তাসহীলুল হাকায়িক

বাংলা শরাহ

কানযুদ্‌দাকায়িক

(দ্বিতীয় খন্ড)

মূল

আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন মাহমুদ আননাসাফী (রহ.)

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ আনোয়ার

পরিচালক : জামিয়া সিদ্দিকিয়া বেতিয়ারকান্দী, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ

প্রাক্তন শাইখুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা আল-মাহমুদ যুবায়ের

শিক্ষক : জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৯২৫০০৯৮২৫, ০১৯২৫০০৯৮২৪

প্রকাশনায়
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯২৫০০৯৮২৫
ফোন ঃ ০১৯২৫০০৯৮২৪

মূল্য
৪০০.০০ টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ
১লা নভেম্বর ২০১৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

পূর্বকথা

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد و اله اجمعين . اما بعد

হামদ ও সালাতের পর, হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সমাদৃত মূল চারটি গ্রন্থের অন্যতম আল্লামা নাসাফী (রহ.) এর অমরকীর্তি কানযুদ্দাকাইক। আল্লাহর ফজলে যার দ্বিতীয় খন্ডের অনুবাদ ও বিশ্লেষণ সমাপ্ত করেছি। প্রথম খন্ড পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে।

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনীর সম্মানিত প্রকাশক হযরত মাওলানা মাসউদুল হাসান সাহেব বরাবরই আমাকে অনুবাদটি জলদি শেষ করতে বলে আসছিলেন। কিন্তু আমারই কাজের ধীরগতি ও বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে হলেও অনুবাদ ও বিশ্লেষণ শেষ করতে পেরে মহান আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। কাজের বিলম্বের দরুন প্রকাশক পাঠক মহলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রথম খন্ডের ন্যায় এ খন্ডেরও নাম দিয়েছি 'তাহসহীলুল হাকায়িক'।

আল্লাহ তা'আলা অধমের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন, আমীন।

পরিশেষে যারা এ কাজটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন এবং কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সফলতার জন্য আন্তরিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, বিশেষ করে জামিয়া সিদ্দিকিয়া বেতিয়ারকান্দী কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ এর স্বনামধন্য পরিচালক ও প্রাক্তন শাইখুল হাদীস জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা এর হযরত মাওলানা মুফতী উবায়দুল্লাহ আনোয়ার দা. বা. ও মুহতারাম আব্বা হযরত মাওলানা আ. খালিক সাহেব (সাবেক নিসিয়র শিক্ষক জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা) এবং জামিয়া ইসলামিয়া কর্মধা এর স্বনামধন্য উস্তাদ মহোদয়গণের অক্লান্ত কুরবানী এবং নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনীর পরিবার, যারা গ্রন্থটি ছাপানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন। আজ তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করছি। তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা রইল। এ পৃথিবীর মানব মন্ডলী সীমিত জ্ঞানের অধিকারী, তাই ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। স্বহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের জানিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা করছি।

হে মাওলা! আপনি আপনার অনুগ্রহে অধমের এ মেহনতটুকু কবুল করুন। এ দ্বারা ছাত্র/ছাত্রীদের যথাযথ উপকৃত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার এ আরজু কবুল করলে সেটাই হবে আমার বড় সফলতা। আমীন।

আল-মাহমুদ যুবায়ের
পিতা : মাওলা আব্দুল খালিক
গ্রাম : ফটিগুলী, ডাক : কর্মধা
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
كتاب النكاح	
অধ্যায় : বিবাহ /৭	
অনুচ্ছেদ : মুহাররামাতের বিবরণ	১৩
পরিচ্ছেদ : ওলী ও কুফু	২৬
অনুচ্ছেদ : পাত্র-পাত্রীর কুফু	৩৪
পরিচ্ছেদ : মহর	৩৯
পরিচ্ছেদ : দাসের বিবাহ	৫৯
পরিচ্ছেদ : কাফেরের বিবাহ	৬৮
পরিচ্ছেদ : পালা বন্টন	৭৮
كتاب الرضاع	
অধ্যায় : স্তন্যপান	৮১
كتاب الطلاق	
অধ্যায় : তালাক	৯২
পরিচ্ছেদ : স্পষ্ট শব্দে তালাক	৯৫
পরিচ্ছেদ : তালাককে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করণ প্রসঙ্গ	১০৭
অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে	১১৮
পরিচ্ছেদ : ইঙ্গিত সূচক তালাক	১২১
পরিচ্ছেদ : তালাকের ক্ষমতা প্রদান	১২৬
পরিচ্ছেদ : স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে	১৩০
পরিচ্ছেদ : ইচ্ছা প্রসঙ্গ	১৩৩
পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত তালাক	১৪২
পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির তালাক	১৫২
পরিচ্ছেদ : রাজআত	১৬০
পরিচ্ছেদ : ঈলা (শপথ করা)	১৭৫
পরিচ্ছেদ : খোলা	১৮৫
পরিচ্ছেদ : যিহার	১৯৬
অনুচ্ছেদ	২০১
পরিচ্ছেদ : লি'আন	২১০
পরিচ্ছেদ : পুরুষত্বহীনতা	২১৯
পরিচ্ছেদ : ইদ্দত	২২৩
পরিচ্ছেদ : বংশ প্রমাণ	২৩৭
পরিচ্ছেদ : সন্তান প্রতিপালন	২৪৬
পরিচ্ছেদ : ভরণ-পোষণ	২৫০
كتاب العتاق	
অধ্যায় : গোলাম আযাদ করা /২৬৭	
পরিচ্ছেদ : এমন দাস সম্পর্কে যার কিছু অংশ স্বাধীন করা হয়	২৭৬
পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত মুক্তি	২৯১
পরিচ্ছেদ : অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান	২৯৩
পরিচ্ছেদ : মুদাব্বার ঘোষণা	২৯৭
পরিচ্ছেদ : দাসী উম্মেওয়ালাদ হওয়া	২৯৯
كتاب الأيمان	
অধ্যায় : শপথ /৩০৫	
পরিচ্ছেদ : প্রবেশ করা, বের হওয়া, বসবাস করা, আগমন করা ইত্যাদি বিষয়ক শপথ	৩১৬
পরিচ্ছেদ : কথা বলা, পরিধান করা এবং পানাহার সংক্রান্ত শপথ	৩২৩
পরিচ্ছেদ : মুক্তিদান ও তালাক সংক্রান্ত শপথ	৩৩৬
পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, নামাজ ও রোজা এবং অন্যান্য বিষয়ে শপথ	৩৪১
পরিচ্ছেদ : হত্যা, প্রহার ও অন্যান্য বিষয়ে শপথ	৩৫০
كتاب الحدود	
অধ্যায় : হদ্দ (দন্ডবিধি) /৩৫৬	
পরিচ্ছেদ : যে সহবাস হদ্দকে আবশ্যক করে আর যা হদ্দকে আবশ্যক করে না।	৩৬৭
পরিচ্ছেদ : যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য ও তা থেকে প্রত্যাহার	৩৭৩
পরিচ্ছেদ : মদ পানের দন্ডবিধি	৩৮১
পরিচ্ছেদ : অপবাদ দানের দন্ডবিধি	৩৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : সাধারণ শাস্তি বিধান -------------	৩৯১

كتاب السرقة

অধ্যায় : চুরি প্রসঙ্গে /৩৯৫

অনুচ্ছেদ : সুরক্ষিত স্থান প্রসঙ্গে -------------	৪০৩
অনুচ্ছেদ : হস্ত কর্তন ও তা সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে ----------------------------	৪০৭
পরিচ্ছেদ : ডাকাতি -----------------------	৪১৬

كتاب السير والجهاد

অধ্যায় : যুদ্ধ-জিহাদ /৪২১

পরিচ্ছেদ : গণিমতের মাল এবং তার বন্টন ---	৪৩১
অনুচ্ছেদ : --------------------------------	৪৩৬
পরিচ্ছেদ : কাফেরদের আধিপত্য বিস্তার -----	৪৪১
পরিচ্ছেদ : নিরাপত্তা অর্জনকারী -------------	৪৪৬
অনুচ্ছেদ : --------------------------------	৪৪৯
পরিচ্ছেদ : উশর (এক দশমাংশ) খারাজ (ভূমি-কর) জিযয়া (নিরাপত্তা-কর) প্রসঙ্গে --------------	৪৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : --------------------------------	৪৫৭
পরিচ্ছেদ : ধর্মত্যাগীদের প্রসঙ্গে -------------	৪৬৪
পরিচ্ছেদ : বিদ্রোহীদের আলোচনা -----------	৪৭৩

كتاب اللقيط

অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া শিশু /৪৭৭

كتاب اللقطة

অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু প্রসঙ্গে /৪৮০

كتاب الأباق

অধ্যায় : পলাতক গোলাম /৪৮৪

كتاب المفقود

অধ্যায় : হারানো ব্যক্তি প্রসঙ্গে /৪৮৭

كتاب الشركة

অধ্যায় : অংশীদারিত্ব প্রসঙ্গে /৪৯০

অনুচ্ছেদ : --------------------------------	৪৯৯

كتاب الوقف

অধ্যায় : ওয়াকফ /৫০২

অনুচ্ছেদ : --------------------------------	৫০৭

তাসহীলুল হাকায়িক

বাংলা শরাহ

কানযুদ্‌দাকায়িক

(দ্বিতীয় খন্ড)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ

هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلٰى مِلْكِ الْمُتْعَةِ قَصْدًا وَ هُوَ سُنَّةٌ وَ عِنْدَ التَّوَقَانِ وَاجِبٌ وَ يَنْعَقِدُ بِاِيْجَابٍ وَ قَبُوْلٍ وَضْعًا لِلْمَضِيِّ اَوْ اَحَدِهِمَا -

---

অনুবাদ ঃ নিকাহ এমন একটি বন্ধন, যা মৌলিকভাবে যৌনাঙ্গ ভোগের অধিকার সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তা হল সুন্নাত। অধিক আসক্তির সময় ওয়াজিব। ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) উভয়টি মাজির (অতীতকাল বাচক) অথবা তাদের একটি মাজি (অতীত কাল বাচক) দ্বারা তা সংঘটিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) তার অনবদ্য গ্রন্থখানী এ পর্যন্ত ইবাদাত তথা নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এখান থেকে মুআমালাত ও মুআশারাত তথা বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেছেন।

কেননা, উভয়টির সমন্বয়ে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন পরিচালিত হয়। সম্মানিত প্রণেতা মুআমালাতের প্রারম্ভ 'কিতাবুন নিকাহ' দ্বারা করেছেন। কেননা, মানুষ ইবাদতের পরপরই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

نِكَاحٌ এর আভিধানিক অর্থ :

نِكَاحٌ শব্দটি বাবে فتح - ضرب - نصر ও تفاعل থেকে ব্যবহৃত হয়। তার মূল বর্ণ হচ্ছে ن - ك - ح তার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে :

১। اَلضَّمُّ - মিলানো।

২। اَلْجَمْعُ - একত্র করা।

৩। اَلْعَقْدُ - বন্ধন। যেমন : আল্লাহ্‌র ইরশাদ— وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

৪। اَلْوَطْئُ - সংগম করা। যেমন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَعَنَ اللّٰهُ نَاكِحَ الْبَهِيْمَةِ-

৫। اَلرُّشْدُ - ভাল-মন্দ বিচার জ্ঞান। যেমন : আল্লাহ্‌র বাণী—

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

৬। اَلْمَهْرُ - মোহর। যেমন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী—

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

نكاح শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১। গ্রন্থকার (রহ.) বলেন—

هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلٰى مِلْكِ الْمُتْعَةِ قَصْدًا -

অর্থাৎ, নিকাহ্ এমন একটি বন্ধন যা মৌলিকভাবে যৌনাঙ্গ ভোগের অধিকার সাব্যস্ত করার লক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। শরহুল বিকায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন—

هُوَ عَقْدٌ مَوْضُوْعٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ اَىْ حِلُّ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ, নিকাহ্ এমন একটি বন্ধন যা দ্বারা হালাল উপায়ে পুরুষ নারী থেকে উপভোগ করার লক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার (রহ.) বলেন—

هُوَ عَقْدٌ وُضِعَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ بِالْاُنْثٰى قَصْدًا

অর্থাৎ, নিকাহ্ এমন একটি বন্ধন যা ঐচ্ছিকভাবে মিলকে মুতআ হালাল হওয়ার অধিকার সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।

মোটকথা, নারী পুরুষের মধ্যে শরীয়ত সম্মত এমন একটি চুক্তি যা তাদের মধ্যে যৌন মিলন ও সতিত্ব সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাকে নিকাহ বলা হয়।

قوله : عَقْدٌ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) নিকাহের সংজ্ঞা বর্ণনায় عقد শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে একথা উপলব্দি করা যায় যে, এখানে 'নিকাহ' দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য নয়; বরং বন্ধনই উদ্দেশ্য। কারণ, এখানে عقد এর বিধি-বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সহবাসের বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানূন নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়।

قوله : لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ الخ : مُتْعَةٌ শব্দটির মীম বর্ণে পেশ সহকারে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ كُلُّ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ 'যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়' তবে শব্দটি اِسْتِمْتَاعٌ তথা 'উপকৃত হওয়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

قوله : وَ هُوَ سُنَّةٌ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে বিবাহের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করতেছেন। বিবাহের গুণাগুণ পুরুষের অবস্থার উপরই ধর্তব্য। পুরুষের অবস্থার ভিন্নতায় বিবাহের হুকুমে ভিন্নতা দেখা দেয়। অর্থাৎ, যদি পুরুষের অবস্থা এমন হয় যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং সে পথ থেকে বাঁচতে বিবাহ ছাড়া এমন কোন পন্থা নেই, তখন পুরুষের উপর বিবাহ করা ফরজ। আর যদি পুরুষের অবস্থা স্বাভাবিক হয়, কিন্তু মহিলার পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করতে অক্ষম হয়, তবে এ ক্ষেত্রে বিবাহ করা মাকরূহ। আর যদি অবস্থা এমন দৃঢ় হয় যে, সে মহিলার উপর অত্যাচার করবে, তবে বিবাহ করা হারাম। আর حالت اعتدال তথা স্বাভাবিক অবস্থায় যদি সহবাস ও ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম হয় তবে দাউদে যাহেরীদের নিকট এমতাবস্থায় বিবাহ করা ফরজে আইন। তারা দলীল দেন কুরআন পাকের আয়াত— فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - । উক্ত আয়াতে اِنْكِحُوْا ইহা امر এর সিগা যা ফরজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, এ অবস্থায় বিবাহ ত্যাগ করে নফল ইবাদতে আত্ম নিয়োগ করা উত্তম। তিনি

দলীল পেশ করেন, কুরআন পাকে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে— سَيِّدًا وَّ حَصُورًا وَّ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ। উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত حصور হল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা। সুতরাং বিবাহ পরিহার করে নফল ইবাদতে আত্ম নিয়োগ করা প্রশংসনীয়।

আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম থেকে কেহ কেহ বলেন, এমতাবস্থায় বিবাহ করা ফরজে কিফায়া। আবার কেহ কেহ বলেন, ফরজে আইন।

তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, এমতাবস্থায় বিবাহ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। দলীল হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার আদর্শ। যে তা থেকে মুখ ফিরায় সে আমার দলভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন নয় বরং নয়জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, যদি ইহা হতে নফল ইবাদত উত্তম হত তবে পিয়ারা রাসূল (সা.) সারা জীবন বৈবাহিক জীবনে কাঠাতেন না। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিবাহকে নবীদের সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন। এবং অনেক হাদীসে বিবাহের তাকীদ ও উৎসাহ দিয়েছেন। মোটকথা, পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থায় যৌন সম্ভোগে ও স্ত্রীর ভরণ পোষণে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বৈবাহিক জীবনের সাথে নফল ইবাদত করা উত্তম।

দাউদে যাহেরীদের দলীলের জবাব হল। امر এর صيغه সব সময় وجوب এর জন্য আসে না বরং ক্ষেত্র বিশেষ مباح - ندب - وجوب - ইত্যাদির জন্য এসে থাকে। অথবা এখানে নির্দেশটি ওয়াজিব বুঝানোর জন্য তবে তা বিবাহের নির্দিষ্ট প্রকারের জন্য প্রযোজ্য।

ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর দলীলের জবাব :

হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। কারণ, হতে পারে তখনকার শরীয়াতে বিবাহের বিধান এভাবেই ছিল। আর আমাদের শরীয়াতে তা لَا رُهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

قوله : وَيَنْعَقِدُ بِاِيْجَابٍ الخ : নিকাহ এর দুটি রুকন রয়েছে। একটি হল ايجاب। আর তা হল বর ও কনের মাঝে প্রথম জনের উত্থাপিত প্রস্তাব। কেননা, তা অপরজনের হ্যাঁ বা না সূচক জবাবের কামনা করে।

দ্বিতীয়টি হল قبول তা হল বর ও কনের দ্বিতীয়জনের উত্থাপিত গ্রহণ। অর্থাৎ বর-কনের প্রথম জনের উক্তিকে ইজাব এবং দ্বিতীয় জনের উক্তিকে কবুল বলা হয়।

উক্ত ইজাব ও কবুলের উভয় শব্দ অতীতকাল বাচক হবে, নতুবা একটি অতীতকাল বাচক হবে। কেননা নিকাহ হলো ইনশা (বর্তমান) এর থেকে। আর ইনশা হল যা প্রমাণিত ছিল না তা প্রমাণ করা এবং বর্তমান কালে কোন জিনিস অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। অর্থাৎ, বিবাহ এমন শব্দাবলীর সন্নিবেশনে হবে যা সরাসরি বর্তমান কালে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসার মর্ম বুঝাবে। আর এমন শব্দ অভিধানে নেই। কারণ, فعل ماضى তা অতিতকাল বুঝায় আর فعل مضارع তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমানভাবে বুঝায়। তাই উভয়টিই পরিত্যক্ত। তবে হ্যাঁ فعل ماضى যা মূলত খবর প্রদানের জন্য গঠন করা হয়েছে তাকে বিবাহের প্রয়োজনকে পূর্ণ করার জন্য ইনশা এর অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যেভাবে দোয়া ইত্যাদিতে فعل ماضى কে ইনশা এর অর্থে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইজাব ও কবুলের উভয় শব্দ অতীতকাল বাচক এর হবে অথবা একটি অতীতকাল বাচক হলেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এক্ষেত্রে অতীতকাল বাচক ভিন্ন শব্দটি ইজাব কবুল থেকে হবে না, বরং তা ওয়াকালতি থেকে হবে। যেমন, কেহ বলল, আমাকে বিবাহ করো। জবাবে অন্যজন বলল, আমি বিবাহ করলাম। তবে প্রথমোক্ত কথাটি

ইজাব বা প্রস্তাব নয়, বরং বিবাহের জন্য ওকীল নিয়োগ করা। আর দ্বিতীয় কথাটি 'আমি বিবাহ করলাম' তা ইজাব ও কবুল।

এদিকে বিবাহের মধ্যে একই ব্যক্তি ইজাব ও কবুল উভয়টি করতে পারে। মূল হওয়ার কারণে নিজের পক্ষ থেকে আর উকীল হওয়ার কারণে অন্যের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ, বিবাহে একই ব্যক্তি ইজাব ও কবুল করতে পারে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ে একজন উভয়দিকের প্রস্তাবক ও গ্রহণকারী হতে পারবে না।

وَ اِنَّمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَ التَّزْوِيجِ وَ مَا وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فِى الْحَالِ عِنْدَ حُرَّيْنِ اَوْ حُرٍّ وَ حُرَّتَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَ لَوْ فَاسِقَيْنِ اَوْ مَحْدُودِيْنِ اَوْ اَعْمَيَيْنِ اَوْ اِبْنَى الْعَاقِدَيْنِ وَ صَحَّ تَزَوُّجُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً عِنْدَ ذِمِّيَيْنِ وَ مَنْ اَمَرَ رَجُلاً اَنْ يُزَوِّجَ صَغِيْرَتَهٗ فَزَوَّجَهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَ الْاَبُ حَاضِرٌ صَحَّ وَ اِلَّا لَا -

---

অনুবাদ : نكاح ও تزويج শব্দ এবং যা গঠন করা হয়েছে সাথে সাথে মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য এমন শব্দাবলী দ্বারা স্বাধীন দুজন পুরুষের উপস্থিতিতে অথবা স্বাধীন একজন পুরুষ ও দুজন স্বাধীন মহিলার উপস্থিতিতে যারা জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলমান যদি উভয়জন ফাসিক হয় অথবা অপবাদ আরোপের অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হয় কিংবা অন্ধ হয় অথবা বর পাত্রীর ছেলে হয়, বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর মুসলমানের বিবাহ জিম্মিয়া (কিতাবী) নারীকে দুজন জিম্মী পুরুষের উপস্থিতিতে সহীহ। আর যে আদেশ করে কোন পুরুষকে যে সে তার অপ্রাপ্তা মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দিবে। অতঃপর সে (উকীল) তাকে একজন ব্যক্তি ও পিতার উপস্থিতিতে বিবাহ দিয়ে দেয় তবে সহীহ। নতুবা সহীহ নয়। (অর্থাৎ, পিতা উপস্থিত না থাকলে বিবাহ সহীহ হবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : وَ اِنَّمَا يَصِحُّ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী বিবাহ نكاح ও تزويج শব্দ দ্বারা সংঘটিত হয়। তাছাড়া যে সকল শব্দাবলী দ্বারা সাথে সাথে মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এমন শব্দাবলী দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হবে। যেমন : بَيْعٌ - شِرَاءٌ - هِبَةٌ - تَمْلِيكٌ - صَدَقَةٌ - عَطِيَّةٌ - উক্ত শব্দগুলো দ্বারা বস্তুর মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় তা দ্বারা নিকাহ সহীহ। তবে اَلشَّرِيكُ - اَلْاِجَارَةُ - اَلْاِبَاحَةُ - اَلْاِحْلَالُ - اَلْاِعَارَةُ - ইত্যাদি শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা, এ প্রকার শব্দাবলী দ্বারা বস্তুর মূল মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, نكاح ও تزويج ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। তার দলীল হলো, শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হবে সে অর্থের প্রতি শব্দের প্রকৃত বা রূপক অর্থ পাওয়া যেতে হবে। সুতরাং নিকাহ এর অর্থ শুধু نكاح ও تزويج শব্দদ্বয়ে পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য শব্দ প্রকৃত বা রূপক কোনভাবেই নিকাহ বুঝা যায় না বিধায় তা দ্বারা বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আমাদের দলীল হচ্ছে, সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে نكاح ও تزويج শব্দ ছাড়া অন্যান্য শব্দগুলো এমন শব্দ যা উপস্থিত মূল বস্তুর মালিকানা বুঝায় তা রূপকভাবে বিবাহের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা, تمليك দেহের মালিকানার কারণে দাসীর সাথে সম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়, তদ্রূপ অন্যান্য শব্দ যা মূল মালিকানা বুঝায় তা দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। তাই বুঝা গেল তামলীক শব্দটি সবব হল আর نكاح শব্দটি মুসাব্বাব হল।

এদিকে নীতিমালা রয়েছে যে, সবব বলে মুসাব্বাব উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। যদিও তার উল্টা জায়েয নয়।

قوله : عِنْدَ حُرَّيْنِ الخ : বিবাহের অন্যতম শর্ত হল সাক্ষ্য প্রদান করা বা সাক্ষ্য রাখা। সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ নয়। তবে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ঘোষণা করা শর্ত। তার দলীল হল, রাসূল (সা.) এর হাদীস أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ الخ - 'বিবাহের ঘোষণা কর, যদিও দফ দ্বারা হয়'। আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী— لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ - 'সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হবে না'।

ইমাম মালিক (রহ.) এর দলীলের জবাব হল এ হাদীসটি ঘোষণা করা ওয়াজিব হওয়া বুঝায়, তবে ঘোষণা করা শর্ত একথা বুঝায় না। এবার সাক্ষী দুজন স্বাধীন পুরুষ বা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দুজন স্বাধীন মহিলা হওয়া অপরিহার্য্য। কেননা, সাক্ষীর যোগ্য সে হবে যে অধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা রাখে।

গ্রন্থকার (রহ.) সাক্ষীদের স্বাধীনতার গুণাগুণের পাশাপাশি সাক্ষীগণ জ্ঞানবান, সাবালক এবং মুসলমান হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কারণ হল গোলাম, নাবালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক তার নিজের উপরই অধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা রাখে না বিধায় অন্যের উপর কিভাবে কর্তৃত্ব করবে?

মুসলমানদের বিবাহ-শাদীতে সাক্ষীগণ মুসলমান হওয়া অপরিহার্য। কেননা, মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا 'আল্লাহ্ মু'মিনগণের উপর কাফেরদের কোন ক্ষমতা প্রদান করেননি, অতএব, মুসলমানের বিবাহে কাফির সাক্ষ্য হতে পারে না।

তবে মুসলমানের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে নাকি ফাসিক বা অন্য দোষে দোষী ব্যক্তিও সাক্ষী হতে পারে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তার সাথীদের মতে মুসলমান সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ন হওয়া শর্ত নয়, বরং যে কোন মুসলমান হোক ন্যায়পরায়ণ বা মুত্তাহাম, সে সাক্ষী হতে পারে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (রহ.) সাক্ষীদের জন্য ন্যায়নিষ্ঠাকে শর্ত করেন। তিনি দলীল দেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস— أَكْرِمُوا الشُّهُوْدَ 'সাক্ষীদের সম্মান কর।'

উক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, সাক্ষ্য হল সম্মানিত আর ফাসিক বা অন্য দোষে দোষী ব্যক্তি হল অসম্মানিত। সুতরাং যদি অসম্মানিত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় তবে সাক্ষ্য যা সম্মানিত তা অর্জিত হয় না।

আমাদের দলীল হল, ফাসিক হউক বা অন্য দোষে দোষী হউক, সে তো মূল অধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য। ইসলাম তাকে তার মুসলমানিত্বের গুণে তার নিজের উপর অধিকার প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে। এজন্য অন্যের উপরও তার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কেননা, মুসলমান সবাই একই শ্রেণীভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ ফাসিক ব্যক্তি বিচারক হতে পারে এবং বিচারক ও অন্যের উপর অধিকার প্রয়োগ করতে পারে বিধায় সে সাক্ষ্যও হতে পারে।

قوله : وَصَحَّ تَزَوُّجُ مُسْلِمٍ ذِمِّيَّةً الخ : মুসলমান পুরুষ জিম্মি তথা আহলে কিতাবীকে বিবাহ করতে পারবে। কেননা, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ -

উক্ত আয়াতে আহলে কিতাবীয়াহদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মুসলমান পুরুষ জিম্মীয়াহকে বিবাহ করলে তার বিবাহের সাক্ষী জিম্মী হতে পারবে কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত শায়খাইন (রহ.) এর মতে মুসলমান পুরুষ জিম্মীয়াহকে বিবাহ করলে তার সাক্ষী

জিম্মী হতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও যুফার (রহ.) এর মতে মুসলমান ভিন্ন কেহ সাক্ষী হতে পারে না। তাদের দলীল হল, বিবাহে ইজাব কবুল শ্রবণ করার নাম হচ্ছে সাক্ষ্য। আর মুসলমানের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। সুতরাং সে যেন ইজাব কবূল শ্রবণই করল না। তাই সাক্ষ্য না পাওয়ার দরুন বিবাহও সংঘটিত হল না।

শায়খাইনের দলীল হল, বিবাহে দুটি বস্তু লক্ষণীয় :

১। স্বামীর জন্য স্ত্রীলোক থেকে যৌন সম্ভোগের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

২। স্বামীর উপর বদলা স্বরূপ স্ত্রীলোকের জন্য মোহর সাবিত করা।

এবার লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, সাক্ষ্য এমন বস্তুর জন্য হয়ে থাকে যা সম্মানজনক। উল্লিখিত দুটি বস্তু থেকে প্রথমটি তথা যৌন সম্ভোগের স্থানও হচ্ছে সম্মানজনক। তবে দ্বিতীয়টি তথা মহর ওয়াজিব করা তা হচ্ছে মাল। তাতে কোন সম্মান মর্যাদা নেই। আবার এ মহর তথা মাল নির্ধারণ করা ছাড়াও বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, সাক্ষ্যদ্বয় স্বামীর জন্য সম্মানজনক বস্তু তথা স্ত্রীর যৌন সম্ভোগকেই সাবিত করতেছে। যা স্বামীর পক্ষে ও জিম্মীয়াহ্ স্ত্রীলোকের বিপক্ষে। এদিকে কাফেরের সাক্ষ্য মুসলমানের পক্ষে গ্রহণ করা হয় যদিও বিপক্ষে কবূল করা হয় না। এজন্য মুসলমান জিম্মীয়াহ্ মহিলাকে বিবাহ করতে জিম্মী সাক্ষ্য হতে পারবে।

قوله : وَ مَنْ اَمَرَ رَجُلًا الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দেওয়ার জন্য ওকীল নিযুক্ত করে। আর ওকীল একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দেয়। এবার লক্ষ্যণীয় হল বিবাহের মজলিসে উক্ত পিতা উপস্থিত আছেন কি না। যদি পিতা উপস্থিত থাকেন তবে বিবাহ হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে পিতা বিবাহ সম্পাদনকারী হিসেবে গণ্য হবেন। আর ওকীল দ্বিতীয় সাক্ষীরূপে সাব্যস্ত হবেন। কেননা, পিতার উপস্থিতিতে ওকীল শুধু বার্তাবাহক ও বক্তব্য উচ্চারণকারী হিসেবে ধর্তব্য হবেন।

আর যদি বিবাহের মজলিসে পিতা উপস্থিত না থাকেন তবে পিতাকে মজলিসের ভিন্নতার দরুন বিবাহের আকদ সম্পাদনকারীরূপে গণ্য করা সম্ভবপর নয়। তাই ওকীল বিবাহের আকদ সম্পাদনকারীরূপে গণ্য হবেন। এমতাবস্থায় মাত্র একজন সাক্ষী অবশিষ্ট থাকেন। বিধায় বিবাহ সংঘটিত হবে না।

فَصْلٌ فِى الْمُحَرَّمَاتِ

অনুচ্ছেদ : মুহাররামাতের বিবরণ

حُرِمَ تَزَوُّجُ أُمِّهِ وَ بِنْتِهِ وَ إِنْ بَعُدَتَا وَ أُخْتِهِ وَ بِنْتِهَا وَ بِنْتِ أَخِيْهِ وَ عَمَّتِهِ وَ خَالَتِهِ وَ أُمِّ اِمْرَأَتِهِ وَ بِنْتِهَا اِنْ دَخَلَ بِهَا وَ اِمْرَأَةِ أَبِيْهِ وَ اِبْنِهِ وَ اِنْ بَعُدَ وَ الْكُلُّ رِضَاعًا وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَ وَطْيًا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ -

অনুবাদ : আপন মাকে ও আপন মেয়েকে (বিবাহ করা নিষিদ্ধ)। যদিও দূরবর্তী হয়। নিজ বোন ও বোনের কন্যা এবং ভাইয়ের কন্যাকে (বিবাহ করা নিষিদ্ধ)। নিজ খালা ও ফুফুকে (বিবাহ করা নিষিদ্ধ)। স্বীয় স্ত্রীর মাকে (বিবাহ করা নিষিদ্ধ) এবং যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে স্ত্রীর গর্ভের (অন্য স্বামীর ঔরষজাত) মেয়েকে (বিবাহ করা নিষিদ্ধ)। পিতার স্ত্রী ও সন্তানের স্ত্রীকে (বিবাহ করা নিষিদ্ধ)। যদিও দূরবর্তী হয়। দুগ্ধ সম্পর্কেও এদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। দুই (সহোদর) বোনকে বৈবাহিকভাবে অথবা মালিকানায় সহবাসে একত্র করা নিষিদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : গ্রন্থকার (রহ.) ইতিপূর্বে বিবাহের শরয়ী অবস্থান ও তার হুকমী প্রকারসমূহ উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তা নিয়ে আলোচনা করছেন। যে সকল স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ তা দু শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) حرمة مؤبدة - যাদের সাথে সর্বদা বিবাহ নিষিদ্ধ। কখনো তা জায়েয হয় না। তা হারাম হওয়ার কারণ তিনটি : (ক) القرابة الخاصة - 'বিশেষ আত্মীয়-স্বজন'। যেমন, নিজের সন্তানাদী যতই নিম্নের হউক। তদ্রূপ নিজের মূল অর্থাৎ, পিতামাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী যতই উর্ধ্বতন হউক। তবে দাদার, নানার, দাদীর, নানীর সন্তানগণ হারাম কিন্তু তাদের সন্তানগণ তথা চাচার, ফুফুর, খালার, মামার সন্তানগণ হারাম নয়।

(খ) نکاحی رشته 'বিবাহ সূত্রে আত্মীয়-স্বজন'। যেমন স্ত্রীর সন্তান যতই নিম্নেরই হউক। এবং তার মাতা যতই উর্ধ্বতন হউক।

(গ) رضاعی رشته 'দুধপান সূত্রে আত্মীয়-স্বজন'। যেমন বংশীয় সম্পর্কে যারা হারাম হয় দুধ সম্পর্কেও তারা হারাম হিসাবে বিবেচ্য হবেন।

(২) حرمت غير موبدة - যারা অস্থায়ীভাবে হারাম। তবে কখনো কখনো হালাল হয়ে যায়। এ প্রকার মহিলা হারাম হওয়ার কারণ চারটি।

(ক) الجمع من المحرمات। 'এমন দুজন মহিলাকে একত্র করণ। যদি তাদের একজনকে পুরুষ অনুমান করা হয় তবে দ্বিতীয়জন তার জন্য বিবাহ করা হারাম হয়। যেমন, সহোদর বোন, অথবা খালা ও তার বোনের মেয়ে।

(খ) حق غير অন্যের বিবাহিতা বা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে বিবাহ করা হারাম।

(গ) عدم دين কাফিরা বা মুশরিকাকে বিবাহ করা হারাম।

(ঘ) মুনিব তার দাসীকে অথবা গোলাম তার মালিকাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

তাছাড়া বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন, স্বাধীন স্ত্রীর সাথে দাসীকে বিবাহ করা, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে হালালা ছাড়া পূর্বের স্বামী বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

قوله : وَ حَرُمَ تَزَوُّجُ اُمِّهٖ الخ : নিজ মাতাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অনুরূপ নানী, দাদীসহ যত উর্ধ্বেরই হউক না কেন তাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কন্যা সন্তান যা তার বীর্য দ্বারা সৃষ্ট তাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এমনিভাবে আপন মেয়ের সন্তানগণ যতই নিম্নে যাক বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

দলীল হল, আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ

'তোমাদের জন্য তোমাদের মাতা ও তোমাদের কন্যাকে হারাম করা হয়েছে।'

উক্ত আয়াতে কারীমাতে মাতা, নানী, দাদী যতই উর্ধ্বেরই হউক না কেন এবং মেয়েকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত اُمٌّ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মূল, শিকড়। তাই এই মূল বা اصول এর ভেতর যেভাবে মাতা বিদ্যমান তেমনি দাদী, নানীগণও বিদ্যমান। তাই সবাইকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অথবা বলা যেতে পারে اُمَّهَات দ্বারা শুধু মাতা উদ্দেশ্য আর দাদী নানী উর্ধ্বতনগণকে ইজমার ভিত্তিতে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ পৌত্রী, প্রপৌত্রী যতই অধঃস্তন হউক না কেন তাদেরও বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এদের বিবাহ করা হারাম হওয়াটা ইজমা বা ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত।

قوله : وَ اُخْتِهٖ وَ بِنْتِهَا الخ : এমনিভাবে বোন, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নি-কন্যাগণ, ফুফু খালা সবই বিবাহ করা নিষিদ্ধ। তাদের হারাম হওয়ার দলীল হল আল্লাহর তাআলার ইরশাদ—

وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ

(তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) 'তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যাগণ'

উক্ত আয়াতে যেহেতু বোন, ফুফু, খালা শর্তবিহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিধায় সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় সব ধরনের বোন, ফুফু, খালাকে বিবাহ করা হারাম বুঝায়।

قوله : وَ اُمِّ اِمْرَاَتِهٖ وَ بِنْتِهَا الخ : স্বামী তার স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা হারাম। স্বামী উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক। কেননা, কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন— وَ اُمَّهٰتُ نِسَائِكُمْ (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) 'তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণকে'। উক্ত আয়াতে সহবাসের শর্তারোপ করেননি বিধায় এ হুকুম তার শর্তহীন হওয়ার উপর বহাল থাকবে। তবে স্ত্রীর পূর্বের স্বামী মাধ্যম কন্যাকে দ্বিতীয় স্বামী বিবাহ করতে পারবে কি না এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা হল যদি স্বামী উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তালাক দিয়ে দেয় তবে উক্ত মহিলার মেয়েকে উক্ত পুরুষ বিবাহ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি সহবাস করে ফেলে তবে উক্ত মেয়েকে আর কখনো বিবাহ করা জায়েয হবে না। কেননা, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَرَبَائِبُكُمُ اللّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) 'তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীর কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। তবে যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। উক্ত আয়াতের বাহ্যিকতায় বুঝা যায় এমন মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয নয় যাদের লালন-পালন দ্বিতীয় স্বামীর দায়িত্বে। তবে যাদের লালন-পালনের দায়িত্বে দ্বিতীয় স্বামী নয় তাদের বিবাহ করতে পারবে।

মূলতঃ কুরআনে পাকের আলোচিত حجور এর قيد টি হল قيد اتفاقى বা قيد عادى তা قيد احترازى নয়।

অর্থাৎ, সাধারণ নিয়ম হল যে, এমন মেয়েকে দ্বিতীয় স্বামী লালন-পালন করে থাকেন।

কুরআনে যখন জায়েয হওয়ার বর্ণনা করেছেন তখন শুধু সহবাসের শর্ত এর نفى এর উপর নির্ভর করেছেন। حجور এর نسى এর উল্লেখ করেননি। যদি حجور এর نفى উদ্দেশ্য হত তবে জায়েয বর্ণনার সময় তার ও نفى এর উল্লেখ করা হত।

قوله : وَ امْرَأَةِ أَبِيْهِ وَ ابْنِهِ الخ : পিতা, দাদা, নানা যতই উর্ধ্বেরই হোক না কেন, তার স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা, পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে— وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَائُكُمْ - 'তোমাদের পিতা যাদেরকে বিবাহ করেছেন তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না'। উক্ত আয়াতে সাধারণভাবে নিকাহই উল্লেখ করেছেন। এতে সহবাসের শর্তারোপ করেননি বিধায় পিতা শুধু বিবাহ করলেই পিতার স্ত্রীকে সন্তানের জন্য বিবাহ করা হারাম। অনুরূপভাবে পুত্রবধু, পৌত্রবধু প্রপৌত্র বধু যতই নিম্নের হউক কাহাকেও বিবাহ করা জায়েয নয়। তার দলীল হল কোরআনের বাণী— وَ حَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ - 'তোমাদের জন্য হারাম তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ।' উক্ত আয়াতে اصلاب এর قيد দ্বারা উদ্দেশ্য হল পালক পুত্রের বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া। তবে তা দ্বারা দুধ সম্পর্কীয় পুত্রের স্ত্রীগণের বিবাহ করা হালাল হওয়া বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

قوله : وَالكُلُّ رِضَاعًا الخ : বংশীয় সম্পর্কে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম ঠিক তেমনি দুধ সম্পর্কীয় তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। দলীল হল পবিত্র কোরআনের আয়াত—

وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

'তোমাদের যে মাগণ তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন, তাদেরকে এবং দুধবোনদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম।

আর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ

'তোমাদের নসব (রক্ত সম্পর্ক) এর কারণে যা হারাম দুগ্ধ পানের কারণেও তা হারাম।'

দ্বিতীয়তঃ দুধ পানের সময় শিশুর শরীর গঠিত হয় দুধ এর ভিত্তিতে অর্থাৎ, তখনকার সময় তার প্রধান খাবার হয় দুধ। সুতরাং শিশু দুধ পানের কারণে উক্ত মহিলার جزء বা অংশ হয়ে গেল। আর নিজ অংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা নিষিদ্ধ।

উপরোল্লেখিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এটুকু প্রমাণিত হল যে, রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয় দুধ সম্পর্কেও তারা নিষিদ্ধ হন।

قوله : وَالْجَمْعُ بَيْنَ اُخْتَيْنِ نِكَاحًا الخ : দু বোনকে একত্র করার দু কারণ :

১। বিবাহে একত্র করা। ২। মালিকানায় একত্র করা।

বিবাহে একত্র করা হারাম। যদি কেহ দু বোনকে এক আকদে বিবাহ করে তবে তার এ বিবাহ মূলগতভাবে হারাম। আর যদি কেহ দু বোনকে একত্র করে এভাবে যে প্রথমে একজনকে বিবাহ করে অতঃপর অপরজনকে বিবাহ করে। তবে দ্বিতীয়জনের বিবাহ বাতিল বলে বিবেচ্য হবে।

২। মালিকানায় একত্র করা। তথা দুবোন বাদীর এক মালিক হওয়া। তা জায়েয। তবে উভয়জনের সাথে সহবাস করা জায়েয নয়।

দলীল হল- আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন— وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ 'আর দু বোনকে একত্র করা (হারাম)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهٗ فِىْ رِحْمِ اُخْتَيْنِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন দুই বোনের রেহেমে আপন বীর্য একত্র না করে।'

ফিরোজ দায়লামী (রা.) এর হাদীসে আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম যে, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার বিবাহে দুজন পরস্পর বোন রয়েছে। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি দুজন থেকে একজনকে পছন্দ কর।

মোটকথা, বিবাহে পরস্পর দু বোনকে একত্র করা হারাম। আর মালিকানায় সহবাসের দিক দিয়ে একত্র করা জায়েয নয়। তবে উভয়ের মালিক হওয়া জায়েয।

فَلَوْ تَزَوَّجَ اُخْتَ اَمَتِهِ الْمَوْطُوْءَةِ لَمْ يَطَاءَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتّٰى يَبِيْعَهَا وَ لَوْ تَزَوَّجَ اُخْتَيْنِ فِىْ عَقْدَيْنِ وَ لَمْ يَدْرِ الْاَوَّلُ فُرِّقَ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَهُمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ بَيْنَ اِمْرَاَتَيْنِ اَيَّةٌ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَرُمَ النِّكَاحُ وَ الزِّنَا وَ اللَّمْسُ وَ النَّظْرُ بِشَهْوَةٍ يُوْجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَ حَرُمَ تَزَوُّجُ اُخْتِ مُعْتَدَّتِهٖ وَ اَمَتِهٖ وَ سَيِّدَتِهٖ وَ الْمَجُوْسِيَّةِ وَ الْوَثَنِيَّةِ -

---

অনুবাদ : যদি সহবাসকৃত বাদীর বোনকে বিবাহ করে তবে বাদীটি বিক্রয় করা ছাড়া উভয়ের কারও সাথে সহবাস করতে পারবে না। আর যদি দু বোনকে পৃথক দু আকদে বিবাহ করে এবং প্রথম কোনটি তা না জানে তবে সেও উভয় বোনকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। আর উভয় বোন অর্ধেক মহর পাবে। আর এমন দু মহিলাকে একত্র করা জায়েয নয়, যাদের একজনকে পুরুষ অনুমান করলে দ্বিতীয়জন তার জন্য হারাম হয়। ব্যভিচার ও কামপ্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ বা তাকানোতে বৈবাহিক মাহরামিয়াত আবশ্যক হবে। আর (স্বামীর তালাকে) ইদ্দত পালনকারিণীর বোনকে (উক্ত স্বামী) বিবাহ করা হারাম। নিজ বাদীকে (বিবাহ করা হারাম), (গোলাম) নিজ মুনিবাকে (বিবাহ করা হারাম), অগ্নিপুজারীকে (বিবাহ করা হারাম) এবং পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ করা হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : فَلَوْ تَزَوَّجَ اُخْتَ الخ : কাহারও অধীনে একজন বাদী বিদ্যমান আর সে উক্ত বাদীর সাথে সহবাস করল। অতঃপর উক্ত বাদীর সহোদর বোনকে উক্ত ব্যক্তি বিবাহ করল। তবে তার এ বিবাহ জায়েয হয়েছে। কারণ, তার এ আকদ এমন স্থানে হয়েছে যেখানে পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে এবং বৈধ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তাই বিবাহ হয়ে গেল। এবার এ বিবাহের পর সে আর তার বাদীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। যদিও সে বিবাহিতার সাথে মোটেও সহবাস না করে। কেননা, বিবাহিতা হুকুমের দিক দিয়ে সহবাসকৃতার অনুরূপ। তবে হ্যাঁ যদি কোন পন্থায় সে বাদীটিকে নিজের উপর হারাম করে নেয়, যেমন বিক্রয় করে দিল বা দান করে দিল তবে সে তার বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে। আর যদি বাদীটির সাথে সে মোটেও

সহবাস করে না তবে বিবাহিতার সাথে সহবাস করতে পারবে। কেননা, বাদী মূলগতভাবে অথবা হুকুমগতভাবে সহবাসকৃতা নয়। কেননা, এ সূরতে দুই বোনকে সহবাসের মাধ্যমে একত্র করার খারাবী আবশ্যক হয় না।

قوله : وَ لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি পরস্পর দু বোনকে দু আকদে বিবাহ করে কিন্তু কাকে প্রথমে আর কাকে পরে বিবাহ করেছে তা জ্ঞাত না থাকে তবে কাজী সাহেব উক্ত স্বামী এবং দু' বোনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। কেননা, তাদের উভয় বোনের একজনের বিবাহ অবশ্যই বাতিল আর একজনের বিবাহ কার্যকর। অর্থাৎ, প্রথম যার সাথে আকদ হয়েছে তিনি স্ত্রী হিসাবে কার্যকর হবেন আর দ্বিতীয় আকদ বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু প্রথম কে, দ্বিতীয় কে তা না জানা অবস্থায় ধার্য করা সম্ভবপর নয়। বিধায় উভয়ের বিবাহই বাতিল বলে গণ্য হবে। আর কাজীর এ বিচ্ছিন্ন করা তা তালাকে বায়েন হবে। এবার যদি এ বিচ্ছিন্ন করাটা সহবাসের আগে হয়ে থাকে, আর উভয়ের মহর সমান সমান থাকে তবে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক উভয়ে বন্টন করে নিবে। সুতরাং প্রত্যেকের ভাগে $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ ভাগ করে হবে। কেননা, মূলত এক্ষেত্রে একজনের বিবাহ সংঘটিত হয়েছে বিধায় তার মহরও ওয়াজিব হবে। আর যেহেতু সহবাসের পূর্বে তালাক হয়েছে তাই ধার্যকৃত মহরের অর্ধেকই ওয়াজিব হবে। এবার যার বিবাহ সঠিক হয়েছিল তাকে চেনা সম্ভবপর নয় বিধায় উভয়ই এ অর্ধেক মহরকে বন্টন করে নিবে।

قوله : وَ بَيْنَ امْرَأتَيْنِ أَيَّةٌ فُرِضَتْ ذَكَراً الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে মুহাররামাত পরস্পর দু মহিলাকে একত্র করা নিষিদ্ধ এর উপর একটি নীতিমালা বর্ণনা করতেছেন, আর তা হল এমন দু মহিলাকে বিবাহে একত্র করা নিষিদ্ধ যাদের থেকে একজনকে পুরুষ ধারণা করা হলে অপরজন তার জন্য হারাম হয়। যেমন, মেয়ে ও তার ফুফু। যদি মেয়েকে ছেলে ধরা হয় তবে ছেলে তার ফুফুকে বিবাহ করা হারাম। তদ্রূপ ফুফুকে পুরুষ মানলে তার ভাইয়ের কন্যাকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম। উভয় সূরতে তাদের বিবাহ জায়েয হল না। এজন্য এক পুরুষ এমন দু মহিলাকে তার আকদে একত্র করা জায়েয নয়।

দলীল হল : এ ধরনের দুই মহিলাকে একত্র করার দ্বারা তারা পরস্পর সতিন হবে। আর সতিনদের মাঝে সাধারণত ঝগড়া ফাসাদ লেগেই থাকে। তাই তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে। অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হারাম। তাই যা হারাম হওয়ার সবব হয় তাও হারাম হবে। সুতরাং এ ধরনের দুই মহিলাকে একত্র করা হারাম।

قوله : وَالزِّنَا الخ : ব্যভিচার দ্বারা আমাদের মাযহাব মতে বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হয়। তাই ব্যভিচারকারীর উপর ব্যভিচারকৃতার মাতা নানীসহ উর্ধতন সবাই হারাম হয়ে যাবে। তদ্রূপ ব্যভিচারকৃতার মেয়ে, পৌত্রীসহ অধঃস্তন সবাই হারাম হয়ে যাবে। আর ব্যভিচারকৃতার উপরও ব্যভিচারকারীর উর্ধ্বতন, অধস্তন সবাই হারাম হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (রহ.)এর মতে ব্যভিচার দ্বারা মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে না। তাই তার মাযহাব মতে উভয়জনের জন্য উভয় দিকই হালাল। তার দলীলের সারসংক্ষেপ হল- ব্যভিচার হল একটি অপরাধ ও হারাম কাজ। যার কোন সম্মান-মর্যাদা নেই। কিন্তু বৈবাহিক মাহরামিয়াত হল অত্যন্ত সম্মানিত বিষয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً

'আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি দ্বারা। অতঃপর তাকে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল বানিয়েছেন'। সুতরাং হারাম কাজ দ্বারা সম্মানি ও মর্যাদাময় কিছু অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ হারাম কাজ কোন নিয়ামতের সবব বা কারণ হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো : উভয়ের মাঝে অংশিদারীত্ব সাব্যস্ত হওয়ার মূল বা আসল হল সন্তান। অর্থাৎ, সন্তান স্ত্রীলিঙ্গ হলে সহবাসকারীর পিতা ও ছেলের জন্য সন্তান হারাম হবে। আর যদি সন্তান পুংলিঙ্গ হয় তবে সহবাসকারীর মাতা ও কন্য হারাম হবে। অতঃপর এ হারাম হওয়াটা তথা মুহাররামিয়াতের সম্পর্ক সন্তানের দু দিকে তথা সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার দিকে স্থানান্তরিত হবে। তাই সহবাসকারীর উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন সহবাসকৃতার উপর এবং সহবাসকৃতার উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন সহবাসকারীর উপর হারাম হবে। কেননা, সন্তান উভয়কে একত্র ও অংশীদারিত্ব করে দিয়েছে। তাই তো সন্তান শুধু সহবাসকারীর দিকে সম্বন্ধ করা যায়। তদ্রূপ সহবাসকৃতার দিকে সম্পৃক্ত করা যায়।

মোটকথা, সহবাসকারী ও সহবাসকৃতা উভয়ই সন্তানের মাধ্যমে একজন অপরজনের অংশ বিশেষ হল। আর অংশের সাথে সহবাস করা নিষিদ্ধ। তবে আপন স্ত্রী স্বামীর অংশ হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে পুনরায় তথা বার বার সহবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কষ্ট দূরীকরণার্থে। যাতে বিবাহের উদ্দেশ্য তথা সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার তা ধ্বংস না হয়ে যায়।

قوله : وَ اللَّمْسُ وَ النَّظْرُ بِشَهْوَةٍ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) তার অনবদ্য গ্রন্থে مس বা স্পর্শের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ভুলে বা আনন্দে কাম-প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ করে তবে আমাদের মাযহাব মতে তার সাথে বৈবাহিক মাহরামিয়্যাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর মতে উল্লিখিত পন্থায় মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রী অন্যের যৌনাঙ্গের দিকে কামভাবে তাকায় তবে আমদের মাযহাব মতে তার সাথে বৈবাহিক মাহরামিয়্যাত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর মতে সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, উক্ত মতানৈক্য হালালভাবে স্পর্শ বা তাকানোর ক্ষেত্রে। হারামভাবে স্পর্শ বা তাকানো উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর দলীল : স্পর্শ করা বা তাকানো তা সহবাসের হুকুমভুক্ত নয়। কেননা, সহবাসের সাথে যে হুকুমসমূহ প্রযোজ্য হয় তার সবকটি তাকানোর সাথে বা স্পর্শ করার সাথে সম্পৃক্ত হয় না। যেমন, সহবাসে রোযা ফাসেদ হয়ে যায়, কিন্তু স্পর্শে বা তাকানোতে রোযা ফাসেদ হয় না। তদ্রূপ সহবাসে ইহরাম ভেঙ্গে যায় তবে স্পর্শে বা তাকানোতে ইহরাম ভঙ্গ হয় না। তাই স্পর্শ ও তাকানোকে সহবাসের সাথে যুক্ত করা যাবে না এবং তা দ্বারা বৈবাহিক মাহরামিয়াত সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলীল হল : স্পর্শ ও তাকানো (কামভাবের সাথে) এমন একটি কারণ যা সহবাসের দিকে আকৃষ্ট করে। তাই সতর্কতা বশতঃ তা সহবাসের স্থলাভিষিক্ত করে তার উপর সহবাসের হুকুম আরোপিত করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীলের জবাব : রোযা ও ইহরাম ভাঙ্গতে হলে প্রকৃত সহবাসের প্রয়োজন। অথচ স্পর্শ ও তাকানোকে আমরা প্রকৃত সহবাস বলি না। আমাদের মাযহাবের সমর্থনে হযরত উম্মে হানী (রাযি.)-এর হাদীস রয়েছে—

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِ اِمْرَاَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَ بِنْتُهَا

'যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের দিকে তাকায় তার উপর হারাম উক্ত স্ত্রীলোকের মাতা ও মেয়ে।
তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযি.)-এর হাদীস—

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْاَةَ اَوْ قَبَّلَهَا اَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ اَوْ نَظَرَ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلٰى اَبِيْهِ وَ اِبْنِهٖ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَ اِبْنَتُهَا (عينى شرح هداية)

'ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা চুম্বন দেয়

কিংবা কামভাবের সাথে স্পর্শ করে অথবা কামভাবের সাথে তার যৌনাঙ্গের প্রতি তাকায় তবে উক্ত পুরুষের পিতা ও সন্তানের উপর সে হারাম এবং উক্ত পুরুষের উপর তার (স্ত্রীলোকের) মাতা ও মেয়ে হারাম। সুতরাং হাদীস ও কিয়াসের আলোকে প্রমাণিত হল যে, কামভাবের সাথে স্পর্শ করা ও তাকানোতে মাহরামিয়াতের সম্পর্ক হয়ে যায়।

قوله : وَ حُرِمَ تَزَوَّجُ أُخْتِ مُعْتَدَّتِهِ الخ : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকে রেজয়ী বা বায়েন বা মুগাল্লাযাহ দিল। অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালনকালে উক্ত স্ত্রীর বোনকে উক্ত ব্যক্তি বিবাহ করা হারাম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর মতে উক্ত স্ত্রী তালাকে বায়েন বা মুগাল্লাজার দরুন ইদ্দত পালন রত হলে তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয। কারণ, এক্ষেত্রে তালাকই বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী। আর বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী পাওয়া গেলে অবশ্যই তার প্রভাবও পাওয়া যাবে। বিবাহ বিচ্ছিন্ন এর দলীল হল, যদি মু'তাদ্দার সাথে সহবাস করা হারাম জেনেও সে উক্ত মু'তাদ্দার সাথে সহবাস করে তবে হদ ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হল, যে কোন তালাক পরবর্তী মু'তাদ্দার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বিদ্যমান থাকে। কেননা, বিবাহের অনেক বিধি-বিধান এখনও বাকী রয়েছে। যেমন, তালাকের পূর্বে যেভাবে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব ছিল তেমনি ইদ্দত পালনকালেও স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। তেমনি স্বামীর অধিকার আছে সে চাইলে ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করতে পারবে। সুতরাং বুঝা গেল, এখনও বিবাহ আংশিক বাকী রয়েছে। তাই এমতাবস্থায় অন্য বোনকে বিবাহ করলে দু' বোনকে একত্র করা হবে যা হারাম।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর দলীলের জবাব : ইদ্দত পালনকালে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে টিকই তবে তার কার্যকারিতা ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হবে বিবাহের হুকুম বাকী থাকার কারণে। আর ইদ্দত পালনকালে স্বামীর হারাম জানা থাকা অবস্থায় সহবাসে হদ ওয়াজিব হবে উক্তিটি আমরা গ্রহণ করি না। বরং 'মাবসূতের' ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, হদ ওয়াজবি হবে না। আর যদি হদ ওয়াজিব হয় এমনটি বলতে হয় তবুও তা বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা যিনা হিসাবে গণ্য হবে। কারণ, বৈবাহিক সম্পর্ক কিছুটা থাকলেও সহবাস হালাল হওয়ার মালিকানা দূর হয়ে গেছে। তাই যেনা দ্বারা হদ ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ أَمَتِهِ وَ سَيِّدَتِهِ الخ : মনিব তার ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা হারাম। যদিও সে পূর্ণ দাসীর মালিক হউক বা আংশিক মালিক হউক। তদ্রূপ মহিলা তার দাসকে বিবাহ করা হারাম। মহিলা এ দাসের পূর্ণ মালিক হউক বা আংশিক। দলীল হল : বিবাহের এমন কিছু ফলাফল থাকে যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমান অধিকার থাকে। অর্থাৎ, কেহ কারও মালিক হতে পারবে না। কেননা, একজন মালিক আর একজন মামলূক হলে মালিকের প্রভাব সৃষ্টি হবে। অথচ বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা মালিক হওয়াকে অথবা মালিক বানানোকে গ্রহণ করে না। বিধায় মুনিব তার ক্রীতদাসীকে বা মহিলা তার ক্রীতদাসকে বিবাহ করা জায়েয নয়।

قوله : وَالْمَجُوْسِيَّةِ الخ : অগ্নিপূজক নারীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِيْ نِسَائِهِمْ وَلَا اٰكِلِيْ ذَبَائِحِهِمْ

'তাদের সাথে কিতাবীদের মত আচরণ করো তবে তাদের নারীদের বিবাহ করো না এবং তাদের জবাইকৃত পশু খেয়ো না।

সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, মজুসীদের সাথে কিতাবীদের মত আচরণ করা হবে তবে তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা যাবে না এবং তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। তদ্রূপ পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

لَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

'আর মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে।'

সুতরাং কুরআনের আয়াত দ্বারা وثنية তথা পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হল।

وَ حَلَّ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّةِ وَ الصَّابِيَّةِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ لَوْ مُحْرِمًا وَ الْأَمَةِ وَ لَوْ كِتَابِيَّةً وَ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ لَا عَكْسِهٖ وَ لَوْ فِىْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ أَرْبَعٍ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ فَقَطْ وَ ثِنْتَيْنِ لِلْعَبْدِ وَ حُبْلٰى مِنْ زِنًا لَا مِنْ غَيْرِهٖ وَ الْمَوْطُوْءَةِ بِمِلْكٍ أَوْ زِنًا وَ الْمَضْمُوْمَةِ إِلٰى مُحَرَّمَةٍ وَ الْمُسَمّٰى لَهَا -

অনুবাদ : কিতাবিয়া নারীকে বিবাহ করা জায়েয। সাবেঈ নারীকে (বিবাহ করা জায়েয), ইহরাম বাধা নারীকে যদিও স্বামী মুহরিম হয় (বিবাহ করা জায়েয), বাদীকে যদিও সে কিতাবিয়া হয় (বিবাহ করা জায়েয) দাসী নারীর উপস্থিতে স্বাধীন নারীকে (বিবাহ করা জায়েয), তবে তার বিপরিত (তথা স্বাধীনা নারীর উপস্থিতে বাদীকে) বিবাহ করা জায়েয নয়, যদিও সে স্বাধীন নারী ইদ্দত পালনে হয়। (স্বাধীন পুরুষ এক সাথে) স্বাধীন ও দাসী থেকে শুধু চারজনকে (বিবাহ করতে পারবে), দাস দুজনকে (বিবাহ করতে পারবে) ব্যভিচারে গর্ভবতীকে (বিবাহ করা জায়েয) তবে অন্য পন্থায় গর্ভবতীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। মালিকানার ভিত্তিতে সহবাসকৃত বা ব্যভিচারীকে (বিবাহ করা সহীহ) এবং এমন মহিলাকে যাকে মুহরিমার (যাকে বিবাহ করা মূলত জায়েয নয়) সাথে এক আকদে মিলানো হয়, তার বিবাহ জায়েয। আর ধার্যকৃত পূর্ণ মহর তার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : وَ حَلَّ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّةِ الخ : কিতাবিয়া মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয। কিতাবী ঐ মহিলা যে আমাদের নবী ভিন্ন অন্য কোন নবীর উপর ঈমান আনে এবং কোন আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখে। স্বাধীন কিতাবীকে বিবাহ করা জায়েয।

দলীল হল : আল্লাহর তাআলার বাণী— وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ الخ 'আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে সতী নারীকে' (বিবাহ করা জায়েয)। উক্ত আয়াতে محصنت এর قيد স্বাভাবিকভাবে তা শর্ত বুঝাবার জন্য নয়।

قوله : وَالصَّابِيَّةِ الخ : সাবেঈ নারীকে বিবাহ করা জায়েয কিনা এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে জায়েয। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে সাবেঈ নারীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। মূলত তাদের মত পার্থক্য সাবেঈ এর পরিচয়ে অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে সাবেঈ হল ঐ ব্যক্তি যে কোন নবীকে নবীরূপে গ্রহণ করে এবং কোন কিতাবের বিশ্বাসী। সাহাবাইন (রহ.)এর মতে সাবেঈ হল তারকারাজীর পূজারী কোন কিতাবের বিশ্বাসী নয়। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাবেঈ এর যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে সাবেঈ আহলে কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে হিসাবে তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) সাবেঈ এর যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে সাবেঈ পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত, তাই যেভাবে পৌত্তলিকদেরকে বিবাহ করা হারাম তদ্রূপ সাবেঈদেরকে বিবাহ করা হারাম।

قوله : وَ الْمُحْرِمَةِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে মুহরিমা মহিলাকে ইহরামহীন পুরুষ বা মুহরিম পুরুষ বিবাহ করতে পারবে। তদ্রূপ কোন মুহরিম ব্যক্তি কারো অভিভাবক হয়ে বিবাহ দেয়, তবে তার এ বিবাহ দেওয়া জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর মতে ইহরাম অবস্থায় নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং কাউকে বিবাহ দিতে পারবে না।

তিনি দলীল দেন, রাসূল (সা.) এর হাদীস— لَايَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُنْكِحُ 'মুহরিম বিবাহ করতে পারবে না

এবং দিতেও পারবে না।' অন্য বর্ণনায় وَلَا يَخْطُبُ শব্দটিও আছে। উক্ত হাদীসের আলোকে প্রতিয়মান হল, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ দেয়া বা বিবাহ করা উভয়টিই নিষিদ্ধ।

আমাদের দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত :

أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ بِمَيْمُونَةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মায়মুনা (রাযি.)কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।'

ইমাম বুখারী (রহ.) আরো বাড়িয়ে বলেন— وَ بَنَى بِهَا وَ هُوَ حَلَالٌ وَ مَاتَتْ بِسَرِفٍ 'তা সাথে বাসর রাত করেছেন হালাল অবস্থায়। আর তিনি (মায়মূনা) সরফ নামক স্থানে ইনতিকাল করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব : উক্ত হাদীসে نكاح এর আভিধানিক অর্থ সহবাসই উদ্দেশ্য। সুতরাং উক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে সঙ্গম নিষিদ্ধ। তবে আকদে নিকাহ জায়েয। দ্বিতীয় জাবাব হচ্ছে : নিষেধ দ্বারা نهى تنزيهى উদ্দেশ্য। نهى تحريمى নয়। অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা বা করানো উচিত নয়।

আমাদের মাযহাবের সমর্থন কিয়াসের ভিত্তিতে হয়। কেননা, বিবাহ শাদী ইত্যাদি অন্যান্য চুক্তির ন্যায়। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং যেভাবে ইহরাম অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয তদ্রূপ বিবাহের আকদ ও জায়েয। সুতরাং প্রতিয়মান হলো যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া জায়েয। তবে সহবাস জায়েয নয়;' বরং তা হারাম।

قوله : وَالْأَمَةِ وَ لَوْ كِتَابِيَّةً الخ : আমদের মাযহাব মতে দাসীকে বিবাহ করা জায়েয চাই দাসী মুসলিমাহ হউক বা কিতাবিয়া হউক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মাযহাব হলো কিতাবিয়া দাসীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। ইমাম মালিক (রহ.) এ মতের প্রবক্তা। এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ (রহ.) ও এমত পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) গংদের দলীল হল দাসীদের বিবাহের অনুমতি প্রয়োজনের ভিত্তিতে হয়েছে কেননা, মূলত দাসীকে বিবাহ করার কারণে নিজের অংশকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা। কারণ, স্ত্রী দাসীর গর্ভের যত সন্তান হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা দাসীর মালিকের বলে গণ্য হবে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে দাসীকে বিবাহ করা জরুরতের ভিত্তিতে বৈধ হয়েছে। আর যা জরুরতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় তা জরুরত পরিমাণই থাকে। তাই মুসলমান দাসীকে বিবাহ করার দ্বারা জরুরত পূর্ণ হয়ে যায় বিধায় কিতাবী দাসীকে বিবাহ করার প্রয়োজন নেই। তাইতো ইমাম শাফেঈ (রহ.) স্বাধীন নারীকে বিবাহ করার সামর্থ থকা অবস্থায় দাসীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হিসাবে গণ্য করেছেন।

আমাদের দলীল হল : আল্লাহ তাআলার বাণী- فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ উক্ত আয়াতে এবং أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ এ আয়াতসহ নারীকে বিবাহ সংক্রান্ত আয়াতসমূহে সাধারণভাবে নারীর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও স্বাধীন হওয়ার বা দাসী না হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং স্বাধীন নারী বা দাসী নারী যে কোন জনকে বিবাহ করা জায়েয।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর দলীলের জবাব হল : দাসীকে বিবাহ করাতে আপন অংশকে দাসত্বে দিয়ে দেওয়া একথা আমরা গ্রহণ করি না; বরং স্বাধীন অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা। এদিকে শরীয়ত তাকে এ অনুমতি দিয়েছে যে যদি সে চায় তবে মূল অংশকেই লাভ করবে না। কেননা, স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে সে 'আজল' করতে পারবে। আর এক্ষেত্রে মূল অংশই সে হাসিল করল না।

সুতরাং দেহ, অংশের গুণ বিশেষ লাভ না করার ও অধিকার রয়েছে।

قوله : وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে প্রথম থেকে যদি স্বাধীন নারী বিবাহে বিদ্যমান থাকে তবে স্বামীর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ বাদীকে করা না জায়েয। যদিও স্বাধীন স্ত্রী ইদ্দত পালনরত থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে যদিও তা স্বাধীন ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। তথাপি গোলামের জন্য তা জায়েয। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে তা জায়েয। তিনি দলীল দেন যে, স্বাধীন স্ত্রীর বর্তমানে বাদী বিবাহ না জায়েয স্বাধীন মহিলার হক হিসাবে। এখন যদি স্বাধীন স্ত্রী তার নিজের হক ছেড়ে দিয়ে অনুমতি দিয়ে দেয়। তবে বাদীকে বিবাহ করা জায়েয। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল, নিষিদ্ধতা ছিল স্বাধীন স্বামীর ক্ষেত্রে। কেননা, সে তার অংশকে দাসত্বের জিঞ্জিরে নিক্ষেপ করতেছে। এবার যখন সে নিজেই গোলাম তখন তার সাথে নিষিদ্ধতার বিদ্যমান থাকবে না। কেননা, গোলাম সে নিজেই দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দলীল হল : রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- لَاتُنْكَحُ الْاَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ 'স্বাধীন স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দাসী বিবাহ করা যাবে না। উক্ত হাদীস ব্যাপক, তাতে স্বাধীন পরাধীন অথবা স্ত্রীর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কোনটারই শর্ত যুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া নিয়ামতকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব রয়েছে। এ জন্যই স্বাধীন স্ত্রীর উপস্থিতিতে দাসীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। তবে এর বিপরীত তথা বাদী বিবাহে থাকা কালে স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— وَ تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْاَمَةِ 'আর দাসী (স্ত্রীর) বিদ্যমান থাকা অবস্থায় স্বাধীন মহিলাকে বিবাহ করা যাবে।'

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন মহিলাকে সর্বাবস্থায় বিবাহ করা জায়েয।

কেননা, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিয়ামতকে অর্ধেককারী নয়।

قوله : وَ اَربَعُ مِنَ الْحَرَائِرِ الخ : আমাদের মাযহাব মতে একজন স্বাধীন পুরুষ এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। চারজন শুধু স্বাধীন হউক বা শুধু দাসী হউক। কিংবা কিছু স্বাধীন আর কিছু দাসী হউক এতে কোন সমস্যা নেই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এ পর্যায়ে মতানৈক্য যে যদি সে দাসী বিবাহ করে তবে একজনকেই বিবাহ করতে পারবে। কেননা, তার মতে দাসীকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বিশেষ কারণ বশত। কাজেই একজনকেই বিবাহ করাতে তা পূর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়জনকে বিবাহ করার প্রয়োজন নেই। আর রাফেজীরা নয়জন ও খারেজীরা আঠারজন বিবাহের অনুমতি দেন। রাফেজীদের দলীল হল- مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ এর মধ্যকার واو কে جمع এর অর্থে বলে তিন সংখ্যাকে একত্র করে বলেন ২ + ৩ + ৪ = ৯ জনকে বিবাহ করা জায়েয।

আর খারেজীরা বলে উক্ত আয়াতের সংখ্যায় তাকরারের অর্থ রয়েছে। সুতরাং مثنى - ২+২ = ৪, ثلث - ৩+৩ = ৬, ربع - ৪+৪ = ৮। ৪+৬+৮ = ১৮ জন।

রাফেজী এবং খারেজীদের মতামত ও যুক্তি আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং এ দুটি মতামত অহেতুক। আমাদের দলীল হল, আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ :

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبَاعَ

এ আয়াত সংখ্যা বর্ণনায় নস। আর সুস্পষ্ট সংখ্যার বর্ণনাতে তার অতিরিক্ত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এক সাথে চারজনের অতিরিক্ত বিবাহ করা জায়েয নয়। আর এ চারজনের মধ্যে স্বাধীন দাসী সব সমান।

কেননা, বাদীকে বিবাহ করা হালাল প্রমাণিত আয়াতসমূহে সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এক, দুই ইত্যাদির কোন শর্ত করা হয়নি।

তাছাড়া আলোচিত আয়াতে النساء শব্দটি مطلق তার ভেতরে স্বাধীন বাদী সবাই সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত। অতএব, একথা বলা যাবে না যে, যদি বাদী বিবাহ করে তবে একজনের ভেতর সীমিত থাকবে। বরং বাদী বিবাহ করলেও যদি সে চায় তবে চারজনই করতে পারবে।

قوله : وثِنْتَيْنِ لِلْعَبْدِ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে গোলাম দুজন নারীকে বিবাহ করা জায়েয।

দুয়ের অধিক বিবাহ করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় চারজনকেই বিবাহ করতে পারবে। কেননা, বিবাহ হল মনুষত্বের বৈশিষ্ট্য। আর মনুষত্বের মধ্যে দাসত্বের কোন প্রভাব নেই। মানুষের শরীর দেহ হিসাবে সব সমান।

আমাদের দলীল হল : দাসত্ব নিঁয়মাতকে অর্ধেকে নামিয়ে দেয় এ ব্যাপারে সবাই একমত। এদিকে নারীকে বিবাহ করা হালাল হওয়াটাও হল আল্লাহ প্রদত্ব নিয়ামত। তাই তাও অর্ধেক হয়ে যাবে। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তি একসাথে চারজন বিবাহ করা হালাল তাই গোলামের জন্য তার অর্ধেক হালাল হবে। তাছাড়া আমাদের মাযহাবের সমর্থন হযরত উমর (রাযি.) এর হাদীসেও পাওয়া যায়। তা হল—

قَالَ لَايَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ

‘হযরত আতা (রাযি.) এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন যে, গোলাম দুয়ের অধিক নারী রাখতে পারবে না।’

قوله : وَ حُبْلٰى مِنْ زِنَا الخ : ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করা তরফাইন (রহ.)-এর মতে জায়েয। তবে গর্ভপাত হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে বিবাহই জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে জায়েয ও নাজায়েয উভয়ই বর্ণিত আছে। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান প্রমাণিত নসবের হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে ব্যভিচার করে এবং উক্ত নারী গর্ভবতী হয়ে যায় অতঃপর উক্ত পুরুষ উক্ত গর্ভবতীকে বিবাহ করতে চায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার সাথে বিবাহ জায়েয এবং সহবাসও জায়েয।

তরফাইন (রহ.) এর মতের দলীল হল : ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী নারী ঐ সকল নারীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে নসের ভিত্তিতে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণিত। অর্থাৎ, اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত। কেননা, মুহাররামাতের কথা আলোচনায় ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতীর কথা উল্লেখ নেই। তবে সঙ্গম এজন্য হারাম যে, যাতে নিজের পানি দ্বারা অন্যের ফসলে সিঞ্চিত করা আবশ্যক না হয়। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

اِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَسْقِىْ مَاءَهٗ زَرْعَ غَيْرِهٖ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের পানি দ্বারা অন্যের ফসল সিঞ্চিত না করে। অর্থাৎ, গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম না করে।

قوله : وَالْمَوْطُوْءَةِ بِمِلْكٍ الخ : মালিকানা সূত্রে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে বা অন্য ব্যক্তি ব্যভিচার করেছে তবে তাকেও বিবাহ করা জায়েয। (والتفصيل فى المطولات)-।

قوله : وَالْمَضْمُوْمَةِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি এক আকদে দু মহিলাকে বিবাহ করে, কিন্তু একজন তার জন্য হালাল হলেও অপরজন তার মুহাররামিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এহেন পরিস্থিতিতে মহরিমার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং পূর্ণ মহর দ্বিতীয় জনের জন্য নির্ধারিত হবে।

وَ بَطَلَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّتِ وَ لَهٗ وَطْئُ اِمْرَاَةٍ اِدَّعَتْ عَلَيْهِ اَنَّهٗ تَزَوَّجَهَا وَ قَضٰى بِنِكَاحِهَا بِبَيِّنَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا -

অনুবাদ : সাময়িক ও মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ। আর এমন মহিলার সাথে সহবাস জায়েয, যে দাবী করে যে, অমুক তাহাকে বিবাহ করেছে। আর কাজী সাক্ষীর ভিত্তিতে তার বিবাহের রায় দেন। অথচ (বাস্তবে) তাহাকে বিবাহ করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : وَ بَطَلَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকারের পরিভাষায় متعة হল اَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ - এত পরিমাণ মালের বিনিময়ে এতদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে উপভোগ করব। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদিও মুতা হালাল ছিল কিন্তু খায়বারের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গৃহপালিত গাধার গোশত ও নারীদের সাথে মুতাকে হারাম করে দিয়েছেন। তারপর মক্কা বিজয়ের বৎসর আওতাসের দিন তিন দিনের জন্য তা হালাল করে পরে মুতাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন।

বিঃ দ্রঃ হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.)সহ অনেকেই ইমাম মালিক (রহ.) এর মাযহাব বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, মুতা ইমাম মালিক (রহ.)এর মাযহাব মতে জায়েয। পক্ষান্তরে উক্ত কথাটি যথার্থ নয়। কেননা, মালেকীগণের কোন কিতাবাদীতে মুতা' জায়েয বলে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) স্বীয় মুআত্তায় হযরত আলী (রাযি.) এর হাদীস বর্ণনা করেন—

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ عَنْ لُحُوْمِ حُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

'নবী করীম (সা.) খায়বার দিবসে মুতা বিবাহ ও গৃহ পালিত গাধার গোশত থেকে নিষেধ করেছেন।'

ইমাম মালিক (রহ.) এর অভ্যাস হল তিনি তার মুআত্তাতে সে হাদীসই আনেন যা তার মাযহাব। তাই উক্ত হাদীসখানা মুআত্তাতে আসাটা প্রমাণ করে যে, ইমাম মালিক (রহ.) মুতা হারাম হওয়ার প্রবক্তা।

قوله : وَالْمُوَقَّتِ الخ : সাময়িক বিবাহ হলো, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা। সাময়িক বিবাহ ও মুতা বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হল, সাময়িক বিবাহের ক্ষেত্রে تزوج শব্দ উল্লেখ থাকে তবে মুতার মধ্যে উল্লেখ থাকে না। সাময়িক বিবাহের দুজন সাক্ষী থাকে। পক্ষান্তরে মুতা বিবাহের সাক্ষী থাকে না। ফুকাহায়ে কেরামগণের মতে নিকাহে মুওয়াক্কাত ফাসিদ। তবে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে সাময়িক বিবাহ জায়েয, তবে নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত ফাসিদ। কেননা, বিবাহ শর্তে ফাসিদ দ্বারা ফাসিদ হয় না। এর জবাবে আমরা বলব যে, সাময়িক বিবাহের নির্ধারিত সময়ে কোন শর্ত নয়, বরং ইজাব-কবূল হয়েছে এ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আর এমন ইজাব কবুল সহীহ নয়।

قوله : وَلَهٗ وَطْئُ اِمْرَاَةٍ الخ : যদি কোন মহিলা কোন পুরুষ সম্পর্কে মিথ্যা দাবী করে যে, সে তার স্বামী, আর মহিলা এ ব্যাপারে দুজন মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে কাজী সাহেবের নারী পক্ষে ফায়সালা দিলে তা বাহ্যিকভাবে ও আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতও ইহা। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে বাহ্যিকভাবে কার্যকর হবে আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দ্বিতীয় মতামত তাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এমন মতামত পোষণ করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) গংদের দলীল হলো : এক্ষেত্রে কাজী সাক্ষ্য গ্রহণে ভুল করেছেন। কেননা, সাক্ষ্যদ্বয় মিথ্যা। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা আভ্যন্তরীণ কার্যকারীতা হয় না। সুতরাং কাজীর ফায়সালা যদিও বাহ্যিকভাবে

কার্যকর তথাপি আভ্যন্তরীণভাবে তা কার্যকর হবে না। যেমন, সাক্ষ্যের পর উভয় সাক্ষ্য কাফের বা গোলাম প্রমাণিত হলে বাহ্যিকভাবে কার্যকর হলেও সর্বসম্মতিক্রমে তা আভ্যন্তরীণভাবে কার্যকর হয় না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : কাজী প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন। তবে ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে সাক্ষদ্বয় সত্যবাদী প্রমাণিত হয়। যদি সাক্ষ্যদ্বয় সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে কাজীর জন্য বিচার করে নেয়া জরুরী। তাইতো কাজী যদি মনে করেন যে, আমার উপর ফয়সালা করা জরুরী নয়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি গড়িমশি করে ফয়সালা দিতে বিলম্ব করে তবে সে ফাসিক হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (রহ.) এর কিয়াসের জবাব হল, সাক্ষ্যদ্বয় কাফের বা গোলাম এ বিষয় অবগত হওয়া সহজ। কেননা, তাদেরকে তাদের বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চেনা যায়। তাই সাক্ষ্যদ্বয় পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে। কেননা, ফায়সালার ভিত্তি হল সাক্ষ্য। আর দাবী হিসাবে বিবাহকে ফায়সালার উপর অগ্রবর্তী করা হবে। যেন কাজী তাদের মাঝে প্রথমে তাদেরকে বিবাহ করালেন। এবং পরে বিবাহের ফয়সালা করে দিলেন। তবে কারো কারো নিকট এ ফয়সালা সাক্ষ্যদ্বয় উপস্থিত থাকা শর্ত আর কারো কারো নিকট সাক্ষ্যদ্বয় উপস্থিত থাকা শর্ত নয়।

কেননা, এ আকদ তাৎক্ষণিক দাবী হিসাবে প্রমাণিত। আর যে বস্তু দাবী হিসাবে প্রমাণিত তার ক্ষেত্রে শর্তের দিকে লক্ষ্য করা হয় না। তার সমর্থন হযরত আলী (রাযি.) এর অভিমত। তার সামনে এ ধরনের ঘটনা উপস্থিত হলে তিনি বিবাহের ফায়সালা করে দিয়েছিলেন। ঐ মহিলা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, সে তো আমাকে বিবাহ করেনি। হযরত আলী (রাযি.) বললেন, شاهداك زوجاك তোমার সাক্ষ্যদ্বয় তোমার বিবাহ দিয়ে দিয়েছে।

بَابُ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَكْفَاءِ

পরিচ্ছেদ : ওলী ও কুফু

نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ وَ لَا تُجْبَرُ بِكْرٌ بَالِغَةٌ عَلَى النِّكَاحِ فَاِنْ اِسْتَاْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ اَوْ ضَحِكَتْ اَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنٌ وَ اِنْ اِسْتَاْذَنَهَا غَيْرُ الْوَلِيِّ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ كَالثَّيِّبِ وَ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ اَوْ حَيْضَةٍ اَوْ جَرَاحَةٍ اَوْ تَعْنِيسٍ اَوْ زِنَا فَهِىَ بِكْرٌ وَالْقَوْلُ لَهَا اِنْ اِخْتَلَفَا فِى السُّكُوْتِ -

---

অনুবাদ : স্বাধীনা, জ্ঞান সম্পন্না, প্রাপ্ত বয়স্কার বিবাহ ওলীর অনুমতি ছাড়া সংঘটিত হবে। সাবালিকা কুমারী নারীকে বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। ওলী যদি তার (সাবালিকা কুমারীর) কাছে বিবাহের অনুমতি চান আর সে নীরব থাকে অথবা হেসে দেয়, কিংবা ওলী তাকে বিবাহ দিয়ে দেন আর এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছে এবং সে নীরব থাকে তবে একে সম্মতি ধরা হবে। আর যদি ওলী ভিন্ন অন্য কেহ অনুমতি চান তবে পূর্ব বিবাহিতা নারীর ন্যায় কথা বলা আবশ্যক, যার লাফালাফি, হায়েজ, জখম, কিংবা বিবাহের বয়স পার হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা যিনার কারণে কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও সে কুমারী বলেই গণ্য হবে। চুপ থাকার ব্যাপারে উভয়ে মতানৈক্য হলে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

শব্দার্থ : تُجْبِرُ - ইহা افعال থেকে اجبار অর্থ বাধ্য করা। ثَيِّبٌ (ج) ثَيِّبَاتٌ - বিবাহিতা নারী, অকুমারী। وَثْبَةٌ - লাফালাফি। تعنيس - ইহা تفعيل থেকে, অর্থ- দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। بِكْرٌ (المذكر و المؤنث) (ج) ابكار - কুমারী, পিতা-মাতার, প্রথম সন্তান, কোন কিছুর প্রথম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

اولياء। ইহা ولى এর বহুবচন। ইহা صفت এর সীগাহ, যা الولاية। মাসদগার থেকে নির্গত। তার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, মালিক, শক্তিমান, অন্তরঙ্গ বন্ধু। অভিভাবক ইত্যাদি। ولى এর পরিভাষিক অর্থ : عمدة الرعاية - গ্রন্থকার (রহ.) বলেন—

اَلْوَلِىُّ هُوَ الَّذِىْ يَنْفُذُ قَوْلُهٗ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ او ابى

ওলী ঐ ব্যক্তি যার কথা অন্যের উপর কার্যকর হয়। চাই সে এতে সম্মত হউক বা না হউক।

دُرُّ الْمُخْتَارِ - প্রণেতা বলেন— هُوَ الْوَارِثُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ 'প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী উত্তরসূরী'। মোটকথা 'ওলী' বলা হয় কোন ব্যক্তির এমন আপনজন যার সিদ্ধান্ত উক্ত ব্যক্তির উপর তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কার্যকর হয়।

قوله : نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ الخ : অভিভাবকের অভিভাবকত্ব বা অনুমতি ছাড়া শুধু عبارة النساء তথা মহিলার

ভাষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে কি না এ ব্যাপারে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) আমাদের মাযহাব বর্ণনা করে বলেন যে, স্বাধীন, বিবেকবান, প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার ভাষ্য দ্বারা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে এক বর্ণনা রয়েছে ওলী ব্যতীত বিবাহ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে স্থগিত অবস্থায় বিবাহ সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, ওলী অনুমতি দিলে বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা থাকবে না। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মহিলাদের ভাষ্য দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বিবাহ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই যেহেতু মহিলাদেরকে হাদীসে ناقصات العقل তথা নারীরা কম জ্ঞানের অধিকারী আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সে হিসাবে বিবাহের ভার নারীদের উপর ন্যাস্ত করলে তার উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। বিধায় অভিভাবকত্বের প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) দলীল দিতে গিয়ে বলেন, ঠিক আছে, মহিলারা ناقصات العقل , তবে ওলীর অনুমতিতে এ ব্যাঘাত উঠে যায়। কেননা, ওলী ভাল মনে করলে বিবাহের অনুমতি দিবে। আর মন্দ মনে করলে বিচ্ছেদ করে দেবে।

আমাদের দলীল হল, এ মহিলা তার অধিকারের মধ্যে ক্ষমতা ব্যয় করেছে। কেননা, যৌনাঙ্গের অধিকারী সে নিজেই। অপর দিকে সে অধিকার প্রয়োগের যোগ্যও। কেননা, সে সাবালিকা, বিবেকবান এবং ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্যকারী। তাই তো তার অর্থে সে নিজেই সম্পূর্ণ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং বালেগা, আকেলা ও আজাদ থাকা অবস্থায় ওলীর অভিভাবকত্ব ছাড়াই তার কথা দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, বিবাহে অভিভাবকত্ব জড়ানোর কারণ হল মহিলা লজ্জাশীল। তারা পুরুষের মজলিসে বের হওয়াতে লোকেরা তাদেরকে নির্লজ্জতা আরোপ করবে। মহিলাদেরকে লজ্জাশীল রাখতে বিবাহে অভিভাবকের অভিভাবকত্বের প্রয়োজন রয়েছে।

قوله : وَلَا تُجْبَرُ بِكْرٌ بَالِغَةٌ الخ : আমাদের মাযহাব মতে প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী নারীকে তার অভিভাবক বিবাহে বাধ্য করতে পারবে না। অর্থাৎ, তার সন্তুষ্টি ছাড়া বিবাহ দিলে পরে তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তবে তা প্রত্যাখ্যাত হিসাবে বিবেচ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী নারীকে বিবাহে বাধ্য করা যাবে। তিনি এ প্রকার নারীকে নাবালিগা কুমারী নারীর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, তার মতে কুমারী নারীকে বাধ্য করা যাবে। চাই সে সাবালিকা হোক বা নাবালিগা হউক। কেননা, উভয়ের মাঝে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বিবাহের বিষয়ে অজ্ঞ। কেননা, নারী পুরুষের নিকট না যাওয়া পর্যন্ত সে বিবাহের উপকার-অপকার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

আমাদের দলীল হল : সাবালিকা নারী স্বাধীনা তার স্বাধীনতার উপর কারো কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অভিভাবকত্ব নেই। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়াতে তার عقل তথা বিবেক পূর্ণ হয়ে গেছে। আর বিবেকপূর্ণ হওয়ার দলীল হল তার উপর আল্লাহর বিধি-নিষেধ আরোপ হওয়া। তার সম্পদে তারই ক্ষমতা থাকে। পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তেমনি সাবালিকা নারী তাব সত্ত্বায় পূর্ণ অধিকারী। তাই প্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী নারীকে বিবাহে বাধ্য করা যাবে না।

قوله : فَإِنْ اِسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ الخ : ওলী যদি বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী নারীর কাছে অনুমতি চায় আর সে চুপ থাকে অথবা হেসে পড়ে তবে তার হাসি বা চুপ থাকাটা সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে। দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী—

اَلْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ

'কুমারী নারীর কাছে তার ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে, যদি সে চুপ থাকে তবে সে সম্মত আছে বলে ধরা হবে।'

দ্বিতীয়ত : নীরবতা ও হাসির ক্ষেত্রে সম্মতির দিকটাই প্রবল। কেননা, বিবাহের মতামত মুখ দ্বারা ব্যক্ত করা থেকে এড়িয়ে থাকতে চায়। আর যদি সে এ ব্যাপারে নারাজ হতো তবে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে দিত। সুতরাং তার অস্বীকার না করাটা সম্মতির লক্ষণ।

উল্লেখ্য যে, কুমারী নারীর নিঃশব্দে কাঁদা সম্মতির লক্ষণ। তবে উচ্চ আওয়াজে কাঁদা সম্মতির লক্ষণ নয়। বরং তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের দলীল। অনুরূপ কেহ কেহ বলেন, বিদ্রূপ বা ঠাট্টা প্রকাশের হাসি হাসলে তাও সম্মতির লক্ষণ হবে না।

قوله : اَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الخ : ওলী তার সাবালিকা কুমারীকে বিবাহ দিয়ে দিল। তারপর তার কাছে বিবাহের সংবাদ ওলী বা তার দূত পৌছাল, কুমারী তা শ্রবণ করে চুপ থাকল বা হাসি দিল বা অনুচ্চ আওয়াজে কাঁদল। তবে তা সম্মতির লক্ষণ হবে। পক্ষান্তরে যদি ওলী বা তার দূত ভিন্ন অন্য মারফতে তার কাছে সংবাদ পৌছে তবে মুখ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করা জরুরী। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, উক্ত ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হওয়া বা একাধিক হওয়া জরুরী। অর্থাৎ, কমপক্ষে দুজন হওয়া জরুরী। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এ ক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই। চাই সংবাদদাতা একজন হউক বা ন্যায়পরায়ণ না হউক। হুকুম আবশ্যক করতে তার প্রয়োজন নেই।

قوله : وَاِنْ اِسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْوَلِيِّ الخ : সাবালিকা কুমারী থেকে অনুমতি চাওয়া ব্যক্তিটি যদি ওলী বা ওলীর দূত না হয়, বরং দূরবর্তী ওলী হয় বা অন্য কেহ হয় তবে চুপ থাকা বা হাসি সম্মতির লক্ষণ হবে না। এক্ষেত্রে মুখ দ্বারা সম্মতি সূচক কথা বলতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে চুপ থাকা দ্বারা তার কথাতে কম গুরুত্বের কারণে হতে পারে। তাই মুখে উচ্চারণ করা জরুরী।

قوله : وَمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا الخ : যদি কোন কুমারীর লাফালাফি বা হায়েজ যাওয়াতে কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে যায় তবে সেও কুমারীর হুকুমভুক্ত থাকবে। তারও সম্মতি চুপ থাকা বা হাসাতে হয়ে যাবে। কেননা, এ নারী মূলত কুমারী রয়ে গেছে। কেননা, بكرة এর অর্থ প্রথম। এ নারীর কাছে যা পৌছেছে তথা বিবাহের অনুমতি তা এই প্রথম পৌছেছে বিধায় সেও بكرة তথা কুমারী। দ্বিতীয়ত এ নারী পুরুষের সংস্পর্শে না যাওয়াতে পূর্ণমাত্রায় লজ্জা বিদ্যমান। যার দরুন মুখ দ্বারা অনুমতি দিতে নারাজ। অনুরূপ ব্যভিচারিণী মহিলাও ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর মতানুযায়ী কুমারী নারীর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও সাহাবাইন (রহ.)-এর মতে এমন নারী পূর্ব বিবাহিতা নারীর মত। অর্থাৎ, এমন নারী সেও মুখ দ্বারা অনুমতি দেওয়া জরুরী। কেননা, ثيبة এর অর্থ প্রত্যাবর্তন। তাই যে নারীর সাথে একবার যা করা হবে তা দ্বিতীয়বার করা হলে সে - ثيبة। তাই তার উপরও পূর্ব বিবাহিতা নারীর হুকুমই প্রত্যাবর্তিত হবে। ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর দলীলের সারমর্ম হল : উক্ত নারী যে ব্যভিচারিণী লোকেরা তা অনেক ক্ষেত্রে জানেনা। এখন যদি সে কথা বলে তবে লোকেরা তাকে দোষারোপ করবে এবং সেও কথা বলতে লজ্জাবোধ করবে। তাই তাকেও তার স্বার্থ রক্ষার্থে কুমারী মহিলার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে হ্যাঁ যদি লোক মুখে সে বভিচারিণী বলে প্রকাশ হয়ে যায় অথবা নিকাহে ফাসিদ হওয়ার পর সহবাসকৃতা হয়ে যায় তবে সে আর কুমারী নারীর অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং সে ثيبة এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قوله : وَالْقَوْلُ لَهَا اِنِ اخْتَلَفَا الخ : কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলে যে, তোমার কাছে বিবাহের সংবাদ পৌছেছিল তখন তুমি চুপ ছিলে, তাই আমার সাথে তোমার বিবাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। অপরদিকে মহিলা বলল, সংবাদ আসার সাথে সাথেই আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি বিধায় বিবাহ হয়নি। আর উভয়ের নিকটই কোন সাক্ষী নেই। তবে আমাদের মাযহাব মতে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, পুরুষের

কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে বাদি হল মহিলা আর বিবাদি হল পুরুষ। বাদির নিকট সাক্ষ্য উপস্থিত না থাকা অবস্থায় বিবাদির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই পুরুষের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কেহ কারো নিকট থেকে কিছু ক্রয় করল। অতঃপর বিক্রেতার জন্য তিনদিনের শর্তারোপ করা হয়েছে তিন দিনের ভিতরে বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করা হবে অথবা রাখা হবে। তিন দিন চলে যাওয়ার পর ক্রেতা বলল, তুমি খেয়ারের সময়সীমার মধ্যে নীরবতা অবলম্বন করেছিলে। আর বিক্রেতা বলল, আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আলোচিত মাসআলায় বিবাদী, যে নীরব থাকার কথা বলছে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, নীরবতা হলো প্রকৃত অবস্থা। আর প্রত্যাখ্যান হলো আরোপিত অবস্থা। তদ্রূপ কিতাবের মূল মাসআলায় ও বাদির নীরবতা তথা পুরুষের কথা গ্রহণ করা হবে।

আমাদের দলীল হল : এখানে পুরুষের দাবী হলো বিবাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। তাই আমি তার সম্ভোগ-অঙ্গের মালিক। কিন্তু মহিলা তা অস্বীকার করছে। এদিকে প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে বিবাহ না হওয়া এবং সম্ভোগ সত্ত্বেও মালিকানা না হওয়া। তাই পুরুষের কথা প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত হল। যার কথা মূলের অনুযায়ী হয় সে হল বিবাদি। আর যার কথা মূলের বিপরীত হল সে বাদী। অর্থাৎ, পুরুষ বাদী। আর মহিলা বিবাদী। সুতরাং বাদীর যেহেতু সাক্ষী নেই তাই বিবাদির তথা মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কেহ কারো নিকট কিছু আমানত রাখল। এবার যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে সে বলল, আমি আমানত পরিশোধ করে দিয়েছি আর আমানতকারী বলল, আদায় করা হয়নি। এদিকে আমানতের মূল হল আদায় করে দেওয়া তাই যিনি আদায়ের কথা বলেছেন, তিনি হলেন বিবাদী। আর আমানত আদায় না করা তথা যিম্মায় থাকাটা হল মূলের বিপরীত। তাই যিনি অনাদায়ের কথা বলেছেন, তিনি হবেন বাদি। সুতরাং বাদির কাছে সাক্ষী না থাকা অবস্থায় বিবাদির কথা (তথা আদায় করা হয়েছে) গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় বিবাদী তথা মহিলার কথা গ্রহণ করা হবে।

وَلِلْوَلِيِّ اِنْكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْوَلِيُّ الْعَصَبَةُ بِتَرْتِيبِ الْاِرْثِ وَلَهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ بِالْبُلُوغِ فِي غَيْرِ الْاَبِ وَالْجَدِّ بِشَرْطِ الْقَضَاءِ وَيَبْطُلُ بِسُكُوتِهَا إِنْ عَلِمَتْ بِكْرًا لَا بِسُكُوتِهِ مَا لَمْ يَرْضَى وَلَوْ دَلَالَةً وَتَوَارَثَا قَبْلَ الْفَسْخِ -

---

অনুবাদ : ওলী (অভিভাবক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বারিকাকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর ওলী হচ্ছেন আসাবা উত্তরাধিকারীত্বের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। পিতা বা দাদা ভিন্ন (অন্য অভিভাবক বিবাহ দিয়ে থাকেন) তবে কাজী সাহেবের ফয়সালার শর্তে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে উভয়ের বিবাহ ভঙ্গ করার ইচ্ছাধিকার থাকবে। বাকেরা মহিলা বিবাহের কথা জানতে পেরে চুপ থাকলে তার ইচ্ছাধিকার রহিত হয়ে যাবে। তবে (এমতাবস্থায়) বালকের নিকট সংবাদ পৌঁছলে ইচ্ছাধিকার রহিত হবে না। যতক্ষণ না সে রাজি হবে। যদিও তা ইঙ্গিত জ্ঞাপক হউক না কেন। বিবাহ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে উভয়ই অপর জনের ওয়ারিস হবে। (অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার পূর্বে যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে অপরজন তার উত্তরাধিকারী হবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلِلْوَلِيِّ اِنْكَاحُ الصَّغِيرِ الخ : অভিভাবকের অভিভাকত্ব কাদের উপর প্রযোজ্য তা নিয়ে আলোচ্য ইবারতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে অভিভাবকের

অভিভাবকত্ব অপ্রাপ্ত বালক বা বালিকার উপর প্রযোজ্য। হউক অপ্রাপ্তা বালিকা কুমারী (বাকেরা) বা পূর্ব বিবাহিতা (ছাইয়্যেবা)।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে অভিভাবকত্ব কুমারিত্বের উপর চলবে। হউক সে প্রাপ্ত বয়স্কা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা তিনি দলিল দেন যে পূর্ব বিবাহিতা হওয়া অভিজ্ঞতা অর্জনের কারণ বা বসব। কারণ, সংমিশ্রণ পাওয়া গেছে। তাই যেহেতু পূর্ব বিবাহিতা নারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে গেল এবং নিজের ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হয়ে গেল তাই তার উপর অভিভাবকত্ব প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল হল : নাবালক ও নাবালিকার ক্ষেত্রে অভিভাবকত্বের প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে। তবে অভিজ্ঞতা বিচক্ষণতা সৃষ্টির কারণ এর পর্যায়ে আমরা বলি যে, কামবৃত্তি ব্যতীত বিবাহের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা সৃষ্টি হয় না। কামবৃত্তি ছাড়া সঙ্গম করা আর দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে থাকা বরাবর। তা ছাড়া সে প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার দরুন ভাল-মন্দ বুঝার যোগ্যতা এখনো সৃষ্টি হয় নাই। তাই আমরা হানাফিরা বলি যে, অভিভাবককের অভিভাবকত্ব অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বালিকার উপরই প্রযোজ্য হবে।

قوله : وَالْوَلِىُّ اَلْعَصَبَةُ بِتَرْتِيْبِ الْإِرْثِ الخ : পূর্বোক্ত মাসআলায় অভিভাবক কে হতে পারেন এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মাযহাব মতে যিনি আসাবা হওয়ার যোগ্য তিনি অভিভাবক হতে পারেন। তবে একাধিক আসাবা বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে আসাবার ক্রমধারা অনুযায়ী নিকটবর্তী জনই অভিভাবক হতে পারবেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে অভিভাবকত্বের অধিকার একমাত্র পিতার হবে। অন্য কারোর সেই অধিকার নেই।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে পিতা দাদা উভয়ই অভিভাবকত্বের অধিকার রাখেন। তাছাড়া আর কেহ অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না।

ইমাম মালেক (রহ.) এর দলিল হল : স্বাধীনা নারীর উপর অভিভাকত্ব সাব্যস্ত করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, তাদের কামবৃত্তি নেই। আর পিতার অভিভাবকত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে খেলাফে কিয়াস নস দ্বারা। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এর আপন মেয়ে হযরত আয়শা (রাযি.) কে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে নবী করীম (সা.) এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন এবং নবী করীম (সা.) তা বহাল রেখেছেন। তাই খিলাফে কিয়াছ পিতার জন্য অভিভাবকত্ব রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিল হল : অভিভাবকত্বের ভিত্তি হল স্নেহ ও সোহাগ এর উপর। তাই পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যান্যদের উপর অভিভাকত্ব অর্পণ করাতে পূর্ণ স্নেহ ও সোহাগ প্রকাশ হবে না। কারণ, পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যান্যদের মাঝে স্নেহ মমতার স্বল্পতা রয়েছে এবং আত্মীয়তার দূরত্বও রয়েছে। বিধায় অভিভাবকত্বের হকদার শুধু পিতা ও দাদা।

আমাদের দলিল হল : পবিত্র হাদীস النكاح الى العصبات। উক্ত হাদীসে পিতা দাদা এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া আত্মীয়তা সবব বা কারণ হল স্নেহ ও সোহাগের, তবে হা পিতা ও দাদা ভিন্ন অন্যান্যদের মাঝে স্নেহ মমতার স্বল্পতা রয়েছে, এজন্যই তো আমরা বলি যে, যদি পিতা বা দাদা বিবাহ পড়িয়ে দেন তবে তা ولاية اجبار - ولاية التزام, উভয়টির অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আর পিতা ও দাদা ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকদের জন্য যদিও ولاية التزام, বা বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব রয়েছে, কিন্তু অভিযোগের অভিভাবকত্ব নেই।

قوله : لَهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ الخ : এখান থেকে ولاية اجبار ও ولاية التزام এর থেকে বের হওয়া মাসআলার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যদি পিতা বা দাদা নাবালেগ বালিকা বা বালকের বিয়ে দিয়ে দেন তবে তাদের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার নেই। কারণ, পিতা ও দাদার জন্য ولاية التزام বা

বাধ্যতামূলক অভিভাবকত্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি পিতা বা দাদা ভিন্ন অভিভাবক বিয়ে দিয়ে দেয়, তবে তাদের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার অধিকার রয়েছে। তবে তা হতে হবে কাজীর ফয়সালার সাথে। কেননা, পিতা বা দাদা ভিন্ন অন্যান্য অভিভাবকদের জন্য যে অভিভাবকত্ব রয়েছে তাহল ولاية اجبار। তাদের জন্য ولاية التزام নেই। ইহা হল তরফাইন (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে পিতা ও দাদার ন্যায় অন্যান্য অভিভাবকদের জন্য পূর্ণ অভিভাবকত্ব রয়েছে। তাই বালক বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের জন্য আর বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার নেই।

তরফাইন (রহ.) এর দলীল হল : পিতা ও দাদা ভিন্ন অন্যান্য অভিভাবকদের স্নেহ মমতায় যেহেতু ক্রটি বিদ্যমান তাই তাদের দেওয়া বিবাহতে ক্রটি বা বিঘ্নতা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়াতে সে ক্রটি বা বিঘ্নতার ক্ষতি পূরণ হওয়া সম্ভব। মোটকথা, তরফাইন (রহ.) এর মতে পিতা বা দাদা ভিন্ন অন্যান্য অভিভাবকদের জন্য ولاية اجبار তো আছেই কিন্তু ولاية التزام নেই।

قوله : وَ بَطَلَ بِسُكُوتِهَا اِنْ عَلِمَتْ بِكْرًا الخ : তরফাইন (রহ.) এর মতামত অনুযায়ী যাদের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার রয়েছে, তাদের জন্য কতটুকু সময় পর্যন্ত এ ইচ্ছাধিকার থাকবে সে বিষয়ে আলোকপাত করছেন।

গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, যে বালিকার জানা আছে যে, তার বিবাহ অমুকের সাথে হয়েছে। অতঃপর সে বালিকা প্রাপ্ত বয়স্ক হল এবং প্রত্যাখ্যান করল না বরং চুপ থাকল। তার এ চুপ থাকাটা তার পক্ষ থেকে সম্মতির লক্ষণ হিসেবে প্রমাণিত হবে। অথবা প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর ও বিবাহের সংবাদ না জানা অবস্থায় পরে যখন জানতে পারল তখনও যদি চুপ থাকে তবে তাও সম্মতির লক্ষণ হিসাবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে যদি সে বালক হয় তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর কথা বলা বা ইঙ্গিত বাচক কোন নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া যা দ্বারা বুঝার যাবে যে সে এ বিবাহে রাজী। যেমন, সে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আমি রাজী আছি বলল। অথবা স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, কিংবা মহর প্রেরণ করল। ইত্যাদি নিদর্শনসমূহ যা দ্বারা এ বিবাহে সম্মত প্রকাশ হল।

قوله : وَ تَوَارَثَا قَبْلَ الْفَسْخِ الخ : প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যাদের ইচ্ছাধিকার রয়েছে যদি তাদের একজন কাজীর বিচ্ছেদের পূর্বে অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তবে অপরজন তার উত্তরাধিকারী হবে। কেননা, মূল বিবাহের আকদ তো সহীহ ছিল, যা মৃত্যু দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে। আর যে বস্তু তার পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে যায় তা কখনো দূরীভূত হয় না।

وَلَا وِلَايَةَ لِصَغِيرٍ وَعَبْدٍ وَمَجْنُونٍ وَ كَافِرٍ عَلٰى مُسْلِمَةٍ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوِلَايَةُ لِلْاُمِّ ثُمَّ لِلْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ ثُمَّ لِاَبٍ ثُمَّ لِوَلَدِ الْاُمِّ ثُمَّ لِذَوِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ لِلْحَاكِمِ وَلِلْاَبْعَدِ التَّزْوِيجُ بِغَيْبَةِ الْاَقْرَبِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهٖ وَوَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ الْاِبْنُ لَا الْاَبُ

অনুবাদ : নাবালক, দাস, পাগলের জন্য এবং মুসলমান নারীর উপর কাফিরের কোন অভিভাবকত্ব নেই। আর যদি কোন আসাবা না থাকেন তবে তার অভিভাবকত্ব মাতার জন্য। অতঃপর (মা না থাকা অবস্থায়) সহোদর বোনের জন্য অতঃপর (সেও না থাকা অবস্থায়) বৈমাত্রেয় বোনের জন্য অতঃপর (সেও না থাকা অবস্থায়) বৈপিত্রেয় ভাই বোনের জন্য অতঃপর (সেও না থাকা অবস্থায়) আত্মীয়-স্বজনের জন্য অতঃপর (আত্মীয়-স্বজনরা না থাকা অবস্থায়) শাসকের জন্য অভিভাকত্ব। আর নিকটবর্তী অভিভাবকের সফরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দূরত্বে হলে দূরবর্তী অভিভাবকের জন্য বিবাহ দানের অধিকার থাকবে, নিকটবর্তী অভিভাবক ফিরে আসাতে তা ভঙ্গ হবে না। মস্তিস্ক বিকৃত মহিলার অভিভাবক তার ছেলে পিতা নন। (যখন পিতা ও ছেলে বিদ্যমান থাকবেন।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَا وَلَايَةَ لِعَبْدٍ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, দাস ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং বিকৃত মস্তিস্ক ব্যক্তির কোন অভিভাবকত্ব নেই। দলিল হল, অন্যের উপর অভিভাবকত্ব অর্জনের পূর্বে দেখতে হবে যে সে কি তার নিজের উপর কর্তৃত্ব আছে। যদি তার নিজের উপর কর্তৃত্ব থাকে না তবে অন্যের উপর কিরূপ অভিভাবকত্ব করবে। মস্তিস্ক বিকৃত ব্যক্তি অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা অথবা দাস যেহেতু তার নিজের উপর অভিভাবকত্ব নেই। তাই তারা অন্যের উপর অভিভাবকত্ব চালাতে পারবে না। তাছাড়া অভিভাবকত্বের মূল ভিত্তিই হলো স্নেহ মমতার উপর। যদি তাদের উপর বিবাহের বিষয়াদি সোপর্দ করা হয় তবে তাদের মাঝে স্নেহ-মমতা পাওয়া যাবে না। কেননা, অপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পাগল কুফু নির্বাচন করতে অপারগ। আর দাস যেতে মুনিবের খেদমতে নিয়োজি তাই তার জন্য কুফু বের করার সময় ও সুযোগ নেই। তাই তার জন্য অভিভাবকত্ব নেই। আর কাফেরদের ও মুসলমানদের উপর অভিভাবকত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَ لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

আল্লাহ্ কখনো মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন প্রধান্যের পথ রাখেন না। উক্ত আয়াতে سبيلا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরয়ী বিধান। উক্ত দলিলের ভিত্তিতে আমরা বলব যে, কাফিরদের জন্য মুসলমানদের উপর অভিভাবকত্ব নেই। তদ্রূপ কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হবে না এবং মুসলমানও কাফিরের ওয়ারিস হবে না। তবে হ্যা, মহান আল্লাহ্ তাআলার বাণী—

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

কাফের পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। উক্ত আয়াতের আলোকে কাফের তার কাফের সন্তানের বা অন্য এমন কাফেরের অভিভাবক হতে পারবে, যার উপর তার অভিভাবকত্ব অর্জিত এবং তাদের পরস্পর মিরাসও

কার্যকর হবে।

قوله : وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ الخ : যার কোন আসাবা নেই তার অভিভাবক কে হবেন এব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, আসাবা না থাকা অবস্থায় অভিভাবকত্ব করবে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ধারাবাহিকতার আলোকে। যেমন, আসাবার অবর্তমানে মাতা, তারও অবর্তমানে সহোদর বোন, তারও অবর্তমানে বৈমাত্রেয় বোন, তারও অবর্তমানে বৈপিত্রিয় ভাই বোন ইত্যাদি।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে আসাবা অবর্তমানে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য অভিভাবকত্ব সাবিত হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে এব্যাপারে দ্বিধান্বিত মতামত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে তিনি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর সাথেই আছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলিল হল পবিত্র হাদীস শরীফ। اَلنِّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَةِ। উক্ত হাদীসে ব্যবহৃত الف لام টি جنسية যা জাতকেই বুঝায়। অর্থাৎ, جنس نكاح সোপর্দ হবে جنس عصبة এর দিকে। তাছাড়া অন্যান্যদের এতে কোন দখল নেই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হলো : অভিভাবকত্বের ভিত্তি হল স্নেহ-মমতার উপর। আর এ স্নেহ-মমতা এ ব্যক্তির উপরই অর্পণ দ্বারাই সাব্যস্ত হবে যে এমন আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পৃক্ত বা স্নেহ-মমতার উদ্রেককারী। সুতরাং যার মাঝে এমন আত্মীয়তা পাওয়া যাবে সেই অভিভাকত্বের অধিকার অর্জন করবে। সে আসাবা হউক বা অন্য কেউ হউক।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিলের জবাব হচ্ছে যে, উক্ত হাদীসে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসাবাগণ থাকা অবস্থায় অন্য কেহ অভিভাবকত্ব করতে পারবে না। আসাবাদের অবর্তমানে অন্যান্যদেরকে বিলুপ্ত করা হয়নি।

قوله : وَ لِلأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ الخ : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, নিকটতম অভিভাবকের বর্তমানে দূরবর্তী অভিভাবক অভিভাবকত্ব করতে পারবে না। কিন্তু যদি নিকটবর্তী অভিভাবক সফরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দূরত্বে অবস্থান করেন, তবে দূরবর্তী অভিভাবক বিবাহ দিতে পারবে। ইহা আমাদের মাযহাব। তবে ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতে নিকটবর্তী অভিভাবকের অবর্তমানে দূরবর্তী অভিভাবক বিবাহ দিতে পারবে না। তার দলিল হলো, নিকটতম অভিভাবকের অভিভাবকত্ব তো বিদ্যমান রয়েছে। তাই তার অভিভাবকত্ব প্রাধান্য পাবে।

আমাদের দলিল হলো : অভিভাবকত্বের মূল তো হচ্ছে কল্যাণ সংরক্ষণের উপর। সুতরাং যার কথা বা মতামত দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভবপর নয়, তার উপর বিবাহের বিষয়াদি অর্পণ করার দ্বারা কোন কল্যাণ সংরক্ষণ হবে না। তাই আমরা নিকটবর্তী ওলী এর অনুপস্থিতিতে যাতে বালক বালিকার কোন কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে হিসাবে দূরবর্তী অভিভাবকের উপর অভিভাবকত্ব প্রদান করলাম। এখন যদি নিকটবর্তী অভিভাবকের অনুপস্থিতে দূরবর্তী অভিভাবক বিবাহ দিয়ে দেয় তবে নিকটবর্তী অভিভাবকের ফিরে আসার পর এ আকদ বা বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে না।

قوله : وَ وَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ الخ : বিকৃত মস্তিস্ক মহিলার অভিভাবক হিসাবে যদি তার পিতা ও পূর্বের স্বামী মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে থাকে তবে ইমাম শায়খাইন (রহ.) এর মতে অভিভাবকত্ব ছেলের হবে, পিতার হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে অভিভাবকত্ব পিতার হবে। কেননা, পিতার মাঝে ছেলে অপেক্ষা স্নেহ-মমতা অধিকতর।

শায়খাইন (রহ.) এর দলিল হলো : আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে অগ্রগণ্য তাই ছেলেই হবে তার মস্তিস্ক বিকৃত মাতার অভিভাবক। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে বিবাহের মধ্যে অভিভাকত্ব শুধু স্নেহ-মমতাই বিবেচ্য। অধিক হওয়াটা বিবেচ্য নয়।

فَصلٌ في الاَكفَاءِ

অনুচ্ছেদ : পাত্র-পাত্রীর কুফু

مَن نَكَحَتْ غَيرَ كُفءٍ فَرَّقَ الْوَلِيُّ وَ رِضَا الْبَعْضِ كَالْكُلِّ وَقَبْضُ الْمَهرِ وَنَحْوِهٖ رِضًا لَا السُّكُوتُ وَالْكَفَاءَةُ تُعتَبَرُ نَسَبًا فَقُرَيشٌ اَكْفَاءٌ وَالْعَرَبُ اَكفَاءٌ وَحُرِّيَّةً وَاِسْلَامًا وَاَبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ وَدِيَانَةً وَمَالًا وَحِرفَةً وَ لَو نَقَصَتْ عَنْ مَهرِ مِثْلِهَا فَلِلْوَلِيِّ اَنْ يُفَرِّقَ اَوْ يُتِمَّ مَهرَهَا وَ لَو زَوَّجَ طِفْلَهٗ غَيرَ كُفُوءٍ اَو بِغُبْنٍ فَاحِشٍ صَحَّ وَ لَمْ يَجُزْ ذٰلِكَ لِغَيرِ الْاَبِ وَ الْجَدِّ -

অনুবাদ : যে মহিলা অসম পাত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার অভিভাবক বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন। (অসম পাত্রে বিবাহ বন্ধনের পর) কিছু বিষয়ে সন্তুষ্ট পূর্ণ সন্তুষ্টির ন্যায়। মহর ইত্যাদি গ্রহণ সন্তুষ্টির লক্ষণ তবে চুপ থাকা সন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। আর সমতা বিবেচ্য হবে বংশের দিক দিয়ে। সুতরাং কুরাইশরা পরস্পর কুফু। আরবরা ও পরস্পর কুফু। সমতা বিবেচ্য হবে স্বাধীনতার দিক দিয়ে ও ইসলামের দিক দিয়ে। সুতরাং যার পিতা ও দাদা মুসলমান সে যার সকল মুসলমান তার সমান। সমতা বিবেচ্য হবে ধার্মিকতার দিক দিয়ে, সম্পদের দিক দিয়ে, পেশার দিক দিয়ে। যদি মহিলা তার মহর মহরে মিছিল থেকে সল্প করে নেয়, তবে অভিভাবকের অধিকার রয়েছে, হয়ত বিচ্ছিন্ন করে দেব অথবা মহর পূর্ণ করবে। যদি কেহ তার প্রাপ্ত সন্তানকে অসম পাত্রে বা মহরে (غبن فاحش) চরম টক করে নেয়, তবেও তা সহীহ। তবে উহা পিতা বা দাদা ভিন্ন অন্যান্য অভিভাবকের জন্য জায়েয নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فى الْاَكْفَاءِ : اَكْفَاءٌ শব্দটি كُفُوٌّ এর বহুবচন। যার অর্থ اَلْمُمَاثِلُ অনুরূপ। اَلْمُسَاوَاةُ সমতা, সাদৃশ্য। كفو এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন—

اَلْكُفُؤُ اَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُتَسَاوِيًا لِلْمَرْاَةِ وَ فِى نَسَبِهَا اَوْ دِينِهَا وَ غَيرِ ذَالِكَ

অর্থাৎ, বংশীয় মর্যাদায়, দ্বীনদারী প্রভৃতি দিক থেকে স্বামী স্ত্রীর সমকক্ষ হওয়াকে কুফু বলা হয়।

الفقه الاسلامى গ্রন্থকার বলেন—

اَلْكُفُوءُ اَلْمُتَمَاثِلَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ دَفْعًا لِلْعَارِ فِى اَمْرٍ مَخْصُوصٍ

সম্ভ্রম রক্ষার্থে কতগুলো বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর সাথে সমতা বিধানকে কুফু বলা হয়।

মোটকথা, كفو হলো শরীয়াতে নির্ধারিত কিছু দিক থেকে স্বামী তার স্ত্রীর সমকক্ষ হওয়াকে কুফু বলা হয়।

বিবাহে কুফু এর বিবেচনা করার দলিল হলো, রাসূল (সা.) এর হাদীস :

اَلَا لَايُزَوِّجُ النِّسَاءَ اِلَّا الْاَوْلِيَاءُ وَ لَايُزَوَّجْنَ اِلَّا مِنَ الْاَكْفَاءِ

সাবধান! অভিভাবক ছাড়া কেহ যেন নারীদের বিবাহ না দেয়। এবং যেন কুফু (সমান সমান) ছাড়া তাদেরকে বিবাহ না দেয়া হয়। যদিও উক্ত হাদীসের সনদে কথা রয়েছে, তদুপরী হযরত আলী (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীসে তার সমর্থন করে যা ইমাম তিরমিযী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। যার মর্মার্থ হলো তিনটি জিনিসে বিলম্ব করতে নেই। ১। যখন নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায়। ২। যখন জানাজা উপস্থিত হয়ে যায়। ৩। স্বামীহীন নারীর যখন কুফু পাওয়া যায়। তাছাড়া আকলী দলীল হল, বিবাহের মধ্যে কিছু কল্যাণকর বিষয়াদী রয়েছে। আর এগুলি তখনই পূর্ণরূপে অর্জিত হবে যখন বিবাহ-শাদী দুই সমকক্ষের মধ্যে সংগঠিত হবে।

قوله : مَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ كُفُوءٍ الخ : যদি নিজেই অসম পাত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তবে তার ওলীদের বিবাহ বিলুপ্ত করার অধিকার রয়েছে। যেন নিজেদের উপর থেকে অপমানের ক্ষতি দূর হয়ে যায়। তবে এই বিচ্ছিন্ন করার অধিকার স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে এবং সন্তান প্রসবের পর আর অভিভাবকদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার থাকবে না।

قوله : وَالْكَفَائَةُ تُعْتَبَرُ نَسَبًا الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, বংশের মধ্যে কুফু তথা সমতা বিবেচনা করা হবে। কারণ, মানুষ বংশ মর্যাদা দ্বারা পরস্পর গর্ববোধ করে থাকে। সুতরাং কুরাইশ পরস্পর কুফু তথা এক কুরাইশ অপর কুরাইশের জন্য কুফু, আর কুরাইশ ভিন্ন এক আরবী অপর আরবীর কুফু। রাসূল (সা.) এব্যাপারে এরশাদ করেন—

قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ وَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ -

কুরাইশ গোত্র পরস্পর কুফু। যে কোন শাখা অপর শাখার কুফু। আরব পরস্পর কুফু। অনারব পরস্পর কুফু। যে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কুফু।

কুরাইশ তাদেরকে বলা হয়, যারা নযর ইবনে কেনানার বংশধর, যারা নযর ইবনে কেনানার বংশধর নয়, তারা কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরাইশ পরস্পর কুফু তাদের মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচ্য নয়। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন খিলাফত খান্দান এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ, খিলাফত খান্দানের মেয়ে অন্য কুরাইশ খান্দানের যারা খিলাফত খান্দান থেকে নয়, তারা সমান বা কুফু নয়। যদি কুরাইশ খিলাফত বংশের কোন প্রাপ্তা মেয়ে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কুরাইশ বংশের ছেলের সাথে বিবাহ করে নেয়, তবে অভিভাবকের এ বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতের দলিল হলো, খিলাফত বংশের মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং ফিতনা দূর করা। কুরাইশ ভিন্ন অন্যান্য আরবী প্রত্যেক প্রত্যেকের কুফু। তবে আরবের মধ্যে অত্যান্ত হীন বংশ বনু বাহেলা তারা সাধারণ আরবের কুফু হবে না। কেননা, তারা মৃতের হাড় নিয়ে তা জুশ দেয় এবং চর্বি বের করে। যা অত্যন্ত মর্যাদাহীন ও জঘন্য।

قوله : وَ حُرِّيَّةً الخ : স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে কুফু বিবেচ্য। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজে এবং তার পিতা ও দাদা স্বাধীন সে এ ব্যক্তির কুফু হবে যে নিজে স্বাধীন হওয়ার পাশাপাশি তার অনেক পূর্ব পুরুষ স্বাধীন। আর যে ব্যক্তি সে নিজে স্বাধীন আর তার পিতা স্বাধীন নয় সে ঐ ব্যক্তির কুফু হবে না যার পিতা দাদা স্বাধীন। স্বাধীন হওয়ার

দিক দিয়ে কুফু বিবেচ্য এজন্য যে গোলামী কুফু এর ফলাফল তাই যেভাবে কুফুর ও ইসলামে কুফু হয় না, তদ্রূপ স্বাধীন ও দাসত্বে কুফু হয় না। দ্বিতীয়ত দাসত্বের মাঝে লাঞ্ছনা রয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার মধ্যে মর্যাদা রয়েছে। তাই কুফু হওয়ার হুকুমের মধ্যে ইহারও বিবেচনা করা হয়।

قوله : وَ إِسْلَامًا وَ أَبَوَانِ فِيهِمَا الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অনারবের মধ্যে মুসলমান হওয়া হিসাবে কুফুর ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে। সুতরাং যে নিজে মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি পিতা ও দাদা মুসলমান সে এ ব্যক্তির কুফু যার পিতা, দাদা, পর দাদাসহ আরো উপরেও মুসলমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যে শুধু নিজে মুসলমান অথবা তার পিতাও মুসলমান সে ঐ ব্যক্তির কুফু হতে পারবে না যার পিতা ও দাদা মুসলমান। কেননা, বংশের পূর্ণতা পিতা ও দাদা উভয়ের দ্বারা হয়।

قوله : وَ دِيَانَةً الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, দিয়ানতদারীর দিক কুফু এর ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। দিয়ানতদারী দ্বারা তাক্ওয়া, পরহেজগারী বিবেক-বিবেচনা ও উত্তম চরিত্রকে বুঝানো হয়েছে। দ্বীন তথা ইসলাম নয়। কারণ, বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলাম হওয়া শর্ত। মোটকথা, দিয়ানতদারী কুফু হওয়ার দলিল হল দিনদারী নিয়ে সর্বোত্তম গর্ব করা হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন— إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ - দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোককে তার স্বামীর বংশহীনতা সম্পর্কে অধিক লজ্জা দেয়া হয় তার স্বামীর ফাসেকীর কারণে।

قوله : وَمَالًا الخ : সম্পদের ক্ষেত্রেও কুফু বিবেচ্য হবে। সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বামী মহর ও ভরণপোষণের সামর্থবান হওয়া। সুতরাং স্বামী যদি উভয়টির মালিক না হয় অথবা যে কোন একটির মালিক না হয়, তবে সে কুফু হবে না, যদিও মহিলা দরিদ্র হয়। মহর এর সমর্থবান হওয়া এ জন্য যে মহর হলো সম্ভোগ অঙ্গের বিনিময়, আর মহর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মহরে মুআজ্জল তথা নগদ মহর, বাকী মহর উদ্দেশ্য নয়। আর ভরণ-পোষণের সামর্থবান হওয়া এজন্য জরুরী যে, ভরণ-পোষণ দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও স্থায়ী থাকে।

قوله : وَ حِرْفَةً الخ : পেশার দিক থেকেও কুফু বিবেচনা করা হয়। কেননা, 'আভিজাত্য পেশা নিয়ে মানুষ গর্ব করে থাকে। আর নিকৃষ্ট পেশা নিয়ে লজ্জাবোধ করে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দু মতের এক মত হল, পেশা এর দিক থেকে কুফু বিবেচনা করা হবে না। কারণ, পেশা মানুষের জন্য অবধারিত নয়, বরং নিম্নস্তরের পেশা থেকে উচ্চস্তরের পেশায় স্থানান্তরিত হওয়া যায়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কথার উপর প্রশ্ন জাগে যে, দরিদ্রতা ও ফাসেকি ও অবধারিত বিষয় নয়। বরং এ থেকে উত্থান সম্ভব। সুতরাং এ থেকে প্রতিয়মান হলো যে, পেশার দিক থেকেও কুফু বিবেচনা করা হবে।

قوله : وَلَوْ نَقَصَتْ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে প্রাপ্ত বয়স্কা নারী যদি তার নিজ বিবাহে মহরে মিছিলের কম ধার্য করে, তবে অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। হয়ত স্বামী মহরে মিছিল পর্যন্ত পূর্ণ করবে নতুবা স্ত্রীকে ত্যাগ করবে।

পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় অভিভাবকদের আপত্তি করার অধিকার নেই। তাদের দলিল হল, দশ দিরহাম হলো শরীয়তের হক। আর তার চেয়ে অধিক হল স্ত্রীর হক। সুতরাং স্ত্রী যদি তার হক স্বে নিজে ছেড়ে দেয় তবে কারও আপত্তি করার অধিকার নেই। যেমন মহর নির্ধারিত করার পর স্ত্রী যদি সে নিজে মহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে কারও আপত্তি করার অবকাশ থাকে না। তদ্রূপ এখানেও কারও কোন আপত্তি করার অধিকার থাকবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতের দলিল হলো : অভিভাবকগণ তাদের বংশের নারীদের উচ্চ মহর নিয়ে গর্ববোধ করে আর সল্প মহর নিয়ে লজ্জাবোধ করে। তাই কম মহর হওয়া কুফু না হওয়ার সদৃশ্য। আর কুফু না হওয়ার অবস্থায় অভিভাবকদের অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে। তবে মহর নির্ধারণ করার পর তা মাফ করে দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন, এর দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

قوله : وَ لَوْ زَوَّجَ طِفْلَهُ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে পিতা যদি তার অপ্রাপ্ত মেয়েকে মহরে মিছিলের কমে বিবাহ দিয়ে থাকে অথবা তার অপ্রাপ্ত ছেলেকে মহলে মিছিল থেকে অনেক বাড়িয়ে মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করিয়ে থাকে। আর এখন কম-বেশী স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে যায় তবুও তাদের এ বিবাহ সহীহ। তবে পিতা, দাদা ভিন্ন অন্য কেহ এমনটি করলে তা সহীহ নয়।

তবে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যদি এ কম-বেশী অত্যন্ত ঠক হিসাবে হয় তবে বিবাহ জায়েয হবে না।

সাহাবাইন (রহ.) এর মতের দলিল হলো : অভিভাবকত্ব সম্পৃক্ত হল কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য। আর এহেন পরিস্থিতিতে কল্যাণ সংরক্ষণ হল না; বরং মেয়ের মহর নিতান্ত স্বল্প করে দেয়া অথবা ছেলের বিবাহে স্ত্রীর মহর মহরে মিছিল থেকে অনেক বাড়িয়ে দেয়া প্রকৃত পক্ষে মেয়ে বা ছেলের প্রতি কল্যাণ হল না। তাই এ বিবাহ জায়েয হবে না। তবে এ কম-বেশী অত্যন্ত ঠক (غبن فاحش) পর্যায়ের না হয়, তবে এ বিবাহ জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : কল্যাণ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়। তার উপর হুকুম নির্ধারিত করা অনেক দুঃসাধ্য। তাই কল্যাণ সংরক্ষণের দলিল এর উপর হুকুম আবর্তন করা হবে। আর কল্যাণ সংরক্ষণের দলিল হল : নিকটাত্মীয়তা। সুতরাং আমরা বলি, বাপ, দাদার মধ্যে কল্যাণ সংরক্ষণের দলিল বিদ্যমান রয়েছে। তাই তাদের উপর বিবাহ জায়েয হওয়ার হুকুম প্রদান করা হবে। আর বাপ, দাদা ভিন্ন যেহেতু নিকটাত্মীয়তার দূরত্ব বিদ্যমান। তাই তাদের দেয়া বিবাহ জায়েয হয়েছে বলে হুকুম প্রদান করা যাবে না। ইমাম সাহাবাইন (রহ.)-এর দলিলের জবাব হলো, বিবাহের মধ্যে শুধু মহরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে না; বরং এ থেকেও অনেক বড় ও মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং পিতা কিংবা দাদা যদিও মহরে কম বেশী করেছেন তথাপি অন্য বিষয়াবলী এমনও হতে পারে যা মহর অপেক্ষায় অনেক কল্যাণ কর। আর সে দিক বিবেচনা করে আপন মেয়ে বা ছেলের মহরে কম বেশী করেছেন। সুতরাং তাদের পড়িয়ে দেওয়া বিবাহটি কার্যকর হবে।

فَصْلٌ : لِابْنِ الْعَمِّ مَنْ يُزَوِّجُ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُزَوِّجَ مُوَكِّلَتَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ بِلَا اِذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوْفٌ كَنِكَاحِ الْفُضُوْلِى وَ لَايَتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعَقْدِ عَلٰى قَبُوْلِ نَاكِحٍ غَائِبٍ وَ الْمَامُوْرُ بِنِكَاحِ اِمْرَاَةٍ مُخَالِفٌ بِامْرَاَتَيْنِ لَابِاَمَةٍ -

---

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : চাচাতো ভাই তার (নাবালেগা) চাচাতো বোনকে নিজের সাথে বিবাহ দিতে পারে। উকিল তার মুওয়াককিলাহকে (যে তাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করেছে) তাকে নিজের সাথে বিবাহ দিতে পারে। ফালুত লোকের বিবাহ এর ন্যায় দাস-দাসীর বিবাহ মনিবের অনুমতি ছাড়া স্থগিত থাকবে। (যদি মনিব অনুমতি দিয়ে দেয় তবে বিবাহ সংগঠিত হয়ে যাবে। আর যদি অনুমতি না দেয় তবে সংগঠিত হবে না) আর অর্ধেক আকদ (তথা শুধু প্রস্তাব) স্থগিত থাকবে না অনুপস্থিত বিবাহকারী গ্রহণ করার উপর। যে ব্যক্তি একজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট বা উকিল হল সে দুজন মহিলা বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে হুকুমের বিপরিতকারী হবে। তবে দাসীর ক্ষেত্রে নয়। (অর্থাৎ, একজন মহিলা বিবাহ করানোর জন্য উকিল নিযুক্ত হলে সে দুজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দিলে তা কার্যকর হবে না। তবে উক্ত একজন মহিলা যদিও বাদী হয় তবে তার এ বিবাহ করিয়ে দেওয়া সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لِاِبْنِ الْعَمِّ اَنْ يُزَوِّجَ الخ : যদি চাচাতো ভাই তার অপ্রাপ্ত চাচাতো বোনকে তার নিজের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়, আর উক্ত অপ্রাপ্ত বোনের চাচাতো ভাই ভিন্ন অন্য কোন অভিভাবক না থাকে, তবে আমাদের ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এ বিবাহ সহীহ। পক্ষান্তরে ইমাম যুফর (রহ.) এর মতে এ বিবাহ সহীহ নয়। তদ্রূপ যদি কোন মহিলা অন্য একজন পুরুষকে তার বিবাহের উকিল নিযুক্ত করে, অতঃপর উক্ত উকিল উক্ত মহিলাকে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে তার নিজের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়। তথা সে নিজেই বিবাহ করে নেয় তবে আমাদের মতে এ বিবাহ সহীহ।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফর (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উক্ত বিবাহ সহীহ নয়। প্রথমোক্ত মাসআলায় ইমাম যুফর (রহ.) এর এবং দ্বিতীয় মাসআলায় ইমাম যুফর ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিল হল : একজন ব্যক্তি একই সময়ে কোন বস্তুর মালিক বানানো ও মালিকানা অর্জন করতে পারে না। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি সে নিজে মালিক এবং মালিক বানাতে পারে না। তদ্রূপ এ দু অবস্থায়ও এক ব্যক্তি উভয় দিক করতে পারে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রথমোক্ত মাসআলায় সহীহ হওয়ার মতামত দিয়েছেন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে। কেননা, সে ছাড়া অন্য কোন অভিভাবক নেই। তাই প্রথমোক্ত মাসআলায় জায়েয হওয়ার মতামত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মাসআলা যেহেতু উকিলের প্রয়োজনীয়তা নেই। এভাবে যে সে ছাড়াও অন্য কেহ উকিল হতে পারে তাই দ্বিতীয় মাসআলায় যেহেতু কোন প্রয়োজনীয়তা নেই সে জন্য তা সহীহ হবে না।

আমাদের দলিল হল : বিবাহের ক্ষেত্রে উকিল হলো শুধু বার্তাবহক ও বক্তব্য উচ্চারক, জিম্মাদার নয়। আর বিরোধ সৃষ্টি হয় জিম্মাদারির ক্ষেত্রে। তবে বক্তব্য উচ্চারণের বা বার্তা সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই। মালিক বানানোর শব্দ উচ্চরণ করে মহিলায় পক্ষ থেকে। আর মালিক হওয়ার শব্দ উচ্চারণ করে নিজের পক্ষ থেকে। সুতরাং তা সম্পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয়ের বিপরীত। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম প্রত্যাবর্তিত হয় উকিলের দিকে। তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না যে তাকে উঁকিল বানিয়েছে। পক্ষান্তরে বিবাহের যাবতীয় বিষয়াদি স্বামী স্ত্রীর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। উকিলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ে এক ব্যক্তি উভয় দিকের অভিভাবকত্ব করতে পারে না। পক্ষান্তরে বিবাহে একজন ব্যক্তি উভয় দিকের অভিভাবকত্ব করতে পারবে। তাই চাচাতো ভাই অথবা উকিলের উক্তি বিবাহ দিলাম কথাটি ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। দ্বিতীয় কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই।

قوله : وَ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَ الْاَمَةِ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) এখানে দাস-দাসীর বিবাহ তার মনিবের অনুমতির উপর স্থগিত, মাসআলাটিকে ফালতু ব্যক্তির বিবাহের ন্যায় স্থগিত বলেছেন। উভয় মাসআলার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ হল : কোন ব্যক্তি যে অভিভাবকও নয় এবং উকিলও নয়, সে কোন মহিলাকে তার নিজের সাথে বা অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেয়। অর্থাৎ, এ মহিলার অনুমতি ছাড়া অন্যত্র এ বিবাহ দিয়ে দেয় এবং মজলিসে গ্রহণকারী ও বিদ্যমান থেকে গ্রহণ করে নেয়, তবে এ বিবাহ উক্ত মহিলার উপর স্থগিত থাকবে।

তদ্রূপ যদি কোন দাস বা দাসী তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তবে মনিবের অনুমতির উপর উক্ত বিবাহ স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমতি প্রদান করে তবে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে। আর যদি মনিব অনুমতি প্রদান করে না তবে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

قوله : وَلَا يَتَوَقَّفُ شَطْرُ الْعَقْدِ الخ : আলোচ্য ইবারতের মাসআলার সার সংক্ষেপ হল, যদি কোন ব্যক্তি দুজন সাক্ষীর সামনে বলে আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করেছি, কিন্তু এ মজলিসে উক্ত অমুক মহিলার পক্ষ থেকে কেহ কবুল বা গ্রহণ করেনি। অতঃপর উক্ত মহিলার কাছে এ প্রস্তাবের সংবাদ পৌছল তখন উক্ত মহিলা অনুমোদন করল। তবে তা বাতিল। কেননা, এ ধরনের বিবাহ স্থগিত থাকা এবং পরবর্তীতে অনুমোদন করার

জন্য শর্ত হল একই মজলিসে উক্ত মহিলার পক্ষ থেকে জায়েজকারী থাকতে হবে। যে বলবে তোমরা সাক্ষ থাক, আমি উক্ত মহিলাকে এ ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিলাম। অথবা বলবে যে তোমরা সাক্ষ থাক যে, আমি উক্ত মহিলার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করলাম। অতঃপর যদি এ সংবাদ এ মহিলার নিকট পৌঁছে এবং মহিলা তা অনুমোদন করে, তবে এ বিবাহ সহীহ। পক্ষান্তরে যদি জায়েযকারী কেহ বিদ্যমান না থাকে তথা মহিলার পক্ষ থেকে কেহ গ্রহণ না করে তবে উভয় সাক্ষী এক সাথে উভয়ের প্রস্তাবও গ্রহণ না শোনাতে বিবাহ মূল থেকেই সহীহ হয়নি বিধায় তা মহিলার অনুমোদনের উপর স্থগিত ও থাকেনি। والله اعلم

قوله : وَ الْمَامُوْرُ بِنِكَاحِ اِمْرَاَةٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে যে, সে তাকে একজন মহিলা বিবাহ করিয়ে দিবে। অতঃপর উক্ত উকিল একই আকদে দুজন স্ত্রীলোককে বিবাহ দিয়ে দেয়। তবে তার এ বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে পণ্য হবে। কেননা, সে তার মুআক্কিলের বিরোধিতা করেছে। কেননা, যদি কার্যকর করা হয় তবে অনির্ধারিতভাবে একজনকে স্থীর করতে হবে। এক্ষেত্রে অজ্ঞতা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর অজ্ঞতার সাথে কোন কিছুই স্থীর করা জায়েয নেই। অথবা নির্ধারিত একজনের বিবাহ কার্যকর করতে হবে। আর ইহা বাতিল এজন্য যে এতে تَرْجِيْحُ بِلَا مُرَجِّحٍ আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথবা উভয়ের বিবাহকে কার্যকর করতে হবে। এ অবস্থায় সরাসরি নির্দেশদাতা তথা মওয়াক্কিলের বিরোধিতা করতে হয়। বর্ণিত তিন সুরতই অসম্ভব বিধায় এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা অনিবার্য হয়ে গেল। তবে যদি উকিল একজন মহিলাকে বিবাহ দেয় আর এ মহিলা স্বাধীন হয় অথবা পরাধিন হয় তবুও বিবাহ সহীহ। কেননা, আদেশদাতা তার বক্তব্যে امرأة। শব্দ প্রয়োগ করেছে। যা مطلق আর এ ধরনের مطلق শব্দ স্বাধীন বা পরাধিন সকল প্রকার মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং একজন দাসীকেও বিবাহ দিলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং মুয়াক্কিল তা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে না।

بَابُ الْمَهْرِ

পরিচ্ছেদ : মহর

صَحَّ النِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِهِ وَ اَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَاِنْ سَمَّاهَا اَوْ دُوْنَهَا فَلَهَا عَشَرَةٌ بِالْوَطْئِ اَوِ الْمَوْتِ اَوِ الْخِلْوَةِ وَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ يَتَنَصَّفُ -

অনুবাদ : মহরের আলোচনা ছাড়াও বিবাহ শুদ্ধ। মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। যদি (বিবাহের আকদের সময়) দশ দিরহাম বা তার কম নির্ধারণ করে, তাহলে সে (স্ত্রী) সহবাস, মৃত্যু অথবা নির্জন বাসের ভিত্তিতে দশ দিরহামই পাবে। আর সহবাসের পূর্বে তালাকের দ্বারা মহর বিভক্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, পাঁচ দিরহাম পাবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

المهر। শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ : مهر শব্দটি مصدر -। তার বহুবচন হল مُهُوْرٌ - অর্থ বিবাহের আর্থিক দান। নারীর প্রাপ্য, উপঢৌকন।

مهر এর পারিভাষিক অর্থ : ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার (রহ.) বলেন—

هُوَ الْمَالُ الَّذِىْ تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ عَلٰى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا اَوْ بِالدُّخُوْلِ بِهَا حَقِيْقَةً

কোন নারী তার সাথে বিবাহ-বন্ধনের কারণে বা সহবাসের কারণে সে তার স্বামীর উপর যে মালের হকদার হয় তাই মহর।

المعجم الوسيط গ্রন্থকার (রহ.) বলেন— اَلْمَهْرُ مَا يَدْفَعُهُ الزَّوْجُ اِلٰى زَوْجَتِهٖ بِعَقْدِ الزَّوَاجِ - মহর হল বৈবাহিক বন্ধনের কারণে স্বামী স্ত্রীকে যা দান করে।

الفقه على المذاهب الاربع গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী মহর হল—

هُوَ الْمَالُ الَّذِىْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ فِى عَقْدِ النِّكَاحِ فِى مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ اَمَّا بِالتَّسْمِيَّةِ اَوْ بِنَفْسِ الْعَقْدِ -

মহর এমন মালকে বলে যা যৌনাঙ্গ সম্ভোগের বিনিময় স্বরূপ বিবাহের সময় সাক্ষীর উপর আবশ্যক হয়। তা হয়ত নির্ধারণ করার দ্বারা অথবা মূল আকদের ভিত্তিতে।

উল্লেখ্য যে, মহর দুপ্রকার এক معجل (নগদ) দুই مؤجل (বাকী) বিবাহের সাথে সাথেই যে মহর আদায় করা হয় তাকে معجل বলা হয়। আর যা পরবর্তী সময়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা সময় সাপেক্ষে প্রদানের অঙ্গিকার করা হয়, তাকে مؤجل বলা হয়। বিবাহের হুকুম হল মহর ওয়াজিব হওয়া। তাই স্বামী-স্ত্রীর সামর্থ অনুযায়ী মহর নির্ধারণ করা উচিত। সামর্থের বাইরে লোক দেখানো বা গর্ব করে মহর চড়া অংকের ধার্য করা মোটেও উচিত নয়। শরীয়ত বরং বিবাহ স্বল্প মহর হওয়া বরকতময় হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। যেমন রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন—

اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

স্বল্প ব্যয় বিশিষ্ট বিবাহ অধিক বরকতময়।

قوله : صَحَّ النِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِهٖ الخ : বিবাহের আকদের সময় যদিও মহরের আলোচনা না হয় তদুপরি বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, বিবাহ মিলন ও দাম্পত্য-বন্ধনের চুক্তিকে বলা হয়, যা স্বামী ও স্ত্রীর ইজাব ও কবুলে পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহরের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিবাহের আলোচনা হয়েছে। যেখানে মহরের উল্লেখ নেই। এখন যদি আমরা মহর বিবাহের জন্য শর্ত হিসাবে আখ্যা দেই তবে তা কুরআনুল কারীমের উপর زيادتى তথা বাড়াবাড়ি আবশ্যক হয়। যা কখনো জায়েয নয়। সুতরাং বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহর শর্ত নয়, বরং মহর ওয়াজিব হয় স্থানের মর্যাদা প্রকাশের জন্য। তাই বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মহরের উল্লেখ শর্ত নয়। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে কারীমে এরশাদ করেন—

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمْ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً الخ

উক্ত আয়াতে কারীমাতে মহর উল্লেখ ছাড়াও তালাক সহীহ হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর তালাক সহীহ হয় বিবাহ সহীহ হলে। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, মহরের উল্লেখ ছাড়াও বিবাহ সহীহ হয়।

قوله : اَقَلُّهٗ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ الخ : মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন সীমা নেই, বরং সামর্থ অনুযায়ী যত বেশী নির্ধারণ করা হবে তাই মহর হবে। তবে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মাযহাব তথা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মহরের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হল দশ দিরহাম। ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ কিংবা তিন দিরহাম। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয়ে যা ثمن তথা মূল্যরূপে সাব্যস্ত হতে পারে তাই মহর হতে পারে। তিনি দলিল দেন যে, মহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণের মত। ক্রেতা-বিক্রেতা যে পরিমাণে সন্তুষ্ট হয় তাই মূল্যরূপে গণ্য হয়। তদ্রূপ মহর স্বামী-স্ত্রীর হক। তাই স্ত্রী যে পরিমাণে সন্তুষ্ট হবে সে পরিমাণই বিবাহের মহর হিসাবে গণ্য হবে।

আমাদের দলীল কুরআনে কারীমের বাণী : اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ - উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, মহর মাল হবে তবে তার পরিমাণ কত হবে তা যদিও আয়াতে উল্লেখ নেই, তথাপি তার বিশ্লেষণ পবিত্র হাদীসে বিদ্যমান, যা দারু কুতনী, বাইহাকী হযরত আবু ইয়া'লা ইবনে আদী (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন— لَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ 'দশ দিরহামের কমে কোন মহর নেই।' উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম হতে হবে, যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। তাছাড়া আকলী দলীল হল, যৌনাঙ্গের মর্যাদা প্রকাশের জন্যই তো শরীয়তে মহলের প্রথা আরোপিত হয়েছে। সুতরাং তাই নির্ধারণ করতে হবে, যা দ্বারা স্থানের মর্যাদা প্রকাশ পেয়ে থাকে। সুতরাং আমরা দেখি যে, যদি চোর সর্বনিম্ন দশ দিরহাম চুরি করে তবে তার হাত কর্তন করা হয়। তা থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের একটি অঙ্গ তথা হাতের সর্বনিম্ন মূল্য দশ দিরহাম। এর উপরই কিয়াস করে আমরা বলি যে, স্ত্রী লোকের যৌনাঙ্গেরও মূল্য সর্বনিম্ন দশ দিরহাম হওয়া চাই। এদিকে মহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণের মত নয়। কেননা, মহর দ্বারা স্থানের মর্যাদা প্রকাশই উদ্দেশ্য। অথচ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণে মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। তাই মহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণের মত হতে পারে না।

قوله : فَاِنْ سَمَّاهَا اَوْ دُوْنَهَا الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীর মহর দশ দিরহাম বা তার কম নির্ধারণ করে অতঃপর নির্জনবাস, সহবাস কিংবা যে কোন একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তবে স্ত্রী পূর্ণ দশ দিরহামের অধিকারী হবে। ইমাম যুফর (রহ.)-এর মতে যদি দশ দিরহামের কম মহর নির্ধারণ করে তবে স্ত্রী মহরে মিছিলের অধিকারী হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং দলীল পেশ করেন যে, স্বামী এমন বস্তু মহর হিসাবে ধার্য করেছে যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং তা এমন হল যেমন কোন কিছু নির্ধারণই করেনি। আর মহর নির্ধারণ না করার অবস্থায় মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। তাই এ অবস্থায়ও মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হল : দশ দিরহামের কম মহর নির্ধারণ করাতে ফাসাদ এসেছে শরীয়তের দাবির কারণে। আর দশ পূর্ণ করলেই শরীয়তের দাবী পূর্ণ হয়ে যায়। তাই দশ দিরহাম পূর্ণ করা হবে এবং কেহ প্রশ্ন করতে পারে যে, স্ত্রী দশ দিরহামে রাজী হবে কি না। এর জবাবে আমরা বলব যে, যখন দশ দিরহামের কমে স্ত্রী রাজী ছিল তাহলে অবশ্যই দশ দিরহামে রাজি থাকবেই। মোটকথা, মহর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শরীয়তের দাবী এবং স্ত্রীর দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। আর এক্ষেত্রে শরীয়তের দাবী হচ্ছে দশ পূর্ণ হওয়া। আর স্ত্রীর দাবী যদিও আর অতিরিক্তের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু সে দাবী সে দশ দিরহামের কমে রাজী হওয়াতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিধায় দশ দিরহাম পূর্ণ করাতে শরীয়াতের হক এবং স্ত্রীর হক পূর্ণ হয়ে গেল।

قوله : وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ الخ : আমাদের ইমাম ত্রয়ের মতে দশ দিরহাম করার পর অথবা দশ দিরহামের কম নির্ধারণ করার পর সহবাসের কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলে স্ত্রী পাঁচ দিরহামের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফর (রহ.) যে ক্ষেত্রে পূর্বের মাসআলায় মহরে মিছিলের প্রবক্তা ছিলেন সে ক্ষেত্রে এখানে বলেন, স্ত্রী মুতআর অধিকারী হবে। অর্থাৎ, দশ দিরহামের কম মহর নির্ধারণ করলে এবং সহবাসের অথবা নির্জন বাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিলে স্ত্রী, মুতআর হকদার হবে। উল্লেখ্য যে, সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়াতে দুটি কিয়াস পরস্পর বিরোধী হয়। প্রথম কিয়াসের দাবি হলো, স্বামীর উপর পূর্ণ নির্ধারিত মহরই ওয়াজিব হবে। কেননা, সে স্বেচ্ছায় তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছে। তা এমন হল যেমন ক্রেতা বিক্রেতার

কাছে মাল হস্তান্তর করার পূর্বেই পণ্য ধ্বংস করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে যেভাবে ক্রেতার উপর পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হয় তদ্রূপ স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে।

দ্বিতীয় কিয়াস হল, স্বামীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়াতে معقود عليه অর্থাৎ যৌনাঙ্গ স্ত্রীর নিকট অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে। যেমনভাবে ক্রেতা পণ্য বিক্রেতার নিকট অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে তার উপর কোন মূল্য ওয়াজিব হয় না, তদ্রূপ এক্ষেত্রে স্বামীর উপর কোনরূপ মহর পূর্ণ বা অর্ধেক কোনটিই ওয়াজিব হবে না। সুতরাং যখন উভয় কিয়াস পরস্পর বিরোধি হল, তাই আমরা নস এর দিকে প্রত্যাবর্তন করব। কোরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

যদি তাদেরকে তোমরা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের জন্য কোন মহর নির্ধারণ করে থাক, তবে যা নির্ধারণ করেছ তার অর্ধেক (দিতে হবে)।

তাই নস অনুযায়ী স্বামীর এই সুরতে নির্ধারিত অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে।

وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَوْ نَفَاهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ وَطِئَ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَالْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْئِ وَ هِيَ دِرْعٌ وَ خِمَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ وَ مَا فُرِضَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ زِيدَ لَايَتَنَصَّفُ وَ صَحَّ حَطُّهَا وَ الْخَلْوَةُ بِلَا مَرَضِ أَحَدِهِمَا وَ حَيْضٍ وَ نِفَاسٍ وَ إِحْرَامٍ وَ صَوْمِ فَرْضٍ كَالْوَطْئِ وَ لَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا أَوْ خَصِيًّا وَ تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا وَ تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا الْمُفَوَّضَةِ قَبْلَ الْوَطْئِ وَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الشِّغَارِ وَ خِدْمَةِ زَوْجٍ لِلْأَمْهَارِ وَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَ لَهَا خِدْمَتُهُ لَوْ عَبْدًا —

অনুবাদ : যদি মহর নির্ধারণ করে না, অথবা তা না দেয়ার শর্ত করে এমতাবস্থায় যদি সহবাস করে কিংবা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে তবে সে মহরে মিছিল পাবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে সে মুতআ পাবে। তা হল (তিনটি বস্ত্র) কামিজ, ওড়না ও চাদর। আর যা আকদের পর নির্ধারিত করা হয় অথবা পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয় তবে তা বিভক্ত হবে না। স্ত্রী তার মহরের পরিমাণে হ্রাস করা সহীহ্ হবে। যে কোন একজনের অসুস্থতা, হায়েয, নিফাস, এহরাম বা ফরজ রোজা ভিন্ন নির্জনবাস, সহবাসের ন্যায়। যদিও স্বামী কর্তিত পুরুষাঙ্গ হয় অথবা নপুংসক হয় কিংবা খাসীকৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। যে কোন তালাক প্রাপ্তাকে মুতআ প্রদান করা মুস্তাহাব। তবে বিনা মহরে বিবাহে সম্মত নারী সহবাসের পূর্বে তালাক প্রাপ্তা ভিন্ন। নিকাহে শিগারে অথবা মহরের পরিবর্তে স্বাধীন স্বামী স্ত্রীর সেবা করার কিংবা কোরআন শিক্ষা দেয়ার শর্তে বিবাহ হলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী পরাধিন তথা দাস হয় তবে স্ত্রী (মহর হিসাবে) সেবাই প্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ اِنْ لَمْ يُسَمِّهِ الخ : আলোচ্য ইবারতে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) দুটি অবস্থার অবতারণ করতেছেন। প্রথম অবস্থা আকদের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু মহরের ক্ষেত্রে কোন কিছু উল্লেখ করেনি, বরং এ ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছে।

দ্বিতীয় অবস্থা : আকদের মাধ্যমে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু মহর না দেয়ার শর্তারোপ করেছে।

উভয় অবস্থায় আমাদের মাযহাব মতে যদি সহবাস কিংবা নির্জনবাস অথবা স্ত্রী রেখে স্বামীর মৃত্যু হয়ে যায় তবে স্ত্রী মহরে মিছিলের অধিকারী হবে।

আর যদি সহবাসের অথবা নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে আমাদের মাযহাব মতে মুতআ ওয়াজিব হবে। মুতআ হল তিনটি কাপড় درع (কামিজ) خمار (ওড়না) ملحفة (চাদর), যা হযরত আয়েশা (রাযি.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তবে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে এধরনের স্ত্রীকে মুতআ প্রদান করা মুস্তাহাব। ইমাম মালিক (রহ.) দলীল পেশ করেন কোরআন কারীমে মুতআ প্রদানকারীকে মুহসীন বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর মুহসিন নফল আদায়কারীকে বলা হয়। তাই মুতআ প্রদান করা মুস্তাহাব হবে।

আমাদের দলীল হল, আল্লাহর ঘোষণা—

وَ مَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

'তোমরা তাদেরকে মুতআ প্রদান কর সচ্ছল ব্যক্তির উপর তার সচ্ছলতার পরিমাণে এবং বিত্তহীন তার সাধ্যানুযায়ী বিধি সম্মতভাবে সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। ইহা সৎলোকের কর্তব্য।

উক্ত আয়াতে متعوا তা আমর এর সিগাহ যা ওয়াজিব হওয়াকে দাবী করে। উক্ত আয়াতে আর একটি শব্দ حقا তাও ওয়াজিব হওয়াকে চায়। সুতরাং মুতআ ওয়াজিবই হবে। তবে আয়াতের শেষে محسنين বলা হয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐসকল লোক যারা ওয়াজিবকে পালন করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে ইহ্সান তথা আরো বৃদ্ধি করে। এরূপ মর্ম গ্রহণ করলে তা ইমাম মালিক (রহ.) এর দলীল রইল না। তাছাড়া মুতআ হল মহরে মিছিলের প্রতিরূপ। সুতরাং যেহেতু মহরে মিছিল ওয়াজিব তাই মুতআ ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ مَا فُرِضَ بَعْدَ الْعَقْدِ الخ : আকদে নিকাহের পর যদি স্বামী নির্ধারিত মহরের পরিমাণে বৃদ্ধি করে এবং স্ত্রী তা গ্রহণ করে তবে আমাদের মাযহাব মতে স্বামীর উপর এ বর্ধিত অংশ আবশ্যক হবে। ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, এ বর্ধিত করণ সহীহ নয়, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এমত পোষণ করেন। তাদের দলীল হল, বর্ধিত অংশ দান স্বরূপ। যদি স্ত্রী তা গ্রহণ করে তবে সে তার মালিক হবে। অন্যথায় সে মালিক হবে না।

আমাদের দলীল হল কোরআন পাকের ইরশাদ—

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَرَضْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

তোমাদের কোন পাপ নেই যখন তোমরা নির্ধারণ করার পর পরস্পর সন্তুষ্টিচিত্তে গ্রহণ করে নাও।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেন যে, যদি স্বামী স্ত্রী মহর নির্ধারণের পর কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে তাদের কোন পাপ নেই। যেমন সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রী মহরের কিছু অংশ কম করে দিল। কিংবা স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে নির্ধারিত মহর থেকে কিছু বর্ধিত করে দিল তবে তাদের কোন পাপ নেই।

আলোচ্য ইবারতে বর্ণিত মাসআলায় আমাদের মাযহাব মতে যেহেতু বর্ধিত করা জায়েয হল, তাই সহবাসের পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দেয় তবে মূল মহরের সাথে বর্ধিত অংশ বিভক্ত হবে কিনা এ নিয়ে যদিও এখতেলাফ

রয়েছে। তদুপরি গ্রন্থকার (রহ.) তরফাইনের মতামতকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেন, মূল মহরের সাথে বর্ধিত পরিমাণ বিভক্ত হবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যে মূল মহরের সাথে বর্ধিত পরিমাণও বিভক্ত হবে। তিনি বলেন, আকদের পর বর্ধিত পরিমাণ যেমন আকদের সময় নির্ধারিত পরিমাণ। সুতরাং সব মিলে এক হয়ে গেল।

আমাদের দলিল হল : অর্ধেক হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট আকদের সময় নির্ধারিত পরিমানের সাথে যুক্ত। তাই মূল মহর যা আকদের সময় নির্ধারিত হয়েছে তাই বিভক্ত হবে। তবে হা যদি স্ত্রী তার মহর থেকে কিছু হ্রাস করে দেয় তবে তা হ্রাস হিসাবেই ধর্তব্য হবে। তা মহর বিভক্তির সময় ধরতে হবে না। কেননা, মহর হল স্ত্রীর হক। তাই সে তার হক থেকে কিছু হ্রাস করার অধিকার রাখে। যেহেতু তা তার অধিকারভুক্ত এবং সীমার ভেতর।

قوله : وَالْخَلْوَةُ بِلَا مَرَضِ اَحَدِهِمَا الخ : স্বামী স্ত্রী একান্ত মিলিত হওয়া দু' প্রকার। ১। শুদ্ধ একান্ত মিলিত হওয়া যাকে আরবীতে خلوة صحيحة বলা হয়। ২। অশুদ্ধ একান্ত মিলন। যাকে আরবীতে خلوة فاسدة বলা হয়।

গ্রন্থকার (রহ.) বলতে চাচ্ছেন, শুদ্ধ একান্ত মিলন সহবাসের ন্যায়। অর্থাৎ, সহবাস পাওয়া গেলে যেভাবে পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয় তদ্রূপ শুদ্ধ একান্তে মিলন পাওয়া গেলেও পূর্ণ মহর ওয়াজিব হয়। শুদ্ধ একান্তে মিলন ধরা হবে তখন যখন সহবাস থেকে বাধাদানকারী কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান না থাকে। প্রতিবন্ধক তা হাকিকী হতে পারে, যেমন অসুস্থতা। কিংবা প্রাকৃতিক ও শরয়ী প্রতিবন্ধক, যেমন, হায়েয, নেফাস, এ দু অবস্থা একাধারে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক। কেননা, এমতাবস্থায় সহবাসের প্রতি মানুষ অনাশক্ত থাকে। তাছাড়া তা শরয়ী প্রতিবন্ধকও বটে। কেননা, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন— وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ - আবার শুধু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক, যেমন, মহিলার যৌনাঙ্গ বন্ধ হওয়া বা অত্যন্ত সংকির্ণ হওয়া। আর শুধু শরয়ী প্রতিবন্ধক যেমন ফরয রোযা অবস্থায় কিংবা ফরয হজ্জ অবস্থায় হিস্সি প্রতিবন্ধক যেমন স্বামী-স্ত্রীর ঘরে অন্য মানুষের অবস্থান। সুতরাং উপরে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকসমূহ না থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীর নির্জনবাস পাওয়া যায় তবে তা সহবাসের হুকুমের ন্যায় হবে।

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে শুদ্ধ নির্জনবাসের পর তালাক দেয় তবে আমাদের মাযহাব মতে স্ত্রী পূর্ণ মহরের মালিক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে যদি সহবাস পাওয়া না যায় তবে অর্ধেক মহরের মালিক হবে। কেননা, সম্ভোগ অঙ্গের মালিকানা পূর্ণভাবে অর্জন হয় সহবাস দ্বারা। আর এখানে সহবাস পাওয়া যায়নি। তাই স্বামী যেন বিনিময়কৃত বস্তু গ্রহণ করেনি। সুতরাং ফলাফল এ দাড়ালো যে, সহবাস ছাড়া মহর দৃঢ় হয় না।

আমাদের দলীল হল : স্ত্রী তার মালিকানা বস্তু তথা সম্ভোগ-অঙ্গ স্বামীর কাছে পূর্ণরূপে প্রদান করেছে। কেননা, স্ত্রী যাবতীয় বাধা দূর করে দিয়েছে। তাই তার জন্য বদলের হক তথা মহর ওয়াজিব হবে। তাই স্ত্রীর জন্য ঐ সুরতে পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلَوْ مَجْبُوبًا اَوْ عِنِّينًا الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে কর্তিত পুরুষাঙ্গ ব্যক্তি যদি আপন স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয় এবং সহবাস করা থেকে (পূর্বে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতা থেকে) কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তারপর তালাক দিয়ে দেয়। তবে স্ত্রী পূর্ণ মহর প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) বলেন, আলোচ্য ব্যক্তির নির্জনবাস হল خَلْوَةٌ فَاسِدَةٌ - তথা অশুদ্ধ মিলন। সুতরাং এরপর তালাক দেওয়াতে স্ত্রী অর্ধেক মহরের হকদার হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : স্ত্রীর কর্তব্য হল, معقود عليه অর্পণ করা অর্থাৎ, সম্ভোগ অঙ্গকে সমর্পণ করা ওয়াজিব। আর এটাই তার সামর্থ্যের ভিতরে রয়েছে। আর স্ত্রীও তা করেছে। তাই স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আর এ মিলন خلوة فاسدة নয়, বরং خلوة صحيحة বিশুদ্ধ একান্ত মিলন।

قوله : وَتَجِبُ الْعِدَّةُ الخ : বিশুদ্ধ একান্তে মিলন সহবাসের স্থলাভিষিক্ত। তার পর তালাক দিলে পূর্ণ মহর দিতে হবে। পক্ষান্তরে অশুদ্ধ মিলন যদিও সহবাসের স্থলাভিষিক্ত নয় এবং এর পর তালাক দিলে পূর্ণ মহর

ওয়াজিব হয়না। তদুপরি এসকল তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণ ইদ্দত পালন করতে হবে এবং তা ওয়াজিব। তবে এ ইদ্দত পালন করা সতর্কতার ভিত্তিতে এবং কিয়াসবিরোধী। সতর্কতা এজন্য যে উক্ত সকল অবস্থায় গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর উক্তি সহবাস করিনি একথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ইদ্দত হল শরীয়ত ও গর্ভস্থ সন্তানের হক। তাই স্বামী-স্ত্রী তা বিলুপ্ত করতে পারবে না।

قوله : وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ الخ : যে কোন সহবাসকৃত স্ত্রীকে মুতআ প্রদান করা মুস্তাহাব। তবে এমন স্ত্রী ভিন্ন যার আকদের পর মহর নির্ধারিত হয় এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়। কারণ, এ মহিলার মুতআ হল মহরে মিছিলের স্থলবর্তী। কেননা, তার জন্য মহরে মিছিল বাদ পড়েছে এবং মুতআ ওয়াজিব হয়েছে। আর যেহেতু এ মহিলার সাথে বৈবাহিক আকদ সংগঠিত হয়েছে তাই তার বদলা আবশ্যক হয়। তাই মুতআ মহরের স্থলবর্তী হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং যাদের জন্য মুতআ ভিন্ন পূর্ণ মহর কিংবা অর্ধেক মহর নির্ধারিত আছে তাদের জন্য মুতআ যা মহরের স্থলাভিষিক্ত তা কখনো আসলের সাথে ওয়াজিব হবে না, বরং তা মুস্তাহাবই হবে।

قوله : وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِى الشِّغَارِ الخ : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার (রহ.) নিকাহে শেগারের আলোচনা করতেছেন। نكاح شغار এর شغار শব্দটি شغور থেকে নির্গত। অর্থ, খালি করা, উঠানো, অর্থাৎ, মহর থেকে খালি করা বা মহর উঠিয়ে দেয়া। নিকাহে সিগার বলা হয় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বোন বা মেয়েকে এ শর্তে বিবাহ করবে যে, সে তার মেয়ে বা বোন উক্ত ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং কারোর কোন মহর নাই। এ ধরনের বিবাহকে নিকাহে শিগার বলা হয়। হানাফীদের মতে এ ধরনের বিবাহ শুদ্ধ। তবে উভয় স্ত্রী মহরে মিছিল প্রাপ্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এ ধরনের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। বরং এ আকদ বাতিল। তিনি দলিল পেশ করেন হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ ইসলামে নিকাহে সিগারের কোন অবকাশ নেই। দ্বিতীয় হাদিস যা হযরত জাবের (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত- نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشِّغَارِ - রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিকাহে শিগার থেকে নিষেধ করেছেন।

আকলী দলীল : উভয়ের সম্ভোগ-অঙ্গ অর্ধেক মহর হিসাবে অপরজনের হবে আর অর্ধেক স্বামীর বিবাহ হিসাবে হবে। অর্থাৎ, সম্ভোগ অঙ্গ স্বামী ও কন্যার মধ্যে মুশতারাক হয়ে গেল। সুতরাং সম্ভোগ অঙ্গে অংশিদারিত্ব আবশ্যক হয়ে গেল। অথচ এক্ষেত্রে অংশিদারিত্বের কোন অবকাশ নেই। তাই তাদের মধ্যকার ইজাব বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যখন ইজাব বাতিল হয়ে গেল তখন মূল আকদই বাতিল বলে গণ্য হবে। মূল বিবাহ সহীহ না হওয়াতে মহর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি আলোচনার বিষয় নয়।

আমাদের দলীল : উভয় আকদে এমন জিনিস মহর রাখা হয়েছে যা মহর হওয়ার যোগ্য নয়। আর কায়দা হচ্ছে যদি, এমন জিনিস মহর রাখা হয় যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তবে মূল আকদ সহীহ হয়, কিন্তু মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। যেমন কেহ মহর শরাব বা শুকর নির্ধারণ করল, তবে তার আকদ সহীহ হয়ে যাবে। তবে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তেমনি এখানেও মূল আকদ সহীহ হবে এবং মহলে মিছিল ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিলের জবাব : যেহেতু সম্ভোগ-অঙ্গ মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, তাই তাতে অংশিদারিত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। আর হাদিসে নিষেধটি বিবাহের জন্য নয়, বরং হাদিসে নিষেধ এসেছে বিবাহকে মহরের নাম থেকে খালি করার কারণে। আর মহরের নাম থেকে যদি বিবাহকে খালি রাখা হয় তবে এর দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হল যে, নিকাহে শিগার সহীহ তবে এক্ষেত্রে উভয় স্ত্রী মহরে মিছিল প্রাপ্ত হবে।

قوله : وَخِدْمَةِ الزَّوْجِ الخ : কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল আর মহর ধার্য করল এক বৎসর

সে স্ত্রীর খেদমত করবে। অথবা কোরআন শিক্ষা দিবে এবং এ খিদমত ও শিক্ষা দেওয়াকে মহর ধার্য করল। তবে উভয় সূরতে শায়খাইন (রহ.) এর মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, স্বাধীন স্বামীর খেদমতের বিনিময়ে মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি দাস তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে এবং এক বৎসর স্ত্রীর খেদমত করাকে মহর ধার্য করে তবে তার এ ধার্য করা সহীহ। স্ত্রীও মহর হিসাবে এক বৎসর স্বামীর খেদমত গ্রহণ করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তা'লীমে কোরআন এবং স্বাধীন স্বামীর এক বৎসরের খেদমত মহর হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল : আকদে নিকাহ হল বিনিময়ের আকদ। সুতরাং যার বিনিময় গ্রহণ করা যায় তা বিবাহের মহর হতে পারে। আর যেহেতু তা'লীমে কোরআন ও খিদমতের বিনিময় গ্রহণ করা যায় তাই তা আকদে নিকাহের মহর হতে পারে।

আমাদের দলীল হল : আকদে নিকাহের মধ্যে শরীয়াত মালের বিনিময়ে সম্ভোগাধিকার লাভের অনুমোদন দিয়েছে। কেননা, কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে— اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ আয়াতে মালের কথা বলা হয়েছে। অথচ তালিমে কোরআন মাল নয়। তদ্রূপ স্বাধীন ব্যক্তির খেদমতও মাল নয়। তাই তা মহর হওয়ার যোগ্য নয়। দ্বিতীয় দলীল : যদি স্বাধীন পুরুষ তার স্ত্রীর খেদমত কারটা মহর হিসাবে ধার্য করে তবে স্ত্রী তার স্বাধীন স্বামীর খেদমত গ্রহণ করার হকদার হবে। এক্ষেত্রে মূল বিষয় পাল্টে যাবে। কেননা, স্ত্রী হয় তার স্বামীর খাদেমা আর স্বামী হয় মাখদুম। কিন্তু এখন যদি স্বামীর খেদমতকে মহর নির্ধারণ করা হয় তখন স্ত্রী খেদমতকৃতা আর স্বামী খেদমতকারী হয়ে যায়। আর এটি সকলের মতে বিবাহের উদ্দেশ্যের বিপরীত। সুতরাং তা'লীমে কোরআন ও স্বাধীন স্বামীর খেদমত মহর হতে পারে না। যদি কেহ এ রকম করে তবে স্ত্রী মহরে মিছিলের হকদার হবে। আর দাসের খেদমত মহর হওয়ার যোগ্য এজন্য যে সে কার্যত মুনিবের খেদমত করতেছে। আর মুনিব তার দ্বারা দাসের স্ত্রীর মহর আদায় করতেছে।

وَ لَوْ قَبَضَتْ اَلْفَ الْمَهْرِ وَ وَهَبَتْ لَهٗ فَطُلِّقَتْ قَبْلَ الْوَطْئِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ فَاِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْاَلْفَ اَوْ قَبَضَتِ النِّصْفَ وَ وَهَبَتِ الْاَلْفَ اَوْ وَهَبَتْ عَرَضَ الْمَهْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ اَوْ بَعْدَهٗ فَطُلِّقَتْ قَبْلَ الْوَطْئِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَ لَوْ نَكَحَهَا بِاَلْفٍ عَلٰى اَنْ لَايُخْرِجَهَا اَوْ عَلٰى اَنْ لَايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اَوْ عَلٰى اَلْفٍ اِنْ اَقَامَ بِهَا وَ عَلٰى اَلْفَيْنِ اِنْ اَخْرَجَهَا فَاِنْ وَفٰى وَ اَقَامَ فَلَهَا الْاَلْفُ وَ اِلَّا مَهْرُ الْمِثْلِ -

---

অনুবাদ : (স্ত্রীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করল) এবং যদি এক হাজার মহর গ্রহণ করে এবং স্বামীকে তা দান করে দেয়। অতঃপর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রাপ্তা হয়। তাহলে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে অর্ধেক মহর ফেরত নেবে। আর যদি এক হাজার গ্রহণ করেনি। অথবা অর্ধেক গ্রহণ করে এক হাজার দান করে দেয় কিংবা মহরের সামান গ্রহণের পূর্বে দান করে দেয় অথবা গ্রহণ করে দান করে দেয়। অতঃপর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রাপ্তা হয় তবে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে কোন বস্তু ফেরত নিতে পারবে না। আর যদি এ শর্তে এক হাজার

দিরহামের মহরে বিবাহ করে যে, তাকে (এ শহর থেকে) অন্যত্র নিয়ে যাবে না অথবা এ শর্তে যে (তার বর্তমানে) অন্য কাউকে বিবাহ করবে না। অথবা এ শর্তে যে এক হাজার মহর, যদি স্বামী তার সঙ্গে এ নগরীতে বাস করে। আর এখান থেকে বের করলে দু হাজার। তবে যদি শর্ত পূর্ণ করে এবং নগরীতে রাখে তবে এক হাজার অন্যথায় মহলে মিছিল পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَوْ قَبَضَتْ اَلْفَ الْمَهْرِ الخ : সুরতে মাসআলা হল, যদি মহিলার মহর এক হাজার দিরহাম হয়ে থাকে অতঃপর স্ত্রী এক হাজার টাকা স্বামীর পক্ষ থেকে গ্রহণ করে পুনরায় তা স্বামীকে দান করে দেয়। তারপর স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়। তবে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে পাঁচশত দিরহাম ফেরত নিতে পারবে। কারণ, দিরহাম ও দিনার উকুদ ও ফুসুখের মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সুতরাং স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়ার কারণে স্ত্রী গ্রহণকৃত দিরহামের অর্ধেকের হকদার হবে। আর স্ত্রী দান করার কারণে স্বামীর দিকে হুবহু ঐ জিনিস পৌঁছেনি যার হকদার স্বামী হয়েছে। কেননা, দিরহাম দিনারের মধ্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সুতরাং স্ত্রীর পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা দান করা এমন হল যেমন, সে মহরের এক হাজার টাকা দান করেনি। আর যখন স্বামী পর্যন্ত ঐ অর্ধেক মহর পৌঁছেনি যার হকদার স্বামী, তখন স্বামী তার অর্ধেক স্ত্রীর নিকট থেকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে।

قوله : فَاِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْاَلْفَ الخ : যদি স্ত্রী এক হাজার গ্রহণ না করে স্বামীকে দান করে অতঃপর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয়। তবে স্বামী স্ত্রী কেহ কারো থেকে কোন কিছু ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তবে কিয়াসের দাবী হল, স্বামী-স্ত্রী থেকে অর্ধেক ফিরিয়ে নিবে। আর ইহা ইমাম যুফার (রহ.) এর মতামত। তিনি দলিল দেন যে, স্ত্রী গ্রহণ করা ছাড়া দান করে স্বামীকে মহর থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছে। এবং স্ত্রীর অব্যাহতি দেয়ার দ্বারা স্বামীর কাছে যে এক হাজার পৌঁছেছে তা স্বামীর নিকট দান স্বরূপ পৌঁছেছে মূল মহর পৌঁছেনি। তাই স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়াতে স্ত্রীর নিকট থেকে অর্ধেক ফিরিয়ে নিতে পারবে।

আমাদের দলীল হল : ইসতিহসানের (استحسان) এর ভিত্তিতে। আর তা হল যখন স্ত্রী তাকে পূর্ণ মহর থেকেই অব্যাহতি দিয়েছে। এবং গ্রহণও করেনি তাই স্বামীর নিকট হুবহু সে জিনিসটাই পৌঁছেছে যার সে হকদার। অর্থাৎ, সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়াতে যে অর্ধেক মহরের হকদার হয়েছিল। তা-ই তো হুবহু স্বামীর কাছেই পৌঁছেছে। সুতরাং স্বামী পুনরায় স্ত্রীর নিকট থেকে আর অর্ধেক ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

قوله : اَوْ قَبَضَتِ النِّصْفَ الخ : সুরতে মাসআলা হল : যদি স্ত্রী অর্ধেক গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ এক হাজার স্বামীকে দান করে অতঃপর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্বামী স্ত্রী থেকে কোন কিছু ফিরত নিতে পারবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় স্ত্রী যা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ, পাঁচ শত দিরহাম তার অর্ধেক তথা দুইশত পঞ্চাশ দিরহাম স্বামী স্ত্রী থেকে গ্রহণ করতে পারবে। সাহাবাইন (রহ.) আংশিক গ্রহণকে পূর্ণ গ্রহণের উপর কিয়াস করেন এবং বলেন, যেভাবে স্ত্রী পূর্ণ গ্রহণ করে স্বামীকে দান করলেও স্বামী তার হক অনুযায়ী অর্ধেক স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নিতে পারে তদ্রূপ এখানেও স্ত্রী যা গ্রহণ করেছে তার অর্ধেক স্বামী নিতে পারবে। দ্বিতীয়ত এখানে যেহেতু স্ত্রী আংশিক গ্রহণ না করে দান করে দিয়েছে তাই তার এ দান করা তথা মহর থেকে হ্রাস করা মূল আকদের সময়ের মহরের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং ধরা হবে যে, তার এখন মূল মহরই হচ্ছে পাঁচশত দিলাম। যা স্ত্রী গ্রহণ করেছে। সুতরাং যেহেতু সহবাসের পূর্বে তালাক পতিত হয়েছে তাই স্ত্রী পাঁচশত দিরহামের অর্ধেকের মালিক হবে। সুতরাং বাকি অর্ধেক তথা দুইশত পঞ্চাশ দিরহাম স্বামীকে ফিরত দিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : স্বামীর সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়াতে বিনিময় ছাড়া অর্ধেক মহরের হকদার হয় আর তা তো সে তালাক দেয়ার পূর্বেই হাসিল করেছে। তাই তালাক দেয়ার পর পুনরায় আর ফেরত নিতে পারবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিলের জবাব হল বিবাহের ব্যাপারে হ্রাসকৃত অংশ মূল আকদের সাথে যুক্ত করা হয় না।

قوله : أَوْ وَهَبَتْ عَرَضَ الْمَهْرِ الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বিবাহের আকদের সময় এমন বস্তু মহর হিসাবে দিয়ে থাকে যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ, দিরহাম, দিনার ভিন্ন জায়গা জমী ইত্যাদি।

অতঃপর স্ত্রী তা গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ না করে স্বামীকে দান করে দেয় এবং সহবাসের পূর্বে স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে আইম্মায়ে সালাসার মতে স্বামী পুনরায় তার অর্ধেক স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে না কেননা, স্বামী সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়াতে বিনিময় ছাড়া স্ত্রীর কাছ থেকে অর্ধেক ফেরত পাওয়ার হকদার হল। কিন্তু এ অর্ধেক সহ সমস্ত মহরই স্ত্রী তালাকের পূর্বেই হুবহু স্বামীর নিকট পৌঁছেছে। বিধায় স্বামী পুনরায় স্ত্রীর কাছ থেকে অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে না।

قوله : وَ لَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর মহর এক হাজার দিরহাম নির্ধারণ করে এ শর্তের উপর যে, সে তাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে না অথবা তার থাকা অবস্থায় আর বিবাহ করবে না। অথবা শর্ত করে যে, যদি তাকে নিয়ে অবস্থান করে তবে এক হাজার আর যদি অন্যত্র নিয়ে যায় তবে দু হাজার। শর্তসমূহ যদিও অগ্রহণযোগ্য তথা ফাসিদ তথাপি বিবাহ হয়ে যাবে এবং উভয় ক্ষেত্রে যদি শর্তপূরণ করে তবে স্ত্রীর মহর এক হাজার হবে। কেননা, নির্ধারিত বস্তু অর্থাৎ এক হাজার টাকা মহর হওয়ার যোগ্য আর স্ত্রীও তাতে সন্তুষ্ট এবং এতে স্ত্রীর উপকারও রয়েছে। আর যদি শর্ত পূরণ না করে তবে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কেননা, শর্তসমূহ ফাসিদ আর শর্ত ফাসিদ হওয়ার অবস্থায় মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়।

وَ لَوْ نَكَحَهَا عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ حُكِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَ عَلٰى فَرَسٍ اَوْ حِمَارٍ يَجِبُ الْوَسَطُ اَوْ قِيمَتُهٗ وَ عَلٰى ثَوْبٍ اَوْ خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ اَوْ عَلٰى هٰذَا الْخَلِّ فَاِذَا هُوَ خَمْرٌ اَوْ عَلٰى هٰذَا الْعَبْدِ فَاِذَا هُوَ حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَ اِذَا اَمْهَرَ عَبْدَيْنِ وَاَحَدُهُمَا حُرٌّ فَمَهْرُهَا الْعَبْدُ -

---

অনুবাদ : যদি কেহ মহিলাকে বিবাহ করে এ দাস অথবা ঐ দাসের (অর্থাৎ, উভয় দাসের একটি) বিনিময়ে তবে মহরে মিছিলের ফায়সালা প্রদান করা হবে। আর যদি ঘোড়া অথবা গাধার বিনিময়ে বিবাহ হয় তবে মধ্যম পর্যায়ের ঘোড়া বা গাধা অথবা তার মূল্য ওয়াজিব হবে। অথবা যদি কাপড়ের বিনিময়ে কিংবা সরাবের বিনিময়ে অথবা শুকরের বিনিময়ে নতুবা এই মটকা ভর্তি সিরকার বিনিময়ে কিন্তু দেখা গেল তা মদ অথবা এই দাসের বিনিময়ে কিন্তু দেখা সে আজাদ। তবে (এসব ক্ষেত্রে) মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর যদি মহর ধার্য করে দুটি দাস। অথচ তাদের থেকে একটি স্বাধীন তবে তার মহর অপর দাসই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ الخ : যদি কেহ দু গোলাম থেকে একজনকে অনির্ধারিত ভাবে বিবাহের মহর ধার্য করে আর এ দু গোলাম থেকে একটি সল্প মানের আর অপরটি উচ্চ মানের হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কোন গোলামই ওয়াজিব হবে না; বরং এ ক্ষেত্রে মহলে মিছিল ওয়াজিব হবে।

সাহাবাইন (রহ.) বলেন, স্বল্প মূল্যের গোলামই স্ত্রী মহর হিসাবে প্রাপ্ত হবে। দলিল : সাহাবাইন (রহ.) এর মতে মহরের মধ্যে মূল হল যা নির্ধারিত হয়। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে মহরের মধ্যে মূল হল মহরে মিছিল। সুতরাং সাহাবাইন (রহ.) বলেন, যখন নির্ধারিত বস্তু মহর হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে তখন তাই মহর হিসাবে গণ্য হবে। মহরে মিছিলের হুকুম দেয়া যাবে না। আর এখানে কম মূল্য দাসটি মহর হিসাবে গণ্য করলে কোনরূপ ফাসাদ দেখা যায় না। কেননা, স্ত্রী উভয়টির কোন একটি মহর হওয়াতে যেহেতু সন্তুষ্ট তাই উভয় গোলামের মধ্যে কম মূল্য গোলামটি মহর হতে সে সন্তুষ্ট। উক্ত মাসআলাটি এমন হল যেমন, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমার সাথে খোলা করব এ গোলামের বিনিময়ে অথবা ঐ গোলামের বিনিময়ে। তদ্রূপ মুনিব যদি তার দাসকে বলে আমি তোমাকে এ গোলামের বিনিময়ে অথবা ঐ গোলামের বিনিময়ে স্বাধীন করব। তবে উভয় অবস্থায় নিম্নমূল্য গোলামই আবশ্যক হবে। তদ্রূপ মহরের মাসআলাতে স্বল্পমূল্যের গোলামই নির্ধারিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, মহরের ক্ষেত্রে যেহেতু মূল মহর হল মহরে মিছিল, তাই তা থেকে তখনই সরে আসতে হবে যখন মহর নির্ধারণ সহীহ হয়। আর এখানে দুগোলামের কথা উল্লেখ দ্বারা উভয়ের মধ্যকার সংশয়ের কারণে অজ্ঞতা এসে গেছে। আর এ অজ্ঞতার কারণে মহর নির্ধারণে ফাসেদী এসে গেছে। তাই নির্ধারিত মহর ওয়াজিব হবে না, বরং মহরের মূল তথা মহলে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে খোলা ও স্বাধীন করার উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, বদলের ক্ষেত্রে এ দুটির কোন মূল্য ওয়াজিব নেই। তাই তাদের থেকে একটি নির্ধারণ করতেই হবে। অর্থাৎ, মহরের ক্ষেত্রে যেভাবে মূল তথা মহরে মিছিল স্ত্রীর আর তদ্রূপ খুলা ও স্বাধীন করার মূল থেকে কোন বস্তু নেই তাই উভয়টি থেকে একটি নির্ধারণ করতে হবে।

قوله : وَ عَلٰى فَرَسٍ اَوْ حِمَارٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের মহর ধার্য করে একটি প্রাণী যার গুণ বর্ণনা করে নি। যেমন একটি ঘোড়া বা গাধা মহর হিসাবে ধার্য করে, কিন্তু এ ঘোড়া বা গাধার গুণাগুণ বর্ণনা করেনি। তবে আমাদের মাযহাব মতে মধ্যম স্তরের প্রাণী ওয়াজিব হবে এবং স্বামীর অধিকার থাকবে যে, সে যদি চায় তবে মধ্যম স্তরের প্রাণী মহর হিসাবে দিতে পারবে। অথবা মধ্যম পর্যায়ের প্রাণীর মূল্য প্রদান করতে পারবে। গ্রন্থকারের এ মাসআলার অর্থ হল স্বামী প্রাণীর শ্রেণীর বর্ণনা দিয়েছে কিন্তু গুণাগুণ বর্ণনা করেনি।

আর যদি স্বামী শ্রেণীও বর্ণনা না দেয় বরং এভাবে বলে একটি প্রাণী মহর হিসাবে রাখলাম। যার শ্রেণী ও গুণাগুণ উভয়টি বর্ণনা করেনি। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উভয় মাসআলায় তথা শ্রেণী বর্ণনা করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি দলিল পেশ করেন— যা ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য হতে পারে না তা মহরও হতে পারবে না। তাই তিনি বলেন, যে প্রাণীর গুণ বর্ণনা করা হয়নি তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য হতে পারে না। তাই তা বিবাহ চুক্তিতেও মহর হতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বিবাহ চুক্তিকে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলীল হল : বিবাহ চুক্তি হল মাল ছাড়া মালের বিনিময়। অর্থাৎ, স্বামী নিজের উপর কোন মাল বিনিময় ছাড়া মাল আবশ্যক করে। আর মাল আবশ্যক করা মূল অজ্ঞাত দ্বারাও ফাসেদ হয় না। যেমন দিয়াতের ক্ষেত্রে শরীয়াত গুণাবলী বর্ণনা ছাড়া একশত উট নির্ধারণ করেছে। তবে আমরা শর্ত করেছি যে, নির্ধারিত বস্তুটি

এমন মাল হতে হবে যার মধ্যস্থর জানা আছে। যাতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের প্রতি লক্ষ রাখা সম্ভব হয়। আর তা তখনই সম্ভব হবে যখন জিনস বা জাত বর্ণনা করা হবে। কেননা, জিনিস এর মধ্যে উত্তম, নিম্ন, মধ্যম সবই বিদ্যমান আছে।

সুতরাং শ্রেণী উল্লেখ করা অবস্থায় স্বামীর উপর মধ্যম স্তরের প্রাণী ওয়াজিব হবে। সে যদি চায় তবে মধ্যম পর্যায়ের প্রাণী মহর হিসেবে দিবে অথবা তার মূল্য পরিশোধ করবে। এখানে মূল্য দ্বারা মহর আদায়ের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এজন্য যে মধ্যম স্তর জানা যায় তার মূল্য দ্বারা। কারণ যার মূল্য অনেক বেশি সেটি হল উচ্চ স্তরের, আর যার মূল্য কম সেটি হল নিম্ন স্তরের। আর যার মূল্য বেশিও নয় আবার কমও নয় সেটি হল মধ্যম স্তরের প্রাণী। তাই আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্য হল আসল। আবার নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাণী হল আসল। তাই স্বামীকে এখতিয়ার দেয়া হবে, সে প্রাণী দ্বারা বা তার মূল্য দ্বারা মহর আদায় করতে পারে।

قوله : وَ عَلٰى ثَوْبٍ الخ : যদি কেহ স্ত্রীর মহর হিসাবে কাপড় নির্ধারণ করে কিন্তু কাপড়ের গুনাগুণ বর্ণনা করে না, তবে সর্বসম্মতিক্রমে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর যদি কাপড়ের গুণাগুণ বর্ণনা করে। অর্থাৎ, কাপড়ের শ্রেণী ও প্রকার ইত্যাদি নির্ণয় করে বলে আমি হারবী, রেশমী ইত্যাদি কাপড় মহর দেব তবে শ্রেনী নির্ণয়কৃত কাপড়ের মধ্যম কাপড় বা তার মুল্য পরিশোধ করলে মহর আদায় হয়ে যাবে।

قوله : اَوْ خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ الخ : যদি কোন মুসলমান তার বিবাহে স্ত্রীর মহর হিসেবে মদ বা শুকর নির্ধারণ করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে বিবাহ সহীহ, কিন্তু মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে বিবাহ ফাসিদ। তিনি ক্রয় বিক্রয়ের উপর কিয়াস করে বলেন, যেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে শরাব কিংবা শুকর মূল্য নির্ধারণ করাতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ তদ্রূপ বিবাহ শুকর কিংবা মদ মহর ধার্য করাতে বিবাহ ফাসিদ হবে। আইম্মায়ে ছালাছার দলিল হল—স্বামী যখন মহর হিসাবে মদের কিংবা শুকরের কথা উল্লেখ করল। তখন তা শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। আর বিবাহ শর্ত ফাসেদ দ্বারা ফাসেদ হয় না, বরং বিবাহ ইজাব কবুলের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে যাবে আর শর্ত যা ফাসেদ তা প্রত্যাখ্যিত হবে। তাছাড়া শর্ত ফাসেদ মহর নির্ধারণ বর্জন করা থেকে বড় নয়। আর যখন মহর নির্ধারণ তরক দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না তখন তো শর্তে ফাসেদ দ্বারা অবশ্যই বিবাহ বাতিল হবে না। তবে একথা বলা যায় যে, মুসরমানের জন্য মদ কিংবা শুকর মহর নির্ধারণ করা জায়েয নয়। আর মহর নির্ধারণ সহীহ না হওয়ার সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয় তাই এ ক্ষেত্রেও মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ عَلٰى هٰذَا الْخَلِّ الخ : যদি কেহ বিবাহের মহর এক মটকা সিরকার দিকে ইঙ্গিত করে নির্ধারণ করে অতঃপর দেখা গেল তা তো মদের মটকা। তদ্রূপ যদি কেহ মহর এক গোলামের দিকে ইঙ্গিত করে নির্ধারণ করে অতঃপর দেখা গেল যে, সে তো গোলাম নয়, বরং স্বাধীন মানুষ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উভয় সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে প্রথম সুরতে মটকা সমপরিমাণ সিরকা ওয়াজি হবে। দ্বিতীয় সুরতে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সাথে এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম ধারণা করে তার যে মূল্য হবে তাই মহর হিসাবে ধার্য হবে।

মোটকথা, উভয় মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে ইঙ্গিতই বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সকল ক্ষেত্রে মহর নির্ধারণই বিবেচ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে ইঙ্গিত ও মহর নির্ধারণের মধ্যে জিনিস এক হলে ইঙ্গিত বিবেচ্য হবে। আর ইঙ্গিত ও মহর নির্ধারণের মধ্যে জিনস ভিন্ন হলে মহর নির্ধারণের মধ্যে জিন্‌স ভিন্ন হলে মহর নির্ধারণ বিবেচ্য হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলিল হল—যদি কেহ কোন গোলাম মহর নির্ধারণ করে এবং তা অর্পণ করার পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যায় তবে যেরূপ তার মূল্য ওয়াজিব হয়ে যায় তদ্রূপ এক্ষেত্রেও স্বামী স্ত্রীকে একটি

মালের আসা দিয়েছে কিন্তু সে মাল হস্তান্তর করতে অপারগ হচ্ছে তাই নির্ধারিত মহর পরিমাপ জাতীয় হয় তবে তার সমপরিমাণ নির্ধারিত সামগ্রী ওয়াজিব হবে। প্রথম সুরত তথা মদের পরিবর্তে সমপরিমাণ সিরকা ওয়াজিব হবে। আর যদি নির্ধারিত মহর মূল্য জাতীয় হয় তবে মূল্যই ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় সুরতে গোলামের পরিবর্তে মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখানে الخل ।هذا এবং العبد ।هذا এর মধ্যে ইশারা (ইঙ্গিত) এবং নাম উল্লেখ একত্র হয়েছে। আর যখন নাম উল্লেখ এবং ইশারা একত্র হয় তখন ইশারাই কার্যকর হয়। কেননা, ইঙ্গিত হল وضع اليد على الشيء তথা কোন কিছুর উপর হাত রেখে দেয়ার স্থলবর্তী কেননা, হাত রাখার পর কোন কিছু সতন্ত্র হয়ে যায়। এজন্যই কোন কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে যদি অন্যটি উদ্দেশ্য নেয়া হয় তবে তা নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন শব্দ বলে তার অন্যটি উদ্দেশ্য নেয়া যায়। তাই প্রতিয়মান হল যে, ইঙ্গিতের মধ্যে অন্যের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নাম উল্লেখের মধ্যে অন্যের সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং যখন ইঙ্গিতটিই বিবেচ্য হল তখন বিবাহ মদ ও স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে হয়ে গেল। এদিকে যখন এ দুটির কোনটি মহর নির্ধারণ করা হয় তখন মহলে মিছিল ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ إِذَا أَمْهَرَ عَبْدَيْنِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি বিবাহে মহর নির্ধারণ করে দুজন গোলামের দিকে ইঙ্গিত করে। অতঃপর একজন গোলাম আর একজন স্বাধীন পাওয়া যায়। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে যদি এ গোলামের মূল্য দশ দিরহাম বা তদোর্ধ হয় তবে মহর হিসাবে শুধু এ গোলামই ওয়াজিব হবে। আর যদি এ গোলামের মূল্য দশ দিরহামের কম হয় তবে এ গোলামসহ দশ দিরহাম পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে গোলাম তো ওয়াজিব হবে সাথে সাথে যাকে স্বাধীন পাওয়া গেল তাকে গোলাম ধারণা করে যে পরিমাণ মূল্য হবে তাও স্বামীর উপর মহর হিসাবে ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে গোলাম ওয়াজিব হবে মহরে মিছিল পর্যন্ত পূর্ণ করে। অর্থাৎ, যদি গোলামটি মহরে মিছিলের কম মূল্যের হয় তবে মহরে মিছিল পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল, নামোল্লেখ আর ইঙ্গিত একত্র হলে ইঙ্গিতই গ্রহণযোগ্য হয়। আর স্বাধীন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করার দ্বারা সে আকদ থেকে বের করে দেয়া হয়। কারণ, স্বাধীন ব্যক্তি মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাহলে যেমন একটি গোলামের বিনিময়ে বিবাহ সংঘটিত হল। সুতরাং যেহেতু মহর নির্ধারিত হয়ে গেল তাই মহলে মিছিল আর ওয়াজিব হবে না। কেননা, মহর নির্ধারিত এবং এর সাথে মহলে মিছিল উভয়টি এক সাথে একত্র হতে পারে না। তবে হ্যাঁ যদি নির্ধারিত মহরটি দশ দিরহামের কম হয় তবে দশ দিরহাম পর্যন্ত পূর্ণ করতে হবে। যেহেতু তা শরয়ী হক।

وَ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ اِنَّمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْئِ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمُسَمّٰى وَ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَ الْعِدَّةُ وَ مَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِقَوْمِ اَبِيْهَا اِذَا اسْتَوَتَا سِنًّا وَ جَمَالًا وَ مَالًا وَ بَلَدًا وَ عَصْرًا وَ عَقْلًا وَ دِيْنًا وَ بَكَرَةً فَاِنْ لَمْ تُوْجَدْ فَمِنَ الْاَجَانِبِ وَ صَحَّ ضِمَانُ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ وَ تُطَالِبُ زَوْجَهَا اَوْ وَلِيَّهَا وَ لَهَا مَنْعُهٗ مِنَ الْوَطْئِ وَ الْاِخْرَاجِ لِلْمَهْرِ وَ اِنْ وَطِئَهَا -

অনুবাদ : নিকাহে ফাসেদে সহবাস দ্বারা (পাওয়া গেলে) মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তবে তা নির্ধারণকৃত মহরের অধিক হতে পারে না। সন্তানের বংশধারা এবং ইদ্দত স্বীকৃত হবে। স্ত্রীর মহরে মিছিল সাব্যস্ত হবে তার পিতার বংশ দ্বারা (অর্থাৎ স্ত্রীর মহর তার পিতার সম্পর্কীয় তথা বোন, ফুফু, চাচাতো বোন ইত্যাদির মহরের সাথে তুলনা করে মহরের মিছিল ধার্য হবে।) যখন উভয় বয়সে, সৌন্দর্যে, সম্পদে, শহরে, কালে, জ্ঞানে, ধার্মিকতায় এবং কুমারীত্বে সমান সমান হবে। যদি এমন পাওয়া যায় না (অর্থাৎ, এমন গুণাবলীল কোন মেয়ে পিতৃ বংশের পাওয়া যায় না) তবে অন্য যে কোন মহিলার সাথে তুলনা করা হবে। মহরের জামিন ওলী হওয়া বিশুদ্ধ এবং স্ত্রী তার স্বামীর কাছে অথবা ওলীর কাছে মহর দাবী করতে পারবে। স্ত্রী মহরের জন্য সহবাস এবং বের করা (তথা সফরে নিয়ে যাওয়া) থেকে বাধা দিতে পারবে। যদিও স্বামী তার সাথে সহবাস করে। (অর্থাৎ, ইতিপূর্বে মহর আদায় না করেও সহবাস করে থাকে তবুও স্ত্রী মহরের জন্য স্বামীকে পুনরায় সহবাস করা অথবা সফরে ইত্যাদিতে নিয়ে যাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ فِىْ نِكَاحِ الْفَاسِدِ الخ : নিকাহে ফাসেদ হলো এমন বিবাহ যাতে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ থেকে কোন একটি শর্ত অবিদ্যমান থাকে। যেমন, স্বাক্ষী দুজনের স্থলে একজন থাকা, প্রথম বোনের আকদ বাকী থাকা অবস্থায় অপর বোনের আকদ করা, চতুর্থ স্ত্রী ইদ্দত পালন করা অবস্থায় পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করা ইত্যাদি।

নিকাহে ফাসেদের পর যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গমের পূর্বে কাজী উভয়কে পৃথক করে দেন তবে স্ত্রী পূর্ণ বা আংশিক মহর প্রাপ্ত হবে না। কেননা, নিকাহে ফাসেদে ফাসিদ আকদের কারণে মহর ওয়াজিব হয় না। তবে মহর ওয়াজিব হয় সম্ভোগ অঙ্গের ফায়দা হাসিল করার কারণে। একথার দলিল হল রাসূল (সা.) এর বাণী—

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

যে মহিলা ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করল তার বিবাহ বাতিল (তবে) যদি তার সাথে মিলন হয় তবে সে মহর পাবে। তার যৌনাঙ্গ হালাল করার কারণে।

উক্ত হাদীস থেকে প্রতিয়মান হল যে, নিকাহে ফাসিদে শুধু আকদের কারণে মহর ওয়াজিব হবে না, বরং তার যৌনাঙ্গ ব্যবহার করার কারণে মহরে মিছিল দিতে হবে। তবে এ মহরে মিছিল আমাদের মাযহাব মতে নির্ধারিত মহর থেকে বাড়ানো যাবে না। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে নিঃশর্তভাবে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তা নির্ধারিত মহর থেকে কম হউক বা বেশি হউক। ইমাম যুফার (রহ.) এর দলিল হল, তিনি বাইয়ে ফাসিদের

উপর কিয়াস করেন যেভাবে বাইয়ে ফাসিদে বস্তুর মূল মূল্যই ওয়াজিব হয় তা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম হউক বা বেশি। অনুরূপভাবে নিকাহে ফাসিদের মধ্যে মহরে মিছিলই ওয়াজিব হবে। নির্ধারিত মহর কম হউক বা বেশি।

আমাদের দলীল হল : সম্ভোগ-অঙ্গের লাভ যা অর্জিত হয়েছে তা মাল নয়। তবে হা যখন বিবাহের সময় মহর উল্লেখ করা হয়েছে তখন তা সম্ভোগ অঙ্গের লাভ মূল্য বিশিষ্ট হয়েছে। সুতরাং যখন মহরে মিছিলের উপর নির্ধারিত মহর বেশি হবে। তখন অতিরিক্ত ওয়াজিব হবে না। কেননা, মহলে মিছিলের অতিরিক্ত, নির্ধারণ সহীহ হয়নি। আর যদি নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে কম হয়ে থাকে তবে অতিরিক্তটা ওয়াজিব হবে না। কেননা, নির্ধারিতের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া নির্ধারিত মহর মহরে মিছিল থেকে কম হওয়ার উপর স্ত্রী রাজী বা তার উপর স্ত্রীর কোন অভিযোগ নেই। তাই অতিরিক্ত ওয়াজিব হবে না। আর এ মাসআলাটিকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা, বিক্রিত বস্তু তার নিজস্ব সত্বা হিসাবেই মূল্য বিশিষ্ট হয়। তাই তার মূল্য দ্বারাই তার মূল্য নির্ধারিত হবে।

উল্লেখ্য যে, নিকাহে ফাসিদে শুধু নির্জন বাসকে সহবাসের স্থলাভিষিক্ত করা হয় নাই। কেননা, শরীয়াত যেহেতু নিকাহে ফাসিদকে অনুমোদন দেয় নাই তাই শরয়ী বাধা বিদ্যমান পাওয়া যাওয়ার কারণে তা শুদ্ধ নির্জন বাস হল না। তাই তা সহবাসের স্থলাভিসিক্ত হবে না।

قوله : وَ يَثْبِتُ النَّسَبُ الخ : নিকাহে ফাসেদ বিচ্ছেদ করার পর স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। কেননা, নিকাহে ফাসেদের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিবাহ রয়েছে। এজন্য মূল সহীহ বিবাহের ন্যায় ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আর ইহা সতর্কতার ভিত্তিতে। আর নিকাহ ফাসিদের পর সহবাসের ভিত্তিতে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার বংশসূত্র স্বীকৃত হবে। কেননা, সন্তানের বংশসূত্র নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সন্তানকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তার উপর বংশ সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে নসবের মেয়াদ স্বামী স্ত্রীর মিলনের সময় থেকে ধার্য হবে। আকদে নিকাহ থেকে শুরু হবে না। আর ইহার উপরই ফতোয়া।

قوله : وَ مَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ الخ : স্ত্রীর মহরে মিছিলের ক্ষেত্রে তার পিত্রীয় বংশের নারীদের বিবেচনা করা হবে। যেমন, বোন, ফুফু, চাচাতো বোন প্রমুখ। একথার দলীল হল, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) এর হাদীস—

لَهَا مَهْرُ مِثْلِ نِسَائِهَا وَ هُنَّ اَقَارِبُ الْاَبِ

স্ত্রীর জন্য তার সমগোত্রীয় নারীদের অনুরূপ মহরে মিছিল হবে এবং তারা পিতার (বংশের) নিকটাত্মীয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ তার পিতার বংশেই পরিচিত হয়। মাতার দিক থেকে বংশ পরিচিতি হয় না। অর্থাৎ, মানুষ তার পিতার সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকে আর যে কোন বস্তুর মূল্য ধার্য করা হয় তার সম্প্রদায় বা জাত এর দিকে বিবেচনা করে। তাই সম্ভোগ-অঙ্গের মূল্য নির্ধারণ করা হবে পিতার বংশের মহিলাদের প্রতি লক্ষ্য করে। তবে হা যদি তার মাতা বা খালা পিতৃ বংশের হয়ে থাকেন, তবে স্ত্রীর মহরে মিছিল নির্ধারণে তাদের মহরের বিবেচনা করা হবে। গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উভয়ের মধ্যে মহরে মিছিলের বিবেচনা করা হবে। সুন্দরের দিক থেকে অথবা বয়সের দিক থেকে কিংবা সম্পদের দিক থেকে শহরের দিক থেকে সমসাময়িকতার দিক কিংবা স্থান, ধার্মিকতার কিংবা কুমারিত্বের দিক থেকে বিবেচনা করা হবে।

قوله : وَ صَحَّ ضِمَانُ الْوَلِيِّ الْمَهْرَ الخ : অভিভাবক তথা পিতা যদি তার প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের জন্য তার স্বামীর পক্ষ থেকে মহরের জামিন হয় তাহলে তার এ জামিন হওয়া সহীহ। কেননা, অভিভাবক মালের দায়িত্ব গ্রহণের

যোগ্য। আর যে বস্তুর দিকে দায়িত্বকে যুক্ত করা হয়েছে তাও দায়িত্বযুক্ত করার যোগ্য। কেননা, মহর হচ্ছে ঋণ আর ঋণের বেলায় দায়িত্ব এবং জামিনদারী উভয়টি জায়েয। তাই ওলী কর্তৃক বালেগার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে জামিন হওয়া জায়েয। এখন যেহেতু জামিনদারী জায়েজ হলো তাই স্ত্রী স্বামীর কাছে মহর দাবী করতে পারবে। অথবা ওলীর কাছেও মহর দাবী করতে পারবে। অন্যান্য জামিনদারির ক্ষেত্রেও মালিক ঋণগ্রহীতার কাছে মাল দাবী করতে পারবে। অথবা জামিন ব্যক্তির কাছেও মাল দাবী করতে পারবে।

قوله : وَ لَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطْئِ الخ : আলোচ্য ইবারতের বিশ্লেষণ কল্পে মাসআলাটির কয়েকটি সূরত নিম্নে প্রদত্ত হল। ১। যদি পূর্ণ মহর মুআজ্জল (معجل) হয় এবং স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসও করেনি তবে স্ত্রীর জন্য ক্ষমতা রয়েছে সে তার স্বামীকে পূর্ণ মহর আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস থেকে অথবা স্বামীর সাথে সফরে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করতে পারবে। কেননা বিবাহ হল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমতার আকদ। এখন যেহেতু আকদের মাধ্যমে সম্ভোগ-অঙ্গের মধ্যে স্বামীর হক নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাই স্ত্রীকেও মহর কজা করার অধিকার দিতে হবে। যাতে বদলের ক্ষেত্রে তার হক নির্ধারিত হয়ে যায়। আর ব্যাপারটি ক্রয়-বিক্রয়ের মত হয়ে গেল। অর্থাৎ, যেভাবে বিক্রেতা মূল্য বুঝে পাওয়া পর্যন্ত বিক্রিত বস্তু আটকে রাখার অধিকার রাখে তদ্রূপ স্ত্রী মহর বুঝে পাওয়া পর্যন্ত সম্ভোগ অঙ্গ ব্যবহারে বাধা প্রদান করতে পারে। ২। যদি পূর্ণ মহর মহরে মুআজ্জাল (معجل) হয় এবং স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসও করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রীর জন্য ক্ষমতা রয়েছে সে তার স্বামীকে পুরো মহর আদায় না করা পর্যন্ত বাধা প্রদান করতে পারবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে স্ত্রী আর বাধা প্রদান করতে পারবে না। তবে যদি জুর পূর্বক অথবা স্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয় কিংবা বিকৃত মস্তিস্ক হয় আর এমতাবস্থায় সহবাস করে নেয়, তবে স্ত্রীর বাধা প্রদানের ক্ষমতা রহিত হবে না। অর্থাৎ, সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যদি স্ত্রীর সন্তুষ্টির সাথে সহবাস করে তবে স্ত্রী বাধা দিতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : স্ত্রী স্বামীকে ঐ বস্তু থেকে বারণ করছে যার বিনিময় আছে। কারণ, প্রত্যেক বার সহবাস দ্বারা সম্মানযোগ্য সম্ভোগ অঙ্গের ব্যবহার হয়ে থাকে। এদিকে সম্ভোগ অঙ্গ ব্যবহার করাটা বিনিময় থেকে খালি হয় না। আর ঐ বস্তু থেকে বারণ করা যার বিপরিতে বিনিময় রয়েছে তা থেকে বারণ করা সহিহ। এজন্য স্ত্রী একবার সহবাসের পরও স্বামী মহর আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীকে বারণ করতে পারবে।

৩। যদি পূর্ণ মহর মহরে মুয়াজ্জল (مؤجل) হয় তবে তরফাইন (রহ.) এর মতে স্ত্রী তার স্বামীকে সহবাস থেকে অথবা সফরে নিয়ে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করতে পারবে না। কেননা, স্ত্রী তার মহর বিলম্বিত করে দেওয়াতে নিজের দাবিকে রহিত করে দিয়েছে। আর যেহেতু স্ত্রী তার হককে নিজেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে বিলম্বিত করার মাধ্যমে। তাই স্বামীকে তথা সম্ভোগ অঙ্গ ব্যবহারে বাধা প্রদান করতে পারবে না। তা এমন হল যেমন, বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য ক্রেতাকে বিলম্বে আদায়ের অবকাশ দিলে পরে বিক্রিত বস্তু ক্রেতা থেকে বারণ করতে পারবে না। তদ্রূপ মহর বিলম্বিত করা হলে স্ত্রী তার স্বামীকে বাধা প্রদানের হকদার হবে না। উল্লেখ্য যে, যদি স্বামী পূর্ণ মহর আদায় করে দেয় তবে স্বামীর এখতিয়ার থাকবে যে, স্ত্রীকে যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে অথবা সহবাস করতে। এতে স্ত্রী বারণ করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা—

نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ * اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ·

উক্ত আয়াতদ্বয়ের ভিত্তিতে স্বামী আপন স্ত্রীর সম্ভোগ-অঙ্গ ব্যবহার এবং তাকে যে কোন স্থানে নিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হল। তবে স্বামীর জন্য কর্তব্য যে এতে যেন স্ত্রীর কষ্ট না হয়। কেননা, অপর আয়াতে وَلَاتُضَارُّوهُنَّ এর قيد বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ حُكِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُتْعَةُ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْئِ وَلَوْ فِي اَصْلِ الْمُسَمَّى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَاِنْ مَاتَا وَلَوْ فِي الْقَدْرِ فَالْقَوْلُ لِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ بَعَثَ إِلٰى اِمْرَاَتِهٖ شَيْئًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَالَ هُوَ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهٗ فِي غَيْرِ الْمُهَيَّا لِلْاَكْلِ -

অনুবাদ : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে (সহাবসের পর) মহরের পরিমাণে মতানৈক্য দেখা দিলে মহরে মিছিলের ভিত্তিতে হুকুম আরোপিত হবে। আর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিলে মুতআ এর ভিত্তিতে হুকুম আরোপিত হবে। আর যদি মূল মহর (নির্ধারণে) মতানৈক্য দেখা দেয় তবে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী মৃত্যু বরণ করে আর মহরের পরিমাণে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে স্বামীর উত্তরাধিকারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে কোন কিছু পাঠাল আর স্ত্রী বলল, ইহা উপহার, পক্ষান্তরে স্বামী বলল, ইহা মহর থেকে, তাহলে খাবারের জন্য প্রস্তুত নয় এমন বস্তু হলে স্বামীর কথা গ্রহণীয় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এর বর্ণিত ইবারতে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাটির কয়েকটি দিক রয়েছে। মহর নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে তাদের জীবিতাবস্থায় এ সূরতে হয়ত এ মতানৈক্য সহবাসের পূর্বে হবে অথবা সহবাসের পর হবে। কিংবা মতানৈক্য তাদের উভয়ের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসুরীদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। অথবা তাদের যে কোন একজনের মৃত্যুর পর। এসকল প্রকারে মহরের মূল তথা মূল মহর নির্ধারিত হল কি না এ নিয়ে কিংবা নির্ধারিত মহরের পরিমান নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। ধারাবাহিকভাবে উপরোল্লিখিত সূরতসমূহের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

قوله : وَلَوْ اِخْتَلَفَ فِيْ قَدْرِ الْمَهْرِ الخ : যদি স্বামী স্ত্রী মহরের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য করে বিবাহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, তবে তরফাইন (রহ.)এর মতে মহরে মিছিল কে মানবদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। যদি বাস্তব অবস্থায় স্বামীর দাবী মহরে মিছিল অনুযায়ী হয় তবে স্বামীর দ্বাবী গ্রহণীয় হবে। আর যদি বাস্তব অবস্থায় স্ত্রীর দাবি মহরে মিছিল অনুযায়ী হয় তবে স্ত্রী দাবি গ্রহণীয় হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)এর মতে মতানৈক্য তালাকের পূর্বাপর যখনই হোক না কেন স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে হা যদি স্বামী নিতান্ত অল্প পরিমাণের দাবি করে যা প্রচলিত সমাজের অনুপাতে হয় না তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলীল হল : এখানে স্ত্রী অতিরিক্তের দাবী করছে। আর স্বামী অস্বীকার করছে। আর কায়দা হচ্ছে যে, দাবিদারের নিকট দলীল না থাকা অবস্থায় শপথসহ অস্বীকারকারীর দাবি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আলোচিত মাসআলাতে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া তিনি বলেন, সম্ভোগ-অঙ্গ মূলত মূল্যহীন। কেননা, তা মাল নয়। তবে হা সম্ভোগ-অঙ্গের মর্যাদা প্রকাশ বা বংশধারাকে সামনে রেখে অনিবার্য কারণ বশত সম্ভোগ অঙ্গকে মূল্য বিশিষ্ট ধরা হয়েছে। তাই যতক্ষণ নির্ধারিত মহরকে (যা আসল) ওয়াজিব করা সম্ভব, মহরে মিছিল যা (অনিবার্য কারণবশত সম্ভব) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। তাই তো নির্ধারিত মহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা সহনীয় হচ্ছে।

তরফাইন (রহ.) এর দলীল : مدعى তথা দাবিদারের নিকট যদি দলীল-প্রমাণ না থাকে তবে مدعى عليه তথা যার উপর দাবি পেশ করা হল তার কথা শপথসহ গ্রহণ করা হবে। আর مدعى عليه তাকে বলা হয় যার

কথা বাস্তবের অনুকূলে হয়। আর যেহেতু বিবাহের ক্ষেত্রে মূল ওয়াজিব হচ্ছে মহরে মিছিল, তাই যার কথা মহরে মিছিল অনুযায়ী হবে তার কথাই বাহ্যিক অবস্থার অনুকূলে হবে। এ মাসআলাটি এমন যেমন, রং মিস্ত্রী ও কাপড়ের মালিকের মধ্যে মজুরির পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ হল। তবে এক্ষেত্রে রং এর মূল্যকে মানদন্ড বানানো হবে। সুতরাং যার কথা রং এর মূল্যের অনুকূলে হবে তার কথাই গ্রহণীয় হবে। তদ্রূপ আলোচিত মাসআলায় যার কথা মহরে মিছিলের অনুকূলে হবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَالْمُتْعَةُ لَوْ طَلَّقَهَا الخ : যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার মতানৈক্য সহবাসের পূর্বে তালাকের পর সংগঠিত হয় তবে জামিউল কবিরের ভাষ্য অনুযায়ী এক্ষেত্রে সমপর্যায়ের মুতআকে মানদণ্ড বানানো যাবে যা তরফাইন (রহ.)-এর মতের অনুকূলে। কেননা, তালাকের পূর্বে মহরে মিছিলের মতো তালাকের পরে মুতআ ওয়াজিব হয়ে থাকে, তদ্রূপ এক্ষেত্রে মুতআকে মানদন্ড করা হবে। পক্ষান্তরে জামিউস সাগিরে ও মাবসূতে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতামত হল আলোচিত মাসআলায় অর্ধেক মহরের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَ لَوْ فِى اَصْلِ الْمُسَمّٰى الخ : যদি স্বামী স্ত্রীর জীবদ্দশায় মূল মহর নিয়ে মতানৈক্য করে অর্থাৎ একজন দাবি করে বিবাহের সময় নির্ধারণ হয়েছে আর অপরজন দাবি করে মূল মহর নির্ধারণ করা হয়নি। তবে অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সকলের মতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। তরফাইন (রহ.) এর মতে যেহেতু মহরের ক্ষেত্রে মহরে মিছিলই হল আসল, তাই তা নির্ধারণ করা হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মহর এর আসল হল নির্ধারিত মহর। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু নির্ধারিত মহরকে প্রযোজ্য করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই মহরে মিছিলের হুকুম প্রদান করা হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার এ মতানৈক্য সহবাসের পূর্বে তালাকের পরে হয়ে থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে মুতআ ওয়াজিব হবে।

قوله : وَ اِنْ مَاتَا وَ لَوْ فِى الْقَدْرِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) তৃতীয় সূরত তথা যদি স্বামী স্ত্রী যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে তবে তার কি ফায়সালা এ নিয়ে আলোচনা করেননি। কেননা, যে কোন একজন মৃত্যু বরণ করলে আর মতানৈক্য দেখা দিলে উভয়ের জীবদ্দশায় যে ফায়সালা হয় তা-ই হবে। প্রয়োজনের তাগিদে আমরা এখানে সে সূরতটি উল্লেখ করলাম।

তা হল স্বামী স্ত্রী থেকে যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে এবং অপর জনের ওয়ারিশদের সাথে মতানৈক্য দেখা দেয়, আর তা মহরের পরিমাণ নিয়ে হয় তবে তরফাইন (রহ.) এর মতামত হল, এক্ষেত্রে মহরে মিছিল মানদন্ড হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মূল মহর নির্ধারিত হল কিনা এ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

গ্রন্থকার (রহ.) এর বর্ণিত মাসআলা হল, যদি এ মতানৈক্য স্বামী স্ত্রী উভয়ের মৃত্যুর পর সংগঠিত হয় তবে ইহার ও দু' সুরত রয়েছে। মতানৈক্য মহরের পরিমাণ নিয়ে হবে অথবা মূল মহর নিয়ে। যদি উত্তরাধিকারের মধ্যে মহরের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্বামীর উত্তরাধিকারদের কথা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তারা যদি এমন অল্পের দাবি করে যা প্রচলিত সমাজের পরিপন্থী তবে তাদের কথা গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে জীবদ্দশায় যে হুকুম প্রদান করা হয়ে ছিল সে হুকুম মৃত্যুর পরও হবে। তিনি মৃত্যুর পরের সুরতকে জীবদ্দশার উপর কিয়াস করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : স্বামীর ওয়ারিশগণ অধিক মহরের অস্বীকারকারী। আর সাক্ষ না থাকার সুরতে অস্বীকারকারীর কথা শপথসহ গ্রহণ করতে হয়। তাই স্বামীর উত্তরাধিকারদের কথা গ্রহণযোগ্য। আর যদি মতানৈক্য দেখা দেয় স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকারদের মধ্যে মূল মহর নির্ধারণ নিয়ে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রীর উত্তরাধিকারগণ স্বামীর উত্তরাধিকারদের থেকে কিছুই প্রাপ্ত হবে না। সাহেবাই

(রহ.) এর মতে ঐ সুরতে মহরে মিছিলের ফায়সালা করা হবে। ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এ মতের প্রবক্তা। আর ইহার উপরই ফাতওয়া। তবে সামান্য প্রভেদ এই যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে শপথসহ মহরে মিছিল ওয়াজিব। আর সাহাবাইন (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে শপথ গ্রহণ ওয়াজিব নয়।

তাদের দলীল হল : যেভাবে নির্ধারিত মহর স্বামীর জিম্মায় ঋণ তদ্রূপ মহরে মিছিলও স্বামীর জিম্মায় ঋণ। তাই যেভাবে নির্ধারিত মহর মৃত্যুর কারণে রহিত হয় না তদ্রূপ মহরে মিছিলও মৃত্যুর কারণে রহিত হবে না। তাছাড়া তারা বলেন, যেভাবে দুজনের একজনের মৃত্যুর সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ উভয়জনের মৃত্যুতেও মহরে মিছিল অগ্রাহ্য হয় না। তদ্রূপ যে কোন একজনের মৃত্যুতেও মহরে মিছিল অগ্রাহ্য হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল, স্বামী স্ত্রী উভয়ের মৃত্যুর দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, তাদের সমসাময়িক লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাই কাজী তার সমসাময়িক কাউকে না পেলে কাদের সাথে তুলনা করে মহরে মিছিল নির্ধারণ করবেন। তাই যখন মহরে মিছিল নির্ধারণ করা গেল না তাই তা ওয়াজিবও হবে না।

قوله : وَمَنْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا الخ : যদি স্বামী আপন স্ত্রীর নিকট কোন বস্তুসমগ্রী প্রেরণ করে আর স্বামী বলে তা মহর হিসাবে প্রেরীত আর স্ত্রী বলে ইহা হাদিয়া, তবে এক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামী মূল মালিক বানানেওয়ালা। সুতরাং সেই অধিক জ্ঞাত সে তা হাদিয়া স্বরূপ নাকি মহর স্বরূপ স্ত্রীকে মালিক বানালো। তাছাড়া বাস্তব অবস্থাও স্বামীর পক্ষে প্রমাণবহ। কেননা, যখন মহর আদায় করা যা তার জিম্মায় ওয়াজিব আর হাদিয়া প্রদান করা যা তার জিম্মায় ওয়াজিব নয়। সুতরাং যা তার জিম্মায় আবশ্যকীয় তাই প্রথমত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। তাই স্বামীর কথা গ্রহণ করতে হবে। তবে হা যদি স্বামী খাদ্যদ্রব্য জাতীয় বস্তু প্রেরণ করে যেমন ভূনা গোস্ত পাকানো খানা অর্থাৎ, যা দীর্ঘ সময় বা দিন ধরে রাখা যায় না, তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রহণীয় হবে। কেননা, সচরাচর এইগুলো হাদিয়া স্বরূপই প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

وَلَوْ نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً بِمَيْتَةٍ أَوْ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَذَا جَائِزٌ عِنْدَهُم فَوُطِئَتْ أَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَكَذَا الْحَرْبِيَّانِ ثَمَّهُ وَلَوْ تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَيْنٍ فَأَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا لَهَا الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ وَفِي غَيْرِ الْعَيْنِ لَهَا قِيمَةُ الْخَمْرِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْخِنْزِيرِ

অনুবাদ : যদি (কোন যিম্মী) যিম্মীয়াকে মৃত প্রাণীর বিনিময়ে কিংবা মহর নেই এর উপর বিবাহ করে আর তা তাদের ধর্মে জায়িজ থাকে অতঃপর সহবাস করে কিংবা সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রীর জন্য কোন মহর নেই। এরূপ হুকুম যদি দুই হরবী দারুল হরবে এভাবে বিবাহ করে। আর যদি কোন যিম্মী অপর যিম্মিয়াকে (নারী)কে নির্দিষ্ট মদ, কিংবা নির্দিষ্ট শুকরের বিনিময়ে বিবাহ করে অতঃপর উভয়জন ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা একজন ইসলাম গ্রহণ করে তবে স্ত্রী (নির্দিষ্ট মদের ক্ষেত্রে) মদ এবং (নির্দিষ্ট শুকরের ক্ষেত্রে) শুকর (মহর হিসাবে) পাবে। আর (মদ ও শুকর) অনির্দিষ্ট হওয়ার বেলায় মদের মূল্য আর শুকরের ক্ষেত্রে মহরে মিছিল স্ত্রী পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَوْ نَكَحَ ذِمِّيَّةً الخ : মুসলমান যেহেতু নির্ধারিত নীতিমালার আওতাধীন, তাই মুসলমানদের সর্ব বিষয়াবলী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আবার কাফেররা যেহেতু মুআমালাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুবর্তী তাই তাদের আংশিক আলোচনা করা হয়। সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বিবাহ যেহেতু মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত তাই এখানে কাফেরদের সাথে সম্পর্কিত বিবাহের আহকাম বর্ণনা করেছেন।

সুরতে মাসআলা হল : যদি কোন জিম্মী অপর জিম্মিয়া (মুসলমান রাষ্টে কর দিয়ে নির্দিষ্ট চুক্তির ভেতর দিয়ে বসবাসকারী কাফের কাফেরাকে জিম্মি জিম্মিয়া বলে) কে বিবাহ করে আর তার মহর নির্ধারণ করে কোন মৃত প্রাণী অথবা মহর ছাড়াই বিবাহ করল। এদিকে তাদের ধর্মে তা জায়িয। সুতরাং উভয় সুরতে স্ত্রী মহর পাবে কি না এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রী মহর পাবে না। সাহাবাইন (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে স্ত্রী মহরে মিছিল পাবে। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল হল : শরীঅত মাল সহ বিবাহ সংঘটনকে বৈধ করেছে। কেননা, মহান আল্লাহ কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন— أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ আর শরীঅত সবার জন্য কেননা, আল্লাহর রাসূল সবার জন্য আগমন করেছেন। তাছাড়া এ শরীঅত পূর্বকার সকল ধর্মকে রহিত করে দিয়েছে। আমাদের শরীঅত সবার জন্য ব্যাপক তাই তার হুকুমও ব্যাপক হবে। এজন্য যেভাবে মৃত প্রাণীকে মহর নির্ধারণ অথবা মহর নেই একথার উপর বিবাহ মুসলমানের মাঝে সংগঠিত হলে মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়, তদ্রূপ জিম্মী জিম্মিয়ার এ পরিস্থিতিতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হল, আমরা একথা গ্রহণ করি না যে, জিম্মীরা মুআমালাতের ক্ষেত্রে আমাদের সমপর্যায়ের। কেননা, জিম্মীরা তাদের চুক্তির কারণে দিয়ানত তথা নামাজ রোযা পালনে যেভাবে আমাদের মত নয়, তদ্রূপ ঐ সকল মুআমালাতেও তারা আমাদের মত নয়। যাহা তাদের ধর্মমতে বিশুদ্ধ। যেমন মদ পান ও তার ক্রয়-বিক্রয়। বিনা সাক্ষিতে বিবাহ সংগঠিত হওয়া তদ্রূপ বিনা মহরে তাদের ধর্মমতে বিবাহ জায়েয তাই এহেন পরিস্থিতিতে স্ত্রী মহর পাবে না। সাহাবাইন (রহ.)-এর দলীলের জবাব হল, বিধান প্রয়োগের কর্তৃত্ব অর্জিত হয় তলওয়ার প্রয়োগ করা কিংবা যুক্তিপ্রমাণে বাধ্য করার দ্বারা। অথচ চুক্তির কারণে জিম্মীদের বেলায় এগুলো অনুপস্থিত। তাইতো আমাদের নির্দেশ করা হয়েছে তাদেরকে তাদের ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সুতরাং জিম্মীদেরকে আমাদের দিয়ানতদারী বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের সমকক্ষ করা চলবে না।

قوله : وَ لَوْ تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً بِخَمْرٍ الخ : যদি কোন জিম্মী কোন জিম্মিয়াকে নির্দিষ্ট মদ বা নির্দিষ্ট শুকরের বিনিময়ে বিবাহ করে অতঃপর উভয় কিংবা যে কোন একজন মুসলমান হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রী নির্দিষ্ট মদ বা নির্দিষ্ট শুকর পাবে আর যদি মদ অনির্দিষ্ট হয় কিংবা শুকর অনির্দিষ্ট হয় তবে মদের ক্ষেত্রে তার মূল্য ওয়াজিব হবে আর অনির্দিষ্ট মদের ক্ষেত্রে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে নির্ধারিত আর অনির্ধারিত উভয় সুরতে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে উভয় সুরতে সে মূল্য পাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতামত যেহেতু একটি বিষয়ে একমত সে হুবহু মদ বা শুকর ওয়াজিব হবে না। এজন্য তাদের দলীল একত্রে বর্ণনা করা যায়। যেমনটি হিদায়া গ্রন্থকার করেছেন। সুতরাং তাদের দলীল হল : কবজ নির্দিষ্ট কবজকৃত বস্তুর মাঝে মালিকানা সংহত করে। তাই তা মূল আকদের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ হলো। তাই উভয়টি অনির্ধারিত হলে সে হুকুম হয় নির্ধারিত হলে তেমনি হবে। সারকথা, কবজ এর অবস্থা যখন আকদের অবস্থার সাথে যুক্ত হলো তখন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, আকদের সময় উভয় মুসলমান হলে এবং এধরনের বস্তু মহর নির্ধারণ করলে মহলে মিছিল ওয়াজিব হয় বিধায় এখানেও মহলে মিছিল ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলীল হল : নাম উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, এগুলো তাদের ধর্মে মহর ধার্য করা সহীহ। কিন্তু ইসলামের কারণে এগুলো অর্পণ করা নিষিদ্ধ তাই মূল্য ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হলো : আকদের দ্বারা নির্ধারিত মহরের ক্ষেত্রে মালিকানা সাবেত হয়ে যায় আর মালিকানা দুপ্রকার : ১। جنس তথা জাতের মালিকানা ২। ব্যবহারের মালিকানা। স্ত্রীর জন্য কবজ এর পূর্বে উভয় মালিকানা সাবেত। তাইতো স্ত্রী কবজ করার পূর্বে তার মধ্যে ইচ্ছাকৃত ব্যবহার করতে পারবে। যদি কবজ করার পূর্বে অনির্ধারিত মহরটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে স্বামীর মালিকানায় ধ্বংস হবে না বরং স্ত্রীর মালিকানায় ধ্বংস হবে। আর স্ত্রীর কবজ দ্বারা মালিকানা স্বামীর জিম্মা থেকে স্ত্রীর মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। আর এ মালিকানা ইসলামের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তাই নির্ধারিত ক্ষেত্রে স্ত্রী মদ বা শুকর প্রাপ্ত হবে। আর অনির্ধারিত ক্ষেত্রে মদের বেলায় মূল্য আর শুকরের বেলায় মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ

পরিচ্ছেদ : দাসের বিবাহ

لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ والْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَلَوْ نَكَحَ عَبْدٌ بِإِذْنِهِ بِيعَ فِي مَهْرِهَا وَسَعَى الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُبَعْ فِيهِ وَطَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً إِجَازَةٌ لِلنِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ لَا طَلِّقْهَا أَو فَارِقْهَا وَالْاِذْنُ فِي النِّكَاحِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ اَيْضًا -

অনুবাদ : মুনিবের অনুমতি ভিন্ন উম্মে ওয়ালাদ মুদাব্বার, মুকাতাব দাসী এবং দাসের বিবাহ জায়েয নয়। যদি দাস মুনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে তবে স্ত্রীর মহরের জন্য তাকে বিক্রয় করা যাবে। মুদাব্বার ও মুকাতাব মজুরী করবে। তাদের এ জন্য বিক্রয় করা যাবে না। (মুনিবের অনুমতি ছাড়া দাসের) স্থগিত বিবাহের ক্ষেত্রে (মুনিবের উক্তি) طلقها رجعية (তাকে তালাকে রেজয়ী দাও) বিবাহ (বিশুদ্ধ হওয়া) এর জন্য অনুমতি স্বরূপ। তবে (মুনিবের উক্তি) তাকে তালাক দাও। কিংবা তাকে পরিত্যাগ কর (বিবাহের) অনুমতি স্বরূপ নয়। (মুনিবের) বিবাহের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গ নিকাহে ফাসেদকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

গ্রন্থকার (রহ.) এ পরিচ্ছেদে ক্রীতদাসের বিবাহের বিবরণ বর্ণনা করতেছেন। বিবাহ করার উপযুক্ততা সম্পর্কিত আহকাম-সমূহ আলোচনা করার পর গ্রন্থকার (রহ.) যাদের বিবাহ করার উপযুক্ততা নেই তাদের বিধান সম্বন্ধে বর্ণনা শুরু করতেছেন। তাছাড়া যেহেতু দাসত্ব কুফরের লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, কেননা প্রথমত কাফেরকে দাস বানানো হয়, মুসলমানকে নয়। তাই তাদের আলোচনা পরবর্তীতে আনা হয়েছে। এদিকে যেহেতু মহর দাস-দাসীকে রাখা যায় তাই মহরের আলোচনার পর গ্রন্থকার (রহ.) দাস-দাসীকে বিবাহের আলোচনায় পেশ করতেছেন।

শব্দার্থ : رَقِيْقٌ (ج) اَرِقَّاءُ দাস, ক্রীতদাস, অধিনস্থ।

قوله : لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَ الْاَمَةِ الخ : মনিবের অনুমতি ছাড়া দাস-দাসীর বিবাহ ফাসিদ ইহা আল্লামা হাফিজুদ্দীন (রহ.) এর মতামত। তবে বিশুদ্ধ মত হল যে, মুনিবের অনুমতি ছাড়া দাস-দাসীর বিবাহ জায়েয, অকার্যকর তথা মুনিবের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। ইহা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইব্রাহীম নাখয়ী (রহ.) প্রমুখদের অভিমত। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে দাসের বিবাহ মুনিবের অনুমতি ছাড়া জায়েয। তার দলীল হল : দাস তালাকের অধিকারী আর যে তালাকের অধিকারী সে বিবাহের ও অধিকারী। কেননা, তালাকের অস্তিত্বই হল নিকাহের কারণে। দলীলটি এভাবে বলা যাবে যে, গোলাম তালাকের মালিক। আর তালাক বলা হয় বিবাহ দূর করাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন জিনিস দূর করার মালিক হল সে এই বস্তুও করার মালিক হবে। তাই গোলাম বিবাহেরও মালিক হবে।

হানাফীগণের দলীল হল : হযরত জাবির (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস— اَيُّمَا عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ - অর্থাৎ, কোন গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ কার্যকর হয় না, তাছাড়া তাদের বিবাহ কার্যকর করাতে তাদের মধ্যে খুঁত যুক্ত হয়ে যায়। কেননা, দাসও দাসীর ক্ষেত্রে বিবাহ হল খুঁত।

এদিকে মনিবের হক হিসাবে দাস-দাসী তারা তাদের নিজেদের খুঁত যুক্ত করতে পারবে না। তবে হা যদি মুনিব অনুমতি প্রদান করে তবে ভিন্ন কথা। ইমাম মালেক (রহ.) এর দলীলের জবাব হল : গোলাম স্ত্রীকে তালাক প্রদানের দ্বারা খুঁত দূর করতে পারে। একথা ইহা আবশ্যক করে না যে সে খুঁত সৃষ্টি করতে পারবে।

قوله : وَ الْمُكَاتَبِ وَ الْمُدَبَّرِ الخ : মুকাতাব, মুদাব্বার ও উম্মেওয়ালাদ এর বিবাহ মুনিবের অনুমতি ছাড়া সহীহ (কার্যকর) হবে না। কেননা, গোলাম সকল অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বাধাপ্রাপ্ত। তবে কিতাবাতের চুক্তির কারণে সে উপকার লাভের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত। যাতে উপার্যন করতঃ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে সে অধিকার প্রাপ্ত হল না। কেননা, এতে তো কোন উপকার নেই; বরং তার উপর স্ত্রীর মহর খোরপোশ ইত্যাদি আবশ্যক হল। তাই এতে তার কোন উপকার নেই, বরং ক্ষতি সাধিত হল। সুতরাং মুকাতাব কিতাবাতের পূর্বে যেভাবে গোলাম ছিল কিতাবাতের পরও গোলাম থাকবে। তাই মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ কার্যকর হবে না। উম্মে ওয়ালাদ মুদাব্বার এর একই হুকুম।

قوله : فَلَوْ نَكَحَ عَبْدٌ بِاِذْنِهِ الخ : যদি গোলাম মুনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে তবে স্ত্রীর মহর গোলামের উপরই ওয়াজিব হবে। মহর আদায়ের জন্য গোলামকে বিক্রি করা হবে। আর যদি এ বিক্রিত টাকা দ্বারা মহর আদায় পূর্ণ হয় না। তবে অবশিষ্ট মহর আদায়ের জন্য গোলামকে দ্বিতীয় বার বিক্রি করা যাবে না; বরং এঋণ গোলাম আজাদ হওয়ার পর আদায় করতে হবে। দলীল হল : ইহা একটি ঋণ যা গোলামের উপরই ওয়াজিব হয়েছে। আর প্রত্যেক ঐ ঋণ যা গোলামের উপর আবশ্যকীয় হয় তা আদায়ের জন্য গোলামকে বিক্রি করা যায়। তাই এ ক্ষেত্রে তার ঋণ (মহর) আদায়ের জন্য গোলামকে বিক্রি করা যাবে।

قوله : وَ سَعَى الْمُدَبَّرُ الخ : যদি মুকাতাব কিংবা মুদাব্বার তার মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে তবে সে মহর নিজ সঞ্চয় থেকে আদায় করবে। তাকে বিক্রিয় করা যাবে না। অর্থাৎ, মুকাতাব কিংবা মুদাব্বার সে উপার্জন করবে এবং তার উপার্জিত অর্থ দ্বারা মহর আদায় করবে। মহর ঋণ আদায় করার জন্য তাকে বিক্রয় করা যাবে না। কেননা, মুকাতাব কিংবা মুদাব্বার থাকা অবস্থায় এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় স্থানান্তর করা যাবে না। তাই তাদেরকে অন্য মালিকের নিকট বিক্রয় করা যাবে না।

قوله : وَ طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً الخ : যদি কোন গোলাম তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, অতঃপর মুনিবের অবগতির পর মুনিব বলে طلقها رجعية তাকে (স্ত্রী)কে তালাকে রেজয়ী দাও। তবে ইহা মুনিবের পক্ষ থেকে

অনুমতি স্বরূপ গণ্য হবে। কেননা, মুনিব তার গোলামকে তালাকে রাজয়ী দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। আর তালাকে রেজয়ী বিবাহ সহীহ হওয়ার হুকুম দিয়েছে। আর তালাকে রেজয়ী বিবাহ সহীহ হওয়ার পরই হয়ে থাকে। তাই মুনিবের এ হুকুম দ্বারা প্রমাণিত হল যে সে গোলামের বিবাহকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছে। যা মুনিবের অনুমতির উপর স্থগিত ছিল।

তবে হা যদি মুনিব বলে فَارِقْهَا اَوْ طَلِّقْهَا তাকে তালাক দাও বা তাকে পরিত্যাগ কর। তবে এটি মুনিবের পক্ষ থেকে বিবাহের অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে না। মুনিবের এরকম কথার মধ্যে যেভাবে নিকাহের অনুমতির সম্ভাবনা রয়েছে তদ্রূপ নিকাহের প্রত্যাখ্যানেরও সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকার দরুন আমরা প্রত্যাখ্যানের বা অনুমতি না দেয়ার দিকটাকে গ্রহণ করেছি। তার কারণ হচ্ছে মুনিবের অনুমতির অপেক্ষা না করে গোলাম বিবাহ করাতে সে অবাধ্য ও নাফরমান হল। আর এমন অবাধ্য নাফরমান গোলামের ক্ষেত্রে উচিত হল তার কৃতকর্মকে গ্রহণ না করা বরং প্রত্যাখ্যান করা। তাছাড়া এজন্য যে প্রত্যাখ্যান এর দিকটা গ্রহণ করা অধিক নিকটবর্তী। কেননা, প্রত্যাখ্যান হল দূর করা, আর তালাক হল নিকাহ হওয়ার পর দূর করা। আর দূর করার তুলনায় প্রত্যাখ্যান সহজ। তাই প্রত্যাখ্যান এর দিকটা গ্রহণ করা অধিক উত্তম ও সমীচিন।

وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدًا مَأْذُونًا له امْرَأَةً صَحَّ هِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْوِيتُهَا فَتَخْدِمُهُ وَيَطَؤُهَا الزَّوْجُ إِنْ ظَفِرَ بِهَا وَلَهُ إِجْبَارُهُمَا على النِّكَاحِ وَيَسْقُطُ الْمَهر بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ قبل الْوَطْءِ لَا بِقَتْلِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا قَبْلَهُ وَالْاِذْنُ فِي الْعَزْلِ لِسَيِّدِ الْاَمَةِ -

---

অনুবাদ : যদি মুনিব তার (ব্যবসায়ের) অনুমতি প্রাপ্ত গোলামকে কোন মহিলার সাথে বিবাহ দেয় তবে সহীহ হবে। স্ত্রী মহর আদায়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের সম অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি তার দাসীকে বিবাহ দিল তবে (স্বামীর সাথে) রাত্রি যাপন করানো তার উপর আবশ্যক নয়। বরং দাসী মুনিবের খেদমত করবে। স্বামী সহবাস করবে যদি সুযোগ পেয়ে থাকে, মুনিব তার দাস-দাসীকে বিবাহে বাধ্য করতে পারবে। (স্বামীর সাথে) সহবাসের পূর্বে মুনিব তার দাসীকে হত্যা করাতে মহর বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে সহবাসের পূর্বে স্বাধীনা স্ত্রী লোকের আত্মহত্যা মহরকে রহিত করে না। আজলের ক্ষেত্রে অনুমতি দাসীর মুনিবের সাথে সম্পৃক্ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

مَأْذُونًا - ইহা اسم مفعول واحد مذكر এর সিগা। অর্থ- অনুমতি প্রাপ্ত। اَذِنَ (س) - اَلْاِذْنُ অনুমতি দেয়া, হুকুম দেয়া আদেশ দেয়া। عَبْدٌ مَأْذُونٌ দ্বারা উদ্দেশ্য যার মুনিবের পক্ষ থেকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত। أُسْوَةٌ - সমান সমান, সমঅধিকার। اَلْغُرَمَاءُ ইহা غَرِيْمٌ এর বহু বচন। অর্থ- ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, প্রতিপক্ষ। تَبْوِيْتٌ - تفعيل - রাত্রি যাপন করা। ظَفِرَ (س) ظَفْرًا - সফল হওয়া, বিজয়ী হওয়া, সুযোগ পাওয়া। اَلْعَزْلُ - আলাদা করণ, অপসারণ, (যৌন মিলনে) বীর্য প্রত্যাহার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَوْ زَوَّجَ عَبْدًا مَأْذُونًا - মুনিব তার ঋণগ্রস্ত ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত গোলামকে মহরে মিছিলের

বিনিময়ে বিবাহ দিল। তবে তার এ বিবাহ জায়েয আর স্ত্রী অন্যান্য পাওনাদারদের ন্যায় মহর আদায়ে সমঅধিকারী হবে। যেমন গোলাম চার হাজার টাকায় বিক্রি হল। পাওনাদার তিনজন যারা প্রত্যেকেই দুই হাজার টাকা করে পাবে, আর চতুর্থ নম্বার পাওনাদার স্ত্রী তার মহর হল দুই হাজার টাকা।

সুতরাং প্রত্যেক তথা চার পাওনাদার নিজ নিজ প্রাপ্য হিসাবে মোট বিক্রিত টাকার এক চতুর্থাংশ তথা এক হাজার টাকা করে প্রাপ্ত হবে। বাকী টাকা গোলাম আজাদ হওয়ার পর পরিশোধ করবে।

قوله : وَ مَنْ تَزَوَّجَ اَمَتَهُ الخ : تَبْوِيَةٌ বলা হয় দাসীকে তার স্বামীর কাছে দিয়ে দেয়া এবং দাসী থেকে মুনিবের খেদমত ছেড়ে দেয়া। আর যদি স্বামীর নিকট আসা যাওয়া করে আর মুনিবেরও খেদমত করে তবে ইহাকে تبوية বলা যাবে না। সুরতে মাসআলা হল : মনিব তার দাসীকে অন্যত্র বিবাহ দেয়া জায়েয। তবে উপরোল্লিখিত تبوية তথা মনিব তার হক ছেড়ে দিয়ে শুধু স্বামীর নিকট অর্পণ করা মনিবের উপর ওয়াজিব নয়, এমতাবস্থায় দাসী তার মনিবের খেদমত করবে আর স্বামীকে বলা হবে যখন সুযোগ পাবে তখন সে মিলিত হবে। কেননা, দাসী থেকে মনিব খেদমত গ্রহণ করার হকদার। তার এ হক অন্যত্র বিবাহ দেয়ার কারণে রহিত হবে না। কারণ, মনিবের হক হল শক্তিশালী ও উন্নত। তাই উন্নত ও শক্তিশালী হক নিচু-নিম্নমানের দ্বারা রহিত করা যায় না। তাই আমরা বলি যে, মনিবের উপর تبوية ওাজিব নয়। এবার প্রশ্ন জাগে যে ঐ দাসীর খোরপোশ ও থাকার ব্যবস্থা কার উপর? মনিবের উপর নাকি স্বামীর উপর। এ প্রশ্নের উত্তর হল : যদি মনিব তার দাসীকে স্বামীর সাথে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে অর্থাৎ, রাতে পৃথক স্থানে স্বামীর সাথে অবস্থানের অনমুতি প্রদান করে তবে তার খোরপোশও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জিম্মায় অর্পিত হবে। আর যদি দাসীকে এভাবে তার স্বামীর সাথে পৃথক স্থানে অবস্থানের অনুমতি না দেয়, তবে দাসীর খোরপোশ ও থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া মনিবের উপর আবশ্যক। কেননা, খোরপোশ ও থাকার ব্যবস্থা করা হল আবদ্ধ রাখার বিনিময়। সুতরাং যিনি আবদ্ধ রাখবেন তার উপরই খোরপোশ ও থাকার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হবে। উল্লেখ্য যে, যদি মনিব تبوية এর অনুমতি দিয়ে থাকে অতঃপর যদি সে তার দাসীকে তার খিদমতে ফিরিয়ে আনতে চায় তবে মনিবের এ অধিকার থাকবে। যদি দ্বিতীয় বার ফিরিয়ে আসে তবে স্বামীর উপর থেকে খোরপোশও থাকার ব্যবস্থা করা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তা মনিবের দিকে স্থানান্তরিত হবে।

قوله : وَ لَهُ اِجْبَارُهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الخ : মনিব তার দাস-দাসীকে বিবাহে বাধ্য করতে পারে। বাধ্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল যদি তাদের সম্মতি ছাড়াও তাদের বিবাহ দিয়ে দেয় তবে তা কার্যকর হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতামত হল মনিব তার দাসকে বিবাহে বাধ্য করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে এমন একটি দুর্বল বর্ণনা রয়েছে যা ইমাম তাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তবে এটি شاذ -। মোটকথা, মনিব তার দাসীকে বিবাহে বাধ্য করতে পারবে। অর্থাৎ, তার সম্মতি ছাড়াও বিবাহ দিতে পারবে। এতে সকলে একমত। পক্ষান্তরে দাসকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারবে কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য হল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে বিবাহ দিতে পারবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে বিবাহ দিতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল হল : বিবাহ হল মানবীয় বৈশিষ্ট্যের একটি বৈশিষ্ট্য। গোলাম মনিবের কর্তৃত্বাধীন হয়েছে মাল হিসাবে। মানুষ হিসাবে নয়। তাই সে তার বিবাহের অভিভাবকত্বের মালিক হবে না। অর্থাৎ, বিবাহ যে জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে মনিব সে বিষয়ের মালিক নয়। তাই তার বিবাহ দেয়াতে মনিব এমন বস্তুর উপর হস্তক্ষেপ করল যে বস্তুর সে মালিক নয়। তাই তার বিবাহ দেয়া এমন হল যেমন অপরিচিত একজনের বিবাহ দেয়া। তাছাড়া গোলামের বিবাহ তার অনুমতি ছাড়া দেয়া অনুপযোগী। কেননা, গোলাম যে কোন সময় তালাক প্রদানের মাধ্যমে তা ভঙ্গ করতে পারে।

আমাদের দলীল : বিবাহ করানো এর অর্থ হল নিজের মালিকানাধীন বস্তুর সংশোধন করা। কেননা, বিবাহ দ্বারা নিজ গোলামকে ব্যাভিচার থেকে রক্ষা করা হয় যা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণও হতে পারে। কেননা, হদ দ্বারা কখন ধ্বংসও হতে পারে আবার কখনো ক্ষত-বিক্ষতও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় মাল ধ্বংস হয় আর দ্বিতীয় অবস্থায় মালের মূল্য হ্রাস হয়ে যায়। সুতরাং মনিব তার গোলামকে রক্ষা করার জন্য তার অনুমতি ছাড়া তাকে বিবাহ করাতে পারে। তাছাড়া যেভাবে দাসীকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারে তার দাসত্বের মালিক হওয়াতে তদ্রূপ দাসকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারবে। সুতরাং আর মতানৈক্য রইল না। তাইতো মুকাতাবকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে বিবাহ হবে না। কারণ, তারা কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের মালিকানা হিসাবে স্বাধীনদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে।

قوله : وَ يَسْقُطُ الْمَهْرُ الخ : যদি কোন মনিব তার দাসীকে বিবাহ দেয় অতঃপর সহবাসের পূর্বে থাকে হত্যা করে ফেলে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। সাহাবাইন (রহ.) এমন হত্যাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, যদি সহবাসের পূর্ব (দাসী) স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে অথবা মনিব ভিন্ন অন্য কেহ হত্যা করে তবুও স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হয়। সুতরাং এখানেও মহর ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : অর্পণ করার পূর্বেই বিনিময় কৃত জিনিসটিকে (সম্ভোগ অঙ্গকে) মনিব আটকে রেখেছে। সুতরাং তার বিনিময় (মহর) ও আটকে রাখা হবে। ইহা এমন হল যেমন স্বাধীন নারী মুরতাদ্দ হয়ে গেল যার দ্বারা সে বিনিময়কৃত বস্তু তথা সম্ভোগ অঙ্গকে আটকে রাখল তবে এ মুরতাদ্দার মহরকে আটকে রাখা হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিলের জবাব : যদি হত্যা দ্বারা নির্ধারিত সময়েই তার মৃত্যু হয় তথাপি দুনিয়ার বিচারে তাকে বিনষ্ট করা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাই সেচ্ছায় হত্যার বদলা কিছাছ আর অনিচ্ছায় হত্যার বদলা দিয়াত ওয়াজিব করা হয়েছে। তবে মনিবের ক্ষেত্রে কিছাছ কিংবা দিয়াত কোনটাই ওয়াজিব হবে না। কেননা, কিছাছ বা দিয়াত তারই জন্য ওয়াজিব হওয়া আবশ্যক হবে। তবে মনিবের গুনা হবে। সুতরাং যেভাবে হত্যাকে কিসাস এবং দিয়াতের ক্ষেত্রে নষ্ট করা গণ্য করা হয়েছে। তদ্রূপ মহরের ক্ষেত্রেও নষ্ট করা হিসাবে গণ্য করা হবে। যেন মনিব অর্পণ করার পূর্বে বিনিময় কৃত বস্তু নষ্ট করে দিয়েছে। তাই তার বিনিময় তথা মহর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

قوله : لَابِقَتْلِ الْحُرَّةِ الخ : তবে যদি স্বাধীন মহিলা সহবাসের পূর্বে নিজে আত্মহত্যা করে তবে তার মহর রহিত হবে না; বরং স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে মহর রহিত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও এ মত ব্যক্ত করেন। তারা এরূপ আত্মহত্যা করাকে মুরতাদ্দাহ হওয়ার উপর কিয়াস করেন। যেভাবে মুরতাদ্দ হওয়া তার জিনের কর্ম তেমনি আত্মহত্যা করাও তার নিজের কর্ম সুতরাং মুরতাদ্দ হওয়াতে যেরূপ মহর রহিত হয়ে যায় তদ্রূপ আত্মহত্যা দ্বারাও মহর রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া মুনিবের হত্যার কারণে যেরূপ মহর রহিত হয়ে যায় তদ্রূপ আত্মহত্যার দরুন ও মহর রহিত হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল : মানুষ তার নিজের উপর অপরাধ করা ইহা দুনিয়ার বিধানে ধর্তব্য নয়। যদিও আখেরাতে পাকড়াও হবে। তাই আত্মহত্যা দুনিয়ার বিচারে স্বাভাবিক মৃত্যুর সাদৃশ্য হল। সুতরাং যেভাবে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মহর ওয়াজিব হয় তদ্রূপ আত্মহত্যার পরও মহর ওয়াজিব হবে। তবে হা স্বাধীন স্ত্রীর বিষয়টি এর বিপরিত। কেননা, দুনিয়ার বিচারে মুরতাদ্দ হওয়া বিচারাধিন থাকে, যেমন স্বাধীন স্ত্রী মুরতাদ্দ হওয়ার দরুন তাকে আটক রাখা হয় শাস্তি দেয়া হয়, বিবাহ স্থগিত রাখা হয়। তাই মুরতাদ্দ হওয়ার দরুন মহর বিলুপ্ত হয়ে যায়, মনিবের হত্যা করার বিষয়টি এর বিপরীত কেননা, মনিব ভুলক্রমে হত্যা করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত এ দু' সুরতের উপর কিয়াস করা যাবে না।

قوله : اَلْاِذْنُ فِى الْعَزْلِ : এর অর্থ স্ত্রীলিঙ্গের বাইরে শুক্র ক্ষয় করা। জমহুর ফকিহদের মতে আজল বলা হয় : هُوَ نَزْعُ الذَّكَرِ مِنَ الْفَرَجِ عِنْدَ الْاِنْزَالِ বীর্য নির্গতের মুহূর্তে স্ত্রীর লিঙ্গ হতে পুরুষের লিঙ্গ বের করে বীর্য বাইরে ফেলা। আজল করা জায়িয নাকি নাজায়িয এ হিসাবে মূলত আজল তিন ভাগে বিভক্ত।

১। স্বীয় দাসীর সাথে আজল, তার সাথে আজল করার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।

২। স্বাধীন স্ত্রীর সাথে আজল করা। তার সাথে আজল করার জন্য তার অনুমতির প্রয়োজন আছে।

৩। বিবাহিত দাসীর সাথে আজল করা।

উল্লিখিত তিন সুরতের প্রথম দুই সুরতে সকল ঐক্যমত। আর তৃতীয় সুরত যা কিতাবে উল্লেখ তাতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মনিব আজল করার অনুমতি প্রদানের হকদার, সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজলের অনুমতি প্রদানের হকদার বিবাহিতা দাসী।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : স্বাধীন নারী যেভাবে সহবাসের দাবিদার হওয়ার যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ বিবাহিতা দাসীও তার স্বামী থেকে সহবাসের দাবী করতে পারে। সুতরাং স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে আজল করতে যেভাবে তার অনুমতির প্রয়োজন তদ্রূপ দাসী স্ত্রী থেকেও আজল করতে স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন। তবে হা এ মাসআলাটি মালিকানা দাসীর বিপরীত। কেননা, সে তার মনিব থেকে সহবাসের দাবী করতে পারে না। তাই মনিব তার থেকে আজল করতে দাসীর অনুমতির প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : আজল দ্বারা সন্তান লাভের বিষয়টি ক্ষুণ্ন ও নষ্ট হয়ে যায়। আর সন্তান হল মনিবের হক। তাই আজল করতে হলে দাসীর স্বামী দাসীর মনিবের অনুমতি নিতে হবে। আমাদের উক্ত আলোচনা দ্বারা বিবাহিতা স্বাধীন নারীও বিবাহিতা দাসী নারীর মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল। এরূপ যে স্বাধীন নারীর সন্তানের হকদ্বার স্বামী স্ত্রী। এখানে তৃতীয় কারো হকের প্রমাণ নেই। আর বিবাহিতা দাসীর সন্তানের হকদার প্রমাণ নেই। আর বিবাহিতা দাসীর সন্তানের হকদার হল মনিব, তাই উভয়টিকে এক নজরে দেখে একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা চলবে না।

وَلَوْ أُعْتِقَتْ أَمَةٌ أو مُكَاتَبَةٌ خُيِّرَتْ وَلَوْ زَوْجُهَا حُرًّا وَلَوْ نَكَحَتْ بِلَا إِذْنٍ فَعَتَقَتْ نَفَذَ بِلَا خِيَارٍ فَلَوْ وطىء قَبْلَهُ فَالْمَهْرُ له وَإِلَّا فَلَهَا وَمَنْ وطىء أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا عُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَدَعْوَةُ الْجَدِّ كَدَعْوَةِ الْأَبِ حَالَ عَدَمِهِ فَلَوْ زَوَّجَهَا أَبَاهُ فَوَلَدَتْ لم تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ له وَيَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْقِيمَةُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ - حُرَّةٌ قَالَتْ لِسَيِّدِ زَوْجِهَا أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ فَسَدَ النِّكَاحُ وَلَوْ لم تَقُلْ بِأَلْفٍ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لَهُ -

---

অনুবাদ : যদি দাসী বা মুকাতাবকে স্বাধীন করা হয় (আর মনিবের অনুমতিতে বিবাহ করে) তবে সে এখতিয়ারাধীন হবে, যদিও তার স্বামী স্বাধীন হয়। আর যদি মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে অতঃপর তাকে স্বাধীন করা হয় তবে এখতিয়ার ছাড়াই বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। যদি স্বাধীন হওয়ার পূর্বে স্বামী সহবাস করে তবে মহর মুনিবের জন্য হবে। নতুবা (তথা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে স্বামীর সাথে সহবাস হয় না, বরং স্বাধীন হওয়ার পর সহবাস হয় তবে) মহর স্ত্রীর জন্য হবে। আর যে তার ছেলের দাসীর সাথে সহবাস করে অতঃপর দাসী সন্তান প্রসব করে অতঃপর ছেলের পিতা তার দাবী করে তবে তার থেকে সন্তানের বংশধারা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং সে (দাসী) তার (ছেলের পিতার) উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তার (ছেলের পিতার) উপর দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে মহর ও সন্তানের মূল্য ওয়াজিব হবে না। দাদার (সন্তানের) দাবী পিতা না থাকা অবস্থায় পিতার দাবীর ন্যায় বিবেচ্য হবে। যদি ছেলে তার দাসীকে তার পিতার সাথে বিবাহ দেয় আর দাসী সন্তান প্রসব করে তবে সে তার স্বামীর (তথা ছেলের পিতার) উম্মে ওলাদ হবে না। (ছেলের) পিতার উপর মহর ওয়াজিব হবে। তার মূল্য ওয়াজিব হবে না আর তার সন্তান স্বাধীন হয়ে যাবে।

কোন স্বাধীন স্ত্রী তার স্বামীর মনিবকে বলে যে এক হাজারের বিনিময়ে তাকে স্বাধীন করে দিন। মনিব তাই করল। তখন বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি এক হাজারের কথা বলে না তবে বিবাহ বাতিল হবে না আর ولاء, আজাদকারী তথা মনিবের জন্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ أُعْتِقَتْ أَمَةٌ الخ : দাসী অথবা মুকাতাব তার মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ করল অতঃপর তাকে তথা দাসীকে স্বাধীন করা হল। এ প্রেক্ষাপটে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উক্ত দাসী বা মুকাতাব এখতিয়ার প্রাপ্ত হবে। স্বামী রাখা না রাখার ব্যাপারে, তার স্বামী দাস হউক বা স্বাধীন হউক। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উক্ত দাসীর স্বামী যদি দাস হয় তবে সে এখতিয়ার প্রাপ্ত হবে আর যদি স্বামী স্বাধীন হয় তবে সে এখতিয়ার প্রাপ্ত হবে না। হানাফী হযরাতদের দলীল হল : হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীস আর তা হল হযরত আয়েশা (রাযি.) যখন তার দাসী বারীরাকে স্বাধীন করে দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বারিরাহকে বললেন— مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِىْ তুমি তোমার সম্ভোগ-অঙ্গের অধিকারী হয়েছ। সুতরাং তুমি এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পার। উক্ত হাদীসে সম্ভোগ-অঙ্গের মালিকানাকে নিঃশর্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তার স্বামী

স্বাধীন হউক বা দাস হউক উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাছাড়া দাসী স্বাধীনতা লাভের সময় তার উপর বর্ধিত মালিকানা আবশ্যক হয়। কেননা, দাসী থাকার অবস্থায় তার স্বামী দুই তালাকের মালিক ছিল, কিন্তু স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে তিন তালাকের মালিক হয়ে গেল। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্ত নারীকে তার উপর অতিরিক্ত মালিকানা রোধ করার অধিকার দেয়া হল। তাই তাকে মূল আকদ রাখা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হবে।

قوله : وَ لَوْ نَكَحَتْ بِلَا اِذْنٍ الخ : যদি দাসী তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বসে তবে তার এ বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং দাসী (স্ত্রী) তার স্বামী রাখা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার প্রাপ্ত হবে না। বিবাহ শুদ্ধ হবে একারণে যে, এখানে বিবাহের দাবী বিদ্যমান রয়েছে আর তা হল বিবাহের রুকন তথা ইজবা কবুল তার যোগ্য স্থান থেকে বের হয়েছে। কেননা, দাসী প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান হওয়ার কারণে সে তার বক্তব্য প্রদানের অধিকারীনী হয়েছে। আর এখন বিবাহের প্রতিবন্ধক ও দূর হয়ে গেছে। কেননা, এ পর্যন্ত মনিবের হকের দরুন বিবাহের কার্যকারিতা রহিত ছিল। এখন যেহেতু মনিব তার দাসীকে আজাদ করে দিয়েছে তাই তার আর হক বাকী থাকল না। সুতরাং বিবাহের রুকন ইজাব-কবুল বিদ্যমান আর প্রতিবন্ধক দূর হওয়াতে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেছে। আর এখতিয়ার সাবেত না হওয়ার কারণ হল, বিবাহ কার্যকর হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর। তাই বাড়তি মালিকানা আরোপিত হচ্ছে না। সুতরাং যখন এখতিয়ারের ইল্লত পাওয়া যায়নি তাই তার জন্য ইচ্ছা স্বাধীনতা রহিত হয়ে গেল এবংবিবাহ শুদ্ধ হয়ে গেল।

قوله : فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ الخ : সুরতে মাসআলা হল দাসী মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহের পর মনিব কর্তৃক স্বাধীন হল। উক্ত নবস্বাধীন স্ত্রীর মহর কার প্রাপ্য হবে? এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ হল, যদি স্বাধীন হওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়ে যায় তবে মহরের হকদার মনিব হবে। কেননা, দাসী মনিবের মালিকানাধীন, তাই তার বদলও মনিবের মালিকানাধীন হবে। আর যদি আজাদ হওয়ার পর সহবাস হয় তবে মহরের হকদার স্ত্রী হবে। কেননা, এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রী থেকে এমন ফায়দা হাসিল করেছে যা স্ত্রীর মালিকানাধীন সুতরাং তার বদলও স্ত্রী প্রাপ্ত হবে।

قوله : وَ مَنْ وَطِئَ اَمَةَ اِبْنِهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার ছেলের বাদির সাথে সহবাস করে আর এর ফলে দাসী সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত দাসীকে উম্মেওয়ালাদ বলা হবে। এবং পিতার উপর ঐ দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে হা সন্তানের মূল্য ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ তার উপর মহরও ওয়াজিব হবে না। আর উক্ত দাসী পিতার উম্মেওয়ালাদ তখন হবে, যখন পিতা সন্তানের দাবী করবে যে সে আমার বীর্য দ্বারা হয়েছে এবং পিতা মুসলমান ও জ্ঞানবান হয়। কেননা, সন্তানের উপর পিতার কর্তৃত্ব রয়েছে যে সে তার সন্তানের মালের মালিক হবে নিজের প্রাণকে অবশিষ্ট রাখার জন্য। কেননা, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে اَنْتَ وَ مَالُكَ لِاَبِيْكَ - তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার জন্য। হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত—

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

মানুষের সন্তানাদি তার সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের অর্থ সম্পদ থেকে আহার কর।

সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে তার সন্তানের মালের মালিক হতে পারে, সত্বা বাকী রাখার জন্য সে তার সন্তানের দাসীরও মালিক হতে পারে। নিজের পানির সংরক্ষণ করার জন্য।

قوله : وَ لَوْ زَوَّجَهَا اَبَاهُ الخ : যদি কোন পুত্র তার দাসীকে পিতার নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় আর পিতার বীর্যে দাসী সন্তান প্রসব করে। তবে পিতার উপর উক্ত দাসীর মূল্য ওয়াজিব হবে না। দাসী পিতার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। তবে হা পিতার উপর উক্ত দাসীর মহর ওয়াজিব হবে। আর পিতার উপর উক্ত দাসীর তরফা যত সন্তানাদি হবে সবাই আজাদ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উক্ত মাসআলায় ব্যতিক্রম মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ছেলের দাসীকে পিতা বিবাহ করতে পারবে না। বিবাহ করা পিতার জন্য জায়েয নয়। কেননা, হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيْكَ তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার জন্য। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, দাসী পুত্রের মাল। তাই সেও তার পিতার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই তো পিতা যদি হারামভাবে পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করে বসে তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে কোন না কোনভাবে দাসীর মালিক হবে সে তাকে বিবাহ করতে পারবে না। তাই পিতাও তার ছেলে বাদীকে বিবাহ করতে পারবে না।

হানাফীদের দলীল হল : পুত্রের দাসী পিতার মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা, পুত্র সর্বদিক থেকে তার দাসীর মালিক। তাই তো পুত্র তার দাসীর সাথে সহবাস করতে পারে। সে আজাদ করে দিলে দাসী আজাদ হয়ে যায়। সুতরাং যখন পুত্রের মালিকানা সর্বদিক থেকে সাব্যস্ত হল। তখন পিতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। কেননা, দু ব্যক্তি এক স্থানে একই সময়ে কোন কিছুর মালিক হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব হল : জাহেরী হাদীসের উপর আমল করে মালিকানার সন্দেহ থাকার কারণে জেনায় হদ রহিত হয়েছে। তবে দাসীর পূর্ণ মালিক ছেলে হওয়ায় পিতা তাকে বিবাহ করা শুদ্ধ। আর যখন বিবাহ শুদ্ধ হল তখন তার সন্তান হওয়াও সন্তানের বংশধারা তার থেকে হওয়া বিশুদ্ধ। আর ঐ দাসী কর্তৃক পিতার বীর্যে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করল সে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, দাসী সন্তান তার মনিবের মালিকানায় হয়। আর এখানে ছেলে হল দাসীর মালিক। সুতরাং পিতা কর্তৃক দাসীর সন্তানটি দাসীর মনিবের ভাই হয়ে গেল, তাই আত্মীয়তার কারণে এ সন্তান তার তথা মনিবের উপর আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ مَلَكَ ذَا رِحْمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি তার কোন মাহরামের মালিক হবে উক্ত মাহরাম তার পক্ষ থেকে এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে দাসীর ছেলে আজাদ হয়ে যাবে।

قوله : حُرَّةٌ قَالَتْ لِسَيِّدِ زَوْجِهَا الخ : যদি কোন দাসের স্ত্রী আজাদ নারী হয় আর সে স্ত্রী স্বামীর মনিবকে বলল, তাকে আমার পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ করে দিন। প্রতি উত্তরে মনিব বলল, আজাদ করে দিলাম। তাহলে এ সুরতে বিবাহ ফাসেদ হবে নাকি হবে না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং আইম্মায়ে ছালাছার মতে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে বিবাহ ফাসেদ হবে না। বিবাহ ফাসিদ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত মূলত আজাদী কার পক্ষ থেকে সংগঠিত হয়েছে এর উপর। আমাদের মতে আজাদী সংগঠিত হয়েছে আদেশদাতা তথা স্বাধীন নারীর পক্ষ থেকে। এজন্য দাসের উত্তরাধিকার আদেশ দাতাই হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এখানে আজাদী মনিবের পক্ষ থেকে হয়েছে। এবাবে যে, স্বাধীন নারী তার দাস স্বামীর মনিবের নিকট এদরখাস্ত করেছে সে যেন তার দাসকে আজাদ করে দেয়। তাছাড়া ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মানুষ যার মালিক নয় তার পক্ষ থেকে কিভাবে আজাদী সংগঠিত হবে। সুতরাং দাসের এ আজাদী তার মনিবের পক্ষ থেকে সংগঠিত হয়েছে। আদেশ দাতার পক্ষ থেকে নয়।

আমাদের দলীল হল : আদেশ দাতার নির্দেশকে অনর্থক ও অহেতুক হওয়া থেকে বাছানোর জন্য তাকে বিশুদ্ধ করতে হবে। আর হা আদেশদাতার কথাকে বিশুদ্ধ করাও সম্ভব। আদেশ দাতার জন্য মালিকানাকে অগ্রগণ্য করা হবে অতঃপর আদেশ দাতার পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগঠিত হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। সুতরাং আদেশ দাতার বক্তব্য أَعْتِقْهُ عَنِّيْ بِأَلْفٍ - এর মূল ইবারত হবে— بِعْهُ عَنِّيْ بِأَلْفٍ ثُمَّ كُنْ وَكِيْلِيْ بِالْإِعْتَاقِ - 'আমার নিকট এ দাসটি এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করুন। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে ওকীল হয়ে তাকে আমার পক্ষ থেকে স্বাধীন করে দিন। অতঃপর মনিবের উক্তি أَعْتَقْتُ এর মূল ইবারত হবে- بِعْتُكَ وَ

أَعْتَقْتُهُ عَنْكَ 'আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম এবং তোমার পক্ষ থেকে তাকে আজাদ করে দিলাম। সুতরাং যেহেতু এখানে বিক্রয় পাওয়া গেল তাই স্বাধীন নারীর মালিকানা পাওয়া গেল এবং তারই পক্ষ থেকে আজাদীও পাওয়া গেল। তাই আমরা বলি বিবাহের মালিকানাও ইয়ামিন (দাসত্বের) মালিকানার মধ্যে বৈপরিত্য পাওয়ার দরুন বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قوله : وَ لَوْ لَمْ تَقُلْ بِالْفٍ الخ : যদি স্বাধীন স্ত্রী তার দাস স্বামীর মনিবকে বলে তাকে আজাদ করে দেন। আর মাল এর কথা বলে না তবে তরফাইন (রহ.) এর মতে বিবাহ ফাসিদ হবে না। এবং وِلَاء মনিবের জন্য হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বিগত মাসআলার উপর কিয়াস করে বলেন, সে এখানেও আদেশ দাতার পক্ষ থেকে আজাদ হবে। অর্থাৎ, যেভাবে প্রথম মাসআলায় আদেশদাতার পক্ষ থেকে আজাদী সংগঠিত হয়েছে এবং বিবাহ ফাসিদ হয়েছে তদ্রূপ এখানেও আদেশদাতার পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগঠিত হয়েছে এবং বিবাহ ফাসিদ হয়েছে।

بَابُ نِكَاحِ الْكَافِرِ

পরিচ্ছেদ : কাফেরের বিবাহ

تَزَوَّجَ كَافِرٌ بِلَا شُهُودٍ أو فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَذَا فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ اَسْلَمَا اُقِرَّا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَنْكِحُ مُرْتَدٌّ أو مُرْتَدَّةٌ اَحَدًا وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيرَ الْاَبَوَيْنِ دِينًا وَالْمَجُوسِيُّ شَرٌّ من الْكِتَابِيِّ وإذا اَسْلَمَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عُرِضَ الْاِسْلَامُ على الْآخَرِ فَاِنْ اَسْلَمَ وَاِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاِبَاؤُهُ طَلَاقٌ لَا إبَاؤُهَا وَلَوْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا ثَمَّهُ لم تَبِنْ حتى تَحِيضَ ثَلَاثًا فإذا حَاضَتْ ثَلَاثًا بَانَتْ وَلَوْ اَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ بَقِيَ نِكَاحُهُمَا -

অনুবাদ : কাফের যদি সাক্ষী ছাড়া কিংবা অন্য কাফেরের ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করে, আর তা তাদের ধর্মে বৈধ হয়ে থাকে, অতঃপর তারা উভয়জন মুসলমান হয়ে যায় তবে তাদের বিবাহ বহাল রাখা হবে। আর যদি স্ত্রী মুহাররামা হয় তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। মুরতাদ বা মুরতাদ্দাহ কেহ বিবাহ করবে না। ধর্ম হিসাবে ছোট সন্তান পিতা মাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে। অগ্নীপূজক আহলে কিতাবীদের থেকেও নিকৃষ্ট। স্বামী স্ত্রীর কেহ যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে অপর জনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। যদি ইসলাম গ্রহণ করে (তবে তো ভালো), নতুবা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। স্বামীর অস্বীকার করাকে তালাক হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু স্ত্রীর অস্বীকার করাকে তালাক হিসাবে গণ্য করা হবে না। যদি স্বামী স্ত্রীর কেহ দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে তবে স্ত্রী তিন হায়েজ পালন না করা পর্যন্ত পৃথক হবে না। আর যখন তিন হায়েয অতিক্রম করে ফেলবে তখন পৃথক হয়ে যাবে। আর যদি কিতাবীয়া নারীর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে বিবাহ বহাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : কাফের বলা হয় আল্লাহ অস্বীকারকারী। এখানে কাফের দ্বারা উদ্দেশ্য বিধর্মী মূর্তি পূজক, অগ্নী পূজক। অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে। আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে মাবুদ বানিয়ে তার উপাসনা করে। কাফেরদের বিবাহ দাস-দাসীর বিবাহের পর আনার কারণ হল, মর্যাদার দিক দিয়ে কাফের দাসের চেয়ে নিম্নমানের। যেমন আল্লাহর ইরশাদ : وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ মুমিন দাস মুশরিক থেকে উত্তম। তাই কাফেরদের আলোচনা দাসের আলোচনার পর করেছেন। কাফেরদের বিবাহ সহীহ হওয়া না হওয়া মূলত তিনটি ভিত্তির উপর নির্ভর করে। তাহলো : ১। যে বিবাহ দুজন মুসলমানের মধ্যে বৈধ তা কাফেরের মধ্যেও বৈধ। ২। মুসলমানের মধ্যকার এমন বিবাহ যা শর্ত ইত্যাদি না পাওয়ার কারণে সহীহ হয় না এমন বিবাহ কাফেরদের ক্ষেত্রে বৈধ না অবৈধ হিসাবে গণ্য হবে এ ব্যাপারে দুটি সুরত রয়েছে :

ক) যদি কাফেরদের ধর্মে এমন বিবাহ গ্রহণযোগ্য হয় না, তবে তা নিষিদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে।

খ) আর যদি কাফেররা এমন বিবাহকে জায়েয মনে করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে কাফেরদের মাঝে এ বিবাহ জায়েয হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

৩। যে বিবাহ স্থান হারাম হওয়ার কারণে হারাম হয়, যেমন বোন ইত্যাদিকে বিবাহ করল, তা হলে বিশ্বাস হিসাবে বৈধ হবে। কিন্তু মাশায়েখে ইরাকের মতে এ বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে।

قوله : تَزَوَّجَ كَافِرٌ بِلَا شُهُوْدٍ الخ : যদি কোন কাফের সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে অথবা অন্য কাফেরের ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে বিবাহ করে আর ইহা তাদের মধ্যে জায়েযও বটে, অতঃপর উভয়জন ইসলাম গ্রহণ করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তাদেরকে তাদের বিবাহের উপর বহাল রাখা হবে। ইমাম যুফার (রহ.)এর মতে উভয় সুরতে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে কিংবা ন্যায়পরায়ণ মুসলমান বিচারকের নিকট তাদের বিষয়টি উপস্থাপন করার পূর্বে তাদের বিষয়ে কোন কিছু করা যাবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর প্রথম সূরতে তথা সাক্ষী ছাড়া বিবাহ এর ক্ষেত্রে ঐ হুকুম যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ব্যক্ত করেছেন।

আর দ্বিতীয় সুরতে তথা কাফেরের মু'তাদ্দাকে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় ঐ হুকুম যা ইমাম যুফার (রহ.) বলেছেন। ইমাম যুফার (রহ.) এর দলীল : আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ لَاتَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ

'তোমরা বিবাহের সম্পর্কের ইচ্ছাও করিও না যতক্ষণ না নির্ধারিত ইদ্দত তার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়।'

আর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— لَانِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না। উক্ত আয়াত ও হাদীসের হুকুম ব্যাপক। তাই সম্বোধনও ব্যাপক হবে। তাই তা মুসলমানদের সাথে সাথে কাফেরদের জন্যও অবধারিত হবে। তবে হা, তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, চুক্তির জন্য তাদের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। আমাদের হস্তক্ষেপ না করার দরুন ইহা প্রমাণিত হয় না যে, আমরা তাদের কার্যকলাপকে সঠিক মনে করি, তবে হা যখন তারা উভয় মুসলমান হয়ে যাবে অথবা মুসলমান আদিল বিচারকের নিকট মামলা উপস্থাপন করবে অথচ তাদের মধ্যকার বিবাহ হুরমত রয়েছে তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَ اَنِ احْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ

উক্ত আয়াতে بَيْنَهُمْ এর ضمير এর مرجع কাফেরদের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ, আপনি কাফেরদের মধ্যে এভাবে ফয়সালা করুন যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান বিচারক শরীয়াত অনুযায়ী বিচার করবেন। সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল : অন্যের মুরতাদ্দাহকে বিবাহ করা হারাম। এব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সহীহ নাকি সহীহ নয় এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এমন কি হযরত ইমাম মালিক (রহ.) ও আবু লায়লা (রহ.) এর মতে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ জায়েয।

আর জিম্মি কাফেররা আমাদের ঐক্যমত পূর্ণ বিধিবিধানে তারা আমাদের অনুগত হবে আর আমাদের মত বিরোধ পূর্ণ বিধিবিধান পালনে আমাদের অনুগত হবে না। সুতরাং অন্যের মু'তাদ্দাকে বিবাহ করা যেহেতু আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধ বিধায় জিম্মী কাফেরের ক্ষেত্রেও মু'তাদ্দাকে বিবাহ করা ফাসিদ হবে। তাই তারা মুসলমান হওয়া কিংবা মুসলিম বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করলে তাদের এ বিবাহকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। আর সাক্ষী ছাড়া বিবাহের ক্ষেত্রে যেহেতু আমদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান তাই জিম্মী কাফেররা আমাদের অনুগত হবে না। আর যেহেতু তা তাদের ধর্ম অনুযায়ী সহীহ তাই তাদের ইসলাম গ্রহন কিংবা মুসলিম বিচারকের নিকট মামলা পেশ করলেও তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন না করে বহাল রাখা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : শরীয়তের হক হিসাবে অথবা স্বামীর হক হিসাবে ইদ্দত পালন রত মহিলাকে বিবাহ নিষিদ্ধ হবে। আর কাফেরের ক্ষেত্রে উভয় সূরত অসম্ভবপর। কেননা, কাফেররা শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সম্ভোধিত নয়। আর দ্বিতীয়টি তথা স্বামীর হক হিসাবে তা তো এ জন্য সম্ভবপর নয় যে, স্বামী কাফের হওয়ার দরুন ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া তো বিশ্বাসই করে না। তাই তো কোন আহলে কিতাবিয়া কোন মুসলমানের বিবাহ থাকে। অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে দিলে মুসলমান স্বামীর হক্ব হিসাবে এ নারী ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা, মুসলমান ইদ্দতের বিশ্বাসী সুতরাং ইদ্দতের কারণে বিবাহ হুরমত হওয়ার যে দুটি সুরত ছিল তা যেহেতু কাফেরের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত তাই এক কাফের অন্য কাফেরের ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে বিবাহ করল অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে গেলে অথবা মুসলমান বিচারকের নিকট বিচার দায়ের করলে তাদের পূর্ব বিবাহকে বাতিল করা যাবে না। আর বিবাহ পরবর্তী অবস্থার সাক্ষী শর্ত নয়। এ কারণেই যদি বিবাহের পর সাক্ষী মরে যায় তাহলে বিবাহ বাতিল হবে না। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কাফের যদি সাক্ষী ছাড়া বা ইদ্দত রত নারীকে বিবাহ করে এবং তা তাদের ধর্মমতে জায়েয থাকে অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদেরকে তাদের বিবাহে বহাল রাখা হবে।

قوله : وَ لَوْكَانَتْ مُحَرَّمَةً الخ : যদি কাফের তার মাহরামাহ তথা মা, কন্যা, বোন, কিংবা যাদেরকে স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম এদের কাউকে বিবাহ করে। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিশুদ্ধ মত হল, এ বিবাহ বিশুদ্ধ ছিল আর আহলে ইরাকীদের মতে এ বিবাহ ফাসিদ ছিল। সাহাবাইন (রহ.) এরও এমন অভিমত। তবে এ ব্যাপারে একমত যে তাদের ইসলাম গ্রহণের পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : স্থায়ী মাহরামদের বিবাহ করা জিম্মিদের কাছেও বাতিল বলে গণ্য। তাছাড়া আমরা সবাই একমত যে, মাহরামাতদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। তাই জিম্মীরা এ বিধানের অনুগত হবে। এজন্য তাদের এ কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু যেহেতু তাদের সাথে জিম্মি চুক্তি হয়েছে এজন্য তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না। এখন যেহেতু তারা উভয় মুসলমান হয়ে গেছে তাই তাদের এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিধায় ইসলামী বিচারক তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : মূলত কাফেরদের মাহরাম বিবাহ করা সহীহ। কেননা, হারাম ছাবেত হওয়ার দু সুরত রয়েছে : ১। শরয়ীভাবে ২। স্ত্রীর হক হিসাবে। যেহেতু কাফেররা শরয়ী বিধিবিধানের

আওতাভুক্ত নয়, তাছাড়া শরয়ী বিধি-বিধানের সম্বোধন তো মুসলমানগণ এতে কাফের শামীল নয়। বিধায় শরয়ী নিষিদ্ধতা আরোপ হবে না। আর স্ত্রীর হক্ব হিসাবে মুহরামাত ছাবিত হবে না। এজন্য যে সে তো এমন মুহরামিয়াতের অস্বীকারকারী। সুতরাং হারাম সাবেতকারী দুটি সুরতের কোনটিই যেহেতু কাফেরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল না। তাই আমরা বলি প্রথমত তাদের মধ্যকার এ বিবাহ সহীহ। তবে হা কাফের ইসলাম গ্রহণ করার পর সে ইসলামের বিধিবিধানের সম্বোধিত ব্যক্তি হয়ে গেছে। আর ইসলামী শরীয়তে যেভাবে শুরুতে মাহরাম হওয়া বিবাহের পরিপন্থী তেমনি বিবাহ অবশিষ্ট থাকারও পরিপন্থী। তাছাড়া এখন যেহেতু সে ইসলম গ্রহণ করে শরীয়তের বিধিবিধান পালনে পাবন্দ হয়ে গেছে, তাই তার উপর এখন হস্তক্ষেপ করা জরুরী হবে। এজন্য বিচারক তাদের মধ্যকার হারাম বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।

قوله : وَ لَا يَنْكِحُ مُرْتَدٌّ أَوْ مُرْتَدَّةٌ الخ : মুরতাদ পুরুষ কোন মুরতাদ্দাহ কিংবা মুসলমান বা কাফের কোন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে না। তদ্রূপ মুরতাদ্দাহ নারীকে কোন মুসলমান কাফের ও মুরতাদও বিবাহ করতে পারবে না। কেননা, মুরতাদ ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে সে হত্যার যোগ্য। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ - যে তার দ্বীন পরিবর্তন করল তাকে হত্যা কর। সুতরাং মুরতাদকে চিন্তাভাবনা করার জন্য তিন দিন পর্যন্ত আবদ্ধ রাখা হবে। আর আবদ্ধ করে রাখার অর্থ ইহাই যে তার মধ্যে ইসলামের যে দিকটা নিয়ে শংসয় দেখা দিয়েছে তা যেন দূর হয়, যদি এ অবস্থায় তাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয় তবে বিবাহ তাকে সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে সরিয়ে ফেলবে।

এমনি যদি মুরতাদ্দাহ নারীকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয় তবে সে তার স্বামীর খেদমত ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে সে তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করা থেকে গাফেল হয়ে যাবে। তাছাড়া উভয়ের মাঝে বিবাহ সম্পর্কিত কল্যাণসমূহ সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম হবে না। কেননা, বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজস্ব সত্ত্বাগত কারণে বৈধতা লাভ করেনি, বরং সংশ্লিষ্ট কল্যাণসমূহের কারণে বৈধতা লাভ করেছে।

قوله : وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ الخ : স্বামী স্ত্রীর একজন যদি মুসলমান হয় তবে তাদের সন্তান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ইসলাম ধর্মের উপর হবে। অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রী কাফের ছিল এখন একজন মুসলমান হল, তবে অপর জনের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যদি সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে এ সন্তান যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার অনুগামী হবে। তবে শর্ত হল, যে মুসলমান হয়েছে সে একই রাষ্ট্রের হবে। আর যদি এমন হয় যে পিতা ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে আসে আর সন্তান দারুল হরবে থেকে যায় কিংবা তার বিপরীত হয় তবে উক্ত সন্তান মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে না। তদ্রূপ স্বামী স্ত্রীর একজন মুসলমান হয় আর তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বিদ্যমান থাকে, তবে সন্তান তার পিতা মাতার মধ্যে মুসলমান জনের অনুগামী হবে।

এ সবের দলীল হল : যদি সন্তানকে মুসলমান পিতা বা মাতার অনুগামী করা হয় তবে তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। দুনিয়াতে ও আখেরাতে তাকে মুসলমানের বকরস্থানে দাফন করা হবে। তার সাথে কাফেরের মত আচরণ করা হবে না, আর আখেরাতে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। সুতরাং সন্তানের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে আমরা সন্তানকে মুসলমানদের অনুগামী হিসাবে গণ্য করি।

قوله : وَ الْمَجُوْسِيُّ شَرٌّ مِنَ الْكِتَابِيِّ الخ : মাজুসী কিংবা মূর্তি পূজক আহলে কিতাবী থেকে নিকৃষ্টতম। একথা বলার দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) ইহা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যদি স্বামী স্ত্রীর একজন মজুসী আর অপরজন কিতাবিয়্যাহ হয় তবে তাদের (অপ্রাপ্ত) সন্তান কিতাবিয়াহ এর অনুগামী হবে। কেননা, সন্তানকে কিতাবির অনুগামী হিসাবে গণ্য করার দ্বারা তার উপর অনুগ্রহ হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে। যেমন, দুনিয়াতে মুসলমান কিতাবীয়াকে বিবাহ করতে পারে, কিতাবিয়ার জবাই করা প্রাণী মুসলমানগণ খেতে পারে তদ্রূপ আখেরাতে কিতাবীয়ার শাস্তি মজুসী থেকে কম হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে শিশুটিকে মজুসীর

অনুগত হিসাবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, যদি শিশুটির পিতা কিতাবী হয় আর মাতা মজুসী হয় তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বিশুদ্ধতম মত হল শিশুটি মজুসি হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আহমদ (রহ.) এমত পোষণ করেন। আর দ্বিতীয় মত হল শিশুটি পিতার অনুগত হয়ে কিতাবী হয়ে যাবে। ইমাম মালিক (রহ.) এমত পোষণ করেন। আর যদি মা কিতাবী আর পিতা মজুসী হয় তাহলে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর একটি মত হল শিশুটি পিতার অনুগত হয়ে মজুসী হবে। তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না তাকে মুসলমান পুরুষ বিবাহ করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল : এ পর্যায়ে যদি শিশুটিকে মজুসীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া হারাম হবে এবং তাকে মুসলমান পুরুষ বিবাহ করা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাকে আহলে কিতাবিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয হবে এবং তাকে মুসলমান পুরুষ বিবাহ করা জায়েয হবে। সুতরাং الحاقين। এর মধ্যে تعارض (বৈপরিত্র) রয়েছে। এদিকে কায়দা হল হুরমত ও হিল্লাতের কারণ যদি এক হয়ে যায় তবে হুরমতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। আর হুরমত তো মজুসীর অনুগত করার মধ্যে রয়েছে। তাই আমরা সন্তানকে মজুসীর অনুগত হিসাবে গণ্য করি। আমাদের দলিল হল যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে শিশুটিকে কিতাবীর অনুগত রাখার মাধ্যমে তার পতি অনুগ্রহ করা হয়। এজন্য আমরা শিশুটিকে কিতাবীর অনুগত হিসাবে নির্ধারণ করেছি।

قوله : وَ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الخ : সুরতে মাসআলা হল : স্বামী স্ত্রী থেকে স্ত্রী মুসলমান হল, আর স্বামী কাফের বা অন্য ধর্মাবলম্বি থেকে গেল তবে ইসলামী কাজী স্বামীর নিকট ইসলাম পেশ করবেন যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে উভয় স্বামী স্ত্রীরূপে বহাল থাকবে, আর যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবেন। তরফাইন (রহ.) এর মতে এ বিচ্ছেদ তালাক হিসাবে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় সূরত হল স্বামী মুসলমান হল আর স্ত্রী মজুসিয়া থেকে গেল, তবে কাজী সাহেব স্ত্রীর নিকট ইসলাম পেশ করবেন, যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে, আর যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করা থেকে অস্বীকার করে তবে কাজী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিবেন। তরফাইন (রহ.) বলেন, উভয় সূরতে বিচ্ছেদ তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা বিবাহ রহিত কারী হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, তরফাইন (রহ.) এর মতে স্বামীর অস্বীকার এর বেলায় সে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে আর স্ত্রীর অস্বীকার এর বেলায় যে বিচ্ছেদ সংগঠিত হবে তা ফসখ বা রহিতকারী হিসাবে গণ্য হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, স্বামী স্ত্রী যে কোন একজনের অস্বীকার করার দরুন কাজী তাদের মধ্যকার সে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিবেন তা তালাক হবে না বরং ফসখ বা রহিতকারী হিসাবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মতামত হল স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে ইসলাম গ্রহণ করল না তার নিকট ইসলাম পেশ করা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে ইসলাম পেশ করা যাবে না। কেননা, তাদের সাথে জিম্মির চুক্তির কারণে আমরা একথায় নিশ্চয়তা দিয়েছি যে আমরা তাদের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না। তবে হা যেহেতু সহবাসের পূর্বে বিবাহ দৃঢ় হয় না। তাই সহবাসের মধ্যে একজন মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সহবাসের পর দৃঢ় হয় এজন্য তিন হায়েজ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। আমাদের দলীল হল : স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করা কিংবা স্বামী ইসলাম গ্রহণ করা দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। আর ব্যবহৃত হওয়া একটি নতুন বিষয় সুতরাং এর জন্য এমন একটি কারণ, থাকা দরকার যার উপর বিচ্ছেদের ভিত্তি রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রকাশ্য দুটি সুরত বিদ্যমান : ১। ইসলাম গ্রহণটি বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ বা সবব। ২। যে ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করে তার অস্বীকারকে বিবাহের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ বা সবব ধরা হবে। উভয়টি থেকে কোনটিই গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কেননা, প্রথমটি তথা ইসলাম আর তা হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত

এবং তা আল্লাহর অনুগত্যতা তা কখনো বিবাহের উদ্দেশ্য তথা নিয়ামত সমূহের জন্য ব্যাহতকারী হতে পারে না। আর দ্বিতীয় সুরতও সম্ভব নয়, কেননা, সে তো তার পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। তাই তার কুফরী পূর্বেও বিবাহ বা তার উদ্দেশ্যসমূহের ব্যাঘাতকারী হয়নি তেমনি এখনও তার কুফরী ব্যাঘাতকারী হতে পারে না। অতএব উপরের কারণদ্বয় ছাড়া অন্য একটি কারণ বের করা প্রয়োজন যার উপর বিচ্ছেদের ভিত্তি রাখা হবে। এজন্য আমরা বলি কাজী সাহেব যার মধ্যে কুফরী বিদ্যমান তার সামনে ইসলাম পেশ করবেন। যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে তো ভালো। বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহে আর ত্রুটি সৃষ্টি হল না। আর যদি অস্বীকার করে তবে বিচ্ছেদ নির্ধারিত হয়ে গেল। সুতরাং ইসলাম থেকে বিমুখতাই বিবাহের উদ্দেশ্যসমূহে ব্যাহত হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। কেননা, ইসলাম অস্বীকার করণ নিয়ামত দূরীভূত হওয়ার কারণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এজন্য আমরা হানাফিয়া বলি যে, যে কুফরী অবস্থায় থাকবে তার কাছে ইসলাম পেশ করা হবে। যাতে তার ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হিসাবে ধার্য করা যায়। স্বামীর ইসলাম অস্বীকৃতির কারণে বিচ্ছেদকে তালাক আর স্ত্রীর ইসলাম অস্বীকৃতির কারণে বিচ্ছেদকে فسخ বা রহিত বলা হবে। এজন্য যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করা থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন দ্বারা নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখা থেকে বিরত থাকল। অথচ সে ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা নিয়মিত স্ত্রীকে রাখার উপর সামর্থবান ছিল। আর কায়দা হল যদি স্বামী স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী রাখা থেকে বিরত থাকে, তবে কাজী তার স্থলবর্তী নিযুক্ত হয়ে স্ত্রীকে মুক্ত করে দেবে। আর এ মুক্তি করাটাই তালাক হিসাবে গণ্য হয়। যেমন কর্তিত পুরুষাঙ্গ ব্যক্তির স্থলবর্তী কাজী হয়ে স্ত্রীর চাওয়া অনুযায়ী তাকে বিচ্ছেদ করে দেন। আর তা তালাক হিসাবে গণ্য হয়।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে কাজি তার স্থলবর্তী হতে পারবে না। কেননা, স্ত্রী তালাক প্রদানের মালিক নয়, আর স্ত্রী থেকে তালাকের চিন্তাও করা যায় না। তাই আমরা বলি যে, যদি স্ত্রী ইসলাম অস্বীকারকারী হয় তবে কাজী তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন। কিন্তু এ বিচ্ছেদ তালাক হবে না, বরং রহিতকারী বা فسخ نكاح হিসাবে পরিগণিত হবে।

قوله : وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا الخ : অর্থাৎ, দারুল হরবে এক স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার স্বামী কাফির অবস্থায় রয়েছে। অথবা হরবী স্বামী ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার স্ত্রী কাফিরাহ অবস্থায় রয়েছে। তাহলে উভয় অবস্থায় স্ত্রীর তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া বা ঋতু না হলে তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছিন্ন হবে না। বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইদ্দতের জন্য দ্বিতীয়বার তিন হায়েয কিংবা তিন মাস অতিবাহিত করবে।

এর দলীল হল নিম্নরূপ :

ইসলাম বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। আর ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়াতে মুসলিম শাসকের কর্তৃত্ব না থাকায় অন্যের কাছে ইসলাম পেশ করাও সম্ভবপর নয়। এদিকে ফাসাদ নিরসনের জন্য বিচ্ছেদ আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সুতরাং যখন ইসলাম থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে বিচ্ছেদের কারণ নির্ধারন করা অসম্ভবপর হয়ে গেল তাই তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়া বা হায়েজ না আসার অবস্থায় তিন মাস অবস্থান করাকে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করা হল।

قوله : وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ الخ : কিতাবীয়া নারীর স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। স্ত্রী মুসলমান হোক বা না হোক। কেননা, মুসলমান পুরুষ কিতাবিয়া নারীকে প্রথম থেকেই বিবাহ করতে পারে তাই পরেও অবশ্য সহীহ হবে।

وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ سَبَبُ الْفُرْقَةِ لَا السَّبْيِ وَتُنْكَحُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلُ بِلَا عِدَّةٍ وَارْتِدَادُ اَحَدِهِمَا فَسْخٌ فِي الْحَالِ فَلِلْمَوْطُوءَةِ الْمَهْرُ وَلِغَيْرِهَا النِّصْفُ إِنْ ارْتَدَّ وَإِنْ ارْتَدَّتْ لَا وَالْاِبَاءُ نَظِيرُهُ وَ لَوْ اِرْتَدَّ اَوْ اَسْلَمَا مَعًا لَمْ تَبِنْ وَ بَانَتْ لَوْ اَسْلَمَا مُتَعَاقِبًا -

অনুবাদ : দু' দেশের ভিন্নতা (বিবাহ) বিচ্ছেদের কারণ, বন্দিত্ব নয়। অন্তঃসত্বাহীন মুহাজেরা মহিলা ইদ্দত পালন ছাড়া বিবাহ করতে পারবে। স্বামী স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেলে সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সহবাস কৃতার জন্য পূর্ণ মহর, আর সহবাস হীনার জন্য অর্ধ মহর হবে যদি স্বামী মুরতাদ হয়। যদি স্ত্রী মুরতাদ হয় তবে এক্ষেত্রে কোন মহর নেই। আর তার দৃষ্টান্ত হল ইসলাম অস্বীকার করা।

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় (এক সাথে) মুরতাদ হয় আবার একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে তবে (বিবাহ) বিচ্ছেদ হবে না। আর যদি পর্যায়ক্রমে উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ تَبَايِنُ الدَّارَيْنِ الخ : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ দু' দেশের ভিন্নতা নাকি বন্দিত্ব সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ নিয়ে আলোকপাত করছেন।

সুতরাং সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত ইবারতের তিনটি সুরত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল متفق عليه আর দুটি হল مختلف فيه -।

متفق عليه তথা সবাই একমত ইহা হল যদি স্বামী স্ত্রীর যে কোন একজনকে গ্রেফতার করা হয় তবে সকলের মতে বিচ্ছেদ সংগঠিত হয়ে যাবে।

মতানৈক্যপূর্ণ (مختلف فيه) প্রথম সুরত হল স্বামী স্ত্রীর কোন একজন মুসলমান হয়ে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসলে হানাফী হযরাতদের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না।

মতানৈক্য পূর্ণ (مختلف فيه) এর দ্বিতীয় সুরত হল যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ই গ্রেফতার হয় তবে হানাফী হযরাতদের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। মোটকথা, আমাদের মতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় প্রকৃত বা দৃশ্যত ভিন্নতার দরুন আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বন্দিত্ব। দেশের ভিন্নতা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল : দুই দেশের ভিন্নতার দরুন কর্তৃত্ব রহিত হয় আর তা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। যেমন কোন হারবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করল আর স্ত্রী দারুল হরবে থেকে গেল তাদের দু দেশের ভিন্নতার দরুন কর্তৃত্ব রহিত হল ঠিকই কিন্তু এ দুদেশের ভিন্নতার দরুন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। তদ্রূপ যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে তবে তার কর্তৃত্ব রহিত হল ঠিকই তবে তার দারুল ইসলামে থেকে যাওয়া স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকবে, বিচ্ছেদ হবে না।

সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, দু দেশের ভিন্নতার দরুন যদিও কর্তৃত্ব রহিত হয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যকার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দুদেশের ভিন্নতা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

অপরদিকে বন্দিত্বের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রভাব বিদ্যমান হয়েছে। কেননা, বন্দিত্বের দাবী হল সর্বদিক

থেকে বন্দিত্ব পাওয়া আর তা তখনই সম্ভব পর যখন বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। সুতরাং বন্দিত্ব পাওয়া যাওয়া তা বিবাহ বিচ্ছেদেরও কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার সবব বা কারণ। চাই এ বন্দিত্ব উভয়ের মধ্যে পাওয়া যাক বা স্বামী স্ত্রীর যে কোন একজনের ক্ষেত্রে পাওয়া যাক। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল হল : দেশ ভিন্নতা প্রকৃত এবং দৃশ্যত বিবাহের স্বার্থের বিপরীত। আর যা স্বার্থের বিপরীত হয় তা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যেমন মাহরাম হওয়ার বিষয়টি। এজন্য দু'দেশের ভিন্নতা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব হল : বন্দিত্ব দ্বারা দেহ সত্তার উপর মালিকানা সাবিত হয়। আর দেহ সত্তার মালিকানা বিবাহের সূচনার পরিপন্থী নয়। যেমন একজন মনিব তার দাসিকে অন্যত্র বিবাহ দিল অথচ মনিব এ দাসীর দেহসত্তার মালিক এরকম বিবাহ জায়েজ। সুতরাং প্রতিয়মান হল দেহ সত্তার মালিকানা সাব্যস্ত হলেও বিবাহের প্রতিবন্ধক হয় না। তাই তো ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। তেমনি বন্দিত্ব দ্বারাও যদিও দেহ সত্তার মালিক হয় কিন্তু বিবাহ বাতিল হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর একথা বলা যে, পূর্ণরূপে বন্দিত্ব পাওয়ার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা তার একথা গ্রহণ করি না। কেননা, বন্দিত্ব তো সে সকল স্থানেই পূর্ণ অধিকারে আসার দাবি করে যেখানে তার আমল আছে। তাই তো বন্দিকারীর জন্য বন্দিত্বের সত্তার মধ্যে বিশেষভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হয় বিবাহের মহলের মধ্যে হয় না। এর দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, বন্দিত্ব বিবাহ বিচ্ছেদের সবব নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কিয়াস করেছেন مستامن তথা নিরাপত্তা প্রার্থীর উপর। জবাবে আমরা বলি ঢালাওভাবে দেশ ভিন্নতাকে আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলি না, বরং যে হারবী নিরাপত্তা চেয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করল অস্থায়ীভাবে। অথবা মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করল অস্থায়ীভাবে তার এ অনুপ্রবেশ বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু তাদের ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাই তাদের উপর কিয়াস করে ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে প্রবেশকারী অথবা যে কোন একজনকে বন্দি করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার বৈবাহিক হুকুম নিরুপণ করা বৈধ নয়। কারণ হুকুমগত ভাবে তারা এক নয়, বরং ভিন্ন।

قوله : وَتَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةُ الخ : যদি কোন স্ত্রীলোক দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে মুসলমান হয়ে কিংবা জিম্মিয়াহ্ হয়ে চলে আসে আর ফেরত যাওয়ার ইচ্ছা থাকে না, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উক্ত মুহাজির স্ত্রীলোককে বিবাহ জায়েয তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.)এর মতে তার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে।

তাদের দলীল হল : উক্ত মহিলার পূর্ব বিবাহ-বিচ্ছেদ দারুল ইসলামে প্রবেশের পর সংগঠিত হয়েছে। আর কায়দা হল দারুল ইসলামে সংগঠিত প্রত্যেক বিচ্ছেদে ইসলামের বিধিবিধান কার্যকর হয়। আর ইদ্দত ও ইসলামী আহকামের অন্তর্ভুক্ত। তাই উক্ত মুহাজিরার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। তবে হা যদি দারুল হরবে হারবী স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় অতঃপর স্ত্রী দারুল ইসলামে হিজরত করে চলে আসে তবে সকল একমত যে তার ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : ইদ্দত হল পূর্বকার বিবাহের ফল যা পূর্ববর্তী স্বামীর বিবাহের মর্যাদা প্রকাশের জন্য ওয়াজিব হয়েছে। এখানে হারবীর কোন মর্যাদা নেই যা প্রকাশ করার জন্য ইদ্দত পালন করতে হবে। এজন্য এমন মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। এখন যদি উক্ত মহিলা গর্ভবতী হয় তবে তাকে বিবাহ করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বর্ণনা করেন যে, উক্ত মুহাজিরা মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে না। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দ্বিতীয় মত যা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। তা হল ঐ মুহাজিরা গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করা সহীহ।

তবে গর্ভপাত হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা যাবে না।

প্রথম মতের কারণ হল, ঐ মুহাজিরা মহিলার গর্ভ অন্যের পক্ষ থেকে সাবিতুন নসব। সুতরাং নসবের ক্ষেত্রে যেহেতু শয্যাধিকার প্রকাশ পেল তাই সতর্কতার জন্য বিবাহ থেকে বিরত থাকাটাও প্রকাশ পাবে।

এজন্য তাকে প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ করা যাবে না।

আর দ্বিতীয় মতের দলীল হল : উক্ত মহিলার স্বামী হারবী যার কোন মর্যাদা নাই। যা প্রকাশ করার জন্য গর্ভবতীকে বিবাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই হারবী স্বামী কর্তৃক গর্ভবতী মুহাজেরা মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। যেমন ব্যভিচারের গর্ভধারিণীর-ক্ষেত্রে করা হয়। কেননা, জেনাকারীর বীর্যের কোন মর্যাদা নেই। তবে উভয় ক্ষেত্রে সহবাস করার অনুমতি এজন্য দেয়া হয়নি যে, এর দ্বারা নিজের পানি দ্বারা অন্যের জমি সিঞ্চন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ।

قوله : وَ اِرْتِدَادُ اَحَدِهِمَا الخ : স্বামী স্ত্রীর যে কোন একজন মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি মুরতাদ হওয়া সহবাসের পূর্বে পাওয়া যায় তবে সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি সহবাসের পর মুরতাদ হয়ে যায় তবে তিন হায়েজ অতিবাহিত করার পর বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইবনে আবি লায়লা বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। এমনকি স্বামী ধর্ম ত্যাগ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে কিংবা নিহত হয় তবেও স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে।

হানাফীদের মতে যেহেতু সাথে সাথে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে তাই এ বিচ্ছেদ বিবাহ রহিতকারী হবে নাকি তালাক হবে। এ নিয়ে আমাদের ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। শাইখাইন (রহ.) এর মতে তা তালাক হবে না, তা রহিতকারী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন যদি এ ধর্মান্তরিত স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তা তালাক হবে। অন্যথায় তালাক হবে না।

তিনি স্বামীর ইসলাম অস্বীকার করার উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ, যদি স্বামী ইসলাম অস্বিকার করে তবে কাজী তার পক্ষ থেকে তার স্ত্রীর সাথের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। আর তা হবে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত। তাই তো তা তালাক হবে। আর যদি স্ত্রী অস্বীকারকারী হয় তবে যেহেতু স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের কল্পনা করা যায় না। তাই কাজী তার স্থলবর্তী হয়ে তার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন আর তা তালাক হবে এমনটি হতে পারে না। বরং এক্ষেত্রে বিচ্ছেদ করে দেয়াটা বিবাহ রহিত করা হিসেবে গণ্য হবে। তদ্রূপ আলোচিত মাসআলাটি।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলীল হল : বিচ্ছেদ এমন কারণে সংঘটিত হয়েছে যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরীক আর তালাক শুধু স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে হতে পারে না। তাই ধর্ম ত্যাগের কারণে যে বিচ্ছেদ হবে তা তালাক হবে না, বরং বিবাহ রহিত করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : তিনি ইসলাম অস্বীকার করা আর ধর্ম ত্যাগের মাঝে পার্থক্য করেন। এজন্য স্বামীর ইসলাম অস্বীকার করার ক্ষেত্রে যে বিচ্ছেদ হয় তা তালাক হিসেবে গণ্য করেন নি। উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের কারণ হল, ধর্ম ত্যাগ হচ্ছে বিবাহের পরিপন্থী। কেননা, ধর্ম ত্যাগ হচ্ছে সত্তা ও অর্থের নিরাপত্তা রহিতকারী। এ জন্যই তো মুরতাদকে কেহ হত্যা করলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ মুরতাদের মালিকানাও বিবাহ রহিত হয়ে যায়। অপর দিকে তালাক বিবাহের পরিপন্থী বিষয় নয়। কেননা, কেহ তালাক দেওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে বিহার করতে পারে, কিন্তু মুরতাদ বিবাহের পরিসমাপ্তি। এজন্যই তো মুরতাদ তার অবস্থায় বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিবাহ করতে পারে না। এ কারণে ধর্ম ত্যাগের পর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়াকে তালাকরূপে গ্রহণ করা কঠিন। ইসলাম গ্রহণ অস্বীকৃতির বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, সে তো তার

পূর্বের হালতে বিদ্যমান। তাই সে জিম্মি হিসেবে থাকবে। তার রক্ত কারো জন্য বৈধ হয়নি। এজন্য ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন তা বিবাহের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। আর ধর্মত্যাগ বিবাহের জন্য প্রতিবন্ধক। উপরের আলোচনার উপর ভিত্তি রেখে আমরা বলি স্বামী-স্ত্রীর যে কোন একজন মুরতাদ হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিবাহ বিচ্ছেদ তালাক হবে না, বরং তা فسخ তথা বিবাহ রহিতকারী হবে।

قوله : فَلِلْمَوْطُوءَةِ الْمَهْرُ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলতে চাচ্ছেন যে, স্ত্রী মহর প্রাপ্ত হবে না কি মহর পাবে না। উক্ত সমস্যার সমাধান হল : যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে যায় আর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে স্ত্রী পূর্ণ মহর প্রাপ্ত হবে এবং ইদ্দতের খোরপোষ পাবে। আর যদি সহবাস না করে থাকে তবে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। আর যদি স্ত্রী মুরতাদ্দাহ হয়ে যায় এবং স্বামীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে তবে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাবে। কিন্তু ইদ্দত রত অবস্থায় খোরপোষ পাবে না।

আর যদি সহবাস না হয়ে থাকে তবে সে মহর পাবে না এবং খোরপোষও পাবে না। কেননা, বিচ্ছেদ স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে। তাই স্ত্রীকে নাফরমান বলা হবে।

قوله : وَلَوْ اِرْتَدَّا اَوْ اَسْلَمَا مَعًا الخ : স্বামী স্ত্রী যদি এক সাথে মুরতাদ হয়ে যায় অতঃপর আবার একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। বিবাহের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এ মত পোষণ করেন। ইমাম যুফার প্রমুখদের দলীল হল একজনের ধর্মত্যাগ যেভাবে বিবাহের পরিপন্থী সুতরাং উভয়ের ধর্মত্যাগ করাটা অবশ্যই বিবাহের পরিপন্থী হবে। তাছাড়া দু জনের ধর্ম ত্যাগের মধ্যে একজনের ধর্ম ত্যাগ অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং একজনের ধর্মত্যাগে যেভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এখানে তাও হবে।

আমাদের দলীল : বনু হানিফা সম্প্রদায় যাকাত অস্বীকার করার দ্বারা মুরতাদ হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাদের নিকট সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাত প্রেরণ করেন। ফলে তারা সকল পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে বিবাহ নবায়নের নির্দেশ দেননি। সুতরাং এর দ্বারা সাহাবিগণের ইজমা ছাবিত হয়ে গেল। কাজেই এ ইজমার কারণে আমরা কিয়াসকে বর্জন করে বলি, যদি উভয়ে একসাথে মুরতাদ হয় আর পরবর্তীতে একসাথে আবার ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের বিবাহ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে। আকদে নিকাহের পূনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। তবে যদি এক সাথে উভয়ে মুরতাদ হয় কিন্তু পরবর্তীতে একজন মুসলমান হয় এরপর অন্যজন মুসলমান হয়। তবে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। কারণ, এক্ষেত্রে একজন মুসলমান থাকা অবস্থা অপরজন মুরতাদ এর উপর দৃঢ় পাওয়া গেছে যা বিবাহের পরিপন্থী।

بَابُ الْقَسْمِ

পরিচ্ছেদ : পালা বন্টন

الْبِكْرُ كَالثَّيِّبِ وَالْجَدِيدَةُ كَالْقَدِيمَةِ وَالْمُسْلِمَةُ كَالْكِتَابِيَّةِ فِيهِ وَلِلْحُرَّةِ ضِعْفُ الْأَمَةِ وَيُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْقُرْعَةُ أَحَبُّ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِذَا وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِلْأُخْرَى -

অনুবাদ : (পালা বন্টনের ক্ষেত্রে) বাকেরা (কুমারী) ছাইয়্যেবার (অকুমারীর) ন্যায় নতুন পুরাতনের ন্যায়, মুসলিমা কিতাবিয়ার ন্যায়। আর স্বাধীনার জন্য দাসীর দিগুণ। স্বামী তাদের থেকে যে কাউকে নিয়ে ভ্রমণ করতে পারেব। তবে লটারী উত্তম। আর যদি কেহ তার হিসসা অপরজনকে দিয়ে দেয় তবে পুনরায় ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْقَسْمِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) একাধিক বিবাহের বৈধতা নিয়ে আলোচনার পর উক্ত স্ত্রীদের মধ্যে কেমন ব্যবহার হবে এ নিয়ে শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনার অবতারণা করতেছেন। আর তাই নিয়ে তিনি باب القسم নামক অনুচ্ছেদ স্থাপন করেছেন। القسم শব্দের قاف বর্ণে فتحة যোগে তা মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আর قسم দ্বারা উদ্দেশ্য اَلْعَدْلُ بَيْنَ النِّسَاءِ স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান করা। قسم - قاف বর্ণে كسره এর সাথে তার অর্থ 'অংশ' আর قسم - قاف বর্ণে ও سين বর্ণদ্বয়ে فتح এর সাথে তার অর্থ হয় শপথ। যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করা অপরিহার্য তবে এসমতা প্রকৃতভাবে শর্তহীনভাবে সম্ভবপর নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

তোমাদের থেকে সম্ভব পর নয় যে তোমরা সকল স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান করবে। তোমাদের মন যতই কামনা করুক। তোমরা একদিকে একবারেই ঝুকে পড়বে না। যার দ্বারা তোমরা তাকে ঝুলন্তের ন্যায় ছেড়ে দেবে।

তবে হাঁ অনেক বিষয় রয়েছে যে গুলোর মধ্যে অবশ্যই সমতা বিধান করতে হবে। আর তা পবিত্র কুরআনুল কারীমে চার স্ত্রী বিবাহ করা বৈধ এরপর বর্ণনা করেন—

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

যদি তোমরা ভয় কর যে সমতা বিধান করতে পারবে না তবে এক স্ত্রীর উপরই অথবা তোমাদের নিকট যে দাসী রয়েছে তার উপরই যথেষ্ঠ কর।

উল্লেখ্য যে যদি সমতা বিধান সম্ভবপর না হয় তবে একজনকেই বিবাহ করার কথা ব্যক্ত হয়েছে এজন্য যে সে যেন আদল ভঙ্গকারী হিসেবে গুনাহগার না হয়। অন্যথায় সমতা ভঙ্গের সাথেও একাধিক বিবাহ করা সহীহ।

অপর দিকে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস :

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَ لَا اَمْلِكُ يَعْنِىْ الْقَلْبَ اَىْ زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ -

রাসূল (সা.) পালা বন্টন করতেন ও সমতা বিধান করতেন এবং বলতেন হে আল্লাহ্ ইহা আমার পালা বন্টন যার আমি মালিক। সুতরাং আপনি আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না যে বিষয়ে তুমি মালিক আমি মালিক নই। তথা অন্তর তথা মহব্বতের আধিক্যের ব্যাপারে।

সমতা ভঙ্গকারীর ব্যাপারে হাদীসে অনেক ভর্ৎসনা এসেছে যেমন হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত :

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اَحَدِهِمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شِقُّهُ مَائِلٌ اَىْ مَفْلُوْجٌ

রাসূল (সা.) বলেন যার দুজন স্ত্রী রয়েছে আর সে তাদের দুজনের একজনের প্রতি ধাবিত হয় তবে কিয়ামতের দিবসে সে এভাবে উঠবে যে তার একটি অঙ্গ কুজু হয়ে রয়েছে। (ফাতহুল কাদির)

অতএব উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, ইসলাম যেভাবে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে তদ্রূপ নারীরা যাতে অবহেলিত হতে হয় না এর জন্য সমতা বিধানকে পুরুষের উপর অবশ্যকীয় করে দিয়েছে।

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) শরীয়তের আলোকে পালা বন্টনসহ অন্যান্য সমতার আলোচনার দৃষ্টি দিয়েছেন।

قوله : اَلْبِكْرُ كَالثَّيِّبِ الخ : যদি কোন ব্যক্তির দুজন বা তার চেয়ে অধিক স্ত্রী থাকে আর তারা উভয়ে কুমারী হয় কিংবা উভয়ে অকুমারী হয় অথবা একজন কুমারী আর অপরজন অকুমারী তবে এসকল সুরতে স্বামীর উপর আবশ্যক পালা বন্টনে সমতা রক্ষা করা। এর দলিল হল পূর্বোক্ত হযরত আয়েশা (রাযি.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) এর হাদীসদ্বয়। যেখানে কুমারীও অকুমারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি বিধায় তার হুকুমের মধ্যে ও পার্থক্য করা যাবে না।

قوله : وَ الْجَدِيْدَةُ كَالْقَدِيْمَةِ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযারী কুমারী ও অমুকারীর ক্ষেত্রে যেভাবে সমতার সাথে পালা বন্টন করা আবশ্যক তেমনি নতুন ও পুরাতন। অনুরূপ বাকেরা নতুন ও পুরাতন সকলের সাথে সমতার সাথে পালা বন্টন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে নতুন স্ত্রী যদি কুমারী হয় তবে বিবাহের পর তার সাথে সাত দিন থাকবে। আর যদি অকুমারী হয় তবে তিনদিন থাকবে। তাদের দলীল হল : হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস :

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুমারির জন্য সাতদিন এবং অকুমারীর জন্য তিন দিন নির্ধারণ করেছেন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস (রাযি.) থেকে :

قَالَ اَلسُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَّمَ وَ اِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَّمَ -

সুন্নাত হল যখন অকুমারীর উপর কুমারীকে বিবাহ করা হয় তখন তার নিকট সাতদিন অবস্থান করবে। অতঃপর পালাবন্টন করবে। আর যখন অকুমারীকে বিবাহ করবে তখন তার নিকট তিনদিন থাকবে। তারপর পালা বন্টন করবে।

আমাদের দলীল হল ঐ সকল হাদীস যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রাযি.) ও হযরত

আবু হুরায়রা (রাযি.) এর হাদীস যা মুতলাক বা শর্তহীন যেখানে নতুন বা পুরাতন এর কোন শর্তারোপ করা হয়নি। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের আয়াত যা থেকে পালা বন্টনে সমতার আবশ্যকীয়তা প্রমাণিত হল সেখানেও কোনরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। তাই নতুন ও পুরাতনে কোনরূপ পার্থক্য করা হবে না। তাছাড়া আকলী দলীল হল : বিবাহের হকসমূহের মধ্য থেকে পালা বন্টন হল অন্যতম সুতরাং অন্যান্য হুকুকসমূহের ন্যায় পালা বন্টনেও সমতা রক্ষা করা হবে। যেমন বিবাহের এক হক হল খোরপোশ দেওয়া। সুতরাং নতুন, পুরাতন, বুদ্ধিমতি, অসুস্থ, সুস্থ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, কারো মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। সবাই খোরপোষে সমান হকদার তদ্রূপ পালা বন্টন হল বিবাহের অন্যতম হক সুতরাং তাতেও সমতা রক্ষা করা হবে।

قوله : وَلِلْحُرَّةِ ضِعْفُ الْاَمَةِ الخ : যদি কারো বিবাহে স্বাধীন স্ত্রী ও দাসী স্ত্রী বিদ্যমান থাকে তবে পালা বন্টনে স্বাধীন স্ত্রীর অর্ধেক দাসী স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। কেননা, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَ لِلْاَمَةِ لَيْلَةٌ স্বাধীনার জন্য দুরাত আর দাসীর জন্য এক রাত পালা বন্টন হবে।

তাছাড়া যেহেতু দাসী স্ত্রী হালাল হওয়া তা স্বাধীন স্ত্রীর হালাল হওয়ার চেয়ে নিম্ন মানের তাই হকসমূহের ক্ষেত্রেও নিম্নতা প্রকাশ করা জরুরী। সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে দাসী দ্বারা খালিছ দাসী। মুকাতাবাহ, উম্মেওলাদ, মুদাব্বারাহ সকল শ্রেণীকেই বুঝিয়েছেন।

قوله : وَ يُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ الخ : আমাদের হানাফীদের মতে যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তবে স্বামী সফরে যেতে যাকে তার ইচ্ছা হয় তাকেই নিয়ে সফরে যেতে পারবে। অর্থাৎ, সফরে যেতে পালা বন্টন করা ওয়াজিব নয়। তবে উত্তম হল তাদের নামে লটারী টানা। লটারীতে যার নাম বের হয়ে আসবে তাকে নিয়ে সফরে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সফরে যেতে স্ত্রীদের নামে লটারী টানা ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেহ লটারী না করে কাউকে সফর সঙ্গীনী বানিয়ে নেয় তবে ফিরে আসার পর যতদিন এ স্ত্রীকে নিয়ে সফরে ছিল ততদিন যাকে সফরে নেয়নি তার কাছে অবস্থান করবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল : হযরত আয়েশা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণীত হাদিস 'যখন হুজুর (সা.) সফরের ইচ্ছা করতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী চালাতেন। লটারীতে যার নাম উঠত তাকে তিনি সফর সঙ্গী করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উক্ত আমাল দ্বারা লটারীকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন। আমরা এর জবাবে বলি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জন্য পালা বন্টন ওয়াজিব ছিল না। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

'আপনি তাদের থেকে যাকে চান কাছে রাখুন আর যাকে চান দূরে রাখুন।'

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর পালা বন্টন ওয়াজিব ছিল না। আর লটারী করা একারণে মুস্তাহাব যে, স্বামীর সফরের সময় স্ত্রীর কোন হক নেই। সুতরাং স্বামী যদি তাদের কাউকে না নিয়ে যায় তাও তার এখতিয়ার আছে। তদ্রূপ যদি সে তাদের কোন একজনকে নিয়ে সফর করে তাও তার এখতিয়ার রয়েছে এবং এটি কোন হিসেবে আসবে না।

قوله : وَ لَهَا اَنْ تَرْجِعَ الخ : যদি কোন সতীন তার পালা বন্টনের হিসসা অপর সতীনকে দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয। এর দলীল হল : হযরত সাওদা (রাযি.) নিজের পালার দিন হযরত আয়েশা (রাযি.) এর জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলতে চেয়েছেন যে, যদি কোন স্ত্রী তার পালার দিন অন্য কোন সতীনকে দিয়ে দেয় অতঃপর সে আবার তা ফিরিয়ে নেয় তবে তা তার জন্য জায়েয। কেননা, যা এখনও ওয়াজিব হয়নি সে এমন হক রহিত করেছে। তাই তা রহিতই হবে না। সুতরাং এরুজু করা নিজের পালা থেকে বারণ করা হবে। তা এমন হবে না যে বিলুপ্তকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় : স্তন্যপান

هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَحُرِّمَ بِهِ وَإِنْ قَلَّ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا مَا حُرِّمَ مِنْهُ بِالنَّسَبِ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ -

অনুবাদ : (রিদ্বা বলা হয়) নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর মহিলার স্তন থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর চুষা। আর যদি ত্রিশ মাসের কম হয়, তবে রিদ্বা দ্বারা হারাম হয় যা বংশ সূত্রে হারাম হয়। তবে হারাম হয় না দুধ সম্পর্কীয় বোনের মা ও দুধ সম্পর্কীয় ছেলের বোন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ الرِّضَاعِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বিবাহ ও তার আংশিক আনুসাঙ্গিক আলোচনার পর দুধপান সম্পর্কীয় আলোচনার অবতারণ করতেছেন। যেহেতু দুধ সম্পর্কের মধ্যেও বিবাহ হারাম ও হালাম হওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত। رضاع শব্দটির রা বর্ণে فتح আর كسره এর সাথেও ব্যবহার হয়ে থাকে। শব্দটি باب سمع ও باب ضرب থেকে ব্যবহৃত হয়। তার অর্থ : স্তন থেকে দুধ চোষা। শরীয়াতের পরিষায় رضاعت বলা হয় নির্দিষ্ট সময়ে মহিলার স্তন থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ চোষণ করাকে।

قوله : هُوَ مَصُّ الرَّضِيْعِ الخ : দুগ্ধপোষ্য শিশুর শর্তহীনভাবে সাধারণ দুধ চোষণকে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী দুধ পানের হুকুম প্রদান করা হয়। হযরত হাসান বসরী, ইবনে মুসাইয়্যাব, ওয়াকী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক এবং জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম এ মতামত পোষণ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সর্বনিম্ন সন্তান পাঁচবার দুধ চোষণ করবে অথবা তার মুখে স্তনের বোটা ঢুকানো হলে তার সাথে حرمت رضاعت ছাবিত হবে।

জাহিরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে ইহাই। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে অন্য মত হচ্ছে সর্বনিম্ন তিনবার স্তন চুষণ বা তিনবার দুধ পান করানোর দ্বারা হুরমত ছাবিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দলীল পেশ করেন হুজুর (সা.) এর হাদীস :

لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَ لَا الْإِمْلَاجَةُ وَ لَا الْإِمْلَاجَاتَانِ

এক বা দুবার চোষা দ্বারা এবং এক বার দু'বার স্তন মুখে ঢুকানো দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

তাছাড়া হযরত আয়েশা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস :

قَالَتْ اَنْزَلَ فِى الْقُرْاٰنِ عَشَرَ رِضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسُ رِضَعَاتٍ

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, কুরআনে নির্ধারিত দশ ঢোক বর্ণিত হয়েছে। তারপর এর মধ্য থেকে পাঁচ ঢোক রহিত হয়ে গেছে।

আমাদের দলীল হল : আল্লাহর বাণী : اُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ ' তোমাদের মাতা যারা তোমাদেরকে দুধ

পান করিয়েছেন তাদেরকে তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।' তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস :

وَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ : দুগ্ধ পানের কারণে সে সবই হারাম হবে বংশের কারণে যা হারাম হয়। আয়াত ও হাদীস উভয়টাই মুতলাক যা সাধারণভাবে দুগ্ধ পান করলেই হারাম ছাবিত হওয়া বুঝায়। এতে কম বেশির কোন শর্তারোপ নেই। তাছাড়া আমাদের আকলী দলীল হল : দুগ্ধ পানের সময়সীমার ভেতর দুগ্ধ পান দ্বারা সন্তানের হাড় ও গোশত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে আর এজন্য সন্তান যার দুগ্ধ পান করল তার সাথে জুজিয়াতের সম্পর্ক হয়ে যায়। আর জুজিয়াত সৃষ্টি হওয়ার কারণেই حرمت رضاعت ছাবিত হয়। এখন কথা হলো, হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি পাওয়া ইহা বাতেনী বিষয়। সুতরাং একবার বা অল্প পরিমাণে যে বৃদ্ধি হয়নি এর কোন প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। এ জন্য আমরা বলি স্বাধারণভাবে দুগ্ধ পান পাওয়া গেলে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। গ্রন্থকার (রহ.) এর مص দ্বারা উদ্দেশ্য দুধ শিশুর পেটে পৌছা। অর্থাৎ মহিলার স্তন থেকে শিশুর পেটে দুধ পৌছা। শিশুর মুখে অথবা নাকের ভেতর দিয়ে। তদ্রূপ মহিলার স্তন থেকে সরাসরি শিশুর মুখে, অথবা মহিলা কোন পাত্রে তার দুধ দোহন করে উক্ত পাত্র থেকে সন্তানের মুখে দিয়ে দেয়। সর্বোপরি যে কোন পদ্ধতিতে যদি দুধ নির্ধারিত অবস্থায় শিশুর পেটে পৌছে গাজা হিসেবে তবে তার সাথে হুরমত সাবেত হয়ে যাবে।

গ্রন্থকারের উক্তি مِنْ ثَدْيِ الْأٰدَمِيَّةِ বলা দ্বারা পুরুষ বা যে কোন প্রাণির দুধ পান দ্বারা হুরমত ছাবেত হয় না ইহা বুঝিয়েছেন। তদ্রূপ الادمية শব্দটি مطلق বা সমাধারণভাবে রাখার দ্বারা কুমারী, অকুমারী, জীবিত, মৃত সকল শ্রেণীর মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

قوله : فِى وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) নির্দিষ্ট সময় বলতে দুগ্ধ পানের বয়সকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং দুগ্ধ পানের মিয়াদ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে শিশু ত্রিশ মাস পর্যন্ত দুগ্ধ পান করতে পারবে। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে দুই বৎসর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এমত পোষণ করেন।

ইমাম যুফর (রহ.) এর মতে দুগ্ধ পানের বয়স হল তিন বৎসর। ইমাম যুফার (রহ.) এর দলীলের সারাংশ হচ্ছে, দুই বৎসরের পর এমন কিছু সময়ের প্রয়োজন যে সময়ে শিশু দুগ্ধ ছাড়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হতে পারে। আর এক বৎসর এমন যার মধ্যে শিশুটি তার অভ্যাস পরিবর্তন করে অন্যখাদ্যের অভ্যস্ত হতে পারবে। এ জন্য মোট তিন বৎসরকে দুগ্ধ পানের মেয়াদ কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا 'তাকে গর্ভ ধারণের ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হল ত্রিশ মাস। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দুগ্ধ পানের ও গর্ভ ধারণের মেয়াদ কাল ত্রিশ মাস বর্ণনা করেছেন। এদিকে গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে ছয়মাস। সুতরাং দুধ পানের মেয়াদ দুই বৎসর অবশিষ্ট থাকল। এরপর দুধ পান ছাড়ানো হবে। দ্বিতীয় দলীল : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস ঃ لَا رِضَاعَ اِلَّا مَاكَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ 'দুগ্ধ পানের অবকাশ শুধু দুই বৎসরেই আছে।'

ইবনে আদী (রহ.) এর বর্ণনায় রয়েছে— لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ اِلَّا مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ - 'দুগ্ধ পান দ্বারা হারাম হবে না তবে দু বৎসরের মধ্যে।' সাহাবাইন (রহ.) এর মতের সমর্থন পবিত্র কুরআনের আয়াত وَ فِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ 'এবং তার দুধ ছাড়ানো হবে দু' বৎসরের মধ্যে'। অন্য আয়াতে রয়েছে—

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

'দুগ্ধপায়ী মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বৎসর দুধ পান করাবে যে চায় তার সন্তানকে দুধের মেয়াদকাল পূর্ণ করতে'। সাহাবাইন (রহ.) এর কুরআন হাদীসের প্রমানাদি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দুধ পানের মেয়াদকাল দু বৎসর হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : কুরআনের আয়াত وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا এখানে আল্লাহ তা'আলা গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো এ দু বিষয়ের উভয়টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এ মেয়াদ উভয়টির জন্য পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, গর্ভের সর্বোচ্চ ত্রিশ মাস আর দুধ ছাড়ানোর সর্বোচ্চ মেয়াদ ত্রিশ মাস। এ মেয়াদ উভয়টির মধ্যে বন্টন হবে না। এর উদাহরণ বাস্তবেও আছে। যেমন, কারো কিছু ঋণ খালিদের নিকট আর কিছু ঋণ হামিদের নিকট। এখন ঋণদাতা উভয়কেই লক্ষ করে এক বৎসরের অবকাশ দিল। তবে এ এক বৎসর উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে না। বরং খালেদের জন্য এক বৎসর আর হামিদের জন্যও এক বৎসরের পূর্ণ অবকাশ থাকবে। তদ্রূপ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি বিষয়ের মেয়াদ পৃথক পৃথকভাবে ত্রিশ মাস রেখেছেন। উভয়টির মধ্যে এ ত্রিশ মাস বন্টন করে দেয়া হবে না। তবে হামলের মেয়াদ কম করার দলীল হযরত আয়েশা (রাযি.) এর হাদীস দ্বারা হয়। হাদীসটি হল :

اَلْوَلَدُ لَايَبْقٰى فِى بَطْنِ اُمِّهٖ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَ لَوْ بِقَدْرِ فَلْكَةِ مِغْزَلٍ

সুতরাং আল্লাহ তাআলার বর্ণিত দ্বিতীয় বিষয় তথা فصال তার বাহ্যিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে।

তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর আকলী দলীল হল : সন্তান দুগ্ধ গাজা গ্রহণ করা থেকে অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য। তথা খাদ্য পরিবর্তন করার জন্য নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তিনি হামলের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাসকে খাদ্য পরিবর্তনকারীরূপে গ্রহণ করেছেন। কেননা, গর্ভের সন্তানের খাবার হল তার মাতার খাবার। প্রসবের পর তার খাবার পরিবর্তন হয়ে দুধের উপর নির্ভর হল। এমনিভাবে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের খাদ্য স্তন্য পরিত্যাগকারী সন্তানের খাদ্যের ভিন্ন। সুতরাং এ থেকে প্রতিয়মান হল যে খাদ্য পরিবর্তনশীল মেয়াদ হল ছয় মাস। তাই পূর্ণ দু' বৎসরের পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হবে। দু' বৎসরের পরের দুধ পানের পারিশ্রমিক পাবে না। আর কুরআনের আয়াত وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ আয়াতে حولين এর قيد পারিশ্রমিকের উপর সম্পৃক্ত হবে। কেননা, এর পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— فَاِنْ اَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا 'যদি তারা উভয়ে দুধ ছাড়াতে চায় পারস্পরিক সন্তুষ্টি দ্বারা'। উক্ত আয়াতে দুধ ছাড়ানোকে সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যদি দু' বৎসরের পর দুধ পান করানো হারাম হতো তবে সন্তুষ্টির সাথে যুক্ত করা হত না। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, দুধ পান করার মেয়াদ দু' বৎসর ছয় মাস হবে।

ফায়দা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) দুধ পানের মেয়াদকে ত্রিশমাসের সাথে শর্তারোপ করে একথা বলতে চাচ্ছেন যে, দুধ পানের মেয়াদের পর দুধ পান করলে হুরমত ছাবিত হবে না। আবার ثلثين কে حُرِّمَ فعل এর সাথে ظرف করে ইহাও বলতে চাচ্ছেন যে, আহনাফের যে মতানৈক্য তা হচ্ছে হুরমত ছাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে। অন্যথায় দুগ্ধপায়ী রমনীদের পারিশ্রমিকে কোন মতানৈক্য নেই। আর তা হল সর্ব সম্মতিক্রমে দু' বৎসর। গ্রন্থকার (রহ.) ثلثين শব্দটিকে مطلق রেখে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে যদি কোন শিশু দুধ ছেড়ে দেয় অতঃপর দুধ পানের মেয়াদের ভেতর দুধ পান করে তবুও রেজায়াত ছাবিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যদি শিশু এক বৎসর পর দুধ পান করা ছেড়ে দেয় এবং অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর দু বৎসর বয়সে কোন মহিলার স্তন থেকে দুধ পান করে তবুও এ মহিলার সাথে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে।

তবে হাঁ দুধ পানের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পরে দুধ পান করলে হুরমত ছাবিত হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন لَا رِضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ 'স্তন ছাড়ানোর পর স্তন্য পান ধর্তব্য নয়'। তাছাড়া হুরমত ছাবিত হয় দুধ দ্বারা শরীর বৃদ্ধি লাভ হওয়ার কারণে আর সেটা হয়ে থাকে স্তন্য পানের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে। কেননা, বড় সন্তানের উক্ত দুধ দ্বারা দেহ গঠিত হয় না।

قوله : مَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) উক্ত ইবারতের মাধ্যমে একটি নীতিমালা বর্ণনা করেছেন যে,

যাদেরকে বংশ সূত্রে বিবাহ করা হারাম হয় তাদেরকে স্তন্য পানের কারণেও হারাম হবে। দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস- يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ তোমাদের নসব (রক্ত সম্পর্ক) এর কারণে যা হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও তা হারাম। তবে হা উক্ত নীতিমালা থেকে দু'টি সূরত বাদ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থকার (রহ.) তা إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَ أُخْتَ ابْنِهِ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থকার (রহ.) এর উক্তি اختہ ام। لا। এর اختہ দ্বারা ব্যক্ত উদ্দেশ্য হল দুধ সম্পর্কীয় বোনের মা অথবা সহোদর বোনের দুধ সম্পর্কীয় মা। কেননা, যদি নসবী বোনের নসবী মা হয় তবে অর্থ দাড়াবে নসবী বোনের মা এ পর্যায়ে নসবী বোনের মা হয়তো তার নিজেরও মা হবেন যখন তারা উভয়ে সহোদর হবে। অথবা বৈমাত্রেয় হবে। অথবা নসবী বোনের মা দ্বারা উদ্দেশ্য তার পিতার স্ত্রী। এ দু সূরতের প্রথমটি তো তার নিজের মা, আর দ্বিতীয় সূরতে পিতার স্ত্রী। এ দুজনকেই বিবাহ করা জায়েয নয়। সুতরাং এখানে দুধ সম্পর্কীয় বোনের এমন মা যার থেকে উক্ত ছেলে দুধ পান করেনি, অথবা নসবী বোনের দুধ সম্পর্কীয় মা যার থেকে উক্ত ছেলে দুধ পান করেনি, উদ্দেশ্য হবে। অতএব إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ এর মোট পাঁচটি সুরত হতে পারে। ১। সহোদর বোনের মা। ২। বৈমাত্রেয় বোনের মা। এ দু অবস্থার উভয়কেই বিবাহ করা হারাম। ৩। রেজায়ী বোনের নসবী মা। ৪। রেজায়ী বোনের রেজায়ী মা (যার থেকে সে দুধ পান করেনি) ৫। বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রিয় অথবা সহোদর বোনের রেজায়ী মা। নিম্নোক্ত তিন সুরতে বোনের ভাই ঐ বোনের মাদেরকে বিবাহ করতে পারবে।

গ্রন্থকারের উক্তি وَ أُخْتُ اِبْنِهِ দ্বারা দ্বিতীয় সূরত বা আলোচিত নিতীমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং أُخْتُ اِبْنِهِ এর মোট ৫টি সূরত হতে পারে। তন্মধ্যে থেকে প্রথম দু সূরত উদ্দেশ্য নয়। তাহল : ১। নসবী ছেলের নসবী বোন। ২। নসবী ছেলের বৈপিত্রীয় বোন। এ উভয় সূরতে বিবাহ করা জায়েয হবে না। কেননা, প্রথম সূরতে সে তো তার বীর্যেরই কন্য। তাই তাকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয নেই। আর দ্বিতীয় সূরতে তার ছেলের শুধু বৈপিত্রীয় তথা মা শরীকী বোন হয় তবে এটি তার সৎ মেয়ে হবে। আর সৎ মেয়েকেও বিবাহ করা হারাম। যাই হউক উভয় সূরতে (কন্যা হউক বা সৎ কন্যা হউক) ঐ নসবী ছেলের নসবী বোনের সাথে বিবাহ জায়েয হবে না। আর স্তন্য পানের মধ্যে উক্ত কারণগুলো নেই। তাই স্তন্য পানের সূরতে বিবাহকে জায়েয বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্তন্য পানের তিনটি সূরত রয়েছে। ১। নসবী ছেলের দুধ সম্পর্কীয় বোন। ২। দুধ সম্পর্কীয় ছেলের নসবী বোন। ৩। দুধ সম্পর্কীয় ছেলের দুধ সম্পর্কী বোন। উক্ত তিন সূরতে ছেলের বোনকে বিবাহ করা জায়েয।

زَوْجُ مُرْضِعَةٍ لَبَنُهَا مِنْهُ اَبٌ لِلرَّضِيعِ وَابْنُهُ اَخٌ وَبِنْتُهُ اُخْتٌ وَاَخُوهُ عَمٌّ وَاُخْتُهُ عَمَّةٌ وَتَحِلُّ اُخْتُ اَخِيهِ رَضَاعًا وَ نَسَبًا -

---

অনুবাদ : স্তন্যদানকারিণীর স্বামী যার মধ্যস্থতায় তার মাঝে দুধের সঞ্চার (সে দুগ্ধপোষ্য শিশুর) পিতা, তার ছেলে (দুগ্ধপোষ্য শিশুর) ভাই, তার মেয়ে (দুগ্ধপোষ্য শিশুর) বোন, তার ভাই (দুগ্ধপোষ্য শিশুর) চাচা, তার বোন (দুগ্ধপোষ্য শিশুর) ফুফু। আর তার ভাইয়ের দুধ বোন বা বংশীয় বোন (বিবাহ করা) হালাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ زَوْجُ مُرْضِعَةٍ الخ : কোন মহিলা অন্য কোন শিশুকে দুধ পান করালো। এতে স্তন্য দানকারিণীর স্বামী ঐ দুধ পানকারীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। সাথে ঐ শিশুর জন্য তার দুধ মাতার স্বামী, স্বামীর বাপ-দাদা

এবং তাদের সন্তানাদি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। দলীল হল, পবিত্র হাদীস يُحَرَّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ। নসবের কারণে যেভাবে পিতা-মাতা উভয় দিকে হুরমত ছাবিত হয় তদ্রূপ দুধ পানের কারণেও উভয় দিকে হুরমত ছাবিত হয়। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রাযি.) এর হাদীস তা হল : হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমার নিকট আফলাহ ইবনে আবী কায়েস আসলেন। আমি তার সাথে পর্দা করলাম। আফলাহ (রাযি.) বললেন, তুমি আমার সাথে পর্দা কর অথচ আমি তোমার চাচা। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম কিভাবে? আফলাহ (রাযি.) বললেন, তোমাকে আমার ভাইয়ের স্ত্রী দুধ পান করিয়েছে। হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, আমাকে মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করায়নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার নিকট তশরীফ আনলে আমি তার নিকট বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন—

لِيَلِجْ عَلَيْكِ اَفْلَحُ فَاِنَّهٗ عَمُّكِ مِنَ الرِّضَاعَةِ

'আফলাহ তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারে। কেননা, সে তোমার চাচা।'

উক্ত হাদীসে হুজুর (সা.) আফলাহকে হযরত আয়েশা (রাযি.) এর চাচা স্থির করেছেন।

সুতরাং দুগ্ধ পানকারিণীর স্বামী যদি দুধ পিতা না হন তবে আফলাহ কিভাবে দুধ চাচা হবেন। হুজুর (স.) যেহেতু দুধ চাচার সাথে হুরতম ছাবিত করেছেন, তবে অবশ্যই দুধ পিতার সাথে হুরমত ছাবিত হবে।

আকলী দলীল হল : স্বামী হল স্ত্রীর স্তনে দুধ প্রবাহিত করার কারণ। এজন্য সতর্কতার দরুন স্বামীর সাথেও হুরমত ছাবিত হবে।

قوله : وَاَبْنُهٗ اَخٌ الخ : যেহেতু দুধ মাতার স্বামী নসবী পিতার সমতুল্য হল এবং তার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ হল এজন্য নসবী হিসেবে যেভাবে اصل القريب (পিতা) এর সন্তানাদির সাথে হুরমত ছাবিত। তদ্রূপ রেজায়ীভাবেও اصل القريب (দুধ পিতার) এর সন্তানাদি এর সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ আর اصل القريب এর শাখা তার নসবী ভাই বোনের ন্যায় হবে। অনুরূপভাবে দুধ সম্পর্কীয় اصل القريب তথা দাদাও তার সন্তানাদি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এবং اصل البعيد এর সন্তানাদি তার নসবী চাচা ও ফুফুর ন্যায় হবে। নসবী চাচা বা ফুফুর সাথে যেভাবে হুরমত ছাবিত তদ্রূপ রেজায়ী চাচা ও ফুফুর সাথে হুরমত ছাবিত। এদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ।

قوله : وَ تَحِلُّ اُخْتُ اَخِيْهِ الخ : দুধ ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েয। এ বোন তার নসবী বা দুধ সম্পর্কীয় হোক উভয় অবস্থায় বিবাহ জায়েয। কেননা, নসবী ভাইয়ের নসবী বোনকেও বিবাহ করা জায়েয়। যেমন, খালেদের দুই ছেলে বকর ও মাজেদ। উভয় ছেলের মা পৃথক পৃথক। অর্থাৎ, উভয় বৈমাত্রেয় ভাই। এখন খালেদ বকরের মাকে তালাক দিয়ে দিল। বকরের মা অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পর এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করল। সে বকরের বৈপিত্রীয় বোন হল। এখন যদি মাজেদ চায় তবে বকরের এ বোনকে বিবাহ করতে পারবে। কেননা, মাজেদের জন্য এ মেয়ে অপরিচিত। তদ্রূপ রেজায়ীভাবেও জায়েয।

وَ لَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ ثَدْيٍ وَبَيْنَ مُرْضَعَةٍ وَوَلَدِ مُرْضِعَتِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا وَاللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ بِالطَّعَامِ لَا يُحَرِّمُ وَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ لَوْ بِمَاءٍ وَدَوَاءٍ وَلَبَنِ شَاةٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى وَلَبَنُ الْبِكْرِ وَالْمَيِّتَةِ مُحَرِّمٌ -

অনুবাদ : এক স্তনের দুই দুগ্ধ পোষ্য পরস্পর হালাল নয়। এবং দুগ্ধপোষ্য মেয়েও দুগ্ধ দান কারিণীর ছেলে এবং ছেলের ছেলের মধ্যে পরস্পর হালাল নয়। খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত দুধ হুরমত ছাবিত করে না। যদি দুধ পানির বা ঔষধের কিংবা বকরীর দুধের অথবা অন্য মহিলার দুধের সাথে মিশ্রিত হয় তবে প্রবলতরের বিবেচিত হবে। কুমারীর এবং মৃতের দুধ হুরমত ছাবিতকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَاحِلَّ بَيْنَ رَضِيعَى الخ : যদি আজনবী কোন ছেলে মেয়ে এক মহিলার দুধ পান করে। এ দুধ পান এক সময় করুক বা আগে পরে করুক তারা উভয় একজন অপরজনের দুধভাই বোন হয়ে যাবে। তাই যেভাবে নসবী ভাই তার বোনকে বিবাহ করতে পারে না তদ্রূপ উক্ত দুধ ভাই বোন পরস্পর বিবাহ করা সহীহ হবে না। হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ইহাই হল নীতিমালা।

অনুরূপভাবে দুধ মাতার সন্তানাদী অথবা তাদের সন্তানাদি যত নিম্নে যাক কাউকে দুধ পানকারী বিবাহ করতে পারবে না। কেননা, দুধ মাতা তার নসবী মাতার ন্যায়। সুতরাং যেভাবে নসবী মাতার সন্তানাদী তার ভাই বোন হওয়াতে তাদেরকে বিবাহ করতে পারে না। তেমনি দুধ মাতার সন্তানাদি তার ভাই বোন হওয়াতে সে তাদেরকেও বিবাহ করতে পারবে না। একই সমস্যা তাদের সন্তানাদি অর্থাৎ, দুধ মাতার সন্তানাদির সন্তানাদি যত নিম্নে যাক তাদের কারো সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ নয়।

قوله : وَ اللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ الخ : যদি দুধ খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হয় আর তা আগুনে পাকানো হয় দুধ পরিমানে কম হউক বা বেশি হউক। অতঃপর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে খাওয়ানো হয় তবে যার থেকে দুধ নেয়া হয়েছে তার সাথে ঐ শিশুর হুরমত ছাবিত হবে না। এতে সকল ফকীহ একমত। আর যদি আগুনে পাকানো হয় না তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে হুরমত ছাবিত হবে না। দুধ কম হউক বা বেশি। সাহাবাইন (রহ.) বলেন, যদি দুধ বেশি হয় তবে হুরমত ছাবিত হবে। আর কম হলে হুরমত ছাবিত হবে না। আগুনে পাকানো হলে হুরমত ছাবিত হবে না এর দলিল হল, যদি দুধ কম হয় তবে তো পরিস্কার যে তা খাদ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না আর যদি বেশি হয় তবে হুরমত একারণে ছাবিত হবে না যে যখন দুধ খাদ্যে মিশ্রিত করে পাকানো হল তখন দুধ খাদ্যের অনুবর্তী হয়ে গেল। তাই এখন এ দুধকে শর্তহীনভাবে দুধ বলা হবে না। তাই হুরমত ছাবিত হবে না।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : এখানে আধিক্যের বিবেচনা করা হবে। যেভাবে পানির সাথে দুধ মিশ্রিত হলে আধিক্যের বিবেচনা করা হয়। তবে শর্ত হল দুধকে অন্য কোন কিছু (তথা আগুন) তার মূল অবস্থাকে পরিবর্তন যেন না করে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : যখন দুধ কোন খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হল তখন শিশুর হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল গেজা হবে খাদ্য। দুধ শুধু খাদ্যের অনুবর্তী হবে। সুতরাং তা এমন হল যেমন খাদ্যে দুধ কম হল। যদি মূলত তা কখন বেশি থাকে না কেন। তার সাথে হুরমত ছাবিত হবে না।

উল্লেখ্য যে যদি খাদ্যে মিশ্রিত দুধ থাকে আর লোকমা উঠাতে দুধ ফোটা ফোটা করে পড়ে তবে তা দ্বারা হুরমত ছাবিত হবে নাকি হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিশুদ্ধ মত হল যে, হুরমত ছাবিত হবে না।

কেননা, খাদ্যের মধ্যে শরীরের পুষ্টিগত গুণ বিদ্যমান। সুতরাং দুধ খাদ্যের অনুবর্তী হয়ে হুরমত ছাবিত হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে এমতও বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। কেননা, দুধের একটি ফুটাতো অবশ্যই শিশুর পেটে পৌঁছেছে। আর তাই হুরমত ছাবিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে বিশুদ্ধ মত হল খাদ্যের সাথে মিশ্রিত দুধে হুরমত ছাবিত হবে না।

قوله : وَ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ الخ : যদি দুধে পানি মেশানো হয় আর ঐ পানি কোন শিশুকে পান করানো হয় তবে আমাদের মাযহাব হল দেখতে হবে দুধের পরিমাণ পানি থেকে কম না বেশি। যদি দুধের পরিমাণ পানি থেকে কম হয় তবে হুরমত ছাবিত হবে না। আর যদি দুধের পরিমাণ পানি থেকে বেশি হয় তবে আমাদের মতে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে যদি সর্বনিম্ন পাঁচ ঢোক পরিমাণ দুধ পানিতে মিশ্রিত হয় আর তা শিশুকে পান করানো হয় তবে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। যদিও পানি বেশি হয়। তিনি দলীল পেশ করেন : উক্ত পানিতে প্রকৃতভাবে দুধ বিদ্যমান আছে। তাই দুধ পান করা ধর্তব্য হবে। কেননা, প্রকৃত বস্তুকে তো আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

আমাদের দলীল হল : কায়দা অনুযায়ী কম পরিমাণ অংশ বিদ্যমান নয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। এজন্য তা অধিকের বিপরীত প্রকাশ পাবে না। যেমন কেহ শপথ করল যে, সে দুধ পান করবে না। অতঃপর সে পানি মিশ্রিত দুধ পান করলো। আর পরিমাণে পানি বেশি আর দুধ কম তবে এ ব্যক্তি শপথ ভঙ্গকারী হবে না। অনুরূপ এখানেও কম দুধ হওয়ায় হুরমত ছাবিত হবে না। দ্বিতীয় দলীল হল : দুগ্ধ পানের বয়স ছাড়িয়ে যাওয়া সন্তানকে দুধ পান করানো দ্বারা হুরমত ছাবিত হয় না। কেননা, এখন তার শরীর দুধ দ্বারা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বরং খাদ্য দ্বারা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সুতরাং প্রতিয়মান হল এমন দুধ পান করা যা দ্বারা হাড় গোস্ত বৃদ্ধি পায়, তা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর পান করানো হলে হুরমত ছাবিত হবে। আর যেহেতু অল্প দুধ ছাড়া খাদ্য হাসিল হয় না, তাই এর দ্বারা হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি পাবে না। অতএব, যখন হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি পেল না তাই এর দ্বারা হুরমত ছাবিত হবে না। অনুরূপ যদি দুধ ঔষধের সাথে মিশ্রিত হয় তবে যদি দুধের পরিমাণ বেশি হয় আর তা শিশুকে পান করানো হয় তবে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। কেননা খাদ্যের ক্ষেত্রে দুধ হইল মূল উদ্দেশ্য। ঔষধ তো প্রয়োগ করা হয় নিছক দুধ যথাস্থানে পৌছার শক্তি বৃদ্ধির জন্য। আর যদি দুধের পরিমাণ কম হয় তবে হুরমত ছাবিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি মহিলার দুধ বকরীর দুধের সাথে মেশানো হয় এবং শিশুকে পান করানো হয় তবে অধিকের উপর ফয়সালা প্রদান করা হয়।

قوله : وَ إِمْرَاةٍ أُخْرَى الخ : সুরতে মাসআলা হল : পূর্বের মাসআলার ন্যায় অর্থাৎ, যদি কোন দুজন স্ত্রী লোকের দুধ একত্র হয়ে যায় এবং কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পান করানো হয় তবে হুরমত ছাবিত হবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যার দুধ অধিক হবে তার সাথেই হুরমত ছাবিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও এ মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, উভয়ের সাথেই হুরমত ছাবিত হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে। একটি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর সাথে আর অপরটি ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) এর সাথে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলীল হল : উভয় স্ত্রী লোকের দুধ মিশ্রিত হয়ে একই বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই এর রাদ্বআতের ভিত্তি করার ক্ষেত্রে স্বল্পতরকে অধিকতর এর অনুবর্তী করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যুফার (রহ.) এর দলীল হল : কোন বস্তু তার সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে প্রাধান্য পেতে পারে না। কারণ, প্রধান্য পাওয়া তখনই সম্ভব যখন স্বল্পতর বস্তু না থাকে। আর কোন বস্তু তার সমজাতীয়র সাথে মিলে অস্তিত্ব হীন হয় না, বরং তার মধ্যে বৃদ্ধি হয়। কেননা, উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। সুতরাং যেহেতু

উভয় স্ত্রীলোকের দুধ সমজাতীয় তাই কারো দুধ অপর জনের দুধের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে অনস্তিত্ব হয়নি, বরং উভয় দুধই তার নিজ নিজ উদ্দেশ্যে তার নিজ সত্তাসহ বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্য হুরমত উভয় জনের সথে সম্পৃক্ত হবে। শুধু একজনের সাথে হবে না।

قوله : وَ لَبَنُ الْبِكْرِ الخ : যদি কোন কুমারী মেয়ের স্তন থেকে দুধ নেমে আসে আর সে তা কোন শিশুকে খাইয়ে দেয় তবে সকলের মতে উক্ত কুমারী মেয়ের সাথে শিশুটির হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। দলীল হল কুরআনের আয়াত- وَ اُمَّهَاتُكُمُ الّتِي اَرْضَعْنَكُمْ উক্ত আয়াতে শর্তহীনভাবে উল্লেখ হয়েছে এতে কুমারী হওয়া বা না হওয়ার কোন قيد নেই। তাছাড়া কুমারীর দুধ ও শরীর বৃদ্ধি করার সবব হয়। তাই এর দ্বারা শরীরের অংশীদারিত্বের সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য সতর্কতার জন্য হুরমতের হুকুম প্রদান করা হয়েছে।

قوله : وَالْمَيِّتَةُ الخ : যদি কোন নারীর মৃত্যুর পর দুধ দোহন করা হয় এবং কোন শিশুকে তা পান করানো হয় তবে হানাফিদের মতে উক্ত মহিলার সাথে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ.) এ মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে হুরমত ছাবিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল পেশ করেন : হুরমত প্রথমত স্তন্য দানকারীর সাথে দুধ পানকারীর হয়ে থাকে। অতঃপর তার মধ্যস্ততার অন্যান্য নারী পুরুষের দিকে হুরমত স্থানান্তরিত হয়। এখন যেহেতু এ নারী মৃত্যুর কারণে হুরমতের ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যমান থাকল না তাই অন্যান্যের দিকেও হুরমত স্থানান্তরিত হবে না। যেমন কেহ মৃত নারীর সাথে সহবাস করল, তাহলে এর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক সাবিত হবে না।

আমাদের দলীল হল : হুরমতের মূল কারণ হল শারীরিক অংশিদারিত্ব সৃষ্টি হওয়া। আর ইহা এ দুধের মধ্যে বিদ্যমান। এ দুধে শিশুর হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য আমরা বলি যে দুধ পানের কারণে শারীরিক অংশিদারিত্ব সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সন্দেহ বিদ্যমান। সুতরাং এ সন্দেহের দরুন আমরা হুরমতের হুকুম প্রদান করে থাকি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর একথা বলা যে মৃত্যুর কারণে এ নারী আর মাহরাম হওয়ার ক্ষেত্র থাকল না, একথাটি ভুল। কেননা, যদি কোন মেয়ে এ মৃত নারীর দুধ পান করে আর তার কোন স্বামী থাকে তবে প্রয়োজন বশত উক্ত মেয়ের স্বামী মৃত নারীকে তায়াম্মুম ও কাফন পরাতে পারবে। যখন তার কোন মাহরাম থাকবে না। উক্ত মেয়ের স্বামী তায়াম্মুম ও কাফন পরাতে পারবে এজন্য যে, সে তো এ মৃত নারীর জামাতা হয়ে গেল। দুধ পানকারিণী মেয়েকে বিবাহ করার দরুন মৃত নারী তার দুধ শাশুড়ী হয়ে গেল যা তার স্ত্রীর নসবী মায়ের সমতুল্য। সুতরাং মৃত্যুর পরও নারী মাহরাম হওয়ার ক্ষেত্র হিসাবে বাকী থাকল।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বৈবাহিক মাহরামাতের উপর কিয়াস করে বলেন যেভাবে ঐ নারীর সাথে সহবাস করাতে বৈবাহিক মাহরামাতের সম্পর্ক সাবেত হয় না তদ্রূপ মৃত নারী থেকে দুধ পানের দ্বারা মাহরামাত হবে না। আমরা তার এ ব্যক্তব্য গ্রহণ করি না। কারণ, রাদ্ব'আতের হুরমতকে বৈবাহিক হুরমতের উপর কিয়াস করা চলে না। কেননা, রাকআতের মধ্যে হুরমতের সবব হল হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি পাওয়া। আর তা তো মৃত নারীর মধ্যের দুধে বিদ্যমান কিন্তু সহবাসের কারণে সন্তান চাওয়া হয়। কিন্তু নারী মৃত হওয়াতে সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র আর থাকে না।

আর যখন মৃত্যুর পর সন্তানের চিন্তাও করা যায় না তাই অংশীদারিত্বেরও চিন্তা করা যায় না। এজন্য এক্ষেত্রে হুরমত ছাবিত হয় না। পক্ষান্তরে মতৃ নারীর দুধ দোহন করে বাচ্চাকে পান করাতে বাচ্চার মধ্যে হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধির সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। এজন্য অংশিদারিত্ব সাবেত হয়ে যায়। সুতরাং বৈবাহিক হুরমত ও দুধ পানের হুরমত উভয়টি এক নয়; বরং একটি থেকে অপরটি পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাই একটি অপরটির উপর কিয়াস করা যায় না।

لَا الِاحْتِقَانُ وَلَبَنُ الرَّجُلِ وَالشَّاةِ وَلَوْ اَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا حَرُمَتَا وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إِنْ لم يَطَأْهَا وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُهُ وَيرجِعُ بِهِ على الْكَبِيرَةِ إِنْ تَعَمَّدَتِ الْفَسَادَ وَإِلَّا لَا وَيثْبتُ بِمَا يَثْبتُ بِهِ الْمَالُ -

অনুবাদ : তবে ডুশ, (অসুস্থ শিশুর গুহ্যদ্বার দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করানো) দ্বারা বকরী ও পুরুষের দুধ দ্বারা হুরমত ছাবিত হবে না। যদি কোন মহিলা তার সতিনকে দুধ পান করায় তবে দুজনই হারাম হয়ে যাবে। (স্বামীর উপর)। যদি বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তবে তার কোন মহর নেই। আর ছোট স্ত্রীর জন্য অর্ধ মহর হবে। যদি বড় স্ত্রী বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছায় দুধ পান করিয়ে থাকে তবে (ছোট স্ত্রীর) মহর বড় স্ত্রীর নিকট থেকে ফিরিয়ে আনা হবে। নতুবা নয়। (যদি বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা না থাকে তবে ফিরিয়ে নেয়া হবে না।) রেদা'আত সাব্যস্ত হয় যা দ্বারা মাল সাব্যস্ত হয়। (অর্থাৎ, দুজন পুরুষের অথবা একজন পুরষের ও দুজন মহিলার সাক্ষী দ্বারা রেদা'আত সাবিত হয়।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لَاالْاِحْتِقَانُ الخ : ডুশ দেওয়া (অর্থাৎ, অসুস্থ ব্যক্তির গুহ্যদ্বার দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করানোর) সূরতে মাসআলা হল : যদি কোন শিশুর গুহ্যদ্বার দিয়ে পেটে কোন মহিলার দুধ ঔষধ হিসাবে প্রবেশ করানো হয় তবে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার সাথে হুরমতের সম্পর্ক হবে না।

তবে নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। কেননা, যেভাবে ডুশ দ্বারা রোজা ফাসেদ হয়ে যায়, তদ্রূপ কোন মহিলার দুধ যদি শিশুর গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করা হয় তবে হুরমত ছাবিত হয়ে যাবে। জাহিরী বর্ণনার দলীল হল : ডুশের মাধ্যমে শরীরের সংশোধন বিদ্যমান রয়েছে এজন্য রোজা ফাসেদ হয়ে যায়। আর দুগ্ধ পানে হারামকারী বিষয় হচ্ছে হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ পুষ্টিগুণ বিদ্যমান থাকা। আর ডুশের মধ্যে বৃদ্ধিকারী পুষ্টিগুণ বিদ্যমান নেই তাই হুরমত ছাবিত হবে না। কেননা, পুষ্টিগুণ লাভ হয় যা উপর থেকে পেটে পৌছানো হয়। নীচের দিকে নয়। সুতরাং যখন ডুশের মধ্যে পুষ্টিগুণ যা দ্বারা হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধি হয় তা পাওয়া গেল না। তাই তা রেদআত ছাবিত করবে না এবং হুরমত যুক্ত হবে না।

قوله : وَ لَبَنَ الرَّجُلِ الخ : যদি কোন পুরুষের স্তন থেকে দুধ বের হয় এবং তা কোন শিশুকে পান করানো হয় তবে তার সাথে হুরমত ছাবিত হবে না। কেননা, মাছের রক্ত যেভাবে প্রকৃত রক্ত নয়, তদ্রূপ পুরুষের দুধ তা প্রকৃত দুধ নয়। তাছাড়া পুরুষের দুধ এর মধ্য হাড় ও গোস্ত বৃদ্ধির কোন যোগ্যতা নেই। তাই হুরমত ছাবিত হবে না। পুরুষের দুধ যে প্রকৃত দুধ নয় এর প্রমাণ হল : দুধ ঐ সত্তা থেকে কল্পনা করা হয় যার গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম হয়। সুতরাং যেহেতু পুরুষ থেকে সন্তান কল্পনা অসম্ভব তেমনি তার থেকে প্রকৃত দুধ পাওয়াও অসম্ভব। তাই যদি অস্বাভাবিকভাবে পুরুষের স্তন থেকে দুধ বেরিয়ে আসে আর তা কোন সন্তান পান করে তবে তার সাথে হুরমত ছাবিত হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন দুই শিশু এক সাথে কোন বকরী বা অন্য কোন প্রাণীর দুগ্ধ পান করে তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে হুরমত ছাবিত হবে না। কেননা, হুরমতের সম্পর্ক মানবকুলের সাথে অন্য কোন প্রাণীর সাথে হয় না।

قوله : وَ لَوْ اَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا الخ : যদি কোন ব্যক্তির বিবাহে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন এবং দুধের শিশু বিদ্যমান থাকে, অতঃপর বড় স্ত্রী ছোট স্ত্রীকে নিজের স্তন থেকে দুধ পান করিয়ে দিল। তবে স্বামীর জন্য উভয়ই হারাম

হয়ে যাবে। ইহা আহনাফ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এ মতই পোষণ করেন। বড় স্ত্রী তো একারণে হারাম হবে যে, সে ছোট স্ত্রীকে দুধ পান করানোর দ্বারা স্বামীর দুধ শাশুড়ী হয়ে গেল। আর দুধ শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয নয়। আর ছোট স্ত্রীর হারাম হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাহল : যদি বড় স্ত্রীর স্তনে উক্ত স্বামীর সহবাসের দ্বারা দুধের সঞ্চার হয় আর তা ছোট স্ত্রী পান করে তবে উক্ত ছোট স্ত্রী স্বামীর দুধ কন্যা হয়ে গেল। আর স্বামী উক্ত ছোট স্ত্রীর দুধ-পিতা হয়ে গেল। তাই দুধ মেয়েকে দুধ পিতা বিবাহ করতে পারে না। বিধায় উক্ত ছোট স্ত্রী স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী বড় স্ত্রীকে বিবাহ করে ঠিকই কিন্তু তার সাথে সহবাস করেনি, বড় স্ত্রীর স্তনে তার পূর্বের স্বামীর মাধ্যমে দুধ আসে আর তা ছোট স্ত্রী পান করে, তবে হুরমত যুক্ত হবে না। কেননা, এ ছোট স্ত্রী হল তার সতিনের মেয়ে আর সতিনের মেয়েরও একই হুকুম, অর্থাৎ, যদি তার মায়ের সাথে সহবাস করে তবে তাকে বিবাহ করা হারাম। আর যদি সহবাস না করে আর তালাক দিয়ে দেয় তবে তার মেয়েকে বিবাহ করা হালাল হবে।

قوله : وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যায়ে মহরের আলোচনা করতেছেন। যদি স্বামী বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তবে স্বামীর উপর বড় স্ত্রীর মহর ওয়াজিব হবে না। বড় স্ত্রী দুধ পান করানোর দ্বারা বিবাহ ভঙ্গের ইচ্ছা করুক বা না করুক। দলীল হল : সহবাসের পূর্বে বড় জনের সাথে স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে তারই কার্যের দ্বারা। আর স্ত্রীর কার্যে যদি সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর অর্ধ মহর থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং এখানে যেহেতু বড় স্ত্রীর কার্যের কারণে সহবাসের পূর্বে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে তাই স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে না। আর যদি বড় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তবে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। তবে স্বামীর উপর স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালীন সময়ের খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। কেননা, ভুল বড় স্ত্রীর পক্ষ থেকেই ঘটেছে।

قوله : وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُهُ الخ : ছোট স্ত্রী মহর প্রাপ্ত হবে কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের মতে ছোট স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপর অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, ছোট স্ত্রী মহর পাবে না। কেননা, বিচ্ছেদ ছোট স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। তাই যেভাবে বড় স্ত্রীর কর্মের দরুন তার মহর বিলুপ্ত হয়ে যায় তদ্রূপ ছোট স্ত্রীরও মহর বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হানাফীগণের দলীল : ছোট স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটেনি। কেননা, যদিও ছোট স্ত্রীর কর্ম দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে তথাপি তার হককে রহিত করার ক্ষেত্রে তার কর্ম শরয়ীভাবে ধর্তব্য নয়। কেননা, সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াতে সে শরীয়াতের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। মাসআলাটি এমন হল যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন সন্তান তার কোন উত্তরসূরীকে নিহত করে ফেলল। তবে এ শিশু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হবে এবং মিরাসও প্রাপ্ত হবে। অথচ ইসলামী শরীয়তে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাই সে শরীয়াতের এ হুকুমের আওতাভুক্ত হল না। সুতরাং প্রতিমান হল যে, শরীয়ত শিশুর হত্যাকে গ্রহণ করেনি। তদ্রূপ বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যদিও শিশুর কর্ম পাওয়া যায় তথাপি সে তার মহর থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং তাকে অর্ধ মহর দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে।

قوله : وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكَبِيرِ الخ : জাহিরী রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, স্বামী ছোট স্ত্রীকে যে অর্ধেক মহর দিবে তা বড় স্ত্রী থেকে ফেরত নিতে পারবে। যদি বড় স্ত্রী দুধ পান করানো দ্বারা বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করে থাকে। আর যদি বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা না থাকে বরং ছোট স্ত্রী ধ্বংস অথবা ক্ষুধা থেকে বাচানোর নিয়তে দুধ পান করিয়ে থাকে তবে এ সূরতে স্বামী ছোট স্ত্রীর অর্ধেক মহর বড় স্ত্রীর নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে না। যদিও বড় স্ত্রীর জানা থাকে যে ছোটজন তার স্বামীর স্ত্রী। নাওয়াদিরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, স্বামী উভয় সুরতে বড় স্ত্রীর নিকট থেকে ছোট স্ত্রীর মহর ফেরত নিবে। বড় স্ত্রী বিবাহ নষ্ট করার ইচ্ছা করুক

বা না করুক। ইহা ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর ইহাই মতামত।

قوله : وَ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ الخ : মাল সম্পদ যা দ্বারা সাবেত হয় রেদাআত ও তা দ্বারা সাবিত হয়। অর্থাৎ, মাল সাবেত করার জন্য সাক্ষী জরুরী। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী যেভাবে মাল সাবিত করার জন্য দুজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। আর দুজন পুরুষ না থাকা অবস্থায় একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন তদ্রূপ রেদা'আত ছাবিত করার জন্য শুধু মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, রেদাআত সাবিত করার জন্য একজন নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য, তবে শর্ত হল উক্ত নারী ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

ইমাম মালিক (রহ.) এর দলীল : হুরমত সৃষ্টি হওয়া তা শরয়ী বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর তা হল দ্বীনী বিষয়। সুতরাং যেভাবে দ্বীনী বিষয় সাবিত করার জন্য একজনেরই সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ এখানেও একজনের সাক্ষের উপর নির্ভর করলে চলবে। সে ব্যক্তি পুরুষ হউক বা নারী হউক। তবে শর্ত হল সে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। যেমন কেহ গোস্ত ক্রয় করল। অতঃপর কেহ তাকে বলল ইহাতো অগ্নিপূজক ব্যক্তি জবেহ করেছে। এখন তা ক্রেতার জন্য আহার করা হারাম হয়ে যাবে। সে নিজেও তা খেতে পারবে না। অন্যকেও তা খাওয়াতে পারবে না। তদ্রূপ এখানেও এ দ্বীনী বিষয় সাবেত করার জন্য একজনের সাক্ষ্য গ্রহযোগ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতের দলীল হল : যে যে বিষয় একান্ত নারী জাতির সাথে সম্পৃক্ত পুরুষরা অবগত হতে পারে না এসব ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে হাঁ, এ নারী মোট চারজন হতে হবে।

আর যেহেতু দুধ পানের সম্পর্ক নারীর স্তনের সাথে, আর নারীর স্তনের দিকে তাকানো পুরুষের জন্য হারাম, তাই স্তন্য পানের বিষয়ে কোন পুরুষ অবগতি হতে পারবে না। এজন্য স্তন্য পান সাব্যস্ত করার জন্য চারজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

আমাদের দলীল : বিবাহের ক্ষেত্রে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া তা মালিকানা রহিত হওয়া থেকে পৃথক নয়। অর্থাৎ, এমন হবে না যে বিবাহের ক্ষেত্রে হুরমত পাওয়া গেল কিন্তু বিবাহের মালিকানা বহাল থাকল। কেননা, হারামের স্থায়িত্বের সাথে বিবাহ বাকী থাকা সম্ভবপর নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, স্তন্য পানের কারণে যেভাবে হুরমত সাবিত হবে তদ্রূপ বিবাহও বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তা মালের মালিকানার ন্যায় হল। এজন্য আমরা বলি বিবাহ বাতিল হওয়ার জন্য তথা স্তন্য পান সাবিত করার জন্য দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্য অপরিহার্য।

ইমাম মালিক (রহ.) গোস্তের সাথে কিয়াস করার জবাব হল : খাবারের ক্ষেত্রে হুরমত সাবিত হওয়ার পরও মালিকানা বহাল থাকে অর্থাৎ এমন হয় না যে, খাবার হারাম হওয়াতে মালিকানাও দূর হয়ে গেছে। যেমন কেহ মাটির মালিক হল তো ঐ ব্যক্তির জন্য মাটি খাওয়া হারাম অথচ সে মাটির মালিক হতে পারে, তদ্রূপ কোন কাফের মদের মালিক অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল এখন তার জন্য উক্ত মদ খাওয়া হারাম। কিন্তু মদের মালিকানা তারই থেকে যাবে।

এমনিভাবে যদি কেহ গোস্তের মালিক হয় আর কেহ তা অগ্নী পূজকের জবেহকৃত বলে তবে তা তার জন্য খাওয়া হারাম হবে, কিন্তু মালিকানা শেষ হবে না। সুতরাং গোস্তের বিষয়টি আর স্তন্য পানের কারণে হারাম সাবিত হওয়ার বিষয়টি এক নয়; বরং ভিন্ন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব হল, স্তন্য পান এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় যাহা পুরুষ অবগতি হতে অক্ষম। বরং পুরুষ অবগতি হওয়া স্বাধারন ব্যাপার। যেমন ذوى الارحام তারা তাদের নারীদের স্তনের দিকে তাকানো না জায়েয। তাই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল গ্রহণযোগ্য।

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় : তালাক

وهو رَفْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتُ شَرْعًا بِالنِّكَاحِ تَطْلِيقُهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَا وَطِئَ فيه وَتَرَكَهَا حتى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا اَحْسَنُ وَثَلَاثًا فِي أَطْهَارٍ حَسَنٌ وَسُنِّيٌّ وَثَلَاثًا فِي طُهْرٍ أَو بِكَلِمَةٍ بِدْعِيٌّ -

অনুবাদ : তালাক বলা হয় বিবাহের দ্বারা শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বন্ধনমুক্ত করা। স্ত্রীকে যে তুহুরে সহবাস হয়নি এমন তুহুরে এক তালাক দেয়া এমতাবস্থায় তার ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হল আহসান (طلاق احسن) আর তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া হল হাসান বা সুন্নি (طلاق حسن او طلاق سنى) আর এক তুহুরে অথবা এক কথায় তিন তালাক দেয়া বেদয়ী (طلاق بدعى) -।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ الطَّلَاقِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত বিবাহ ও তৎ সংশ্লিষ্ট আলোচনা পেশ করেছেন এ পর্যায়ে তালাক ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। কেননা, বাস্তব কথা হল অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বিবাহ প্রথমে হয়ে থাকে তারপর তালাক হয় এ হিসেবে প্রথমে বিবাহ ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করেছেন। আর এ পর্যায়ে তালাক নিয়ে আলোচনা করতেছেন। এদিকে তালাকের অধ্যায়ের আগে রিদা এর অধ্যায় আনার কারণ হল রিদা দ্বারা বিবাহ হারাম হয় আর তা স্থায়ীভাবে হারাম হয়, কিন্তু তালাক দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় ঠিকই তবে পুনরায় আবার বিবাহ করতে পারে। এজন্য সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) শক্ত হুরমত বিষয়টি তথা রিদা এর আলোচনা প্রথমত করে এখান থেকে তালাকের আলোচনা করতেছেন।

قوله : هُوَ رَفْعُ الْقَيْدِ الخ : طلاق ইহা سلام শব্দের ন্যায় تفعيل এর মাসদার। আভিধানিকভাবে তার কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

১। إِزَالَةُ الْقَيْدِ বন্ধন মুক্ত করা। ২। اَلتَّخْلِيَةُ খালিক করা। ৩। اَلتَّفْرِيقُ বিচ্ছিন্ন করা। ৪। رَفْعُ الْقَيْدِ বন্ধন উঠিয়ে নেয়া।

طلاق এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : هُوَ رَفْعُ الْقَيْدِ الثَّابِتِ شَرْعًا بِالنِّكَاحِ - তালাক বলা হয় বিবাহের দ্বারা শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন মুক্ত করা।

المعجم الوسيط গ্রন্থকার বলেন : هُوَ رَفْعُ قَيْدِ نِكَاحِ الْمُنْعَقِدَيْنِ الزَّوْجَيْنِ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ - স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সংগঠিত বিবাহ বন্ধনকে নির্দিষ্ট শব্দাবলী দ্বারা মুক্ত করা।

ইসলামী শরীয়তে তালাক যদিও বৈধ, তবে তা সর্ব নিকৃষ্টতম বৈধ বস্তু হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اَبْغَضَ الْمُبَاحَاتِ عِنْدَ اللهِ اَلطَّلَاقُ

কিন্তু স্বভাব-চরিত্রের ভিন্নতার দরুন কিংবা স্বামী-স্ত্রীর অমিল-কলহ, ইত্যাদির কারণে অনেক সময় বিবাহ

বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা থাকে না। সুতরাং এজন্য শরীয়ত তালাককে জায়েজের স্তরে রেখেছে। যেমন আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ

উক্ত আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, প্রয়োজনের বেলায় তালাক দেয়া মাকরূহ নয়। অন্যথায় প্রয়োজন ছাড়া তালাক দেয়া নিতান্ত গর্হিত কাজ। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : لَعَنَ اللّٰهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مُطَلَّاقٍ -

অন্যত্র বলেন :

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِغَيْرِ نُشُوْزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রয়োজন ছাড়া তালাক দেয়া গুনাহের কাজ।

قوله : تَطْلِيْقُهَا وَاحِدَةٌ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে তালাকের শ্রেণী বিন্যাস করছেন। সুতরাং তিনি তালাককে প্রথমত তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

১। আহসান। ২। হাসান বা সুন্নী। ৩। বেদয়ী।

নিম্নে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১। طلاق احسن 'তালাকে আহসানের সংজ্ঞা : স্বামী তার স্ত্রীকে এমন তুহুরে এক তালাক দিবে যে তুহুরে তার সাথে সহবাস হয়নি। অতঃপর আর তালাক দিবে না। এবং স্ত্রীর নিকটবর্তীও হবে না। এমনকি স্ত্রী ইদ্দত শেষ করে ফেলবে।

এর দলীল হল, সাহাবায়ে কেরাম একের অধিক তালাক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত না দেয়াকে পছন্দ করতেন। তাছাড়া এর মধ্যে অনেক হেকমত নিহিত আছে। তা হল যে কাজের জন্য তালাক দেয়া হল সম্ভবত ইদ্দত পালনরত অবস্থায় এর সংশোধন হতে পারে এবং রুজু করার অবকাশ থাকে। আর ইহাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَلَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا -

অধিকন্তু এতে স্ত্রীর প্রতি সহজতা রয়েছে কেননা এরকম এক তালাক দিয়ে রাখলে তার ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয় না। কিন্তু একাধিক তালাক দেয়াতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। উল্লেখ্য যে احسن দ্বারা তার নিজ সত্তা হিসাবে অধিক উত্তম এবং ছওয়াবের কাজ ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং حسن ও بدعى পর্যায়ের তালাক থেকে ইহা উত্তম, ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য।

قوله : وَ ثَلْثًا فِى اَطْهَارٍ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে তালাকের দ্বিতীয় প্রকার বলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তালাকে হাসান হচ্ছে স্বামী তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করা। সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) তালাকে হাসানকে তালাকে সুন্নী দ্বারা অবিহিত করার কারণ হচ্ছে, তিনি ইমাম মালিক (রহ.) এর মতামতকে প্রত্যাখ্যান করতেছেন। যে তালাকে হাসানাটিও সুন্নাত দ্বারা সাবিত। নতুবা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাহ দ্বারা ইবাদত বা ছওয়াব বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আমাদের মাযহাব মতে তালাকে হাসান ও বৈধ। যা সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত। এ পদ্ধতিতে তালাক প্রদানকারী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে না। তবে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে ইহাও তালাকে বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার মতে এক তালাকই দেয়া বৈধ। কারণ, তালাকের মূল হল নিষিদ্ধতা যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন— تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا 'তোমরা বিবাহ কর তালাক দিও না, তবে হা এক তালাক দিয়ে দিলে পূর্ণ হয়ে যায়। বিধায় প্রত্যেক তুহুরে একেক তালাক দেয়ার প্রয়োজন নেই তাই তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমাদের দলীল : হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর হাদীস তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর বাকী দু তালাক তিনি দুই তুহুরে প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন। হুজুর (সা.) তা শুনে বললেন, হে ইবনে উমর আল্লাহ, তোমাকে এরকম করতে আদেশ দেননি। তুমি তো সুন্নাত পরিত্যাগ করলে। সুন্নাত হল, তুহুরের অপেক্ষা করা এবং প্রত্যেক তুহুরে একটি করে তালাক দিবে। অতঃপর রাসূল (সা.) নির্দেশ দিলে আমি আমার স্ত্রীকে রাজআত করলাম। রাসূল (সা.) বললেন, যখন সে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাকে তালাক দেবে নতুবা বিরত থাকবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমি যদি তাকে তিন তালাক দেই তাহলে তাকে রুজু করা কি আমার বৈধ হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, না সে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তোমার জন্য তা গুনাহ হবে। (দারাকুতনী)

এ হাদীস থেকে প্রতিয়মান হল যে, বিচ্ছিন্নভাবে তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া সুন্নাত সমর্থিত।

আমাদের আকলী দলীল : তালাক প্রদানের প্রয়োজন ইহা অত্যন্ত অপ্রকাশ্য একটি বিষয়ী। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রমাণকেই প্রয়োজনের স্থালাভিষিক্ত করা হয়। আর এখানে প্রয়োজন হল যে, স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথেই সহবাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্বেও তালাক প্রদান করা ইহা প্রমাণ করে যে, অনিবার্য কোন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর হায়েজের অবস্থায় তালাক দিলে বলা হবে যে, সে অনাগ্রহের কারণে তালাক দিয়েছে। তাই প্রয়োজনের প্রমাণ এর জন্য ধরা হবে প্রয়োজনটি বারংবার আসবে। সুতরাং বারংবার যেভাবে প্রয়োজন পাওয়া যায় তদ্রূপ প্রতি তুহুরে তালাকও পাওয়া যাবে। এবং চাইলে প্রদান করতে পারবে। তাই আমরা বলি ভিন্ন ভিন্নভাবে তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া বৈধ যা বিদআত নয়।

قوله : وَ ثَلٰثًا فِى طُهْرٍ الخ : তালাকে বেদয়ী এর সংজ্ঞা প্রদান করতে তিনি বলেন, তালাকে বেদআত হল এক তুহুরে তিন তালাক দিয়ে দেয়া। অথবা এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া কিংবা হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী এধরনের তালাক প্রদান করা হারাম। তবে কেউ প্রদান করলে তা পতিত হবে এবং তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং প্রদানকারী গুনাহগার হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সব ধরনের তালাক বৈধ। কেননা, তালাক শরীয়ত সম্মত একটি বিধান আর তা শরীয়ত সম্মত বিধান হওয়ায় তা থেকে হুকুম প্রবর্তিত হয়। সুতরাং যা শরীয়ত কর্তৃক সম্মত তা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কেননা, শরীয়ত কর্তৃক গৃহিত হওয়া আর নিষিদ্ধ হওয়া এক হতে পারে না।

আমাদের দলীল হল : তালাকের ক্ষেত্রে মূল হল নিষিদ্ধতা। কেননা, তালাকের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথচ এ বিবাহের সাথে দুনিয়াবী ও উখরাবী অনেক বিষয়াদি সম্পৃক্ত। সুতরাং এসব যা দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় তা মূলত শরীয়ত সমর্থিত না হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনে এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে হয় অনেক উদ্ভূৎ পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়ে। আর এ প্রয়োজন এক তালাক দিলে অথবা তিন তুহুরে তিন তালাক দিয়ে দিলে পূর্ণ হয়ে যায়। এক সাথেই এক তুহুরে তিন তালাক দেয়া কিংবা এক কথায় তিন তালাক দেয়া বৈধ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর পেশকৃত দলীলের জবাব হল : সত্তাগত যা শরীয়ত সমর্থিত তা সত্তাগত নিষিদ্ধ কোন কিছুর সাথে কখন মিলিত হবে না। তবে হা অন্য কোন কারণে নিষিদ্ধ কোন কিছুর সাথে মিলিত হতে পারে আর এ মিলিত হওয়াতে তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয় না। যেমন কেহ জমি আত্মসাৎ করল এবং তাতে নামাজ পড়ল অথবা জুমার আজানের পর সাঈ না করে ক্রয়-বিক্রয় করল। এখন লক্ষনীয় হচ্ছে আত্মসাৎকৃত জমির উপর নামাজ পড়া নিষেধ, তাই বলে কি এ জমিতে কেহ নামাজ পড়ে নিলে নামাজ হবে না? অনুরূপ জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ তাই বলে কি এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যাবে। কখনো না। বরং নামাজও হবে এবং ক্রয়-বিক্রয়কারী অবশ্যই গুনাহগার হবে। তদ্রূপ এক সাথে তিন তালাক দেয়া কিংবা এক তুহুরে তিন তালাক দেয়াতে তালাক প্রদানকারী গুনাহগার হবে। কিন্তু তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, তালাকের কার্যকারিতা রহিত হবে না।

وَغَيرُ الْمَوْطُوءَةِ تُطَلَّقُ لِلسُّنَّةِ وَلَوْ حَائِضًا وَفُرِّقَ على الْأَشْهُرِ فِيمَنْ لَا تَحِيضُ وَصَحَّ طَلَاقُهُنَّ بَعْدَ الْوَطْءِ وَطَلَاقُ الْمَوطُوءَةِ حَائِضًا بِدْعِيٌّ فَيُرَاجِعُهَا وَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ وَلَوْ قال لِمَوْطُوءَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةٌ وَإِنْ نَوَى اَنْ تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أو عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ -

অনুবাদ : সহবাসহীন স্ত্রীকে সুন্নী তালাক দিতে পারবে যদিও সে ঋতুগ্রস্ত হয় না কেন। আর যাদের ঋতুস্রাব হয় না তাদের ক্ষেত্রে পার্থক্য নিরূপন করবে মাসসমূহ দ্বারা (তিন মাসকে তিন তুহুর এর স্থলাভিষিক্ত করবে) আর তাদেরকে সহবাসের পরও তালাক দেয়া বিশুদ্ধ। সহবাসকৃতার তালাক ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় বেদয়ী। তাই তাকে রুজু করবে এবং দ্বিতীয় তুহুরে (প্রয়োজন হলে) তাকে তালাক দিবে। যদি কেহ তার সহবাসকৃতাকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا لِلسُّنَّةِ 'সুন্নাত অনুযায়ী তুমি তিন তালাক'। তবে প্রত্যেক তুহুরে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি এক সাথে তিন তালাক পতিত হওয়ার নিয়াত করে কিংবা প্রত্যেক মাসে এক তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত করে তবে (তার নিয়ত করা) বিশুদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ غَيرُ الْمَوْطُوءَةِ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে তুহুর কিংবা হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান করা যাবে এবং তা বেদআত হবে না। বরং তা শরয়ীভাবে বৈধ হবে। তবে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন এমন স্ত্রীকেও হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া মাকরূহে তাহরিমী। তিনি এমন স্ত্রীকে সহবাসকৃত স্ত্রীর উপর কিয়াস করেন। যেভাবে সহবাসকৃতা স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া মাকরূহ। তদ্রূপ এ স্ত্রীকেও হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া মাকরূহ।

আমাদের দলীল হল : যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হল না তার সাথে সহবাস করার আগ্রহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। সে তুহুর অবস্থায় থাক বা হায়েজ অবস্থায় থাক। এজন্য তাকে যে কোন সময় তালাক দেয়াতে অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে তার হায়েয অবস্থায় সহবাস করার আগ্রহ থাকে না বরং প্রতি তুহুরে আগ্রহ নবায়ন হয়। এজন্য সহবাস কৃতাকে হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান করা মাকরূহ।

قوله : وَ فُرِّقَ عَلَى الْأَشْهُرِ الخ : যদি স্ত্রীর বয়স কম হওয়ায় বা বার্ধক্যের কারণে হায়েজ আসে না। আর স্বামী চায় তাকে তালাক দিয়ে দিতে তবে স্বামী প্রতি মাসে এক তালাক দিয়ে দিবে। এ তিন মাস তিন হায়েজের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

وَاللّٰئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰائِى لَمْ يَحِضْنَ -

তোমাদের স্ত্রীদের যারা নৈরাশ হয়ে গেছে (বার্ধক্য জনিত কারণে) হায়েজ থেকে আর যাদের হায়েজ শুরু হয়নি। যদি সন্দিহান হও তবে তাদের ইদ্দত হল তিন মাস।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, তিন হায়েজের স্থলাভিষিক্ত তিন মাস। কেননা, যদি তাদের হায়েজ আসত তবে তাদের ইদ্দত হায়েজ দ্বারাই হত। কিন্তু যেহেতু তাদের হায়েজ আসছে না। তাই তাদের ইদ্দত পালন করা হবে তিন মাস দ্বারা একথা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হায়েজ এর স্থলাভিষিক্ত মাস দ্বারা হয়ে থাকে।

এখন যদি তালাক মাসের হিসাবে দেয় তবে হয়ত মাসের শুরুতে দেয়া হবে। তখন চন্দ্র মাস হিসেব করতে হবে। আর যদি মাসের মধ্যখানে দেয়া হয় তবে দিন গণণার মাধ্যমে মাস পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ, ত্রিশদিন পূর্ণ হলে পর একত্রিশ দিনে দ্বিতীয় তালাক অনুরূপ পরবর্তী গণনার মাসের এক তারিখ তৃতীয় তালাক প্রদান করা হবে। আর যদি ত্রিশতম দিন পূর্ণ হতেই তালাক দিয়ে দেয় তবে এক মাসে দুই তালাক হয়ে যাবে। যা সুন্নত অনুযায়ী নয়।

قوله : وَ صَحَّ طَلَاقُهُنَّ الخ : যাদের হায়েজ রহিত অল্প বয়সের কারণে কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে তাদেরকে সহবাসের পর পরই তালাক দেয়া জায়েয অর্থাৎ, তাদের ক্ষেত্রে সহবাসের পর এক মাসের অপেক্ষা করতে হবে না। বরং যে কোন সময় তালাক দিতে পারবে।

ইহা আহনাফ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমুখের মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম যুফর (রহ.) এর মতে উক্ত স্ত্রীর ক্ষেত্রেও সহবাসের পর এক মাস (যা হায়েজের স্থলাভিষিক্ত) অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর তাদেরকে তালাক দিতে পারবে। তিনি দলীল পেশ করেন। উক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে মাস হায়েজের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং যেভাবে ঋতুবতী স্ত্রীলোকের বেলায় সহবাসের পর এক হায়েজের অপেক্ষা করতে হয়। তদ্রূপ উক্ত স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও সহবাসের পর একমাস অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া তুহুর অবস্থায় যেভাবে সহবাস করলে আগ্রহ কমে যায় আর তা এক হায়েজের পর পুনরায় নতুনভাবে জাগ্রত হয় তদ্রূপ সহবাসের পর উক্ত স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও নতুন আগ্রহ পাওয়া যাওয়ার জন্য এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। একারণেই ইমাম যুফার (রহ.) ঋতুহীন স্ত্রীলোকদের বেলায় সহবাস ও তালাকের মধ্যে এক মাসের ব্যবধানে রাখাকে আবশ্যকীয় বলেন।

আমাদের দলীল হল : ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে সহবাস ও এক হায়েজের ব্যবধান রাখা হয়েছে যেন গর্ভ সঞ্চার না হয়। কেননা, গর্ভ সঞ্চার এর বিষয়টি অবগত না হলে ইদ্দতের বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। কেননা, যদি মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় তবে তার ইদ্দত হবে গর্ভমুক্তি পর্যন্ত আর যদি গর্ভবতী না হয় তবে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েয। সুতরাং এ অস্পষ্টতার দরুন ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের বেলায় সহবাসের পর পরই তালাক দেয়া মাকরূহ বলা হয়েছে। আর যাদের হায়েজ আসে না তাদের ক্ষেত্রে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তাদের ইদ্দত পালনে যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হবে ইহার কোন সন্দেহ বিদ্যমান নাই। তাই তাদেরকে সহবাসের পরপরই তালাক দেয়া যায়। তাছাড়া যার সাথে সহবাস হল না এমন ঋতুবতী স্ত্রী লোককে ও ঋতু চলা কালীন সময়ে ও তালাক দেয়া বৈধ। বৈধ হওয়ার কারণ হল, এমন স্ত্রী গর্ভ হওয়ার কোন অবকাশ নাই। কেননা, তার সাথে সহবাসই হয়নি। আমাদের আলোচিত মাসআলাটিও তদ্রূপ। যেহেতু উক্ত স্ত্রীগণের ঋতুস্রাব নাই। তাই গর্ভ হওয়ারও কোন সন্দেহ নেই। বিধায় তাদেরকে যে কোন সময় তালাক দেয়া যায়।

قوله : وَ طَلَاقُ الْمَوْطُوْئَةِ الخ : কোন পুরুষ তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। তবে তা সুন্নী এর বিপরীত তথা বেদয়ী এমন তালাক দাতা অবশ্যই গুনাহগার হবে। আর তালাক কার্যকর হওয়ার দলীল হল হযরত ইবনে উমর (রাযি.) তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে হুজুর (সা.) বললেন, فليراجعها 'সে যেন তাকে রেজওয়াত করে।' এতে বুঝা গেল পূর্বে তালাক কার্যকর হয়েছে নতুবা রেজআত এর হুকুম দিতেন না।

দ্বিতীয় দলীল হল : হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ। তা অন্য কারণে। তাহল ইদ্দত লম্বা হওয়া থেকে মহিলাকে রক্ষা করার জন্য। কেননা, হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে এ হায়েজ গণনায় আসে না। সুতরাং এমতাবস্থায় তালাক তার নিজ সত্তাগত কারণে নিষিদ্ধ নয়, বরং তার বহির্ভুত অন্য কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে। তাই আমরা বলি হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হলে তা শরয়ীভাবে কার্যকারী। তাকে বিলুপ্ত করে না।

قوله : فَيُرَاجِعُهَا الخ : যদি কেহ তার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয় তবে তার জন্য মুস্তাহাব হল রুজু করবে এবং পরবর্তী তুহুরে চাইলে তালাক দিবে। দলীল হল : হযরত ইবনে উমর (রাযি.) তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়াতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন, فَلْيُرَاجِعْهَا সে যেন তাকে রুজু করে। এখানে আমরের সিগা ব্যবহার করা হয়েছে। যা নূন্যতম হলেও মুস্তাহাবকে সাবেত করে। তাছাড়া ইহা মুস্তাহাব হওয়ার অন্য কারণ হল যে, ইহা তো একমাত্র স্বামীর ব্যক্তিগত হক। আর মানুষের নিজ হকের মধ্যে ওয়াজিব সাবেত হয় না। তবে কেহ কেহ বলেন, রেজায়াত করা ওয়াজিব। তাদের কথা বল হাদীসে আমল এর সীগা এসেছে যা ওয়াজিবকে সাহেব করে। তাছাড়া হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়াতে মহিলার ইদ্দত দীর্ঘায়িত হল তাই মহিলার কষ্ট দূর করণার্থে রেজআয়াত করা ওয়াজিব।

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়ার পর রেজাআত করল এখন তার ইচ্ছাধীকার রয়েছে যদি সে চায় তবে স্ত্রীকে দ্বিতীয় তুহুরে অর্থাৎ যে হায়েজে তালাক দিয়েছে এর পরবর্তী তুহুরে নয়, বরং এর পরবর্তী হায়েজের পরের তুহুরে তালাক দিতে পারবে। আর যদি চায় তবে পুনরায় তার স্ত্রী হিসেবে রাখতেও পারবে। এরূপই বর্ণনা করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মসবুত নামক গ্রন্থে। ইমাম তাহাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত যে প্রথম তুহুরেই তালাক দিতে পরবে। আল্লামাহ আবুল হাসান কারখী (রহ.) উভয় মতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য দিয়েছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যা বর্ণনা করেছেন তা হল সাহেবাই (রহ.) এর মতামত।

সাহাবাইন (রহ.) এর মতের যুক্তি হল : দুই তালাকের মাঝে একটি পূর্ণ হায়েজ অতিবাহিত হওয়া সুন্নাত। আর এখানে যেহেতু হায়েজ অবস্থায় তালাক দেয়া হয়েছে তাই তার পরবর্তী তুহুরে তালাক দেয়া হলে পূর্ণ এক হায়েজ ব্যবধানকারী পাওয়া গেল না। এজন্য প্রথম হায়েজকে দ্বিতীয় হায়েজ দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। অতঃপর তালাক দেয়া যাবে। আর দ্বিতীয় হায়েজকে পূর্ণ করতে হবে। কেননা, এক হায়েজকে খন্ডিত করা সম্ভবপর নয়, তাই দ্বিতীয় হায়েজকে পূর্ণরূপে অতিবাহিত করতে হবে। অতঃপর তুহুরটিই হল সুন্তুষ্টির সময়। এখন চাইলে এ তুহুরে তালাক দিতে পারে বা স্থায়ীভাবে রাখতেও পারে।

قوله : وَ لَوْ قَالَ لِمَوْطُوْئَةٍ الخ : যদি কেহ তার সহবাসকৃত স্ত্রীকে বলে সুন্নাত মত তোমাকে তিন তালাক। তবে দেখতে হবে স্বামীর কোন নিয়ত আছে কি না যদি কোন নিয়ত থাকে না তবে প্রত্যেক তুহুরে এক এক তালাক পতিত হবে। কেননা, বাক্যে للسنة এর لام বর্ণনাটি সময় বুঝানোর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর সুন্নাত সময় হচ্ছে এমন তুহুর যাতে সহবাস হয়নি। আর যদি সে নিয়ত করে তবে তার নিয়ত কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ, সে যদি নিয়ত করে যে এক সাথে তিন তালাক পতিত হউক তবে তবে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতি মাসে এক তালাক পতিত হবে। স্ত্রী হায়েজগ্রস্ত হউক বা তুহুর অবস্থায় হউক। আর যদি সহবাসকৃত তুহুরে এমনটি করে আর কোন নিয়ত না করে কিংবা প্রত্যেক তুহুরে এক তালাক এর নিয়ত করে তবে স্ত্রী ঋতুগ্রস্ত হয়ে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না।

ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এক সাথে তিন তালাকের নিয়ত করলে তা কার্যকর হবে না। কেননা, এক সাথে তিন তালাক দেয়া সুন্নত মত নয়, বরং দেবআত। তাই সুন্নত বলে বিদআত উদ্দেশ্য হতে পারে না।

আমাদের মতে একসাথে তিন তালাকের নিয়ত করলে তা কার্যকর হবে এবং তা সুন্নত মত হবে। অর্থাৎ, তিন তালাক এক সাথে পতিত হওয়াটা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

مَنْ طَلَّقَ اِمْرَاتَهُ اَلْفًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَالْبَاقِىْ رُدَّ عَلَيْهِ

কেহ তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিলে তিন তালাক দ্বারা সে বায়েনা হবে। অবশিষ্ট তালাকগুলো তার দিকেই ফিরে যাবে।

সুতরাং হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তা পতিত হবে। তাই সুন্নাত সমর্থিত হলো।

অথবা বলা যেতে পারে যে পতিত করানো তথা কার্যকর হওয়ার দিক থেকে সুন্নাত। অর্থাৎ, সহবাস মুক্ত তিন তুহুরে তিন তালাক দেয়া। সুতরাং যখন কোন কিছুর নিয়ত করেনি তখন পরিপূর্ণ সুন্নাত উদ্দেশ্য হবে। আর পরিপূর্ণ সুন্নত হল পতিত হওয়ার ও পতিত করা উভয় দিক থেকে তালাক কার্যকর হওয়া। তাই এ পর্যায়ে প্রতি তুহুরে একটি করে তালাক পতিত হবে। আর যখন এক সাথের নিয়ত করে তখন তাই হবে। কেননা, তার কথায় পতিত হওয়ার দিক থেকে সুন্নাতের সম্ভাবনা আছে। আর যদি সহবাস কৃতা স্ত্রী ঋতুবতি না হয় বরং মাস গণনাকারী হয় তবে তার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত কথাটি বলার দ্বারা মুহূর্তে এক তালাক পতিত হবে। এবং এক মাস পর দ্বিতীয়টি এবং পরের মাস পর তৃতীয় তালাক পতিত হবে। আর যদি এক সাথে তালাক দেয়ার নিয়ত করে তবে এক সাথে তিন তালাক পতিত হবে।

وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ وَلَوْ مُكْرَهًا وَسَكْرَانُ وَاَخْرَسُ بِإِشَارَتِهِ حُرًّا أَوْ عَبْدًا لَا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالسَّيِّدِ عَلَى إِمْرَأَةِ عَبْدِهِ وَاعْتِبَارُهُ بِالنِّسَاءِ فَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ وَالْاَمَةِ ثِنْتَانِ -

---

অনুবাদ : তালাক পতিত হয় এমন প্রত্যেক স্বামীর যে সুস্থ মস্তিষ্ক, বালেগ যদিও (তাদের থেকে তালাক নেয়া হয়) বল প্রয়োগ করে, নেশাগ্রস্ত কিংবা বোবা তার ইশারায়, তারা স্বাধীন হউক অথবা দাস হউক। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের তালাক, মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির তালাক, ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক মনিবের তালাক তার দাসের স্ত্রীর উপর পতিত হবে না। তালাকের বিবেচনা মহিলাদের থেকে হয়। সুতরাং স্বাধীনার তিন তালাক আর দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ يَقَعُ طَلَقُ كُلِّ زَوْجٍ الخ : এ পর্যায়ে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) কার মধ্যে তালাক দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে আর কার মধ্যে তালাক দেয়ার যোগ্যতা নেই তার আলোচনা করতেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, যদি স্বামী সুস্থ মস্তিস্ক হয় এবং বালেগ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের তালাক প্রদান সহীহ হবে। কেননা, সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার দলীল হল যে, তারা নিজের উপর নিজ কর্তৃত্ব সাব্যস্তকারী এবং ভাল-মন্দ পার্থক্য বোধক বিবেকের অধিকারী। তাই তাদের যেভাবে নিজের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে তদ্রূপ নিজ স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করারও অধিকার রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্ক ব্যক্তিকে তালাক প্রদান করার জন্য বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা হয় এবং সে বাধ্য হয়ে তালাক দিয়ে দেয় তবে তা পতিত হবে কি না, আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তালাক পতিত হয়ে যাবে। হযরত উমর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) প্রমুখদের মতেও তালাক পতিত হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, মীলক, আহমদ (রহ.) প্রমুখদের মতে তালাক পতিত হবে না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) প্রমুখদের মতেও তালাক পতিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ীগংদের দলীল হল : রাসূল (সা.)-এর হাদীস :

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى اَلْخَطَاءُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

আমার উম্মত থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ভুলভ্রান্তি ও বলপ্রয়োগের ফলে কৃত অপরাধের হিসাব।

দ্বিতীয় দলীল হল বলপ্রয়োগ আর ইচ্ছা এক হতে পারে না। আর উভয়টি থেকে শরীয়তের ইচ্ছার দ্বারাই কর্মসমূহ ধর্তব্য হয়। এজন্য বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির ইচ্ছা না থাকায় তার তালাক পতিত হবে না।

তবে কেহ যদি পরিহাসচ্ছলে তালাক দেয় তবে তালাক পতিত হবে। কেননা, সে তো তখন ইচ্ছাস্বাধীন। সুতরাং তখন বলা হবে সে ইচ্ছাতেই তালাক প্রদান করেছে।

আমাদের দলীল হল : বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীকে তার ইচ্ছাতেই তালাক প্রদান করেছে। এবং সে তালাক প্রদানের যোগ্যও বটে। সুতরাং তার তালাকের ফলাফল প্রকাশ পাবে। যদিও সে এ ফলাফলে সন্তুষ্ট নয় তথাপি তালাক পতিত হয়ে যাবে। যেমন পরিহাসচ্ছলে কেহ তালাক দিলে তালাক পতিত হয় অথচ সে তালাকের ফলাফলে সন্তুষ্ট নয়। আর বল প্রয়োগ কৃত ব্যক্তি যে তার ইচ্ছাতেই তালাক প্রদান করেছে তার প্রমাণ হল উক্ত ব্যক্তির সামনে বল প্রয়োগকারীরা দুটি বিষয় উপস্থাপন করেছে আর ঐ ব্যক্তি উভয় বিষয় থেকে সহজতর বিষয়ই তার ইচ্ছাতেই গ্রহণ করেছে। দুটি বিষয় হল :

১। নিজের জীবন ধ্বংস করা। ২। স্ত্রীকে নিঃশেষ করা তালাকের মাধ্যমে। সে উক্ত মন্দ দু বিষয়ের সহজটি তথা স্ত্রীকে নিঃশেষ করা তালাকের মাধ্যমে গ্রহণ করেছে তার ইচ্ছাতেই। এজন্য আমরা বলি বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে হাদীস পেশ করেছেন তা দুনয়াবী হুকুম আহকামের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং উখরাবীর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুলভ্রান্তি বা বল প্রয়োগে কোন অপরাধ করে বসলে আখেরাতে জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত থাকবে। তবে দুনিয়ার আহকাম তার উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন কেহ ভুলে কাউকে হত্যা করলে আখেরাতে তার জবাবদিহীতা নেই। কিন্তু দুনিয়াতে তিনি দিয়াত দিতে হবে। তদ্রূপ যদি কেহ নামাজে ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তবে আখেরাতে জবাবদিহী হতে হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তিনি সাহু সেজদা দিতে হবে। তদ্রূপ বলপ্রয়োগে তালাক দিলে তিনি আখেরাতে জবাবদিহী হতে হবে না বটে, তবে দুয়িাতে তা কার্যকর হয়ে যাবে। والله اعلم -

قوله : وَ سَكْرَانَ وَ اَخْرَسَ الخ : سكران বলা হয় মদ্যপান বা অন্য কোন নেশার বস্তু আহারে বা পান করলে মানুষের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সে পুরুষ মহিলা ও আকাশ জমির পার্থক্য করতে পারে না। সুতরাং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক আমাদের মাযহাব অনুযায়ী পতিত হয়ে যাবে।

তবে ইমাম কারখী (রহ.) ইমাম তাহাবী (রহ.) এর গ্রহণীয় মত হচ্ছে তালাক পতিত হবে না। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর এক অভিমত। তাদের দলীল হল : ব্যক্তির ইচ্ছা তখনই বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে যখন তার জ্ঞান, বুদ্ধি, আকল থাকে। আর নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তো কোন আকল বুদ্ধি নেই। নেশায় ইচ্ছা না থাকায় তার তালাক পতিত হবে না। যেমন ঔষধ সেব করে যদি কেহ মাতাল হয়ে যায় তবে তার তালাক কার্যকর হয় না। তদ্রূপ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাকও পতিত হবে না।

আমাদের দলীল : নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আকল এমন এক কারণে বিলুপ্ত হয়েছে যা গুণাহের কাজ। যেমন কেহ মদ পান করল। তাই সতর্কতার দরুন আমরা হুকুমের দিক থেকে আকলকে বিদ্যমান বলে গণ্য করি। তাই তার তালাকের ইচ্ছাও বিশুদ্ধ হবে। এবং তালাকও পতিত হবে। তবে হা যদি কোন ব্যক্তি প্রচন্ড মদ পানের কারণে মাথা ব্যথা শুরু হয় অতঃপর এ ব্যাথার কারণে তার আকল বিলুপ্ত হয়। আর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে আমরা তার এ তালাককে কার্যকর হিসাবে গ্রহণ করি না। কেননা, তার আকল বিলুপ্তির কারণ মদ পান নয়, বরং তার মাথাব্যথা। বোবা ব্যক্তির তালাক তার ইশারা দ্বারা সংগঠিত হয়। লিখতে সামর্থ হউক বা না হউক। কেননা, তার ইশারা পরিজ্ঞাত ও পরিচিত। তাই পয়োজন পূর্ণ করতে তার ইশারা ইঙ্গিত কে বচনের স্থালভিষিক্ত করা হয়েছে।

قوله : لَاطَلَاقُ الصَّبِيِّ الخ : আর যদি স্বামী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় অথবা পাগল হয় নতুবা ঘুমন্ত হয় তবে তার তালাক পতিত হবে না। এর দলীল হল : হাদীসে রাসূল (সা.) كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ - 'অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের তালাক ছাড়া সকল তালাক কার্যকর'। তাছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের পার্থক্যবোধক বিবেক নেই। আর পার্থক্য বোধক দ্বারাই যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যেহেতু তাদের মধ্যে যোগ্যতা নেই তারা তালাক প্রদানের যোগ্য নয়।

আর ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন ইচ্ছাই নেই বলে তার কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। আর মনিবের তার দাসের স্ত্রীকে তালাক দিলে তা পতিত হবে না। কেননা, তালাক প্রদানের এক মাত্র মালিক স্বামী। সে ছাড়া অন্য কেহ স্ত্রীকে তালাক প্রদানের যোগ্য নয়। বিধায় মনিব তার দাসের স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাকটি কার্যকর হবে না।

قوله : وَاعْتِبَارُهٗ بِالنِّسَاءِ الخ : তালাকের সংখ্যার বিবেচনা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মহিলার দিক লক্ষ করে হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী যদি স্বাধীনা হয় তবে তার তালাক তিনটি হবে। আর যদি স্ত্রী দাসী হয় তবে তার তালাক দুটি হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তালাকের বিবেচনা স্বামীর দিক লক্ষ্য করে হবে। যদি স্বামী স্বাধীন হয় তবে তার তালাক তিনটি হবে। আর যদি স্বামী দাস হয় তবে তার তালাক দুটি হবে। উল্লিখিত মাসআলার মোট চার সূরত রয়েছে। যার দু'টি ঐক্যমত আর দুটি মতানৈক্যপূর্ণ।

১। স্ত্রী দাসী, স্বামীও দাস। তবে তাদের তালাকের সংখ্যা সর্বসম্মতিক্রমে দুটি হবে।

২। স্ত্রী স্বাধীনা, স্বামীও স্বাধীনা। তবে তাদের তালাকের সংখ্যা সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি হবে।

৩। স্ত্রী দাসী, স্বামী স্বাধীনা। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তালাক দুটি হবে। যেহেতু স্ত্রী দাসী। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তালাক তিনটি হবে। যেহেতু স্বামী স্বাধীন।

৪। স্ত্রী স্বাধীনা, স্বামী দাস হয়। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলে, তালাক তিনটি হবে, যেহেতু স্ত্রী স্বাধীনা। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তালাক দুটি হবে, যেহেতু স্বামী দাস। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হল, পবিত্র হাদীস : اَلطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ তালাক পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ইদ্দত মহিলার সাথে সংশ্লিষ্ট। উক্ত হাদীসে তালাকের সম্পর্ক করা হয়েছে পুরুষের সাথে আর ইদ্দতের সম্পর্ক করা হয়েছে মহিলাদের সাথে। তাই তো স্ত্রী যদি দাসী হয় তবে তার ইদ্দত দুই হায়েজ বা দুই তুহুর হবে। আর যদি স্ত্রী স্বাধীন হয় তবে তার ইদ্দত তিন হায়েজ বা তিন তুহুর হবে। সুতরাং এ হিসাবে তালাকের সম্পর্ক পুরুষের সাথে হওয়া চাই। যদি স্বামী স্বাধীন হয় তবে তার তালাক তিনটি। আর দাস হলে তার তালাক দুটি হবে।

দ্বিতীয় দলীল হল : মালিকানার গুনটি মর্যাদার বিষয়। আর মানবতার মর্যাদাকে দাবী করে। আর মানবতার গুণ স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আর দাসের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান নয়। তাই স্বাধীন পুরুষের মালিকানাও পূর্ণরূপে পাওয়া যেত তিন তালাকের মালিক হওয়া দ্বারা। আর দাসের মধ্যে যেহেতু অপূর্ণাঙ্গ তাই দাস দুটির মালিক হবে।

আমাদের দলীল হল : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী : طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ - দাসির তালাক হল দুটি আর তার ইদ্দত হল দুই হায়েজ। এ হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তালাকের সংখ্যার বিবেচনা করা হবে স্ত্রীলোকদের দিক লক্ষ্য করে। তাছাড়া স্ত্রীর সম্ভোগঅঙ্গ হালাল হওয়া ইহা স্ত্রীর প্রতি বিরাট এক খোদাপ্রদত্ত নিয়ামত। কেননা, একারণে সে স্বামী থেকে মহর খোরপোষ ইত্যাদি প্রাপ্ত হবে। আর সকল নিয়ামতের পরিমাণকে অর্ধেক করার ক্ষেত্রে দাসত্বের প্রভাব বিদ্যমান। তাই স্বাধীন স্ত্রী তিন তালাকের হকদার হলে দাসীদের দেড় তালাকের হকদার হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যেহেতু অর্ধেক তালাকের কোন বিধান নেই, তাই অর্ধেক পূর্ণ করে আমরা বলি দাসী স্ত্রী মোট দু তালাকের হকদার হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর পেশকৃত হাদীসের জবাব হল যে তালাক প্রদানের হকদার স্বামী হবে। আর তালাকের মূল হকদার স্ত্রীই হবে।

بَابُ الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ

পরিচ্ছেদ : স্পষ্ট শব্দে তালাক

اَلصَّرِيحُ كَانَتْ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُكِ وَتَقَعُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً وَإِنْ نَوَى الْاَكْثَرَ أَوْ الْاِبَانَةَ أو لم يَنْوِ شَيْئًا وَلَوْ قال اَنْتِ الطَّلَاقُ أو اَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ أو اَنْت طَالِقٌ طَلَاقًا يَقَعُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً بِلَا نِيَّةٍ أو نَوَى وَاحِدَةً أو ثِنْتَيْنِ فَاِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَاِنْ اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أو إِلَى ما يُعَبِّرُ بِهِ عنها كَالرَّقَبَةِ وَالْعُنُقِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَالْجَسَدِ وَالْفَرْجِ وَالْوَجْهِ أو إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ منها كَنِصْفِهَا وَثُلُثِهَا تُطَلَّقُ وَاِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالدُّبُرِ لَا -

অনুবাদ : স্পষ্ট তালাক হল যেমন (স্বামীর উক্তি) তুমি তালাক, তুমি তালাক প্রাপ্তা, তোমাকে তালাক দিলাম। তবে এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। যদিও এর বেশির অথবা তালাকে বাইনের নিয়ত করে। কিংবা কোন কিছুর নিয়ত নাও করে। আর যদি বলে انت الطلاق অথবা انت طالق الطلاق কিংবা انت طالق طلاق নিয়ত ছাড়া। কিংবা এক বা দু তালাকের নিয়ত করে তাহলে এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি তালাক শব্দটিকে তার (স্ত্রীর) সমগ্র সত্তার সঙ্গে যুক্ত করে কিংবা এমন কোন অঙ্গের সাথে যুক্ত করে যার দ্বারা সমগ্র সত্তা বুঝানো হয় যেমন ঘাড়, গলা, আত্মা, শরীর, দেহ, গুপ্তাঙ্গ, মাথা, মুখ কিংবা স্ত্রীর শরীরের বড় অংশের সাথে যুক্ত করে। যেমন তার অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ, তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি তালাককে যুক্ত করে হাত, পা, গুহ্যদ্বারের সাথে তবে তালাক পতিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে তালাক প্রদানের দিক থেকে তার শ্রেণী বিন্যাসের আলোচনা করতেছেন। সুতরাং তালাক প্রদান করা শব্দগতভাবে দুশ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে।

১। صريح (স্পষ্ট) ২। كناية (অস্পষ্ট)। এখানে طلاق صريح নিয়ে আলোচনা করতেছেন।

قوله : هُوَ كَانَتِ طَالِقٌ الخ : স্পষ্ট তালাক হচ্ছে স্বামী তালাক প্রদানে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করবে যা শুধু স্পষ্টভাবে তালাক প্রদানের জন্য গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই তালাক বুঝাবে। যেমন কেহ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, ইত্যাদি। এসকল শব্দবলী দ্বারা তালাক দিলে তালাকে রেজয়ী সংঘটিত হবে। কেননা, প্রচলিত অর্থে এসকল শব্দ স্ত্রীকে তালাকই বুঝিয়ে থাকে।

আর স্পষ্ট তালাকের পর তালাকে রেজয়ীই সংঘটিত হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ কোরআনের এ আয়াত দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হল। আর যেহেতু শব্দাবলী

তালাকের ক্ষেত্রে স্পষ্ট তাই নিয়তের কোন প্রয়োজন নেই। বরং তালাকের নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ اِنْ نَوٰى الْاَكْثَرَ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) এর উক্ত বাক্য পূর্বে উল্লিখিত تقع واحدة رجعية এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, পূর্বোল্লিখিত انت طالق مطلقة طلقتك শব্দসমূহ দ্বারা যদি কেহ তালাক প্রদান করে তবে তাতে এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। যদিও সে এর চেয়ে বেশি বা তালাকে বায়েনার নিয়ত করে। ইহা আমাদের মাযহাব।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সে যত তালাকের নিয়ত করবে তত তালাক পতিত হবে। ইমাম মালিক, আহমদ, যুফার (রহ.) এর অভিমত অনুরূপ।

তাদের দলীল হল : তালাকদাতা যত সংখ্যার নিয়ত করবে তত পতিত হবে। তার কথা উক্ত সংখ্যাসমূহের সম্ভাবনা রাখে। কেননা, طالق যা সিগায়ে সিফাত। উহার উল্লেখ তার ক্রিয়ামূল طلاق কে অন্তর্ভুক্ত করে, তদ্রূপ طالق এ অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন বলা হয় انت طالق ثلثا এখানে ثلثا শব্দটি তামইজ হয়েই তো ফাতাহ যুক্ত হয়েছে। আর তামইজ এর কাজ হল মুমাইয়্যেজে যার সম্ভাবনা থাকে তা নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা। সুতরাং বুঝা গেল طالق ইহা কম ও বেশির সম্ভাবনা রাখে। তাই নিয়ত দ্বারা তা নির্দিষ্ট করা এর অর্থ হল طالق এর ব্যাখ্যা প্রদান করা।

আমাদের দলীল হল : طالق শব্দটি যে কোন একজনের অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। আর দুজনের অবস্থা বুঝানোর জন্য طالقان আর সকলের অবস্থা বুঝানোর জন্য طوالق ব্যবহার করতে হয়। এতে প্রমাণিত হল যে, ইহা সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। কেননা, সংখ্যা হল মূল অর্থের বিপরীত। আর কোন বস্তু তার বিপরীত কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। এজন্য طالق শব্দের উল্লেখ দ্বারা দুই তিনের নিয়ত করা বৈধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব : এখানে طالق শব্দটি স্ত্রীর সিফাত তালাক পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তালাক প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আর যেহেতু طلاق মাসদারের অর্থের মধ্যে তালাক প্রদানের অর্থ বিদ্যমান। তাই তাতে সংখ্যার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এজন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল যুক্তিসঙ্গত হয়নি।

قوله : وَ لَوْ قَالَ اَنْتِ الطَّلَاقُ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে انت الطلاق অথবা انت طالق الطلاق কিংবা انت طالق طلاقا এ তিনভাবের কোন একভাবে তালাক প্রদান করে এবং কোন কিছুর নিয়ত করে না অথবা এক বা দু তালাকের নিয়তও করে তবে এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। انت طالق طلاقا এবং انت طالق الطلاق বাক্যদ্বয় দ্বারা তালাক পতিত হওয়া একেবারে প্রকাশ্য। কেননা, যদি সে শুধু সিফতের সিগা তথা শুধু انت طالق বলত তবুও তালাক পতিত হয়ে যেত। সুতরাং যেহেতু সিফাতের সিগার সাথে ক্রিয়ামূলকে সংযুক্ত করেছে তাই অবশ্যই তালাক পতিত হবে। আর প্রথমটি তথা انت الطلاق বাক্যে ক্রিয়ামূল ব্যবহার করা হয়েছে আর এ ক্রিয়ামূল দ্বারাও তালাক পতিত হয়ে যায় তার কারণ হল কখন কখন ক্রিয়ামূল বিশেষ্য এর অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন বলা হয় رجل عدل এর অর্থ হল رجل عادل এখানে عدل যা ক্রিয়ামূল তা عادل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ انت الطلاق ইহা انت طالق এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেহেতু انت طالق দ্বারা তালাক পতিত হয় তাই এখানেও তালাক পতিত হবে। আর তা হল এক তালাকে রেজয়ী। আর যদি কেহ এসব বাক্য বলে তিনের নিয়ত করে তবে তা কার্যকর হবে।

কেননা এসব বাক্যে ক্রিয়ামূলের ব্যবহার বিদ্যমান যা ইসমে জিনস তাই ব্যাপক ও আধিক্যের অর্থের সম্ভাবনা রাখে। এভাবে যে, এখানে ইসমে জিনসের প্রকৃত একক এক তালাক। আর বিধানগত একক হল সমগ্র তথা তিন তালাক। এজন্য দুই তালাকের নিয়ত করলে তা কার্যকর হবে না। কেননা, দুই প্রকৃত এককের ভেতর

নয়। তদ্রূপ দুই সংখ্যাটি বিধানগত এককের ভেতরও বিদ্যমান নয়। এজন্য তিন তালাকের নিয়ত সহীহ হবে, কিন্তু দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না। তবে হাঁ, দাসীর ক্ষেত্রে যদি দুই তালাকের নিয়ত করে তবে বিশুদ্ধ হবে। কারণ, হল দাসীর ক্ষেত্রে দুই হল ইসমে জিনস তথা ক্রিয়ামূলের বিধানগত একক সমগ্র। আর স্বাধীনার ক্ষেত্রে দুই কেবল সংখ্য মাত্র। যা প্রকৃত একও নয় আবার বিধানগত একও নয়।

قوله : وَ اِنْ اَضَافَ الطَّلَاقَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর তা হল যদি তালাক শব্দকে স্ত্রীর সমগ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে অথবা এমন অঙ্গের প্রতি সম্পৃক্ত করে যা সমগ্র সত্তাকেই বুঝায়, তবে তালাক পতিত হবে। আর যদি এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি তালাককে সম্পৃক্ত করে যা সমগ্র সত্তা বুঝাতে অক্ষম তবে তালাক পতিত হবে না। সমগ্র সত্তার প্রতি তালাককে সম্পৃক্ত করার উদাহরণ হল- انت طالق - উক্ত বাক্যে انت অর্থ তুমি। আর তুমি বলতে সমগ্র স্ত্রীকেই বুঝায়। গ্রন্থকার (রহ.) এমন কিছু অঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যাদের প্রতি তালাকের সম্বন্ধ করলে পূর্ণ সত্তাকেই বুঝায়। তাহল : ১। الرقبة (ঘাড়) যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ (একটি ঘাড় আজাদ কর। সূরা নিসা-৯২) এখানে رقبة দ্বারা ذات رقبة তথা গোলামই উদ্দেশ্য।

২। عنق (গলা) 'আল্লাহ তা'আরা ইরশাদ করেন فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ (তাদের গলাসমূহ হয়ে গেল। -সূরা শুয়ারা) এখানে اعناق দ্বারা اعناق ওয়ালা তথা সত্তাকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। ৩। روح (প্রাণ) যেমন আরবরা বলে هَلَكَ رُوْحُهُ (তার প্রাণ শেষ) এখানে روح দ্বারা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। ৪। بدن (দেহ) ৫। جسد (শরীর) এ দুটি দ্বারা অনায়াসে সম্পূর্ণ সত্তাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। ৬। الفرج (গুপ্তাঙ্গ) যেমন, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে : لَعَنَ اللّٰهُ الْفُرُوْجَ عَلَى السُّرُوْجِ উক্ত হাদীসে فروج দ্বারা গুপ্তঙ্গওয়ালী তথা নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

৭। وجه (চেহারা) যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ (আর তোমার প্রতিপালকের সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। সূরা রহমান-২৭) এখানেও وجه দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে رأس (মাথা) দ্বারাও সত্তাকে বুঝানো হয়। যেমন বলা হয় فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ অমুক সম্প্রদায়ের নেতা। এখানে راس দ্বারা সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপ دم (রক্ত) যেমন دَمُهُ هَدَرٌ তার রক্তপণ মুক্ত। এখানেও دم দ্বারা সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে।

قوله : اَوْ اِلٰى جُزْءٍ شَائِعٍ الخ : অনুরূপভাবে যদি তার স্ত্রীর এমন অঙ্গের প্রতি তালাককে সম্পৃক্ত করে যা স্ত্রী বিস্তীর্ণ অঙ্গ। তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। যেমন কেহ তার স্ত্রীর অর্ধাংশের প্রতি কিংবা এক তৃতীয়াংশের প্রতি তালাককে সম্পৃক্ত করে বলে نصفك طالق - ثلثك طالق তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা, শরীরের বিস্তির্ণ অংশ বিধানগতভাবে সমস্ত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু যেহেতু তালাককে খণ্ড বিখণ্ড করা সম্ভবপর হয় না। বিধায় সর্বাংশে তালাক সাব্যস্থ হবে।

قوله : وَ اِلَى الْيَدِ اَوِ الرِّجْلِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের জন্য স্ত্রীর হাত বা পা এর দিকে তালাককে সম্পৃক্ত করে অর্থাৎ এমন অঙ্গের দিকে তালাককে সম্পৃক্ত করে যা দ্বারা সমস্ত সত্তা বুঝানো অসম্ভব হয় এসব অঙ্গের দিকে তালাককে সম্পৃক্ত করলে আহনাফের মতে তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.)-দের মতে তালাক পতিত হবে।

তাদের দলীল হল : নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ (অর্থাৎ, হাত, পা, নখ, চুল ইত্যাদি) বিবাহ চুক্তির কারণে ব্যবহার করা যায় এবং এগুলো বিবাহ-বন্ধনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচ্য হয়। সুতরাং এসব অঙ্গ তালাকেরও ক্ষেত্রস্বরূপ হবে। এজন্য এসব অঙ্গের প্রতি সম্বন্ধকৃত তালাক এসব অঙ্গের বেলায় কার্যকর হয়ে সারা দেহে তা বিস্তার লাভ করে। যেভাবে শরীরের বিস্তৃত অংশে তালাক দেয়াতে উক্ত অংশে তালাক পতিত হয়ে সমস্ত সত্তার উপর তালাক পতিত হয়।

আমাদের দলীল হল : যে সমস্ত অঙ্গ বর্ণনার দ্বারা সত্তা অর্থ নেয়া ঠিক হয় না, তালাক এসবের প্রতি সম্বন্ধ করাতে তালাকও পতিত হবে না। যেমন কেহ স্ত্রীর থুথুর সাথে অথবা নখের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা, এসব তালাকের ক্ষেত্র নয়। তাছাড়া যেখানে বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে, তাই হল তালাকের ক্ষেত্র। কারণ, বন্ধন মুক্তির নামই হচ্ছে তালাক। আর হাত, পা এ জাতীয় অঙ্গের মধ্যে বন্ধন নেই। এজন্যই তো এগুলোর দিকে বিবাহের সম্বন্ধ করে আকদ করলে তা বৈধ নয়।

তবে হ্যাঁ, বিস্তৃত অংশের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বন্ধনের ক্ষেত্র তাই তালাকেরও ক্ষেত্র হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

وَنِصْفُ التَّطْلِيقَةِ أو ثُلُثُهَا طَلْقَةٌ وَثَلَاثَةُ اَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاثٌ وَمِنْ وَاحِدَةٍ أو ما بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلى ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإلَى ثَلَاثٍ ثِنْتَانِ وَوَاحِدَةٌ في ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ إنْ لم يَنْوِ شَيْئًا أو نَوَى الضَّرْبَ وَإنْ نَوى وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ وَثِنْتَيْنِ في ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَمِنْ هُنَا إلَى الشَّامِ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَبِمَكَّةَ وَفِي الدَّارِ تَنْجِيزٌ وإذا دَخَلْتِ مَكَّةَ تَعْلِيقٌ -

---

অনুবাদ : এক তালাকের অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ (তালাক দিলে) এক তালাক হবে। দুই তালাকের তিন অর্ধাংশ (তালাক দিলে) তিন তালাক হবে। এক থেকে দুই পর্যন্ত কিংবা এক থেকে দুইয়ের মধ্যবর্তী (তালাক দিলে) এক তালাক হবে। আর এক থেকে তিন পর্যন্ত (তালাক দিলে) দুই তালাক হবে। আর দুয়ের মধ্যে এক (তালাক দিলে পর) যদি কোন কিছু নিয়ত করে না কিংবা গুণের নিয়ত করে (তবে) এক তালাকই হবে। আর যদি এক ও দুই তালাকের ইচ্ছা করে তবে তিন তালাকই হবে। আর দুয়ের মধ্যে দুই (তালাক দিলে) দুই তালাক হবে। যদিও গুণের ইচ্ছা করে। আর এখান থেকে শাম পর্যন্ত (তালাক দিলে) এক তালাকে রেজয়ী হবে। (আর যদি বলে তুমি) মক্কায় কিংবা ঘরের মধ্যে (তালাক) তবে তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। (আর যদি বলে) যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে (তখন তালাক) তবে ঝুলন্ত থাকবে। (অর্থাৎ, মক্কাতে প্রবেশ করলে তালাক হবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ نِصْفُ التَّطْلِيقَةِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে অর্ধেক তালাক দেয় কিংবা এক তৃতীয়াংশ তালাক দেয়। তবে এক তালাকই পতিত হবে। কেননা, তালাক খণ্ডিত হয় না। আর কায়দা হল যা খণ্ডিত হয় না তার অংশ বিশেষের উল্লেখ দ্বারা পূর্ণটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এক তালাকের কোন অংশ উল্লেখ দ্বারা পূর্ণ এক তালাকই গ্রহণ করতে হবে। তাই এসব শব্দ দ্বারা পূর্ণ এক তালাকই পতিত হবে।

قوله : وَ ثَلٰثَةُ اَنْصَافِ الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তুমি দুই তালাকের তিন অর্ধাংশ তালাক তবে স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা, দুই তালাকের অর্ধাংশ হল এক তালাক, দ্বিতীয় অর্ধাংশ দ্বারা দ্বিতীয় তালাক আর তৃতীয় অর্ধাংশ দ্বারা তৃতীয় তালাক পতিত হবে। যখন তিনটি অর্ধেককে একত্র করা হবে এবং প্রতিটি অর্ধেককে পূর্ণ করা হবে তখন তো তিন তালাকই হয়ে যাবে। তাই উপরোক্ত কথা দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে।

তবে কেহ কেহ বলেন, এখানে মোট তিন অর্ধেক। সুতরাং প্রথম দুই অর্ধেককে যদি এক করা হয় তবে এক তালাক হল। আর বাকী এক অর্ধেককে পূর্ণ ধরা হলে দ্বিতীয় তালাক হল। এজন্য উক্ত কথা দ্বারা দুই তালাকই পতিত হবে। তবে তাদের এ যুক্তি যথার্থ নয়। (ফাতহুল কদীর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬)

قوله : وَ مِنْ وَاحِدَةٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে এক মূলনীতির উপর দুটি মাসআলা উপস্থাপন করেছেন। তা হল : প্রথম মাসআলা : যদি কেহ তার স্ত্রীকে এক থেকে দুই তালাক পর্যন্ত তালাক দেয়। এভাবে যে, তুমি এক থেকে দুই তালাক। কিংবা তুমি এক থেকে দুই তালাকের মধ্যবর্তী তালাক। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে এক তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। আর ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে কোন তালাকই পতিত হবে না।

দ্বিতীয় মাসআলা : যদি কেহ তার স্ত্রীকে এক থেকে তিন তালাক পর্যন্ত তালাক দেয়, এভাবে যে, তুমি এক থেকে তিন পর্যন্ত তালাক, কিংবা তুমি এক থেকে তিনের মধ্যবর্তী তালাক। তবে পূর্বের ন্যায় এখানেও মতানৈক্য বিদ্যমান। তা হল, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। আর ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এক তালাক পতিত হবে।

উল্লিখিত মাসআলাদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে : غاية টি مغاية এর অন্তর্ভুক্ত হয় কি না বা অন্তর্ভুক্ত হলে প্রথমটি নাকি শুধু শেষটি নাকি উভয়টি। সুতরাং সকলের দলীলসমূহ পেশ করার পূর্বে আমরা মাসআলাটির আলোকে غاية ও مغاية নিয়ে আলোচনা করছি।

উপরোল্লিখিত মাসআলায় স্বামীর কথার শুরু ও শেষ সীমার উল্লেখ আছে। সুতরাং যার জন্য শুরু ও শেষের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (مغيا) এর মধ্যে উভয় ধরনের সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে কি না এর মোট চারটি ৪ সূরত রয়েছে।

১। প্রাথমিক ও শেষ উভয় সীমা (مغيا) এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতামত।

২। প্রাথমিক ও শেষ কোন সীমাই مغيا এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইহা ইমাম যুফার (রহ.) এর মতামত।

৩। প্রাথমিক সীমা مغيا এর অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত।

৪। প্রাথমিক সীমা مغيا এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, কিন্তু শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত হবে। ইহা কারো নিকট গ্রহণীয় নয়।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : সামাজিকভাবে এ ধরনের কথা দ্বারা সমগ্রটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন কেউ কাউকে বলল, তুমি এখান থেকে এক থেকে দশ টাকা নিয়ে নাও। তবে সে পূর্ণ দশ টাকাই প্রাপ্ত হবে।

এ থেকে প্রতিয়মান হল, যার জন্য সীমা নির্ধারণ হয় তার মধ্যে প্রাথমিক ও শেষ সীমা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এজন্য ১ম মাসআলায় দুই তালাক আর দ্বিতীয় মাসআলায় তিন তালাক পতিত হবে।

ইমাম যুফর (রহ.) এর দলীল হল : যার জন্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, সীমার কোন দিকই তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। প্রথমও না শেষও না। যেমন কেহ বলল, আমি এ দেয়াল থেকে ঐ দেয়াল পর্যন্ত বিক্রয় করলাম। তবে ক্রেতা কোন দেয়ানেরই মালিক হবে না। সুতরাং প্রথম মাসআলার যেহেতু প্রথম ও শেষ সীমাই শুধু বর্ণনা করেছে তাই এ দুটির কোনটিই পতিত হবে না। আর দ্বিতীয় মাসআলায় যেহেতু মধ্যবর্তী এক তালাক বিদ্যমান এজন্য এক তালাক পতিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : যদি প্রাথমিক সীমায় ও শেষের সীমাই সংখ্যা বিদ্যমান থাকে। আর উভয় সংখ্যার মধ্যখানে অন্য একটি সংখ্যা থাকে তবে সর্বনিম্ন সংখ্যা থেকে অধিক সংখ্যাটিই উদ্দেশ্য হবে।

যেমন, এক থেকে তিন পর্যন্ত তালাক দিলে এক্ষেত্রে এক ও তিন এর মধ্যবর্তী দুই সংখ্যা দ্বারা ব্যবধান বিদ্যমান। সুতরাং আলোচিত ক্ষেত্রে সংখ্যাসমূহ থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা হল এক, তার চেয়ে অধিক পরিমাণ সংখ্যা হল দুই অতএব, দ্বিতীয় মাসআলায় দুই তালাক পতিত হবে। আর যদি উভয় সীমার মধ্যবর্তী কোন সংখ্যা না থাকে তবে সর্বাধিক সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যাটি উদ্দেশ্য হবে। যেমন এক থেকে দুই পর্যন্ত তালাক দিল। এক্ষেত্রে এক ও দুই এর মধ্যবর্তী কোন সংখ্যা নেই। তাই উভয়টি থেকে সর্বাধিক সংখ্যা হল দুই আর তার চেয়ে নিম্ন পরিমাণের সংখ্যা হল এক। বিধায় এক তালাকই পতিত হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীলের জবাব : দুটি সীমা উল্লেখ থাকলে সমগ্রটুকু উদ্দেশ্য হয়। সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী বৈধ কোন বিষয়ে যেমন দিরহাম গ্রহণ করা। কেননা, এক থেকে দশ পর্যন্ত গ্রহণ করা বৈধ। পক্ষান্তরে তালাকের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতাই হল মূল বিষয়। এজন্য তালাকের মাসআলাকে উক্ত বিষয়ের উপর কিয়াস করা বৈধ নয়। ইমাম যুফার (রহ.) এর দলীলের জবাব : দ্বিতীয় সীমাটি কার্যকর করার জন্য প্রথম সীমাটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এজন্য আমরা প্রথম সীমাটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু বিক্রয়ের বিষয় ভিন্ন। কেননা, এখানে সীমাটি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। তাই তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে আলোচিত মাসআলাটিতে কোন সীমা পূর্ব থেকে বিদ্যমান নেই। বিধায় প্রথম সীমাটি অন্তর্ভুক্ত হবে, যাতে দ্বিতীয় সীমাটি কার্যকর হয়।

قوله : وَ وَاحِدَةٌ فِى ثِنْتَيْنِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে তুমি দুয়ের মাঝে এক তালাক। আর এর দ্বারা সে অংকের গুণ এর ইচ্ছা করে কিংবা না করে। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী এক তালাকই পতিত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এবং ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) এর মতে দুই তালাক পতিত হবে। তাদের দলীল হল : প্রচলিতভাবে গণিত শাস্ত্রবিদদের নিকট তাহাই ধর্তব্য হয় যে, এ ধরনের বাক্য দ্বারা সাধারণত গুণই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এককে দুই দ্বারা গুণ করে দুইই হয়। বিধায় এক্ষেত্রে দুই তালাকই পতিত হবে।

আমাদের দলীল হল : বস্তু দুই প্রকার। ১। যার দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা বিদ্যমান। যেমন শরীর। ২। যার কোন দৈর্ঘ, প্রস্থ ইত্যাদি নেই। যেমন স্পর্শহীন বস্তু তালাক, এতাক ইত্যাদি।

সুতরাং গুণ দ্বারা প্রথম প্রকার বিষয়ের মূল বস্তুর বৃদ্ধি ঘটে আর গুণ দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার বিষয়ের মূল বস্তুর বৃদ্ধি ঘটেনা, বরং বস্তুর অংশের বৃদ্ধি ঘটে। আর তালাক যেহেতু দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তাই তার অংশ বৃদ্ধি পাবে। মূল তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। আর তালকের অংশে যতই বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করা হউক এক তালাকই ধর্তব্য হয়। এজন্য আমরা বলি উক্ত বাক্য দ্বারা এক তালাকই পতিত হবে। আর যদি সে এক ও দুই তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা, وَاحِدَةٌ فِى ثِنْتَيْنِ এখানে فى অব্যয়টি واو এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং ظرف কে مظروف এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকে। সহবাসকৃতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ বিধান। আর যার সাথে সহবাস হয়নি তার ক্ষেত্রে এক তালাকই পতিত হবে।

قوله : ثِنْتَيْنِ فِى ثِنْتَيْنِ الخ : আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি দুয়ের মাঝে দুই তালাক, তবে নিয়ত না করলে কিংবা গুণের নিয়ত করলেও দুই তালাকই পতিত হবে। তিনি বলেন, এখানে গুণের দাবি হল চার তালাকই হওয়া, কিন্তু যেহেতু তিন তালাকের অধিক তালাক নেই বিধায় তিন তালাকই পতিত হবে। আমাদের দলীল পূর্বের মাসআলায় চলে গেছে। আমাদের দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে স্বামীর কথায় প্রথম অংশ গ্রহণযোগ্য হবে, এবং দুই তালাকই পতিত হবে।

قوله : وَ مِنْ هُنَا اِلَى الشَّامِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا اِلَى الشَّامِ (তুমি এখান থেকে শাম পর্যন্ত তালাক) তবে আমাদের মতে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, এখানে তালাককে দীর্ঘ গুণের সাথে গুণান্বিত করা হয়েছে। আর দীর্ঘ

দৃঢ়তার অর্থ বহন করে। এজন্য তালাকে বায়েন হবে। কারণ, এতে দৃঢ়তা রয়েছে। কিন্তু তালাকে রেজঈতে যেহেতু দৃঢ়তা নেই বিধায় তালাকে রেজঈ সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলীল : উক্ত ব্যক্তি তালাককে সীমাবদ্ধ করেছে। সে একটি নির্দিষ্ট স্থানের সাথে তালাককে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে যদি সে শুধু انت طالق বলত তবে পৃথিবীর সর্বত্রই সাব্যস্ত হত। তাই আমরা বলি সে তালাককে দীর্ঘ গুণের সাথে সম্পৃক্ত করেনি, বরং তালাককে সে সীমাবদ্ধ করেছে। তাই এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে।

قوله : بِمَكَّةَ أَوْ فِى الدَّارِ الخ : যদি কেহ বলে তার স্ত্রীকে যে তুমি মক্কাতে তালাক কিংবা ঘরের মধ্যে তালাক তবে তৎক্ষণাৎ তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। সে মক্কাতে থাক কিংবা ঘরে থাক, কেননা, তালাক কোন স্থানকে বাদ দিয়ে কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। সর্বত্র সবজায়গাতেই তালাক কার্যকর হয়।

আর যদি বলে তুমি মক্কাতে প্রবেশ করলে তালাক, তবে মক্কায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তালাক হবে না। কেননা, স্বামী তালাককে মক্কায় প্রবেশের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। আর শর্ত পাওয়া না গেলে শর্ত মুক্ত বিষয় কার্যকর হয় না। তাই আমরা বলি এধরনের কথার তালাক ঝুলন্ত থাকবে।

فَصْلٌ : فِيْ إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الزَّمَانِ

পরিচ্ছেদ : তালাককে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করণ প্রসঙ্গ

أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَو فِي غَدٍ تُطَلَّقُ عِنْدَ الصُّبْحِ وَنِيَّةُ الْعَصْرِ تَصِحُّ فِي الثَّانِي وفي الْيَوْمِ غَدًا أَو غَدًا الْيَوْمِ يُعْتَبَرُ الْأَوَّلُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ أَو أَمْسِ وَنَكَحَهَا الْيَوْمَ لَغْوٌ وَإِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَمْسِ وَقَعَ الْآنَ -

অনুবাদ : (যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে) তুমি আগামীকাল তালাক, কিংবা আগামী কালের মধ্যে তালাক। (তবে) ফজরের সাথে সাথে তালাক পতিত হবে। দ্বিতীয় উক্তির বেলায় আসরের নিয়ত করাও বিশুদ্ধ। আর (যদি বলে (তুমি) আজ আগামীকাল তালাক কিংবা আগামীকাল আজ তালাক তাহলে প্রথম (উচ্চারিত শব্দ)টি বিবেচ্য হবে। (আর যদি বলে) আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তুমি তালাক। অথবা তুমি গতকাল তালাক অথচ আজ তাকে বিবাহ করেছে। (তবে তার উভয় কথাটি) অনর্থক হবে। আর যদি গতকালের পূর্বে বিবাহ করে থাকে তবে সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে। انت طالق غدا তুমি আগামীকাল তালাক, তবে আগামীকাল শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, আগামীকালের ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা, সে তার কথায় সমগ্র আগামী কালকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং সমগ্র আগামীকাল অর্থ নেয়া তখনই সম্ভবপর হবে যখন আগামীকালের সূচনাতেই কার্য পাওয়া যাবে।

এজন্য আমরা বলি, যদি انت طالق غدا - কেহ তার স্ত্রীকে বলে তবে আগামীকাল ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যদি সে এ কথা বলার দ্বারা দিনের কোন নির্দিষ্ট অংশ ইচ্ছা করে থাকে তবে তা দুনিয়ার বিচারে কার্যকর হবে না। কিন্তু দ্বীনী বিচারে কার্যকর হবে। কেননা, সে ব্যাপকতা থেকে নির্দিষ্ট তার অর্থ গ্রহণ করেছে। যা বাহ্যিক তার বিপরীত। আর যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে انت طالق فى غدٍ তুমি আগামী দিনের মধ্যে তালাক। আর কোন নিয়ত করে না তবে দিনের শুরুতেই তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে যদি ইহা বলার দ্বারা দিনের শেষাংশ বা অন্য কোন অংশ উদ্দেশ্য নেয় বা ইচ্ছা করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তা গ্রহণীয় হবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে প্রথম মাসআলার ন্যায় তা দুনিয়ার বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে আখেরাতের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : সে ব্যক্ত সমগ্র আগামী কালের সাথে স্ত্রীর তালাককে সম্পৃক্ত করেছে। তাই তা আগামীকালের ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই কার্যকর হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যদি আগামীকালের কোন অংশ বিশেষের নিয়ত করে তবে তা ব্যাপকতার মাঝে নির্দিষ্টতার নিয়ত করা হবে যা বাহ্যিকতার বিপরীত। আর একারণেই তার এ নিয়ত করাকে দুনিয়ার বিচারে কার্যকর করা যাবে না। তবে দ্বীনী বিচারে তা কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত فى অব্যয়টি ظرف তথা পাত্র অর্থ নির্দেশক যা পাত্রস্থের সামগ্রীকতাকে দাবী করে না। বরং কখন পাত্রের অংশবিশেষে পাত্রস্থ পাওয়া যেতে পারে। আর এখানে পাত্র অর্থাৎ, আগামীকালই উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আগামী কালের পূর্বে যেহেতু فى অব্যয় বিদ্যমান, তাই যদি কেহ আগামীকালের কিছু অংশ উদ্দেশ্য নেয় বা তার ইচ্ছা করে তবে তা হবে পাত্রের অংশ বিশেষের তালাক প্রদানের ইচ্ছা। আর তাই অর্থ নেয়া এ বাক্য দ্বারা সম্ভবপর। এজন্য আমরা বলি যদি انت طالق فى غد বলে কেহ দিনের শেষ সময় উদ্দেশ্য নেয় তবে তা দুনিয়ার বিচারে কার্যকর হবে। এবং দিনের শেষাংশেই তালাক পতিত হবে। উভয় মাসআলার দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায় যে, কেহ বলল واللّٰه لَاَصُوْمَنَّ عُمُرِىْ 'আল্লাহর কসম আমি সারা জীবন রোজা রাখব।

এখানে যেহেতু فى অব্যয় বিদ্যমান তাই জীবনের কিছু অংশ রোজা রাখলে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। প্রথম উদাহরণে যেভাবে عمرى দ্বারা সারাটি জীবন উদ্দেশ্য হয়েছে তদ্রূপ انت طالق غدا এর মধ্যে সারাটি দিন উদ্দেশ্য হবে। আর সারাটি দিন তখন তালাকের মধ্যে গণ্য হওয়া সম্ভব যখন দিনের প্রথমাংশে তালাক পাওয়া যাবে।

আর দ্বিতীয় উদাহরণে فى عمرى দ্বারা অনিবার্যরূপে যদিও সারাটি জীবন উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবনের কিছু অংশকেই ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারণ করলে অনিবার্যবশত যা সাবিত হয় তার উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়ে জীবনের কিছু অংশে রোজা রাখলে যথেষ্ট হবে। তদ্রূপ انت طالق فى غد এর মধ্যেও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের কিছু অংশ নির্ধারন করে নেয় তবে তা কোন ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় অনিবার্য বশত সারাটি দিন উদ্দেশ্য নেয়া থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ হবে। والله اعلم -

قوله : وَ فِى الْيَوْمِ غَدًا الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে انت طالق اليوم غدا তুমি আজ আগামীকাল তালাক। কিংবা انت طالق غدا اليوم তুমি আগামীকাল আজ তালাক। তবে উভয় বাক্যে প্রথম কথা বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, প্রথম বাক্যে তাৎক্ষণিকই তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় বাক্যে আগামীকালই তালাক হবে। কেননা, প্রথম বাক্যে اليوم বলাতে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হবে যা আগামীকালের সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা তাৎক্ষণিককে অন্তর্ভুক্ত করে না। কেননা, তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করতে গেলে সম্বন্ধ اضافت কে বাতিল করতে হয় যা যথার্থ নয়।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে আমি তোমাকে বিবাহ করার পূর্বে তুমি

তালাক তবে কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা, সে তালাককে তালাকের মালিকানাহীন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। কারণ, বিবাহের পূর্বে কোন অপরিচিতাকে তালাক দেয়ার মালিকানা বিদ্যমান নেই, তাই তার একথা অনর্থক হবে। তার একথা এমন হল যেমন, সে বলল, আমি তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা শিশু অবস্থায় তালাক দিলাম।

قوله : أَوْ أَمْسِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে আজ বিবাহ করেছে অথচ বলে আমি তোমাকে গতকাল তালাক দিলাম, তবে তার এ তালাক পতিত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রেও সে তালাককে তালাকের মালিকানার পরিপন্থী অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর যদি গতকালের পূর্বে বিবাহ করে থাকে তবে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হবে। কেননা, স্বামী তালাককে এমন অবস্থার সাথে যুক্ত করেছে যা তালাকের মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। তা মালিকানার পরিপন্থী নয়। কেননা, সে তো তাকে গতকালের আগে বিবাহ করেছে। তাই তার অতীতকালীন কথাকে انشاء বা সৃজন অর্থে গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হওয়ার অর্থে গ্রহণ করা হবে। আর মূলনীতি হল অতীতকালীন সৃজন, বর্তমানকালীন সৃজন হিসাবে ধর্তব্য হয়।

أَنْتِ طَالِقٌ ما لم أُطَلِّقْكِ أو مَتٰى لم أُطَلِّقْكِ أو مَتَى ما لم أُطَلِّقْكِ وَسَكَتَ طُلِّقَتْ وفي إنْ لم أُطَلِّقْكِ أو إذَا لم أُطَلِّقْكِ أو إذَا ما لم أُطَلِّقْكِ لَا حَتّٰى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا أَنْتِ طَالِقٌ ما لم أُطَلِّقْكِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلِّقَتْ هٰذِهِ الطَّلْقَةَ أَنْتِ كَذَا يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَنَكَحَهَا لَيْلًا حَنِثَ بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ -

---

অনুবাদ : (আর যদি স্বামী বলে) তুমি তালাক তোমাকে আমি তালাক না দেওয়া পর্যন্ত। কিংবা যে পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দেই। অথবা যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে তালাক না দেই এবং সে চুপ করে থাকে তবে স্ত্রী, তালাক প্রাপ্তা হবে। (আর যদি বলে) যদি তোমাকে তালাক না দেই, অথবা যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই। কিংবা যখন না আমি তোমাকে তালাক না দেই তবে যে কোন একজনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। (আর যদি বলে) তুমি তালাক যখন তোমাকে তালাক না দেই তুমি তালাক। তবে (দ্বিতীয়) তালাক দ্বারা সে তালাক প্রাপ্ত হবে। (আর যদি বলে) তুমি এমন (অর্থাৎ তালাক) যেদিন আমি তোমাকে বিবাহ করব। অতঃপর তাকে সে রাতে বিবাহ করল। তবে সে ভঙ্গকারী হবে। (অর্থাৎ তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে।) স্ত্রীকে ইচ্ছা প্রদানের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : أَنْتِ طَالِقٌ مَالَمْ أُطَلِّقْكِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে انت طالق مالم اطلقك (তুমি তালাক যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দেই) অথবা انت طالق متى لم اطلقك (তুমি তালাক যে পর্যন্ত আমি তোমাকে তালাক না দেই।) কিংবা انت طالق متى مَا لم اطلقك (তুমি তালাক যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে তালাক না দেই।) উক্ত বাক্য থেকে যে কোন একটি বলার পর যদি স্বামী চুপ থাকে তবে সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা, বাক্যসমূহ তালাককে তালাক থেকে মুক্ত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আর যখন সে নীরব ছিল তখনই তালাক থেকে মুক্ত সময় পাওয়া গেছে বিধায় তালাক পতিত হয়ে গেল।

متى - ما - متى ما অব্যয়সমূহ সময় বুঝানোর জন, ব্যবহৃত হয়। কেননা, متى (যে পর্যন্ত) متى ما (যে পর্যন্ত না) শব্দ দুটি ظرف زمان এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই শব্দ দুটি স্পষ্ট সময় নির্দেশক। অনুরূপভাবে ما (যতক্ষণ) অব্যয়টিও সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনের বাণী مَا دُمْتُ حَيًّا যার মর্মার্থ مدة دوامي حيا জীবতকাল। সুতরাং আলোচিত বাক্যসমূহে যেহেতু উক্ত অব্যয়সমূহের প্রয়োগ বিদ্যমান তাই তালাকও এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে যে সময় সে তালাক দেয়া থেকে চুপ থাকল। এজন্য বাক্যসমূহ বলার পর পরই চুপ থাকার কারণে তালাক পতিত হবে।

قوله : وَ فِي اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ لَمْ اُطَلِّقْكِ (যদি তোমাকে তালাক না দেই তবে তুমি তালাক) অথবা اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا لَمْ اُطَلِّقْكِ (তুমি তালাক যখন তোমাকে তালাক না নেই) কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا مَالَمْ اُطَلِّقْكِ (তুমি তালাক যখন না আমি তোমাকে তালাক না দেই) এসব অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্বামী স্ত্রীর কোন একজনের মৃত্যুর সময় তালাক পতিত হয়ে যাবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর মতে প্রথম বাক্য দ্বারা যে কোন একজনের মৃত্যুর সময় তালাক পতিত হবে। কিন্তু শেষোক্ত বাক্যদ্বয় উচ্চারণের পর স্বামী চুপ করার সাথে সাথেই তালাক পতিত হয়ে যাবে।

শেষোক্ত বাক্যদ্বয়ের ব্যাপারে সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে اذا ব্যবহার করা হয়েছে যা متى - ما - متى এর মত সময়ের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ এ আয়াতে اذا অব্যয়টি সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে কবির উক্তি :

وَ اِذَا تَكُوْنُ كَرِيْهَةٌ اُدْعٰى لَهَا * وَ اِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعٰى جُنْدُبُ

মন্দের সময় আহুত হই আমি আর মিষ্টান্নের বেলায় আহুত হয় জুনদুব।

এখানে اذا অব্যয়টি ব্যবহার হয়েছে সময় এর অর্থে। তদ্রূপ বাক্যদ্বয়ে اذا সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং স্বামী চুপ থাকার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : اذا অব্যয়টি শর্তের অর্থ ব্যবহৃত হয় যেমন কবির উক্তি :

وَ اَسْتَغْنِ مَا اَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنٰى * وَ اِذَا تُصِبْكَ خِصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ

তুমি অমুখাপেক্ষী থাকো যতক্ষণ তোমার প্রভু তোমাকে প্রাচুর্যশীল রাখেন আর যখন তুমি অভাবে পড়বে তখন ধৈর্য ধর।

কবিতায় اذا শর্তের জন্য ব্যবহার হয়েছে এজন্যই তো تُصِبْكَ জযম বিশিষ্ট হয়েছে। সুতরাং اذا যেভাবে শর্তের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তদ্রূপ সময় এর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে এখানে ان এর ন্যায় শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও সাহাবাইন (রহ.) এর মধ্যকার মতপার্থক্য তখনই সৃস্টি হবে যখন স্বামী এ বাক্যদ্বয় থেকে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করে এবং কোন কিছুর নিয়াত করে না। অধিকন্তু যদি সে اذا দ্বারা সময় উদ্দেশ্য নেয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি সে শর্তের নিয়াত করে তবে জীবনের শেষ প্রান্তে তালাক সাব্যস্ত হবে। - الله اعلم।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ مَالَمْ اُطَلِّقْكِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ مَالَمْ اُطَلِّقْكِ اَنْتِ طَالِقٌ - (তুমি তালাক যখন আমি তোমাকে তালাক না দেই তুমি তালাক) তবে স্বামীর বক্তব্যের শেষ কথাটি তথা اَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে।

তবে কিয়াসের দাবি হল স্ত্রী সহবাসকৃতা হলে প্রথমোক্ত বাক্য তথা اَنْتِ طَالِقٌ مَالَمْ اُطَلِّقْكِ দ্বারা এক তালাক পতিত হওয়া যেমনটি ইমাম যুফার (রহ.) এর মতামত। অর্থাৎ, তিনি বলেন, প্রথমোক্ত বাক্য দ্বারা এক তালাক

আর শেষের বাক্য তথা انت طالق দ্বারা এক তালাক মোট দুই তালাক হয়ে এ সম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা দুই তালাক পতিত হবে।

তার দলীল হল স্বামী انت طالق مالم اطلقك দ্বারা স্বামী এমন এক সময়ের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করেছে যে সময়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়নি। যদিও তা স্বল্প হউক না কেন।

সুতরাং শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে এবাক্য দ্বারা এক তালাক পতিত হবে।

আর পরবর্তী انت طالق দ্বারা অন্য তালাক পতিত হবে। তাই উক্ত বাক্য উচ্চারণ করাতে সহবাসকৃতার ক্ষেত্রে দুটি তালাক পতিত হবে।

আমাদের দলীল হল : যদি কেহ শপথ করে তবে তার জন্য এতটুকু সময়ের প্রয়োজন যতটুকু সময়ের ভেতর সে শপথ পূর্ণ করতে পারে। আর এ পরিমাণ সময়কে বহির্ভুত না ধরলে শপথ রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং انت طالق مالم اطلقك এর পর এতটুকু সময়ের প্রয়োজন যে সময়ে সে انت طالق উচ্চারণ করবে। এজন্য আমরা বলি যে انت طالق مالم اطلقك দ্বারা তালাক পতিত হবে না। আর পরবর্তী انت طالق দ্বারা তালাক পতিত হবে।

قوله : اَنْتِ كَذَا يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অপরিচিত এক মহিলাকে বলে اَنْتِ كَذَا (اى طالق) يَوْمَ اَتَزَوَّجُكِ তুমি তালাক যেদিন তোমাকে বিবাহ করব। অতঃপর উক্ত মহিলাকে সে রাতে বিবাহ করল তবে এ স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, এখানে يوم শব্দ রয়েছে। আর يوم বলা হয় দিবসের আলোকিত অংশকে। আবার রূপকভাবে স্বাধারণ সময়কেও يوم বলা হয়। সুতরাং যখন এর সাথে قرينة সংযুক্ত হবে তখন তা দ্বারা তার অর্থ নির্দিষ্ট হবে। قرينة হল যদি يوم এর সাথে দীর্ঘ মেয়াদী তথা প্রলম্বিত কোন কাজ সংযুক্ত হয় তবে তা দ্বারা দিবসের আলোকিত অংশ উদ্দেশ্য হয়। আর যদি يوم এর সাথে সংক্ষিপ্ত তথা অপ্রচলিত কোন কাজ সম্পৃক্ত হয় তবে يوم দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়। সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) ইহাই বুঝানোর জন্য بِخِلَافِ الْاَمْرِ بِالْيَدِ এর উল্লেখ করেছেন। কেননা, স্ত্রীকে ইচ্ছা প্রদান করা বা রোজা ইত্যাদির জন্য কিছু প্রলম্বিত সময়ের প্রয়োজন তাই ইহা দ্বারা দিবসের আলোকিত অংশ উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু তালাক ইতাক ইত্যাদির জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় না। বিধায় তার সাথে يوم এর ব্যবহার হলে সাধারণ সময়ই বুঝাবে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ (যেদিন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে) এখানে يوم দ্বারা সাধারণ সময় উদ্দেশ্য। অতএব আমাদের আলোচিত মাসআলার يوم দিন রাত উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। তাই এখানে দিন রাতের যে কোন সময় সে বিবাহ করলে তালাক পতিত হয়ে যাবে।

أَنَا مِنْكَ طَالِقٌ لَغْوٌ وَ إِنْ نَوٰى وَ تَبِيْنُ فِى الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَو لَا أو مَعَ مَوْتِى أَوْ مَعَ مَوتِكِ لَغْوٌ وَلَوْ مَلَكَهَا أو شِقْصَهَا أو مَلَكَتْهُ أو شِقْصَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لم يَقَعْ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ فَأَعْتَقَ لَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ تَعَلَّقَ عِتْقُهَا وَطَلْقَتَاهَا بِمَجِيْءِ الْغَدِ فَجَاءَ لَا وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ -

অনুবাদ : (যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে) আমি তোমার থেকে তালাক প্রাপ্ত (তবে তার কথা) অনর্থক হবে যদিও তালাকের নিয়ত করে। আর বায়েন, (বিচ্ছিন্ন) হারাম বলার দ্বারা তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, যদি বলে আমি তোমার থেকে বায়েন বা হারাম তবে তালাকে বায়েন পতিত হবে)। (আর যদি স্বামী বলে) তুমি এক তালাক অথবা না কিংবা, আমার মৃত্যুর সাথে সাথে অথবা তোমার মৃত্যুর সাথে (এক তালাক তবে তার কথা) অনর্থক হবে। স্বামী যদি স্ত্রীর কিংবা স্ত্রীর কোন অংশের মালিক হয়ে যায় অথবা স্ত্রী স্বামীর কিংবা স্বামীর কোন অংশের মালিক হয়ে যায় তবে আকদে নিকাহ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রীকে ক্রয় করে অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তালাক পতিত হয়নি। (অর্থাৎ, ক্রয়ের সাথে সাথেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাই মহল না থাকায় তালাক পতিত হবে না।) (অন্যের দাসী থাকা অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে) তোমার মনিব তোমাকে আজাদ করার সাথে সাথে তুমি দুই তালাক। অতঃপর মনিব আজাদ করল। তবে স্বামীর জন্য ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে। আর যদি মনিব তার আজাদীকে এবং স্বামী তার (দুই) তালাককে আগামী কাল আসার সাথে সম্পৃক্ত করে অতঃপর আগামীকাল আসলে স্বামী রেজয়াত করতে পারবে না। আর এ মহিলার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : أَنَا مِنْكِ طَالِقٌ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে انا منك طالق (আমি তোমার থেকে তালাক) তবে তালাকের নিয়ত করলে ও তালাক পতিত হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন যদি তালাকের নিয়ত করে তবে তালাক পতিত হবে।

তিনি দলীল পেশ করেন : স্বামী স্ত্রী বিবাহের মালিকানার মধ্যে সমান শরীক। তাইতো একজন আরেকজনের কাছে সহবাসের দাবী করতে পারে। অনুরূপভাবে হালাল হওয়ার মধ্যে উভয়ই শরীক। আর এগুলো বিলুপ্ত করতে হয় তালাকের মাধ্যমে। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, তালাক যেভাবে স্ত্রীর দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ। তদ্রূপ স্বামীর দিকে সম্পূর্ণ করাও বৈধ। যেমন ابانة ও تحريم শব্দদ্বয়কে স্বামী স্ত্রীর যে কোন জনের দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ।

আমাদের দলীল হল : তালাক হল বন্ধন মুক্তির নাম। আর বন্ধন স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান। স্বামীর ক্ষেত্রে নয়। তাই তো স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়াতে বিধিনিষেধ বিদ্যমান। সুতরাং বৈবাহিক বন্ধন যেভাবে স্ত্রীর দিকে তেমনি তালাক ও স্ত্রীর দিকে সম্পৃক্ত হবে। এজন্য انا منك طالق কে স্বামীর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না যদিও সে তার নিয়ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীলের জবাব : যদি মেনে নেয়া হয় যে মালিকানা বিলুপ্তির জন্য তালাক তবুও তা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হতে পারে না। কেননা, মালিকানা শুধু স্বামীর জন্য নির্ধারিত। আর স্ত্রী মীলকানাধীন। যেমন স্ত্রীকে বলা হয় منكوحة (বিবাহকৃতা) সুতরাং যেহেতু মালিকানা স্ত্রীর উপরেই তাই তালাকও স্ত্রীর উপরই হবে। স্বামীর উপর নয়।

আর ابانة শব্দটি যে কোন জনের দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে। কেননা, তার অর্থ হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর সম্পর্কের মধ্যে স্বামী স্ত্রী উভয়ই শরীক। তদ্রূপ تحريم শব্দটিও কেননা, তা বৈধতা বিলুপ্তির জন্য নির্ধারিত। আর হালাল হওয়ার মধ্যে উভয়ই শরীক। সুতরাং এ শব্দদ্বয়ের উপর কিয়াস করে انا منك طالق। দ্বারা নিয়ত থাকা অবস্থায় তালাক পতিত হবে বলা মোটেও ঠিক নয়।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً اَوْ لَا الخ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে তুমি এক তালাক কিংবা নয়, তবে কোন তালাক পতিত হবে না। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, জামিস সাগিরে মাসআলাটিকে বিনা মতপার্থক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার তিনি বলেন, ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দ্বিতীয় মত। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এক বর্ণনা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর প্রথম বর্ণনায় রয়েছে এ বাক্য দ্বারা এক তালাকে রেজয়ী পতিত হবে।

দলীল : او বর্ণকে এক তালাক ও না বাচক শব্দের মাঝে প্রয়োগ করার কারণে তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এক তালাকের গ্রহণযোগ্যতা রহিত হল। আর انت طالق (তুমি তালাক) কথাটি বহাল থাকল। আর একথা দ্বারা এক তালাকে রেজঈ পতিত হয়। বিধায় এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। আর যদি বলে انت طالق او لا (তুমি তালাক কিংবা নয়) واحدة ছাড়া। তবে কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা, এখানে মূল তালাকের ক্ষেত্রেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : তালাক গুণকে যখন সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন সংখ্যার উল্লেখের দ্বারা তালাক পতিত হয় গুণের দ্বারা নয়। আর সংখ্যার দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার কারণ হলো যা পতিত হয় তা হলো উহ্য ধাতু। সুতরাং انت طالق واحدة এর অর্থ হবে انت طالق تطليقة واحدة (তুমি তালাক প্রাপ্তা, এক তালাক) আর যার সংশ্লিষ্ট তাই যখন পতিত হয় তখন মূল তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হল। আর সন্দেহের কারণে তালাক পতিত হবে না।

قوله : اَوْ مَعَ مَوْتِىْ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে انت طالق مع موتى (তুমি আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তালাক) কিংবা انت طالق مع موتك (তুমি তোমার মৃত্যুর সাথে সাথে তালাক) তবে সর্বসম্মত মতামত অনুযায়ী তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, مع অব্যয়টি যদি مصدر তথা ক্রিয়ামূলের সাথে ব্যবহৃত হয় তবে তা بعد এর অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যদ্বয়ে مع موتى তথা بعد موتى - مع موتك তথা بعد موتك এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য তালাক পতিত হবে না। কেননা, সে তালাককে এমন এক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা তালাকের পরিপন্থী। কেননা, স্বামীর মৃত্যু হলে তালাক প্রদানের যোগ্যতা হারালো। আর স্ত্রীর মৃত্যুর ফলে তালাকের ক্ষেত্রই থাকে না। তাই তো তালাক পতিত হওয়ার জন্য উভয়ের বিদ্যমান থাকা জরুরী।

قوله : وَلَوْ مَلَكَهَا الخ : যদি স্বামী স্ত্রীর মালিক হয় যে কোন সূত্রে অথবা স্ত্রীর আংশিকের মালিক হয় অথবা স্ত্রী স্বামীর মালিক হয় কিংবা স্বামীর আংশিকের মালিক হয়ে যায় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। কেননা, বিবাহ সূত্রে মালিকানা এবং দাসত্বসূত্রে মালিকানার মাঝে বৈপরিত্ব রয়েছে। এভাবে যে, বিবাহ সূত্রের মালিকানায় এমন অনেক বিষয় আছে যা স্বামী থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য রয়েছে। যেমন মহর খোরপোষ ইত্যাদি। অনুরূপ স্ত্রী থেকে স্বামীর প্রাপ্য রয়েছে। যেমন সম্ভোগঅঙ্গ ব্যবহার করা। স্বামীর মালের হিফাযত করা। তার অনুমতি ছাড়া কোথাও না যাওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ, বিবাহের বন্ধনের ফলে স্বামী স্ত্রী উভয়েই একজন অপরজনের নিকট দায়বদ্ধ। অথচ দাসের মালিকানার ক্ষেত্রে শুধু মনিব সবকিছুর মালিক। এখানে দাস বা দাসীর কোন দাবী-দাওয়া মনিবের নিকট

বিদ্যমান নেই। এজন্য দাসত্বের মালিকানা এবং বিবাহের বন্ধন একত্র করা সম্ভবপর নয়।

قوله : فَلَوْ اِشْتَرَاهَا الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে ক্রয় করে অথবা যে কোনভাবে তার মালিক হয় কিংবা তার অংশ বিশেষের মালিক হয় তবে তাদের মধ্যকার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। এজন্য স্বামী যদি মালিক হওয়ার পর তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তা পতিত হবে না। কেননা, তালাক পতিত হওয়ার মহল তথা আকদে নিকাহ্ বিদ্যমান নেই। আর আকদে নিকাহ্ না থাকলে তালাক কোথায় পতিত হবে। আকদে নিকাহ্ এর অস্তিত্ব না থাকার কারণ হল : এ ক্রয়কৃত দাসীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব নয়। আর সামগ্রিকভাবে বিবাহ না থাকার কারণ হল দাসত্বের মালিকানা অর্জন হওয়ায় বিবাহ সূত্রের মালিকানা শেষ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে যদি স্বাধীন স্ত্রী দাস স্বামীকে ক্রয় করে বা যে কোনভাবে মালিক হয়ে যায় তবে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা, মালিক হওয়া আর মালিকানাধীন থাকা একই স্থানে হতে পারে না।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রী যিনি অন্যের দাসি তাকে লক্ষ্য করে বলল انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك তোমার মুনিব তোমাকে আজাদ করার সাথে সাথে তুমি দুই তালাক। অতঃপর মনিব তাকে আজাদ করে দিল তবে স্ত্রীর উপর দু তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। স্বামী চাইনে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কেননা, স্বামীর তালাককে মনিবের আজাদ করার সাথে শর্তযুক্ত করেছে। অর্থাৎ, স্বামীর তালাক হল مشروط শর্তযুক্ত। আর আজাদ করা/ আজাদ হওয়া হল شرط শর্ত। সুতরাং শর্ত পাওয়া গেলে শর্তযুক্ত পাওয়া যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে আজাদ হওয়া শর্ত। আর তার ফলাফল হল তালাক। আর ফলাফল যেহেতু পরে হয়ে থাকে তাই আজাদ হওয়া / বা করার পর তালাক পতিত হবে। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, স্ত্রী আজাদ হওয়ার পর তালাক পতিত হবে। আর আজাদ স্ত্রীর যেহেতু তিন তালাক। তাই এ স্ত্রীর উপর দুই তালাকে রেজয়ী পতিত হবে।

قوله : وَلَوْ تَعَلَّقَ عِتْقُهَا الخ : যদি স্বামী তার (অন্যের দাসী) স্ত্রীকে বলে যখন আগামীকাল হবে তখন তুমি দুই তালাক, এ দিকে তার মনিবও বলে যখন আগামীকাল হবে তখন তুমি আজাদ। অতঃপর আগামীকাল আসলে পর এ দাসী স্ত্রী স্বাধীনতা অর্জন করবে। এবং স্বামী কর্তৃক দুই তালাক প্রাপ্তা হবে। সে এ স্বামীর নিকট পুনরায় ফিরে আসতে হলে অন্য স্বামীকে বিবাহ করতে হবে। দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হলে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে এবং উক্ত স্ত্রী তিন হায়েজ ইদ্দত পালন করবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতামত। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, উক্ত স্ত্রীর উপর আগামীকাল হলে দু তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। যদি স্বামী চায় তবে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলীল হল : স্বামী তালাককে এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে যার সঙ্গে মনিব আজাদ করার বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং আজাদী দাসি অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাই তালাকও দাসী অবস্থায় পতিত হয়েছে। আর দাসীর বেলায় দুই তালাকই হল চূড়ান্ত। তাই আলোচিত মাসআলায় দাসী স্ত্রীর উপর চূড়ান্ত হুরমত হিসাবে দুই তালাকই পতিত হবে। তবে সে তিন হায়েজ ইদ্দত পালন করবে। কেননা, ইদ্দতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

اَنْتِ طَالِقٌ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِثَلَاثَةِ اَصَابِعَ فَهِيَ ثَلَاثٌ اَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أو اَلْبَتَّةُ أو اَفْحَشَ الطَّلَاقِ أو طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أوِ الْبِدْعَةِ أو كَالْجَبَلِ أو اَشَدَّ الطَّلَاقِ أو كَالْفٍ أو مِلْءَ الْبَيْتِ أو تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً أو طَوِيلَةً أو عَرِيضَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إنْ لم يَنْوِ ثَلَاثًا -

---

অনুবাদ : (যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে) তুমি এরূপ তালাক, আর তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তবে তা তিন তালাক হবে। (যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে) তুমি বায়েন তালাক কিংবা অকাট্য তালাক। অথবা নিকৃষ্টতম নতুবা শয়তানের তালাক, কিংবা বেদয়ী, (তালাক) অথবা পাহাড়ের ন্যায় (তালাক) কিংবা কঠিনতম তালাক, অথবা হাজারের ন্যায় (তালাক) কিংবা ঘর ভর্তি (তালাক) অথবা প্রচন্ড তালাক অথবা লম্বা তালাক কিংবা প্রশস্ত তালাক তবে এক তালাকে বায়েন হবে, যদি তিন তালাকের নিয়ত না করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ هٰكَذَا الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লক্ষ করে বলে انت طالق هكذا (তুমি এরূপ তালাক) আর তিন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তবে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তবে দুই তালাক পতিত হবে। এর দলীল হল : আঙ্গুলের ইশারা যদি অস্পষ্ট সংখ্যার সাথে যুক্ত হয় তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যা বিবেচিত হবে। যেমন আরবী মাসের দিনের সংখ্যা বর্ণনা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

عَنْ اِبْنِ عُمَرَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا وَ عَقَدَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ وَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا (متفق عليه)

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) আঙ্গুলের ইশারায় মাসের গণনা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আঙ্গুলের ইশারা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যা বুঝাবে।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ اَوْ اَلْبَتَّةُ الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের ক্ষেত্রে কঠোরতা অথবা অতিরিক্ততার কোন গুণে গুণান্বিত করে যেমন সে বলে انت طالق بائن او البتة (তুমি তালাকে বায়েন বা অকাট্য তালাক) তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে সহবাসের পর হলে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

তাদের দলীল হল : স্পষ্ট তালাককে শরীয়াত রাজআত যোগ্য করে অনুমোদন দিয়েছে। তাই তাতে বায়েন তালাক পতিত করার কোন অবকাশ নেই। যেমন কেহ তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَنْ لَا رَجْعَةَ لِىْ عَلَيْكَ (তোমার উপর এমন তালাক যে তোমাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার আমার নেই। তবে তালাকে রেজঈ হবে। অনুরূপ আলোচ্য মাসআলায়ও তালাকে রেজয়ী পতিত হবে।

আমাদের দলীল হল : স্বামী তালাককে এমন এক গুণে গুণান্বিত করেছে যার সম্ভাবনা তালাক রাখে। তুমি তালাক একথারই মধ্যে বায়েন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এজন্যই তো সহবাসহীনা স্ত্রীকে তুমি তালাক বললেই বায়েন তালাক পতিত হয়ে যায়। সুতরাং স্পষ্ট তালাকে বর্ধিত গুণটি বায়েন হওয়ার উপরই ধর্তব্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তার মতের স্বপক্ষে যে মাসআলা দ্বারা কিয়াস করেছেন আমরা বলি এধরনের বাক্য দ্বারা তালাকে বায়েনই পতিত হয়। সুতরাং তার এ কিয়াস করা যথার্থ হয় নাই।

قوله : وَ اَفْحَشَ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষেত্রে তালাকের সাথে افحش। (নিকৃষ্টতম) شيطان (শয়তানী) بدعة (বেদআতী) এ তিনটি গুণ থেকে কোন এক গুণে গুণান্বিত করে তবে পূর্বের ন্যায় এ স্ত্রীর উপর তালাকে বায়েন পতিত হবে। افحش। বা এ জাতীয় যেমন اسوأ।اخبث। ইত্যাদি যে কোন বিশেষণ দ্বারা তালাককে বিশেষিত করলে স্ত্রীর উপর তালাকে বায়েন হওয়ার কারণ হল এ জাতীয় বিশেষণ তালাকের সাথে সংযোগ করার কারণে তালাকের ফলাফলে তার প্রভাব পড়ে তা হল সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তাই তা انت بائن এর মতো হল। আর طلاق الشيطان ও طلاق البدعة দ্বারা বায়েন পতিত হওয়ার কারণ হল তালাকে রেজয়ী যা সুন্নত মোতাবেক তালাক। সুতরাং বিদআত বা শয়তানী তালাক অবশ্যই এর বিপরীত হবে। অর্থাৎ, তালাকে বায়েন। তবে এ দলীল যথার্থ হয়নি। কেননা, হায়েজ অবস্থায়ও যদি انت طالق বলে তবে স্ত্রীর উপর তালাকে রেজঈ ই পতিত হতে হবে। যা সুন্নাত মোতাবেক হল না। এজন্য ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ (তোমার প্রতি বেদআতী তালাক) তবে নিয়ত ছাড়া বায়েন তালাক পতিত হবে না। কেননা বেদআতী তালাক কখনো বায়েন হওয়ার দ্বারা হয়। আবার কখনো হায়েজ অবস্থায় তালাক দিলে বেদআতী হয়। এজন্য বাক্যের দ্বারা বায়েন তালাক উদ্দেশ্য নেয়া তখনই সম্ভবপর হবে যখন বায়েন হওয়ার প্রতি قرينة বিদ্যমান থাকবে। আর قرينة হল নিয়ত পাওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, اَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ বা اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ বলাতে বায়েন তালাক পতিত হবে না। কেননা, তালাকের এগুণ হায়েজ অবস্থায়ও তালাক প্রদানে হয়ে থাকে। তাই সন্দেহের কারণে তালাকে বায়েন পতিত হবে না।

قوله : كَالْجَبَلِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ كَالْجَبَلِ (তুমি পাহাড়ের ন্যায় তালাক) তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তালাকে রেজয়ী পতিত হবে। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য পাহাড় যেভাবে এক তদ্রূপ তোমাকে এক তালাক দিলাম। তাই ধরণের তালাকের গুণ সম্পৃক্ত করা দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : পাহাড়ের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করা দ্বারা অতিরিক্ততা অনিবার্যভাবে সাবস্ত হবে। আর এ অতিরিক্ততা সংখ্যার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তদ্রূপ গুণগতভাবে হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গুণগত অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হবে। আর তা হল বায়েন হওয়া। তাই আমরা বলি তালাকের সাথে এমন গুণ সম্পৃক্ত করাতে তালাকে বায়েন পতিত হবে।

قوله : اَوْ اَشَدَّ الطَّلَاقِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে তুমি কঠিনতম তালাক বা হাজারের ন্যায় তালাক। বা ঘর ভর্তি তালাক, তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। اَشَدَّ الطَّلَاقِ এর ক্ষেত্রে বায়েন তালাক পতিত হওয়ার কারণ হল, স্বামী তালাককে কঠিনতম গুণের সাথে গুণান্বিত করেছে আর তালাকের মধ্যে বায়েন তালাক হল রেজঈ থেকে কঠিন যা উপেক্ষা করা যায় না। এজন্য বায়েন তালাকই পতিত হবে। আর اَنْتِ طَالِقٌ كَاَلْفٍ এর ক্ষেত্রে বায়েন তালাক পতিত হওয়ার কারণ হল الف। এর উল্লেখ কখনো শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, তদ্রূপ কখনো সংখ্যার আধিক্যের উপর উপমা পেশ করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং একথার শক্তি ও সংখ্যার সম্ভাবনা থাকায় উভয়টির নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। আর নিয়ত না থাকা অবস্থায় উভয়টি থেকে যা লঘু তাই কার্যকর হবে। আর তা হল তিন তালাক থেকে এক তালাকে বায়েন স্বল্প ও লঘু। তাই আমরা বলি নিয়ত না থাকা অবস্থায় এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে এক্ষেত্রে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা الف। সংখ্যা

বাচক শব্দ। আর সাধারণভাবে এ ধরনের ক্ষেত্রে সংখ্যার তুলনাই হয়ে থাকে। যেমন কেহ বলল اَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ مِلْأَ الْبَيْتِ তোমার প্রতি এক হাজারের মত তালাক, তবে সর্বসম্মত ভাবে তিন তালাকই পতিত হবে। আর اَلْفٍ এর দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হওয়ার কারণ হল, কোন বস্তু তার মর্যাদাগত বড়ত্ব দ্বারা ঘর ইত্যাদি পূর্ণ করে আবার কখনো তা সংখ্যার আধিক্য হওয়ার দরুন ঘর ইত্যাদি পূর্ণ করে। সুতরাং তার একথার মধ্যে গুণের বড়ত্ব ও সংখ্যার আধিক্য বিদ্যমান।

গুণের দিক বিবেচ্য করলে তালাকে বায়েনই হবে। কেননা, তা তালাকের গুণের বড়ত্ব বুঝায়। আর সংখ্যার দিক বিচেনা করলে তিন তালাকই পতিত হবে। সুতরাং যদি সংখ্যার আধিক্যের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। আর যদি নিয়ত না করে তবে উভয়টি থেকে লঘুটি তথা তালাকে বায়েন পতিত হবে।

قوله : اَوْ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের বেলায় শক্ত দৈর্ঘ্য কিংবা প্রসস্ততার গুণ উল্লেখ করে বলে اَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً - اَنْتِ طَالِقٌ عَرِيْضَةً اَوْ طَوِيْلَةً - তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

তবে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে এ ধরনের তালাক তালাকে রেজঈই হবে। কেননা, প্রশস্ততা, দৈর্ঘ্য, প্রচন্ডতা এমন গুণ যা তালাকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এসব বিশেষণ বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। তাই এ বিশেষণগুলো বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। এবং শুধু اَنْتِ طَالِقٌ বাকি থাকবে। যা দ্বারা তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

قوله : وَاِنْ لَمْ يَنْوِ ثَلَاثًا الخ : উপর উল্লিখিত সূরতগুলোর ক্ষেত্রে যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা, বায়েন তালাক দু প্রকার। ১। চূড়ান্ত, ২। সাধারণ বায়েন। সুতরাং তিন তালাকের নিয়ত করলে চূড়ান্ত বায়েন তালাক হিসেবে বিবেচ্য হবে। আর যদি নিয়ত করে না তবে এক তালাকে বায়েনই হবে।

فَصْلٌ : فِى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে

طَلَّقَ غَيْرَ الْمَوْطُوْءَةِ ثَلَاثًا وَقَعْنَ وَإِنْ فَرَّقَ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَلَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الْإِيقَاعِ قَبْلَ الْعَدَدِ لَغَا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً أو قبل وَاحِدَةٍ أو بَعْدَهَا وَاحِدَةً يَقَعُ وَاحِدَةً وفي بَعْدَ وَاحِدَةٍ أو قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أو مع وَاحِدَةٍ أو مَعَهَا ثِنْتَانِ إن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَدَخَلَتْ يَقَعُ وَاحِدَةً وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ فَثِنْتَانِ -

অনুবাদ : কেহ তার সহবাসহীন (স্ত্রী)কে তিন তালাক দিল (তখন স্ত্রীর উপর) তা পতিত হবে। আর যদি বিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করে তবে এক তালাকে বায়েন হবে, আর যদি তালাক পতিত করার পর সংখ্যা উল্লেখের পূর্বে স্ত্রী মৃত্যু বরণ করে তবে তা অনর্থক হবে। আর যদি স্বামী বলে তোমার প্রতি এক তালাক, আর এক তালাক অথবা এক তালাকের পূর্বে বা পরে এক তালাক তবে এক তালাক পতিত হবে। আর (যদি বলে তুমি এক তালাক) যার পরে এক তালাক রয়েছে অথবা যার পূর্বে এক তালাক রয়েছে, কিংবা তুমি এক তালাকের সঙ্গে এক তালাক, বা এমন একটি তালাক যার সাথে আর একটি তালাক রয়েছে তাহলে দুটি তালাক পতিত হবে। (আর যদি বলে) তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তবে তোমার প্রতি এক তালাক আর এক তালাক অতঃপর প্রবেশ করল তাহলে এক তালাক পতিত হবে। আর যদি শর্তকে বাক্যের শেষে উল্লেখ করে তবে দুই তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَصْلٌ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) পূর্বে সহবাসের পর তালাক প্রদানের বিধিবিধান উল্লেখ করেছেন। আর এখানে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদানের বিধিবিধান আলোচনা করতেছেন। কেননা, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো সহবাস করা। এজন্য সহবাসের পর তালাক হল মূল। আর সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় পারিপার্শ্বিকতার কারণে। যা মূল নয়। এজন্য গ্রন্থকার (রহ.) মূলের আলোচনা প্রথম করেছেন আর এ অনুচ্ছেদকে পরে উল্লেখ করেছেন।

قوله : طَلَّقَ غَيْرَ الْمَوْطُوْءَةِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে দেয় তবে স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হবে। হযরত উমর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের ইহাই মতামত। তালাক পতিত হওয়ার দলীল : তালাক শব্দটিকে যখন কোন সংখ্যার সাথে সংযুক্ত করা হবে তখন সংখ্যা দ্বারা তালাক পতিত হবে। বিশেষণ উল্লেখ দ্বারা নয়। কেননা, মূল যা পতিত হয় তা হল উহ্য ধাতু যেমন أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا তুমি তালাক প্রাপ্তা তিন তালাক। তাই শুধু أَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা তালাক পতিত হবে না, বরং সবটি মিলিয়ে তালাক পতিত হবে।

قوله : وَإِنْ فَرَّقَ بَانَتْ الخ : যদি স্বামী তার সহবাসহীন স্ত্রীকে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেয় তবে তার

কয়েকটি সূরত হতে পারে। যেমন (১) গুণকে পৃথক করে وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً (২) শুধু বাক্যের خبر কে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে। যেমন اَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ (৩) পূর্ণ বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে। حرف عطف সহ বা ছাড়া। যেমন : اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ اَنْتِ طَالِقٌ তবে এ অবস্থাসমূহে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, এখানে প্রত্যেক তালাকই পৃথক পৃথকভাবে পতিত হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, তার কথার শেষে এমন কোন শর্ত বিদ্যমান নেই যা প্রথম কথাকে পরিবর্তন করবে। তাই সবকটি বাক্য সতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর যেহেতু প্রথম কথা দ্বারাই স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পতিত হয়ে গেল, বিধায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাকের স্থান বাকী না থাকায় তা অনর্থক হিসাবে গণ্য হবে।

قوله : وَ لَوْ مَاتَتْ الخ : আর যদি স্বামী তার সহবাসহীন বা সহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً অথবা اَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ কিংবা اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا কিন্তু এসব ক্ষেত্রে স্বামী সংখ্যা বলার পূর্বেই স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে, তবে স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা, স্বামী তার তালাককে সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আর বিশেষণ দ্বারা তালাক পতিত হবে না, বরং সংখ্যা দ্বারা তালাক পতিত হবে।

এখন যেহেতু সংখ্যা বলার পূর্বে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে, বিধায় তালাকের পাত্র বাকী না থাকায় কোন তালাক পতিত হবে না। আর যদি সংখ্যা বলার পর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রীর উপর সংখ্যার অনুপাতে তালাক পতিত হবে।

قوله : وَ لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الخ : যদি স্বামী তার সহবাসহীন স্ত্রীকে বলে انت طالق واحدة واحدة (তুমি এক তালাক আর এক তালাক) তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, যখন প্রথম واحدة বলেছে তখনই স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় বার واحدة, পতিত হওয়ার মহল বাকী নেই বিধায় তার দ্বিতীয় واحدة টি لغو বা অনর্থক হবে।

قوله : اَوْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ الخ : এখানে গ্রন্থকার (রহ.) সহবাসহীনা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের দুটি সূরত উল্লেখ করেছেন। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ (তুমি এক তালাকের পূর্বে এক তালাক) অথবা اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ (তুমি এক তালাক যার পর এক তালাক রয়েছে) তবে দু অবস্থায় এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, প্রথম উদাহরণে কাল বাচক শব্দ قبل পূর্ববর্তী واحدة, এর বিশেষণ। অর্থাৎ, পথম এক তালাক পূর্বে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় এক তালাক পতিত হবে। আর যখন এক তালাক পতিত হয়ে গেল তাই দ্বিতীয় এক তালাক পতিত হওয়ার স্থান বাকী না থাকায় তা অনর্থক হয়ে গেল এজন্য এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

আর দ্বিতীয় উদাহরণে কালবাচক শব্দ بعد টি পরবর্তী واحدة, এর বিশেষণ। অর্থাৎ, দ্বিতীয় واحدة, দ্বারা তালাক আগে পতিত হবে আর প্রথম واحدة, দ্বারা তালাক পরে পতিত হবে। সুতরাং পূর্বের মাসআলার ন্যায় দ্বিতীয় এক তালাক পতিত হওয়াতে প্রথম তালাক পতিত হওয়ার কোন স্থান বাকী থাকল না। এজন্য আমরা বলি এক তালাকে বায়েন হবে।

قوله : وَ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ الخ : এখানে গ্রন্থকার (রহ.) মাসআলাটির কয়েকটি সূরত বর্ণনা করেছেন। যার প্রত্যেক সূরতে স্ত্রীর উপর দু তালাকে বায়েন পতিত হবে।

(১) যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ (তুমি এক তালাকের পর এক তালাক) মুসান্নিফ (রহ.) যাকে وَ فِىْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন তবে দু তালাক পতিত হবে। কেননা, এখানে কাল বাচক শব্দ بعد প্রথম واحدة, এর বিশেষণ। এজন্য এ বাক্য প্রথম তালাক তাৎক্ষণিক ও দ্বিতীয় তালাক তার পূর্বে হওয়ার দাবি করে। আর বিগত সময়ের এক তালাক বর্তমানে প্রদান হিসাবে গণ্য হয়। তাই উভয় তালাকই পতিত হবে।

(২) যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ (তুমি এমন এক তালাক যার পূর্বে এক তালাক

রয়েছে।) যাকে গ্রন্থকার (রহ.) وَ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তা হলে দুই তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, বাক্যে উল্লিখিত কালবাচক শব্দ قبل যা পরবর্তী واحدة এর বিশেষণ। তাই দ্বিতীয় তালাকটি পূর্বের সময়ের সাথেই প্রথম তালাকটি বর্তমান সময়ে পতিত হওয়ার দাবি রাখে। আর বিগত সময়ে তালাক দেয়ার অর্থ বর্তমান সময়ে তালাক দেয়া হবে। এজন্য উভয় তালাকই এক সাথে পতিত হবে।

(৪) তৃতীয় সূরতের ন্যায় তবে مع এর সাথে ضمير সংযুক্ত। যেমন اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ مَعَهَا وَاحِدَةٌ (তুমি এমন একটি তালাক যার সাথে আর একটি তালাক রয়েছে তবে দু তালাকই পতিত হবে। কেননা, উভয় সূরতে এক তালাকের সাথে অপর তালাককে مع দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই দুটি তালাক এক সাথে হওয়ায় এক সাথে পতিত হবে। তবে ঈমাম আবু ইউসুফ (রহ.) معها واحدة এর সূরতে এক তালাক পতিত হবে। কেননা, معها এর মধ্যকার ضمير তথা সর্বনাম রয়েছে। তা দ্বারা যে তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার অগ্রবর্তীতা অপরিহার্য্য। তখন দ্বিতীয় তালাকটি এমন অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে যে, প্রথম তালাক দ্বারাই সে বায়েন হয়ে গেছে। তাই এ দ্বিতীয় তালাকের কোন ক্ষেত্র বিদ্যমান না থাকাতে অনর্থক হবে।

قوله : اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ الخ : যদি সহবাসহীনা স্ত্রীকে একাধিক তালাক প্রদানে শর্তযুক্ত করা হয় এবং واو দ্বারা প্রত্যেক তালাকের উপর অপর তালাককে عطف করা হয় তবে হয়ত শর্তকে পূর্বে উল্লেখ করবে অথবা শর্তকে পরে উল্লেখ করবে। যদি শর্তকে পরে উল্লেখ করা হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে দু তালাক পতিত হবে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (তোমার উপর এক তালাক আর এক তালাক যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর।) আর যদি শর্তকে বাক্যের প্রথমাংশে উল্লেখ করে, যেমন, اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً (যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর তাহলে তুমি এক তালাক আর এক তালাক।) তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে এক তালাক পতিত হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে দু তালাক পতিত হবে। তাদের দলীল হল : واو অব্যয়টি সাধারণভাবে একত্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উভয় তালাক একত্রভাবে শর্তের সাথে যুক্ত হবে। যেমন স্পষ্টভাবে দুই তালাক বলার ক্ষেত্রে এক সাথে দুই তালাক পতিত হয়।

অনুরূপভাবে যদি শর্তকে শেষে উল্লেখ করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে দুই তালাক পতিত হবে।

তদ্রূপ এখানের মধ্যে যেহেতু শর্তের সাথে উভয় তালাক একত্র হয়ে শর্ত যুক্ত হয়েছে তাই এক সাথে দু' তালাক পতিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : واو দ্বারা পূর্বাপর দুটি জিনিসকে যেভাবে একত্রীকরণের অর্থ পাওয়া যায় তদ্রূপ ধারাবাহিকতারও সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং সংযুক্ততার সম্ভাবনার যেভাবে দু তালাকের সম্ভাবনা রাখে তদ্রূপ ধারাবাহিকতার সম্ভাবনায় এক তালাকের সম্ভাবনাও রাখে।

স্বামী স্পষ্ট শর্তহীন ভাষায় তালাক প্রদান করে তবে এক তালাকই প্রদান করা হয়। যেমন : اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَاحِدَةً (তুমি এক তালাক এক তালাক) তাই এ থেকে বুঝা যায় যে, আলোচ্য মাসআলায় একের অধিক তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে। আর সন্দেহের অবস্থায় এক তালাকই পতিত হয় বিধায় এ মাসআলায় এক তালাকই পতিত হবে।

بَابُ الْكِنَايَاتِ

পরিচ্ছেদ : ইঙ্গিত সূচক তালাক

لَا تُطَلَّقُ بِهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ أَو دَلَالَةِ الْحَالِ فَتُطَلَّقُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فِي اِعْتَدِّي وَاسْتَبْرِي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ وَفِي غَيْرِهَا بَائِنَةٌ وَ اِنْ نَوٰى ثِنْتَيْنِ وَ تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلٰثِ وَهِيَ بَائِنٌ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ حَرَامٌ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ اَلْحَقِي بِاَهْلِكِ وَهَبْتُكِ لِاَهْلِكِ سَرَّحْتُكِ فَارَقْتُكِ اَمْرُكِ بِيَدِكِ اخْتَارِي اَنْتِ حُرَّةٌ تَقَنَّعِي تَخَمَّرِي اسْتَتِرِي اُغْرُبِي اُخْرُجِي اذْهَبِي قُومِي ابْتَغِي الْاَزْوَاجَ -

অনুবাদ : ইঙ্গিতবাচক তালাক নিয়ত বা অবস্থাগত ইঙ্গিত ছাড়া পতিত হয় না। সুতরাং তুমি গণণা কর তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত করো, তুমি এক, বলা দ্বারা এক তালাকে রেজঈ পতিত হয়। এ শব্দগুলো ছাড়া ইঙ্গিত বাচক অন্য শব্দের ক্ষেত্রে তালাকে বায়েন পতিত হবে, যদিও দুই তালাকের নিয়ত করে। আর তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। আর ইঙ্গিত বাচক অন্য শব্দসমূহ হল : بائن বিচ্ছিন্ন, بتة কর্তিত, بتلة পৃথক, حرام হারাম (নিষিদ্ধ) برية বন্ধনহীন, حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ তোমার লাগাম তোমার কাধে, الحقى باهلك তোমার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হও। وهبتك لاهلك তোমার পরিবারকে তোমাকে দিয়ে দিলাম। سَرَّحْتُكِ আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম। فَارَقْتُكِ তোমাকে পৃথক করলাম। اَمْرُكِ بِيَدِكِ তোমার বিষয় তোমার হাতে اِخْتَارِىْ তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর اَنْتِ حُرَّةٌ তুমি স্বাধীন, تقنعى মুখে নেকাব পরিধান করো تَخَمَّرِىْ মাথায় উড়না দাও استترى পর্দা করো اخرجى বের হও, اذهبى চলে যাও قومى দাড়াও اِبْتَغِى الْاَزْوَاجَ স্বামী অনুসন্ধান করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

باب الكنايات : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) তালাককে স্পষ্ট ও ইঙ্গিত সূচক এ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। স্পষ্ট তালাকের আলোচনার পর তিনি ইঙ্গিত সূচক তালাকের আলোচনায় মনোনিবেশ দিচ্ছেন।

كناية শব্দের বহুবচন كنايات - তার আভিধানিক অর্থ : যার আভিধানিক অর্থ অস্পষ্ট। পারিভাষিকভাবে كناية বলা হয় শব্দকে এমন অর্থে প্রয়োগ করা যার জন্য শব্দ ঘটিত হয়নি। তাই তার মর্ম অস্পষ্ট ও গোপন থাকে।

قوله : لَاتُطَلَّقُ بِهَا اِلَّا بِالنِّيَّةِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে ইঙ্গিত সূচক শব্দ যোগে তালাক প্রদান করে তবে স্বামীর তালাকের নিয়ত বা অবস্থাগত ইঙ্গিত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে রাগ বা অন্য কোন অবস্থায় ব্যবহৃত কেনায়া শব্দের ক্ষেত্রে অবস্থাগত ইঙ্গিত নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে। এতে যদিও স্বামীর নিয়ত পাওয়া না যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে রাগ কিংবা অন্য কোন অবস্থায় ব্যবহৃত কেনায়া শব্দের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর নিয়ত পাওয়া না গেলে তালাক পতিত হবে না।

আমাদের মতে শুধু স্বামীর নিয়তই যথেষ্ট। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে কেনায়া শব্দের ক্ষেত্রে নিয়ত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। কেনায়া শব্দের ক্ষেত্রে নিয়তের বা অবস্থাগত ইঙ্গিতের প্রয়োজনীয়তা এজন্য প্রয়োজন যে, ইঙ্গিত সূচক শব্দ মূলত তালাকের জন্য গঠিত নয়; বরং অন্য অর্থের জন্য গঠিত। তাই তা তালাকের অর্থ প্রদানের জন্য নিয়ত বা অবস্থাগত ইঙ্গিত অবশ্যই বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য।

قوله : فَتُطَلَّقُ وَاحِدَةً رِجْعِيَّةً الخ : ইঙ্গিত সূচক শব্দাবলি দ্বারা তালাক মূলত দুই প্রকার (১) এমন কিছু শব্দ যা দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য নিলে এক তালাকে রেজঈ পতিত হয়। (২) এমন কিছু শব্দ যা দ্বারা তালকা উদ্দেশ্য নিলে এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। যদি তা দ্বারা দু তালাকের নিয়ত করে। তবে হ্যাঁ যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। সুতরাং প্রথম প্রকারের মধ্যে তিনটি শব্দ রয়েছে। (১) اعتدى। তুমি গণনা কর (২) استبرى رحمك। তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত কর (৩) انت واحدة। তুমি এক। এ তিনটি শব্দের মধ্যে প্রতিটির অর্থে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে তাই নিয়ত বা অবস্থাগত ইঙ্গিত দ্বারা যে কোন একটিকে নির্ধারণ করতে হবে।

বাক্যগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

(১) اعتدى। তুমি গণনা কর : বিবাহ বিচ্ছেদের পর ইদ্দতের দিন গণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে, কিংবা আল্লাহর নিয়ামতরাজি গণনা করা উদ্দেশ্য হতে পারে। এখন যদি স্বামী নিয়ত দ্বারা প্রথম অর্থটি গ্রহণ করে থাকে তবে তাই নির্ধারিত হবে। আর ইদ্দত গণনা করা তালাকের পর হয়ে থাকে, তাই এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

(২) استبرى رحمك। তোমার গর্ভাশয় মুক্ত কর। এর দ্বারা ইদ্দতের অর্থ হতে পারে। তদ্রূপ হায়েয নেফাস ইত্যাদি থেকে তোমার গর্ভাশয়কে পবিত্র কর। তখন সুন্নাত অনুযায়ী তালাক দিবে উদ্দেশ্য হতে পারে। তাই স্বামী যদি তার নিয়ত দ্বারা প্রথমোক্ত অর্থ তথা ইদ্দত পালনের অর্থটি গ্রহণ করে থাকে তবে তাই নির্ধারিত হবে।

আর ইদ্দত পালন করা তালাকের পূর্বে কল্পনা করা যায় না বিধায় তালাকই পতিত হবে। আর পরবর্তী স্ত্রীকে রেজআতের অবকাশ থাকে বিধায় এক তালাক রেজঈ পতিত হবে।

(৩) أَنْتَ وَاحِدَةٌ তুমি এক, একথার দ্বারাও বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন : তুমি এক তালাক তখন واحدة শব্দটি উহা تطليقة এর বিশেষণ হতে পারে। যেমন, انت تطليقة واحد - অথবা স্বামী তার স্ত্রীর প্রশংসা করতে যেয়ে বলতে পারে যে, তুমি আমার এক মাত্র স্ত্রী বা তুমি অনন্য সুতরাং স্বামী যদি প্রথমোক্ত অর্থের নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করে তবে তা নির্ধারিত হবে এবং এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

মোটকথা, উপরে উল্লিখিত শব্দসমূহের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান তাই স্বামী তার নিয়ত দ্বারা তালাকের অর্থের দিকটাকে গ্রহণ করতে হবে। নিয়ত দ্বারা যদি তালাকের অর্থ নির্ধারিত হয় তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, প্রথম দুটির ক্ষেত্রে মূলভাবে انت طالق। রয়েছে। আর শেষেরটির ক্ষেত্রে উহ্য হিসেবে انت طالق। রয়েছে। সুতরাং স্বামী যদি انت طالق। প্রকাশ্যে বলত তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হত। এজন্য উহ্য অবস্থায়ও এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে انت واحدة দ্বারা তালাকের নিয়ত করলেও তালাক পতিত হবে না। কেননা সংখ্যাটি স্ত্রীর বিশেষণ, যা তালাক হওয়া দাবী করে নয়। আমাদের দলীল হল নিয়ত করলে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, সুস্থ বিবেকবান প্রতি মানুষের একথায় তালাকের অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ আছে।

قوله : وَفِى غَيْرِهَا الخ : কেনায়া শব্দাবলী দ্বারা তালাক প্রদানকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম ভাগের আলোচনা শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা করতেছেন। দ্বিতীয় প্রকার হল প্রথম প্রকারের তিন শব্দ : اعتدى - استرى رحمك - انت واحدة। ব্যতীত বাকী ইঙ্গিত সূচক শব্দের দ্বারা যদি স্ত্রীকে সম্বোধন করে এবং এক তালাকের

বা দু তালাকের নিয়ত করে তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে।

ইঙ্গিত সূচক শব্দাবলীর দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলো হল :

اَنْتِ بَائِنٌ (তুমি বিচ্ছিন্ন)। اَنْتِ بَتَّةٌ (তুমি কর্তিত)। اَنْتِ بَتْلَةٌ (তুমি কৃথক)। اَنْتِ حَرَامٌ (তুমি নিষিদ্ধ)। اِلْحَقِى। خَلِيَّةٌ (তুমি মুক্ত)। اَنْتِ بَرِيَّةٌ (তুমি বন্ধনহীন)। حَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ (তোমার লাগাম তোমার কাধে)। بِاَهْلِكِ (তোমার পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হও)। وَهَبْتُكِ لِاَهْلِكِ (তোমার পরিবারকে তোমাকে দিয়ে দিলাম)। سَرَّحْتُكِ (আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম)। فَارَقْتُكِ (তোমাকে পৃথক করলাম)। اَمْرُكِ بِيَدِكِ (তোমার বিষয় তোমার হাতে)। اِخْتَارِىْ (তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর)। اَنْتِ حُرَّةٌ (তুমি স্বাধীন)। تَقَنَّعِىْ (মুখে নেকাব পরিধান কর)। تَخَمَّرِىْ (মাথার উড়না দাও)। اِسْتَتِرِىْ (পর্দা কর)। اُخْرُجِىْ (বের হও)। اَعْزُبِىْ (দূর হও)। اِذْهَبِىْ (চলে যাও)। قُوْمِىْ (দাঁড়াও)। اِبْتَغِى الْاَزْوَاجَ (অন্য স্বামী অনুসন্ধান কর)।

উল্লিখিত শব্দসমূহের বিভিন্ন অর্থ বিদ্যমান। তাই স্বামী তার নিয়ত দ্বারা তা তালাকের জন্য নির্ধারিত করতে হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : ইঙ্গিত সূচক শব্দাবলী দ্বারা কখন-কিভাবে তা তালাকের দাবী করে বা স্বামীর নিয়ত থাকা জরুরী কিংবা কখনো নিয়ত ছাড়াও তালাক পতিত হবে, এ সবের বিস্তারিত আলোচনা যা হেদায়া গ্রন্থকার তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন আমরা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তার মর্ম সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি :

স্বামীর তালাক দানের অবস্থা তিন ধরনের হতে পারে।

(১) স্বাভাবিক খুশি ও সন্তুষ্টির অবস্থা।

(২) তালাক নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল।

(৩) অথবা রাগ ও ক্রোধের অবস্থা।

এমনিভাবে ইঙ্গিত সূচক শব্দাবলীও তিন প্রকার :

(১) যা স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার উত্তর হওয়ার যোগ্যতা রাখে আবার তা প্রত্যাখান হওয়ারও যোগ্যতা রাখে।

(২) যা স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার উত্তর হওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করার যোগ্যতা রাখে না।

(৩) এমনসব শব্দ যা উত্তর হতে পারে আবার গালমন্দও হতে পারে।

তালাক পতিত হওয়ার প্রথম অবস্থার তথা স্বামীর স্বাভাবিক খুশির অবস্থায় এ সকল শব্দাবলী দ্বারা নিয়ত ছাড়া তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্বামী আদালতে নিয়তের অস্বীকার করে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই এগুলো দ্বারা তালাক সাবেত করার জন্য নিয়ত আবশ্যকীয়।

আর তালাক পতিত হওয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় তথা তালাকের আলোচনা চলাকালে যদি ইঙ্গিত সূচক শব্দাবলীর বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার উত্তর হতে পারে এমন শব্দ স্বামী বলে থাকে, তবে স্বামী যদি দুনিয়ার বিচারে বলে যে, সে তালাকের নিয়ত করেনি তবে তার দাবী প্রত্যাখ্যাত হবে। অর্থাৎ, গ্রহণ করা হবে না।

এ ধরনের শব্দ হল আটটি। যথা : (১) اَنْتِ خَلِيَّةٌ - তুমি মুক্ত (২) اَنْتِ بَرِيَّةٌ - তুমি বন্ধনহীন। (৩) اَنْتِ بَائِنٌ - তুমি পৃথক (৪) اَنْتِ بَتَّةٌ - তুমি কর্তিত। (৫) اَنْتِ حَرَامٌ - তুমি নিষিদ্ধ (৬) اِعْتَدِّىْ - তুমি গণনা কর। (৭) اَمْرُكِ بِيَدِكِ - তোমার বিষয় তোমার হাতে। (৮) اِخْتَارِىْ - তোমার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর।

তার কারণ হল স্ত্রী যখন বাহ্যত স্বামীর নিকট তালাক দাবী করে আর স্বামী এসব শব্দাবলী থেকে কোন একটি বলে ফেলে তবে তা তালাক প্রদানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর বিচারক বাহ্যিক বিষয়ের উপর নিভৃর করেই বিচারকার্য সমাধা করেন। তাই স্বামীর তালাকের নিয়ত নেই বলা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এ দ্বিতীয় অবস্থায় যদি প্রথম প্রকার শব্দাবলী অর্থাৎ, যা স্ত্রী তালাক দাবীর উত্তরও হতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও হতে পারে।

এমন শব্দ উচ্চারণ করে স্বামী নিয়তের অস্বীকার করলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাহল সাতটি যথা :

(১) إِذْهَبِي - চলে যাও। (২) أُخْرُجِي - বের হও। (৩) قُومِي - উঠে যাও। (৪) تَقَنَّعِي - মুখে নেকাব পর। (৫) تَخَمَّرِي - মাথায় উড়না দাও। (৬) أُغْرُبِي দূর হও। (৭) إِسْتَبْرِي - পর্দা কর। এসব শব্দের ক্ষেত্রে স্বামীর নিয়তের অস্বীকার গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তা প্রত্যাখ্যান অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

আর তালাক পতিত হওয়ার তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ, রাগ বা ক্রোধের সময় সকল ইঙ্গিত সূচক শব্দের ক্ষেত্রে স্বামী বলে আমি নিয়ত করিনি, তবে তার এ কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা, এসব শব্দ তখন গালি স্বরূপ হতে পারে। তবে হা যে সকল শব্দ গালি হতে পারে না বরং শুধু তালাকের সম্ভাবনা রাখে এ সবের ক্ষেত্রে স্বামীর কথা তালাকের নিয়ত না করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। তা হল إِعْتَدِّي - إِخْتَارِي - أَمْرُكِ بِيَدِكِ - কেননা ক্রোধ অবস্থায় তা তালাকেরই প্রমাণ করে।

وَإِنْ قَالَ لَهَا اعْتَدِّي ثَلَاثًا وَنَوى بِالْأُولٰى طَلَاقًا وَبِمَا بَقِيَ حَيْضًا صُدِّقَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِمَا بَقِيَ شَيْئًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَتُطَلَّقُ بِلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ أَو لَسْتِ لَكِ بِزَوْجٍ أَن نَوى طَلَاقًا وَالصَّرِيحُ يَلْحَقُ الصَّرِيحَ وَالْبَائِنَ وَالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَّرِيحَ لَا الْبَائِنَ إِلَّا إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِأَنْ قَالَ لَها إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ بَائِنٌ -

---

অনুবাদ : আর যদি স্বামী তিনবার বলে তুমি গণনা কর আর প্রথমটি দ্বারা ইচ্ছা করে তালাক আর বাকীগুলো দ্বারা হায়েজ, তবে তার কথা সত্যায়ন করা হবে। আর যদি বাকীগুলো দ্বারা কোন নিয়ত করে না তবে তিন তালাক পতিত হবে। আর স্বামী যদি তালাকের নিয়ত করে বলে তুমি আমার স্ত্রী নয় কিংবা আমি তোমার স্বামী নয় তাহলে তালাক পতিত হবে। স্পষ্ট তালাক স্পষ্ট তালাকের সাথে এবং বায়েন তালাকের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর তালাকে বায়েন তালাকে সরীহ এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে তবে তালাকে বায়েনের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। তবে তা যদি শর্তযুক্ত হয়। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলে যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি বায়েন অতঃপর শর্ত ছাড়া বলে তুমি বায়েন (এক্ষেত্রে তালাকে বায়েন তালাকে বায়েনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَوْ قَالَ إِعْتَدِّي الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে إِعْتَدِّي (তুমি গণনা কর) إِعْتَدِّي তুমি গণনা কর, إِعْتَدِّي তুমি গণনা কর। অর্থাৎ, তিনবার إِعْتَدِّي বলে আর প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করে আর বাকী দুটি দ্বারা হায়েয গণনা করার কথা বুঝায় ইদ্দত হিসাবে তবে আদালতের বিচারে তার কথা গ্রহণ করা হবে। ইহা আয়িম্মায়ে আরবা'আর মতামত।

স্বামীর উভয় কথা গ্রহণ করার দলীল হল : সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছে। আর প্রথম শব্দটির সম্ভাব্য অর্থ থেকে এক অর্থ গ্রহণ করেছে। এজন্য উভয় নিয়তই আদালতের বিচারে গ্রহণীয় হবে। তাছাড়া স্বামী স্বাধারণত তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ করে থাকে যেমনটি আলোচিত মাসআলায় স্বামী দ্বিতীয় ও তৃতীয় اعتدّى দ্বারা করেছে। তাই বাহ্যিক অবস্থাও তার কথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে এজন্য স্বামীর উভয় কথা গ্রহণ করা হবে।

আর যদি স্বামী বলে যে, সে এ তিন শব্দ বলার দ্বারা কোন নিয়ত করেনি। তবে কোন কিছু পতিত হবে না। কেননা, এখানে কোন বাহ্যিক অবস্থা বিদ্যমান নেই যা তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আর যদি প্রথম শব্দ

দ্বারা তালাকের নিয়ত করে কিন্তু পরবর্তী শব্দদ্বয় দ্বারা কোন কিছুর নিয়ত করে না তবে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা, প্রথমটি দ্বারা তালাকের নিয়ত করায় তালাকের ন্যায় হয়ে গেল তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দ অবস্তার প্রমাণ্য দ্বারা তালাকের জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আর যদি তৃতীয় শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়ত করে কিন্তু প্রথম দুটি দ্বারা কোন কিছুর নিয়ত না কুরে থাকে তবে তার প্রথম কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, প্রথম দু'টি বলার সময় তালাকের নিয়ত বিদ্যমান নেই আবার এমন অবস্থার ও বিদ্যমান নেই যা তালাক সাবেত করে। তাই তার প্রথম ও দ্বিতীয়টি অনর্থক হবে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এ মাসআলার সম্ভাব্য কয়েক সূরত বর্ণনা করেছেন নিম্নে তা চক আকারে প্রদত্ব হল।

ক্রমিক	১ম اعتدى দ্বারা নিয়ত	২য় اعتدى দ্বারা নিয়ত	৩য় اعتدى দ্বারা নিয়ত	তার হুকুম
১	তালাক	তালাক	তালাক	তিন তালাক
২	তালাক	—	—	"
৩	ইদ্দত হিসাবে হায়েজ	—	—	"
৪	তালাক	তালাক	—	"
৫	তালাক	—	তালাক	"
৬	ইদ্দত হিসাবে হায়েজ	তালাক	তালাক	"
৭		তালাক	—	দুই তালাক
৮	তালাক	ইদ্দত হিসাবে হায়েজ	—	"
৯	তালাক	তালাক	হায়েজ	"
১০		তালাক	তালাক	"
১১	হায়েজ	হায়েজ	—	"
১২	হায়েজ	—	হায়েজ	"
১৩	তালাক	তালাক	হায়েজ	"
১৪	তালাক	হায়েজ	তালাক	"
১৫	হায়েজ	হায়েজ	তালাক	"
১৬	হায়েজ	তালাক	হায়েজ	"
১৭	—	হায়েজ	—	"
১৮	হায়েজ	হায়েজ	হায়েজ	এক তালাক
১৯	—	—	তালাক	"
২০	—	—	হায়েজ	"
২১	—	তালাক	হায়েজ	"
২২	তালাক	হায়েজ	হায়েজ	"
২৩	—	হায়েজ	হায়েজ	"
২৪	—	—	—	কোন তালাক নয়

بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ

পরিচ্ছেদ : তালাকের ক্ষমতা প্রদান

وَلَوْ قال لها اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاقَ فَاخْتَارَتْ فِي مَجْلِسِهَا بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ولم تَصِحُ فيه نِيَّةُ الثَّلَاثِ فَإِنْ قَامَتْ أو اَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ بَطَلَ خِيَارُهَا وَذِكْرُ النَّفْسِ أَوِ الْاِخْتِيَارَةِ فِي اَحَدِ كَلَامَيْهِمَا شَرْطٌ وَلَوْ قال لها اِخْتَارِي فقالت أنا اَخْتَارُ نَفْسِي أو اخْتَرْتُ نَفْسِي تُطَلَّقُ وَلَوْ قال لها اخْتَارِي اخْتَارِي اِخْتَارِي فقالت اخْتَرْتُ الْأُولَى أو الْوُسْطَى أو الْاَخِيرَةَ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَوْ قالت طَلَّقْتُ نَفْسِي أو اخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِي تَطْلِيقَةٍ أو اخْتَارِي تَطْلِيقَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا طُلِّقَتْ رَجْعِيَّةً -

অনুবাদ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তুমি তোমার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর। এর দ্বারা স্বামী তালাকের নিয়ত করে। অতঃপর এ স্ত্রী বৈঠকে তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর তিন তালাকের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি স্ত্রী দাড়িয়ে যায় অথবা অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। (এক্ষেত্রে) স্বামী স্ত্রী থেকে যে কোন এক জনের কথার মধ্যে نفس (নিজেকে) অথবা (তার স্থলাভিষিক্ত কোন শব্দ) اختيارة (ইচ্ছাধিকার) এর উল্লেখ থাকা শর্ত।

আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর, স্ত্রী বলে আমি নিজেকে গ্রহণ করছি অথবা নিজেকে গ্রহণ করলাম। তবে তালাক পতিত হবে। (অর্থাৎ, এক তালাকে বায়েন পতিত হবে) আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, অতঃপর স্ত্রী বলে প্রথমটি অথবা মধ্যবর্তীটি কিংবা শেষটি অথবা এক বার গ্রহণ করলাম তবে নিয়ত ছাড়াই তিন তালাক পতিত হবে।

আর যদি (স্বামীর উপরোক্ত কথার প্রেক্ষিতে) স্ত্রী বলে, নিজেকে তালাক দিলাম কিংবা একটি তালাকের মাধ্যমে নিজেকে গ্রহণ করলাম তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। (আর যদি স্বামী বলে) এক তালাকের ব্যাপারে তোমার বিষয় তোমার হাতে কিংবা একটি তালাকের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর। অতঃপর স্ত্রী তার নিজেকে গ্রহণ করল তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) ইতিপূর্বে তালাক প্রদানে স্বামীর নিজস্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আরোপিত করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে ভিন্ন পরিচ্ছেদে তালাককে অন্যের ক্ষমতায় অর্পণ করার ও অন্যকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে আলোকপাত করছেন।

অন্যকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা বিষয়টি যদিও কিয়াসের যুক্তিযুক্ত নয়, তথাপি তা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে প্রমাণিত। কেননা, হযরত উমর (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), হযরত আয়েশা (রাযি.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে এর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত। যেমন তাদের থেকে বর্ণিত—

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهٗ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِىْ مَجْلِسِهَا ذَالِكَ فَاِذَا قَامَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا -

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করবে তখন তার ইচ্ছাধিকার ঐ বৈঠকেই বিবেচ্য হবে। বৈঠক থেকে উঠে গেলে স্ত্রীর আর ইচ্ছাধিকার থাকবে না। সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা এবং সে অনুযায়ী তালাক পতিত করানো বৈধ।

قوله : وَلَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِىْ الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে اِخْتَارِىْ (তুমি তোমার ইচ্ছা প্রয়োগ কর) আর স্বামী তা দ্বারা তালাকের নিয়ত করে তবে স্ত্রী এ আসরে থাকা অবস্থায় নিজের উপর তালাক দিতে পারবে। তবে হা যদি স্ত্রী এ আসর থেকে উঠে যায় কিংবা অন্য কোন কাজে লেগে যায় তবে সে আর তার নিজের উপর তালাক দিতে পারবে না। কেননা, তার উঠে যাওয়া বা অন্য মনস্ক হওয়া অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে, তা হলে প্রাপ্ত ক্ষমতা বাতিল বলে গণ্য হবে। এর দলীল হল ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হওয়া ও তা মজলিশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা তা কিয়াস বহির্ভূত সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে যুক্তি এই যে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা তা এমন হল যে, একটি কজের অধিকার প্রদান করা। আর অধিকার প্রদানমূলক কার্যাদী যে মজলিসে প্রদান করা হল তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তার জবাব ঐ মজলিসেই দিতে হয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয় যে মজলিসে বিক্রয়ে বা ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয় সেই মজলিসেই তার জবাব দিতে হয়। পরিবর্তন করার পর পূর্বের নির্ধারিত মূল্য বা পণ্যতে যে কোন পরিবর্তন ঘটে গেলে কেহ কাউকে জবাবদিহীতা করতে হয় না। কেননা, মজলিসের মুহূর্তসমূহকে একই মুহূর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং স্ত্রীকে প্রদত্ত ক্ষমতা আসর বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আর আসর পরিবর্তন করে ফেললে প্রদত্ত ক্ষমতা আর বিদ্যমান থাকবে না। আর আসর পরিবর্তন দুভাবে হয়ে থাকে। (১) প্রস্থানের মাধ্যমে (২) অন্য কোন কাজে জড়িত হলে যেমন দ্বীনী আলোচনার আসর ছিল তা শেষ করে আপ্যায়ন পর্বে চলে যাওয়া।

قوله : اَنْتِ بِوَاحِدَةٍ الخ : স্বামী কর্তৃক ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হয়ে স্ত্রী যদি এ আসরেই তার উপর তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে তিন তালাকই পতিত হবে। এ ব্যাপারে হেদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, কিয়াসের দাবী হলো যে, কোন তালাক পতিত না হওয়া, যদিও স্বামী তালাকের নিয়ত করে। কেননা, স্বামী এ ধরনের শব্দ দ্বারা তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। তাই অন্যকেও তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে না। তবে ইহা আমরা তা সাহাবায়ে কেরামের ইজমার দরুন সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে বৈধতা দান করেছি। তাছাড়া বিবাহকে স্থায়ী রাখা অথবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকারী তো স্বামী। তাই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সে স্ত্রীকে তার স্থলবর্তী করতে পারবে। এজন্য এর দ্বারা প্রদত্ব তালাক বায়েন হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী তার নিজেকে তালাকের মাধ্যমে গ্রহণ করা তখনই সাব্যস্ত হবে যখন তার বিষয়ে সে একক মালিকানা অর্জন করতে। অর্থাৎ, স্বামীর মালিকানা শেষ হওয়ার পর সে নিজেই মালিক হবে। আর ইহা বায়েন তালাকের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। তবে হাঁ, স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করলেও কার্যকর হবে না। কেননা, নিজের মালিকানা গ্রহণ একাধিক ভাগে বিভক্ত হয় না। - والله اعلم

قوله : ذِكْرُ النَّفْسِ الخ : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী

যে কোন একজনের কথায় نفس (নিজেকে) অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কোন শব্দ থাকা অপরিহার্য। এজন্য স্বামী যদি বলে اختاری (তুমি গ্রহণ কর) প্রতি জবাবে স্ত্রী বলে اخترت। (আমি গ্রহণ করলাম) তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা, ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সাবিত হয়েছে। আর তাদের ইজমা এভাবে সাবিত হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীর যে কোন একজনের কথার মধ্যে نفس বা তার মতো কোন শব্দ উল্লেখ থাকবে। আর ইজমা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেভাবেই বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়ত স্বামীর উক্তি اختاری। ইহা অস্পষ্ট। তদ্রূপ স্ত্রীর কথা اخترت। তাও অস্পষ্ট। সুতরাং উভয়টি অস্পষ্ট হওয়াতে একটি অপরটির জন্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। এ জন্য তা দ্বারা তালাকের নিয়ত করা বৈধ হবে না।

قوله : وَ لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِی الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اختاری। গ্রহণ কর। অতঃপর স্ত্রী তার জবাবে বলে انا اختار نفسى। (আমি আমার নিজেকে গ্রহণ করছি) অথবা اخترت نفسى। (আমি আমার নিজেকে গ্রহণ করলাম।) তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, যদিও স্বামী তার কথার মধ্যে نفس এর উল্লেখ করেনি যার দরুন অস্পষ্টতা দেখা দিল। কিন্তু এ অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেছে স্ত্রীর উক্তির দরুন। কেননা, তার কথাতে نفس শব্দ বিদ্যমান। যা স্বামীর কথার ব্যাখ্যাস্বরূপ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তালাক প্রদানের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছাধিকার প্রদানের কারণে স্ত্রী জবাবে যদি বলে انا اختار نفسى (আমি নিজেকে গ্রহণ করছি) তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। তবে কিয়াসের দাবি হল তালাক না হওয়া। কেননা, স্ত্রী নিজ ইচ্ছা প্রয়োগের বেলায় اختار বা فعل مضارع উল্লেখ করেছে। কেননা, فعل مضارع এর মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল বিদ্যমান। এখন যদি স্ত্রী ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য নেয় তবে তা তালাক না হয়ে নিছক এক অঙ্গিকার হবে, যা দ্বারা তালাক পতিত হয় না। আর যদি বর্তমানের অর্থ গ্রহণ করে তবুও তা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রাখাতে তালাক পতিত হবে না। সুতরাং انا اختار نفسى দ্বারা তালাক পতিত না হওয়াটা কিয়াসের দাবি।

তবে আমরা তা দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার প্রমাণ পেশ করি সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আর তা হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক তার স্ত্রীদেরকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের দ্বারা। কেননা এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাযি.) এর বক্তব্য হচ্ছে—

فَاِنِّیْ اُرِیْدُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি।

হযরত আয়েশা (রাযি.) উক্ত বক্তব্য اُرِیْدُ যা فعل مضارع বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থের সম্ভাবনা রাখে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা জবাব স্বরূপ গ্রহণ করেছেন। তাই প্রতিয়মান হয় যে, فعل مضارع দ্বারাও ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করা যায়।

তাছাড়া فعل مضارع প্রকৃতভাবে বর্তমানের অর্থ প্রদান করে আর রূপকভাবে তা ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। যেমন :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

উক্ত কালিমায়ে শাহাদাতে اشهد। যদি فعل مضارع কিন্তু তা শুধু বর্তমানের অর্থ প্রদান করে। তদ্রূপ সাক্ষের ক্ষেত্রে اشهد। বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হল যে; যেহেতু فعل مضارع এর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ সম্ভব বলে বর্তমানের অর্থই উদ্দেশ্য হয় বিধায় انا اختار نفسى এর ক্ষেত্রে বর্তমানের অর্থই গ্রহণ করা হবে। আর তা দ্বারাই তালাক পতিত করা হবে।

قوله : وَ اِنْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِىْ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিন বার اختارى - اختارى - اختارى বলে আর স্ত্রী এর জবাবে বলে اخترت الاولى او الوسطى والاخيرة। আমি প্রথমটি কিংবা মধ্যবর্তীটি বা শেষটি গ্রহণ করলাম। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে একটি তালাক পতিত হবে।

স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন না থাকার কারণ হল اختار। শব্দটি বারংবার উল্লেখের দরুন তালাকের অর্থকে নির্দেশ করে। কেননা, স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ বার বার হতে পারে একমাত্র তালাকের ব্যাপারে। সুতরাং তালাকের ইঙ্গিত থাকায় স্বামীর নিয়ত না থাকলেও তালাকের অর্থে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলীল হলো : স্ত্রীর প্রথম, মধ্যবর্তী, শেষোক্ত শব্দগুলো সংখ্যা প্রকাশের জন্য কার্যকর। তারতীব বা ক্রম বিকাশের জন্য তা কার্যকর নয়। তাই যে বিষয়ে শব্দগুলো কার্যকর হবে হুকুম সে হিসেবেই প্রবর্তিত হবে। তাই স্ত্রীর উক্তি اِخْتَرْتُ। তার মূলরূপ এভাবে হবে যে, اخترت التطليقة الاولى। (আমি প্রথম তালাকটি গ্রহণ করেছি।) বিধায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথাটি দ্বারা তালাক পতিত হবে না। বরং স্ত্রীর কথার অর্থ দাড়াবে যে প্রথম শব্দটি দ্বারা অর্পিত করা হয়েছে তা আমি গ্রহণ করেছি। আর প্রথম শব্দটি দ্বারা অর্পিত হয়েছে এক তালাক। তাই স্ত্রীর উপর এক তালাকই পতিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এ শব্দগুলোর কোন অর্থ নেই। কেননা, স্বামীর উক্তি اِخْتَارِى তিন বার বলা দ্বারা স্ত্রীর মালিকানায় যে তিনটি তালাক জমা হয়েছে তার কোন ক্রম-বিকাশ নেই। অর্থাৎ, কোন তারতীব নেই। যে একটির পর দ্বিতীয়টি আর দ্বিতীয়টির পর তৃতীয়টি। তাই তা এমন হল যেমন, কোন স্থানে একত্রিত অনেক মানুষ এদের মধ্যে কোন ক্রম থাকে না। সুতরাং যেখানে ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিন্যাস নেই সে ক্ষেত্রে ক্রম বুঝায় এমন শব্দের প্রয়োগ অর্থহীন।

আলোচিত মাসআলায় যেহেতু ক্রম বা তারতীব নেই, তাই স্ত্রীর উক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শব্দসমূহ ক্রম বুঝাতে অকার্যকর হল। তাই তা সংখ্যা বুঝাতেও অকার্যকর হবে। শব্দগুলো ক্রম বিন্যাস বা সংখ্যা বুঝাতে যেহেতু অকার্যকর হল তাই তা অর্থহীন হয়ে গেল। সুতরাং বাকী থাকল স্ত্রীর উক্তি اِخْتَرْتُ আর স্বামী যখন তিনবার اختارى বলে আর স্ত্রী তার প্রতি উত্তরে اخترت। (আমি গ্রহণ করলাম) বলে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। এজন্য আমরা বলি আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়েছে।

আর যদি স্বামীর তিনবার اختارى। বলার পর স্ত্রী বলে اخترت اختيارةً। তবে সর্বসম্মতিক্রমে তিন তালাক পতিত হবে। এর দলীল হল : اختيارةً। এর মধ্যকার تاءِ تانيث একবার এর অর্থে এসেছে। সুতরাং স্ত্রী যেন বলল, اخترت نفسى مرةً। (আমি একবারেই গ্রহণ করলাম) আর এভাবে বলা দ্বারা তিন তালাকই পতিত হয়। তাছাড়া اختيار। শব্দটি তাকিদ বা দৃঢ় বুঝানোর জন্য এসেছে। আর এ তাকিদবাচক শব্দ ছাড়াও যদি স্বামীর এহেন উক্তির প্রেক্ষিতে স্ত্রী শুধু বলে اخترت। তবেও তিন তালাকই পতিত হয়। তাই তাকিদসহ বাক্য দ্বারা তিন তালাক পতিত করা তো আরো যুক্তিযুক্ত।

قوله : وَ لَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِىْ الخ : স্বামীর اختارى। তিনবার বলার পর স্ত্রী যদি তার জবাবে طَلَّقْتُ نَفْسِىْ (আমি নিজেকে তালাক দিলাম) অথবা اخترت نفسى بتطليقة। (একটি তালাকের মাধ্যমে আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম) তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, এই শব্দটি ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর বন্ধনমুক্তি সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে স্বামীর উক্তি اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِىْ تَطْلِيْقَةٍ অথবা اختارى تطليقة। বলার পর স্ত্রী বলে اخترت نفسى তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, এখানে স্ত্রীকে تطليقة শব্দের মাধ্যমে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর تطليقة শব্দ দ্বারা এক তালাকে রেজঈ পতিত হয়ে থাকে। বিধায় আলোচ্য মাসআলায়ও স্ত্রীর উপর এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে।

فَصْلٌ : فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদান প্রসঙ্গে

أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِى ثَلَاثًا فَقَالَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ وَقَعْنَ وفي طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدَةً أو اخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ في أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ وَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَ في يَوْمِهَا بَطَلَ الْأَمْرُ في ذلك الْيَوْمِ وكان أَمْرُهَا بِيَدِهَا بَعْدَ غَدٍ وفي أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا يَدْخُلُ وَإِنْ رَدَّتْ في يَوْمِهَا لم يَبْقَ في الْغَدِ وَلَوْ مَكَثَتْ بَعْدَ التَّفْوِيضِ يَوْمًا وَلَمْ تَقُمْ أَوْ جَلَسَتْ عَنْهُ أو اتَّكَأَتْ عن قُعُودٍ أو عَكَسَتْ أو دَعَتْ أَبَاهَا لِلْمَشُورَةِ أو شُهُودًا لِلْإِشْهَادِ أو كانت على دَابَّةٍ فَوَقَفَتْ بَقِيَ خِيَارُهَا وَإِنْ سَارَتْ لَا وَالْفُلْكُ كَالْبَيْتِ -

অনুবাদ : (স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে) 'তোমার বিষয় তোমার হাতে' এতে স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে। অতঃপর স্ত্রী বলে আমি নিজেকে একবারে গ্রহণ করলাম। (তবে) তিন তালাক পতিত হবে। (আর যদি স্ত্রী বলে) আমি নিজেকে এক তালাক দিলাম অথবা আমি নিজেকে এক তালাক দ্বারা গ্রহণ করলাম। (তবে) এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। (আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে) আজ ও আগামী পরশু তোমার বিষয় তোমার হাতে তবে (মধ্যবর্তী) রাত্রিটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর স্ত্রী যদি আজকের দিনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে শুধু আজকের দিনের ক্ষমতা বাতিল হবে। আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে থেকে যাবে। (আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে) আজ এবং আগামীকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে তবে রাত অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর স্ত্রী যদি আজই তা প্রত্যাখ্যান করে তবে আগামীকাল তার হাতে বিষয়টি অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি (স্বামী কর্তৃক ইচ্ছাধিকার) অর্পণের পর একদিন অবস্থান করে এবং দাড়ায় না। (অর্থাৎ, অন্য কাজে লিপ্ত হয় না।) অথবা দাড়ানো থেকে বসে পড়ে কিংবা বসা থেকে হেলান দেয় অথবা এর বিপরীত করে (অর্থাৎ, হেলান থেকে বসে পড়ে) কিংবা পরামর্শের জন্য পিতাকে অথবা সাক্ষের জন্য সাক্ষীকে আহ্বান করে। কিংবা সে আরোহী ছিল অতঃপর থেমে যায়, তবে (এসব অবস্থায়) তার ইচ্ছাধিকার বাকী থাকবে। আর যদি (আবার) চলতে শুরু করে তবে ইচ্ছাধিকার থাকবে না। আর নৌকা ঘরের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : أَمْرُكِ بِيَدِكِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে امرك بيدك (তোমার বিষয় তোমার হাতে) আর এর দ্বারা স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে এর প্রতিউক্তিরে স্ত্রী বলে اَخْتَرْتُ نَفْسِى بِوَاحِدَةٍ (আমি নিজেকে একবারে গ্রহণ করলাম) তাহলে তিন তালাক পতিত হবে। কেননা, স্ত্রীর উক্তির মধ্যকার واحدة শব্দটি উহ্য اختيارة এর ব্যাখ্যা সরূপ। আর اِخْتِيَارَةً শব্দটি তালাকের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ নয়।

তাই স্ত্রীর বক্তব্য মূলত এরূপ হবে যে— اِخْتَرْتُ نَفْسِى بِاخْتِيَارَةٍ وَاحِدَةٍ - (আমি নিজেকে এক বারেই গ্রহণ করলাম।) আর এ ধরনের বাক্য ব্যবহারে তিন তালাকই পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। তাই স্ত্রীর এ উক্তি দ্বারা তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী امرك بيدك দ্বারা স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের পর স্ত্রী তার জবাবে اِخْتَرْتُ نَفْسِى بِتَطْلِيْقَةٍ বা طَلَّقْتُ نَفْسِى وَاحِدَةً বলে তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, ক্ষমতা প্রদানের শব্দ اَمْرُكِ بِيَدِكِ ইহা কেনায়া শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত, আর কেনায়া শব্দাবলী দ্বারা বায়েন তালাকই পতিত হয়। তাই স্বামী স্ত্রীকে যেন বায়েন তালাক পতিত করার ক্ষমতা প্রদান করল আর স্ত্রী তার জবাবে, তা গ্রহণ করল। অর্থাৎ, স্ত্রীর বক্তব্য স্বামীর কথার প্রেক্ষিতেই হয়েছে। এজন্য ক্ষমতা প্রদান যেভাবে তালাকে বায়েন হওয়া ধর্তব্য তেমনি তালাক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই বিশেষণটি ধর্তব্য হবে।

قوله : وَلَا يَدْخُلُ اللَّيْلَ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ (তোমার বিষয় আজ ও আগামী পরশু তোমার হাতে) তবে আজকের পর আগত রাত্রিটি তার ইচ্ছাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এজন্য স্ত্রী যদি রাতে তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর যদি সে আজকের দিনের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে তবে আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে বহাল থাকবে। কেননা, স্বামীর এ বক্তব্য দ্বারা স্ত্রীর দুদিনের ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ, আজ এবং আগামী পরশু এ দুদিনের মধ্যবর্তী আগামী কালপূর্ণরূপে পৃথক থেকে গেল যা তার ইচ্ছাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি এই একই কারণে মধ্যবর্তী রাতটিও তার ইচ্ছাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পৃথক দুদিনের ইচ্ছাধিকার দেয়া হয়েছে যার কারণে স্ত্রী আজকে তা প্রত্যাখ্যান করলেও আগামী পরশুর ক্ষমতা তার হাতে থেকে যায়।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন যদি সে আজ তার প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকার প্রত্যাখ্যান করে তবে আগামী পরশুর ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, আজ ও আগামী পরশু উভয়টি এক ও অভিন্ন, যেমন কেহ তার স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ (তুমি আজ ও আগামী পরশু তালাক) তবে আজকেই একটি তালাক পতিত হবে। এর জবাবে আমরা বলি স্ত্রীর হাতে তালাকের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টিকে তালাকের উপর কিয়াস করা সঠিক নয়। কেননা, তালাক নির্ধারিত সময় দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না, কিন্তু নিজের সম্পর্কে ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিষয়টি সময় দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এজন্য প্রথম দিনের বিষয় প্রথম দিনের সাথেই আবদ্ধ থাকবে। আর (আগামী পরশু) দ্বিতীয় দিনের বিষয় সে দিনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। উভয়টিই পৃথক পৃথক বিষয় বলে গণ্য হবে। আর স্বামীর কথা اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ بَعْدَ غَدٍ এর মর্ম হবে।

اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ اَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ غَدٍ (আজ তোমার বিষয় তোমার হাতে এবং আগামী পরশু তোমার বিষয় তোমার হাতে)।

قوله : اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ غَدًا (আজ ও আগামীকাল তোমার বিষয় তোমার হাতে) তবে তার একথা আজ ও আগামীকালের মধ্যবর্তী রাতকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এজন্য স্ত্রী যদি আজকে বা রাত্রে তা প্রত্যাখ্যান করে তবে আগামী কাল আর তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকবে না। কেননা, স্বামী কর্তৃক আজ ও আগামী কালের বর্ণনা মূলত এক ও অভিন্ন। কারণ, আজ ও আগামী কালের মধ্যে তার সমগোত্রীয় কোন পার্থক্যকারী নেই। সুতরাং স্বামীর কথা এরূপ হল যেমন اَمْرُكِ بِيَدِكِ فِىْ يَوْمَيْنِ (তোমার বিষয় তোমার হাতে দুদিনের জন্য) তাই স্বামীর ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি এক ও অভিন্ন হল। এজন্য স্ত্রী যদি আজ তার প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে বসে তবে তার জন্য আগামীকালের ইচ্ছাধিকার বাকী থাকবে না। অনুরূপ যদি আজ সে তা প্রত্যাখ্যান করে স্বামীকে গ্রহণ করে নেয় তবে আগামী কাল সে আর তা প্রয়োগ করতে পারবে না। কেননা, দুটি থেকে সে একটিকেই গ্রহণ করতে পারবে উভয়টিকে নয়।

قوله : لَوْ مَكَثَتْ بَعْدَ التَّفْوِيْضِ الخ : স্বামী স্ত্রীর নিকট তালাকের বিষয়ের ইচ্ছাধিকার প্রদান করে أَمْرُكِ بِيَدِكَ বা اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ বলার মাধ্যমে। অতঃপর স্ত্রী এ মজলিসে অবস্থা করতে থাকে। তবে অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে ইচ্ছাধিকারের মালিক থাকবে। এমনকি যদি এ অবস্থায় এক দিনও চলে যায়। তবুও তার ইচ্ছাধিকারের ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে না। কেননা, স্ত্রীর বিষয়টি তার হাতে অর্পণ কিংবা তাকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের অর্থ হল তাকে তালাকের মালিকানা প্রদান করা। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রীর অবস্থা অনুরূপ। আর এভাবে মালিকানা প্রদান মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে আর যদি স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের পর স্ত্রী দাড়ানো থেকে বসে পড়ে কিংবা বসা থেকে হেলান দেয় অথবা হেলান থেকে সুজা বসে পড়ে তবে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা, দাঁড়ানো থেকে বসে পড়া কিংবা বসা থেকে হেলান দেয়া অথবা হেলান থেকে সুজা বসে পড়ার কারণে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা, দাঁড়ানো থেকে বসা একথার প্রমান করে যে, সে এ বিষয়ের প্রতি আগ্রহী। কারণ, দাঁড়ানো থেকে বসে চিন্তা ফিকর অধিকতর সুসংহত হয়। অনুরূপবাবে বসার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা ধারণ করাও ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে না। কেননা, এতে প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন হয় না। আর প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন হয় এক কাজ থেকে অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার দ্বারা যা ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত কালীন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই হেলান থেকে বসা বা বসা থেকে হেলান দেয়াতে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না।

قوله : أَوْ دَعَتْ أَبَاهَا الخ : স্বামী কর্তৃক ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রী যদি এ বিষয়ের জন্য পরামর্শের জন্য পিতাকে ডাকে কিংবা এ বিষয়ের সাক্ষী গ্রহণ করার জন্য লোক ডাকে তবে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা, পিতার সাথে পরামর্শ করা হয় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার জন্য আর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় যাতে পরবর্তীতে স্বামী তা যেন অস্বীকার করতে না পারে। এজন্য এ দু অবস্থা স্ত্রী থেকে প্রকাশ হওয়া স্বামীর কথাকে উপেক্ষা করার দলীল হবে না।

قوله : وَ كَانَتْ عَلٰى دَابَّةٍ الخ : স্ত্রী যদি কোন বাহনে আরোহী থাকে আর এমতাবস্থায় স্বামী তাকে أَمْرُكِ بِيَدِكِ বা اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ বলে আর স্ত্রী তা শুনে সওয়ারী থামিয়ে ফেলে তবে তার ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে। আর যদি চলা অব্যাহত রাখে তবে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সওয়ারির চলা অব্যাহত রাখা বা থামানো ইহা স্ত্রীর দিকেই সম্পৃক্ত। আর বাহন থেকে নেমে পড়লে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল বলে গণ্য হবে না।

قوله : وَ الْفُلْكُ كَالْبَيْتِ الخ : নৌকা বা জাহাজ ঘরের ন্যায়। অর্থাৎ, নৌকা বা জাহাজে থাকা অবস্থায় যদি স্বামীর স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করে আর নৌকা বা জাহাজ চলতে থাকে, তবে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হবে না। কেননা, পানিতে নৌকা বা জাহাজ চলা যা স্ত্রীর দিকে সম্পৃক্ত হয় না। কারণ, সে তো থামতে সক্ষম হয় না। এজন্য তার চলা দ্বারা প্রত্যাখ্যানের দলীল হয় না।

فَصْلٌ : فِى الْمَشِيْئَةِ

পরিচ্ছেদ : ইচ্ছা প্রসঙ্গ

وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَلَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ وَقَعَتْ رَجْعِيَّةً وَإِنْ طَلَّقَتْ ثَلَاثًا وَنَوَاهُ وَقَعْنَ وَبِأَبَنْتُ نَفْسِي طُلِّقَتْ لَا بِاخْتَرْتُ وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ وَتَقَيَّدَ بِمَجْلِسِهَا إِلَّا إِذَا زَادَ مَتَى شِئْتَ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِي لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْمَجْلِسِ إِلَّا إِذَا زَادَ إِنْ شِئْتَ -

অনুবাদ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ তুমি নিজেকে তালাক দাও। আর কোন নিয়ত করে না কিংবা এক তালাকের নিয়ত করে, অতঃপর স্ত্রী তালাক দিয়ে দেয় তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী তিন তালাক দিয়ে দেয়, আর স্বামী তার নিয়তও করে তবে তা পতিত হবে। (আর যদি স্ত্রী বলে) আমি নিজেকে পৃথক করলাম। (তথা বায়েন তালাক দিলাম) তবে এক তালাক (রেজঈ) হবে।

কিন্তু (স্ত্রীর উক্তি) আমি গ্রহণ করলাম দ্বারা তালাক হবে না। স্বামী তা প্রত্যাহারের মালিক হবে না। (অর্থাৎ, ইচ্ছাধিকার প্রদানের পর স্বামী তা প্রত্যাহারের মালিক হবে না।) আর তা (ইচ্ছাধিকারটি) স্ত্রীর বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে যদি স্বামী বাড়িয়ে দেয় (متى شئت) যখন তোমার ইচ্ছা (তবে স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার বৈঠক পর্যন্ত) সীমাবদ্ধ থাকবে না।

যদি স্বামী কোন ব্যক্তিকে বলে তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও তবে তা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। তবে স্বামী বাড়িয়ে দেয় (ان شئت) যদি তুমি চাও (তবে তার কথা বৈঠক পর্যন্ত) সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) تَفْوِيْضُ طَلَاقٍ এর দুটি অনুচ্ছেদের পর তৃতীয় অনুচ্ছেদের আলোচনা আরম্ভ করতেছেন। তাই গ্রন্থকার (রহ.) فصل فى المشيئة দ্বারা স্ত্রীর চাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত তালাকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতেছেন।

قوله : لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে طلقى نفسك (তুমি নিজেকে তালাক দাও) আর তা দ্বারা স্বামীর কোন নিয়ত না থাকে কিংবা এক তালাকের নিয়ত করে অতঃপর স্ত্রী তার প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকারের প্রয়োগ হিসাবে নিজের উপর তালাক প্রদান করে তবে এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। আর যদি স্বামী তার উক্তি طلقيى نفسك দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে এবং স্ত্রী তার জবাবে নিজের উপর তিন তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রীর উপর তিন তালাকই পতিত হবে। প্রথম মাসআলায় এক তালাকে রেজঈ আর দ্বিতীয় মাসআলায় তিন তালাক পতিত হওয়ার দলীল হচ্ছে যে, স্বামীর উক্তির মধ্যে নির্দেশ বাচক ক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়ামূল নিহিত আছে। অর্থাৎ, স্বামীর উক্তি طلقى نفسك এর মর্মার্থ হচ্ছে— افعلى فعل الطلاق (তুমি তালাকের কাজ সম্পাদন কর) আর ক্রিয়া মূল হচ্ছে জিনস বা জাতীবাচক শব্দ। এদিকে সমগ্র জাতী বাচক শব্দের মধ্যে যেভাবে فرد حقيقى তথা প্রকৃত একককে অন্তর্ভুক্ত করে তদ্রূপ فرد حكمى সমগ্র জাত তথা বিধানগত একককেও অন্তর্ভুক্ত করে।

এজন্য طلقی এর মধ্যে যেভাবে এক তালাকের সম্ভাবনা রাখে তদ্রূপ সমগ্র তথা তিন তালাককে উদ্দেশ্য করা জায়েয। আর এক তালাকের ক্ষেত্রে এখানে এক তালাকে রেজঈ হওয়ার কারণ হচ্ছে স্ত্রীকে স্পষ্ট তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যা দ্বারা তালাকে রেজঈ পতিত হয়ে থাকে।

قوله : وَ بِأَبَنْتُ نَفْسِى طَلُقَتْ الخ : স্বামী কর্তৃক ইচ্ছাধিকার প্রাপ্তের পর স্ত্রী প্রতি উত্তরে ابنت نفسی। বললে তালাকে রেজঈ পতিত হবে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী বলে اخترت نفسی। তবে তালাক পতিত হবে না। ابنت نفسی। বলার দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার কারণ হচ্ছে। الابانة। শব্দটি তালাকের শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, স্বামী তালাকের নিয়তে স্ত্রীকে ابنتك। বললে কিংবা স্ত্রীর ابنت نفسی। বলার পর স্বামী তার অনুমোদন দিয়ে দিলে স্ত্রীর উপর বায়েন তালাক পতিত হয়। সুতরাং এখানেও স্বামীর طلقی نفسك কথা দ্বারা ইচ্ছাধিকার প্রদানের পর স্ত্রী ابنت نفسی। বলা দ্বারা মূল তালাক পতিত হবে। তবে হ্যাঁ স্ত্রীর অতিরিক্ত বিশেষণটি তথা বায়েন হওয়াটা বাতিল বলে গণ্য হবে।

আর যদি স্বামীর উক্তি طلقی نفسك (তুমি নিজেকে তালাক দাও) বলার পর স্ত্রী اخترت نفسی। (আমি নিজেকে গ্রহণ করলাম) বলে তবে স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা, الاختيار। (ইচ্ছাধিকার) ইহা তালাকের শব্দ নয়। এজন্য স্বামী তালাকের নিয়তে স্ত্রীকে اخترتك। বা اختاری। বলাতে কিংবা স্ত্রীর اخترت نفسی। এর জবাবে اجزت। বলাতে কোন তালাক পতিত হয় না। সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমার ভিত্তিতে اختيار। শব্দ দ্বারা তখনই তালাক পতিত হবে যখন তা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার প্রদানের পর স্ত্রীর পক্ষ থেকে জবাব স্বরূপ হয়। অর্থাৎ, স্বামী যখন বলবে اختاری এর জবাবে স্ত্রী যদি বলে اخترت نفسی। তবে তালাক পতিত হবে।

পক্ষান্তরে এখানে স্বামীর উক্তি طلقی نفسك (তুমি নিজেকে তালাক দাও) ইহা ইচ্ছাধিকার প্রদান নয়। এজন্য স্ত্রীর উক্তি اخترت نفسی। ইহা স্বামীর কথার মোতাবেক না হওয়াতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

قوله : وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعُ الخ : স্বামী তার স্ত্রীকে طَلِّقِى نَفْسَكِ দ্বারা তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্ত্রীকে দিয়ে দিলে আর সে তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। কেননা, স্বামীর বক্তব্যে শর্তারোপের কথা বিদ্যমান রয়েছে এভাবে যে, এখানে তালাককে স্ত্রী কর্তৃক প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর শর্তারোপের বিষয়টি বাধ্যতামূলক কর্ম হওয়ার দরুন স্বামী তার কথাকে প্রত্যাহার করতে পারবে না।

আর স্ত্রীর জন্য ক্ষমতা তথা নিজেকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই স্ত্রী যদি বৈঠক থেকে উঠে যায় তবে তার আর ক্ষমতা বাকী থাকবে না। কেননা, স্বামী طلقی نفسك দ্বারা স্ত্রীকে তালাকের মালিক বানিয়েছে। আর এভাবে মালিক বানানো মজলিস (বৈঠক) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। তবে হ্যাঁ, যদি স্বামী তার কথা তথা طلقی نفسك এর সাথে متی شئت (যখন ইচ্ছা কর) বাড়িয়ে দেয় তবে স্ত্রীর জন্য ঐ মজলিস পর্যন্ত তালাক প্রদানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং মজলিস বা বৈঠক শেষ হয়ে গেলেও স্ত্রী তার ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেননা, متی (যখন) শব্দটি কোন সময়কে নির্দিষ্ট করে না, বরং সকল সময়ের জন্য ব্যাপক। সুতরাং স্বামীর কথা طلقی نفسك متی شئت (তুমি নিজেকে যখন ইচ্ছা তালাক দাও) এর মর্ম হবে طلقی نفسك فی ای وقت তাই স্ত্রীর ইচ্ছা ঐ বৈঠক বা তা শেষ হওয়ার পরও বিদ্যমান থাকবে।)

قوله : وَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ الخ : যদি স্বামী কোন ব্যক্তিকে বলে طَلِّقْ إِمْرَأَتِى (তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও) তাহলে তা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। অর্থাৎ, সে এ ব্যক্তির স্ত্রীকে বৈঠকে কিংবা বৈঠকের বাইরে তালাক দিতে পারবে। আর স্বামী তার একথা প্রত্যাহারও করতে পারে। কেননা, তার উক্তি طلق امرأتی এর মাধ্যমে সে অন্যকে উকিল নিযুক্ত করেছে এবং তালাক প্রদান করতে তার সহযোগিতা কামনা করছে। তাই তা বাধ্যতামূলকভাবে শুধু উকিলের জন্য নির্ধারিত হল না। আর তা বাধ্যতামূলক না হওয়াতে বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হল না। এ কারণেই তালাক প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিলের ইচ্ছাধিকার মজলিস ও তার পরেও বহাল থাকবে।

তবে যদি স্বামী طلق امرأتي ان شئت এর সাথে ان شئت (যদি তুমি ইচ্ছা কর) বাড়িয়ে দেয় তবে নিযুক্ত উকিল শুধু ঐ বৈঠকে তালাক দিতে পারবে। অর্থাৎ, বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। বৈঠক শেষ হয়ে গেলে তার আর তালাক প্রদানের ক্ষমতা বহাল থাকবে না। আর স্বামী তার কথাও প্রত্যাহার করতে পারবে না। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে স্বামীর উভয় কথা অর্থাৎ طلق امرأتي (তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও) এবং طلق امرأتي ان شئت (তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমার স্ত্রীকে তালাক দাও) সমান। অর্থাৎ, দুনু অবস্থায়েই নিযুক্ত উকিলের ইচ্ছাধিকার বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। অনুরূপ স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করতে পারবে।

তার দলীল হল স্বামী ইচ্ছার কথা স্পষ্টভাবে বলা না বলার মত। কেননা, তালাক প্রদানের জন্য নিযুক্ত উকিল তার ইচ্ছা অনুযায়ীই তালাক প্রদান করবে। তাই উভয়টি এক জাতীয় হওয়ায় তার হুকুমত এক হবে। এজন্য طلق امرأتي এর যা হুকুম طلق امرأتي ان شئت এরও তা হুকুম হবে।

আমাদের দলীল হল : طلق امرأتي ان شئت বাক্যটি দ্বারা মালিক বানানোর অর্থ বিদ্যমান। আর এর দ্বারা এমন মালিকানা অর্জিত হয় যার মধ্যে শর্তারোপের অর্থ বিদ্যমান। সুতরাং মালিক বানানো হিসাবে এ ইচ্ছাধিকার বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তা শর্তারোপের অর্থের দিক থেকে ইহা একটি বাধ্যতামূলক কর্ম। তাই স্বামী তার কথা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে না।

কিন্তু طلق امرأتي ইহার মধ্যে শর্তারোপের অর্থ বিদ্যমান নেই, যা দ্বারা বাধ্যতামূলক কর্ম স্থির হবে। এজন্য এক্ষেত্রে তা বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে না। অনুরূপ স্বামী তার একথা থেকে প্রত্যাহার করার অধিকারী হবে।

وَلَوْ قال لها طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةً لَا فِي عَكْسِهِ وَطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَعَكْسُهُ لَا وَلَوْ اَمَرَهَا بِالْبَائِنِ أَو الرَّجْعِيِّ فَعَكَسَتْ وَقَعَ ما اَمَرَ بِهِ اَنْت طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فقالت شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فقال شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ أو قالت شِئْتُ إِنْ كَانَ كَذَا لِمَعْدُومٍ بَطَلَ وَإِنْ كان لِشَيْءٍ مَضَى طُلِّقَتْ -

---

অনুবাদ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি নিজেকে তিন তালাক দাও, অতঃপর স্ত্রী এক তালাক দিল তবে এক তালাক পতিত হবে। এর বিপরীতে তালাক পতিত হবে না। (অর্থাৎ, যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি নিজেকে এক তালাক দাও, আর স্ত্রী এর জবাবে নিজেকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তবে তালাক পতিত হবে না।) (আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে) তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার নিজেকে তিন তালাক প্রদান কর। অতঃপর স্ত্রী (তার নিজের উপর) এক তালাক প্রদান করল। অথবা এর বিপরীতে (অর্থাৎ, যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার নিজেকে এক তালাক প্রদান কর। অতঃপর স্ত্রী তার নিজের উপর তিন তালাক প্রদান করল, (তবে) কোন তালাক পতিত হবে না। যদি কেহ স্ত্রীকে তালাকে বায়েন বা রেজঈ প্রদানের নির্দেশ করে আর স্ত্রী এর বিপরীত করে তবে স্বামী যে তালাক প্রদানের নির্দেশ করেছে তাই পতিত হবে। (আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে) তুমি যদি চাও তবে তুমি তালাক, অতঃপর স্ত্রী বলে তুমি যদি চাও তবে আমিও চাই, আর স্বামী তালাকের নিয়তে বলে আমি চাই (তবে বিষয়টি বাতিল হিসাবে গণ্য হবে)।

কিংবা স্ত্রী বলে আমি চাই যদি এমন হয় (বলে) অনস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত করে তবে তা বাতিল হবে। আর যদি (স্ত্রী বলে আমি চাই) এমন হয় (বলে) অতীত কালীন কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তবে তালাক প্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لَا فِى عَكْسِهِ الخ : অর্থাৎ, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে طلقى نفسك واحدة (তুমি নিজেকে এক তালাক দাও) আর স্ত্রী তার নিজের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে কোন তালাক পতিত হবে না। ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এরও অনুরূপ অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে এক তালাক পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর অনুরূপ অভিমত।

তাদের দলীল হল : স্বামী তার স্ত্রীকে যাহার মালিক বানিয়েছে স্ত্রী তার নিজের উপর ইহা সহ অতিরিক্ত প্রয়োগ করেছে। তাই স্ত্রী যেটুকুর মালিক হল তা কার্যকর হবে। আর অতিরিক্ত সব কথা অতিরিক্তই থেকে যাবে। তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, طلقى نفسك (তুমি নিজেকে তালাক দাও) স্ত্রী তার জবাবে সে নিজের উপর তো এক তালাক দিল সাথে সাথে তার সতীনকেও তালাক দিল। তবে সে যার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে তাই তার উপর প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে তার সতীনের উপর তালাক দেয়ার ক্ষমতা অর্জিত না হওয়ায় তার উপর কোন তালাক পতিত হবে না। ঠিক তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু স্ত্রী এক তালাক প্রয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে তাই তার উপর এক তালাক পতিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : স্বামী কর্তৃক যা স্ত্রীর হাতে অর্পিত হয়নি স্ত্রী তা প্রয়োগ করেছে। কেননা, সে এক তালাক প্রদানের মালিক হল কিন্তু নিজের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করেছে। আর তিন এক এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, তিন হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা যা সম্মিলিত ও একত্র। কিন্তু এক হল একক সংখ্যা যাতে যৌগিকতা নেই। সুতরাং এক এর মধ্যে বৈপরিত্বের ভিত্তিতে ভিন্নতা রয়েছে। এজন্য আমরা বলি যে, স্ত্রী যে বিষয়ের মালিক হল সে এর বিপরীত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যা তার নিজের থেকেই সূচনা করেছে বলে ধার্য হবে।

আর স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে নিজের উপর তালাক প্রদান করার ক্ষমতা রাখে না। এজন্য তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে।

قوله : وَ طَلِّقِى نَفْسَكِ ثَلٰثًا اِنْ شِئْتِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে طَلِّقِى نَفْسَكِ ثَلٰثًا اِنْ شِئْتِ (তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে তোমার নিজের উপর তিন তালাক প্রয়োগ কর) এর জবাবে স্ত্রী তার নিজের উপর এক তালাক প্রদান করে তবে কোন তালাক পতিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর অভিমত অনুরূপ।

দলীল হল : স্বামীর উক্তি ان شئت ثلثا এর অর্থ হচ্ছে তুমি যদি চাও নিজের উপর তিন তালাক প্রদান করতে তবে তিন তালাক প্রদান কর। সুতরাং স্বামীর একথা থেকে অনুধাবন হয় যে, তালাক প্রদানের জন্য তিনের ইচ্ছাকে শর্ত করা হয়েছে। আর স্ত্রী তার নিজের উপর এক তালাক প্রদানের কারণে শর্ত পাওয়া যায়নি। তাই শর্ত বিদ্যমান না থাকার কারণে তালাক পতিত হবে না।

তদ্রূপ স্বামী যদি বলে তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার নিজের উপর এক তালাক প্রদান কর আর সে তার নিজের উপর তিন তালাক প্রদান করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রীর উপর এক তালাক পতিত হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : তিন তালাকের ইচ্ছার মধ্যে এক তালাক অন্তর্ভুক্ত। তাই শর্ত বিদ্যমান থাকার কারণে এক তালাক পতিত হবে। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : তিন একের বিপরীত। কেননা, তিন সংখ্যা সম্মিলিত যা যৌগিক। তাই তিন তালাকের ইচ্ছা এক তালাক নয়। কেননা, স্বামী কর্তৃক শর্ত ছিল, যদি স্ত্রী এক তালাক চায় তবে তা নিজের উপর পতিত করা। কিন্তু স্ত্রী এক এর বিপরীতে তিন তালাকের ইচ্ছা করেছে। সুতরাং শর্ত পাওয়া যায়নি বলে কোন তালাক পতিত হবে না।

قوله : وَ لَوْ اَمَرَهَا بِالْبَائِنِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করে আর স্ত্রী তার নিজেকে তালাকে রেজঈ প্রদান করে কিংবা স্বামী তালাকে রেজঈ গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করে আর স্ত্রী তালাকে বায়েন গ্রহণ করে তবে স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, প্রথম সুরতে তালাকে বায়েন আর দ্বিতীয় সুরতে তালাকে রেজঈ পতিত হবে। কেননা, স্বামী নিজেই স্ত্রীকে অর্পিত তালাকের বিশেষণ নির্ধারিত করে দিয়েছে। এখন স্ত্রীর প্রয়োজনীয় কাজ হল, মূল তালাক পতিত করা। তালাকের বিশেষণ নির্ধারণ করা স্ত্রীর প্রয়োজনীয় কাজ নয়। তাই স্ত্রীর কথার উল্লিখিত বিশেষণ যা স্বামীর কথায় বিদ্যমান নেই। তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্বামীর নির্ধারিত বিশেষণসহ তালাক পতিত হবে।

قوله : وَ اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شِئْتِ الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি চাও তবে তুমি তালাক স্ত্রী এর জবাবে বলে তুমি যদি চাও তবে আমিও চাই। অতঃপর স্বামী তালাকের নিয়তে বলে আমি চাইলাম তবে স্ত্রীর হাতে অর্পিত ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, স্বামী শর্তহীন চাওয়ার সাথে তালাকের নিয়ত করেছে। আর স্ত্রী শর্তহীনভাবে তালাক চায়নি। বরং শর্তযুক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ, পুনরায় স্বামীর চাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করেছে। তাই স্বামীর নির্ধারিত শর্ত না পাওয়ার দরুন তালাক পতিত হবে না। আর স্ত্রীর উক্তি شئت ان شئت (যদি তুমি চাও তাহলে আমি চাই) এর উত্তরে স্বামী তালাকের নিয়ত করেও যদি বলে شِئْتُ তবেও তালাক পতিত হবে না। কেননা, স্ত্রীর কথায় তালাকের কোন উল্লেখ নেই। যার উপর ভিত্তি করে স্বামীর চাওয়াকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। তাই কোন তালাক পতিত হবে না। যদিও স্বামী তার উক্তি شِئْتُ দ্বারা তালাকের নিয়ত করে থাকে। কেননা, অনুচ্চারিত কোন বিষয়ের নিয়ত কার্যকর হয় না। আর এখানে স্বামী স্ত্রী কারো কথায় তালাকের উল্লেখ নেই। তাই এক্ষেত্রে নিয়ত করলেও তালাক পতিত হবে না। তবে স্বামী যদি তালাকের নিয়তে বলে شئت طلاقِكِ তবে তালাক পতিত হবে। কেননা, এখানে নতুনভাবে তালাক প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। যা স্ত্রীর পূর্ব কথার অনুপাতে হয়েছে বলে ধার্য হবে না।

অনুরূপভাবে স্ত্রীর কথা যদি অমুক বিষয় হয়ে থাকে তাহলে আমি চাই অর্থাৎ এখনো ঘটেনি এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা, স্বামী শর্তহীনভাবে তালাক গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ করেছে। যা স্বামীর কথার বিপরীত হওয়াতে তালাক পতিত হবে না। আর যদি স্ত্রীর ঘটে গেছে এমন কোন বিষয়ের সাথে তালাককে সম্পৃক্ত করে তবে স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, তালাককে সংঘটিত কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ হল, তাৎক্ষণিক তালাক প্রয়োগ করা।

أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ أو مَتَى مَا شِئْتِ أو إِذَا شِئْتِ أو إِذَا ما شِئْتِ فَرَدَّتْ الْأَمْرَ لا يرتَدُّ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَلَا تُطَلَّقُ إِلَّا وَاحِدَةً وفي كُلَّمَا شِئْتِ لها أَنْ تُفرِّق الثَّلَاثَ وَلَا تَجْمَعَ لَوْ طُلِّقَتْ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَا يَقَعُ وفي حَيْثُ شِئْتِ وَأَيْنَ شِئْتِ لم تُطَلَّقْ حتى تَشَاءَ في مَجْلِسِهَا وفي كَيْفَ شِئْت يَقَعُ رَجْعِيَّةً فَإِنْ شَاءَتْ بَائِنَةً أو ثَلَاثًا وَنَوَاهُ وَقَعَ وفي كَمْ شِئْتِ أو ما شِئْت تُطَلَّقُ ما شَاءَتْ وَإِنْ رَدَّتْ ارْتَدَّ وفي طَلِّقِي من ثَلَاثٍ ما شِئْت تُطَلَّقُ ما دُونَ الثَّلَاثِ -

অনুবাদ : (আর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে) তুমি তালাক যখন তুমি চাও, কিংবা (তুমি তালাক) যখন কোন সময় তুমি চাও, অথবা (তুমি তালাক) যদি তুমি চাও, কিংবা (তুমি তালাক) যদি কোন সময় তুমি চাও। অতঃপর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যান সাব্যস্ত হবে না। আর বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। আর এক তালাক পতিত হবে। আর كلما شئت (যতবার তুমি ইচ্ছা করবে অর্থাৎ, যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যতবার তুমি ইচ্ছা করবে তুমি তালাক) এর অবস্থায় স্ত্রী পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দিতে পারবে। একত্র করতে পারবে না। (অর্থাৎ, এক সাথে তিন তালাক দিতে পারবে না) আর যদি স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পর (নিজেকে) তালাক প্রদান করে তবে তা পতিত হবে না। আর حيث شئت (যেখানেই তুমি চাইবে) ও اين شئت (যে স্থানে তুমি চাইবে) (অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যেখানেই তুমি চাইবে, কিংবা যে স্থানে তুমি চাইবে সেখানে তুমি তালাক) এর অবস্থায় স্ত্রীর বৈঠকের মধ্যে চাওয়া ব্যতিরেকে তালাক সাব্যস্ত হবে না। আর كيف شئت (যেভাবে ইচ্ছা কর) (অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রীকে বলে যেভাবে ইচ্ছা কর তুমি তালাক) এর অবস্থায় তালাকে রেজঈ পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী তালাকে বায়েন বা তিন তালাক চায় আর স্বামী তার নিয়ত করে তবে তা পতিত হবে। আর كم شئت (যে পরিমাণ তুমি চাও) বা ماشئت (যত চাও) (অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যে পরিমাণ চাও বা যত চাও তালাক) এ অবস্থায় স্ত্রী যত সংখ্যক ইচ্ছা করবে তালাক পতিত হবে। আর যদি স্ত্রী প্রত্যাখ্যান করে তাহলে প্রত্যাখ্যাত হবে। আর طلقي من ثلث ما شئت (তুমি তিন তালাক হতে যত ইচ্ছা তালাক দাও) এর সূরতে তিন তালাকের কম (যত ইচ্ছা) তালাক দিতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ اَنْتِ طَالِقٌ مَتٰى شِئْتِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ مَتٰى شِئْتِ (তুমি তালাক যখন তুমি চাও) অথবা انت طالقٌ متى ما شئتِ (তুমি তালাক যখন কোন সময় তুমি চাও) কিংবা انت طالق اذا شئتِ (তুমি তালাক যদি তুমি চাও) অথবা انت طالق اذا ما شئتِ (তুমি তালাক যদি কোন সময় তুমি চাও) অর্থাৎ, স্বামী তার ব্যবহৃত বাক্য متى বা متى ما অথবা اذا বা اذا ما ব্যবহার করে। তালাকের ইচ্ছাধিকার স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে আর স্ত্রী তার জবাবে তার হাতে অর্পিত বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। তবে তা প্রত্যাখ্যিত হবে না। বরং প্রত্যাখ্যান করার পরও সে নিজেকে এক তালাক দিতে পারবে। আর এ বিষয়টি বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং স্ত্রী যদি বৈঠক থেকে উঠে যায় বা অন্য কোন কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও সে নিজের উপর এক তালাক

পতিত করতে পারবে। এসব কথার দলীল হল : متى ও متى ما শব্দগুলো সময় বাচক। যা সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এবং সকল সময়ের ব্যাপারে ব্যাপক। সুতরাং ব্যাপক সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা তা মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না। এদিকে স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করলে ও প্রত্যাখ্যিত হবে না। কেননা, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ঐ সময়ের জন্য তালাকের মালিক বানিয়েছে যখন সে নিজেকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করবে। তাই তার তালাকের ইচ্ছা করার পূর্বে সে তালাকের মালিক হবে না। আর তালাকের মালিক না হলে তা প্রত্যাখ্যান করাটা সাবিত হবে না। আর এক্ষেত্রে স্ত্রী এক তালাকের বেশী দিতে পারে না। কেননা, متى ও متى ما যদিও সময়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা বিদ্যমান, কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক হবে না। এজন্য স্ত্রী যে কোন সময়ে তালাকের ইচ্ছা করাটা কার্যকর হলেও এক তালাকের পর দ্বিতীয়, তৃতীয় তালাক প্রদানের মালিক হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ এর মতে اذا - اذما এ সকল শব্দ متى ও متى ما এর সমান। তাই متى ও متى ما সম্বলিত বাক্যের যে হুকুম হয় তদ্রূপ اذا ও اذ ما এরও হুকুম প্রয়োগ হবে। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে اذا ও اذما যেভাবে সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ শর্তের জন্যও ব্যবহৃত হবে। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি স্ত্রীর অধিকারে ন্যাস্ত করা হয়েছে তাই সন্দেহের কারণে অধিকার বহির্ভূত হবে না।

قوله : وَ فِي كُلَّمَا شِئْتِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ (যতবার তুমি ইচ্ছা করবে ততবার তুমি তালাক) তাহলে স্ত্রী তার নিজেকে একের পর এক তথা তিন বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করতে পারবে। কেননা, كلما শব্দটি কর্মের বারংবার তা বুঝায়। এজন্য স্ত্রী একের পর এক তালাক প্রদান করতে পারবে। তবে হা এক মজলিসে তিন তালাক বা দু তালাক প্রদান করতে পারবে না। কেননা, كلما শব্দটি সংখ্যার ব্যাপকতা সাব্যস্ত করে। কিন্তু সংখ্যার সমবেত হওয়া সাব্যস্ত করে না। এজন্য এক শব্দে বা এক বৈঠকে স্ত্রী তিন তালাক প্রদানের ইখতিয়ার রাখবে না।

অনুরূপভাবে স্ত্রী যদি অন্য স্বামীর ঘর করার পর পুনরায় প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে আসে তবে পুণরায় নিজেকে তালাক প্রদানের অধিকারিণী হবে না। কেননা, শর্তযুক্ত তা শুধু বর্তমান মালিকানার দিকে প্রত্যাবর্তীত হয়। অর্থাৎ, বর্তমান স্বামীর মালিকানায় যেসব তালাক বিদ্যমান স্ত্রী শুধু সেসব তালাকের মালিক হবে। দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করে ফিরে আসলে সে তার নিজের উপর আর কোন তালাক প্রদান করতে পারবে না। কেননা, ইহা নতুনভাবে সৃষ্ট মালিকানা।

قوله : وَ فِيْ حَيْثُ شِئْتِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ (তুমি যেখানে চাইবে তুমি তালাক) কিংবা انت طالقٌ اَيْنَ شئتِ (যেস্থানে তুমি চাইবে তুমি তালাক) তবে স্ত্রী বৈঠকের ভেতর পর্যন্ত যখনই তালাকের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করবে তালাক পতিত হবে। মজলিসের পর আর তালাকের ইচ্ছাধিকার বহাল থাকবে না। কেননা, حيث (যেখানে) اين (যে স্থানে) শব্দদ্বয় স্থান বাচক আর তালাক কোন স্থানের সাথে নির্দিষ্ট হয় না। এজন্য যদি কেহ তালাককে কোন স্থানের সাথে নির্দিষ্ট করে তবে তা সর্বত্র পতিত হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ বাতিল বলে গণ্য হয়। তদ্রূপ এখানেও حيث ও اين এর উল্লেখকে বাতিল হিসাবে গণ্য করতে হবে। এবং শর্তহীন ইচ্ছাধিকার উল্লেখ বহাল থাকবে। তাই স্বামীর উক্তি انت طالق حيث شئت এর মর্ম হবে انت طالق اِنْ شئت (তুমি যদি চাও তবে তুমি তালাক)। আর انت طالق ان شئت এর ক্ষেত্রে যেভাবে বৈঠক থেকে উঠে গেলে ইচ্ছাধিকার বহাল থাকে না তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও ইচ্ছাধিকার বৈঠকের পর বহাল থাকবে না।

قوله : وَ فِيْ كَيْفَ شِئْتِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে انت طالق كيف شئت (তুমি তালাক যেভাবে তুমি ইচ্ছা কর) তবে স্ত্রীর চাওয়ার পূর্বেই এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। অতঃপর স্ত্রী যদি স্বামীর কথা অনুযায়ী এক তালাকে বায়েন বা তিন তালাক চায় আর স্বামী তার নিয়ত করে তবে, তা পতিত হবে।

অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে এক্ষেত্রে মূল তালাক স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং

চাওয়ার পূর্বেই এক তালাকে রেজঈ পতিত হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী সহবাসহীনা হয় তবে তার ইচ্ছাধিকার বাকী থাকবে না। আর যদি সহবাসকৃতা হয় তবে ঐ বৈঠকে স্ত্রী তালাকের বিশেষণ নির্ধারণ করার ইচ্ছা রাখে। অর্থাৎ, স্ত্রী চাইলে বায়েন বা রেজয়ী কিংবা তিন তালাকের ইচ্ছা করতে পারে। এবার স্ত্রী তালাকের যে কোন বিশেষণে বিশেষিত করার পর স্বামী যদি কোন কিছুর নিয়ত না করে তবে মুতাআখখিরিন ফুকাহায়ে কেরাম ইচ্ছাধিকারের উপর কিয়াস করে বলেন, স্ত্রীর ইচ্ছা করা কার্যকর হবে। আর যদি স্বামী ইচ্ছা করে তবে তার দুটি সূরত রয়েছে : (১) স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর চাওয়ার সাথে মিল হবে। (২) কিংবা মিল হবে না। যদি স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীর চাওযার সাথে মিল হয় তবে সে হিসাবেই তালাক পতিত হবে। আর যদি উভয়ের ইচ্ছা ও চাওয়ার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়, অর্থাৎ স্বামী রেজঈর ইচ্ছা করে আর স্ত্রী বায়েন চায় বা তার বিপরীত হয় তবে একটি রেজঈ তালাক পতিত হবে।

পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে স্ত্রী না চাওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। অর্থাৎ, তাদের মতে মূল তালাক স্ত্রীর চাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের দলীল হল : স্ত্রী তালাককে যে বিশেষণে চায় সে বিশেষণে তার হাতে স্বামী তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। কেননা, كيف (যেভাবে) শব্দটি সাধারণভাবে অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এজন্য মূল তালাককে তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত রাখা অপরিহার্য। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : كيف (যেভাবে) শব্দটি বিশেষণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মূল বিষয়টি জানতে চাওয়ার জন্য নয়। যেমন كيف أَصْبَحْتَ (কিভাবে তোমার সকাল হল?) অর্থাৎ, সুস্থভাবে নাকি অসুস্থভাবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, বিশেষণের ক্ষেত্রে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর বিশেষণ প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতা অর্পণ মূল বিষয়ের অস্তিত্ব দাবী করে। আর তালাক প্রয়োগ না করলে তালাকের অস্তিত্ব হয় না। এজন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রীর তালাক চাওয়ার পূর্বেই তালাক পতিত হবে। তবে হা স্বামীর নিয়তের প্রয়োজনিয়তা এজন্য যে আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রীকে তালাকের অবস্থার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর তালাকের অবস্থা كم (সংখ্যা) ও كيف (পদ্ধতির) এর ক্ষেত্রে সমানভাবে আসে। তাই নির্দিষ্ট করার জন্য নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে।

قوله : وَفِي كَمْ شِئْتِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে انت طالق كم شئت (তুমি তালাক যে পরিমাণ চাও) অথবা انت طالق ماشئت (তুমি তালাক যত চাও) তবে স্ত্রী মজলিস পর্যন্ত যত ইচ্ছা তালাক নিজের উপর প্রয়োগ করতে পারবে। যদি চায় তবে এক তালাক দুই তালাক কিংবা তিন তালাক নিজের উপর প্রয়োগ করতে পারবে।

মোটকথা, এ মাসআলায় মূল তালাক স্ত্রীর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা, كم ও ما শব্দদ্বয় সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেন স্বামীর তালাকের সংখ্যা স্ত্রীর হাতে অর্পণ করেছে। তাই স্ত্রী যত সংখ্যা ইচ্ছা নিজের উপর প্রয়োগ করতে পারে। আর স্ত্রীর এ ইচ্ছাধিকার বৈঠক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই বৈঠক সমাপনান্তে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী তার ইচ্ছাধিকার প্রত্যাখ্যান করে তবে তা প্রত্যাখ্যিত হবে। কেননা, বাক্যে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যা বারংবার তাকে কামনা করে।

قوله : وَفِيْ طَلِّقِيْ مِنْ ثَلْثٍ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে طَلِّقِيْ نَفْسَكِ مِنْ ثَلْثٍ (তুমি নিজেকে তিন তালাক থেকে যত ইচ্ছা তালাক দাও)। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রী নিজেকে এক তালাক কিংবা দু তালাক দিতে পারে, কিন্তু তিন তালাক দিতে পারবে না। তাদের দলীল হল : ما অব্যয়টি ব্যাপকতার অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট। আর من অব্যয়টি কখনো কখনো ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ -

(সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক) এ আয়াতে من অব্যয়টি ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো من অব্যয়টি আংশিকতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো এ দুটি ভিন্ন অন্য অর্থের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই স্বামীর কথার সুনির্দিষ্ট ও সম্ভাবনাময়ী অর্থ বিদ্যমান সুতরাং من অব্যয়টি

এখানে তালাকের নিজস্ব বা সমগ্র পরিমাণ ব্যাখ্যার অর্থে গ্রহণ করা হবে। তাই স্বামীর কথার অর্থ দাঁড়াবে তুমি নিজেকে যত ইচ্ছা তিন তালাক পর্যন্ত তালাক প্রদান কর। যেমন কারো উক্তি كُلْ مِنْ طَعَامِيْ مَا شِئْتَ (তুমি আমার খাবার হতে যত ইচ্ছা আহার কর) কিংবা কেহ কাউকে বলল, طَلِّقْ مِنْ نِسَائِيْ مَنْ شَائَتْ (তুমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে থেকে যে চায় তাকে তালাক প্রদান কর) উক্ত দু বাক্যের ১ম বাক্যে সম্পূর্ণ খাওয়ার অনুমতি বিদ্যমান। তদ্রূপ দ্বিতীয় বাক্য যদি সকল স্ত্রী চায় তবে তাদেরকে সে তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে। এমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায় من অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপনের জন্য আসেনি, বরং সমগ্র পরিমাণের ব্যাখ্যার জন্য এসেছে। তাই যদি স্ত্রী চায় তবে নিজেকে তিন তালাক প্রদান করতে পারবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : من শব্দটি প্রকৃতপক্ষে আংশিকতার জন্য এসেছে। আর বাক্যে ব্যবহৃত ما শব্দটি ব্যাপকতার জন্য এসেছে। আর উভয় অর্থই কার্যকর করা সম্ভব। এভাবে যে দুই এমন একটি সংখ্যা যা এক এর হিসাবে ব্যাপক। আবার তিন হিসাবে আংশিক। তাই দুই অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তিন অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, তিন তো আংশিক নয়। তবে হা এক তালাক এজন্য নেয়া যাবে যে, তা তো বাক্যের ইঙ্গিত সূচক। কেননা, যখন দুটি তালাক প্রয়োগের ইচ্ছাধিকার বিদ্যমান তাই একটি তালাক প্রয়োগ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। সুতরাং আংশিকতা ও ব্যাপকতা উভয়টির অর্থ নেয়া সম্ভবপর হওয়ায় কোনটিকেই পরিত্যাগ করা যাবে না।

بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত তালাক

إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ كَقَوْلِهِ لِمَنْكُوحَتِهِ إنْ زُرتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أو مُضَافًا إِلَيْهِ كإن نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ بَعْدَهُ فَلَوْ قال لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ زُرتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنكَحها فَزَارَتْ لم تُطَلَّقْ وَأَلْفَاظُ الشَّرْطِ إنْ وإذا وإذاما وَكُلُّ وَكَلَّمَا وَمَتَى وَمَتَى ما فَفِيهَا إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ انْتَهَتِ الْيَمِينُ إلَّا في كُلَّمَا لِاقْتِضَائِهَا عُمُومَ الْأَفْعَالِ كَاقْتِضَاءِ كُلِّ عُمُومَ الْأَسْمَاءِ فَلَوْ قال كُلَّما تزوَّجتُ امْرَأَةً يَحْنَثُ بِكُلِّ امْرَأَةٍ وَلَو بَعْدَ زَوجٍ آخَرَ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ في الْمِلْكِ طُلِّقَتْ وَانْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَإِلَّا لَا -

অনুবাদ : শর্তযুক্ততা শুধু মালিকানায় বিশুদ্ধ। যেমন, স্বামীর উক্তি তার বিবাহকৃতার জন্য ان زرت فانت طالق (যদি তুমি তোমার পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাত কর তবে তুমি তালাক।) অথবা (তালাক প্রদানকে বিবাহের দিকে সম্পৃক্ত করা বিশুদ্ধ। যেমন (কেহ বলল) যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক তাহলে বিবাহের পর তালাক পতিত হবে। আর যদি কেহ অপরিচিত মহিলাকে বলে যদি তুমি সাক্ষাত কর (তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে) তাহলে তুমি তালাক অতঃপর তাকে সে বিবাহ করল এবং স্ত্রী (পরিবার-পরিজনের সাথে) সাক্ষাত করল। তাহলে তালাক পতিত হবে না।

শর্তবাচক শব্দগুলো হলো : ان (যদি) اذا - اذما (যখন) كل (যে কোন) كلما (যখনই) متى ما - متى (যখন)। সুতরাং এসব শব্দের ক্ষেত্রে যখন শর্ত পাওয়া যাবে শপথ শেষ হয়ে যাবে। তবে كلما (যখনই) শব্দটি ব্যতিক্রম। কেননা, তা কর্মের ব্যাপকতার দাবিদার যেভাবে كل (যে কোন) শব্দটি বিশেষ্যর ব্যাপকতার দাবিদার। সুতরাং যদি কেহ বলে كُلَّما تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً (যখনই কোন মহিলা বিবাহ করব) সে তালাক তাহলে যে কোন মহিলাকে বিবাহ করলে তালাক হবে। যদিও অন্য স্বামীর ঘর করে (পুনরায়) আসে। আর অঙ্গীকারের (শর্ত উচ্চারণের) পর বৈবাহিক মালিকানার বিলুপ্তি শর্তকে বাতিল করে না। অতঃপর মালিনাকার শর্ত পাওয়া গেলে তালাক পতিত হবে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ হয়ে যাবে। নতুবা (যদি শর্তটি বৈবাহিক মালিকানার অবর্তমানে পাওয়া যায় তাহলে শর্তের উপস্থিতির কারণে) শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু (ক্ষেত্রটি না থাকার কারণে) কোন তালাক পতিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ যাবত শর্ত মুক্ত তালাকের আলোচনা করেছে। এখান থেকে শর্তযুক্ত তালাকের আলোচনা সূচনা করতেছেন। কেননা, শর্তযুক্ত তালাক শর্তহীন তালাক যা মূল এর শাখা আর বিধিবদ্ধ নিয়ম হচ্ছে যা মূল তথা শর্তহীন তালাক তা প্রথমে হয় আর শাখা তথা শর্তযুক্ত তালাক তা পরে হয়ে থাকে। তাছাড়া শর্তযুক্ত তালাকে হরফে শর্ত বিদ্যমান থাকায় তা مركب (যৌগিক) আর শর্তহীন তালাক হল مفرد (একক) আর মূলনীতি হল একক যৌগিকের অগ্রবর্তী হয়। এ জন্যই শর্তহীন তালাকের আলোচনা প্রথমে এবং শর্তযুক্ত তালাকের আলোচনা পরবর্তীতে করা হয়েছে।

قوله : اِنَّمَا يَصِحُّ فِى الْمِلْكِ كَقَوْلِهِ الخ : যদি কেহ তালাককে কোন শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজ মালিকানায় প্রয়োগ করে তবে শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে। যেমন কেহ তার স্ত্রীকে বলল اِنْ زُرْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাত কর তবে তুমি তালাক) অতঃপর স্ত্রী বাস্তবেই সাক্ষাত করে তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে তালাক প্রাপ্ত হবে। কেননা, শর্ত আরোপের সময় মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে।

قوله : اَوْ مُضَافًا اِلَيْهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তালাককে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে اِنْ نَكَحْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক), তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিবাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এধরনের কথার দ্বারা তালাক পতিত হবে না। ইমাম আহমদ (রহ.) এরও অভিমত অনুরূপ। তাদের দলীল হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রহ.) বর্ণিত হাদীস তিনি জনৈক স্ত্রীলোকের বিবাহের পয়গাম পাঠান সে মহিলার অভিভাক এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনি বলে বসেন اِنْ نَكَحْتُكِ طَالِقٌ ثَلٰثًا (যদি আমি তাকে বিবাহ করি তবে সে তিন তালাক)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, لَا طَلَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ (বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।) হযরত আলী (রাযি.) হযরত আয়েশা (রাযি.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বর্ণিত। তাই বুঝা গেল পূর্বে তালাক দিলে তা পতিত হবে না।

আমাদের দলীল হল : বক্তার বক্তব্যে শর্ত (شرط) ও পরিণতি جزاء বিদ্যমান হওয়ার শর্তে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর শর্ত সহীহ হওয়ার জন্য বর্তমানে বিবাহে থাকা শর্ত নয়। বরং তালাক পতিত হওয়ার সময় মালিকানা থাকা আবশ্যক। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু শর্ত পাওয়ার সময় বৈবাহিত মালিকানা পাওয়া সুনিশ্চিতভাবে বিদ্যমান। তাই তার পরিণতি جزاء অবশ্যই সাব্যস্ত হবে। আর শর্ত পাওয়ার আগ পর্যন্ত বক্তব্যটি সংশ্লিষ্ট হলফকারীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। তাই সে সময় তালাকের পাত্র বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নয়। বরং শর্ত সহীহ হওয়ার জন্য উচ্চারণকারীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর পেশকৃত হাদীসের জবাব হল : তাৎক্ষণিক তালাক পতিত না হওয়ার বেলায় হাদীসটি প্রযোজ্য। হাদীসে বলা হয়েছে, বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না। এতে তো সকল একমত, কিন্তু আমাদের আলোচনা হচ্ছে তালাক প্রদানকে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েয কি না? আর এ ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না।

قوله : فَلَوْ قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি কোন আজনবিয়া (অপরিচিতা) মহিলাকে বলে ان زرت فانت طالق (যদি তুমি সাক্ষাত কর তবে তুমি তালাক) অতঃপর সে উক্ত অপরিচতাকে বিবাহ করে এবং এ স্ত্রী তার পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাত করে তবে তালাক পতিত হবে না।

কেননা, উক্ত বক্তব্য উচ্চারণকারী ব্যক্তি শর্তারোপের সময় তালাকের মালিক ছিল না এবং তালাকের

মালিকানা কিংবা মালিকানার সূত্র কোনটির সাথে সে তালাকের শর্তকে সম্পৃক্ত করেনি। অথচ তালাককে তালাকের মালিকানা কিংবা মালিকানার সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা জরুরী।

قوله : وَ اَلْفَاظُ الشَّرْطِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) শর্তবাচক শব্দাবলীল বর্ণনা করতে حروف না বলে الفاظ। শব্দ প্রয়োগ করেছে। যেহেতু শর্তবাচক অধিকাংশ বিশেষ্য, তাই অধিকাংশের উপর হুকুম আবর্তিত হওয়া হিসেবে حروف না বলে الفاظ। বলেছেন। গ্রন্থকার (রহ.) মোট ৭টি শর্তবাচক শব্দ উল্লেখ করেছেন। (তন্মধ্যে) ان হল মূল আর অন্যান্য শব্দগুলো ان এর অনুগামী। শর্তবাচক শব্দগুলো হচ্ছে : ان (যদি) اذ - اذما (যখন) كل (যেকোন) كلما (যখনই) متى ما - متى (যখন) তাছাড়া আরো চারটি শব্দ রয়েছে যা হযরত ইবনে নাসীফ (রহ.) শরহুল মুফাসসাল এ বর্ণনা করেছেন। যথা : اَىٌّ - مهما - ما - من -

قوله : فَفِيْهَا اِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ الخ : كلما শব্দটি ছাড়া শর্তবাচক অন্যান্য শব্দগুলোর হুকুম হল আভিধানিকভাবে ব্যাপকতা ও পুনঃ পুনঃ হওয়ার দাবী করে না। এ জন্য একবার শর্তবাচক ক্রিয়া পাওয়া গেলেই শর্ত শেষ হয়ে যাবে। আর শর্ত ছাড়া অঙ্গিকার স্থায়ী থাকে না। তবে হা كلما শব্দটি ব্যতিক্রমতা পুনঃ পুনঃ হওয়ার দাবী করে। যেমন পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

আর যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে তখনই সে চামড়ার পরিবর্তে তাদেরকে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যাতে তারা আযাব ভোগ করে। (সূরা নিসা : ৫৬)

সুতরাং যেহেতু ক্রিয়ার ব্যাপকতা নিশ্চিতভাবে পুনঃপুনঃ হওয়ার দাবী করে এজন্য كلما শব্দটির ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যাওয়ার পরও অঙ্গীকার অব্যহত থাকে।

قوله : فَلَوْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً الخ : যদি কেহ বিবাহ শব্দের সাথে كلما শব্দ যুক্ত করে বলে كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً فَهِىَ طَالِقٌ (যখন আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করব সে তালাক) তবে এ ব্যক্তি যত বারই বিবাহ করবে ততবারই তালাক পতিত হবে। এমনকি যদি কোন মহিলা অন্য স্বামীর ঘর করে পুনর্বার তার স্ত্রী হয়ে আসে তবেও তালাক পতিত হবে। কেননা, উক্ত ব্যক্তি শর্তকে যুক্ত করেছে, বিবাহের সাথে সুতরাং যতবার বিবাহের মাধ্যমে সে তালাকের মালিক হবে ততবার তালাকও পতিত হবে। তবে হা কেহ যদি তার স্ত্রীকে كلما শব্দের মাধ্যমে শর্তারোপ করে বলে كلما دخلتِ الدار فانت طالقٌ (যখনই তুমি এ ঘরে প্রবেশ করবে তুমি তালাক) অতঃপর যদি বার বার প্রবেশ করে তবে তালাকও বার বার পতিত হতে থাকবে। এমনকি স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। এখন যদি স্ত্রী তিন তালাক প্রাপ্ত হয়ে অন্য স্বামীর ঘর করে পুনরায় পূর্বের স্বামীর স্ত্রী হয়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে তার উপর আর কোন তালাক পতিত হবে না। কেননা, স্বামী তার পূর্ববর্তী বিবাহের সূত্রে প্রাপ্ত তালাকের অধিকার পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেছে। তাই جزاء অবশিষ্ট নেই। আর جزاء অবশিষ্ট না থাকায় অঙ্গীকারও পূর্ণ হয়ে গেছে।

قوله : وَ زَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ : শর্তারোপের পরে যদি বৈবাহিক মালিকানা বিলুপ্তি হয়ে যায় তবে শর্ত বাতিল হয় না, বরং শর্ত বিদ্যমান থাকে অতঃপর শর্ত পাওয়া গেলে তার হুকুমও বলবত থাকবে। যেমন কেহ তার স্ত্রীকে বলল, ان دخلت الدار فانت طالق (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক) অতঃপর ঘরে প্রবেশের পূর্বে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়ে দিল। তাহলে স্বামীর বৈবাহিক মালিকানা শেষ হওয়াতে শর্ত বাতিল হবে না। এমনকি যদি স্বামী উক্ত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করল এবং সে ঘরে প্রবেশ করলে শর্ত পাওয়ার কারণে তার উপর جزاء (পরিণাম) আরোপিত হবে। অর্থাৎ, সে তালাক প্রাপ্তা হবে। কেননা, শর্ত ও পরিণাম বিদ্যমানতার দ্বারাই অঙ্গিকার বিদ্যমান থাকে। এজন্য শর্ত এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি বিধায় তা বহাল থাকে।

তদ্রূপ جزاء ও বিদ্যমান। কারণ, স্ত্রী লোকটিতো বিদ্যমান। তাই শর্ত ও জাযা (পরিণতি) বিদ্যমান থাকায় অঙ্গিকারও বহাল থাকবে। ইহা এমন যেমন কেহ বলল ان تزوجتكِ فانتِ طالقٌ (যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক) এরূপ উচ্চারণের মাধ্যমে শর্তারোপ করা সহীহ।

যদিও শর্তকারী এখনো তালাকের মালিক নয়। তাই প্রতিয়মান হল যে, প্রাথমিকভাবে শর্তারোপ সহীহ হওয়ার জন্য যেভাবে মালিকানা বিদ্যমান প্রয়োজন নয় তেমনি শর্ত বহাল থাকার জন্য মালিকানা প্রথম থেকে শর্ত পাওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য নয়।

قوله : فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ : স্বামী যদি তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে এবং তার সাথে পূর্বের বিবাহে থাকা অবস্থায় কৃত শর্ত এখন পাওয়া যায় তবে শর্ত পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে তালাক পতিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তালাকের অধিকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি শর্ত পাওয়া যায় তবে তালাক পতিত হবে এবং শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। তালাক পতিত হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু শর্ত তালাকের মালিকানার অধিকারের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে আর শর্ত পূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে শর্তে উল্লিখিত ان। অব্যয়টি পুনঃপুনঃ হওয়ার দাবী করে না। তাই একবার শর্ত পাওয়া গেলেই শর্ত পূর্ণ হয়েছে বলা হবে। আর যদি দ্বিতীয় বিবাহের আগেই অর্থাৎ, প্রথম স্বামীর মালিকানাহীন অবস্থায় স্ত্রী শর্ত (ঘরে প্রবেশ করে) পূর্ণ করে বসে তবে শর্ত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তালাক পতিত হবে না। তালাক পতিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে তালাকের ক্ষেত্র বিদ্যমান নেই। আর শর্ত শেষ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে শর্ত সম্পন্ন করতে স্ত্রী হতে হবে। (অর্থাৎ, তালাকের মালিক হতে হবে) এমন কোন বিধান নেই। তাই শর্ত পূর্ণ হয়েছে বলা হবে।

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ له إِلَّا إِذَا بَرْهَنَتْ وما لَا يُعْلَمُ إِلَّا منها فَالْقَوْلُ لها فِي حَقِّهَا كان حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ أو إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ فقالت حِضْتَ أو أُحِبُّكَ طُلِّقَتْ هِيَ فَقَطْ وَبِرُؤْيَةِ الدَّمِ لَا يَقَعُ فَإِنِ اسْتَمَرَّ ثَلَاثًا وَقَعَ من حِينَ رَأَتْ وفي إِنْ حِضْتِ حَيْضَةً يَقَعُ حين تَطْهُرُ وفي إِنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْثَى فَأَنْتِ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ تُطَلَّقُ وَاحِدَةً قَضَاءً وَثِنْتَيْنِ تَنَزُّهًا وَمَضَتِ الْعِدَّةُ -

---

অনুবাদ : আর যদি শর্তের অস্তিত্ব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য হয় তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি স্ত্রী সাক্ষ্য পেশ করে (তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।) অথবা তা এমন হয় যে, স্ত্রীর মাধ্যম ছাড়া জানা যায় না তাহলে তার (স্ত্রীর) নিজের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য। যেমন (স্বামী শর্তারোপ করল যে,) إنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طالقٌ وَ فُلَانَةٌ (তুমি যদি ঋতুমতী হও তবে তুমি ও অমুক তালাক) ان كنت تُحِبِّينَنِى فانتِ طالقٌ وَ فُلَانَةٌ (তুমি যদি আমাকে ভালবাস তাহলে তুমি ও অমুক তালাক) অতঃপর স্ত্রী (প্রথম কথার উত্তরে) বলল, আমি ঋতুমতি হয়েছি। অথবা (দ্বিতীয় কথার উত্তরে বলল) আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহলে সে শুধু তালাক প্রাপ্তা হবে। আর রক্ত দেখার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে না। বরং যদি তিনদিন স্থায়ী থাকে তবে তালাক পতিত

হবে যখন থেকে রক্ত দেখেছে। আর (স্বামীর উক্তি) যদি তোমার একটি হায়েজ হয় (তবে তুমি তালাক) তাহলে যখন হায়েজ থেকে পবিত্র হবে তখন তালাক পতিত হবে। আর (স্বামীর উক্তি) যদি তুমি ছেলে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি এক তালাক। আর যদি কন্যা সন্তান প্রসব কর তবে দুই তালাক। অতঃপর সে পুত্র ও কন্যা সন্তান প্রসব করল। কিন্তু কোনটি প্রথম তা জানা যায়নি তাহলে আদালতের বিচারে এক তালাক পতিত হবে। আর সন্দেহ যুক্ত হিসাবে দুই তালাক পতিত হবে এবং ইদ্দত ও অতিক্রান্ত হল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ اِنْ اِخْتَلَفَا فِى وُجُوْدِ الشَّرْطِ الخ : স্বামী স্ত্রীকে শর্তের উপর তালাক প্রদানের পর শর্ত সম্পন্ন হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে যদি স্ত্রী তার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করতে পারে তবে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে না তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামী মূল অবস্থার দাবিদার। আর তা হল শর্তের অনুপস্থিতি। সুতরাং যার বক্তব্য মূল অবস্থার স্বপক্ষে সে হলো مدعى عليه আর যার বক্তব্য অবস্থার বিপরীত হল مدعي আর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী مدعي এর নিকট সাক্ষ্য প্রমান না থাকলে مدعيه عليه এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় দলীল হল : স্বামী তালাক পতিত হওয়া এবং অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার কথা অস্বীকার করছে, আর স্ত্রী তার দাবী করছে, সুতরাং স্ত্রীর দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে অস্বীকারকারী তথা স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَلَا يَعْلَمُ اِلَّا مِنْهَا الخ : আর যদি স্বামী কর্তৃক শর্ত এমন হয় যে, এ শর্তের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেবল স্ত্রীই জ্ঞাত তবে তা সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর কথাই যোগ্য হবে কেবল তার ব্যাপারে। যেমন, স্বামী বলল, ان حِضْتِ فانتِ طالق وَ فُلَانَةٌ (যদি তুমি ঋতুমতি হও তবে তুমি ও অমুক তালাক) কিংবা ان تُحِبِّيْنِى فانت طالق وَ فُلَانَةٌ (যদি তুমি আমাকে ভালোবাস তবে তুমি ও অমুক তালাক) অতঃপর স্ত্রী দাবী করে যে, সে ঋতুমতী হয়েছে তবে সে নিজে তালাক প্রাপ্ত হবে। কিন্তু অপর স্ত্রী তথা তার সতীন তালাক প্রাপ্তা হবে না। আর যদি স্বামী তার কথা অনায়াসে স্বীকার করে নেয়, তবে উভয়ের উপর তালাক পতিত হবে। আর আমাদের আলোচিত মাসআলা হচ্ছে যদি স্বামী অস্বীকার করে তবে স্ত্রীর কথা তার নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহা হচ্ছে সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবী হচ্ছে তালাক পতিত না হওয়া এবং স্বামীর কথা যেহেতু অস্বীকারকারীর কথা তাই সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকা অবস্থায় স্বামীর কথা গ্রহণ হওয়া।

সূক্ষ্ম কিয়াসের দলীল হল : স্ত্রীলোকগণ এসব ব্যাপারে তথা হায়েজ পালন বা ইদ্দত পালন তথা তাদের জরায়ুর ব্যাপারে তারা আমানতদার ও আদিষ্ট। কেননা, পবিত্র কুরআনের বাণী لَايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ (তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য তাদের জরায়ুতে আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। (সূরা বাকারা-২২৮) সুতরাং বুঝা গেল তাদের ঋতুমতী হওয়ার সংবাদ তাদের থেকেই বলা সম্ভবপর। আর মূলনীতি হচ্ছে আমানতদারের কথা তার নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। একারণেই স্ত্রীলোকটির কথা তার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ الخ : স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, اِنْ حِضْتِ فَانْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি ঋতুমতি হও তবে তুমি তালাক) একথা বলার পর স্ত্রী হায়েজের রক্ত দেখতে পেল তবে তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত তা স্থায়ী হলে পরে তার উপর তালাক পতিত হবে। তবে হাঁ তিনদিন ও তিন রাত পর নিশ্চিত তা হায়েজ হিসাবে গণ্য হওয়ার পর অবশ্যই হায়েয শুরুর দিন থেকেই সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে। কেননা, যদি তিনদিন ও তিনরাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে আমাদের হানাফী মাযহাব মতে তা রক্তস্রাব হবে না বরং তা ইস্তিহাজা

হিসাবে গণ্য হবে। আর ইস্তিহাজা হলে স্বামীর শর্ত না পাওয়ার দরুন তার উপর তালাক পতিত হবে না। তবে হা ফুকাহায়ে কেরামগণ হায়েজের নিম্ন সীমা নিয়ে ইখতিলাফের ভিত্তিতে তিন দিন ও তিন রাতের কমেও তালাক পতিত হওয়ার দাবী করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে একদিন এক রাত রক্ত দেখলেই তালাক পতিত হবে। সকলের মতেই রক্ত দেখার সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে না, বরং তা হায়েজ হলে তার প্রথম থেকেই তালাক পতিত হবে।

قوله : وَ فِيْ اِنْ حِضْتِ حَيْضَةً الخ : স্বামী তার স্ত্রীকে বলে ان حضت حيضة فانت طالق (যদি তোমার একটি হায়েজ হয় তবে তুমি তালাক) অতঃপর স্ত্রী হায়েজ গ্রস্ত হয় তবে একটি হায়েজ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। কেননা, حيضة এর ة বর্ণ দ্বারা পূর্ণ একটি হায়েজ বুঝা যায়। আর হায়েজ শেষ হওয়ার দ্বারা পূর্ণতা হয়। আর হায়েজ শেষ হয় পবিত্র হওয়ার মাধ্যমে। তাই পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না।

قوله : وَ فِيْ اِنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে—

إِنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَأَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَأَنْتِ ثِنْتَيْنِ

(যদি তুমি ছেলে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি এক তালাক আর যদি মেয়ে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি দুই তালাক) অতঃপর স্ত্রী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করল, কিন্তু প্রথম কোনটি তা জানা হল না তবে আদালতের বিচারে এক তালাক পতিত হবে। আর সন্দেহ যুক্ত হিসাবে দুই তালাক পতিত হবে। এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। উক্ত মাসআলায় কয়েকটি সূরত রয়েছে : (১) যদি জানা যায় যে, প্রথম পুত্র সন্তান প্রসব করেছে তবে এক তালাক পতিত হবে এবং পরবর্তী কন্যা সন্তান প্রসব করতে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। (২) যদি জানা যায় যে, প্রথম কন্যা সন্তান প্রসব করেছে তবে দুই তালাক পতিত হবে। এবং পরবর্তী পুত্র সন্তান প্রসব করাতে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। (৩) যদি স্বামী স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, স্বামী বলে প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করেছে আর স্ত্রী বলে প্রথম কন্যা সন্তান প্রসব করেছে তবে এক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামী অতিরিক্ততার অস্বীকারকারী। (৪) যদি জানা যায় না যে, পুত্র না কন্যা প্রথমে প্রসব হয়েছে ' যা কিতাবে উল্লেখ, তাহলে আদালতের বিচারে এক তালাক পতিত হবে। কেননা, এক তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। আর দ্বিতীয় তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বিদ্যমান। তাই সন্দেহের কারণে আদালতের বিচারে দুই তালাক পতিত হওয়া কার্যকর হবে না। তবে দ্বীনী বিচারে দুই তালাক পতিত হবে। কেননা, যদি প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করে তবে এক তালাক পতিত হবে। আর পরবর্তী কন্যা সন্তান প্রসব দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, পুত্র সন্তান প্রসবের পর সে তালাক প্রাপ্তা হল। এমতাবস্থায় যে সে গর্ভবতী আর গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভপাত করা। তাই যখন কন্যা সন্তান প্রসব করল তখন তার ইদ্দত পরিসমাপ্ত হয়ে গেল। আর যদি প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করে তবে দুই তালাক পতিত হবে এবং পরবর্তী পুত্র সন্তান প্রসব দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী দলীলের ভিত্তিতে। মোটকথা, এক অবস্থায় এক তালাক আর আরেক অবস্থায় দুই তালাক পতিত হবে। সুতরাং এক তালাক পতিত হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। এ জন্য আদালতের বিচারে সুনিশ্চিতটি তথা এক তালাক পতিত হওয়ার ফায়সালা প্রদান করা হবে। আর দ্বীনী বিচারে সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার কারণে দুই তালাক পতিত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নেয়াই উত্তম। তবে উভয় অবস্থায় ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। والله اعلم -

وَالْمِلْكُ يُشْتَرَطُ لِآخِرِ الشَّرْطَيْنِ وَيَبْطُلُ تَنْجِيزُ الثَّلَاثِ تَعْلِيقَهُ وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ أَوِ الْعِتْقَ بِالْوَطْءِ لَمْ يَجِبِ الْعُقْرُ بِاللُّبْثِ وَلَمْ يَصِرْ بِهِ مُرَاجِعًا فِي الرَّجْعِيِّ إِلَّا إِذَا أَوْلَجَهُ ثَانِيًا وَلَا تُطَلَّقُ فِي أَنْ نَكَحْتُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ وَلَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُتَّصِلًا وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ ثِنْتَانِ وَفِي الْاِثْنَتَيْنِ وَاحِدَةٌ وَ فِي إِلَّا ثَلَاثًا ثَلَاثٌ -

---

অনুবাদ : উভয় শর্তের শেষটির জন্য স্বত্বা বিদ্যমান থাকা শর্ত। সাথে সাথে তিন তালাক প্রদান, বাতিল করে (পূর্বের) তিন তালাককে শর্ত যুক্ত করাকে। আর যদি স্বামী তিন তালাককে অথবা (বাদীর) স্বাধীনতাকে সহবাসের সাথে শর্তযুক্ত করে তবে কিছু সময় (সহবাসে) অবস্থান করাতে মহর ওয়াজিব হবে না। (উক্ত অবস্থানে) রেজঈ তালাকের ক্ষেত্রে সে রেজায়াতকারী হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় বার প্রবিষ্ট করায় তবে রেজয়াতকারী হবে। আর (স্বামীর উক্তি) যদি তোমার উপর তাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। অতঃপর তার বায়েন তালাকের ইদ্দতে (দ্বিতীয়জনকে) বিবাহ করে তাহলে (দ্বিতীয়জন) তালাক হবে না। আর (যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে) তুমি তালাক ইনশাআল্লাহ্ (উক্ত বাক্যে ইনশাআল্লাহ্) মিলিতভাবে বলে তাহলে তালাক পতিত হবে না। যদিও স্ত্রী স্বামীর উক্তি ইনশাআল্লাহ্ বলার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে। আর (যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে) তুমি তিন তালাক তবে একটি ছাড়া তবে দুই তালাক পতিত হবে। আর (যদি বলে) দুটি ছাড়া তবে এক তালাক পতিত হবে। আর (যদি বলে) তিনটি ছাড়া তবে তিন তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ الْمِلْكُ يُشْتَرَطُ الخ : যদি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দুটি শর্তের সাথে যুক্ত করে তালাক প্রদান করে। তাহলে তালাক সাব্যস্ত করার জন্য অন্তত দ্বিতীয় শর্তটি স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় হওয়া শর্ত। যেমন কেহ তার স্ত্রীকে বলল : إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍو وَ أَبَا يُوْسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلْثًا - (যদি তুমি আবু উমর ও আবু ইউসুফের সাথে কথা বল তবে তিন তালাক) অতৎপর স্বামী তাকে এক তালাক দিল। স্ত্রী বায়েন হয়ে ইদ্দত পূর্ণ করে। অতঃপর বিবাহ বিচ্ছেদ অবস্থায় সে আবু উমরের সাথে কথা বলল, তারপর স্বামী তাকে পুণরায় বিবাহ করল। এখন স্ত্রী অবস্থায় সে আবু ইউসুফের সাথে কথা বলল, তাহলে পূর্ববর্তী এক তালাকের সাথে তিন তালাক পতিত হবে।

আলোচ্য মাসআলায় কয়েকটি সূরত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা তা তুলে ধরছি। (১) উভয় শর্ত যদি স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সম্পন্ন হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তালাক পতিত হবে। কেননা, তালাকের শর্ত স্বামীর তালাকের স্বত্ব থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে।

(২) উভয় শর্ত যদি স্বামীর তালাকের স্বত্ব না থাকা অবস্থায় সম্পন্ন হয় তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা, কোন শর্তই স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তাই তালাকও পতিত হবে না। (৩) প্রথম শর্ত স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান অবস্থায় আর দ্বিতীয় শর্ত স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় হয় তবে কোন তালাক পতিত

হবে না। কেননা جزاء তথা তালাক স্বামী স্বত্ব না থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয় না। (৪) প্রথম শর্ত স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় আর দ্বিতীয় শর্ত স্বামী স্বত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সম্পন্ন হয়। তবে পূর্ববর্তী এক তালাকের সাথে তিন তালাক সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَ يَبْطُلُ تَنْجِيزُ الخ : সাথে সাথে তিন তালাক প্রদান বাতিল করে পূর্বের শর্ত যুক্ত তিন তালাককে। অর্থাৎ, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে ان دخلت الدار فانتِ طالق ثلثا (যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তিন তালাক) অতঃপর স্বামী শর্ত ছাড়া তিন তালাক দিল। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর পরবর্তী কথা দ্বারা তিন তালাক প্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালন করতঃ অন্য স্বামীর ঘরে তালাক প্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালন করে পূর্বের স্বামীর নিকট বিবাহ বসল এবং উক্ত ঘরে প্রবেশ করল তবে স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে তিন তালাক পতিত হবে। তিনি দলীল পেশ করেন। উচ্চারিত শর্ত শর্ত যুক্ত থাকায় তার جزاء (পরিণতি হল শর্ত মুক্ত তিন তালাক। তা বর্তমান স্বামীর স্বত্বের মধ্যে হতে পারে কিংবা ভবিষ্যতে স্বামী সত্বের মধ্যে হতে পারে। আর শর্তমুক্ত তিন তালাকের অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে তালাক লাভের পর পুনঃ বিবাহের সম্ভাবনার কারণে। সুতরাং শর্ত বিদ্যমান থাকার কারণে তথা স্ত্রী বিদ্যমান থাকার কারণে পরিণতি তিন তালাক পতিত হবে।

আমাদের দলীল : শর্তযুক্ত বাক্যের পরিণতি শর্ত মুক্ত তিন তালাক নয়, বরং পরিণতি হচ্ছে বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক। কেননা, পরিণতি তা-ই যা শর্তের অস্তিত্ব লাভের ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্ধারণকারী কিংবা উদ্বুদ্ধকারী। এ দুই উদ্দেশ্যের কোন একটির জন্য শর্তযুক্ত বাক্য উচ্চারিত হয়। আর এখানে ঘরে প্রবেশ থেকে নিবারণকারী বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক। পরবর্তীতে বিবাহের বলে অর্জিত তালাক নয়। আর যে স্বামীত্বের অধিকার দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা অর্জিত হয়। তার অনস্তিত্বই বর্তমানে দৃশ্যমান। সুতরাং সেটা ভয় প্রদর্শন দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব, একথা সাব্যস্ত হল যে, আলোচ্য শর্তযুক্ত বাক্যের পরিণতি হচ্ছে বর্তমান স্বামীত্বের অধিকার বলে অর্জিত তিন তালাক। আর নিঃশর্ত তিন তালাক প্রদানের মাধ্যমে সেটা হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কেননা, তিন তালাক প্রদান বিবাহের বা তালাকের ক্ষেত্র হওয়ার যোগ্যতাই বাতিল করে দেয়। সুতরাং শর্তযুক্ত বাক্যের কার্যকারিতা বিদ্যমান থাকবে না।

قوله : وَ لَوْ عَلَّقَ الثَّلٰثَ الخ : যদি স্বামী স্ত্রীর তালাককে কিংবা মুনিব তার দাসীর আজাদীকে সহবাসের উপর শর্তারোপ করে অর্থাৎ, স্বামী তার স্ত্রীকে বলে আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তুমি তিন তালাক, অথবা দাসীকে বলে আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তুমি স্বাধনিা। অতঃপর স্বামী/মনিব সহবাস করল তাহলে দুই গুপ্তাঙ্গ যখন মিলিত হবে তখনই তিন তালাক পতিত হবে। আজাদী সংঘটিত হবে।

যদি স্বামী অথবা মনিব এতে কিছু সময় অবস্থান করে তবে তার উপর মহরও ওয়াজিব হবে না। আর যদি পুরুষাঙ্গ বের করে পুনরায় প্রবেশ করায় তাহলে তার উপর মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে স্বামী যদি যৌনাঙ্গ মিলিত করে কিছু সময় অবস্থান করে তবে তার উপর মহর ওয়াজিব হবে। কেননা, এর দলীল হল : স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সাথে সাথেই তালাক হয়েছে আর সে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে তার যৌনাঙ্গ কিছু সময় অবস্থান করানো দ্বারা নতুন একটা সহবাস পাওয়া গেল যা তা তার জন্য হারাম। তাই স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হবে। তবে হা জেনার হদ্দ তার উপর আরোপিত হবে না। কেননা, এখানে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই হদ্দ ওয়াজিব হবে না। সন্দেহ এভাবে যে, স্বামী প্রথম হালাল অবস্থায় প্রবিষ্ট করাইয়াছে যা সর্বসম্মতিক্রমে হদ্দও ওয়াজিব করে না। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় তথা কিছু সময় অবস্থান করানো যেহেতু তালাক অবস্থায় পাওয়া গেছে তাই হদ্দকে ওয়াজিব করে। সুতরাং উভয় অবস্থায় ক্রিয়ার মজলিস ও উদ্দেশ্য এক, তাই ক্রিয়া দুটিতে অভিন্নতার সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এজন্য হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আমাদের

দলীল হল, সহবাস বলা হয় স্বামীর যৌনাঙ্গকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানোকে। আর প্রবিষ্টের জন্য স্থায়িত্ব হয় না। অর্থাৎ, প্রবিষ্ট করণ ক্রিয়াতে স্থায়িত্ব নেই। একারণেই ঐ ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ বের করা পর্যন্ত একটি সহবাস হবে। তাই তার উপর নতুন করে মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে না, তবে হা যদি সে পুরুষাঙ্গ বের করে পুনরায় প্রবেশ করায় তবে তার উপর মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

কেননা এক্ষেত্রে প্রথম পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোর পর তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে আর পুনরায় পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো দ্বারা তালাক অবস্থায় সহবাস পাওয়া গেল তাই মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। কিন্তু জিনার হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা, প্রবেশ করানো ও বের করার মজলিসও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে ক্রিয়া দুটিতেও অভিন্নতার সন্দেহ রয়েছে, যার কারণে হদ্দ ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَ لَمْ يَصِرْ بِهِ مُرَاجِعًا الخ : অর্থাৎ, পূর্বে মাসআলার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার (রহ.) বলেন যে, যদি সহবাসের উপর শর্ত যুক্ত তালাকটি তালাকে রেজঈ হয় তবে স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যোনি পথে প্রবেশ করানোর সাথে সাথেই এক তালাকে রেজঈ পতিত হবে। এখন যদি প্রথম বার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানোর পর কিছু সময় অবস্থান করে তবে স্বামী রাজয়াতকারী হবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে স্বামী এমতাবস্থায় রেজওয়াতকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, তার মতে অবস্থান করা দ্বিতীয়বার সহবাসের সমপর্যায়ভুক্ত। আর যদি স্বামী পুরুষাঙ্গ বের করে পুনরায় প্রবেশ করায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে স্বামী রেজয়াতকারী হিসাবে গণ্য হবে।

قوله : وَلَا تُطَلِّقُ فِى نَكَحْتُهَا عَلَيْكِ الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমার বিবাহ থাকা অবস্থায় অমুক স্ত্রীলোককে বিবাহ করি তবে সে তালাক। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করল এবং সে ইদ্দত পালনরত এমতাবস্থায় সে পূর্বের আলোচিত অমুক স্ত্রীলেকটিকে বিবাহ করে তবে সে তালাক প্রাপ্তা হবে না। কেননা, তালাকে বায়েনের পর বিবাহ পূর্ণরূপে বাকী থাকে না। তবে হা যদি সে তার স্ত্রীকে তালাকে রেজঈ প্রদান করে, আর সে ইদ্দত পালনরত এমতাবস্থায় সে পূর্বের আলোচিত অমুক স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করে তবে সে তালাক প্রাপ্তা হবে। কেননা, তালাকে রেজঈ এর পর বিবাহ পূর্ণরূপে বাকী থাকে। তাই এমন হল যেমন সে তার বিবাহ থাকা অবস্থায় স্ত্রী লোকটিকে বিবাহ করল। الله اعلم।

قوله : وَ لَا فِى اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الخ : যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান কালে ان شاء الله শব্দটিকে তালাকের সাথে সাথেই প্রয়োগ করে তবে তালাক পতিত হবে না। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল انت طالق ان شاء الله (তুমি তালাক যদি আল্লাহ্ চান) তালাক পতিত না হওয়ার দলিল হল রাসূল (সা.) এর বাণী—

مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ اَوْ عِتَاقٍ وَ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا بِهِ لَاحِنْثَ عَلَيْهِ

কেহ যদি (স্ত্রীর উদ্দেশ্যে) তালাক অথবা (দাস দাসীর উদ্দেশ্যে) আজাদ শব্দ প্রয়োগ করে শপথ করে এবং তৎসংলগ্নে ان شاء الله تعالى বলে তবে তা কার্যকর হবে না। আকলী দলীল : স্বামী তার বক্তব্য শর্তরূপে ব্যবহার করেছে তাই তার বাক্যটি শর্তযুক্ত হয়েছে আর শর্তযুক্ত বাক্যে শর্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টিকে অস্তিত্বহীন রাখা হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় শর্ত হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। আর আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভবপর। তাই তা শুরু থেকেই অস্তিত্বহীন বলে গণ্য হবে। ان شاء الله تعالى বাক্যের সাথে সাথে উল্লেখের শর্ত করা হয়েছে। যেভাবে অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

এমনিভাবে যদি স্বামীর উক্তি انت طالق ان شاء الله تعالى উচ্চারণের পূর্বে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে তবে তালাক পতিত হবে না। কেননা, ব্যতিক্রম বাচক শব্দ ব্যবহারের কারণে তার বক্তব্য কার্যকর হওয়া থেকে বিরত হল এজন্য তার হুকুমও বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামীর উক্তি 'তুমি তালাক' বলার পর স্বামী ইনশাআল্লাহ বলার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বাচক শব্দটি মূল বক্তব্যের সার্থে সম্পৃক্ত হয়নি। তাই মূল বক্তব্য কার্যকর হয়ে যাবে।

قوله : وَفِى اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا الخ : কেহ যদি তার স্ত্রীকে বলে انت طالق ثلثا الا واحدة (তুমি তিন তালাক তবে একটি ছাড়া) তবে স্ত্রী দু তালাক প্রাপ্তা হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে انت طالق ثلثا الا ثنتان (তুমি তিন তালাক তবে দুটি ছাড়া) তাহলে এক তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, কম ও বেশি উভয় ধরনের استثناء ই শুদ্ধ। আর যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে انت طالق ثلثا الا ثلاثا (তুমি তিন তালাক তিন তালাক ছাড়া) তাহলে তিন তালাক পতিত হবে।

আলোচ্য সামআলা সমূহের ভিত্তি হল : استثناء এর অর্থ হল ব্যতিক্রমের পর অবশিষ্ট অংশের হুকুম কার্যকর হওয়া। অর্থাৎ, مستثنى منه এর যা অবশিষ্ট থাকে তাই কার্যকর হয়। এজন্য যেভাবে সমগ্র থেকে কম সংখ্যক বাদ দেয়া বিশুদ্ধ তদ্রূপ সমগ্র থেকে বেশি সংখ্যক বাদ দেয়া বিশুদ্ধ তবে সমগ্র থেকে সমগ্র বাদ দেয়া বিশুদ্ধ নয়। এ আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, انت طالق ثلثا الا واحدة এর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দুই তালাক রয়েছে। তাই দুই তালাক পতিত হবে। আর انت طالق ثلثا الا ثنتين এর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট এক তালাক রয়েছে। তাই এক তালাক পতিত হবে। আর انت طالق ثلاثا الا ثلاثا এর ক্ষেত্রে সমগ্রটি তথা তিন তালাক পতিত হবে। এ বাক্যে সমগ্র থেকে সমগ্র বাদ দেয়া হয়েছে যা শুদ্ধ নয়। কেননা, ব্যতিক্রমের পর এমন কোন অংশ বাকী থাকছে না যার দিকে মূল বক্তব্যকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং বক্তাকে এ অংশের উচ্চারণকারী বলা হবে। الله اعلم -

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

পরিচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির তালাক

طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أو بَائِنًا في مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَاتَ في عِدَّتِهَا وَرِثَتْ وَبَعْدَهَا لا وَلَوْ أَبَانَهَا بِأَمْرِهَا أو اخْتَلَعَتْ منه أو اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بِتَفْوِيضِهِ لم تَرِثْ وفي طَلِّقْنِي رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتْ وَإِنْ أَبَانَهَا بِأَمْرِهَا في مَرَضِهِ أو تَصَادَقَا عليها في الصِّحَّةِ وَمَضَى الْعِدَّةُ فَاَقَرَّ أو أَوْصَى لها فَلَهَا الْأَقَلُّ منها وَمِنْ إِرْثِهَا وَمَنْ بَارَزَ رَجُلًا أو قُدِّمَ لِيُقْتَلَ بِقَوَدٍ أو رَجْمٍ فَأَبَانَهَا وَرِثَتْ أن مَاتَ في ذلك الْوَجْهِ أو قُتِلَ وَلَوْ مَحْصُورًا أو في صَفِّ الْقِتَالِ لَا -

---

অনুবাদ : স্বামী মৃত্যুরোগকালে স্ত্রীকে রেজঈ বা বায়েন তালাক প্রদান করে। অতঃপর সে স্ত্রী ইদ্দত পালনের সময় মৃত্যুবরণ করে তাহরে স্ত্রী (তার) উত্তরাধিকারী হবে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করলে উত্তরাধিকারী হবে না। আর যদি স্বামী স্ত্রীর আদেশে তালাকে বায়েন প্রদান করে। অথবা স্ত্রী স্বামী থেকে খোলা করে। কিংবা স্বামীর ইচ্ছাধিকার প্রদানে সে নিজেকে গ্রহণ করে। (অর্থাৎ, নিজেকে তালাক প্রদান করে) তাহলে স্ত্রী উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হবে না। (অর্থাৎ, স্বামীর মিরাস পাবে না। স্ত্রীর উক্তি) আমাকে রেজয়ী তালাক দাও (প্রতি উত্তরে) স্বামী তিন তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রী উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হবে। আর যদি স্ত্রীর আদেশে স্বামী মৃত্যুরোগকালে তাকে তালাকে বায়েন প্রদান করে অথবা সুস্থ অবস্থায় তার উপর তালাকের বিষয় ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি পরস্পর সত্যায়ন করে। অতঃপর স্বামী (স্ত্রীর অনুকূলে) ঋন স্বীকার করে কিংবা তার জন্য ওসিয়াত করে তবে মিরাস বা তা (ঋনের স্বীকার বা অসিয়ত) থেকে নিম্নতর পরিমাণটি স্ত্রীর প্রাপ্য হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় অথবা কিসাস বা রজম হিসাবে হত্যার জন্য অগ্রবর্তী করা হয় অতঃপর সে তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে তবে স্ত্রী মিরাস পাবে। যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয়। আর যদি অবরুদ্ধ হয় কিংবা যুদ্ধের সারিতে থাকে (আর এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে) তবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) সুস্থ ব্যক্তির তালাকের আলোচনা পরিসমাপ্তির পর এখান থেকে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তালাকের আলোচনা শুরু করতেছেন। কেননা, সুস্থতা হচ্ছে মানুষের মূল। আর রোগ ব্যধিগ্রস্থ হওয়া হচ্ছে আরোপিত বিষয়। সুতরাং প্রথমত মূলের আলোচনা হয়ে থাকে। এ হিসাবে গ্রন্থকার (রহ.) প্রথমত মূল তথা সুস্থ্য ব্যক্তির আলোচনা করেছেন। আর এখান থেকে আরোপিত বিষয় তথা অসুস্থ ব্যক্তির তালাকের আলোচনা শুরু করতেছেন।

قوله : طَلَّقَهَا رِجْعِيًّا الخ : স্বামী যদি তার মৃত্যু রোগশয্যায় তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে আর স্ত্রী এতে সম্মতিজ্ঞাপন করে না। অর্থাৎ, স্ত্রী সম্মতি ছাড়া তালাক প্রদান করে এবং স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় স্বামী মৃত্যুবরণ করে আর স্ত্রী মিরাস পাওয়ার উপযুক্তও হয় তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে।

আর যদি স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত শেষান্তে মৃত্যুবরণ করে তবে মিরাস প্রাপ্ত হবে না। আর যদি স্বামী তালাকে রাজঈ প্রদান করে তবে বিবাহের হুকুম বহাল থাকার দরুন সে মিরাস প্রাপ্ত হবে। আর যদি স্বামী স্বাভাবিক অসুস্থাবস্থায় তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর সে সুস্থ হয়ে যায় এবং সুস্থ হওয়ার পর অন্য কারণে মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে না।

আর যদি স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তাকে স্বামী মৃত্যুশয্যায় তালাকে বায়েন প্রদান করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে না। অপর দিকে স্ত্রী মিরাস পেতে হলে মিরাস পাওয়ার যোগ্য হতে হবে। অধিকন্তু স্ত্রী যদি আহলে কিতাবী হয় কিংবা দাসী হয় তবে সে মিরাস প্রাপ্ত হবে না। আর যদি স্বামী স্ত্রীর ইদ্দতকালীন সময় মৃত্যুবরণ করে না বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে না।

মোটকথা, হানাফীদের মতে স্বামী তার মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রীর অসন্তুষ্টিতে তালাকে বায়েন প্রদানের পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী মিরাসের যোগ্য হলে মিরাস প্রাপ্ত হবে।

আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করলে মিরাস প্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উভয় অবস্থায় স্ত্রী মিরাসের হকদার হবে না।

তার দলীল হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিরাসের সম্পর্ক হয় বিবাহ সূত্রের মাধ্যমে। যদি তাদের মধ্যে বিবাহ সূত্র বিদ্যমান না থাকে তবে মিরাসের সম্পর্ক হবে না। সুতরাং এ মূল ভিত্তির আলোকে আলোচিত মাসআলায় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করায় বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে তাই মিরাসের সম্পর্কের সূত্র তথা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে না। স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় কিংবা ইদ্দতের পর মৃত্যু বরণ করুক।

আমাদের দলীল হল : মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রী মিরাস পাওযার সূত্র হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক। কেননা, স্ত্রী এ সময়ে স্বামীর সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং স্বামী এমন সময় তালাক প্রদানের উদ্দেশ্য হতে পারে স্ত্রীকে তার উত্তরাধিকার থেকে তথা স্ত্রীর হক থেকে তাকে বঞ্চিত করা। তাই স্ত্রীকে তার হক থেকে বঞ্চিত করার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর অশুভ পদক্ষেপকে প্রতিহত করা হবে। তাই ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে। তাছাড়া ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত এখনও বিবাহের অনেক হুকুমাদী বাকী থাকে। তাই হুকুমগত দিক থেকে তাকে মিরাসের হকদার সাব্যস্ত করা হবে। তবে হা সে যদি স্বেচ্ছায় তালাক কামনা করে বা তার সন্তুষ্টিতে স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তবে তা ব্যতিক্রম। কেননা, এক্ষেত্রে স্ত্রী তার নিজের ক্ষতির ব্যাপারে সে নিজে দায়বদ্ধ।

তাছাড়া আমাদের মতামতের পক্ষে হাদীস পাওয়া যায়। কেননা হযরত আয়শা (রাযি.) থেকে বর্ণিত إِنَّ إِمْرَأَةَ الْفَارِ تَرِثُ (মিরাস ফাঁকিদাতার স্ত্রী মিরাস পাবে।) হযরত আলী (রাযি.) হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযি.) প্রমুখ সাহাবীগণ থেকেও এ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইজমা দ্বারাও আমাদের মাযহাব সুপ্রতিষ্ঠিত। কেননা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) মৃত্যুশয্যায় তার স্ত্রী (তুমাযির রাযি.) কে তালাকে বায়েন দিলেন। তার স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। হযরত উসমান (রাযি.) আবদুর রহমান ইবনে আউফের স্ত্রীর জন্য মিরাস প্রাপ্তির ফায়সালা দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের কেহ তার বিরোধিতা করেন নি। সুতরাং এ দ্বারা মৌন ইজমা সংঘটিত হয়েছে। والله اعلم -

قوله : وَ اِنْ اَبَانَهَا الخ : স্ত্রীর আদেশে বা তার চাওয়ার ভিত্তিতে স্বামী তাকে তালাকে বায়েন প্রদান করে কিংবা স্ত্রীকে তালাকের ইচ্ছাধিকার প্রদানে স্ত্রী তার নিজের ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে অথবা স্ত্রী স্বামীর সাথে খোলা করে অর্থাৎ, অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে তালাক চায় আর স্বামী তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। আর এ সকল অবস্থা স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় হয়ে থাকে এবং স্বামী তার স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। কেননা, বর্ণিত তিন সুরতে স্ত্রী তার নিজের হক বিনষ্ট করতে সম্মত হয়েছে। প্রথম সুরতে সে তো নিজেই তালাক কামনা করেছে। আর দ্বিতীয় সুরতে স্ত্রী তার নিজের ব্যাপারে নিজের উপর ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্নতা কামনা করেছে। আর তৃতীয় সুরতে স্ত্রী নিজেই অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক নিয়েছে।

সুতরাং এসব স্ত্রীর উত্তরাধিকার বাতিলের প্রতি তার সম্মতির প্রমাণ। অথচ শরীয়াত স্ত্রীর হককে কার্যকর করার জন্য ইদ্দতের শেষ পর্যন্ত তার উত্তরাধিকারের বিষয়কে বিলম্বিত করেছে। সুতরাং স্ত্রী যখন তার হক বিনষ্ট করার ব্যাপারে সে নিজেই দায়বদ্ধ, তাই অন্যের উপর তার অধিকার সংরক্ষণের দায়ভার অর্পণ করা যাবে না।

قوله : وَ فِى طَلِّقْنِى رِجْعِيَّةً الخ : স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যায় স্ত্রী যদি তালাকে রেজঈ কামনা করে আর স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর স্বামী স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে। কেননা, স্ত্রীর তালাকে রেজঈ কামনা করা দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার কামনা নয়। কেননা, তালাকে রেজঈ দ্বারা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী তাকে তালাকে রেজঈ চাওয়ার উপর তালাকে বায়েন প্রদান করা প্রমান করে যে, সে স্ত্রীকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। তাই স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষার্থে সে স্বামীর মিরাস পাওয়ার হুকুম প্রদান করা হবে।

قوله : وَ اِنْ اَبَانَهَا بِاَمْرِهَا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে দুটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তা হল, (১) স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যা। স্ত্রী তিন তালাক চাইল আর স্বামী তাহাকে তিন তালাক প্রদান করল অতঃপর তার ইদ্দতে স্বামী স্ত্রীর ঋনের কথা স্বীকার করল। বা তার জন্য কিছু ওয়াসিয়াত করল।

(২) স্বামী মৃত্যুরোগ শয্যায় তার স্ত্রীকে বলল, আমি সুস্থ অবস্থায় তোমাকে তিন তালাক দিয়েছিলাম এবং তুমিও ইদ্দত পূর্ণ করেছ। অতঃপর স্ত্রী ও তার কথা সত্য বলে স্বীকার করল। তারপর স্বামী তার কিছু ঋণের কথা স্বীকার করল কিংবা তার জন্য তার সম্পত্তি থেকে ওসিয়াত করল।

আলোচিত উভয় মাসআলার হুকুম সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উভয় সুরতে মিরাস ঋন ও অসীয়াতের মধ্যে যেটি নিম্ন পরিমাণের সেটিই স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ, ঋন ও মিরাসের ক্ষেত্রে যেটির পরিমাণ কম হবে তা স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। আর অসিয়াত ও মিরাসের ক্ষেত্রে যেটি নিম্ন পরিমাণ তাই কার্যকর হবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে যে পরিমাণ ঋণ স্বীকার করেছে অথবা অসিয়াত করেছে সে পরিমাণই কার্যকর হবে। তা মিরাস থেকে কম হউক বা বেশী হউক। সাহাবাই (রহ.) এর মতে প্রথম মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাই হবে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় ইমাম যুফার (রহ.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাই হবে।

অর্থাৎ, প্রথম মাসআলায় সে উভয়টি থেকে নিম্ন পরিমাণ প্রাপ্ত হবে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় ঋণ বা অসিয়াতের পরিমাণ প্রাপ্ত হবে। তা মিরাসের চেয়ে কম হউক বা বেশী হউক। ইমাম যুফার (রহ.) এর দলীল হল : স্ত্রীর জন্য ঋণ স্বীকার কিংবা অসিয়াত কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হচ্ছে মিরাছের মালিক হওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে স্ত্রীর মিরাসের মালিক না হওয়াতে ঋনের বা অসিয়াতের পরিমাণ সে প্রাপ্ত হবে। কেননা, প্রথম মাসআলায় স্ত্রী তালাক চাওযাতে স্বামী তালাক প্রদানে সে মিরাস থেকে বঞ্চিত হল। আর দ্বিতীয় মাসআলার পূর্বে তালাক পতিত হওয়া এবং ইদ্দত অতিক্রম হওয়ার বিষয়ে উভয় একমত হওয়ায় বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকায়

মিরাসের সূত্রের অবর্তমানে সে মিরাসের মালিক না হওয়া স্পষ্ট। সেই স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঋনের স্বীকৃতি বা অসিয়াত করা কার্যকর হবে। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে ততটুকু লাভ করবে যতটুকু স্বামী তার জন্য ঋন স্বীকার করেছেন বা অসিয়াত করেছে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল : প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে তারা বলেন, যেহেতু স্ত্রী এখনও ইদ্দত পালন করতেছে তাই অভিযোগের অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। অভিযোগ এভাবে যে এখনও সে ইদ্দতে থাকায় একজনের ওয়ারিসকে অন্যান্যদের থেকে অধিক প্রদানের অভিযোগ বিদ্যমান। তাই অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় অবকাশ বিদ্যমান থাকা ঋন স্বীকার করা বা তার জন্য অসিয়াত করা বৈধ হবে না। এজন্য স্ত্রীর ইদ্দত বহাল থাকার স্ত্রীর জন্য স্বামীর ঋন স্বীকার কিংবা অসিয়াত কার্যকর হবে না। এজন্য মিরাস ঋন ও অসিয়াতের সর্বনিম্ন পরিমাণ সে প্রাপ্ত হবে। তবে দ্বিতীয় মাসআলা এর থেকে ভিন্ন। কেননা, স্বামী স্ত্রী যখন তালাক পতিত হওয়ার বিষয় এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে একমত হল তখন তারা উভয় একজন অপর জনের জন্য অপরিচিত সাব্যস্ত হবে। সে আর মিরাসের অধিকারী নয়। তদ্রূপ কোন অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। এজন্যই তো তাকে যাকাত প্রদান করা বা তার বোনকে বিবাহ করা সবই বৈধ।

আর অপরিচিত কারো জন্য ঋন স্বীকার করা কিংবা তার জন্য অসিয়ত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়ারিস থেকে তাকে ওয়ারিস হিসাবে অগ্রগণ্য করার অভিযোগের অবকাশ বিদ্যমান নেই। এজন্য যেভাবে অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির জন্য ঋন স্বীকার করা কিংবা অসিয়াাত করা বৈধ, তদ্রূপ এ মহিলার জন্য ঋণ স্বীকার করা কিংবা তার জন্য অসিয়াত করা বৈধ। স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে স্বীকৃত ঋণ বা অসিয়াতকৃত মাল পূর্ণটিই সে প্রাপ্ত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : উভয় মাসআলাতেই আভিযোগের অবকাশ পূর্ণরূপে বিদ্যমান। প্রথম মাসআলায় তো সর্বসম্মতভাবে অভিযোগে বিদ্যমানের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় মাসআলায় অভিযোগ বিদ্যমান থাকার কারণ হচ্ছে। স্ত্রীর প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কখনো কখনো স্বেচ্ছায় স্বামী স্ত্রী তালাকেরও ইদ্দত পালনের উপর একমত হতে পারে। যাতে করে ঋনের বা অসিয়াতের দোহাই দিয়ে স্বামী স্ত্রীকে তার সম্পত্তি থেকে বেশি দানের মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে পারে। মূলত তালাক ও ইদ্দতের কোন প্রয়োজনিয়তা ছিল না।

সুতরাং এতে করে অন্যান্য ওয়ারিশদের ক্ষতি সাধিত হওয়ার বিষয়টি অতি স্পষ্ট। মোটকথা, এই অভিযোগেও সন্দেহ হচ্ছে মিরাসের চেয়ে অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে। তবে হা মিরাসের সমপরিমাণ সম্পদ ঋণ বা অসিয়ত করলে এতে কোন সন্দেহ বা অভিযোগ নেই। এজন্য মিরাসের সমপরিমানকে বৈধ বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং মিরাস ঋণ ও অসিয়াতের মধ্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। অসিয়ত কিংবা ঋনের পরিমাণ যদি মিরাসের চেয়ে কম হয়, তবে স্ত্রী তাই প্রাপ্ত হবে। আর যদি অসিয়াত কিংবা ঋণ মিরাসের চেয়ে কম হয়। তবে স্ত্রী তাই প্রাপ্ত হবে। আর যদি অসিয়াত কিংবা ঋন মিরাসের চেয়ে বেশি হয় তবে সে মিরাসই প্রাপ্ত হবে।

قوله : وَ مَنْ بَارَزَ رَجُلًا الخ : যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের সারি থেকে বের হয়ে শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অথবা কিসাসের কারণে কিংবা রজমের কারণে হত্যার জন্য সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর সে এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে অতঃপর এ অবস্থায় সে মারা যায় বা হত্যা করা হয় তবে স্ত্রী উক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি জেলে বা দুর্গে অবরুদ্ধ থাকে কিংবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের সাথে থাকে আর এমতাবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে অতঃপর সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে না। উভয় মাসআলার মূল হচ্ছে যে মিরাস ফাঁকি দানকারী স্বামীর তালাক দ্বারা সে মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। ইহা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে প্রমাণিত নতুবা সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী তালাক প্রাপ্তা স্বামীর মিরাসের

অংশিদারিত্ব হতে পারে না। কেননা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বিবাহের সূত্রেই একে অপরের উত্তরাধিকার হয়। সুতরাং যেহেতু তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা হল তাই মিরাস পাওয়ার সূত্রের অবিদ্যমানে সে মিরাস এর হকদার হতে পারে না। পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী হল স্ত্রী স্বামীর মিরাস পাবে। কেননা, স্বামী তার মৃত্যুর সন্নিকটে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীকে মিরাসের সূত্র তথা বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে তাকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা। তাই স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষার্থে স্ত্রী মিরাসের মালিক হওয়ার ফয়সালা আরোপিত হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বামী মিরাস থেকে ফাঁকি দানকারী কখন সাব্যস্ত হবে। এর উত্তরে হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) এর ভাষ্য অনুযায়ী ফাঁকি দান এর হুকুম সাব্যস্ত হবে স্বামীর মালের সাথে স্ত্রীর উত্তরাধিকার সম্পৃক্ত হওয়ার দ্বারা আর তা সম্পৃক্ত হবে এমন কোন রুগে আক্রান্ত হওয়ার দ্বারা যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল থাকে। যেমন সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল এভাবে যে সুস্থ ব্যক্তি যেমন অভ্যস্ত সে ভাবে সে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে না। আর অবশ্য প্রবল মৃত্যু আশঙ্কার ক্ষেত্রে রোগতুল্য বিষয় দ্বারাও। যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সম্মোখ যুদ্ধের জন্য শত্রুর মুখামুখি হওয়া বা কিসাসের কারণে বা রজমের কারণে হত্যার জন্য পেশ করা ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যে অবস্থায় নিরাপত্তার সম্ভাবনা প্রবল সে অবস্থা দ্বারা ফাঁকি দান সাব্যস্ত হবে না। যেমন যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করা কিংবা কোন দুর্গে অবরুদ্ধ ব্যক্তি। সুতরাং উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, মিরাস থেকে ফাঁকি দানের সুরতে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রী মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে না। আর যদি এমন অবস্থায় তালাক প্রদান করে যে সে মিরাস থেকে ফাঁকি দান প্রমাণিত হয়নি তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে।

আর স্বামী যদি মৃত্যুরোগ অবস্থায় বা প্রবল মৃত্যু আশঙ্কার মুহূর্তে তালাক প্রদান করে অতঃপর সে নিহত হয় বা অন্য কোন কারণে মৃত্যুবরণ করে তবেও স্ত্রীর উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা, তালাক প্রদানের মুহূর্তে মিরাস থেকে ফাঁকি দানের সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أو بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَالتَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ في مَرَضِهِ أو بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَهُمَا في مَرَضِهِ أو الشَّرْطُ فَقَطْ أو بِفِعْلِهَا وَلَا بُدَّ لها منه وَهُمَا في الْمَرَضِ أو الشَّرْطِ وَرِثَتْ وفي غَيْرِهَا لَا وَلَوْ أَبَانَهَا في مَرَضِهِ فَصَحَّ فَمَاتَ أو أَبَانَهَا فَارْتَدَّتْ فَأَسْلَمَتْ فَمَاتَ لم تَرِثْ وَإِنْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ أو لَاعَنَ أو آلَى مَرِيضًا وَرِثَتْ وَإِنْ آلَى في صِحَّتِهِ وَبَانَتْ منه في مَرَضِهِ لَا -

---

অনুবাদ : যদি স্বামী স্ত্রীর তালাককে অপর কোন ব্যক্তির কাজের সাথে কিংবা কোন সময় আসার সাথে সম্পৃক্ত করে আর শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন হয় স্বামীর অসুস্থতাবস্থায় কিংবা (তালাককে) নিজের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে আর শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন হয় অথবা শুধু শর্ত সম্পন্ন হয় স্বামীর অসুস্থাবস্থায় কিংবা (তালাককে) স্ত্রীর কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং তার (স্ত্রীর) জন্য কাজটি অপরিহার্য হয়। আর শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন হয় অথবা শুধু শর্ত সম্পন্ন হয় স্বামীর অসুস্থাবস্থায় তবে স্ত্রী ওয়ারিস (উত্তরাধিকার) হবে। অন্যান্য সুরতে ওয়ারিস (উত্তরাধিকার) হবে না। আর যদি স্বামী তার অসুস্থাবস্থায় স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর সে সুস্থ হয়ে যায়। তারপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা স্বামী (মৃত্যুরোগাবস্থায়) স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিল। অতঃপর

স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেল তারপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল এবং স্বামী (তার মৃত্যু রোগ শয্যা থেকেই) মৃত্যুবরণ করে তাহলে মিরাস পাবে না। আর যদি (মুরতাদ না হয় বরং) স্বামীর পুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ প্রদান করে কিংবা স্বামী অসুস্থাবস্থায় লিআন বা ইলা করে তাহলে স্ত্রী মিরাস পাবে। আর যদি স্বামী সুস্থাবস্থায় স্ত্রী বায়েনা হয় তাহলে মিরাস পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) আলোচ্য চারটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। (১) যদি কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুরোগে স্ত্রীর তালাককে অন্য কোন ব্যক্তির কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে যেমন- إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ فِى الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (যদি যায়েদ ঘরে প্রবেশ করে তবে তুমি তালাক) (২) অথবা কোন সময় আসার সাথে সম্পৃক্ত করে।

যেমন إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ যেমন মাস শুরু হবে তখন তুমি তালাক) আর এ ভয় অবস্থায় শর্তারোপ ও শর্ত সম্পৃক্ত হয় স্বামীর অসুস্থ অবস্থায় তবে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে।

(৩) কিংবা স্ত্রীর তালাককে তার নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে যেমন إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ (আমি যদি এমন করি তবে তুমি তালাক) (৪) অথবা স্ত্রীর তালাককে স্ত্রীর কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে আর তা এমন কাজ যা স্ত্রীকে না করলে না হয়। অর্থাৎ, তার জন্য এমন কাজ করা অপরিহার্য। যেমন إِنْ صَلَّيْتِ الظُّهْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (তুমি যদি জোহরের নামায পড় তবে তুমি তালাক) আর এ উভয় অবস্থায় শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন হয় স্বামীর অসুস্থ অবস্থায় কিংবা শুধু শর্তারোপ করা পাওয়া যায় স্বামীর অসুস্থাবস্থায় তবে স্ত্রী উত্তরাধিকার হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সুরতে স্ত্রী উত্তরাধিকার হওয়ার কারণ : এ দুই সূরতে স্বামীর পক্ষ থেকে ফাঁকি দানের ইচ্ছার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ, স্বামী স্ত্রীর তালাক প্রদানকে এমন অবস্থার সাথে শর্তরূপ করেছে যখন তার সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত হয়েছে। আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মিরাস ফাঁকি দানকারীর স্ত্রী মিরাসের হকদার হয়। তাই স্ত্রী এক্ষেত্রে মিরাস পাবে। আর যদি প্রথম ও দ্বিতীয় সূরতে শর্তারোপ সুস্থ অবস্থায় হয়। আর শর্ত সম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায় হয় তবে স্ত্রী মিরাসের হকদার হবে না। ইমাম যুফার (রাযি.) বলেন, মিরাসের হকদার হবে। তিনি বলেন মৃত্যু রোগ শয্যা যেভাবে নিঃশর্ত তালাক দানের কারণে স্ত্রী মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাদ্বয়ে যেহেতু শর্তযুক্ত তালাক শর্তটি সম্পন্ন হয়েছে স্বামীর মৃত্যুরোগ অবস্থায় তাই তালাক পতিত হওয়া হিসাবে উভয়টি এক জাতীয় হওয়াতে হুকুম ও এক জাতীয় হবে।

সুতরাং অসুস্থ অবস্থায় তালাক প্রদানে যেভাবে স্ত্রী মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না। তদ্রূপ এক্ষেত্রেও স্ত্রী মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে না।

আমাদের দলীল হচ্ছে : পূর্বের শর্তারোপকৃত তালাক শর্তের অস্তিত্বলাভ কালে কার্যকারী ভাবে তালাক দেয়া হিসাবে সাব্যস্ত হয়। সেচ্ছাকৃতভাবে নয়।

এর দৃষ্টান্ত অপর এক মাসআলা দ্বারা প্রতিয়মান হয়। তাহল যদি কোন সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাককে শর্তযুক্ত করে আর শর্তের অস্তিত্বের সময় যে ব্যক্তি পাগল থাকে তবে তালাক পতিত হবে। যদিও এ সময় তার নতুন করে তালাক প্রদানের ক্ষমতা বিদ্যমান নেই। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, পূর্বের শর্তারোপকৃত তালাক শর্ত সম্পন্ন হওয়ার সময় তালাক দেয়া হয় বলে সাব্যস্ত হয় কার্যককারীভাবে, সেচ্ছাকৃতভাবে নয়। সুতরাং স্বামীর কর্ম এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যিত হবে না। আর স্বামীর কর্মকে যখন প্রত্যাখ্যান করা গেল না তখন সুস্থ অবস্থায় তালাক প্রদান হিসাবে গণ্য করতে হবে।

এ জন্য স্বামী এক্ষেত্রে মিরাস থেকে ফাঁকি দানকারী সাব্যস্ত না হওয়াতে স্বামীর সম্পত্তি থেকে মিরাস প্রাপ্ত

হবে না। আর তৃতীয় সুরতে অর্থাৎ, স্ত্রীর তালাককে স্বামী তার নিজের কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তবে এ কাজ অপরিহার্য হউক বা না হউক। তদ্রূপ শর্তারোপ সুস্থ অবস্থায় আর শর্তের অস্তিত্ব অসুস্থ অবস্থায় হয় কিংবা শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন অসুস্থাবস্থায় হয় তবে স্ত্রী মিরাসের হকদার হবে না। কেননা, স্বামী তার এমন অবস্থায় তালাকের শর্তরূপ কিংবা শর্ত সম্পন্ন করেছে যাতে স্ত্রীর হক নষ্ট করার ইচ্ছা রয়েছে। যাতে প্রমাণিত হল স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে মিরাস ফাঁকি দানকারী। তাই স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য স্ত্রীর জন্য মিরাসের হুকুম প্রদান করা হবে। আর চতুর্থ সূরতে অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রীর তালাককে তার কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে। আর শর্তারোপ ও শর্ত সম্পন্ন উভয়টি স্বামীর অসুস্থাবস্থায় হয়। আর কাজটিও এমন যা স্ত্রী চাইলে পরিহার করতে পারে এতে তার দুনিয়াবী বা উখরওয়ী কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। যেমন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলা তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার নিজের হক নিজেই বিনষ্ট করেছে। আর যদি কাজটি এমন হয় যে, তা পরিহার করলে দুনিয়াবী বা উখরুওয়ী কোন ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান যেমন নামাজ না পড়া মাতা-পিতার সাথে কথা না বলা। কিংবা খাবার না খাওয়া ইত্যাদি। তবে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে। কেননা, সে বাধ্য এ কাজ করেছে নতুবা সাধারণ হলে হয় তো বা তা করত না।

আর যদি শর্তযুক্ত করা হয় স্বামীর সুস্থ অবস্থায় আর শর্ত সম্পন্ন হয় স্বামীর মরণ ব্যধির সময় আর কাজও এমন হয় যে তা পরিহার যোগ্য অতঃপর স্ত্রী সে কাজ করে বসে তবে সে মিরাস প্রাপ্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সে একাজ না করলে হতো, কিন্তু তার নিজের ক্ষতি জেনে সে একাজ করে নিজের হক নিজেই শেষ করে দিয়েছি। তাই সে মিরাসের মালিক হবে না। আর যদি যুক্ত কাজ অপরিহার্য হয় আর তা করে বসে তবে ইমাম মুহাম্মদ (রাযি.) ও যুফার (রাযি.) এর মতে সে মিরাস প্রাপ্ত হবে না। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ ইমাম আবু ইউসুফ (রাযি.)এর মতে সে মিরাস প্রাপ্ত হবে।

শায়খাইন (রাযি.) এর দলীল হল : শর্তযুক্ত কাজটি অপরিহার্য হওয়াতে স্ত্রী তা করতে বাধ্য হয়েছে। তাই কাজটি স্বামীর দিকেই সম্পৃক্ত হবে। এ কাজটি সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে স্ত্রী যেন বলপ্রয়োগের স্বীকার হল আর বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে যিনি প্রয়োগ করেন হুকুম তার দিকেই প্রত্যাবর্তীত হয়।

কেননা বাধ্য ব্যক্তির কর্ম বাধ্যকারীর দিকেই সম্পৃক্ত হয়। অনুরূপভাবে এখানে ও স্ত্রীর কাজটি স্বামীর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সে যেন তার অসুস্থাবস্থায় শর্তযুক্ত কাজটি সম্পাদন করেছে এজন্য স্বামীকে মিরাস ফাঁকি দানকারী সাব্যস্ত করা হবে। এবং স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে।

قوله : وَ لَوْ اَبَانَهَا فِى مَرَضِهٖ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় বায়েন তালাক প্রদান করে। অতঃপর সে সুস্থ হয়ে যায় তারপর স্ত্রীর ইদ্দত চলাকালে সে মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে না। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে সে মিরাস পাবে। কেননা, স্বামী অসুস্থাবস্থায় তালাক দেওয়ার অর্থই হচ্ছে স্ত্রীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। আর সেও ইদ্দত চলাকালে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই সে ফাঁকি দানকারী হল। আর ফাঁকি দানকারীর স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হয়। আর তালাক প্রদান ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সুস্থতা ধর্তব্য নয়।

আমাদের দলীল হল : অসুস্থতার পর যদি সুস্থতা লাভ হয় তবে তা মৃত্যুরোগ হতে পারে না, বরং পূর্বের অসুস্থতা সুস্থতার অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই যেন সে সুস্থ অবস্থায় তালাক প্রদান করেছে আর সুস্থ অবস্থায় তালাক প্রদান করলে স্ত্রী কোন অবস্থায় মিরাস প্রাপ্ত হয় না, তাই এক্ষেত্রেও স্ত্রী মিরাস পাবে না। তাছাড়া অসুস্থতার পর সুস্থ হওয়ার পর স্পষ্ট হল সে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে কোন হক সম্পৃক্ত হয়নি। তাই এ তালাক দ্বারা স্বামী ফাঁকি দান কারি সাব্যস্ত হবে না। তাই স্ত্রীও মিরাস প্রাপ্ত হবে না।

قوله : اَوْ اَبَانَهَا فَارْتَدَّتْ الخ : যদি স্বামী মৃত্যুরোগ অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে কিংবা এক তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর স্ত্রী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (العياذ بالله) অতঃপর পূণর্বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

করে। আর স্বামী মৃত্যুবরণ করে। আর এসব কিছু ইদ্দতের মধ্যে ঘটে তবে স্ত্রী মিরাস পবে না। কেননা, সে মুরতাদ হওয়ার দরুন উত্তরাধিকারী বা ওয়ারেশী হারিয়ে ফেলেছে। কেননা, মুরতাদ কারো ওয়ারিশ হতে পারে না। এজন্য মুরতাদ হওয়ার সূরতে স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হবে না। যদিও পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

قوله : وَاِنْ طَاوَعَتْ اِبْنُ الزَّوْجِ الخ : আর যদি স্বামীর মৃত্যুরোগ অবস্থায় তালাকের পর স্ত্রী স্বামীর ছেলে তথা তার সৎপুত্রকে যৌনাচারের সুযোগ করে দেয় তবে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, এ আচরণ করা দ্বারা উভয়ের মাঝে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ উত্তরাধিকার হওয়া থেকে বাধা দান করে না। তাই তালাকের পর সৎ ছেলের সাথে যৌনাচার করলেও সে স্বামীর উত্তরাধিকার হবে। তবে হা যদি তালাকের পূর্বে স্বামীর ছেলের সাথে অবৈধ যৌনাচারের সুযোগ করে দেয় তবে সে মিরাস প্রাপ্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সে নিজেই তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাই প্রতিয়মান হয় যে সে নিজে তার হক বিনষ্ট করতে সম্মত। প্রথম মাসআলা এর বিপরীত।

قوله : اَوْ لَاعَنَ الخ : যদি স্বামী সুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রীর উপর জেনার অভিযোগ আরোপ করে। অতঃপর মৃত্যুরোগ অবস্থায় পরস্পর লিআন করে। আর বিচারক তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের ফয়সালা দিয়ে দেন। আর স্বামী-স্ত্রীর ইদ্দতের ভেতর মৃত্যুবরণ করে। তবে স্ত্রী মিরাসের হকদার হবে। ইহা শায়খাইন (রহ.) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমান মুহাম্মদ (রহ.) এর মতামত হল এ স্ত্রী মিরাস পাবে না। আর যদি জিনার অভিযোগে লিআন স্বামীর মৃত্যুরোগ শয্যার হয়ে থাকে এবং স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে।

শায়খাইন (রহ.)এর দলীল হল : এ হুকুমটি শর্তযুক্ত তালাকের সাথে সম্পৃক্ত হল এভাবে যে, এক্ষেত্রে স্ত্রী তার নিজের উপর তালাক পতিত হউক তা কামনা করেনি। বরং তার উপর আরোপিত অপরাধটি খন্ডানোর জন্য লিআন করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং তা এমন শর্ত হল যা স্ত্রীর জন্য করা অপরিহার্য। আর এমতাবস্থায় স্ত্রী তা করলে যদিও তালাক পতিত হয় কিন্তু মিরাস থেকে বঞ্চিত হয় না। তার কারণ, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যে শর্তারোপ যদি সুস্থ অবস্থায় হয় আর শর্ত সম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায় হয়। আর শর্ত এমন হয় যা স্ত্রীকে অবশ্যই করতে হবে।

তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে স্ত্রী মিরাস পাবে। কেননা, কাজটি স্বামীর করার জন্য বাধ্য করেছে। তাই কাজটি স্বামীর প্রতিই সম্পৃক্ত হবে।

قوله : اَوْ آلَى الخ : স্বামী যদি অসুস্থাবস্থায় স্ত্রীর সাথে ইলা করে (ইলা হল স্বামী তার স্ত্রীকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলল আমি তোমার সাথে মিলিত হব না। কিংবা আল্লাহর নামে শপথ করে বলল আমি তোমার সাথে চার মাস মিলিত হব না। অতঃপর ইলার কারণে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। স্বামীর অসুস্থবস্থায় এবং ইদ্দতের সময় স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রী মিরাস প্রাপ্ত হবে। কেননা, ইলা এর অর্থ হল সহবাস মুক্ত চার মাসের সাথে তালাককে শর্ত যুক্ত করা। তাই তা নির্ধারিত সময়ের আগমনের সাথে শর্ত যুক্ত করার শামিল। সুতরাং শর্তারোপ এবং শর্তের অস্তিত্ব দুটিই যদি অসুস্থাবস্থায় সম্পন্ন হয় তবে স্ত্রী ও উত্তরাধিকারী হবে। কেননা, স্বামীর সম্পদের সাথে স্ত্রীর হক সম্পৃক্ত হওয়ার অবস্থায় শর্তারোপের মাধ্যমে ফাঁকি দানের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। তাই স্ত্রী মিরাস পাবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে ইলা করে সুস্থাবস্থায় আর ইলার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় স্বামীর অসুস্থাবস্থায় তবে স্ত্রী মিরাস পাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে স্বামীর ফাকি দান সাব্যস্ত হচ্ছে না তাই স্ত্রী মিরাস পাবে না।

بَابُ الرَّجْعَةِ

পরিচ্ছেদ : রাজআত

هِيَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ وَتَصِحُّ فِي الْعِدَّةِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثًا وَلَوْ لَمْ تَرْضَ بِرَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَبِمَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ وَالْإِشْهَادُ مَنْدُوبٌ عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْعِدَّةِ رَاجَعْتُكِ فِيهَا فَصَدَّقَتْهُ تَصِحُّ وَإِلَّا لَا كَرَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ مَضَتْ عِدَّتِي وَلَوْ قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ رَاجَعْتُ فِيهَا فَصَدَّقَهُ سَيِّدُهَا وَكَذَّبَتْهُ أَوْ قَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِي وَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ لَهَا -

অনুবাদ : তা (রেজাআত) হল ইদ্দতের ভেতর বিদ্যমান মালিকানা অব্যহত রাখা যদি তিন তালাক দেয়া না হয় তবে ইদ্দতের ভেতর (রাজআত করা যাবে) যদিও স্ত্রী সন্তুষ্ট না হয়। راجعتك (তুমাকে আমি ফিরিয়ে নিলাম কিংবা رَاجَعْتُ اِمْرَأَتِى (আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম) অথবা বৈবাহিক মুহাররামাত আবশ্যক করে এমন কোন কাজ দ্বারা (স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নেয়া বিশুদ্ধ। আর রাজআতের উপর (দুজন) সাক্ষ্য গ্রহণ করা মোস্তাহাব। আর যদি স্বামী ইদ্দতের পর বলে আমি তোমাকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়েছি অতঃপর স্ত্রী তা সত্যায়ন করে তবে (তা) বিশুদ্ধ। নতুবা (অর্থাৎ, যদি স্ত্রী তা সত্যায়ন করে না তবে) বিশুদ্ধ হবে না। যেমন (স্বামী বলল) আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়েছি স্ত্রী তার জবাবে বলে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। (তবে তার রাজআত বিশুদ্ধ হবে না।) আর যদি দাসীর স্বামী ইদ্দতের পর বলে আমি ইদ্দতে ফিরিয়ে নিয়েছে। অতঃপর দাসীর মনিব তা সত্যায়ন করে আর দাসী তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা বলে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে আর মনিব তা অস্বীকার করে তবে স্ত্রীর (দাসীর) কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الرَّجْعَةِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) নীতিগত দিক বিবেচনা করেই তালাকের আলোচনার পর রাজআত এর আলোচনা শুরু করেছেন। কেননা, তালাক না পাওয়া গেলে রাজয়াত সাব্যস্ত হবে না। বা রাজআতের প্রশ্নই উঠে না। এজন্য তালাকের পর রাজআতের আলোচনা শুরু করতেছেন।

رجعت শব্দটির راء বর্ণে যবর দিয়া এবং যের দিয়ে পড়া যায়। তবে যবর যোগে অধিক বিশুদ্ধ। শব্দটি বাবে ضرب يضرب থকে ব্যবহৃত হয়। তা فعل لازم ও فعل متعدى উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন শরীফে فعل لازم হিসেবে এসেছে— لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা মুনাফিকুন-৮) فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلَى اَبِيْهِمْ (অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করল। (সূরা ইউসুফ-৬৩) فعل متعدى হিসাবে কুরআন শরীফে এসেছে— فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ (বস্তুত আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। (সূরা তওবা-৮৩)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ(অতঃপর তুমি দৃষ্টিকে বার বার ফিরাও। সূরা মুলক-৪)

শরীয়াতের পরিভাষায় রাজআত বলা হয় : কানযুদদাকাইক গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী— هِيَ اِسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ রাজআত হল ইদ্দতের ভেতর বিদ্যমান মালিকানা অব্যহত রাখা। মোটকথা, রাজআত বলা হয়— اِسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ النِّكَاحِ তথা বৈবাহিক মালিকানাকে অব্যাহত রাখা। রাজআতের জন্য শর্ত হচ্ছে (১) স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক প্রয়োগ করা। যেমন اَنْتِ طَالِقٌ (তুমি তালাক) বা طَلَّقْتُكِ আমি তোমাকে তালাক দিলাম। অথবা অস্পষ্ট শব্দাবলী থেকে তিনটি শব্দের যে কোন একটি দ্বারা তালাক প্রদান করা। তাহল—

(ক) اعتدى (তুমি ইদ্দত পালন কর) (খ) استبرى رحمك (তোমার জরায়ু খালি কর) (গ) انت واحد (তুমি এক)।

(২) তালাকের বিনিময়ে অর্থ না নেয়া তথা খোলা না করা।

(৩) তিন তালাক না দেয়া।

(৪) স্ত্রী সহবাসকৃতা হওয়া।

(৫) ইদ্দত বিদ্যমান থাকা।

অর্থাৎ স্ত্রীকে এভাবে তালাক দেয়া যাতে স্ত্রী বায়েন না হয়, বরং রাজআত করার অধিকার বিদ্যমান থাকে। তালাকে রেজঈর পর স্ত্রীকে রাজআত করার বিধান কুরআন হাদীস ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আল কুরআনের ঘোষণা : وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে।) অপর আয়াতে উল্লেখ আছে— فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (অতঃপর তারা যখন ইদ্দতকালে পৌছে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে)।

হাদীস শরীফে এসেছে, হুজুর (সা.) হযরত উমর (রাযি.)কে নির্দেশ দিলেন যখন তার ছেলে নিজ স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় এক তালাক দিলেন— مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا (তোমার ছেলেকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়।)

তাছাড়া হুজুর (সা.) হযরত সাওদা বিনতে জামআ (রাযি.)কে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আর রাজআতের ব্যাপারে ইজমায়ে সাহাবা সংঘটিত হয়েছে।

قوله : وَ تَصِحُّ الْعِدَّةِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে এক বা দুতালাকে রেজঈ প্রদান করে তবে ইদ্দতের ভেতর স্ত্রীকে তার সম্মতি ছাড়াই রাজআত করার ক্ষমতা রাখে। স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন না হওয়ার দলীল হল—পবিত্র কোরআনের আয়াত— وَ بُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ এবং অপর আয়াত فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ আয়াত দ্বয়ে শর্তহীনভাবে রাজআতের উল্লেখ স্বামীদের প্রতি করা হয়েছে। স্ত্রীর এতে সম্মতি বা অসম্মতির কোন উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর হাদীসে হুজুর (সা.) বলেন— مرابنك فليراجعها উক্ত হাদীসে ও স্ত্রীর সম্মতি বা অসম্মতির কোন উল্লেখ করা হয়নি। তাই রাজআতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সন্তুষ্টির কোন প্রয়োজন নেই।

আর ইদ্দত বিদ্যমান থাকা এজন্য প্রয়োজন রাজআতের মর্ম হচ্ছে নতুন করে বিবাহ নয়। বরং পূর্বের বিবাহের মালিকানাকে ফিরিয়ে আনা বা অব্যহত রাখা। তাই তো পবিত্র কুরআন শরীফে امساك। শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, ধরে রাখা। আর স্বামীর সত্বকে অব্যাহত রাখা তখনই সম্ভব যখন ইদ্দতের মধ্যে রাজআত করা হয়। কেননা, ইদ্দত শেষ হলে স্বামী সত্ব বিদ্যমান থাকে না বিধায় তা অব্যাহত রাখার প্রশ্ন উথাপিত হবে না।

قوله : بِرَاجَعْتُكِ الخ : তালাকে রেজঈর এর পর স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার পদ্ধতি হচ্ছে দু প্রকার :

(১) স্পষ্ট শব্দ দ্বারা। যেমন স্বামী বলল رَاجَعْتُكِ (আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম) কিংবা راجعتُ امرأتى (আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম)। এ প্রকার বাক্য দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে কারো কোন দ্বিমত নেই। رجعتك - رددتك - امستك - ارتجعتك। শব্দগুলোও স্পষ্ট শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এসব

শব্দের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন নেই।

(২) রাজআতের দ্বিতীয় প্রকার শব্দ হচ্ছে ইঙ্গিতবাচক শব্দ। এ প্রকার শব্দের কথাই গ্রন্থকার (রহ.) وَ بِمَا يُوجِبُ الْمُصَاهَرَةَ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। যার মর্ম হচ্ছে ঐ ক্রিয়াসমূহ যা দ্বারা হুরমতে মুসাহারা তথা বৈবাহিক মুহাররামাত সাব্যস্ত হয়। যেমন, সহবাস করা, চুম্বন করা, কামভাবসহ স্পর্শ করা। স্ত্রীর যৌনাঙ্গের প্রতি তাকানো। সুতরাং এ ধরনের ইঙ্গিত বাচক কর্ম দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হবে। ইহা আমাদের মাযহাব। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহ.) হযরত হাসান বসরী (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) প্রমুখদের অভিমত। আর ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে এসব ইঙ্গিতবাচক শব্দাবলী বা কাজ দ্বারা যদি রাজআতের নিয়ত করে তবে রাজআত সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় রাজআত সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে বাকশক্তি সম্পন্নদের ক্ষেত্রে মৌখিক স্বীকারুক্তির দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হবে।

ইঙ্গিতবাচক শব্দ বা কাজ দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হবে না। তবে হা যদি স্বামী বোবা হয় তবে তার ইঙ্গিত বা কর্ম কথা বলার পর্যায়ে বিধায় তার ক্ষেত্রে ইঙ্গিত বা কর্ম রাজআত সাবিতকারী হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রাজআত করাকে নতুন বিবাহের পর্যায়ে রেখেছেন। এজন্য তার মতে স্ত্রীকে মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে হবে।

আর আমাদের মতে রাজআত হল পূর্বের বিবাহকে বহাল রাখা। এজন্য তালাকে রেজঈ পরবর্তীতে ফিরিয়ে নেয়াকে আল কুরআনের ভাষায় امساك 'ধরে রাখা' বলা হয়েছে। আর উচ্চারণের মতো কখনো কখনো কর্ম দ্বারাও অব্যাহত রাখা হয়। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খেয়ার বা ইচ্ছাধিকার রহিত করণের বিষয়টিতে কর্ম অব্যাহত রাখার প্রমাণ। অর্থাৎ, কেহ তিনদিনের ইচ্ছাধিকার রহিত করনের ভিত্তিতে কোন বাদী বিক্রয় করল। এ সময়ের ভেতর সহবাস করলে তা মালিকানা অব্যাহত রাখার প্রমাণ হবে। এমনিভাবে তালাকে রেজঈর ক্ষেত্রে ইদ্দত অবস্থায় স্বামী সহবাস করলে বিবাহ অব্যাহত রাখার প্রমাণ হবে। আর রাজআত এমন সব কর্ম দ্বারা সাব্যস্ত হবে যা বিবাহের সাথে বিশিষ্ট। এজন্য আমাদের মতে সহবাস, চুম্বন দেয়া, কামভাব সহকারে স্পর্শ করা বা যৌনাঙ্গের প্রতি তাকানো বা তার মতো ক্রিয়াবলী দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَالْإِشْهَادُ مَنْدُوبٌ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী রাজআতের উপর দুজন সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব। এভাবে যে, স্বামী দুজন মুসলমান পুরুষের সামনে বলবে তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আমার স্ত্রীকে রাজআত করলাম। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দুটি মতের মধ্যে এক মত অনুযায়ী সাক্ষী ছড়া রাজআত শুধু হবে না। তার দলীল হল : আল্লাহ তা'আলার বাণী—

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ

অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতে পৌছে তখন তাদেরকে উত্তম পন্থায় রেখে দেবে কিংবা উত্তম পন্থায় বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এবং তোমাদের মধ্যে থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখ।

উক্ত আয়াতে اشهدوا যা আমর এর সীগা যা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। তাই রাজআতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা পরিহায্য।

আমাদের দলীল হল : রাজআত সংক্রান্ত কুরআন হাদীসে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ থাকলে ও সাক্ষীর কথা উদৃত নেই।

যেমন (১) وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ তাদের স্বামী তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। (সূরা বাকারা-২২৮)

(২) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ - তখন তাদেরকে উত্তম পন্থায় রেখে দেবে। (সূরা তালাক-২)

(৩) اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ তালাকে রাজঈ হল দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়ামানুযায়ী রাখবে। (সূরা বাকারা-২২৯)

(৪) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا - তবে তাদের উভয় পরস্পরকে ফিরিয়ে নিতে কোন পাপ নেই। (সূরা বাকারা-২৩০)

(৫) হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর হাদীস (যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে) এতে হুজুর (সা.) ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ সাক্ষ্যের শর্ত ছাড়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন— مُرْاِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا (তোমার ছেলেকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়।) উক্ত আয়াত ও হাদীসের কোথাও সাক্ষ্য রাখার কথা ব্যক্ত করা হয়নি বিধায় সাক্ষ্য রাখা হল কুরআন ও হাদীসের مطلق (শর্তমুক্ত) কে مقيد (শর্তযুক্ত) করা লাযিম আসে। যা মূলত জায়েয নয়। আর আমাদের সাক্ষ্য ওয়াজিব না হওয়ার যুক্তি হল রাজআত হচ্ছে বিবাহকে অব্যাহত রাখার নাম। সুতরাং তাতে সাক্ষ্য প্রয়োজন হয় না। যেমন, ইলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সাক্ষী প্রয়োজন হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল সম্বলিত আয়াতের উত্তর হচ্ছে : উক্ত আয়াত দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণ করা সর্বোচ্চ মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। কেননা, বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সকলের মতে সাক্ষ্য রাখা মুস্তাহাব। অথচ বিচ্ছেদের সাথেই সাক্ষ্যের কথা উদ্ধৃত হয়েছে বিধায় রেজআতের ক্ষেত্রেও তা মুস্তাহাব হবে।

قوله : وَ لَوْ قَالَ بَعْدَ الْعِدَّةِ الخ : ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে আমি তোমাকে ইদ্দত থাকাকালীন সময়ে ফিরিয়ে নিয়েছি। আর স্ত্রী তা সত্যতা স্বীকার করে, তবে রাজআত সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে তবে স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামী এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছে যা বর্তমান সময়ে তার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে না। তাই সে এ বিষয়ে অভিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী যদি তা সত্যায়ন করে তবে তার উপর থেকে অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। আর যদি স্ত্রী তা স্বীকার করে না, তবে সে অভিযুক্ত থেকে যাবে বিধায় তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি ইদ্দত থাকা অবস্থায় স্বামী বলে, আমি তোমাকে রাজআত করেছি, আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবেও রাজআত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে স্বামী এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছে যা ইচ্ছা স্বামী করলে বর্তমানেও কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে। তাই সে স্ত্রীর অস্বীকার করলেও অভিযুক্ত হবে না, বিধায় এক্ষেত্রে স্বামীর কথা গ্রহনযোগ্য হবে।

قوله : كَرَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً الخ : স্বামীর তার তালাকে রেজঈ প্রাপ্তা স্ত্রীকে বললো- رَاجَعْتُكِ আমি তোমাকে রাজআত করলাম। আর স্ত্রী বলল, আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে রাজআত সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এর অনুরূপ মতামত। তবে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে রাজআত শুদ্ধ হবে।

তাদের দলীল হল : রাজআত ইদ্দতের সাথে মিলিত হয়েছে। কেননা, ইদ্দত শেষ হওয়ার সংবাদ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত ইদ্দত থাকাটাই স্বাভাবিক। আর ইদ্দত অবস্থায় রাজআত করা শুদ্ধ। সুতরাং রাজআত স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার সংবাদ প্রদানের পূর্বে সংঘটিত হওয়ায় রাজআত করা শুদ্ধ হলো। যেমন, স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার সংবাদ প্রদানের পূর্বে যদি স্বামী তালাক প্রদান করে আর স্ত্রী বলে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, তবুও তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও রাজআত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : রাজআতের শব্দ উচ্চারণ হয়েছে ইদ্দতের পর। কেননা, ইদ্দত শেষ হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী আমানতদার। সে ভিন্ন তা জানা অসম্ভব। মহিলাদের জরায়ুতে কি আছে কি না তা সংশ্লিষ্ট মহিলাই জ্ঞাত। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ— لَايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى اَرْحَامِهِنَّ - মহিলাদের জন্য বৈধ নয় আল্লাহ্ তাআলা তদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা। মোটকথা, স্ত্রীর ইদ্দত সমাপ্তির সংবাদ প্রমাণ হল যে, রাজআতের সংবাদ প্রদানের পূর্বেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে

গেছে। আর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আর কোন রাজআত হতে পারে না। বিধায় আলোচ্য মাসআলার রাজআত ছাবিত হবে না।

আর সাহাবাইন (রহ.) এর কিয়াসের জবাব হল : এমতাবস্থায় তালাক পতিত হয় কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান আর মতানৈক্য পূর্ণ মাসআলা দ্বারা অন্য মাসআলার কিয়াস করা বৈধ নয়। তাছাড়া যদিও মেনে নেই যে, এমতাবস্থায় তালাক পতিত হয়, তবুও তা দ্বারা কিয়াস করা যাবে না। কেননা, তালাক তো ইদ্দত শেষ হওার পরও স্বামী স্বীকৃত দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে রাজআত শুধু স্বামীর স্বীকৃতি দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং তালাকের বিষয় আর রাজআতের বিষয় একটি অপরটি থেকে পৃথক বিধায় তা দ্বারা কিয়াস করা বৈধ নয়।

قوله : وَ لَوْ قَالَ زَوْجُ الْاَمَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ الخ : যদি কোন দাসীর স্বামী ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর বলে আমি তোমাকে ইদ্দত চলাকালীন রাজআত করেছি, তবে এ মাসআলার চারটি অবস্থা হতে পারে। (১) স্বামীর কথা দাসী ও তার মনিব উভয়েই সত্যায়ন করে। এ সুরতে সর্বসম্মতিক্রমে রাজআত সাবিহ হবে।

(২) স্বামীর কথা দাসী ও তার মনিব উভয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে রাজআত সাব্যস্ত হবে না।

(৩) স্বামীর কথা দাসী প্রত্যাখ্যান করে আর মনিব তা স্বীকৃতি প্রদান করে। তবে জমহুর ফুকাহা তথা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম যুফার (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমুখদের মতে স্ত্রীর (দাসীর) কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং রাজআত সাব্যস্ত হবে না।

আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে রাজআত সাব্যস্ত হবে এবং মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের দলীল হচ্ছে : ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর দাসীর সম্ভোগ অঙ্গের মালিক হয় মনিব। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে মনিব স্বামীর অনুকুলে দাসীর যৌন সম্ভোগের স্বীকৃতি প্রদান নিজের একান্ত হকের স্বীকৃতির নামান্তর। (যা সে স্বামীকে প্রদান করতে সম্মত হয়েছে)। কাজেই তার একথা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। তা এমন হল যেমন, দাসীর বিপক্ষে মনিবের বিবাহ-স্বীকৃতির সমতুল্য হলো।

জমহুর ফুকাহায়ে কেরামগণের দলীল : রাজআতের হুকুম প্রমাণিত হওয়া ইদ্দত বাকী থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, রাজআত করার সময় ইদ্দত বাকী থাকলে রাজআত সাব্যস্ত হবে। আর যদি ইদ্দত বাকী থাকে না তবে রাজআত প্রমাণিত হবে না। আর ইদ্দত বাকী থাকা বা না থাকা স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট যদি স্ত্রী ইদ্দত বাকী থাকার কথা ব্যক্ত করে তবে রাজআত প্রমাণিত হবে। আর যদি ইদ্দত বাকী নেই বলে উদ্ধৃত করে তবে রাজআত সাব্যস্ত হবে না। আর ইদ্দত বাকী থাকা বা না থাকার সংবাদ একমাত্র স্ত্রীলোকগণই দায়বদ্ধ। কেননা, তারা এ বিষয়ের আমানতদার।

(৪) স্বামীর কথা স্ত্রী (দাসী) স্বীকৃতি প্রদান করে আর দাসীর মনিব তা প্রত্যাখ্যান করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, দাসীর সম্ভোগ-অঙ্গের একান্ত মালিক হল মনিব। তাই এ সূরতে স্বামী হচ্ছে مدعى তথা দাবীদার। আর মনিব হচ্ছে منكر তথা অস্বীকারকারী। আর ইহাতো অতি প্রসিদ্ধ কায়দা যে مدعى নিকট প্রমানাদী বিদ্যমান না থাকলে منكر তথা অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। বিধায় এক্ষেত্রে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বিশুদ্ধতম মত ইহা যে এক্ষেত্রে মনিবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, আপাতদৃষ্টিতে দাসী তার ইদ্দত পূর্ণ করেছে। ফলে বাহ্যিকভাবে মনিব তার দাসীর সাথে সহবাসের অধিকার অর্জন করেছে। তাই দাসীও তার স্বামীর কথার ভিত্তিতে যদি রাজআত সাব্যস্ত করা হয় তবে মনিবের তার দাসীর সাথে সহবাসের অধিকার রহিত হয়ে যায়। অথচ সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি ছাড়া অন্যের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার রহিত করা যায় না। তাই আলোচ্য মাসআলার মনিবের সুপ্রতিষ্টিত অধিকার দাসীর কথা দ্বারা রহিত করা যায় না।

وَتَنْقَطِعُ إِنْ طَهُرَتْ من الْحَيْضِ الْأَخِيرِ لِعَشَرَةٍ وَإِنْ لم تَغْتَسِلْ وَلِأَقَلِّ لَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ أو يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ أو تَيَمَّمَتْ وَتُصَلِّي وَلَوْ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ أَقَلَّ من عَضْوٍ تَنْقَطِعُ وَلَوْ عَضْوًا لَا وَلَوْ طَلَّقَ ذَاتَ حَمْلٍ أو وَلَدَتْ وقال لم أَطَأْهَا رَاجَعَ وَإِنْ خَلَا بها ثُمَّ قال لم أُجَامِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَهَا لِأَقَلِّ من عَامَيْنِ صَحَّتْ تِلْكَ الرَّجْعَةُ إِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ من بَطْنٍ آخَرَ فَهِيَ رَجْعَةٌ كُلَّمَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثًا فِي بُطُونٍ فَالْوَلَدُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ رَجْعَةٌ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَزَيَّنُ وَنُدِبَ إِن لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتّٰى يُؤْذِنَهَا وَلَا يُسَافِرُ بِهَا حَتّٰى يُرَاجِعَهَا وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ -

অনুবাদ : ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে যাবে, যদি শেষ হায়েজের দশ দিনের মাথায় পবিত্র হয়। যদিও সে গোসল না করে। আর রক্ত স্রাব দশ দিনের কমে বন্ধ হলে গোসল করা কিংবা পূর্ণ একটি নামাজের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়া অথবা তায়াম্মুম করে নামাপ পড়া পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়া (রাজআত) রহিত হবে না। আর যদি স্ত্রী গোসল করে এবং এক অঙ্গের কম পরিমাণ শরীরের কোন স্থানে পানি পৌঁছাতে ভুলে যায়, তবে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ণ এক অঙ্গ হয় তবে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হবে না।

আর যদি স্বামী স্বীয় গর্ভবতী বা (তার ঔরসে) সন্তান প্রসবের পর বলে আমি তার সাথে সহবাস করিনি তবে সে রাজআত করতে পারবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করে অতঃপর বলে আমি তার সাথে সহবাস করিনি তারপর তালাক প্রদান করে তবে রাজআত করতে পারবে না। (তারপরও) যদি স্বামী স্ত্রীকে রাজআত করে অতঃপর রাজআতের পর দু বৎসরের ভেতরে সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত রাজআত সহীহ হবে। (আর যদি স্বামী বলে,) যদি তুমি সন্তান প্রসব কর তবে তুমি তালাক। আর সে সন্তান প্রসব করল। অতঃপর অন্যগর্ভে সন্তান প্রসব করল তবে রজআত সাব্যস্ত হবে। (আর যদি স্বামী বলে) যখনই কোন সন্তান প্রসব করবে তখনই তুমি তালাক। অতঃপর পৃথক পৃথক গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করল। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান রাজআতের কারণ (অর্থাৎ, প্রথম সন্তান দ্বারা এক তালাক দ্বিতীয় সন্তান দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হবে) রাজঈ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী সাজগোজ করবে। আর স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হল সে যেন তার (স্ত্রীর) অনুমতি ছাড়া তার (স্ত্রীর) ঘরে প্রবেশ না করে। আর তাকে রাজআত না করা পর্যন্ত তাকে নিয়ে ভ্রমণ করবে না। আর রাজঈ তালাক সহবাসকে হারাম করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَتَنْقَطِعُ إِنْ طَهُرَتْ الخ : রেজঈ তালাক প্রাপ্তা নারীর তৃতীয় হায়েজের রক্ত যদি পূর্ণ দশদিনের মাথায় শেষ হয় তবে স্ত্রীকে তার স্বামী আর রাজআত করার অধিকার পাবে না। এতে স্বামীর রাজআত করার বিষয়টি

স্ত্রীর গোসল করা পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে না। আর যদি দশ দিনের কমে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। তবে স্বামীর রাজআত করার অধিকার প্রলম্বিত হবে স্ত্রীর গোসল করা পর্যন্ত, অথবা পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা, যদি শেষ হায়েজ পূর্ণ দশ দিন অতিবাহিত হয়ে বন্ধ হয় তবে হায়েজের রক্ত পূণরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে না। দশ দিনের মাথায় রক্ত বন্ধ হওয়ায় এ মহিলা হায়েজ থেকে মুক্ত হল এবং তার ইদ্দতও শেষ হলো। এজন্য স্বামীর রাজআতের ক্ষমতাও রহিত হয়ে গেল। উক্ত মহিলা গোসল করুক বা না করুক। কেননা, স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হলেই স্বামী রাজআত করার বিধানও শেষ হয়ে যায়। তাই রাজআত করার বিষয়টি ইদ্দত থাকার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং যেহেতু পূর্ণ দশ দিন হায়েজ হয়ে বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই মহিলার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে বিধায় সাথে সাথেই রাজআত করার বিষয়টিও রহিত হয়ে গেল।

আর যদি তৃতীয় হায়েজ দশদিনের কমে বন্ধ হয় তবে স্ত্রীর হায়েজ পুনরায় আসার সম্ভাবনা থাকে বিধায় যথারীতি গোসল করা বা পবিত্র মহিলাদের উপর আবশ্যক হয় এমন কোন হুকুম তার উপর অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে তার হায়েজ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত হতে হবে। যখন এ মহিলা গোসল করে নিল বা গোসল করা অবস্থায় পূর্ণ একটি নামাজের ওয়াক্ত তার উপর দিয়ে চলে গেল যা তার জিম্মায় কাজা হিসাবে আরোপিত হল তখন সে সুনিশ্চিত হয়ে গেল যে তার আর হায়েজ আসবে না। তখনই তার ইদ্দত শেষ হওয়ার ফায়সালা প্রদান করা হবে।

সুতরাং তার ইদ্দত শেষ হওয়াকে যেভাবে প্রলম্বিত করা হলো তদ্রূপ রাজআতকেও প্রলম্বিত করা হবে। আর যদি সে নারী আহলে কিতাবীয়া হয়ে থাকে আর তার রক্ত দশ দিনের কমে বন্ধ হয় তবে তার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হওয়ার ফয়সালা প্রদান করা হবে। তাই তার রাজআত করার বিষয়টিও রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তার তো উপর শরীয়তের আরো কোন বিধান নেই যা দ্বারা সুদৃঢ়তা প্রমাণিত করা হবে। والله اعلم।

قوله : اَوْ تَيَمَّمَتْ وَ تُصَلِّىْ الخ : তালাকে রেজঈ প্রাপ্তা নারীর যদি তৃতীয় হায়েজ দশদিনের কমে শেষ হয় আর সে পানি ব্যবহারে অক্ষম হয় বা এমন কোন কারণ পাওয়া যায় যার কারণে তার জন্য পবিত্রতা অর্জন তায়াম্মুম ছাড়া সম্ভবপর না হয় তবে এ নারী তায়াম্মুত করে ফরজ বা নফর নামাজ পড়া পর্যন্ত স্বামীর জন্য রাজআত করা বৈধ। ইহাই শায়খাইন (রহ.) এর অভিমত।

অর্থাৎ, তাদের মতে শুধু তায়াম্মুত নয়, বরং তায়াম্মুমসহ নামায আদায় উভয়টার সাথে রাজআত করার বিয়ষটি সম্পৃক্ত হবে, ইহা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে শুধু তায়াম্মুম করার পরই রাজআত রহিত হয়ে যাবে। নামাজ পড়া পর্যন্ত স্বামীর জন্য রাজআত করাকে প্রলম্বিত করা যাবে না। ইমাম যুফার (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এরও মতামত তাই।

তাদের দলীল হল : পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া বা পানির অবিদ্যমান অবস্থায় তায়াম্মুত হল গোসলের স্থলাভিষিক্ত কেননা, গোসল দ্বারা যেভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। তায়াম্মুম দ্বারাই তদ্রূপ তাহারাত প্রমাণিত। যেমন মসজিদে প্রবেশ করা। কুরআন শরীফ স্পষ্ট করা। নামাজ পড়া ইত্যাদি।

সুতরাং হুকুমের ক্ষেত্রেও তা গোসলের ন্যায় হবে। তাই যেভাবে গোসল দ্বারা রাজআত রহিত হয়ে যায়। তদ্রূপ তায়াম্মুম দ্বারাও রাজআত রহিত হয়ে যাবে। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে নামাজ আদায় পর্যন্ত রাজআতকে স্বামীর জন্য প্রলম্বিত করা যাবে না।

শায়খাইন (রহ.) এর দলীল : তায়াম্মুত মূলত পবিত্রকারী নয়, বরং তা পানির মত পবিত্র না করে ময়লা যুক্ত করে। তদুপরি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীয়াত তা পবিত্রকারীরূপে সাব্যস্ত করেছে। কেননা, যদি তায়াম্মুমের অনুমোদন দেয়া না হয়, তবে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম বা পানির অবিদ্যমান অবস্থায় মানুষের উপর অনেক

হুকুম আহকাম রয়েছে যেমন, নামাজ ইত্যাদি পালন করতে সক্ষম হবে না। তাই এ হুকুম আহকাম পালন করার জন্য শরীয়াত তায়াম্মুম পবিত্রকারী হিসাবে অনুমোদন দিয়েছে। আর উক্ত প্রয়োজনিয়তা কেবল নামায আদায়ের বেলা প্রকাশ পাবে তার পূর্বে নয়। তাই প্রমাণিত হল, যদি তায়াম্মুমের পর নামাজ আদায় করা হয় না তবে তা পবিত্রকারী নয়। এজন্য আমরা বলি তায়াম্মুমের পর নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত রাজআত সাব্যস্ত হবে। শুধু তায়াম্মুম এর পর স্বামীর জন্য রাজআত করা রহিত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলীলের সারসংক্ষেপ হচ্ছে মূলত তায়াম্মুম দ্বারা উক্ত আহকামাদী আঞ্জাম দেয়া সহীহ হয়েছে তা দ্বারা নামাজ আদায় করা বৈধ হওয়ার ভিত্তিতে। কেননা, নামাযের ভেতর এসকল আহকাম পাওয়া যায়। যেমন, তেলাওয়াতে কুরআন, সিজদা, জামাতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ অর্থাৎ, নামাজ যেহেতু এসকল কর্মসমূহকে বেষ্ট করে আর তা নামাজে বৈধ বিধায় নামাজের বাহিরে তা বৈধ। এ কারণে নয় যে, তায়াম্মুম মূলত গোসলের মত পবিত্রকারী।

قوله : إِغْتَسَلَتْ وَ نَسِيَتْ الخ : যদি দশ দিনের কমে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায় আর স্ত্রী গোসল করে নেয়, কিন্তু শরীরে কিছু পরিমাণ শুষ্ক থেকে যায়, তবে তার ব্যাখ্যা হল এই যদি শুষ্ক অংশের পরিমাণ এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি হয়। তবে স্বামী রাজআত করতে পারবে। তা রহিত হবে না। আর যদি শুষ্ক অংশ এক অঙ্গের চেয়ে কম হয় তবে রাজআত করতে পারবে না। তা রহিত হয়ে যাবে। ইহা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। আর সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ, যদি এক অঙ্গ বা তার বেশি শুষ্ক থেকে যায় তবে স্বামী রাজআত করতে পারবে না। আর এক অঙ্গের কম হলে স্বামী রাজআত করতে পারবে। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হচ্ছে পূর্ণ এক অঙ্গ এবং তার চেয়ে কমের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে এক অঙ্গের কম তা পরিমাণে স্বল্প হওয়ার কারণে এতে এ সন্দেহ বিদ্যমান থেকে যায় যে, হতে পারে তাতে পানি পৌঁছে ছিল কিন্তু তা এখন শুকিয়ে গেছে বা এও সন্দেহ থেকে যায় যে, হতে পারে তাতে পানি পৌঁছেনি। তাই আমরা সতর্কতার ভিত্তিতে বলি যে রাজআত করা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় মহিলা অন্য বিবাহ বসতে পারবে না। কেননা, একান্ত যদি এ শুষ্ক অংশ মূলভাবে শুষ্ক থেকে যায় তবে তো মহিলা পবিত্র হলো না, বরং তার মধ্যে حدث বাকী থাকল। আর حدث বাকী থাকাতে তার ইদ্দত পূর্ণ হল না। আর এক ইদ্দত পালন করা অবস্থায় অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ নয়। আর যদি এক বা তার চেয়ে বেশী শুষ্ক থেকে যায় তবে তো তার গোসল হল না। আর ইহা অসম্ভব যে, এক অঙ্গ বা তার চেয়ে বেশি অংশ ধৌত করা হয়েছিল আর এখন তা শুষ্ক হয়ে গেছে। একারণে আমরা বলি যেহেতু তার গোসল হয়নি। বিধায় পবিত্রতা অর্জিত হয়নি এজন্য তার ইদ্দতও বাকী রয়েছে। আর স্ত্রীর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী তাকে রাজআত করার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে।

قوله : وَ لَوْ طَلَّقَ ذَاتَ حَمْلٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে কিংবা তার স্ত্রী তার বৈবাহিক বন্ধনে থাকা অবস্থায় সন্তান প্রসবের পর তাকে তালাক প্রদান করে এবং স্বামী বলে আমি তার সাথে সহবাস করিনি। তবে তার পর যদি স্বামী চায় তাকে রেজআত করতে তাহলে রাজআত করতে পরবে। আর স্বামীর উক্তি আমি তার সাথে সহবাস করিনি বলা গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং তা প্রত্যাখ্যাত হবে কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রীর গর্ভ এতটুকু সময়ের সাথে প্রকাশ হওয়া যে তা উক্ত স্বামীর সঞ্চারিত গর্ভ হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে তা স্বামীর সঞ্চারিত গর্ভ হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন, তালাক প্রদানের পর যদি স্ত্রী ছয় মাসের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তান তালাক দাতা স্বামীর বলে বিবেচিত হবে। তার দিকেই সন্তানের পিতৃপরিচয় সম্পৃক্ত হবে।

সুতরাং সন্তানের পিতৃ পরিচয় স্বামীর দিকে হওয়ায় সে সহবাসকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কারণ, সহবাস ছাড়া সন্তানের কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং স্বামী সহবাসকারী সাব্যস্ত হওয়ায় স্ত্রীর উপর তার মালিকানাস্বত্ব

সুদৃঢ় হল এবং স্ত্রী সহবাসকৃতা সাব্যস্ত হবে। আর সহবাসকৃতাকে তালাক প্রদান করাতে তাকে রজআত করা বৈধ। তাই এ সূরতে স্বামীকে রাজআতের বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর স্বামীর কথা আমি সহবাস করিনি তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

তবে হা এর উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সন্তানের পিতৃপরিচয়ের বিষয়টি হল دلالة তথা নির্দেশনা যেমন হুজুর (সা.) এর হাদীস- اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ শয্যা যার সন্তান তার। হাদীসে রয়েছে— اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ। শয্যা যার সন্তান তার। আর ব্যভিচারী বঞ্চিত। সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের ক্ষেত্রে হাদীসদ্বয় হচ্ছে دلالة তথা নিদর্শনা। আর স্বামীর উক্তি আমি সহবাস করিনি। তাহল صريح তথা স্পষ্ট। আর دلالة এবং صريح একত্র হলে صريح এর অগ্রাধিকার হয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় صريح এর উপর دلالة এর অগ্রাধিকার হয়ে গেল। অথচ এমনটি না হওয়া উচিত।

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব হচ্ছে : دلالة (নির্দশনা) বিষয়টি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পক্ষ থেকে। আর صريح (স্পষ্ট) বিষয় হচ্ছে মানুষের কথা। যা সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা মিথ্যা হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তাই রাসূল (সা.) এর কথা সাধারণ মানুষের স্পষ্ট কথা বা শব্দের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কথাই সব সময় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এজন্য এখানে صريح এর উপর دلالة অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হল।

قوله : وَ اِنْ خَلَابِهَا الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হয়। এভাবে যে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় কিংবা পর্দা টেনে দেয় এবং বলে আমি তার সাথে সহবাস করিনি অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তবে সে আর রাজআত করার অধিকারী হবে না। কেননা, সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে উক্ত স্ত্রী ইদ্দত পালন ছাড়াই বায়েনা হয়ে যায় বিধায় সে রাজআত করতে পারবে না। আর স্বামী সহবাসের কথা অস্বীকার করছে। সুতরাং তার অধিকার রহিত করার ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর রাজআত হল স্বামীর অধিকার। তাই রাজআত রহিত করার ক্ষেত্রে স্বামীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَ اِنْ رَجَعَهَا الخ : 'আমি তার সাথে সহবাস করিনি' স্বামীর একথা বলার পরও যদি স্ত্রীকে রাজআত করে অতঃপর স্ত্রী দু বৎসরের ভেতর কোন সন্তান জন্ম দেয় তবে তার পূর্বে রাজআত শুদ্ধ হবে। আর উক্ত দু বৎসরের গণনা রাজআতের সময় থেকে গণনা করা যাবে না বরং তালাক প্রদানের সময় থেকে গণনা করতে হবে। রাজআত শুদ্ধ হওয়ার দলিল হল : উক্ত সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথেই হবে। কেননা, স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার করেনি। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে সন্তান দু বৎসর পর্যন্ত মায়ের পেটে থাকতে পারে কাজেই উক্ত সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথে হওয়াই প্রমাণ করে যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। নতুবা সন্তানের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। নতুবা সন্তানের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস কখন করেছে তালাকের পূর্বে না পরে এ বিষয়ে আমরা বাধ্যতামূলকভাবে বলবো যে স্বামী তালাকের পূর্বেই সহবাস করেছে। কেননা, তালাকের পর তার সাথে সহবাস করা হারাম। কারণ সহবাসহীনা স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে তা বায়েনা হয়ে যায়। আর এমতাবস্থায় সহবাস করা হারাম, আর মুসলমান হারাম কাজে জড়িত হতে পারে না এটাই স্বাভাবিকতা। এজন্য আমরা বাধ্যতামূলকভাবে সহবাসকে তালাকের পূর্বে নির্ধারিত করব। الله اعلم -

قوله : وَ اِنْ وَلَدَتْ فَاَنْتِ طَالِقٌ الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তুমি যদি সন্তান প্রসব কর তবে তুমি তালাক, অতঃপর স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। তবে তো সে তালাক প্রাপ্ত হল অতঃপর যদি অন্ততঃ ছয় মাসের ব্যবধানে স্ত্রী অন্য সন্তান প্রসব করে তবে স্বামী রাজআতকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

দলীল : স্ত্রী প্রথম সন্তান প্রসবের পর তালাক প্রাপ্ত হয়ে ইদ্দত পালনরত। কেননা, এমতাবস্থায় তার উপর

ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হল তখন প্রমাণিত হল স্ত্রীর ইদ্দত পালনকালীন সময়ে স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে এবং স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে এবং সন্তানও প্রসব করেছে। তাছাড়া মহিলাও তার ইদ্দত শেষ হওয়ার এখনো কোন ঘোষণা দেয় নাই। এজন্য উক্ত স্বামী তার তালাকে রাজঈ প্রাপ্তার সাথে সহবাসকারী প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে রাজআতকারী সাব্যস্ত হবে। স্বামী তা প্রত্যাখ্যান করলে ও প্রত্যাখ্যাত হবে না। কেননা, সন্তানের পিতৃপরিচয় তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে।

قوله : كُلَّمَا وَلَدْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ الخ : আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে كُلَّمَا وَلَدْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (তুমি যখনই সন্তান প্রসব করবে তখনই তালাক) অতঃপর স্ত্রী পৃথক গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করল। অর্থাৎ প্রতি দু' সন্তানের মাঝে সর্ব নিম্ন ছয় মাসের ব্যবধান। তবে তার হুকুম হল প্রথম সন্তান প্রসবের পর এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। অতঃপর সর্বনিম্ন ছয় মাসের পর দ্বিতীয় সন্তান প্রসব দ্বারা প্রথমে রাজআত সাব্যস্ত হবে। তারপর দ্বিতীয় তালাকে রাজঈ পতিত হবে। রাজআত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে, এ দ্বিতীয় সন্তান। কেননা, প্রথম সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হল যে, স্বামী তার তালাকে রাজঈ প্রাপ্তার সাথে সহবাস করেছে। যার ফলশ্রুতিতে এ দ্বিতীয় সন্তানের আগমন। বিধায় রাজআত প্রমাণিত হল। আর তালাক পতিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, স্বামীর শর্ত তথা كلما শব্দ যোগে শপথ করার কারণ। কেননা, তা পুনঃপুনঃ হওয়ার দাবী করে সুতরাং তার جزاء শর্ত পুনঃপুনঃ হওয়ার দাবী করে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্তানের জন্মে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হওয়ায় আবার তার উপর ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হলো। কিন্তু যখন অন্তত ছয় মাসের ব্যবধানে তৃতীয় সন্তান প্রসব করল তখন প্রথমত রাজআত প্রমাণিত হবে এবং সাথে সাথেই তালাক পতিত হবে। কেননা, তৃতীয় সন্তান প্রসব হওয়া একথার দাবীদার যে স্বামী তার তালাকে রাজঈ প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। আর كلما শব্দের চাহিদা অনুযায়ী তৃতীয় তালাক পতিত হবে। এখন এ মহিলা যেহেতু ঋতুবতীদের অন্তর্ভুক্ত তাই তার উপর হায়েজের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হয়ে পড়ল।

قوله : وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ الخ : তালাকে রাজঈ প্রাপ্তা নারীর জন্য উচিত সে যেন সাজজোগ করে থাকে। কেননা, তালাকে রাজঈর উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক এখনো পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। এজন্যই তো রাজঈর পর উত্তরাধিকারী সহ বিবাহের অন্যান্য সকল আহকামাদী বিদ্যমান থাকে। তাই ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন যে তালাকে রাজঈর পর স্ত্রীকে রাজআত করা মুস্তাহাব। আর স্ত্রীর সাজগোজ ইত্যাদি রাজআতের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী। এজন্য তালাকে রাজঈ প্রাপ্তা নারী সাজগোজ করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ।

قوله : وَ نُدِبَ اَنْ لَا يَدْخُلَ الخ : রাজঈ তালাক প্রাপ্তার স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হল যে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে তার অনুমতি নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করা, যদি স্বামীর রাজআত করার ইচ্ছা না থাকে। এমনও হতে পারে যে, স্ত্রীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করল আর স্ত্রীর এমন কোন অঙ্গ থেকে কাপড় সরে যেতে পারে যার প্রতি তার তাকানোর দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যার দরুন স্বামী পুনরায় তাকে তালাক প্রদান করতে হবে এবং স্ত্রীর উপর অযথা ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। এজন্য স্বামী তার ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি নেয়া মুস্তাহাব।

قوله : وَ لَا يُسَافِرُ بِهَا الخ : রাজঈ তালাক প্রাপ্তা নারীকে নিয়ে স্বামী সফরে বের হতে পারবে কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তাকে রাজআত এর উপর সাক্ষী নির্ধারণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিয়ে সফরে বের হতে পারবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে স্বামী তাকে সফরে নিয়ে যেতে রাজআতের উপর সাক্ষী নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, তালাকে রাজঈ এর পর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বহাল থাকে। আর বিবাহ বহাল থাকার প্রমাণ হচ্ছে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী এমতাবস্থায় সহবাস করা বৈধ। সুতরাং বিবাহিত স্ত্রীকে যেভাবে সফরে নিয়ে যেতে সাক্ষ্য প্রমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনিয়তা নেই, তদ্রূপ তালাকে রাজঈ প্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সফরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে রাজআতের উপর সাক্ষ্য প্রমাণ নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল হল : আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَاتُخْرِجُوْاهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ (তোমরা তাদেরকে আপন ঘর থেকে বের করে দিও না।)

মুফাসসিরিনে কেরামের মতে উক্ত আয়াত তালাকে রাজঈ প্রাপ্তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হল যে, স্বামীর জন্য তালাকে রাজঈ প্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সফরে বের হওয়া বৈধ নয়। তাছাড়া যুক্তি হল যে, তালাক প্রদানের পর থেকে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাওয়া। কেননা, তালাক অর্থই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন করা কিন্তু তালাকে রাজঈর ক্ষেত্রে স্বামীর উপর অনুগ্রহ করে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে রাজআত করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যাতে সে চাইলে রাজআত করতে পারে। আর যদি স্বামী রাজআত করে না এমতাবস্থায় ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তবে তো ইদ্দত চলাকালীন সকল হায়েয ইদ্দতের মাঝে গণ্য হবে। কেননা, স্বামী রাজআত না করাটা একথার প্রমাণ যে তার রাজআত করার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং এ আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, তালাকের অস্তিত্ব লাভ করা থেকেই বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যায় তাই তা তালাকে বায়েনার মতো হয়ে গেল। তাই যেভাবে তালাকে বায়েনা প্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে সফরে যাওয়া যায় না তদ্রূপ এ মহিলাকেও নিয়ে সফরে বের হওয়া যাবে না। তবে হা যদি প্রয়োজন পড়ে তবে আগে তাকে রাজআত করতে হবে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতে তাহলে তার ইদ্দত বাতিল হবে। আর ইদ্দত বাতিল হলে পর সে অন্য সাধারণ স্ত্রীদের মত হয়ে গেল। তাই যেভাবে অন্য সাধারণ স্ত্রীকে নিয়ে সফরে বের হওয়া বৈধ তাকেও সফরে নিয়ে বের হওয়া স্বামীর জন্য বৈধ।

قوله : وَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَايُحَرِّمُ الْوَطْىَ الخ : তালাকে রাজঈ সহবাসকে হারাম করে কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তালাকে রাজঈ সহবাসকে হারাম করে না। বরং ইদ্দত অবস্থায় স্বামীর জন্য যে কোন সময় তা বৈধ এবং সহবাস পাওয়া গেলে স্বামী রাজআতকারী সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তালাকে রাজঈ প্রাপ্তার সাথে স্বামীসহবাস করতে পারবে না। ইমাম আহমদ (রহ.) এর ও অভিমত অনুরূপ। তাদের দলীল হচ্ছে সহবাস হালাল। কারণ সম্ভোগ সত্বের মালিক হওয়া তা বৈবাহিতভাবে বা দাসত্বের মালিকানা হিসাবে। আর এখানে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে সহবাস হালাল ছিল। কিন্তু যখন বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী তালাক পাওয়া গেল তখন আর ক্ষেত্র বাকি না থাকায় তার জন্য সহবাস হালাল হবে না চাই এ তালাক রাজঈ হোক বা বায়েন।

আমাদের দলীল হচ্ছে : তালাকে রাজঈ পতিত হওয়ার পর স্ত্রীকে তার ইদ্দতের ভেতর রেজআত করতে পারবে। সুতরাং এ রাজআত করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তাহল দু ধরনের। স্বামীর মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা বা হুরমাতে মুছাহারা বা বৈবাহিক মুহাররামাত সাব্যস্তকারী কোন কর্ম দ্বারা। সুতরাং সহবাস এ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই রাজঈ তালাক প্রাপ্তার সথে ইদ্দত অবস্থায় সহবাস হালাল হবে এবং এর ভিত্তিতে রাজআতও প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয় দলীল হল : রাজঈ তালাক প্রদানের পরও বিবাহ অব্যাহত থাকে এজন্যই তো রাজআতের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামতের কোনরূপ প্রয়োজন পড়ে না। আর যদি রাজঈ তালাকের পর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হত তবে এ নারী অপরিচিতা হয়ে যেত এবং তার সম্মতি ছাড়া কোনভাবেই রাজআত সাবিত হত না।

বিবাহ বিদ্যমান থাকার দলীল হল : স্বামী অনুশোচনার সময় যাতে তার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং স্বীয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। এজন্য রাজআতের ক্ষমতা রাখা হয়। তাই এটা স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। এথেকে অনুমেয় হয় যে, তা একক স্বামীর অধিকার। কেননা, যদি তার একক অধিকার না হত তবে তা অনুগ্রহ হত না। সুতরাং স্বামী রাজআতের ক্ষেত্রে একক হক্বদার হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, রাজআত করা বৈবাহিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকার প্রমাণ বৈবাহিক সম্পর্কের সূচনার নাম নয়। আর ইহা তো সতঃসিদ্ধ কথা যে বৈবাহিক সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সহবাস করা হারাম নয়। এজন্য আমাদের মতে তালাকে রাজঈ প্রাপ্তার সাথে তার ইদ্দত অবস্থায় সহবাস করা বৈধ। আর এ সহবাস দ্বারা রাজআত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

فَصْلٌ : وَيَنْكِحُ مُبَانَتَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا لَا الْمُبَانَةَ بِالثَّلَاثِ لَو حُرَّةً وَبِالثِّنْتَيْنِ لَو أَمَةً حتى يَطَأَهَا غَيْرُهُ وَلَوْ مُرَاهِقًا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَتَمْضِي عِدَّتُهُ لَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَكُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ وَ إِنْ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي ما دُونَ الثَّلَاثِ وَلَوْ أَخْبَرَتْ مُطَلَّقَةُ الثَّلَاثِ بِمُضِيِّ عِدَّتِهِ وَعِدَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ له أَنْ يُصَدِّقَهَا إِنْ غَلَبَ على ظَنِّهِ صِدْقُهَا -

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : তালাকে বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দতের পরে বিবাহ করতে পারবে। তবে স্বাধীনা হলে তিন তালাকে বায়েনাকে আর দাসী হলে দু' তালাকে বায়েনাকে বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে (উক্ত স্বামী) ছাড়া অন্য কেহ বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সহবাস করে না। যদিও (দ্বিতীয় স্বামী) বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর হয় এবং তার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে যায়। তবে দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতে হবে না। (অর্থাৎ, দাসীর সাথে সহবাস তাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল বানাবে না) আর হালাল করার অর্থে বিবাহ মাকরূহ যদিও স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় স্বামী (প্রথম স্বামীর) তিন তালাক থেকে কম তালাককে শেষ করে দেবে। আর যদি তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার ইদ্দত এবং দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। আর অতিক্রান্ত সময় এর সম্ভাবনাও রাখে তাহলে প্রথম স্বামী তার স্বীকৃতি দিতে পারে যদি বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তার প্রবল ধারণা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত তালাকে রাজঈ এর সুরত সমূহের সংশোধনের নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর এখন থেকে তালাকে রাজঈ ছাড়া অন্যান্য তালাক সমূহের সংশোধন নিয়ে আলোচনা করতেছেন। এজন্য তা পৃথক অনুচ্ছেদ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

قوله : وَ يَنْكِحُ مُبَانَتَهُ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এক তালাকে বায়েন প্রদান করে অথবা স্বাধীনাকে দু তালাকে বায়েন প্রদান করে তবে স্বামী উক্ত স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা অবস্থায় বা ইদ্দতের পর বিবাহ করতে পারবে। (হালালার প্রয়োজন নেই)। কেননা, উক্ত মহিলা এখনও হালাল হওয়ার ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে। এ মহিলা মুসলিমা হওয়া ও মাহরাম না হওয়ার কারণে। তবে হা এ বিধান তিন তালাকে বায়েন না হওয়া পর্যন্ত।

قوله : لَا الْمُبَانَةَ بِالثَّلٰثِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্বাধীনা স্ত্রীকে তিন তালাকে বায়েন প্রদান করে অথবা দাসী স্ত্রীকে দু তালাকে বায়েন প্রদান করে তবে উক্ত স্ত্রী এ তালাকদাতা স্বামীর জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্য কোন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করছে না এবং সহবাসের পর তালাক প্রদানের পর কিংবা দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু বরণের পর সে ইদ্দত পালন করছে না। অতঃপর প্রথম স্বামী চাইলে তাকে বিবাহ করতে পারবে। অন্যথায় নয়।

দলীল হলো পবিত্র কোরআনের ঘোষণা—

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অতঃপর সে যদি তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে।

মুফাসসিরীনে কেরামগণের মতে এখানে তৃতীয় তালাকই উদ্দেশ্য। সুতরাং আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা চূড়ান্ত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে হলে দুটি শর্ত নির্ধারণ করেছি। প্রথম শর্ত দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার বিশুদ্ধ বিবাহ সংঘটিত হওয়া। সুতরাং নিকাহে ফাসেদ বা মনিব কর্তৃক সহবাস পাওয়ার ভিত্তিতে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কেননা, حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এ আয়াতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কে مطلقا (তথা সাধারণ)ভাবে রাখা হয়েছে। বিশুদ্ধ বিবাহ বা ফাসেদ বিবাহ কোনটাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর যা مطلقا ভাবে উল্লেখ হয় তা তার فرد كامل (পরিপূর্ণ সত্তা) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এজন্য এখানে مطلق বিবাহ দ্বারা পরিপূর্ণ বিবাহ উদ্দেশ্য হবে। আর বিশুদ্ধ বিবাহের মাঝে পরিপূর্ণ বিবাহ পাওয়া যায়। বিবাহে ফাসেদের মধ্যে পূর্ণতা পাওয়া যায় না এজন্য আমরা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়াকে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিশুদ্ধতম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে শর্ত যুক্ত করেছি। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক সহবাস পাওয়া। সুতরাং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু বিশুদ্ধভাবে আকদে নিকাহ পাওয়া গেলেই প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, বরং দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক সহবাস পাওয়া শর্ত এর দলীল : حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এ আয়াতের ইঙ্গিতার্থের ভিত্তিতে। তা হল এভাবে যে تنكح শব্দটি نكاح থেকে নির্গত যা সহবাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে عقد অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আর আয়াতের শেষে زوجا غيره দ্বারা আকদে নিকাহ বা বিবাহ বন্ধন উদ্দেশ্য। কেননা, বিশুদ্ধ আকদ তথা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া পৃথিবীর কেউ زوج বা স্বামী হতে পারে না। তাছাড়া যদি تنكح غيره দ্বারা পুণরায় আকদে নিকাহই উদ্দেশ্য হয় তবে আয়াতের অর্থে বারংবারতা সৃষ্টি হবে। আর যদি تنكح শব্দ দ্বারা সহবাসের অর্থ নিয়ে থাকি তবে অর্থের মাঝে নতুনত্ব সৃষ্টি হবে। আর পুণরাবৃত্তি থেকে নতুনত্ব উত্তম। এজন্য আমরা تنكح শব্দ থেকে সহবাসের অর্থ গ্রহণ করে বলি দ্বিতীয় স্বামী থেকে সহবাস পাওয়া শর্ত। তাছাড়া সহবাস শর্ত হওয়ার দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে, হাদীসে মাশহুর তা হল : হযরত রিফাআ (রাযি.) তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করে বলেন, রিফআ আমাকে তিন তালাক দিয়েছেন। অতঃপর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এর নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু তাকে সহবাসে খুবই দুর্বল পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কি তুমি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও। তিনি বললেন, হা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, لَا حَتّٰى تَذُوْقِى عُسَيْلَتَهٗ وَ يَذُوْقُ عُسَيْلَتَهٗ (না তুমি তার স্বাদ এবং তোমার স্বাদ গ্রহণ করার পূর্বে নয়)। হুজুর (সা.) এর একথায় সহবাসের ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হতে হলে দ্বিতীয় স্বামী থেকে সহবাস পেতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনার জন্য তিন তালাক আর দাসীর জন্য দুই তালাক হচ্ছে চূড়ান্ত তালাক।

قوله : لَايَمْلِكُ يَمِيْنُ الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে (যে অন্য ব্যক্তির দাসীও বটে) দুই তালাক প্রদান করে। অতঃপর তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে মনিব তার সাথে সহবাস করে তবে মনিবের সহবাস দাসীর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল সরূপ হবে না। কেননা, পবিত্র আয়াত তথা حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ উক্ত আয়াতে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়াকে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শর্ত করেছে। এটাতো অতি স্পষ্ট যে মনিব কখনো স্বামী বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। বিধায় মনিবের সহবাস প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী সাব্যস্ত হবে না।

قوله : وَ كُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْلِيْلِ الخ : যদি কেহ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়তে বিবাহ করে এবং বলে যে تَزَوَّجْتُكِ عَلٰى اَنْ اُحَلِّلَكِ (অর্থাৎ, আমি তোমাকে তোমার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার শর্তে বিবাহ করলাম) তবে এ দ্বিতীয় বিবাহ মাকরূহ হবে। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهٗ। - (যে হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করা হয় তারা উভয়ের প্রতি আল্লাহর

লা'নত)। উক্ত হাদীস হালাল শর্তে বিবাহের আকদের উপর প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যদি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়ত অন্তরে বিদ্যমান থাকে আর তা মুখে উচ্চারণ করে না, তবে সে লা'নাতের স্বীকার হবে না। তবে হা যদি হালাল করার শর্তে বিবাহ করে তবে তার এ বিবাহ মাকরূহ হলেও এ দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসের পর তালাকের পরবর্তী ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর জন্য বিবাহ করা হালাল হয়ে যাবে। কেননা, বিশুদ্ধ বিবাহের মধ্যে সহবাস পাওয়া গেছে। আর প্রথম স্বামীর জন্য ইহাই শর্ত উল্লেখ্য যে হালাল করার শর্তে বিবাহ করা বিশুদ্ধ নাকি নিকাহে ফাসেদ। সুতরাং আমাদের মতে দ্বিতীয় স্বামীর এ শর্ত। ফাসেদ হয়ে যাবে আর বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, শর্তে ফাসেদের ভিত্তিতে নিকাহ ফাসিদ হয় না, বরং শর্তটিই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

قوله : وَ يَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِى الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্বাধীনা স্ত্রীকে এক বা দুতালাক প্রদান করে এমতাবস্থায় স্ত্রী ইদ্দত শেষ করে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক প্রদান করে তারপর এ স্ত্রী তার ইদ্দত শেষ করে পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে শায়খান (রহ.) এর মতে উক্ত স্বামী পূর্ণ তিন তালাকের মালিক হবে। অথাৎ, প্রথম স্বামী নতুন করে তিন তালাকের মালিক হবে। আর দ্বিতীয় স্বামী যেভাবে প্রথম স্বামীর প্রথমোক্ত তিন তালাককে পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে তদ্রূপ প্রথম স্বামীর এক তালাক বা দু তালাককেও বিলুপ্ত করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমত হচ্ছে এমতাবস্থায় প্রথম স্বামীর এক বা দু তালাককে দ্বিতীয় স্বামী বিলুপ্ত করতে পারে না। বরং প্রথমে যদি প্রথম স্বামী এক তালাক দিয়ে থাকে তবে এখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে দুই তালাকের মালিক হবে। আর যদি প্রথমে দুই তালাক দিয়ে থাকে তবে এখন দ্বিতীয় বিবাহ করাতে সে এক তালাকের মালিক হবে। অর্থাৎ তার মতে প্রথম স্বামীর তিন তালাকের কমে তথা এক বা দুই তালাককে দ্বিতীয় স্বামী বিলুপ্ত করতে পারে না। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অভিমতও এটিই।

তাদের দলীল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

উক্ত আয়াতে فلاتحل له এর উদ্দেশ্য হল স্থায়ী নিষিদ্ধতা। আর উক্ত নিষিদ্ধতার শেষ হল, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ করা। কেননা, আয়াতে فلاتحل له من بعد এর حتى تنكح زوجا غيره বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত অংশের حتى অব্যয়টিকে সীমানা বর্ণনার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। আর যে বস্তুর সীমানা বর্ণনা করা হয় তা তার সীমায় গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম স্বামীর নিষিদ্ধতা দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম স্বামীর জন্য নিষিদ্ধতা সাবিত হয়না তবে তো তা দ্বিতীয় স্বামীর মাধ্যমে বিলুপ্ত করার প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। এজন্য প্রথম স্বামীর এক বা দু তালাক প্রদান করার পর তার সাথে হুরমত তথা নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হল না বিধায় দ্বিতীয় স্বামী তা বিলুপ্ত করতে পারবে না। সুতরাং প্রমাণিত হল, দ্বিতীয় স্বামী তিন তালাকের পর কম পরিমাণকে বিলুপ্ত করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় স্বামীর তালাক পরবর্তী ইদ্দত পালন শেষে প্রথম স্বামী একে বিবাহ করলে সে তিন তালাকের মালিক হবে না, বরং প্রথম বার যত তালাক দিয়েছিল তার অবশিষ্টগুলোর মালিক হবে। অর্থাৎ, প্রথম বার দুই তালাক দিয়ে থাকলে এখন এক তালাক। আর প্রথম বার এক তালাক দিয়ে থাকলে এখন দুই তালাকের মালিক হবে। শায়খাইন (রহ.) এর দলীল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী— لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ। উক্ত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ باب ماجاء فى الزوج الثانى এর অধীনে উল্লেখ করেছেন। তাই হালালকারী দ্বারা দ্বিতীয় স্বামী উদ্দেশ্য হবে। যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয় স্বামীকে হালালকারী অভিহিত করেছেন। আর হালালকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হালাল সাব্যস্তকারী। আর স্বামীর জন্য দ্বিতীয় বার এ স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল হওয়াটা পূর্বেকার হালাল এর অংশ বিশেষ নয়, বরং তা নতুন হিল্লাত হিসাবে নির্দিষ্ট হবে।

সুতরাং নতুন হিল্লাত পূর্ববর্তী হিল্লাত এর বিপরীত হবে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহ না করলেও সে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করা জায়েয ছিল, কিন্তু এ বিবাহের পর স্বামী অবশিষ্ট তালাকের মালিক হত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্বামীর মাধ্যমে হালাল সাব্যস্ত হল, আর এখন প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করল। তাই স্বামী পূর্ণ তিন তালাকের মালিক হবে। কেননা পূর্ণ হিল্লাত তিন তালাকের দ্বারাই হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হল, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য নতুনভাবে হিল্লাত সাব্যস্তকারী হবে। চাই প্রথম স্বামী তিন তালাকের কম তালাক প্রদান করুক বা তিন তালাকই প্রদান করুক। এ দুটোই সমান।

قوله : وَاَخْبَرَتْ مُطَلَّقَةٌ الخ : কেউ যদি তার স্বাধীনা স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে এমতাবস্থায় কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী বলল, যে ইদ্দত পালন করে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ হয়ে তার সাথে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক প্রদান করেছে এবং সে এ তালাকেরও ইদ্দত অতিবাহিত করে ফেলছে। আর বাস্তব অবস্থাও এমন যে উক্ত মহিলা যে সময়ে এতগুলো কাজ সম্পাদন করেছে বলে দাবী করেছে তা সংঘঠিত হতে পারে। তবে প্রথম স্বামী যদি ইচ্ছা করে তবে তার কথা গ্রহণ করতে পারে যদি সাবেক এ স্ত্রীর কথার সত্যতা সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়। কেননা, বিবাহ হয়তো দুনিয়াবী অথবা দ্বীনী বিষয় হতে পারে। দুনিয়াবী এ জন্য যে, স্ত্রী সম্ভোগ অঙ্গের বিনিময়ে মহর প্রাপ্ত হবে এবং স্বামী থেকে বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনিয় সামগ্রী প্রাপ্ত হবে। আর তা দ্বীনী এজন্য যে স্বামীর জন্য এ আকদে নিকাহ হওয়ায় স্বামী সম্ভোগ অঙ্গের মালিক হবে এবং তা ব্যবহার করতে পারবে। আর উল্লিখিত উভয় অবস্থায়ই একজন মুসলমানের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য। সুতরাং যদি বিবাহ দুনিয়াবী বিষয় হয় তবে তা দু প্রকার : দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার অর্থ বিদ্যমান থাকবে বা দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার অর্থ থাকবে না। আর বিবাহ এ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাই এ দ্বিতীয় প্রকার মুআমালাতের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। একজন হয়তো ন্যায় পরায়ণ হবে বা ফাসিক হবে। অনুরূপ সে একজন পুরুষ হবে বা মহিলা হবে। অনুরূপ গোলাম হউক বা স্বাধীন হউক। তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দ্বীনী বিষয় হয় তবুও একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এ ধরনের বিষয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথাই গ্রহণ করতেন। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় এক মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি সময় এগুলোর সম্ভাবনা রাখে এবং মহিলা সত্যবাদী হওয়ার প্রবল ধারণা হয়। উল্লেখ্য যে, মহিলার এসকল কর্ম আঞ্জাম দানের জন্য সর্বনিম্ন কত দিন হতে পারে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট প্রত্যেক তালাকের ইদ্দত সর্বনিম্ন ষাট দিন হবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে প্রত্যেক ইদ্দত উনচল্লিশ দিন করে হবে।

والتفصيل فى المطولات -

بَابُ الْإِيلَاءِ

পরিচ্ছেদ : ঈলা (শপথ করা)

هُوَ الْحَلْفُ عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ كَقَوْلِهِ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ كَفَّرَ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ وَإِلَّا بَانَتْ وَسَقَطَ الْيَمِينُ لَوْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَبَقِيَتْ لَوْ عَلَى الْأَبَدِ فَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا وَمَضَتِ الْمُدَّتَانِ بِلَا فَيْءٍ بَانَتْ بِأُخْرَيَيْنِ فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ تُطَلَّقْ فَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ وَلَا إِيلَاءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هٰذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إِيلَاءٌ وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ قَالَ وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا أَوْ قَالَ بِالْبَصْرَةِ وَاللهِ لَا أَدْخُلُ مَكَّةَ وَهِيَ بِهَا لَا -

অনুবাদ : ঈলা হল চার মাস বা তার চেয়ে বেশি দিনের জন্য স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়ার উপর শপথ করা। যেমন তার (স্বামীর) উক্তি আল্লার শপথ আমি তোমার সাথে চার মাস মিলিত হব না। কিংবা (তার উক্তি) আল্লাহর শপথ আমি তোমার সাথে মিলত হব না। অতঃপর যদি এ সময়ের মধ্যে সহবাস করে তবে কাফফারা আদায় করবে এবং ঈলা শেষ হয়ে যাবে। নতুবা স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে (অর্থাৎ চার মাস নিকটবর্তী না হলে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে এক তালাকে বায়েনা হয়ে যাবে) আর শপথ শেষ হয়ে যাবে, যদি চার মাসের উপর শপথ করে। আর শপথ বাকি থাকবে যদি চির জীবনের জন্য শপথ করে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার বিবাহ করে আর উভয় সময় চলে যায় ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া (অর্থাৎ, সহবাস করে না আর চার মাস করে অতিবাহিত হয়ে যায়) তবে শেষ দু'টি (ঈলা) স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। আর যদি অন্য স্বামী বিবাহ করার পর সে বিবাহ করে তবে (পুনরায় চার মাস অতিবাহিত হওয়ায়) তালাক পতিত হবে না। আর যদি সহবাস করে তবে শপথ বাকী থাকার কারণে কাফ্‌ফারা আদায় করবে। আর চার মাসের কমে ঈলা সাব্যস্ত হবে না। (আর স্বামীর উক্তি) আল্লাহর শপথ দুমাস এবং দুমাসের পর আরো দুমাস তোমার সাথে মিলিত হব না। তাহলে তা ঈলা হবে। আর যদি একদিন অবস্থান করে অতঃপর বলে আল্লাহর শপথ প্রথম দুমাসের পর আরো দুমাস তোমার সাথে মিলিত হব না। কিংবা বলে আল্লাহর শপথ আমি একদিন ছাড়া এক বৎসর তোমার সাথে মিলিত হবা না। অথবা বসরায় বলে আল্লাহর শপথ আমি মক্কায় প্রবেশ করব না এমতাবস্থায় তার স্ত্রী মক্কায় তবে ঈলা সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْاِيْلَاءِ الخ : الايلاء। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শপথ করা। কসম করা, শরীয়াতের পরিভাষায় ঈলা বলা হয় هُوَ الْحَلَفُ عَلٰى تَرْكِ قُرْبَانِهَا (اَيِ الْمَنْكُوْحَةِ) اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوْ اَكْثَرَ ঈলা হল : চার মাস বা তার চেয়ে অধিক সময়ের জন্য স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়ার উপর শপথ করা। ঈলা সংঘটিত হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে শর্ত হল কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হওয়া।

ঈলা এর হুকুম : শপথকারী যদি চার মাসের ভিতর স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায় তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে। শপথ ভঙ্গের কারণে আর যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় আর সে স্ত্রী সহবাস করেনি তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং শপথকারীর উপর কোন কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে তো তার শপথ পূর্ণ করেছে।

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) ঈলা এর আলোচনা তালাকের পর করেছেন। তার কারণ হচ্ছে, স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর যে হুরমত পতিত হয় তা মূলত চার প্রকার : ১। তালাক ২। ঈলা ৩। জিহার ৪। লি'আন। সুতরাং ঈলার মধ্যে তালাকের হুকুম সাথে সাথে পতিত না হয়ে বিলম্বের সাথে পতিত হয়। এজন্য তা তালাকের পর উল্লেখ করেছেন। আর তা 'খুলা' এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। অথচ 'খুলা' হচ্ছে তালাকের এক প্রকার। তার কারণ হচ্ছে 'খুলা' যদিও তালাক তবে ইহা মালের বদলা হয়। আর ঈলা এর মধ্যে যে তালাক পতিত হয় তার বিনিময়ে কোন মাল নেই। তাই গ্রন্থকার ايلاء। কে خلع এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

قوله : فَاِنْ وَطِئَ فِى الْمُدَّةِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে এবং তার সময় সীমার ভেতর তথা চার মাসের ভেতর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে এবং আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তার উপর শপথ ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সে শপথ ভঙ্গকারী হবে ঠিকই তবে তার উপর শপথ ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তিনি দলীল পেশ করেন পবিত্র কুরআনের আয়াত—

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যদি স্বামী ঈলার সময়ের ভেতর সহবাস করে বসে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ যাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তার কর্মের দরুন তার উপর কাফফারা আবশ্যক হয় না। তাই এই ব্যক্তির উপর কোনরূপ কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না।

আমাদের দলীল হচ্ছে : শপথ ভঙ্গের অপরিহার্য হুকুম হচ্ছে কাফফারা ওয়াজিব হওয়া। শরীয়াতের দৃষ্টিতে ঈলা হচ্ছে শপথ। সে ব্যক্তি উক্ত শপথ ভঙ্গ করেছে বিধায় তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর আয়াত দ্বারা প্রদত্ত দলীলের জবাব হচ্ছে আয়াতে ক্ষমার ঘোষণা আখেরাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় দুনিয়াতে। তাই তা আখেরাতের ক্ষমার ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। তাছাড়া ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর প্রথম অভিমত। আর তার নতুন অভিমত হচ্ছে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে। ইমাম মালেক (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর অভিমতও তাই। সারকথা হচ্ছে ঈলার সময়সীমার মধ্যে সহবাস পাওয়া গেলে ঈলা বিলুপ্ত হয়ে যায় আর শপথ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার দরুন কাফফারা ওয়াজিব হবে। ঈলা বিলুপ্তির অর্থ হল স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না।

قوله : وَ الْاَبَانَتْ : স্বামী যদি ঈলার সময় সীমার মাঝে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে সক্ষম হয় না অর্থাৎ, ঈলার সময়সীমা তথা চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল না। তবে আমাদের আহনাফদের মতে এক তালাকে বায়েনা পতিত হবে। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) ও আবু

বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারিস (রহ.)এর মতে এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, শুধু ইলার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা তালাক পতিত হবে না, বরং অপেক্ষা করা হবে হয়ত স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিবে অথবা তালাক প্রদান করবে। আর যদি স্বামী এতদুভয়ের কোনটি করতে রাজি না হয় এবং স্ত্রী বিচ্ছেদে কাজীর দারস্থ হয় তবে কাজী বিচ্ছেদের রায় প্রদান করবেন এবং এতে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আহলে জাহেরিয়াদের মতে ঈলার সময়কাল অতিবাহিত হলেও কাজী তলাক প্রদান করতে পারে না, বরং কাজী স্বামীকে বেত্রাঘাত বা জেলে বন্দি করে তাকে বাধ্য করবে হয়তো সে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করুক বা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাক।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হচ্ছে : স্বামী চার মাসের অধিক স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে স্ত্রীকে কষ্টে নিপতিত করতে চাচ্ছে। কেননা, তার শপথের দরুন স্ত্রী তার অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে এহেন কষ্টে নিপতিত করে তাকে তার নিকট উত্তমভাবে রাখা থেকে বিরত করছে। তাই বিচারক স্ত্রীকে উত্তমভাবে মুক্ত করে দেয়ার জন্য স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেবেন। আর কাজীর এ বিচ্ছেদ এক তালাকে বায়েনরূপে সাব্যস্ত হবে। যেমন, স্বামীর লিঙ্গ কর্তিত অথবা নপুংসক অবস্থায় কাজী স্বামীর স্থালাষিক্ত হয়ে বিচ্ছেদ করে দিতে পারেন।

আমাদের দলীল হল : স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে চার মাস স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত থেকে স্ত্রীর উপর জুলুম করেছে। তাই শরীয়াত এ জুলুমের প্রতিকার এভাবে করেছে, ঈলার সময়সীমা শেষ হলে বিবাহের মত নিয়ামতকে স্বামীর হাত ছাড়া হওয়ার ফায়সালা প্রদান করেছে এবং স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত করেছে।

এক্ষেত্রে যদি রাজঈ তালাক পতিত করা হয় তবে তো জুলুমের প্রতিকার করা হল না। কেননা, যদি স্বামী চায় তবে তো তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। তাই এ তালাককে বায়েন তালাক সাব্যস্ত করা হবে। তাছাড়া ঈলার সময় সীমা অতিক্রান্ত হলে বায়েন তালাক পতিত হওয়ার বর্ণনা হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হযরত ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) হতে বর্ণিত। সুতরাং এ মহান ব্যক্তিবর্গের অনুসরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের যুক্তি নির্ভর দলীল হচ্ছে : জাহিলিয়াতের যুগে ঈলা তাৎক্ষণিক তালাক হিসাবে গণ্য হতো। অর্থাৎ, যে কেউ ঈলা করত সে আর তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারত না। অতঃপর শরীয়াতে ইসলাম তার হুকুমকে ঈলার শেষ সীমা পর্যন্ত বিলম্বিত করেছে। ঈলার সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তালাকে বায়েন পতিত হবে।

قوله : وَ يَسْقُطُ الْيَمِيْنُ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (রহ.) ঈলার দুটি সুরত বর্ণনা করতেছেন। প্রথম, যদি স্বামী নির্দিষ্টভাবে চার মাসের উল্লেখ করে ঈলা করে যেমন তার উক্তি— والله لا اقربك اربعة اشهر 'আল্লাহর শপথ আমি চারমাস পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হবো না।' সুতরাং যদি স্বামী চার মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে না তবে তার স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং তার শপথ শেষ হয়ে যাবে। কেননা, স্বামী নির্দিষ্ট সময়ের সাথে শপথ করেছিল। সুতরাং সময় অতিবাহিত হওয়ায় শপথও শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি স্বামী এ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে এবং তার সাথে সহবাস করে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, সেই শপথ ছিল সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় শপথও শেষ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় : যদি স্বামী সারা জীবন স্ত্রী সহবাস না করার উপর ঈলা করে যেমন তার উক্তি والله لا اقرب ابدا। 'আল্লাহর শপথ আমি কখনোই তোমার সাথে সহবাস করব না।' অতঃপর সহবাস ছাড়ই চার মাস অতিবাহিত হল, তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কিন্তু শপথ বাকি থাকবে। কেননা, সে অনির্দিষ্ট সময়ের উপর শপথ করেছে। তাই তার শপথ স্থায়ীভাবে হয়ে যাবে। আবার স্বামী থেকে শপথ ভঙ্গকারী কোন কাজ তথা

সহবাস পাওয়া গেল না, তাই তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। আর যদি পুনরায় বিবাহের পূর্বেই যদি আরো চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে অধিকাংশ মাশায়েখে কেরামের মতে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা, তালাকে বায়েন হওয়ার পর স্ত্রী আর সহবাসের ক্ষেত্র হিসাবে অবিশিষ্ট থাকল না। তাই এক্ষেত্রে স্বামী জুলুমকারী সাব্যস্ত হবে না বিধায় দ্বিতীয় বার আর তালাকে বায়েনের মাধ্যমে বিবাহ নিয়ামতকে বিলুপ্ত করা হবে না। স্বামী والله لا اقربك ابدا, বলার পর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত করার পর স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে তাহলে ঈলাও পুনরাং প্রবর্তিত হবে। যদি স্বামী চার মাসের ভেতর সহবাস করে তবে ঈলা শেষ হবে এবং সে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। এবং কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, তার পূর্বেকার শপথে ابدا শব্দটি সংযোগ করায় তা স্থায়ীভাবে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যখনই সে উক্ত শপথ ভঙ্গ করবে তখনই তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে আর যদি সহবাস ছাড়া পুনরায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে স্ত্রী দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় তালাকে বায়েন হয়ে যাবে।

স্বামী যদি উক্ত স্ত্রীকে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করে, তবে ঈলা ফিরে আসবে। এখন সহবাস করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে এবং ঈলা শেষ হয়ে যাবে। শপথের কাফফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি সহবাস করে না এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে স্ত্রীর উপর তৃতীয় তালাক পতিত হবে। কিন্তু শপথ শেষ হবে না। এখন যদি উক্ত স্ত্রীকে অন্য কোন স্বামী বিবাহ করে তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর ইদ্দত শেষ করার পর উক্ত স্ত্রীকে পুর্বোক্ত ঈলাকারী স্বামী বিবাহ করে তবে সহবাস না করা অবস্থায় চার মাস চলে যায়। তবে আর স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। কিন্তু স্বামী সহবাস করলে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে তাই কাফফারা আদায় করতে হবে। স্ত্রীর উপর তালাক পতিত না হওয়া আমাদের মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে উক্ত নতুন বিবাহে পূর্বোক্ত ঈলা প্রভাব ফেলবে। তাই এমতাবস্থায় যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় আর স্বামী সহবাস করে না তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

আমাদের দলীল হল : পূর্বোক্ত ঈলা প্রথম মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাই তা দ্বিতীয় বার বিবাহের পর এতে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। কেননা, ঈলা দ্বারা তালাক প্রমাণিত হওয়া তার তো এক সীমা রয়েছে। আর তাহল মালিকানা। সুতরাং যখন প্রথম মালিকানায় ঈলার কারণে সবকটি তালাক পতিত হয়ে গেল। তাই ঈলার ক্ষেত্র শেষ হওয়ায় তা দ্বিতীয় বার বিবাহ করার পর প্রভাব ফেলতে পারবে না। তাছাড়া এ বিবাহে তো স্বামী পূর্ণ তিন তালাকের মালিক হয়। তবে হা যদি উক্ত দ্বিতীয় বিবাহের পর সহবাস পাওয়া যায় তবে সে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, শপথ কোন সময়ের সাথে সীবদ্ধ ছিল না আর সহবাস না করার কারণে শপথ ভঙ্গকারীও পাওয়া যায়নি। বিধায় এখন যেহেতু সহবাস পাওয়া গেছে তাই সে শপথ ভঙ্গকারী হবে এজন্য তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে।

قوله : وَ لَا إِيْلَاءَ فِيمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الخ : যদি কোন স্বামী চার মাসের কম সময়ের জন্য স্ত্রী সহবাস করবেনা বলে শপথ করে তবে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। যেমন স্বামীর উক্তি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে والله لا اقربك شهرا আল্লাহর শপথ আমি এক মাস তোমার সাথে সহবাস করব না। অথবা বলল والله لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ আল্লহর শপথ আমি দুই মাস তোমার সাথে সহবাস করব না। অথবা স্বামী তিন মাসের সাথে শপথকে সম্পৃক্ত করল, তবে স্বামী ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। ইবনে আবী লায়লা (রহ.) বলেন, যদি স্বামী এমতাবস্থায় চার মাস পর্যন্ত সহবাস না করে তবে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে প্রথম অবস্থায় এরূপ মতামত ছিল, কিন্তু যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ফতোয়া তথা لا ايلاء في مادون اربعة اشهر 'চার মাসের কমে কোন ঈলা নেই' তখন তিনি তার কথা থেকে ফিরে আসেন। তাছাড়া যুক্তিনির্ভর দলীল হচ্ছে, যে ব্যক্তি চার মাসের কম সময়ের জন্য সহবাস না করার শপথ করে

এবং তা কর্মে পরিণত করে তবে তার শপথ বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখন চার মাস পর্যন্ত যা তার শপথের অন্তর্ভুক্ত নয় এ সময় যদি সহবাস করে না তবে তো এর পিছনে কোন শপথ বিদ্যমান নেই যার উপর ভিত্তি করে ঈলা সাবিত করা হবে এবং তালাক পতিত করা হবে এজন্য চার মাসের কম সময়ের শপথ করলে তার দ্বারা চার মাস অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা তালাক পতিত হবে না।

قوله : وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে আল্লাহর শপথ আমি তোমার সাথে দু' মাস সহবাস করব না এবং এ দুমাসের সাথে আরো দু মাস সহবাস করব না, তবে ব্যক্তি ঈলা সাব্যস্ত সে হবে, কেননা, এ ব্যক্তি প্রথম দু মাসের পরবর্তী দু মাসকে একত্র করে পুরো চার মাসকেই সহবাস না করার উপর যুক্ত করেছে। তাই সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। তা পূর্ণ করলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর শপথ এর পর থেকে চার মাসের ভেতর যদি সহবাস করে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

قوله : وَلَوْ مَكَثَ يَوْمًا الخ : আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে লক্ষ করে বলে আল্লহার শপথ আমি দুমাস তোমার সাথে সহবাস করব না অতঃপর এক দিন অতিবাহি হয় তারপর বলে আল্লাহর শপথ প্রথম দু মাসের সাথে আরো দুমাস তোমার সাথে সহবাস করব না, তবে এ ব্যক্তি ঈলাকারী হবে না। উল্লিখিত উভয় মাসআলার মূল ভিত্তি হলো : যদি বক্তব্যে معطوف বাক্যে আল্লাহর শপথ উল্লেখ না থাকে এবং حرف نفي এরও উল্লেখ না থাকে এবং معطوف عليه ও معطوف এর মধ্যে বিলম্ব না থাকে তাহলে معطوف عليه এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত معطوف হয়ে যায়। যেমন প্রথমোক্ত মাসআলায় আমরা এ তিন নিয়ম পেয়েছি বিধায় হুকুমের দিক থেকে তা একত্রিত হবে। আর যদি এ তিনটি থেকে যে কোন একটি নিয়ম অনুপস্থিত থাকে তবে তা এ হুকুমভুক্ত হবে না, বরং দ্বিতীয় বাক্য পৃথকভাবে নতুন বাক্য হিসাবে পরিগণিত হবে। সুতরাং আলোচিত দ্বিতীয় মাসআলায় আমরা তিনটি নিয়মের কোনটি না পাওয়ার কারণে উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী হবে না। তবে হা তার উক্ত কথা পৃথক পৃথকভাবে দুটি শপথ হিসাবে গণ্য হবে। তাই যদি উক্ত মিয়াদের ভেতর একবারও সহবাস করে তবে তার উপর দুটি শপথ ভঙ্গ করায় দুটি কাফফারা আবশ্যক হবে।

قوله : اَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে আল্লাহর শপথ আমি একদিন ছাড়া এক বৎসর তোমার সাথে সহবাস করব না তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে উক্ত ব্যক্তি ঈলা সাব্যস্তকারী হবে না। আর ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে সে ব্যক্তি ঈলা সাব্যস্ত কারী হবে। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এর মতও তাই। তাদের দলীল হল : স্বামীর উক্তিতে اِلَّا যাহা استثناء বা ব্যতিক্রমী রয়েছে। অর্থাৎ, الا يومًا একদিন ছাড়া। সুতরাং এ استثناء বা ব্যতিক্রমী দিনটিকে বৎসরের শেষ দিন নির্ধারণ করা হবে। যেভাবে ইজারার ক্ষেত্রে করা হয়। যেমন কেহ তার ঘর অন্যের নিকট একদিন ছাড়া এক বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করল তবে একদিনকে বৎসরের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়। তেমনি আলোচ্য মাসআলায় ও ব্যতিক্রমী দিনটিকে বৎসরের শেষ দিন নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং নির্ধারিত একদিন ছাড়া এক বৎসরের মধ্যে চার মাস তো অবশ্যই বিদ্যমান তাই সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে।

আমাদের দলীল হল : কাফফারা ওয়াজিব হওয়া ছাড়া চার মাস সহবাস করতে না পারাকে ঈলা বলা হয়। আর সে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ একদিন ছাড়া এক বৎসর তোমার নিকটবর্তী হব না বলল। সে কাফফা ওয়াজিব ছাড়া একদিন সহবাস করতে পারবে। কেননা, একদিন ছাড়া এর একদিন অনির্দিষ্ট। বৎসরের প্রতিটি দিন এক দিন হতে পারে। এজন্য উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যবহার করার জন্য একদিনকে বৎসরের শেষ দিন নির্ধারণ করা সঠিক হবে না। ইমাম যুফার (রহ.) এর দলিলের জবাব হল, ইজারা এর উপর আলোচ্য মাসআলার কিয়াস করা বৈধ নয়। কেননা, উভয়টির মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান এভাবে যে ইজারার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী এক

দিনকে যদি বৎসরের শেষের দিন নির্ধারণ করা হয় না তবে ইজারা ফাসেদ হয়ে যাবে। তাই তা বিশুদ্ধ করার স্বার্থে ইসতিসনাকৃত দিনকে বৎসরের শেষের দিন নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু শপথ এর ভিন্ন। কেননা, তা অনির্দিষ্টভাবে ও বৈধ। তাই উভয় মাসআলায় বৈপরিত্য বিদ্যমান থাকায় একটিকে অপরটির উপর কিয়সা করা বৈধ নয়।

আর যদি এধরনের শপথ করার পর একদিন সহবাস করে ফেলে এবং এরপর চার মাস স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকে তবে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। কেননা, সে ইছতেসনার কারণে ইলাকারী সাব্যস্ত হওয়ার কথা ছিল তা রহিত হয়ে গেছে। এজন্য ইলা সংগটিত হয়ে যাবে।

قوله : أَوْ قَالَ بِالْبَصَرَةِ الخ : যদি কোন স্বামী বসরায় থাকা অবস্থায় তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে আল্লাহ্র শপথ আমি মক্কায় প্রবেশ করব না, আর স্ত্রী মক্কাতে থাকে তবে এ ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ ব্যক্তি কাফফারা ওয়াজিব হওয়া ছাড়া তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে। আর তা এভাবে যে যদি সে তার স্ত্রীকে অন্য লোকের মারফত মক্কা থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যায় আর সেথায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে তো তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয় না, আর কাফফারা ওয়াজিব না হলে ঈলা সংঘটিত হয় না। কেননা, ঈলা হল কাফফারা ছাড়া চার মাস তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে না পারা।

وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَو صَوْمٍ أَو عِتْقٍ أَو صَدَقَةٍ أَو طَلَاقٍ أَو آلَى من الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهُوَ مُولٍ وَمِنَ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ لَا وَمُدَّةُ إِيلَاءِ الْأَمَةِ شَهْرَانِ وَإِنْ عَجِزَ الْمَوْلَى عن وَطْئِهَا بِمَرَضِهِ أَو مَرَضِهَا أَو بِالرَّتَقِ أَو بِالصِّغَرِ أَو بُعْدِ مَسَافَةٍ فَفَيْؤُهُ أَنْ يَقُولَ فِئْتُ إِلَيْهَا وَإِنْ قَدَرَ فِي الْمُدَّةِ فَفَيْؤُهُ الْوَطْءُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِيلَاءٌ إِنْ نَوَى التَّحْرِيمَ أَو لم يَنْوِ شَيْئًا وَظِهَارٌ إِنْ نَوَاهُ وَكِذْبٌ إِنْ نَوَى الْكَذِبَ وَبَائِنَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَثَلَاثٌ إِنْ نَوَاهُ وفي الْفَتَاوَى إِذَا قال لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَالْحَرَامُ عِنْدَهُ طَلَاقٌ وَلَكِنْ لم يَنْوِ طَلَاقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ -

---

অনুবাদ : আর যদি (সহবাসের বিষয়টি) হজ্ব কিংবা রোজা অথবা সদকা কিংবা (গোলাম-দাসী) আজাদ করা অথবা তালাক প্রদানের সাথে সম্পর্কিত করে শপথ করে কিংবা রাজঈ তালাক প্রাপ্তার ব্যাপারে ঈলা করে তবে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে, (আর যদি) বায়েন তালাক প্রাপ্তার ব্যাপারে কিংবা অপরিচিতার ব্যাপারে ঈলা করে তবে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। দাসীর ঈলার সময়সীমা দুমাস। আর যদি ঈলাকারী তার অসুস্থতার দরুন কিংবা স্ত্রীর অসুস্থতার দরুন অথবা যোনিদ্বারে প্রতিবন্দকতার কারণে অথবা অল্পবয়স্কা হওয়ার দরুন কিংবা দুরত্বের কারণে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য ঈলা প্রত্যাহারের পন্থা হল যে, সে বলবে (ঈলা এর মেয়াদের ভেতরে) আমি তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম অতঃপর যদি মেয়াদের ভেতর সে সক্ষম হয় (স্ত্রীর সাথে সহবাসের) তবে তার (ঈলা) প্রত্যাহার হবে শুধু সহবাস দ্বারা। (আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে

তুমি আমার উপর হারাম তবে তা জিহার হবে যদি জিহারের নিয়ত করে। মিথ্যা হবে যদি মিথ্যার নিয়ত করে। আর তালাকে বায়েন হবে যদি বায়েনের নিয়ত করে। আর তিন তালাক হবে যদি তিন তালাকের নিয়ত করে। আর ফাতওয়ার মধ্যে রয়েছে, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে তুমি আমার উপর হারাম, আর হারাম তার নিকট তালাকের অর্থে, অথচ সে তালাকের নিয়ত করেনি তাহলে তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَاِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত আল্লাহর নামে শপথ করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইলা এর বিবরণ পেশ করেছেন। এখান থেকে غير الله এর নামে শপথকে সম্পৃক্ত করা এবং এর দ্বারা ঈলা ছাবিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করতেছেন। গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, যদি স্বামী তার শপথকে হজ্বের সাথে সম্পৃক্ত করে এভাবে বলে যে যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার উপর হজ্জ ওয়াজিব অথবা তার শপথকে রোজার সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যেমন স্বামীর উক্তি যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার উপর এক বৎসরের রোজা ওয়াজিব হবে। কিংবা তার শপথকে সদকা এর সাথে সম্পৃক্ত করে এভাবে বলে যে, যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার উপর এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে, অথবা তার শপথকে গোলাম আজাদের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার গোলাম আজাদ কিংবা তার শপথকে তালাকের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তুমি বা তোমার সতিন তালাক উল্লিখিত সকল সূরতে উক্ত ব্যক্তি ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, শর্ত ও তার জাজা উল্লেখ করার কারণে সহবাস থেকে বিরত থাকা তার উপর অপরিহার্য হয়েছে। উল্লিখিত জাজাগুলো তথা হজ্জ, রোজা, সদকা, তালাক ইত্যাদি স্ত্রী সহবাস থেকে প্রতিবন্দককারী হবে, কেননা, এই পরিণতীর সাথে কষ্ট বিদ্যমান, তাইতো যখনই সে শর্তে তথা সহবাসের লিপ্ত হয়ে যাবে তখনই তার উপর জাযা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর উক্ত জাযাগুলো বাস্তবায়িত করার সাথে তার উপর কষ্ট অপরিহার্যভাবে আবশ্যক হবে, এজন্য এ পরিণতিগুলো সহবাস থেকে বাধা দানকারী হবে। সুতরাং উল্লিখিত সকল সূরতে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ঈলা, তাই যদি স্বামী এ শপথের পর থেকে চার মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে না তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি সহবাস করে বসে তবে তার উপর জাযা আবশ্যক হবে। والله اعلم -

قوله : اَوْ اٰلٰى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার তালাকে রাজঈ প্রাপ্তার সাথে ঈলা করে তবে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে। আর যদি বায়েন তালাক প্রাপ্ত বা কোন আজনবীরা (অপরিচিতার) সাথে ঈলা করে তবে সে ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। রাজঈ তালাক প্রাপ্তার সাথে ঈলা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে রাজঈ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীগণের সাথে স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কেননা, স্বামী যদি চায় তবে তার স্ত্রীকে তার অনুমতি ছাড়াই তার ইদ্দতের ভেতর রাজআত করতে পারবে, পক্ষান্তরে তালাকে বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীগণের স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। আর তাই তো তারা ঈলা পতিত হওয়ার ক্ষেত্র নয়। কেননা, কুরআনের আয়াত لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ উক্ত আয়াতে نِسَائِهِمْ শব্দ এসেছে তা দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা হিসাবে তাদের স্ত্রীগণ বলা হয়েছে পক্ষান্তরে বায়েনা রমণী স্বামীর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বিধায় ঈলার ক্ষেত্র না থাকায় তাদের ক্ষেত্রে ঈলা সাব্যস্ত হবে না। অধিকন্তু কেহ যদি তার বায়েনা প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে ঈলার শপথ করে এবং তার সাথে অবৈধ সহবাস করে ফেলে তবে তার উপর শপথ ভঙ্গের কাফফারা আবশ্যক হবে। আর যদি রাজঈ তালাক প্রাপ্তার সাথে ঈলা করার পর চার মাসের ভেতর তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তবে ঈলা বাতেল হয়ে যাবে। কেননা, রাজঈ তালাকের পর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে ঈলার ক্ষেত্র বাকি থাকে না। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি বেগানা বা অপরিচিতা মহিলাকে বলে আল্লাহর শপথ আমি তোমার সাথে সহবাস করব না। তবে সে

ঈলাকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, উক্ত স্ত্রীলোকটি ঈলার ক্ষেত্র নয়, তার বিবাহিতা না হওয়ায়। যদি পরবর্তীতে উক্ত শপথকারী উক্ত অপরিচিতাকে বিবাহ করে তবে হাঁ তার সাথে সহবাস পাওয়া গেলে শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা আবশ্যক হবে, কেননা, শপথ কোন সময় বা পাত্রের সাথে নির্দিষ্ট নয়।

قوله : وَ مُدَّةُ إِيلَاءِ الْأَمَةِ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী যদি কারো স্ত্রী দাসী হয় তবে তার ঈলার মেয়াদ হবে দুমাস। স্বামী গোলাম হউক বা স্বাধীন। হযরত উমর (রাযি.) থেকে এমনটিই বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (রহ.) এর প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে গোলামের স্ত্রীর ইলার মুদ্দত হচ্ছে দু মাস তার স্ত্রী দাসী হউক বা স্বাধীনা। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে ইলার মেয়াদ হচ্ছে চার মাস, স্বামী স্বাধীন হউক বা গোলাম হউক। অনুরূপ স্ত্রী স্বাধীনা হউক বা দাসী হউক সকলের ক্ষেত্রে ইলার হুকুম সমান। তাদের দলীল হচ্ছে : জালিম স্বামীর জুলুম চিহ্নিত করার জন্য ইলার সময় সীমা হয়ে থাকে আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ স্বাধীন পরাধীন সবাই সমান। এজন্য সবার ঈলার মেয়াদ চার মাস হবে। কেননা, সহবাস থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে দাসী বা সাধীনার স্বামী সমান অপরাধি।

আমাদের দলীল হল : বায়েন তালাক প্রাপ্তা সাব্যস্ত করার জন্য ঈলার মেয়াদকে চার মাসের সাথে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং দাসত্বের কারণে ঈলার মেয়াদ অর্ধেক বাতিল হবে। আর অর্ধেক থেকে যাবে। তাই দাসীর ঈলার মেয়াদ দু' মাস যেভাবে দাসত্বের দরুন তালাক ও ইদ্দতে স্বাধীনার অর্ধেক করা হয়।

قوله : وَإِنْ عَجِزَ الْمُولِى الخ : যদি ঈলাকারী এমন অসুস্থ হয় যে সে সহবাস করতে অক্ষম, কিংবা স্ত্রী এমন অসুস্থ হয় যে, তার সাথে সহবাস করা মোটেও সম্ভবপর নয়। অথবা স্ত্রীর যোনিদ্বারে কোন প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকে যার দরুন স্বামী তার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাতে সক্ষম না হয়। অথবা উভয় এমন দুরত্বে থাকে যে স্বামীর চার মাস অবধি সফরে থাকলেও স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে পারবে না তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী স্বামী মৌখিকভাবে তার ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে। যেমন স্বামী বলবে فَجِئْتُ إِلَيْهَا আমি তার দিকে ফিরে গেলাম বা رَجَعْتُ إِلَيْهَا অথবা أَبْطَلْتُ إِيلَائَهَا ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের ভিত্তিতে ঈলা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, স্বামীর সহবাস ছাড়া ঈলা প্রত্যাহারের আর কোন সূরত অবশিষ্ট নাই। অর্থাৎ, সে শুধু সহবাস দ্বারাই ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে। ঈলাকারী স্বামী যদি অসুস্থ হয় তবে তার তিনটি সূরত রয়েছে। প্রথম সুরত : যদি ঈলাকারী সুস্থাবস্থায় ঈলা করে এবং এতটুকু সময় সুস্থ থাকে যে চাইলে সে সহবাসের মাধ্যমে ঈলা প্রত্যাহার করতে পারত। অতঃপর সে অসুস্থ হয়ে যায় এমনকি ঈলার সময়সীমার ভেতর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মৌখিকভাবে সে তার ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে না, বরং সহবাস দ্বারাই ঈলা প্রত্যাহার করতে হবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এক্ষেত্রেও সে মৌখিকভাবে তার ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে।

তার দলীল হল : ঈলার ক্ষেত্রে ঈলা করার সময়ের অবস্থাটি ধর্তব্য হয় না, বরং ঈলার শেষ সময়টি ধর্তব্য হয়। তাই উক্ত ব্যক্তি অসুস্থতার দরুন শেষ সময়ে সহবাস করতে অক্ষম হয়েছে বিধায় সে মৌখিকভাবে ঈলা প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কেহ নামাযের ওয়াক্তের শুরুতে পানি পেল, কিন্তু তা দ্বারা অজু করে নামাজ আদায় করল না, কিন্তু ওয়াক্তের শেষে এ পানি শেষ হয়ে গেল। সুতরাং এ ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে পারবে। আমাদের আলোচিত মাসআলার এরূপই ঈলার শেষ সময়ে সহবাস থেকে অক্ষম হওয়াতে মৌখিকভাবে ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে।

আমাদের দলীল হচ্ছে : উক্ত ব্যক্তি সহবাস করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় ও স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তার প্রতি সুনিশ্চিত জুলুম করেছে। সুতরাং স্ত্রীর অধিকার সহবাসের মাধ্যমে পূর্ণ করতে হবে। তাই প্রমাণিত হল যে সে তার ঈলা সহবাসের মাধ্যমেই প্রত্যাহার করতে হবে। মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় সূরত : যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় ঈলা করে অতঃপর অসুস্থাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হয়। তবে আমাদের মাযহাব মতে উক্ত ব্যক্তি মৌখিকভাবে চাইলে তার ঈলা প্রত্যাহার করতে পারবে। পক্ষান্তরে ঈমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মৌখিকভাবে প্রত্যাহার দ্বারা তার ঈলা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে না, বরং সহবাসের মাধ্যমে তা প্রত্যাহার করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হচ্ছে : যদি মৌখিকভাবে ঈলা প্রত্যাহারের দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হতো তবে তা দ্বারা যেভাবে ঈলা বিলুপ্ত হয় তদ্রূপ শপথও ভঙ্গ হওয়ার কথা অথচ মৌখিক প্রত্যাহারের দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয় না। তাই প্রমাণিত হলো যে মৌখিক প্রত্যাহার দ্বারা ঈলা প্রত্যাহার হয় না, বরং ঈলা প্রত্যাহার সহবাস দ্বারাই সংঘটিত হবে।

আমাদের দলীল হল : স্বামী এক্ষেত্রে স্ত্রীকে মৌখিক নির্যাতন করেছে। তা এভাবে যে স্বামী যখন তার সাথে ঈলা করে তখনও তার সহবাসের ক্ষমতা নেই। আর এখনও নেই। সুতরাং এ অবস্থায় ঈলা করার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীকে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তায় নিপতিত করা। তাই স্বামী তার মৌখিক প্রত্যাহার দ্বারা স্ত্রীর প্রতি যে ধরনের জুলুম করেছিল তা শেষ হয়ে যাবে। কেননা, সে তো স্ত্রীকে মৌখিকভাবে অত্যাচার করেছে। তাই তা মৌখিকভাবে প্রত্যাহারের অঙ্গিকার প্রদানের দরুন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করাই যতেষ্ট হবে।

তৃতীয় সুরত : যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় স্ত্রীর সাথে ঈলা করে অতঃপর সুস্থ হয়ে যায় তবে তার সহবাস দ্বারাই ঈলা প্রত্যাহার করতে হবে। যদিও সে অসুস্থাবস্থায় মৌখিকভাবে প্রত্যাহার করে থাকে। কেননা, সে অন্য মাধ্যমে উদ্দেশ্যপূর্ণ করার পূর্বেই প্রত্যাহারের মূল পন্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। যেমন কেহ পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুত করে নামাজ শুরু করে কিন্তু নামাজান্তে পানি পেয়ে যায় তবে তার জন্য ওয়াজিব নামাজ ভঙ্গ করে অজু করে পুনরায় নামাজ পড়ে নেয়া তদ্রূপ এক্ষেত্রে যে প্রত্যাহারের মূল মাধ্যম তথা সহবাসের উপর সক্ষম হওয়ায় তার স্থলবর্তী তথা মৌখিক প্রত্যাহারের বিষয়টি বাতিল হয়ে যাবে।

قوله : اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ اِيْلَاءٌ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে انت على حرام তবে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তা দ্বারা কি নিয়ত করেছে? কেননা, এ বাক্য বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রাখে যেমন এরূপ বাক্য দ্বারা তালাক, ঈলা, জিহার, ইত্যাদি সাব্যস্ত হতে পারে। সুতরাং স্বামী যদি এবাক্য বলার দ্বারা হারাম এর নিয়ত করে অথবা কোন কিছুর নিয়ত না করে তবে ঈলা সাব্যস্ত হবে। তাই যদি সে চার মাসের ভিতর সহবাস করে তবে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে। আর যদি সহবাসহীন অবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। স্ত্রীকে হারাম করার নিয়ত করলে তা শপথ হওয়ার দলীল হল : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তালাককে হারাম সাব্যস্ত করার নামই হল শপথ। কেননা, পবিত্র কোরআনের ঘোষণা :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ *

অর্থাৎ, 'হে নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য যে বস্তু হালাল করেছেন তা আপনি আপনার জন্য হারাম করছেন কেন? আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কসমসমূহ খুলে ফেলারও দায়িত্ব আরোপ করেছেন।' সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হল, হারাম করা তা শপথই। আর যদি কোন নিয়ত না করে তবেও তা ঈলাকে আবশ্যক করবে। কেননা, শপথ দ্বারা সর্ব নিম্নমানের হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, ঈলার ক্ষেত্রে কাফফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করা বৈধ। পক্ষান্তরে জিহার এমন নয়, বরং তার কাফফারা আদায় করেও তার স্ত্রীকে তার বিবাহে রাখতে পারে। কিন্তু কোন নিয়ত না করা অবস্থায় আমরা হারাম দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য নিয়ে থাকি। তবে তাৎক্ষণিক তালাকে বায়েন পতিত

হয়ে যাবে। যা বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী এজন্য হারাম বলার পর কোন নিয়ত না থাকা অবস্থায় আমরা সর্বনিম্ন হারাম ততা ঈলাকে গ্রহণ করেছি।

قوله : وَ ظِهَارٌ الخ : আর যদি স্বামী اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ বলার দ্বারা জিহারের নিয়ত করে তবে তার নিয়ত সহীহ হবে এবং স্বামী জিহারকারী সাব্যস্ত হবে। ইহা শায়খাইন (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্ম (রহ.) এর মতে তা জিহার হবে না। তার দলীল হল : জিহার বলা হয় নিজ স্ত্রীকে কোন মুহররামাত এর সাথে তুলনা করা কিন্তু আলোচ্য বাক্যে যেহেতু তুলনা বাচক কোন শব্দ বিদ্যমান নেই, তাই উক্ত বাক্য দ্বারা জিহারের নিয়ত শুদ্ধ হবে না।

শায়খাইন (রহ.) দ্বয়ের দলীল হল : حرام শব্দটিকে শর্তহীনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রাখে যেমন তা দ্বারা তালাক, যিহার, ঈলা, ইত্যাদি তাই বক্তা এগুলোর যে কোন একটিকে নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করলে তা নির্ধারিত হবে। কেননা, শর্তহীন বাক্য যা বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রাখে তার যে কোন একটি নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করা সহীহ, সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় স্বামীর উক্তি।

اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ দ্বারা জিহারের নিয়ত করে তবে তা কার্যকর হবে।

قوله : وَ كِذْبٌ الخ : আর যদি স্বামীর উক্তি اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ বলার পর সে বলে আমি তা দ্বারা মিথ্যার নিয়ত করেছি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার এ বাক্য দ্বারা তালাক, যিহার, ঈলা, কোন কিছু পতিত হবে না। কেননা, সে তো তার উক্তির প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে। তা হল যে এ স্ত্রী তার জন্য হালাল ছিল কিন্তু সে বলতেছে, তুমি আমার উপর হারাম যা বাস্তবতার বিপরীত। সুতরাং তার উক্তিটি মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। এজন্য যে শরীয়াত, বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করে। তাই তার নিয়ত যথার্থ হিসাবে গণ্য হবে।

قوله : وَ بَائِنَةٌ الخ : স্বামী যদি তার উক্তি اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ দ্বারা তালাকের নিয়ত করে আর সংখ্যা নির্ধারণ না করে কিংবা এক বা দুতালাকের নিয়ত করে তবে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা, ইহা তালাকের ক্ষেত্রে ইঙ্গিত বাচক শব্দ। যা দ্বারা এক তালাকে বায়েন বা তিন তালাকে বায়েন পতিত হতে পারে। এব্যাপারে ইঙ্গিত বাচক তালাকের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قوله : وَ فِى الْفَتَاوٰى الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) তার উক্ত বক্তব্য দ্বারা ইহা বুঝাতে চাচ্ছেন যে কেহ তার স্ত্রীকে বলল, انت على حرام আর উক্ত বাক্যের হারাম শব্দটি তালাকের অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে সে জানে কিন্তু তালাকের নিয়ত করল না তবুও তার কথা দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। অর্থাৎ, এ বাক্যের মধ্যকার হুরমত বাচক শব্দকে নিয়ত না করা সত্ত্বেও সাধারণ প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে তালাকের অর্থে গ্রহণ করা হবে। কেননা, প্রচলনগতভাবে انت على حرام দ্বারা তালাকই গ্রহণ করা হয়। ফক্বীহ আবুল লাইছ (রহ.)ও এ অর্থে গ্রহণ করেছেন।

بَابُ الْخُلْعِ

পরিচ্ছেদ : খোলা

هُوَ الْفَصْلُ مِنَ النِّكَاحِ وَالْوَاقِعُ بِهِ وَبِالطَّلَاقِ على مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَكُرِهَ له أَخْذُ شَيْءٍ إِنْ نَشَزَ وَإِنْ نَشَزَتْ لَا وما صَلُحَ مهرا صَلُحَ بَدَلَ الْخُلْعِ فَإِنْ خَالَعَهَا أو طَلَّقَهَا بِخَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ أو مَيْتَةٍ وَقَعَ بَائِنٌ في الْخُلْعِ رَجْعِيٌّ في غَيْرِهِ مَجَّانًا كَخَالِعْنِي على ما في يَدِيْ وَلَا شَيْءَ في يَدِهَا وَإِنْ زَادَتْ مِنْ مَالٍ أو مِنْ دَرَاهِمَ رَدَّتْ مَهْرَهَا أو ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ -

অনুবাদ : খোলা হল বিবাহ বন্ধন থেকে পৃথক হওয়া খোলা দ্বারা বা মালের বিনিময়ে তালাক দ্বারা তা তালাকে বায়েন (পতিত করে) এবং স্ত্রীর উপর মাল আবশ্যক করে। আর যদি স্বামী অন্যায় আচরণ করে তবে কোন কিছু (স্ত্রীর নিকট থেকে) গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ। আর যদি স্ত্রী অন্যায় আচরণ করে তবে মাকরূহ নয়। আর যা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে তা খোলায় বদলা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যদি স্বামী মদের কিংবা শুকরের অথবা মৃতের বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খোলা করে অথবা তালাক প্রদান করে তবে কোন কিছু আরোপিত না হওয়া অবস্থায় খোলার ক্ষেত্রে তালাকে বায়েন পতিত হবে, আর খোলা ভিন্ন (তথা তালাকের ক্ষেত্রে) তালাকে রাজঈ পতিত হবে। যেমন, (স্ত্রীর উক্তি) আমার হাতে যা আছে তার বিনিময়ে আমার সাথে খোলা কর অথচ তার হাতে কোন কিছু নেই (অতঃপর স্বামী তার সাথে খোলা করল তবে স্ত্রীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।) আর যদি স্ত্রী তার কথায় من مال (মাল থেকে) কিংবা من دراهم (দিরহামসমূহ থেকে) (শব্দ) বৃদ্ধি করে, তবে স্ত্রী নিজ মহর অথবা (من دراهم বাড়ানোর ক্ষেত্রে) তিন দিরহাম ফিরিয়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত তালাকের এমন সব বিধি-নিষেধের আলোচনা করেছেন, যা পুরুষের পক্ষ থেকেই অবলম্বিত ছিল। আর এখন থেকে তালাকের এমন সব নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনার করবেন, যাতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে মালের বিনিময়ে বিচ্ছেদের দাবী পেশকারক হবে। আর তার নাম হচ্ছে খোলা, সুতরাং তালাক হচ্ছে বিনিময়হীন আর খোলা হচ্ছে বিনিময়ের পরিবর্তে তালাক চাওয়া।

خُلْعٌ শব্দটির خاء বর্ণে যবর ও পেশ যোগে পড়া যায়। الخلع (ف) خلع। পৃথক করা খোলা। যেমন خَلَعْتُ النَّعْلَ আমি জুতা খোলেছি। শরীয়তের পরিভাষায় খোলা বলা হয় أَخْذُ مَالِ الْمَرْأَةِ بِإِزَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ খোলা শব্দের মাধ্যমে বৈবাহিক মালিকানা ত্যাগের বিনিময়ে স্ত্রীর নিকট থেকে মাল গ্রহণ করা।

খোলার হুকুম : তা দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হয়। স্বামীর দিক বিবেচনায় তা ইয়ামিন যা বলার পর আর প্রত্যাহার করতে পারে না। আর স্ত্রীর দিক থেকে তা معاوضه বা বিনিময় লেনদেন চুক্তি।

খোলা কখন করা বাঞ্ছনীয় : কোরআন হাদীস দ্বারা খোলা যদিও সমর্থিত কিন্তু যে কেউ তার স্বামীর সাথে খোলা করা ঠিক নয়। বরং যদি নারীর জীবন যাত্রা এ স্বামীর অধীনে হয়ে উঠে কষ্টকর ও বিপদ-আপদযুক্ত এবং

স্বামীর স্ত্রী পরস্পরে ঝগড়া করতে থাকে এমনকি তারা এই ধারণা করে যে, পরস্পরের হক্ব তারা আদায় করতে পারবে না। যাতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় তবে সে খোলা করতে পারে।

আর যদি স্ত্রী তার পরকিয়া বা অন্য অসামাজিক বা এমন কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না এমন কোন স্বার্থের জন্য আইনের মাধ্যমে স্বামী থেকে খোলা করে নেয়, তবে সে নারী মারাত্মক গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। কেননা, পবিত্র হাদীস শরীফে এরকম নারীদের ব্যাপারে কড়া বাণী উল্লেখ হয়েছে যেমন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِى غَيْرِ مَابَأْس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ -

যে মহিলা কষ্টক্লেশ ব্যতিরেকে স্বামীর কাছে তালাক কামনা করে তার উপর জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।

সুতরাং বিনা প্রয়োজনে অন্যায়ভাবে স্বামীর সাথে খোলা করা স্ত্রী লোকদের জন্য উচিত নয়।

খোলা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اٰتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

তোমরা আপন স্ত্রীদের যা দিয়েছ তা থেকে বিন্দুমাত্র ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য হালাল হবে না। কিন্তু যদি স্বামী স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ পালন করতে না পারে। সুতরাং যখন তোমরা আশঙ্কা করবে যে উভয়ের দাম্পত্যের নিয়ম-নীতিগুলো রক্ষা করতে পারবে না, তখন নিজেকে মুক্ত করার জন্য স্ত্রী যা কিছু প্রদান করবে তাতে তাদের কোন গুনাহ নেই। এ হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা কাজেই একে কেউ অতিক্রম করো না। (বাকারা-২২৯)

আমরা উক্ত আয়াতে খোলার বিভিন্ন দিকের প্রমানাদি ও শর্তাবলী প্রাপ্ত হয়েছি। অধিকন্তু আলোচ্য আয়াতের فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ অংশ থেকে স্ত্রী তার আত্মমুক্তির জন্য স্বামীকে মাল প্রদানের এবং স্বামী তা গ্রহণপূর্বক বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার অনুমোদন হল।

قوله : طَلَاقٌ بَائِنٌ الخ : খোলা সংগটিত হলে তা তালাক নাকি বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হওয়া এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। আহনাফ হযরাতদের মতে স্বামী স্ত্রীর সাথে খোলা করলে তা এক তালাকে বায়েন হবে।

তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর এক অভিমত হচ্ছে যে, খোলা বিবাহ বিচ্ছিন্নকারী তা তালাককে আবশ্যক করে না। আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এ মতানৈক্য প্রকাশ পাওয়ার সূরত হচ্ছে যদি কেহ তার স্ত্রীকে দু তালাক দিয়ে দেয় অতঃপর স্ত্রী এ স্বামীর সাথে মালের বিনিময়ে খোলা করে। তবে আমাদের মতে উক্ত মহিলার উপর তিন তালাক পতিত হবে। তাই স্বামী উক্ত মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও সহবাসের পর তালাক প্রাপ্ত হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অভিমত অনুযায়ী উক্ত স্ত্রী দু তালাক প্রাপ্তাই হবে। আর খোলার কারণে তার উপর নতুন করে এক তালাক পতিত হবে না। বিধায় সে দু তালা্কে বায়েনাই থাকবে। এজন্য স্বামী তাকে পুণরায় বিবাহ করতে হলে দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক সহবাস ও তালাকের প্রয়োজন নাই।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর দলীল হচ্ছে : পবিত্র কুরআন শরীফে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 'তালাক দুবার' অতঃপর খোলার বিবরণ দেয়া হয়েছে :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فْتَدَتْ بِهِ 'বৈবাহিক বন্ধন মুক্তির জন্য স্ত্রী স্বামীকে অর্থ দিলে তাকে (প্রদানে ও গ্রহনে) তাদের কোন গুনাহ নেই।' তারপর সর্বশেষে বর্ণিত হয়েছে فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 'অতঃপর যদি কেহ তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না, অন্য স্বামীকে বিবাহ করা ছাড়া।' সুতরাং উক্ত আয়াতে প্রথমত দু তালাকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর খোলার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর আবার তালাকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি খোলা তালাক হতো তবে সর্বশেষে فَإِنْ طَلَّقَهَا বাক্যটি বলতেন না। আর যদি হানাফীদের মতামত অনুযায়ী খোলাকে তালাক গ্রহণ করা হয় তবে মোট তালাক তিনটির পরিবর্তে চারটি হয়ে যাবে। অথচ শরীয়ত তিনটি তালাককে নির্ধারিত করেছে। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে : বিবাহ ক্রয়-বিক্রয় এর মত একটি চুক্তি। সুতরাং অন্যান্য চুক্তি যেভাবে ভেঙ্গে দেয়া যায় তদ্রূপ বিবাহের চুক্তিকেও ভেঙ্গে দেয়া যা। যেমন, কুফু এর মিল না থাকলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার অভিবাবকগণ সংরক্ষণ করেন। এভাবেই দাসী স্বাধীনা হওয়ার পর, নাবালিকা সাবালিকা হওয়ার পর ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। সুতরাং খোলাটিও হচ্ছে বিবাহ চুক্তি ভঙ্গ করার নাম। তাতে তালাক পতিত হয় না।

আমাদের দলীল : রাসূল (সা.) এর বাণী اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ খোলা একটি বায়েন তালাক।

দ্বিতীয় দলীল : ইজাব কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণের) এর ভিত্তিতে যখন বিবাহ পূর্ণভাবে সংঘটিত হয়ে যাবে তখন তা তালাক ছাড়া বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আর কুফুর অমিলের অবস্থায়, দাসী স্বাধীনা হওয়ার অথবা অপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অবস্থায় তাদের ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের কারণে বিবাহ-ভেঙ্গে গেলে বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা বলা হয়। আর তা মূলত বিবাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে। পূর্ণ হওয়ার পর নয়, অথচ খোলা হয়ে থাকে বিবাহ পূর্ণ হওয়ার পর আর বিবাহ পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পর ভেঙ্গে যাওযার সম্ভাবনা রাখে না বিধায় খোলা বিবাহ ভঙ্গ নয়, বরং বিবাহ বিচ্ছেদ যা তালাক দ্বারা কার্যকর হয়। আমাদের এই দলীলের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দ্বিতীয় দলীলেরও জবাব হয়ে গেল।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর প্রথম দলীলের জবাব : পবিত্র কোরআনে الطلاق مرتان দ্বারা দু তালাকই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয় তালাককে দুভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হয়ত স্বামী অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদান করবে। সুতরাং খোলার ভিত্তিতে তালাককে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আর অর্থ ছাড়া স্বাভাবিক তালাককে فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যা মূল তিন তালাককেই শামিল করে। চার তালাক নয়, যেমন কেহ অপরকে বলল, আমাকে বইটি দিন। অতঃপর সে যদি অর্থের বিনিময়ে বই দান করে অথবা অর্থ ছাড়া বই দান করে তবে তো একটি বইই প্রদান করা হল। দুভাবে দেয়াতে দুইটি বই হল না। তদ্রূপ এখানে তৃতীয় তালাককে দুভাবে পতিত করার পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় দলীল হচ্ছে খোলা শব্দটি দ্বারা তালাকে বায়েন হওয়া সম্ভব। কেননা, এ শব্দটি তালাক প্রদানের শব্দাবলীর দু প্রকারের এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, শব্দটি অস্পষ্ট বাচক তথা কেনায়া শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর كناية শব্দাবলীর দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হয়। সুতরাং এখানেও খোলা দ্বারা এক তালাকে বায়েন পতিত হবে।

قوله : وَ لَزِمَهَا الْمَالُ : স্বামী যদি স্ত্রীকে মালের বিনিময়ে তালাক প্রদান করে আর স্ত্রী তা গ্রহণ করে তবে তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রীর উপর মাল আবশ্যক হবে। যেমন স্বামীর উক্তি : اَنْتِ طَالِقٌ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ বা اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ (তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তালাক)

স্ত্রীর উপর মাল আবশ্যক হওয়ার দলীল : ইহা একটি বিনিময় চুক্তি আর বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে প্রদানের ও গ্রহণের যোগ্যতা থাকার সাথে সাথে স্থানের যোগ্যতা অপরিহার্য। আর এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর মাল আবশ্যক হয়।

قوله : وَ كُرِهَ لَهُ اَخْذُ شَيْءٍ الخ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার খোলার করার কারণ হিসাবে যদি অন্যায় আচরণ বা

স্বামীর অবাধ্যতা বা যে কেউ অন্যজনের প্রতি অবজ্ঞা অনীহা প্রকাশ হয়। সুতরাং একাজগুলো স্বামী বা স্ত্রী যে কোন একজনের নিকট থেকে প্রকাশ হতে পারে। সুতরাং এহেন অন্যায় আচরণ যদি স্বামীর নিকট থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে স্বামী খোলা সূত্রে স্ত্রীর নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা মাকরূহ এর দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

وَ اِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ (اِلٰى اَنْ قَالَ) فَلَا تَاْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও .... তাদের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করো না।' উক্ত আয়াতে স্বামীর অন্যায় আচরণের কারণে স্ত্রী খোলা করতে বাধ্য হলে স্বামীদেরকে স্ত্রীদের থেকে কোন কিছু বিনিময় সরূপ না নেয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। এজন্য এক্ষেত্রে স্বামীদের কোন কিছু নেয়া মাকরূহ। অধিকন্তু যদি স্বামীরা তাদের এহেন আচরণের পরও স্ত্রীদের নিকট থেকে মাল নিয়ে নেয় তবে তা বৈধ হবে। কেননা, فلا تَاخذ منه شيئا বলে যে নিষিদ্ধতা বুঝানো হয়েছে। তা অন্য কারণে নিষিদ্ধ মুলগতভাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। যেমন জুমআর আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি কেহ ক্রয়-বিক্রয় এর সকল শর্ত মত ক্রয়-বিক্রয় করে ফেলে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা, এ নিষিদ্ধতা نهى لغيره (পারিপার্শ্বিক কারণে নিষিদ্ধ) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে : স্বামী এ স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করায় তাকে কষ্ট দিচ্ছে এখন যদি আবার তার কাছ থেকে মাল গ্রহণ পূর্বক তালাক প্রদান করে তবে তো তার কষ্ট ক্লেশকে আরো বাড়ানো হল এজন্য স্বামী এহেন অবস্থায় তার থেকে মাল নেয়া মাকরূহ। আর যদি অবজ্ঞা, অনিহা, বা অবাধ্যতা বাদ আচরণ ইত্যাদি স্ত্রীর নিকট থেকে প্রকাশ পায় তবে স্বামীর জন্য মাল গ্রহণ পূর্বক তালাক প্রদান করা মাকরূহ নয়, কেননা, কোরআনের আয়াত। فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ উক্ত আয়াতে নিঃশর্তভাবে খোলার বিনিময় গ্রহণের বৈধতা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মূলত এক্ষেত্রে স্বামী অপরাধী নয় যে সে তালাক দানের প্রতি আগ্রহী, বরং স্ত্রীর কাজে-কর্মে সে বাধ্য হচ্ছে উক্ত স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করতে এজন্য স্ত্রী স্বামীকে আর্থিক বিনিময় দিয়ে তার থেকে তালাক গ্রহণ করবে। তাই তা স্বামীর জন্য গ্রহণ করা মাকরূহ নয়।

قوله : وَ مَا صَلُحَ مَهْرًا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে একটি মূলনীতি বর্ণনা করতেছেন। তা হল : যা বিবাহে মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে তা খোলার ক্ষেত্রে বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা, যা প্রথমত সম্ভোগ অঙ্গের বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে তা পরবর্তীতে মূল্যহীন সম্ভোগ-অঙ্গের বিনিময় হতে পারা অতি স্বাভাবিক। অর্থাৎ, বিবাহের ক্ষেত্রে সম্ভোগ মালস্বরূপ ছিল, কিন্তু খোলার সময় তা মূল্যহীন।

এজন্য যা মালের মূল্য হতে পারে তা অবশ্যই মাল নয় এমন বিষয়ের মূল্য হতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। অর্থাৎ, খোলার ক্ষেত্রে যা বিনিময় হওয়ার যোগ্য তা বিবাহের ক্ষেত্রে মহর হওয়ার যোগ্য হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, খোলার ক্ষেত্রে মালের কোন নির্দিষ্টতা নেই। পক্ষান্তরে বিবাহের মহরের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দশ দিরহাম হতে হবে।

قوله : فَاِنْ خَلَعَهَا الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে খোলা করে আর তার বিনিময়ে এমন মাল নির্ধারণ করে যা শরীয়াত সম্মত নয়, যেমন স্বামী মদ, শুকর, মৃত প্রাণী ইত্যাদির বিনিময়ে নিজ স্ত্রীর সাথে খোলা করে তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং বিনিময়কৃত বস্তু বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, স্ত্রীর উপর কোন মাল আবশ্যক হবে না। আর যদি স্বামী এমন কোন মালের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে যা শরীয়াত সম্মত নয় আর স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় এবং এ তালাক তৃতীয় তালাক না হয়ে থাকে তবে এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। আর বিনিময় কৃত বস্তু বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্ত্রীর উপর কোন মাল নতুন করে আবশ্যক হবে না। উভয় ক্ষেত্রে তালাক পতিত হওয়ার কারণ হচ্ছে : স্বামী তার তালাক প্রদানকে স্ত্রীর সম্মতির সাথে শর্তযুক্ত

করেছে। আর স্ত্রী এতে সম্মতি প্রকাশ করেছে এজন্য তালাক পতিত হবে। তবে প্রথম সুরতে বায়েন আর দ্বিতীয় সুরতে রাজঈ পতিত হবে। কারণ, উভয় বিনিময় বাতিল হয়ে গেল তখন তালাক পতিত হওয়ার শব্দগুলো বাকি থাকল। সুতরাং প্রথম সুরতে তালাক পতিত হওয়ার শব্দটি হচ্ছে খোলা خلع যা অস্পষ্ট শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর অস্পষ্ট শব্দাবলীর মধ্য থেকে তিনটি শব্দ (অর্থাৎ, اِعْتَدِّىْ - اَنْتِ وَاحِدَةٌ - اِخْتَارِىْ) ছাড়া বাকি শব্দাবলীর দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হবে।

আর দ্বিতীয় সূরতে তালাক পতিত হওয়ার শব্দটি হচ্ছে انت طالق। যা তালাকের স্পষ্ট শব্দ। আর স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাকে রাজঈ পতিত হয় বিধায় এ দ্বিতীয় সুরতে তালাকে রাজঈ পতিত হবে।

আর উভয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিনিময়টি প্রদান যোগ্য না হওয়াতে স্ত্রীর উপর নতুন করে বিনিময় আবশ্যক হবে না। কেননা, স্ত্রী এমন কোন মালের উল্লেখ করেনি শরয়ীভাবে যার মূল্য আছে। আর এখন সে প্রতারক সাব্যস্ত হচ্ছে। এজন্য তার উপর কোন মূল্য ওয়াজিব হবে না।

স্ত্রীর উপর বিনিময় আবশ্যক না হওয়ার অন্য কারণ হচ্ছে : বিনিময় সাব্যস্ত হয় দুটি পন্থায় (১) চুক্তির সময় যা উল্লেখ করা হয় তা (২) অথবা উল্লেখ করা হয়নি এমন কিছু সাব্যস্ত করা। এখানে প্রথমটি সাব্যস্ত হবে না। কেননা, মুসলমান শুকর মদ ইত্যাদি আদান-প্রদান করতে পারে না। আর দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, স্ত্রী ইহার দায়বদ্ধতা স্বীকার করেনি।

আর যদি কোন নির্ধারিত শিরকার পাত্রের বা অন্য কোন হালাল প্রাপ্য নির্ধারিত করে খোলার বিনিময় নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর দেখা গেল যে, তা শিরকা নয়, বা ইঙ্গিতকৃত হালাল পণ্য না হয়ে হারাম কোন পণ্য হয়। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মহরে মিছিল পরিমাণ অর্থ স্বামীকে দিতে হবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে শিরকার ক্ষেত্রে এ পাত্র পরিমাণ শিরকা তার উপর আবশ্যক হবে। (তালাক অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে) স্ত্রীর উপর মাল আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে মুসলমানের কাছে মাল পরিগণিত হয় এমন কিছুর উল্লেখ করেছে, কিন্তু তার খেলাফ পাওয়ায় সে প্রতারণাকারী সাব্যস্ত হল বিধায় তার উপর জরিমানা আবশ্যক হবে।

قوله : كَخَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ الخ : স্ত্রী যদি তার স্বামীর সাথে তার হাতে যা আছে তার উপর খোলা করে অতঃপর তার হাতে কোন কিছু পাওয়া গেল না, তবে স্ত্রীর উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। কেননা, সে এক্ষেত্রে প্রতারণাকারী সাব্যস্ত হল না। সে তো কোন মালের উল্লেখ করেনি। আর যদি সে তার কথার মধ্যে مِنْ مَالٍ বা مِنْ دَرَاهِمَ এর উল্লেখ করে অর্থাৎ, সে বলে خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ مَالٍ আমার হাতে যে মাল রয়েছে সেগুলোর বিনিময়ে আমার সাথে খোলা কর। অতঃপর স্বামী তার সাথে খোলা করল, কিন্তু স্ত্রীর হাতে কোন মাল পাওয়া গেল না। তাহলে স্ত্রীর উপর মহর পরিমাণ মাল স্বামীকে দেওয়া আবশ্যক হবে। কেননা, স্ত্রীর মাল উল্লেখ করার উপরই স্বামী তার সাথে খোলা করেছে। তাই প্রতিয়মান হল যে স্বামী অবশ্যই বিনিময় ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে রাজি নয়। আর যদি স্ত্রী বলে, خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ دَرَاهِمَ (আমার হাতে যে দিরহাম আছে এর বিনিময়ে আমার সাথে খোলা কর) অতঃপর স্বামী খোলা করে কিন্তু তার হাতে কোন দিরহাম পাওয়া গেল না, তবে স্ত্রীর উপর তিনটি দিরহাম আবশ্যক হবে। কেননা, স্ত্রীর উক্তির মধ্যে دَرَاهِمَ টি বহুবচনের শব্দ। আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা আরবীতে তিনই হয়ে থাকে। এজন্য তিন দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর এখানে ব্যবহৃত مِنْ টি হচ্ছে বর্ণনার জন্য বিভাজনের জন্য নয়। যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ বাক্যে مِنْ অব্যয়টি বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

فَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ أَبَقَ لَهَا عَلَى أَنَّهَا بَرِيَّةٌ من ضَمَانِهِ لم تَبرأْ قالت طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً له ثُلُثُ الْأَلْفِ وَبَانَتْ وفي عَلَى أَلْفٍ وَقَعَ رَجْعِيٌّ مَجَّانًا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أو على أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لم يَقَعْ شَيْءٌ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أو عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ لَزِمَ وَبَانَتْ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ أو أَنْتِ حُرٌّ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ طُلِّقَتْ وَعُتِقَ مَجَّانًا-

অনুবাদ : আর যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে পলাতক গোলামের বিনিময়ে খোলা করে, এ শর্তে যে স্ত্রী ঐ গোলামের জামানত থেকে মুক্ত তাহলে স্ত্রী (জামানাত থেকে) মুক্ত হবে না। (আর যদি) স্ত্রী বলে আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান কর। অতঃপর স্বামী এক তালাক প্রদান করল, তাহলে স্বামীর জন্য এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্য হবে এবং স্ত্রী বায়েনা হবে। আর عَلَى أَلْفٍ এক হাজারের শর্তে এর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ, যদি স্ত্রী বলে আমাকে এক হাজার টাকার শর্তে তিন তালাক প্রদান কর। অতঃপর স্বামী তাকে এক তালাক করে) এক কোন কিছু আরোপিত না হওয়া অবস্থায় এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে। (আর যদি স্বামী বলে) তুমি নিজেকে এক হাজারের বিনিময়ে কিংবা এক হাজারের শর্তে তিন তালাক প্রদান কর। অতঃপর স্ত্রী (তার নিজেকে) এক তালাক প্রদান করল। তা হলে কোন কিছু পতিত হবে না। (আর যদি স্বামী বলে) তুমি তালাক প্রাপ্তা এক হাজারের বিনিময়ে কিংবা এক হাজরের শর্তে। অতঃপর স্ত্রী তা গ্রহণ করল তবে তা আবশ্যক হবে এবং স্ত্রী বায়েন হয়ে যাবে। (আর যদি স্বামী বলে) তুমি তালাক আর তোমার উপর এক হাজার অথবা (দাসকে মুনিব বলে) তুমি স্বাধীন আর তোমার উপর এক হাজার তা হলে স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হবে আর দাস স্বাধীন হবে। কোন কিছু আরোপিত না হওয়া অবস্থায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ الخ : স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে খোলা করে এবং তার বিনিময় হিসাবে নির্ধারণ করে তার পালাতক গোলামকে এ শর্তে যে যদি সে আমার হস্তগত হয় তবে তা আপনাকে প্রদান করব। আর যদি সে পালাতকই থেকে যায় এবং আমার হস্তগত না হয় তবে আমি তার দায় মুক্ত, অর্থাৎ গোলাম খোজে বের করা এবং স্বামীর হাতে অর্পন করতে আমার উপর কোন বল প্রয়োগ বা চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। স্ত্রীর এ রকম শর্ত করার পরও সে জামানত মুক্ত হবে না। বরং যদি গোলাম খোজে পাওয়া যায় তবে গোলামকেই স্বামীর হাতে অর্পণ করতে হবে। আর যদি গোলাম পাওয়া না যায় তবে গোলামের মূল্য স্বামীকে প্রদান করতে হবে। কেননা, খোলা হচ্ছে একটি বিনিময় চুক্তি যা বিনিময় প্রদানকে আবশ্যক করে। সুতরাং স্ত্রীর দায় মুক্ত হওয়ার শর্তটি হচ্ছে শর্তে ফাসিদ আর, আর শর্তে ফাসিদ দ্বারা খোলা বিলুপ্ত হয় না। বরং খোলার চুক্তি ঠিক থাকবে আর জামানত মুক্তির কথা বাতিল হবে। এজন্য স্ত্রীর উপর উল্লেখকৃত গোলাম আপন করা আবশ্যক হবে। আর যদি স্ত্রী তা অর্পণ করতে সক্ষম না হয় তবে তার মূল্য দ্বারা খোলার চুক্তি বহাল রাখবে এবং স্বামীকে গোলামের মূল্য প্রদান করবে।

قوله : قَالَتْ طَلِّقْنِى ثَلَاثًا الخ : স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে طَلِّقْنِى ثَلَاثًا بِأَلْفٍ 'আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক প্রদান কর।' অতঃপর স্বামী তাকে এক তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন

পতিত হবে। আর এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ আবশ্যক হবে। কেননা, স্ত্রীর এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ আবশ্যক হবে। কেননা, স্ত্রীর এক হাজারের বিনিময়ে তিন তালাক চাওয়া যেমন সে প্রতিটি তালাক এক হাজারের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে চেয়েছে। কারণ, আলোচ্য বাক্যে ব্যবহৃত (باء) অব্যয়টি বদলে প্রদত্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয় তবে এ বদল যে বস্তুর বিনিময়ে প্রদত্ত তার অনুপাতে বিভাজ্য হয়। এজন্য এক হাজার তিন তালাকের উপর বিভক্ত হবে, আর তালাকটি যেহেতু মালের বিনিময়ে পতিত হয়েছে এজন্য তা বায়েন হবে।

قوله : وَ فِيْ عَلٰى اَلْفٍ : যদি স্ত্রী আপন স্বামীকে বলে طَلِّقْنِيْ ثَلَاثًا عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ 'এক হাজারের শর্তে আমাকে তিন তালাক প্রদান কর' অতঃপর স্বামী এক তালাক প্রদান করল। সুতরাং স্বামীর এ তালাক রাজঈ হবে নাকি বায়েন হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে এক্ষেত্রে তালাকে রাজঈ পতিত হবে। এবং স্ত্রীর উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। এবং স্ত্রীর উপর এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ আবশ্যক হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এরও অনুরূপ অভিমত।

তাদের দলীল হচ্ছে : মালের বিনিময়ে তালাক ইহা একটি বিনিময় চুক্তি। আর সকল বিনিময়ের ক্ষেত্রে শর্ত বোধক 'على' বিনিময় বোধক باء এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, সকল বিনিময় বোধক চুক্তির ক্ষেত্রে على ও باء এর হুকুম সমান। সুতরাং প্রথম মাসআলায় যেভাবে এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ আবশ্যক হয়েছে আর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়েছে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাতেও এক তালাকে বায়েন পতিত হবে এবং স্ত্রীর উপর এক হাজারের এক তৃতীয়াংশ আবশ্যক হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল, আলোচ্য বাক্যে على শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর على এর প্রকৃত ব্যবহার হচ্ছে কোন কিছুর উপর হওয়াকে বুঝায়। যেমন زيد على السطح (যায়েদ ছাদের উপর) আর যেখানে উপরের অর্থ নেয়া অসম্ভব সে ক্ষেত্রে লাযিম এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর যেখানে লাযিম অর্থে ব্যবহার করা অসম্ভব সে ক্ষেত্রে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা, শর্ত ও লাযিমের মধ্যে মিল রয়েছে। অর্থাৎ, লাযিম ও মালযুমের মাঝে যেভাবে আবশ্যকীয়তার অর্থ বিদ্যমান তেমনি শর্ত ও জাযার মধ্যেও আবশ্যকীয়তার অর্থ বিদ্যমান على শব্দ শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআন থেকে যে, يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا - এখানে على অব্যয়টি শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে যে, আল্লহর সাথে শিরক না করা বাইআত এর শর্ত তদ্রূপ মানুষের কথা اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَنْتِ تَدْخُلِى الدَّارَ উক্ত বাক্যের মধ্যেও ঘরে প্রবেশ তালাক পতিত হওয়ার শর্ত। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে على অব্যয়টি শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর শর্তের অংশ বিশেষের উপর শর্ত যুক্ত বিষয় বিভাজ্য হয় না। কেননা, যুক্ত বিষয় পাওয়া যায় শর্ত পাওয়া গেলে, শর্তের অংশ বিশেষ পাওয়া গেলেই শর্তযুক্ত বিষয়ের অংশ বিশেষ পাওয়া যাবে এমন নয়। কিন্তু باء অব্যয় এর বিপরীত। সুতরাং উল্লিখিত মাসআলায় ও على কে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত করায় স্ত্রীর طَلِّقْنِيْ ثَلَاثًا عَلٰى اَلْفٍ এর জবাবে স্বামীর এক তালাক প্রদান করাতে স্ত্রীর কথার জবাব সরূপ হবে না, বরং ইহা নতুনভাবে তালাক পতিত হয়েছে বলা হবে। আর এর দ্বারা এক তালাকে রাজঈ পতিত হবে, এবং স্ত্রীর উপর কিছুই আবশ্যক হবে না।

قوله : طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ (তুমি নিজেকে এক হাজারের বিনিময়ে বা এক হাজারের শর্তে তিন তালাক প্রদান কর) অতঃপর স্ত্রী তার নিজিনে এক তালাক প্রদান করল তবে কোন তালাক পতিত হবে না। এর দলীল হচ্ছে স্বামী তাকে বায়েন তালাক প্রদান করতে সম্মত হল, এক হাজার টাকা পাওয়ার প্রত্যাশী হয়ে। ইহা প্রমাণ করে যে সে এক হাজারের কমে তালাক তার হস্তক্ষেপ থেকে প্রত্যাহার করেনি। এজন্য স্ত্রী যদি তার নিজেকে এক তালাক প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ اَوْ بِاَلْفٍ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে اَنْتِ طَالِقٌ بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ 'তুমি এক হাজারের বিনিময়ে কিংবা এক হাজারের শর্তে তালাক।' অতঃপর স্ত্রী তা গ্রহণ করে তবে সে এক তালাকে বায়েন হবে এবং স্ত্রীর উপর এক হাজারই আবশ্যক হবে। কেননা, بِاَلْفٍ এর সুরতে অর্থ হবে ঐ এক হাজারের বিনিময়ে তুমি তালাক যা তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া শর্ত, আর عَلٰى اَلْفٍ এর সুরতে অর্থ হবে এক হাজারের শর্তে তোমাকে তালাক। সুতরাং بالف এর সুরতে বিনিময় গ্রহণের অবস্থায় বিনিময় কৃত বস্তু তথা তালাক আবশ্যক হবে। তদ্রূপ عَلٰى اَلْفٍ এর সুরতে শর্ত সংঘটিত হওয়ার অবস্থায় শর্তযুক্ত বস্তুটি তথা তালাক আবশ্যক হবে। অতএব স্ত্রী এক হাজারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। আর বিনিময়ের বদলা স্বরূপ যে তালাক হয়, তা তালাকে বায়েনই হবে।

قوله : اَنْتِ طَالِقٌ وَ عَلَيْكِ اَلْفٌ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে انت طالق و عليك الف 'তোমাকে তালাক আর তোমার উপর এক হাজার' অথবা মনিব তার গোলামকে বলে انت حُرٌّ و عليك الف তুমি স্বাধীন আর তোমার উপর এক হাজার অতঃপর উভয় সম্মত হল গোলাম আজাদ হবে আর স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রী বা গোলাম কারো উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) স্ত্রী বা গোলাম সম্মত হলে তাদের উপর এক হাজার আবশ্যক হবে। আর যদি তারা সম্মত না হয় তবে তাদের উপর কোন টাকা আবশ্যক হবে না। তদ্রূপ তাদের উপর আজাদী/ তালাক সংঘটিত হবে না।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল : উভয় ক্ষেত্রে عليك الف বাক্যটি বিনিময় বাচক আর খোলা যেহেতু বিনিময় চুক্তি তাই عليك الف বাক্যটির মধ্যকার واو বর্ণটি باء অব্যয় এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিনিময়ের অর্থ প্রদান করেছে সুতরাং স্বামীর উক্তি انت طالق و عليك الف বাক্যটি انت طالق بالف এর ন্যায় হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদি স্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে এবং স্ত্রীর দায়িত্বে এক হাজার টাকা আবশ্যক হবে; (তেমনি এখানে ও স্ত্রী ও তার দাস এক হাজারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে এবং গোলামের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রযোজ্য হবে এবং সাথে সাথে তাদের উপর এক হাজার টাকা আবশ্যক হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : عليك الف বাক্যটি مبتداء ও خبر হিসাবে পূর্ণ বাক্য। তাই উপযুক্ত কারণ ছাড়া তা পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা, বাক্যটি পৃথকভাবে অর্থ প্রকাশ করা বা হুকুম প্রযোজ্য হওয়া ইহা প্রতিটি বাক্যের মৌলিক প্রকৃতি। আর আমাদের মাসআলায় عليك الف বাক্যটি তার পূর্বোক্ত বাক্য انت طالق এর সাথে সম্পৃক্ত করার কোন কারণ ব্যাকরণগত বা ইঙ্গিতগত কোনভাবে কোন কারণ নেই। কেননা. এ ধরণের শর্ত ছাড়াও তালাক বা স্বাধীনতা পতিত হতে পারে। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাক বা স্বাধীনতা প্রদান করতে কোনরূপ বিনিময় নেয়া হয় না। এজন্য আমাদের মাযহাব অনুযায়ী স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হবে انت طالق দ্বারা। আর و عليك الف ইহা সমর্থক হবে। আর গোলাম স্বাধীন হবে انت حرٌّ দ্বারা। আর وعليك الف ইহা অনর্থক হবে।

وَصَحَّ خِيَارُ الشَّرْطِ لها لَا له طَلَّقْتُكِ أَمْسِ بِأَلْفٍ فلم تَقْبَلِي وَقَالَتْ قَبِلْتُ صُدِّقَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ كُلَّ حَقٍّ لِكُلٍّ وَاحِدٍ على الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ حتى لو خَالَعَهَا أو باراها بِمَالٍ مَعْلُومٍ كان لِلزَّوْجِ ما سَمَّتْ له ولم يَبْقَ لإحدهما قِبَلَ صَاحِبِهِ دَعْوَى في الْمَهْرِ مَقْبُوضًا كان أو غير مَقْبُوضٍ قبل الدُّخُولِ بها أو بَعْدَه وَلَوْ خَلَعَ صَغِيرَةً بِمَالِهَا لم يَجُزْ عليها وَلَوْ بِأَلْفٍ على أَنَّهُ ضَامِنٌ طُلِّقَتْ وَالْأَلْفُ عليه -

অনুবাদ : খোলার ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য خيار شرط বৈধ, তবে স্বামীর জন্য তা বৈধ নয়। (আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে) গতকাল তোমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তালাক দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি গ্রহণ করনি, তখন স্ত্রী বলল, আমি কবুল করেছি, তবে স্বামীকে (তার কথা বিশুদ্ধ হিসাবে) সত্যায়ন করা হবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় এর ব্যতিক্রম (কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এ ধরনের কথার উপর ক্রেতাকে সত্যায়ণকরা হবে।) আর খোলা এবং মোবারাত (পরস্পরকে দায়-দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান) একের অপরের বিবাহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রাপ্য হক রহিত করে দেয়। এমনকি যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে খোলা করে কিংবা মুবারাত করে তবে স্বামীর জন্য হবে যা স্ত্রী তার জন্য নির্ধারণ করেছে। স্বামী-স্ত্রী কেহ কারো নিকট মহরের দাবীর ইচ্ছাধিকার বাকি থাকবে না (মহরটি) কবজকৃত হউক বা না হউক সহবাসের পূর্বে হউক বা পরে আর কেউ যদি নাবালিকার পক্ষ হতে তার অর্থের বিনিময়ে (তার স্বামীর সাথে) খোলা করে তবে তা কন্যার উপর কার্যকর হবে না এবং তালাক পতিত হবে। আর যদি এক হাজারের বিনিময়ে (খোলা করা) হয় এশর্তে যে সে (খোলাকারী অভিবাবক) জামিন তবে তালাক পতিত হবে আর এক হাজার তার (জামিন দারের) উপর আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

وَصَحَّ خِيَارُ الشَّرْطِ : খোলার চুক্তির মধ্যে خيار شرط ইচ্ছাধিকারের শর্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য স্বামীর জন্য সহীহ নয়। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে স্বামী স্ত্রী কারও জন্য খোলা চুক্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকারের শর্ত নেই। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল انت طالق على الف على انى بالخيار ثلثةَ ايام 'তুমি এক হাজারের শর্তে তালাক তবে শর্ত এই যে, আমার তিন দিনের এখতিয়ার রয়েছে'। এ অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও সাহাবাইন (রহ.) সকলের মতে স্বামীর ইচ্ছাধীকার বাতিল বলে গণ্য হবে, স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হইবে এবং এক হাজার তার উপর আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, স্বামীর জন্য কোন এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে না। আর যদি স্বামী বলে اَنْتِ طَالِقٌ عَلٰى اَلْفٍ عَلٰى اَنَّكِ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ 'তোমাকে এক হাজারের শর্তে তালাক তবে শর্ত এই যে, তোমার তিন দিনের এখতিয়ার রয়েছে।' এ অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রীর জন্য ইচ্ছাধিকার রয়েছে সে যদি চায় তবে তিন দিনের ভেতর তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। আর যদি সে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ কোন কিছু করে না এমতাবস্থায় তিন দিন শেষ হয়ে যায় তবে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। এবং তার উপর এক হাজার টাকা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে প্রথম মাসআলায় যেভাবে স্বামীর জন্য কোন এখতিয়ার ছিল না তদ্রূপ উক্ত মাসআলাতে ও স্ত্রীর কোন ইচ্ছাধিকার থাকবে না, বরং তালাক পতিত

হবে এবং তার উপর এক হাজার টাকা আবশ্যক হবে। উভয় মাসআলাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত না হওয়ার দলীল হচ্ছে : এখতিয়ার বা ইচ্ছাধিকারকে শরীয়াত অনুমোদন করেছে রহিত করার জন্য। আর খোলা রহিত হতে পারে না। তাই উভয় অবস্থায় এ এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এখতিয়ারের বিষয়টি মৌলিকভাবে কোন বস্তু সংঘটিত হওয়ার পর তা রহিত করণের জন্য শরীয়াত অনুমোদন করেছে। কোন বস্তু সংঘটিত হওয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য নয়। তাই আলোচ্য মাসআলায় রহিত হওয়া সম্ভব নয়। আর তা স্বামীর পক্ষ থেকেও সম্ভব নয়। তদ্রূপ স্ত্রীর পক্ষ থেকেও সম্ভব নয়। কেননা, খোলা হচ্ছে স্বামীর পক্ষ থেকে শপথ। তাই শপথ বা ইয়ামিন রহিত করা যায় না। বিধায় স্বামীর পক্ষ থেকে রহিত করা সম্ভব নয়। তেমনি স্ত্রীর পক্ষ থেকেও তা রহিত করা সম্ভবপর নয়। কেননা, স্ত্রী গ্রহণ করা ইয়ামিনের জন্য শর্ত। সুতরাং যেভাবে ইয়ামিন রহিত হতে পারে না তদ্রূপ তার শর্তও রহিত হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হচ্ছে : খোলা স্ত্রীর পক্ষে বিক্রয়ের মত। কেননা, সে বিনিময় হিসাবে স্বামীকে সম্পদের মালিক বানাচ্ছে। কেননা, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করা বিশুদ্ধ এবং মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে তদ্রূপ খোলার ক্ষেত্রে স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখে এবং মজলিসের বাইরে তার হুকুমটি বিলম্বিত হয় না। তাই একথা প্রতিয়মান হল যে, খোলা ক্রয় বিক্রয় সমতুল্য। এজন্য ক্রয় বিক্রয়ে যেভাবে ইচ্ছাধীকারের শর্তটি বিশুদ্ধ তেমনি খোলার ক্ষেত্রে ও ইচ্ছাধীকারের শর্তটি স্ত্রীর পক্ষে করা বিশুদ্ধ কিন্তু খোলা স্বামীর ক্ষেত্রে শপথ বা ইয়ামিনের মত। তাই স্বামী ইচ্ছা করলেই খোলা করার পর তা আর প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কেননা, শপথের ক্ষেত্রে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এখতিয়ার থাকে না। বিধায় স্বামীর জন্য খোলা করার পর ইচ্ছাধীকার বাকি থাকবে না।

قوله : وَ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে আমি গতকাল তোমাকে এক হাজারের বিনিময়ে তালাক দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করনি। অতঃপর স্ত্রী বলে আমি গ্রহণ করে ছিলাম। তাহলে স্বামীর কথা শপথ সহ গ্রহণ হবে। কেননা, স্বামী তালাককে স্ত্রীর মাল গ্রহণের উপর শর্তারোপ করেছে আর এ ধরণের শর্তারোপ করার নামই হচ্ছে শপথ। আর যে শপথ করে তার শপথ করার দ্বারা তা পরিপূর্ণ হয়ে যায় সুতরাং স্বামীর পক্ষ থেকে শপথ উচ্চারণ করা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সম্পদ গ্রহণ করার স্বীকার করাকে বুঝায় না। কেননা, শর্ত ছাড়াও শপথ বিশুদ্ধ হয়ে যায়। এজন্য স্বামীর উক্তি তুমি তা গ্রহণ করনি। নিজ কথা প্রত্যাখ্যান বুঝায় না। এজন্য স্বামীর কথা শপথ সহ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ক্রয় বিক্রয় এর বিপরিত যেমন কোন ব্যক্তি অপর জনকে বলল, গতকাল আমি তোমার নিকট গরুটি এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রিয় করেছিলাম। আর তুমি তা গ্রহণ করনি। অতঃপর ক্রেতা বলল, আমি গ্রহণ করে ছিলাম তবে এক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, ক্রেতার গ্রহণ ব্যতিত বিক্রয় চুক্তির অস্তত্বিই অসম্ভব। এজন্য বিক্রেতা যখন বিক্রি সংঘটিত হওয়ার কথা স্বীকার করল তখন সে মূলত এমন কথারও স্বীকার করেছে যা ছাড়া বিক্রির এ অস্তিত্ব অসম্ভব অর্থাৎ, ক্রেতার তা গ্রহণ করা। অতঃপর যখন বিক্রেতা বলল, তুমি তা গ্রহণ করনি নিজ কথাকে প্রত্যাহার করার নামান্তর। তাই ক্রেতার কথা গ্রহণ যোগ্য হবে। সুতরাং একটিকে অপরটির সাথে কিয়াস করা সহীহ হবে না।

قوله : وَ يَسْقُطُ الْخُلْعُ الخ : মুবারাত হল খোলা এর ন্যায় অর্থাৎ, পরস্পরকে বৈবাহিক দায়-দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান। যেমন মহর এবং বিগত দিনের খোরপোষ আর হা যদি খোলা ইদ্দতকালীন সময়ের খোশপোশের বিনিময়েই করে থাকে তবে তা রহিত হয়ে যাবে। আর বাসস্থান খরচ রহিত হয় না কেননা, তা শরীয়াতের হক আর শরীয়াতের হক্ব কেহ রহিত করতে পারে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে খোলা ও মুবারাতের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী যা উল্লেখ করবে এবং উভয় এক হবে। তাই রহিত হয়। আর যা উল্লেখ করবে না তা রহিত হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মুবারাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা

(রহ.) যা ব্যক্ত করেছেন তাই। আর খোলার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যা ব্যক্ত করেছেন তাই। ইমামগণের মতপার্থক্য একটি দৃষ্টান্তে প্রকাশ পায় যেমন কোন স্ত্রীর মহর এক হাজার ধার্য করা হয়েছে। অতঃপর সঙ্গমের পূর্বেই স্বামীর সাথে এক শত টাকার বিনিময়ে খোলা করে নিল। এখানেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, স্ত্রী তার স্বামী থেকে মহরের বাকী অংশ ফেরত চাইতে পারবে না। কেননা, খোলা করার কারণে মহর রহিত হয়ে গেছে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অবশিষ্ট অংশ ফেরত নিতে পারবে। কেননা, খোলার কারণে মহর রহিত হয়ে গেছে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অবশিষ্ট অংশ ফেরত নিতে পারবে। কেননা, খোলার সময় যা উল্লেখ করা হয়েছে তাই স্বামী হক্বদার। এ খোলার দ্বারা বাকী অন্য কিছু আর রহিত হয় না।

সুতরাং স্ত্রীর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রাপ্তা হওয়ায় পাঁচশত দিরহামের মালিক ছিল কিন্তু যেহেতু একশত দিরহামের উপর খোলা হয়েছে তাই তা রহিত হয়ে যাবে বাকি চারশত স্বামীর নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে।

অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী পূর্ণ এক হাজার টাকা নিয়ে নেয় আর একশত টাকার বিনিময়ে খোলা করে ফেলে সহবাসের পূর্বে, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে বাকি অংশ ফেরত নিতে পারবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে স্বামী-স্ত্রীর নিকট থেকে খোলার একশত টাকাসহ মোট ছয়শত টাকা ফেরত নিতে পারবে। কেননা, সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়াতে স্ত্রী পাঁচশত টাকার মালিক হয়েছে, তাই স্বামী এক হাজার থেকে বাকি পাঁচশত টাকা এবং খোলার একশত টাকা ফেরত নিতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলীল হল : খোলাও মুবারাত উভয়টি বিনিময় যোগ্য লেনদেন। আর বিনিময় যোগ্য লেনদেনে তাই আবশ্যক হয় যা বিনিময়কালিন সময়ে উল্লেখ হয়। এজন্য খোলা ও মুবারাআতে তাই রহিত হবে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যা উল্লেখ করা হয় নাই, তা রহিত হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) এর দলীল : مُبَارَأَةٌ শব্দটি বাবে مفاعلة থেকে ব্যবহৃত যার অর্থ পরস্পরকে দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান সুতরাং তা স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের দায়মুক্তির দাবি করে। অনুরূপভাবে بَرَاءَةٌ শব্দটি ব্যাপক, যা সকল ধরনের বিষয়ের দায়মুক্তিকেই বুঝাবে। তা বিবাহের সাথে সম্পর্কিত হউক কিংবা অন্যের সাথে সম্পর্কিত হউক। কিন্তু এ ব্যাপকতা থেকে আমরা বৈবাহিক বিষয়াদিকেই বুঝিয়েছি। আর তা হচ্ছে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ যা বিবাহের কারণে সৃষ্ট হয়েছে এজন্য বিবাহের দ্বারা যেসব দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেসব রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু খোলা এর ব্যতিক্রম। কেননা, এক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হলেই তার বিনিময় অর্থ বা মাল আবশ্যক হয়। অন্যান্য দায়মুক্তির প্রয়োজন হয় না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : খোলা শব্দের অর্থ হল পৃথক করা। যেমন বলা হয় خَلَعَ النَّعْلَ সে জুতা খুলল। সুতরাং তা মুবারাআতের ন্যায় শর্তমুক্তভাবে উচ্চারণের অবস্থায়, বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধান এবং হক্বসমূহের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। স্বামী স্ত্রী তা উল্লেখ করুক বা না করুক তবে ইদ্দতকালীন খোরপোশ ও বাসস্থানের খরচ রহিত হবে না। কেননা, তা শরীয়াতের হক্ব। তবে হা যদি স্ত্রী ইদ্দতকালীন সময়ের খোরপোশ এর বিনিময়ে খোলা করে তবে তা রহিত হবে। কিন্তু এমতাবস্থায় ও বাসস্থানের খরচ স্বামীর উপর থেকে রহিত হবে না। কেননা, তা শরীয়াতের হক্ব যা রহিত করলেও রহিত হয় না।

قوله : وَإِنْ خَلَعَ صَغِيرَتَهُ الخ : যদি কোন পিতা বা অভিভাবক আপন নাবাগিলা কন্যার পক্ষ থেকে তার মাল দ্বারা খোলা করে তবে তা কার্যকর হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) ও এমত পোশন করেন। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে তা কার্যকর হবে।

কন্যার উপর তা কার্যকর না হওয়ার দলীল হচ্ছে : পিতা বা অভিভাবকদের অধিকার হচ্ছে কল্যাণ ও দয়া সুলভ। আর এতে কোন দয়া বা কল্যাণ নেই। কেননা, এ বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ অঙ্গ মূল্যবান বস্তু নয়। অতচ প্রদত্ত বিনিময়টি হচ্ছে মূল্যবান বস্তু। আর মূল্যহীন বস্তুর বিনিময়ে মূল্যবান বস্তু প্রদান করার মধ্যে কোন কল্যাণ

নেই। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে খোলা করলে যদিও খোলা কার্যকর হবে না তবে তালাক পতিত হবে। কেননা, স্ত্রীর তালাক পিতার গ্রহণ এর উপর শর্তযুক্ত। এজন্য অন্য বস্তুর উপর শর্তযুক্ত করার উপর কিয়াস করা হবে। যেমন কারো ঘরে প্রবেশের উপর শর্তারোপ করার পর সে ঘরেই পবেশ করলেই তালাক পতিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ স্বামী তালাক পতিত হওয়াকে স্ত্রীর পিতার গ্রহণের উপর শর্তারোপ করেছে। সুতরাং পিতার গ্রহণের কারণে তালাক পতিত হবে।

قوله : وَلَوْ بِأَلْفٍ عَلٰى أَنَّهُ ضَامِنٌ الخ : পিতা বা অভিভাবক তার অপ্রাপ্তা কন্যার স্বামীর সাথে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খোলা করে এই শর্তে যে সে তা পরিশোধ করবে, কন্যার মাল থেকে নয়। তাহলে এ অবস্থায় খোলা কার্যকর হবে এবং অভিভাবকের উপর এক হাজার দিরহাম কার্যকর হবে। কেননা, অপরিচিত ব্যক্তির উপর খোলার বিনিময়কে শর্তারোপ বৈধ রয়েছে। এজন্য পিতা বা অভিভাবকের উপর শর্তারোপ করাটা স্বাভাবিকভাবেই বৈধ হবে।

بَابُ الظِّهَارِ

পরিচ্ছেদ : যিহার

هو تَشْبِيهُ الْمَنْكُوحَةِ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ حرم الْوطءُ ودواعِيهِ بِأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَتّٰى يُكَفِّرَ فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَطْ وعوده عزمه على وَطْئِهَا وبَطْنُهَا وفَخِذُهَا وفرجها كَظَهْرِهَا وأُخْتُهُ وعَمَّتُهُ وأُمُّهُ رَضَاعًا كَأُمِّهِ ورأسك ووَجْهُكِ وفرجُكِ ورقبتكِ ونصفُكِ وثُلُثُكِ كَأَنْتِ وَإِنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي بِرًّا أو ظِهَارًا أو طَلَاقًا فَكَمَا نَوَى وَإِلَّا لَغَا وَبِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي ظِهَارًا أو طَلَاقًا فَكَمَا نَوَى وَبِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي طَلَاقًا أو إِيلَاءً فَظِهَارٌ وَلَا ظِهَارَ إِلَّا من زَوْجَتِهِ فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَظَاهَرَ منها فَأَجَازَتْهُ بَطَلَ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهَارٌ مِنْهُنَّ وَكَفَّرَ لِكُلٍّ

অনুবাদ : তা হলো স্ত্রীকে তুলনা করা স্বামীর উপর স্থায়ী মাহরামাত (মহিলাদের) সাথে। (স্বামীর উক্তি) তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় (বলাতে) স্বামীর উপর কাফফারা আদায় করা পর্যন্ত সঙ্গম ও সঙ্গমোদ্দীপক বিষয়সমূহ হারাম হয়ে যাবে। আর যদি কাফফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করে তবে শুধু ইস্তেগফার করবে। (অর্থাৎ, প্রাথমিক ওয়াজিব হওয়া কাফফারা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না) আর তার প্রত্যাবর্তন হল স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের উপর দৃঢ় সংকল্প করা। মহিলার পেট, তার উরু, তার লজ্জাস্থান,

মহিলার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় (অর্থাৎ, এগুলোর উল্লেখ করে মাহরামাতের সাথে তুলনা করলে যিহার হয়ে যাবে) আর স্বামীর বোন, তার ফুফু এবং দুগ্ধ সম্পর্কীয় মাতা (এর সাথে নিজ স্ত্রীকে তুলনা করার ক্ষেত্রে) প্রকৃত মাতার ন্যায়। (স্বামী স্ত্রীকে এমন বলা যে) তোমার মাথা, তোমার যৌনাঙ্গ, তোমার চেহারা, তোমর গ্রীবা, তোমার অর্ধেক, তোমার একত তৃতীয়াংশ, তুমি এর ন্যায় (অর্থাৎ, তুমি আমার মাতার ন্যায় বলা আর স্ত্রীর উল্লেখিত অঙ্গসমূহকে মুহারামাতের সাথে তুলনা করা যিহারের ক্ষেত্রে সমান হুকুম) আর যদি اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ اُمِّىْ (তুমি আমার মাতার ন্যায়) এর দ্বারা নিয়ত করে সততায় কিংবা যিহারের অথবা তালাকের (মাতার মত) তবে যেরূপ নিয়ত করবে তদ্রূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। নতুবা (অর্থাৎ, নিয়ত না থাকা অবস্থায় কথাটি) অনর্থক হবে। আর (স্বামীর উক্তি) اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَاُمِّىْ (তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মত হারাম) যিহারের বা তালাকের নিয়ত করে তাহলে যেরূপ নিয়ত করবে তদ্রূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর (স্বামীর উক্তি) اَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمِّىْ (তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় হারাম) দ্বারা যিহার বা তালাকের নিয়ত করে তাহলে যিহার হবে। আর তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি যিহার হয় না। সুতরাং যদি কেহ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তাকে বিবাহ করে অতঃপর তার সাথে যিহার করে আর স্ত্রীলোকটি বিবাহ অনুমোদন করে তাহলে যিহার বাতিল হবে। (আর যদি স্বামী তার একাধিক স্ত্রীকে লক্ষ করে বলে) তোমরা সকল আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ সমতুল্য। তাহলে সকলের ক্ষেত্রে যিহার হবে। স্বামী সকলের কাফফারা আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الظِّهَارِ : ইসলাম পূর্বযোগে তালাকের ন্যায় যিহার এর মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন করা হতো। ইসলাম যিহারের প্রকৃতকে স্বীকৃতি দিয়ে তার হুকুমকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। অর্থাৎ, যিহারের মাধ্যমে তালাক হয় না, বরং কাফফারা আদায় করে নিলে তার স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হালালই থাকবে। তবে কাফফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সে তার কথার মধ্যে মিথ্যাবাদী যার কারণে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন— وَ اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا (তারাতো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে)। সুতরাং যিহার একটি অসঙ্গতি ও মিথ্যা কাজ হওয়ায় শাস্তি স্বরূপ সে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়াকে হারাম হিসাবে রাখা হয়েছে। তাই তার কাফফারা আদায় করা দ্বারা তার অপরাধের প্রতিকার হয়ে যায়। অতঃপর তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

قوله : هُوَ تَشْبِيْهُ الْمَنْكُوْحَةِ الخ : ظهار এর সংজ্ঞা : ظهار এটা مفاعله এর মাসদার। তার অর্থ হচ্ছে তুলনা করা, প্রকাশ করা, পিঠের সাথে তুলনা করা, পরস্পর সহযোগিতা করা।

পারিভাষিকভাবে (যিহার) ظهار বলা হয় : هُوَ تَشْبِيْهُ الْمَنْكُوْحَةِ بِمَحْرَمَةٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّابِيْدِ স্ত্রীকে তুলনা করা স্বামীর উপর স্থায়ী মুহাররামাত মহিলাদের সাথে।

তাছাড়া এরূপও বলা যায় যে, تَشْبِيْهُ الْمَنْكُوْحَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ عَلَى سَبِيْلِ التَّابِيْدِ اِتِّفَاقًا بِنَسَبٍ اَوْ رِضَاعٍ اَوْ صِهْرِيَّةٍ যে সকল মহিলা বংশ, দুধপান কিংবা দাম্পত্য সম্বন্ধের সূত্রে সর্বসম্মতভাবে হারাম, তাদের কারো সাথে আপন স্ত্রীকে তুলনা করা।

ظهار এর শর্ত হচ্ছে যিহারকারী স্বামী মুসলমান হওয়া সাবালক হওয়া সুস্থ মস্তিস্ক থাকা এবং স্ত্রী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকা

ظهار এর রুকন হচ্ছে : স্বামী স্ত্রীকে তার মায়ের পিষ্ঠদেশের ন্যায় বলা কিংবা এ জাতীয় কোন শব্দ প্রয়োগ করা যা দ্বারা স্বামীর মুহাররামাতের সাদৃশ্যতা বুঝা যায়।

ظهار এর হুকুম হচ্ছে : বৈবাহিক বন্ধন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ও সঙ্গমোদ্দীপক বিষয়সমূহ

কাফফারা আদায় করার সময়সীমা পর্যন্ত হারাম হওয়া। কেননা, পবিত্র কোরআনে যিহার এর কাফফারা ওয়াজিব হওয়া এবং স্ত্রীর কাফফারা আদায় করা পর্যন্ত সঙ্গম বা সঙ্গমমোদ্দিপক বিষয়সমূহ হারাম হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে অতঃপর যা বলেছে তা সংশোধনী করতে চায়, তাহলে পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আজাদ করা কর্তব্য। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত (অবগত) —সূরা মুজাদালা

قوله : فَلَوْ وَطِيَ قَبْلَهُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করত: কাফফারা আদায় না করে স্ত্রী সহবাস করে বসে তবে জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে স্বামীর এ অপকর্মের জন্য শুধুই ইস্তিগফার করবে। নতুন করে অন্য কোন হুকুম তার উপর আরোপিত হবে না। বরং পূর্বের কাফফারাটি আদায় করবে।

পক্ষান্তরে হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) এর মতে দুইটি কাফফারা আবশ্যক হবে। ইমাম হাসান বসরী (রহ.) ও ইমাম নাখঈ (রহ.) এর মতে তিনটি কাফফারা আবশ্যক হবে। জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের দলীল পেশ করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা—

اَنَّ سَلْمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرْتُ مِنْ اِمْرَاَتِى ثُمَّ اَبْصَرْتُ خَلْخَالَهَا فِى لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَ لَاتَعُدْ حَتّٰى تُكَفِّرْ -

হযরত সালমা বিন সাখার বায়াযী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বললেন, যে আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি। চাঁদনী রাতে তার পায়ের নুপুর দেখে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছি। তখন নবী করীম সা. বললেন, স্বীয় প্রভূর নিকট ক্ষমা চাও। এমনটি আর করো না কাফফারা আদায় করা ছাড়া।

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকে শুধু ইস্তিগফারের হুকুম প্রদান করেছেন। যদি ইস্তিগফার ছাড়াও অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ্ সা. অবশ্যই তা ব্যক্ত করতেন। তাই প্রতিয়মান হল যে, একটি কাফফারাই আবশ্যক হবে পূর্বের যিহারের জন্য। আর কাফফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করাতে তার উপর নতুন করে কোন কিছু আবশ্যক হবে না। তবে হা যেহেতু সে গুনাহের কাজ করে ফেলেছে তাই তার জন্য খালিস মনে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

قوله : وَرَأْسِكِ وَ فَرْجِكِ الخ : যদি স্বামী পূর্ণ স্ত্রীকে তার মায়ের পৃষ্ঠ দেশের সাথে তুলনা করে কিংবা স্ত্রীর এমন কোন অঙ্গকে যা দ্বারা পূর্ণ অঙ্গ বুঝানো প্রচলন রয়েছে তা তার মায়ের পৃষ্ঠদেশের সাথে তুলনা করে তবে সে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীর মাথা বা লজ্জাস্থান, কিংবা চেহারা অথবা গর্দান কিংবা অর্ধাংশ বা একতৃতীয়াংশকে নিজ মাতার পৃষ্ঠদেশের সাথে তুলনা করে তবে স্বামী যিহারকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَاِنْ نَوٰى بِاَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ اُمِّىْ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ اُمِّىْ তুমি আমার জন্য মাতাতুল্য, তবে এক্ষেত্রে স্বামীর নিয়তের উপর হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি স্বামীর একথা দ্বারা কোন কিছুর নিয়ত না করে তবে কোন কিছুই সংঘটিত হবে না। আর নিয়ত করার ক্ষেত্রে যা নিয়ত করবে তাই কার্যকর হবে

কেননা, বাক্যটি বিভিন্ন অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং স্বামী এ ধরনের বাক্য ব্যবহৃত করে বলে আমি তা দ্বারা সম্মান মর্যাদার নিয়ত করেছি তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, বাক্যটি এর সম্ভাবনা রাখে। তাই স্বামীর উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর যদি সে বলে আমি তা দ্বারা যিহারের নিয়ত করেছি তাহলে তাই কার্যকর হবে। কেননা, সে তার বাক্য اَنْتِ عَلَىَّ مِثْلُ اُمِّىْ দ্বারা তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ মহাররামাতের সাথে তুলনা করেছে। আর যেহেতু এক অঙ্গের সাথে তুলনা দ্বারা যিহার হয়ে যায় তাই পূর্ণ মায়ের সাথে তুলনা দ্বারা আরো উত্তমভাবে যিহার হয়ে যাবে। তবে হা যেহেতু অঙ্গের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই তাই নিয়তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আর যদি স্বামী বলে আমি এ বাক্য দ্বারা ত্বালাক্ব নিয়ত করেছি তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে এবং এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। কেননা, স্বামীর উক্তি اَنْتِ عَلَىَّ مِثْلُ اُمِّىْ বাক্যটি দ্বারা হারাম হওয়া হিসাবে মায়ের সমতুল্যতা বুঝায়। তাই তা اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ বাক্যের ন্যায় হয়ে গেল। আর তালাকের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে انت على حرام বাক্যটি তালাকের ক্ষেত্রে কেনায়ার অন্তর্ভুক্ত আর কেনায়া বাক্য দ্বারা তালাকে বায়েন সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু এতে নিয়তের প্রয়োজন। আর স্বামীর এ উক্তির পেছনে কোন ধরনের নিয়ত না থাকা অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তার কথা لغو বা অনর্থক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, তার কথাটি মুজমাল বা ব্যাখ্যার যোগ্য। অতএব, বক্তার বর্ণনার দ্বারাই তার কথার উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হবে। বক্তার পক্ষ থেকে কোনরূপ ব্যাখ্যা না থাকলে কোন কিছু নির্ধারিত হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে স্বামীর কথার কোনরূপ ব্যাখ্যা বিদ্যমান না থাকা অবস্থায়ও যিহার সাব্যস্ত হবে।

قوله : اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ كَاُمِّىْ الخ : আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ كَاُمِّىْ (তুমি আমার জন্য মায়ের মত হারাম) তাহলে পূর্বের মাসআলার ন্যায় এখানেও নিয়তের ভিত্তিতে হুকুম আরোপিত হবে। অর্থাৎ, যদি স্বামী যিহারের নিয়ত করে তবে যিহার হবে আর যদি তালাকের নিয়ত করে তবে তালাক পতিত হবে। কেননা, বাক্যটি উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। আর যদি স্বামীর উক্ত বাক্য বলার পর কোনরূপ নিয়ত না থাকে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তা ঈলা হবে। কেননা, ঈলা এর হুরমত যিহারের হুরমতের চেয়ে আসান ও লঘুতর, এর কয়েক কারণ রয়েছে। যেমন : ১। সববের দিক দিয়ে যিহার শক্ত। কেননা, শুধু যিহার হওয়াটাই কবীরাহ গুনাহ। কিন্তু ঈলা এর বিপরীত। কেননা, তার হুরমত অন্য কারণে হয়ে থাকে। ২। যিহারের হুকুম ঈলায় হুকুমের তুলনায় কঠিন কেননা যিহারের কাফফারা ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো। ৩। ঈলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হুমরমত দূর করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু যিহারের ক্ষেত্রে কাফফারা আদায়ের পূর্বে হুরমত দূর করার কোন পদ্ধতি নেই। মোটকথা, যিহার হচ্ছে সর্বদিক থেকে ঈলার চেয়ে শক্ত ও কঠিন। আর ঈলা তার চেয়ে সহজতর ও লঘু। এজন্য স্বামীর এ উক্তির পর কোনরূপ নিয়ত না থাকা অবস্থায় ঈলাই সাব্যস্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, নিয়ত ছাড়া স্বামীর উক্তি اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ مِثْلُ اُمِّىْ দ্বারা যিহারই হবে। তিনি বলেন, উক্ত বাক্যে كاف تشبيه বিদ্যমান যা তুলনা বাচক অব্যয় হিসাবে গণ্য, যা বিশেষত যিহারের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর আবু হানিফা (রহ.) এর মতে নিয়ত বিহীন উক্ত বাক্য لغو বা অনর্থক। কেননা, বাক্যটি مجمل (ব্যাখ্যা যোগ্য) অতএব, বক্তার বর্ণনা দ্বারাই তার কথার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে। তার পক্ষ থেকে বর্ণনা ব্যতিত কোন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যাবে না।

قوله : وَ بِاَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ اُمِّىْ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে انت على حرام كظهر امى (তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম) আর স্বামী এর দ্বারা তালাক বা যিহারের নিয়ত করল তবে

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে শুধু যিহার হবে। ইমাম আহমদ (রহ.)ও উক্ত মত পোষণ করেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে সে যা নিয়ত করে তাই সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, সে যদি যিহারের নিয়ত করে তবে যিহার আর তালাকের নিয়ত করলে তালাক পতিত হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল হল : বর্ণিত মাসআলায় انت علي حرام বাক্যটি محتمل যাতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বক্তার নিয়ত দ্বারা যে কোন একটি নির্ধারণ করতে হবে।

আর كظهر امي বাক্যটি পূর্বেরটির জন্য تاكيد (মজবুতকারী) হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল স্বামীর উক্তির মধ্যে كظهر امي শব্দ রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে যিহার অর্থ প্রদানকারী শব্দ। যা محكم যাতে নিয়তের কোন প্রয়োজন হয় না। আর হ্যাঁ, ব্যবহৃত حرام শব্দটি محتمل যা কয়েকটি অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর যেহেতু حرام শব্দটি كظهرامي (যা محكم) এর স্থানে এসেছে। তাই নীতিমালা অনুযায়ী তা দ্বারা তথা حرام দ্বারা محكم এর অর্থই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং স্বামী তালাকের নিয়ত করলেও যিহার এর হুকুম প্রযোজ্য হবে।

বিঃদ্রঃ সাহাবাইন (রহ.) এর মতের মধ্যে কিছুটা তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য রয়েছে তা হল যদি স্বামী তালাকের নিয়ত করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে শুধু তালাকই পতিত হবে। যিহার হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তালাক ও যিহার উভয়টি পতিত হবে।

قوله : وَ لَا ظِهَارَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِهٖ الخ : যিহার শুধু স্ত্রীর সাথে সম্পর্কীয়। অতএব, দাসীর সাথে যিহার হবে না। কেননা, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ الخ উক্ত আয়াতে نسائهم শব্দটি বিবাহিতা স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও نساء শব্দটি অভিধানে সকল মহিলাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তাফসীরবিদগণ একমত যে উক্ত আয়াতে نساء শব্দটি শুধু বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে : আইয়ামে জাহিলিয়াতে যিহার তালাকরূপে গণ্য ছিল। ইসলামে তা রহিত করে যিহারের প্রকৃত তথা হুরমত হওয়া ও কাফফারা আদায় করার বিধান আবশ্যক করে দিয়েছে। সুতরাং যিহার এমন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে হবে যাদের সাথে তালাকের সম্পর্ক রয়েছে। তাই যেহেতু দাসীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই তাই তালাকের সম্পর্ক নেই। এজন্য তার সাথে যিহারেরও হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

قوله : فَلَوْ نَكَحَ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ اَمْرِهَا الخ : যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে অতঃপর তার সাথে যিহার করে, তারপর স্ত্রীলোকটি তার বিবাহের অনুমোদন প্রদান করে তবে যিহার কার্যকর হবে না। কেননা, যিহারের ক্ষেত্রে মিথ্যা দাবীর দরুন সে গুনাহগার ও শাস্তিযোগ্য হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন তুলনা করল তখন সে সত্যবাদী হল। কেননা, মহিলা অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তার জন্য হারাম ছিল। তাই যিহারের মূল বিষয়টি না পাওয়ার কারণে যিহার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, যিহার হল হালাল স্ত্রীকে হারাম মহিলার সাথে তুলনা করা। আলোচ্য মাস্অরায় উক্ত ব্যক্তি কোরআনের আয়াত مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়াতে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে না।

قوله : اَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ الخ : যদি কারো অনেক স্ত্রী থাকে আর সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে انتن علي كظهر امي (তোমরা সকল আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের সমতুল্য) তাহলে উক্ত ব্যক্তি প্রত্যেক স্ত্রী থেকে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে সকল স্ত্রীর প্রতি যিহারকে সম্পৃক্ত করেছে। আলোচ্য মাসআলা তালাকের মাসআলার ন্যায় হল। অর্থাৎ, যদি কেহ তার একাধিক স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে তোমরা সবাই তালাক তবে তালাক সবার প্রতিই প্রযোজ্য হয়। তদ্রূপ এ মাসআলায়ও যিহার প্রত্যেক স্ত্রীর বেলায় প্রযোজ্য হবে।

তবে হ্যাঁ, তার কাফফারা নিয়ে মত পার্থক্য বিদ্যমান হানাফী শাফেয়ী ফুকাহায়ে কেরামের মতে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একেকটি কাফফারা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রাযি.) ও ইমাম আহমদ (রাযি.) এর মতে

সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি কাফফারা আবশ্যক হবে। আমাদের দলীল হল : কাফফারা আবশ্যক করা হয়েছে হুরমতকে বিলুপ্তির জন্য। আর হুরমত যেহেতু সকলের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে তাই স্বামী যার নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তার কাফফারা আদায় করে হালাল করবে। তবে মাসআলাটির কাফফারার বিধান ঈলার কাফফারার বিধানের ন্যায় নয়। কেননা, ঈলার ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হয় আল্লাহর নামের শপথ ভঙ্গ করার কারণে। এক্ষেত্রে স্ত্রীদের এক বা ততোধিক কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, ঈলার কাফফারা স্ত্রীদের সাথে নয়, বরং শপথ ভঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যিহারের কাফফারা স্ত্রীদের সাথে সম্পৃক্ত তাই যাকে হালাল করতে চাইবে তার কাফফারা পূর্বে আদায় করত : তার নিকটবর্তী হবে।

فصل

অনুচ্ছেদ

وهو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ولم يَجزِ الأَعْمَى وَمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ أو إبْهَامَيْهِمَا أو الرِّجْلَيْنِ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي أَدَّى شَيْئًا فَإِنْ لم يُؤَدِّ شَيْئًا أو اشْتَرَى قَرِيبَهُ نَاوِيًا بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ أو حَرَّرَ نِصْفَ عَبْدِهِ عن كَفَّارَتِهِ ثُمَّ حَرَّرَ بَاقِيَهُ عنها صَحَّ وَإِنْ حَرَّرَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَضَمِنَ بَاقِيَهُ أو حَرَّرَ نِصْفَ عَبْدِهِ ثُمَّ وَطِىءَ الَّتِي ظَاهَرَ منها ثُمَّ حَرَّرَ بَاقِيَهُ لا فَإِنْ لم يَجِدْ ما يُعْتِقُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رَمَضَانُ وَأَيَّامٌ مَنْهِيَّةٌ فَإِنْ وَطِئَ فِيهِمَا لَيْلًا أو يَوْمًا نَاسِيًا أو أَفْطَرَ اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ .

অনুবাদ : যিহারের কাফফারা হল গোলাম স্বাধীন করা। (তবে) অন্ধ, উভয় হাত কিংবা উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী অথবা উভয় পা কর্তিত, পাগল, মুদাব্বার, উম্মে ওলাদ এবং মুকাতাব যে কিছু পরিশোধ করে ফেলেছে (তাদেরকে যিহারের কাফফারায় স্বাধীন করা) যায়েয নয়। আর যদি মুকাতাব যে কোন কিছু পরিশোধ করে নাই, কিংবা কাফফারা বাবৎ স্বাধীন করার নিয়তে নিকটবর্তীকে ক্রয় করে অথবা কাফফারা হিসাবে তার গোলামের অর্ধাংশ স্বাধীন করে অতঃপর বাকি অর্ধেক কাফফারা হিসাবে স্বাধীন করে তবে তা সহীহ। আর যদি শরীকানা গোলামের অর্ধেক স্বাধীন করে আর বাকি অর্ধাংশের জামিন হয় অথবা তার গোলামের অর্ধাংশ স্বাধীন করে অতঃপর যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার পর অবশিষ্ট অংশ স্বাধীন করে তাহলে তা আদায় হবে না (অর্থাৎ, যিহারের কাফফারা আদায় হবে না।) যদি (যিহারকারী) আজাদ করার মত গোলাম না পায় তাহলে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোজা রাখবে। যাতে রমজান মাস এবং নিষিদ্ধ (ঈদের দুদিন ও তাশরীকের তিন দিন) দিন সমূহ না থাকে। আর যদি এ দু মাসের মধ্যে ভুলক্রমে রাতে বা দিনে সহবাস করে বসে কিংবা (এক দিনও) রোজা পালন না করে তাহলে নতুনভাবে রোজা রাখতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : فصل : সম্মানিত গ্রন্থকার (রা.) এ যাবৎ যিহারের সংজ্ঞা, হুকুম ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী গিয়ে আলোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে যিহারের পর স্ত্রীকে হালাল করার জন্য যা স্বামীর উপর আরোপিত হয় তথা কাফফারা তা নিয়ে আলোচনা করতেছেন। সুতরাং الكفارة (কাফফারা) এর অর্থ হচ্ছে মোচন করা। এমন অনেক গুনাহ রয়েছে যা সদকা-খয়রাত দিলে মোচন হয়। এজন্য গোনাহ মোচনকারী আমলসমূহকে কাফফারা নামে অভিহিত করা হয়।

قوله : وَ هُوَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الخ : যিহারের কাফফারা তিনভাবে আদায় করা যায়। তবে প্রত্যেক প্রথমটির উপর সক্ষম না হওয়াতে দ্বিতীয়টি দ্বারা সম্ভব। এর দলীল হল আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন পাকের এরশাদ—

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ *

'তাহল একে অপরের স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। আর যার এ সামর্থ নেই সে একে অপরের সাথে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোযা রাখবে। আর যে এতেও সামর্থ্য না হয় সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এজন্য যে তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।'

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কাফফারার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার দিকটি বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমত গোলাম আযাদ করতে হবে। যদি গোলাম আযাদ করতে অক্ষম হয় তবে দু মাস ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখবে। তাও যদি সক্ষম না হয় তবে ষাট জন মিসকিনকে দু' বেলা আহার করাবে। উক্ত আয়াতে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে, স্বামী স্ত্রী পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে কাফফারা আদায় করতে হবে।

কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে গোলাম মুসলমান বা কাফের নারী পুরুষ হওয়া সবই সহীহ। গোলামের কোন নির্ধারিত গুনাবলী শর্ত নয়। কেননা, যিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনে দাশ মুক্তির কথা فتحرير رقبة দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর رقبة শব্দটি দ্বারা এমন দাস দাসীকে বুঝায় যারা সার্বিকভাবে গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ। এজন্যই তো মুদাব্বার দাসকে স্বাধীন করা বৈধ নয়। কেননা, তার দাসত্ব মালিকের মৃত্যুর সাথে সীমাবদ্ধ সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, আলোচ্য আয়াতে رقبة শব্দটি ব্যাপক যা মুসলমান নারী পুরুষ কাফের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এজন্য আহনাফের মতে গুনাগুন হিসাবে যে কোন ধরনের গোলামকে যিহারের কাফফারায় স্বাধীন করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে কাফের গোলামকে যিহারের কাফফারায় স্বাধীন করলে কাফফারা আদায় হবে না। তিনি বলেন, কাফফারা হচ্ছে আল্লাহ হক তাই তা জাকাতের ন্যায় কোন শত্রু (তথা কাফের) এর অভিমুখি করা যায় না।

আমাদের দলীল হচ্ছে : মুক্তিদাতা দাসদাসীকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু পরেও যদি সে তার নাফরমানী তথা কুফরী নিয়ে বিদ্যমান থাকে তবে তো তা তার জন্য দুর্ভাগ্য। তা মুক্তিদাতার পক্ষ থেকে ক্রটির কারণ হবে না। তাছাড়া কোরআনের رقبة শব্দটি ব্যাপক যা সব ধরনের গোলামকে অন্তর্ভুক্ত করে।

قوله : وَ لَمْ يَجُزْ الخ : ক্রটিপূর্ণ গোলাম স্বাধীন করা প্রসঙ্গে : যিহারের কাফফারা হিসাবে গোলামের ক্ষেত্রে আমাদের মতে পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ১। গোলাম সার্বিকভাবে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা ২। যিনি মুক্তি দেবেন গোলাম তার মালিকানাধীন থাকা। ৩। কাফফারার উদ্দেশ্যে আজাদ করতে হবে। ৪।

গোলামের উপকারীতা বিদ্যমান থাকা। ৫। বিনিময় ছাড়া স্বাধীন করা। উল্লেখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে কাফফারা হিসাবে গোলাম স্বাধীন করা বৈধ। অন্যথায় গোলাম স্বাধীন করা বৈধ নয়।

এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে অন্ধ, উভয় হাত পা কর্তিত, কিংবা উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্তিত গোলামকে কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করা বৈধ হবে না। কেননা, এদের মধ্যে সম্পূর্ণ উপকারিতা বিদ্যমান নেই আর গোলামের আংশিক উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে কাফফারা হিসাবে স্বাধীন করা বৈধ। যেমন বিপরীত দিক দিয়ে এক হাত ও পা কর্তির্ত। কিংবা এক চোখ অন্ধ, এদেরকে কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করা বৈধ। তদ্রূপ মুদাব্বার ও উম্মে ওলদকে যিহারের কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করা যাবে না। কেননা, মুদাব্বার ও উম্মে ওলদের মধ্যে সার্বিকভাবে দাসত্ব পাওয়া যায়নি।

قوله : وَ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ اَدّٰى شَيْئًا الخ : মুকাতাব বলা হয় যার সাথে মনিবের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যে তুমি এত টাকা দিয়ে দিলে স্বাধীন। অতঃপর এ মুকাতাব গোলাম যদি ধার্য্যকৃত টাকা থেকে, কিছু আদায় করে তবে তাকে কাফফারা হিসাবে স্বাধীন করা বৈধ নয়। কেননা এ গোলামকে স্বাধীন করা বিনিময়সহ হয়ে যাবে। আর বিনিময় ইবাদাতকে বিনষ্ট করে ফেলে। অথচ গোলাম স্বাধীন করা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও ইবাদাত হাসিল করার উপায়। তবে ইমাম আবু হানিফা (রাযি.) এর একটি অভিমত হচ্ছে অংশ বিশেষ আদায়কারী মোকাতাব গোলামকে স্বাধীন করা কাফফারা হিসাবে বৈধ। তিনি দলীল হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদিস পেশ করেন— اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ একটি দিরহাম বাকি থাকলে মুকাতাব গোলামই থাকবে। তাছাড়া মুকাতাব তো সর্বদিক থেকে গোলামিতেই রয়েছে। একারণেই তো কিতাবাত চুক্তি রহিত করার অধিকার গোলামের পক্ষ থেকে বিদ্যমান রয়েছে। তাই তাকে স্বাধীন করা বৈধ। আর যদি মুকাতাব তার চুক্তির কোন টাকা আদায় করে না, তবে তাকে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কাফফারা হিসাবে স্বাধীন করা বৈধ-। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মুকাতাব গোলামকে স্বাধীন করা বৈধ নয়। তিনি দলিল পেশ করেন, মুদাব্বার যেভাবে তার তাদবীরের কারণে মুক্তি প্রাপ্ত এর উপযোগী তদ্রূপ মুকাতাব ও তার কিতাবাত এর কারণে মুক্তি প্রাপ্ত এর উপযোগী সুতরাং যেভাবে মুদাববারকে কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করলে যথেষ্ট হবে না, তদ্রূপ মুকাতাবকেও কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করলে বৈধ হবে না।

হানাফী ফকীহদের দলীল : রাসূল (সা.) এর হাদীস اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ এক দিরহাম বাকী থাকা অবস্থায়ও সে গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং যে মুকাতাব কোন অর্থ আদায় করেনি, সে তো আরো অধিক যুক্তিতে গোলামই থাকবে।

দ্বিতীয় দলীল : কিতাবাত চুক্তির পূর্বে তো মুকাতাব অবশ্যই গোলাম ছিল। কেননা, কোন গুন তার বিপরীত গুণ ছাড়া বিলুপ্ত হয় না। আর কিতাবাত চুক্তিতো দাসত্বের বিপরীত নয়। কিতাবাত সম্পর্কীয় কার্য ক্ষমতার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। যেমন গোলামকে ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাছাড়া কিতাবাত চুক্তির প্রত্যাহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য অনিবার্যভাবে আমরা বলব যে মনিব যখন তাকে স্বাধীন করে তখন ধরে নিতে হবে যে, সে তার কিতাবাত চুক্তি প্রত্যাহার করে সাবেক গোলামকে স্বাধীন করতেছে। এজন্য মুকাতাব গোলাম যে তার কোন অর্থ আদায় করেনি তাকে কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করা বৈধ নয়। কেননা, এ গোলামকে স্বাধীন করা বিনিময়সহ হয়ে যাবে। আর বিনিময় ইবাদাতকে বিনষ্ট করে ফেলে। অথচ গোলাম স্বাধীন করা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও ইবাদাত হাসিল করার উপায়।

তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর একটি অভিমত হচ্ছে অংশ বিশেষ আদায়কারী মোকাতাব গোলামকে স্বাধীন করা কাফফারা হিসাবে বৈধ। তিনি দলীল হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদিস পেশ করেন— اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ একটি দিরহাম বাকি থাকলে মুকাতাব গোলামই থাকবে। তাছাড়া মুকাতাব তো সর্বদিন

থেকে গোলামিতেই রয়েছে। একারণেই তো কিতাবাত চুক্তি রহিত করার অধিকার গোলামের পক্ষ থেকে বিদ্যমান রয়েছে। তাই তাকে স্বাধীন করা বৈধ। আর যদি মুকাতাব তার চুক্তির কোন টাকা আদায় করে না তবে তাকে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কাফফারা হিসাবে স্বাধীন করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মুকাতাব গোলামকে স্বাধীন করা বৈধ নয়। তিনি দলিল পেশ করেন, মুদাব্বার যেভাবে তার তাদবীরের কারণে মুক্তি প্রাপ্ত এর উপযোগী তদ্রূপ মুকাতাবও তার কিতাবাত এর কারণে মুক্তি প্রাপ্ত এর উপযোগী। সুতরাং যেভাবে মুদাব্বারকে কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করলে যথেষ্ট হবে না তদ্রূপ মুকাতাবকেও কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করলে বৈধ হবে না।

হানাফী ফকীহদের দলীল : রাসূল (সা.) এর হাদীস المكاتب عبد ما بقى عليه درهم। এক দিরহাম বাকী থাকা অবস্থায়ও সে গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং যে মুকাতাব কোন অর্থ আদায় করেনি সে তো আরো অধিক যুক্তিতে গোলামই থাকবে।

দ্বিতীয় দলীল : কিতাবাত চুক্তির পূর্বে তো মুকাতাব অবশ্যই গোলাম ছিলো। কেননা, কোন গুন তার বিপরীত গুণ ছাড়া বিলুপ্ত হয় না। আর কিতাবাত চুক্তিতো দাসত্বের বিপরীত নয়। কিতাবাত সম্পর্কীয় কার্যক্ষমতার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। যেমন গোলামকে ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাছাড়া কিতাবাত চুক্তির প্রত্যাহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য অনিবার্যভাবে আমরা বলব যে, মনিব যখন তাকে স্বাধীন করে তখন ধরে নিতে হবে যে, সে তার কিতাবাত চুক্তি প্রত্যাহার করে সাবেক গোলামকে স্বাধীন করতেছে। এজন্য মুকাতাব গোলাম যে তার কোন অর্থ আদায় করেনি তাকে কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করা বৈধ।

قوله : أَوِاشْتَرى قَرِيبَهُ الخ : যদি কারো উপর যিহারের কাফফারা ওয়াজিব হয় আর সে তার নিকটবর্তী তথা পিতা বা পুত্রকে কাফফারা আদায় করার নিয়তে ক্রয় করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার কাফফারা আদায় করা সহীহ হবে।

তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে সহীহ হবে না।

قوله : أَوْ حَرَّرَ نِصْفَ عَبْدِهِ الخ : যদি কেহ যিহারের কাফফারা আদায় করা বাবত গোলামের অর্ধেক স্বাধীন করে অতঃপর স্ত্রী সহবাসের পূর্বে দ্বিতীয় অর্ধেক স্বাধীন করে তাহলে তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। তার মতে মুক্তি দান আংশিকতাকে গ্রহণ করে তাই প্রথম কথায় অর্ধেক আর দ্বিতীয় অর্ধেক স্বাধীন হবে এবং তা যেহেতু একই মালিকানায় পাওয়া গেছে তাই তা কাফফারা হিসাবে গোলাম আজাদ করার প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতে একই মালিকানায় تجزى (আংশিকতা) গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে মুক্তিদান تجزى (আংশিকতা)কে গ্রহণ করে না। বরং একই মালিকানায় অর্ধেক আজাদ করাটা পূর্ণ আজাদ করাকেই বুঝায়। এজন্য প্রথম বাক্যেই পূর্ণ আজাদ হয়ে যাবে। পৃথক বাক্যের প্রয়োজন নেই। উক্ত মতানৈক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে এ সুরতে যে যদি মনিব প্রথম অর্ধেক স্বাধীন করার পর যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে যায় তবে সাহাবাইন (রহ.)-এর মতে তা জায়েয হবে। কেননা, প্রথমেই তো গোলাম পূর্ণরূপে আজাদ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে সঙ্গম জায়েয হবে না। কেননা, অর্ধেক আজাদ পাওয়া গেছে স্পর্শের পর। অথচ স্পর্শের পূর্বে পূর্ণ আজাদ পাওয়া শর্ত। তাই অর্ধেক আজাদের পর যিহারকৃতার সাথে সঙ্গম জায়েয নয়।

قوله : وَ اِنْ حَرَّرَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ الخ : যদি কারো উপর যিহারের কারণে গোলাম আজাদ করা আবশ্যকীয় হয়। আর সে অংশিদারের ভিত্তিতে গোলামের মালিক হয়। সুতরাং সে যদি তার অংশ কাফফারার নিয়তে স্বাধীন করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার কাফফারা আদায় হবে না। এমনকি যদি সে

বাকী অংশ অন্য অংশিদারদের থেকে ক্রয় করতঃ স্বাধীন করে তবুও তার কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, সে যখনই অর্ধেক বা তার অংশ বিশেষ স্বাধীন করেছে তখন তো সে পূর্ণ গোলামের মালিক ছিল না। তদ্রূপ দ্বিতীয় বার যখন অন্য অংশ ক্রয় করত স্বাধীন করে তখনও সে পূর্ণ গোলামের মালিক নয়। সুতরাং যিহারের কাফফারা এর জন্য আংশিক গোলাম আজাদ করা সহীহ নয়। তবে হ্যাঁ, প্রথমোক্ত মাসআলা এর বিপরীত। কেননা, যেখানে স্বাধীন কারী পূর্ণ গোলামের মালিক ছিল, যদিও দুবারে স্বাধীন করে না কেন।

সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আলোচ্য মাসআলায় যদি আজাদকারী ব্যক্তি স্বচ্ছল হয় তবে তার অংশ আজাদ করা সহীহ্ হবে। কেননা, সে তার বাকী অংশ অংশীদারদের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে যিমান দিতে পারবে। কেননা, তাদের মতে মুক্তিদান অংশিদারিত্বকে গ্রহণ করে না, বরং সে যখন তার অংশ স্বাধীন করল তখন পূর্ণ গোলাম স্বাধীন হয়ে গেল। আর উক্ত আযাদকারী ব্যক্তি বাকি অংশিদারদের অংশের যিমান সে আদায় করে দেবে। আর যদি আযাদকারী অসচ্ছল হয় তবে সবার মতে শুধু তার অংশ স্বাধীন হওয়ার কারণে কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, এ সূরতে গোলামের উপর আবশ্যক হবে যে সে অর্থ উপার্জন করে অর্থের বিনিময়ে বাকী অংশিদারদের থেকে আজাদী গ্রহণ করা। যা কাফফারার প্রতিবন্ধক, যা জায়েয নয়।

قوله : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتَقُ الخ : যিহারকারী ব্যক্তি যদি যিহারের কাফফারা হিসাবে গোলাম আজাদ করতে অক্ষম হয়। অর্থাভাবে বা না পাওয়ার কারণে তবে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোজা রাখতে হবে। যে দুমাসের মাঝে রমজান হবে না। কেননা, রমজানে আল্লাহর নির্দেশিত রোজা পালন করা ফরজ এ সময় অন্য নিয়তে রোজা রাখা বৈধ নয় এবং এ দু' মাসের মধ্যে দুই ঈদের দিন এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিন না হওয়া। কেননা, এ পাঁচ দিনও রোজা রাখা নিষিদ্ধ। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন— أَنْ لَا تَصُومُوا هٰذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ 'এ নিষিদ্ধ দিনগুলোতে তোমরা রোযা রাখবে না। কেননা, এসব হচ্ছে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের দিন' আর রোজা রাখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, তা তো স্পষ্ট কুরআনের নির্দেশ— فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا - 'আর যারা গোলাম আজাদে সামর্থবান হবে না তারা পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দুমাস রোজা রাখবে।' সুতরাং উক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হল যে, গোলাম স্বাধীন করতে অসামর্থ হলে ধারাবাহিকভাবে দুমাস রোজা রাখবে। তবে হা এ দু মাসের মধ্যে রমজান মাস বা ايام منهية বা নিষিদ্ধ দিন না থাকা অপরিহার্য্য।

قوله : فَإِنْ وَطِيَهَا فِيهِمَا الخ : রোজা দ্বারা কাফফারা আদায়কারী ব্যক্তি যদি রোজা রাখা অবস্থায় রাতে ইচ্ছাকৃত বা দিনে ভুলবশত যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে উক্ত রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় করা সহীহ কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। আহনাফের তরফাইন (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে উক্ত রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় সহীহ হবে না। কেননা কুরআনের ঘোষণা- من قبل ان يتماسا উক্ত আয়াতের দুটি দাবী : ১। সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আগে রোজা রাখা ২। রোজা রাখা অবস্থায় সঙ্গম মুক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটিকে লাযেম করে। এখন যদি রোজা রাখা অবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে যায় তবে উক্ত শর্ত বাতিল হওয়া লাযিম হয়। সুতরাং শর্ত যখন বাতিল হয়ে যাবে তখন তার দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ও নতুন করে রোজা রাখতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে নতুনভাবে রোজা রাখার প্রয়োজন নেই। কেননা, রাত্রে ইচ্ছাকৃত বা দিনে ভুল বশত সহবাস করাতে রোজা ভঙ্গ হয় না। তাই ধারাবাহিকতা বজায় থাকল। আর যদি রোজা পালনকারী স্বেচ্ছায় দিনের বেলায় সহবাস করে তবে তার কাফফারা বাতিল হয়ে যাবে। নতুন করে পুনরায় রোজা রাখতে হবে। অনুরূপভাবে রোজা পালনরত অবস্থায় কোন একদিন রোজা ভেঙ্গে দিল, তবুও তার কাফফারা বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় রোজা রাখতে হবে।

وَلَمْ يَجُزْ لِلْعَبْدِ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ أَطْعَمَ سِتِّينَ فَقِيرًا كَالْفِطْرَةِ أَوْ قِيمَتِهِ فَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ وَتَصِحُّ الْإِبَاحَةُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْفِدْيَةُ دُونَ الصَّدَقَاتِ وَالْعُشْرِ وَإِنْ أَعْطَى فَقِيرًا شَهْرَيْنِ صَحَّ وَلَوْ فِي يَوْمٍ لَا إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ وَلَا يَسْتَأْنِفُ بِوَطْئِهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ وَلَوْ أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِّينَ فَقِيرًا كُلَّ فَقِيرٍ صَاعًا صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ إِفْطَارٍ وَظِهَارٍ صَحَّ عَنْهُمَا وَلَوْ حَرَّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ صَحَّ عَنْهُمَا وَمِثْلُهُ الصِّيَامُ وَالْإِطْعَامُ وَإِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ صَحَّ عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَا

অনুবাদ : আর গোলামের জন্য (যিহারের কাফফারা) রোজা ভিন্ন জায়েজ নয়। যদিও গোলামের মনিব তার পক্ষ থেকে খানা খাওয়ায় কিংবা গোলাম আযাদ করে। আর যদি যিহারকারী রোজা রাখতে সক্ষম না হয় তবে সদকায়ে ফিতর বা তার মূল্য পরিমাণ ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে। যদি সে অন্যকে নির্দেশ প্রদান করে তার যিহারের কাফফারা স্বরূপ তার পক্ষ থেকে খানা খাওয়ানোর অতঃপর সে তা করে তাহলে তার পক্ষ তা জায়েয হবে। আর সকল কাফফারার ক্ষেত্রে اباحة। (শুধু খাওয়ার বা খাওয়ানোর অনুমতি প্রদান) সহীহ। তবে সাদাকাত (তথা যাকাত ফিতরা) ও উশরে সহীহ নয়। (বরং তা আদায় করতে হবে।) আর শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক ফকীরকে পেট ভরে দু সকাল বা দুবিকাল কিংবা এক সকাল ও এক বিকাল খানা খাওয়ানো। আর যদি এক ফকীরকে দুমাস খানা প্রদান করে তবুও তা সহীহ। আর যদি একদিন দিয়ে দেয় তবে একদিনের ভিন্ন সহীহ হবে না। আর যদি আহারের মধ্যবর্তী অবস্থায় যিহার কৃতার সাথে সহবাস করে তাহলে নতুনভাবে আহার দান করতে হবে না। আর যদি দুটি যিহারের কাফফারা স্বরূপ ষাটজন মিসকীনের প্রত্যেককে এক সা পরিমাণ আহার করায় তবে এক যিহারের কাফফারা বাবত তা সহীহ। আর যদি রোজা ভঙ্গের ও যিহার এর কাফফারা বাবত উক্ত পরিমাণ আহার করায় কিংবা দুটি যিহারের কাফফারা স্বরূপ দুজন গোলামকে অনির্দিষ্টভাবে স্বাধীন করে তবে উভয়টির জন্য সহীহ। অনুরূপ রোজা রাখা বা খানা খাওয়ানোর বিষয়টিও। (অর্থাৎ, যদি চার মাস রোজা পালন করে কিংবা একশত বিশজন মিসকীনকে আহার দান করে তবে তা জায়েয।) আর উভয়টির কাফফারা স্বরূপ যদি একটি গোলাম আযাদ করে কিংবা দুমাস রোজা রাখে তবে যে কোন একটির ক্ষেত্রে সহীহ আর যিহার ও হত্যার কাফফারা স্বরূপ এমন করলে (কোনটি থেকেই) শুদ্ধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

وَ لَمْ يَجُزْ لِلْعَبْدِ الخ : যদি কোন গোলাম আপন স্ত্রীর সাথে যিহার করে বসে তবে সে শুধু যিহারের কাফফারা রোজা রাখার মাধ্যমে আদায় করতে পারবে। সে গোলাম স্বাধীন করা বা মিসকিনদেরকে খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে কাফফারা আদায় করতে পারবে না। কেননা, রোজা ভিন্ন বাকি দুটিই মাল। আর গোলাম সে নিজেই অন্যের মাল, তাই সে মালের মালিক হতে পারে না। তাই গোলাম আজাদ করা বা মিসকনিদের আহার দান করার কোন অবকাশ তার থেকে বিদ্যমান নেঈ। আর যদি মনিব উক্ত গোলামের যিহারের কাফফারা স্বরূপ

কোন গোলাম স্বাধীন করে দেয় কিংবা মিসনিকদেরকে অন্য দান করে তবুও তা গোলামের পক্ষ থেকে যিহারের কাফফারা স্বরূপ আদায় হবে না। কেননা, গোলামের মধ্যে মালিক হওয়ার যোগ্যতা বিলুপ্ত। তাই যদি কেহ তাকে মালিক বানায় তবুও সে মালিক হতে পারে না। উক্ত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, গোলাম তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলে তার কাফফারা একমাত্র রোজা রাখার মাধ্যমে আদায় করতে পারবে। আর হ্যাঁ, এ রোজা রাখার ক্ষেত্রে মনিব গোলামকে বাধা দিতে পারবে না। কেননা, ইহা নিতান্ত স্ত্রীর হক্ব সম্পর্কীয় বিষয়। এতে মনিবের কোন দখল নেই।

قوله : فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ الخ : আর যদি যিহারকারী রোজা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। দলীল হল কুরআন পাকের ইরশাদ : فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا - 'যে এতে (রোজা রাখতে) অক্ষম হয় তার কর্তব্য হল ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো।' উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যিহারের কাফফারার সর্বশেষ পদ্ধতি হচ্ছে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো এবং খানার পরিমাণ হল প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' খেজুর বা যব কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করা। কেননা, হযরত আউস ইবনে সামিত ও সাহল ইবনে সাখর (রাযি.) সম্পর্কিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন— لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ প্রত্যেক মিসকিনের জন্য অর্ধ সা' গম।

তাছাড়া দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে, প্রত্যেক মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর অর্থ হচ্ছে তার একদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করা। সদকাতুল ফিতরের ন্যায় তার পার্থক্য হল, এতটুকু যে, সদকাতুল ফিতরে শুধু পরিমাণ ঠিক রাখা প্রয়োজন হয় মিসকিনের সংখ্যা ঠিক রাখা প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে পরিমাণ টিক রাখার সাথে সাথে মিসকিনের সংখ্যা ঠিক রাখা অপরিহার্য। এজন্য যদি কেহ একদিন ত্রিশজন মিসকিনকে যিহারের কাফফারা বাবত ষাটজনের খাবার দেয় তবে তা জায়েয হবে না।

যিহার কাফফারা যদি নস দ্বারা বর্ণিত এমন পণ্য দ্বারা আদায় করে অর্থাৎ, গম বা গমের ছাতু কিংবা গমের আটা দ্বারা তবে আধা সা' বা এক কেজি সাড়ে সাত শত গ্রাম আদায় করতে হবে। আর যদি খেজুর বা যব কিংবা যবের আটা দ্বারা কাফফারা আদায় করে তবে এক সা' বা তিন কেজি চারশত গ্রাম আদায় করতে হবে। অথবা এসবের বাজার দরের সমমূল্য দিয়ে দিবে। তবে মূল্য দ্বারা কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে যে, এমন বস্তু দ্বারা মূল্য আদায় করবে। যার দ্বারা আদায়ের কথা নস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ, যদি নসে বর্ণিত বস্তু দ্বারা মূল্য আদায় করে এবং তা ঐ জিনিসের নির্ধারিত পরিমাণের কম হয় তাহলে তা জায়েয হবে না। যেমন আধা সা' উত্তম খেজুরের মূল্য এক সা' গমের সমপরিমাণ হয়। তাহলে আধা সা' খেজুর দ্বারা কাফফারা আদায় করা বৈধ হবে না। আর যদি নসে বর্ণিত বস্তু না হয় তবে জায়েয। যেমন, আধা সা' গমের মূল্য যদি এক কেজী চাউলের সমপরিমাণ হয়, তবে চাউল দ্বারা কাফফারা আদায় করা জায়েয। যেমন, আধা সা' গমের মূল্য যদি এক কেজী চাউলের সমপরিমাণ হয় তবে চাউলের দ্বারা কাফফারা আদায় করা জায়েয।

قوله : فَلَوْ اَمَرَ غَيْرَهٗ اَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ الخ : যিহারকারী যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে তুমি আমার পক্ষ থেকে খানা খাইয়ে দাও আর নির্দেশিত ব্যক্তি তা পালন করে তবে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, যিহারকারী নিজের পক্ষ থেকে খানা খাওয়ানো মূলত নির্দেশিত ব্যক্তি থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। আর ধরে নেয়া হবে ফকির প্রথম নির্দেশিত ব্যক্তি থেকে যিহারকারীর পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করত সে কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেছে। অতএব এখানে নিজে মালিক হওয়া এবং অন্যকে মালিক বানানোর অর্থ বিদ্যমান থাকায় কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

وَ تَصِحُّ الْاِبَاحَةُ فِى الْكَفَّارَاتِ الخ : যিহারকারী যদি ষাটজন মিসকিনকে পেট পুরে খানা খাইয়ে দেয়, তাহলে ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে জায়েয। কেননা, পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ

مِسْكِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া। আর তা খানা খাওয়ার অনুমতি প্রদানের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং যিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে খানা খাওয়ার অনুমতি প্রদান বা মালিক বানিয়ে দেয়া উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যাকাত বা সাদকায়ে ফেতর এর ব্যতিক্রম। তাতে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। কেননা, যাকাতের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে— وَ اٰتُو الزَّكٰوةَ (অর্থ : তোমরা যাকাত প্রদান কর) সাদকায়ে ফেতরের ব্যাপারে নস হচ্ছে : রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— اَدُّوْا عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ যাদের দায়িত্বভার তোমাদের উপর তাদের পক্ষ থেকে আদায় কর। যাকাত ও সাদকাতুল ফিতরের ব্যাপারে দলিলদ্বয়ে ايتاء ও ادا শব্দদ্বয়ের কারণে মালিক বানানো শর্ত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু কাফফারার ক্ষেত্রে নস মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয়াটা শর্ত হিসাবে বুঝায় না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে যাকাত ও সাদকাতুল ফিতর এর ন্যায় কাফফারার ক্ষেত্রে মিসকিনকে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। শুধু সকাল সন্ধ্যা খানা খাওয়ানো যথেষ্ট নয়। বরং تمليك তথা মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত। কেননা, মালিক বানিয়ে না দিলে মিসকিন তার প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে সামর্থ হবে না। তাই তার একান্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া শর্ত।

قوله : وَاِنْ اَعْطٰى فَقِيْرًا الخ : যদি কেহ যিহারের কাফফারা স্বরূপ এক মিসকিনকে ষাট দিন আহার প্রদান করে তবে তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একই মিসকিনকে ষাটজনের পরিমাণ আহার এক দিনই দিয়ে দেয় তবে এক দিনের কাফফারা আদায় হবে। বাকী উনষাট দিনের কাফফারা অনাদায় থেকে যাবে। তাই বাকী উনষাট দিনের আহার দৈনিক আদায় করতে হবে। কেননা, কাফফারার উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাবী ব্যক্তির অভাব দূর করা। আর মানুষের প্রয়োজন দৈনিক নবায়ন হয়। সুতরাং দ্বিতীয় দিন প্রথম দিনের মিসনিককে দান করা আর নতুন করে অন্য মিসকিনকে দান করা সমান। এজন্য একই মিসকিনকে ষাট দিন আহার দান করা যাবে। কিন্তু একই মিসকিনকে ষাট দিনের পরিমাণকে এক দিন দিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, এখানে প্রয়োজন একজন মিসকিনের দৈনিক ষাটবার দেখা দেয়নি। যা বাস্তবের বিপরীত।

ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এক মিসকিনকে ষাট দিনে ষাট বার আহার দানে কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, কুরআনের আয়াতের বিপরীত। কেননা, কুরআনে سِتِّيْنَ مِسْكِيْنَ এর কথা উল্লেখ হয়েছে। যা প্রকৃতভাবে ষাটজন মিসকিনকে বুঝায়।

قوله : وَ لَايَسْتَانِفُ بِوَطْئِهَا الخ : কেহ যিহারের কাফফারা খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে আদায় করা অবস্থায় অর্থাৎ, খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়ে সহবাস করে তবে তার কাফফারা বাতিল হবে না। অর্থাৎ, নতুনভাবে তার উপর কাফফারা লাযিম হবে না। কেননা, পবিত্র কুরআনে যিহারের কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে من قبل ان يتماسا বাক্যের শর্তারূপ করা হয়নি। এজন্য খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়েও যদি সে যিহার কৃতার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায় তবুও তার কাফফারা বাতিল হবে না। তবে হা খানা খাওয়ানো সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে সহবাস করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা অন্য কারণে তা হল হতে পারে তখন যিহারকারী গোলাম স্বাধীন করার কিংবা রোজা রাখার ক্ষমতা পেয়ে যেতে পারে। আর তখন গোলাম স্বাধীন বা রোজা রাখার পূর্বে সহবাস পাওয়া যাবে, যা নিষিদ্ধ। সুতরাং সত্তাগতভাবে খানা খাওযানোর মধ্যবর্তী সময়ে সহবাস করা নিষিদ্ধ নয়। তবে অন্য সম্ভাবনার বিদ্যমান হওয়ার আশংকায় সহবাস করা নিষিদ্ধ। যেমন জুমার আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় প্রকৃতভাবে শুদ্ধ। কিন্তু নামাযে যাওয়ার জন্য এগুলো বন্ধ করার বিধান এসেছে। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, খানা খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়ে একান্ত সহবাস করার কারণে তার কাফফারা বাতিল হবে না।

قوله : وَ لَوْ اَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি দু'টি যিহার এর কাফফারার নিয়তে ষাট জন মিসকিনকে এক সা গম প্রদান করে, তাহলে দু'টি যিহার এর কাফফারা আদায় হবে না কি একটি যিহারের কাফফারা আদায় হবে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। শায়খাইন (রহ.) এর মতে

একটি যিহারের কাফফারা আদায় হবে। আর দ্বিতীয় যিহারের কাফফারা পুনরায় আদায় করতে হবে। যিহারের কাফফারা পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা, নিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেনীর জিনসের মধ্যে পার্থক্য করা। একই জিনসের মাঝে পৃথকী করণের নিয়ত অর্থহীন। আর এখানে তো উভয়টি একই জিনসের যেমন কারো রমজানের কয়েকটি রোজা কাজা হয়ে গেল। তাই পরবর্তীতে তা আদায়ের সময় শুধু কাজা রোজার নিয়ত করলেই যথেষ্ট। নির্ধারিত দিনের রোজার নিয়ত করায় কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি কারো রমজানের কাজা রোজা এবং মান্নাতের রোজা ওয়াজিব হয় তবে সে কাজা নাকি মান্নতের রোজা পালন করতেছে তা নিয়ত দ্বারা পার্থক্য করতে হবে। কেননা, উভয়টি জিনস হিসাবে ভিন্ন। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ব্যক্তির নিয়ত বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, তার আদায়কৃত পরিমাণ এক কাফফারার জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ, কাফফারার ক্ষেত্রে অর্ধ সা' হচ্ছে সর্ব নিম্ন পরিমাণ। যার নিম্নে কাফফারা আদায় করা সহীহ নয়। তবে হা যদি কেহ এর চেয়ে বেশী দান করে তবে তা কাফফারা আদায়ের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। এজন্য আমরা বলি যে, আলোচ্য মাসআলায় ব্যক্তির দু'টি যিহারের কাফফারা আদায়ের নিয়ত বাতিল হয়ে একটি যিহারের কাফফারা আদায় হবে। যেভাবে শুধু কাফফারার নিয়ত দ্বারা হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে উভয় কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত ব্যক্তি যে পরিমান আদায় করেছে তথা এক সা' গম তা যদি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করত তবে তা জায়েজ হত। সুতরাং যা আদায় করেছে তা দু'টি যিহারের কাফফারার যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ যে মিসকিনদের মাঝে তা বিতরণ করেছে। তারাও একটি কাফফারা গ্রহনের পর দ্বিতীয়টি গ্রহণ করতে পারবে না। তথা তারা আর কাফফারা গ্রহণের উপযুক্ত নয়। এমনটি বলা যাবে না, বরং তারা মিসকিন থাকা অবস্থায় যত চায় কাফফারা গ্রহণ করতে পারবে, তাই ব্যক্তি যা দিয়েছে, তা দুটি কাফফারা হওয়ার এবং যাদেরকে দিয়েছে তারা কাফফারা গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার দরুন দু'টি যিহারের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে এর জবাব স্পষ্ট হয়ে গেছে নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি না।

قوله : وَعَنْ اِفْطَارٍ وَظِهَارٍ الخ : যদি কেহ যিহারের কাফফারা এবং রোজা ভঙ্গের কাফফারা এর নিয়তে ষাট জন মিসকিনকে এক সা গম করে প্রদান করে তবে উভয়টির কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে জিনস ভিন্ন। জিনস ভিন্ন হওয়ার কারণে উভয়টির নিয়ত এবং প্রদান সবই কার্যকর। কারণ একটি অপরটির অন্তর্গত হওয়ার প্রতিবন্ধক। তদ্রূপ যদি কারো উপর দু'টি যিহারের কাফফারা আবশ্যক হয় আর সে অনির্দিষ্টভাবে দু'টি গোলাম স্বাধীন করে অথবা চার মাস রোজা রাখে কিংবা একশত বিশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ায় তাহলে তার উভয় কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, একই জিনসের ক্ষেত্রে নিয়ত দ্বারা পর্থক্যের কোন প্রয়োজন নেই।

قوله : وَاِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا رَقَبَةً الخ : যদি কারো উপর দু'টি যিহারের কাফফারা আবশ্যক হয় আর সে একটি কাফফারা আদায় করে অর্থাৎ, একটি গোলাম স্বাধীন করে অথবা দুমাস রোজা রাখে। তাহলে আহনাফ ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উক্ত ব্যক্তি যে কোন যিহারের কাফফারা নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবে। আর যদি কাফফারার কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয় অর্থাৎ, একটি যিহার আর অপরটি হত্যার হয় তবে কোনটির কাফফারা নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করা সহীহ হবে না।

তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এক্ষেত্রেও উক্ত ব্যক্তির নিয়ত দ্বারা উভয়টি থেকে যে কোন একটি নির্ধারণ করার এখতিয়ার থাকবে। তিনি বলেন, সকল কাফফারারই উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, তাহল পাপ মুচন করা। এ হিসাবে সকল কাফফারাই এক জিনস বা জাত তুল্য। আর ইহা অতি প্রসিদ্ধ যে একই জিনসের মধ্যে নিয়ত ধর্তব্য নয়। তাই দু' যিহারের বেলায় যেভাবে যে কোন একটিকে নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। তদ্রূপ

এখানেও যে কোন একটিকে নিয়ত দ্বারা নির্ধারণ করা যাবে। আমাদের ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, উভয় মাসআলাতেই নিয়ত দ্বারা কোনটিকেই নির্ধারণ করা যাবে না এবং তার কাফফারা আদায়ও হবে না। কেননা, দু'টি কাফফারার ক্ষেত্রে একটি কাফফারা তথা একটি গোলাম আজাদ করেছে। তাই এমন হল যে, সে অর্ধেক গোলাম কাফফারা হিসাবে আদায় করেছে। অথচ অর্ধেক গোলাম আজাদ করলে কাফফারা আদায় হয় না। তাই তার এ আজাদ করা নফল হিসাবে গণ্য হবে। কাফফারা হিসাবে হবে না। তাছাড়া যখন সে গোলাম আজাদ করে ফেলল, তখন তো তার আর কোন কিছু বাকী থাকল না যে, তা নিয়ত দ্বারা নির্ধারন করবে। কেননা, গোলাম স্বাধীন হওয়ার পরে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই যখন স্বাধীন করবে। তখনই নিয়ত পাওয়া যাওয়া ধর্তব্য।

بَابُ اللِّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আন

هِيَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا وَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَصَلُحَا شَاهِدَيْنِ وَهِيَ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا أو نَفَى نَسَبَ الْوَلَدِ وَطَالَبَتْهُ بِمُوجِبِ الْقَذْفِ وَجَبَ اللِّعَانُ فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حتى يُلَاعِنَ أو يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيُحَدُّ فَإِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ فَإِنْ أَبَتْ حُبِسَتْ حتى تُلَاعِنَ أو تُصَدِّقَهُ -

অর্থ : লি'আন হল শপথ দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এবং অভিসম্পাত শব্দযোগে উচ্চারিত সাক্ষসমূহ। যা স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের হদ্দের স্থলবর্তী। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের হদ্দের স্থলবর্তী। যদি কেহ তার স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ দেয় আর তারা উভয়ে সাক্ষ দানের উপযুক্ত হয় এবং স্ত্রী লোকটি এমন হয় যে তার উপর অপবাদকারীর উপর হদ কায়েম করা হয় অথবা স্বামী (প্রসবের পর) স্ত্রীর সন্তানের বংশ পরিচয় অস্বীকার করে। আর স্ত্রী যদি অপবাদের প্রতি বিধান দাবীকারী হয়, তবে স্বামীর উপর লিআন আবশ্যকীয় হবে। যদি স্বামী (লি'আন করতে) অস্বীকার করে তবে তাকে বন্দি করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লি'আন করবে অথবা নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করে নেবে। (যদি সে মিথ্যাবাদী স্বীকার করে নেয়) তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি স্বামী লি'আন করে তাহলে স্ত্রীর উপর লিআন আবশ্যকীয় হবে। যদি স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে আটক করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লি'আন করবে অথবা স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

لعان শব্দটি باب مفاعلة এর ক্রিয়ামূল। যা فعال এর وزن এ ব্যবহৃত হয়। অর্থ বিতাড়ন, দূরীকরণ। শরীয়তের পরিভাষায় লি'আন হল :

هِيَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْاَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِيْ حَقِّهِ وَ مَقَامَ حَقِّ الزِّنَا فِيْ حَقِّهَا

লি'আন হল শপথ দ্বারা সুদৃঢ় কৃত এবং অভিসম্পাৎ শব্দ যোগে উচ্চারিত সাক্ষসমূহ, যা স্বামীর ক্ষেত্রে অপবাদের হদ্দের স্থলবর্তী। আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারের হদ্দের স্থলবর্তী।

قوله : فَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَه الخ : লিআনের বিধান প্রমাণিত হওয়ার কারণ, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি ব্যভিচারিণী বা আমি তোমাকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেছি। অথবা হে ব্যভিচারিণী বলে সম্বোধন করে কিংবা স্বামী তার সন্তানের বংশ তার দিকে সম্বন্ধ হওয়াকে অস্বীকার করে। আর স্ত্রী এসবগুলো অস্বীকার করে তার অপবাদের প্রতি বিধান দাবি করে এবং অবস্থা এমন হয় যে, অপবাদকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করার উপযুক্ততা বিদ্যমান থাকে, তাহলে জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব।

লি'আন ওয়াজিব হওয়ার প্রেক্ষাপট : ইসলামের প্রথম যোগে স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপের কারণে স্বামীর উপর حد قذف তথা অপবাদের হদ্দ আবশ্যক হত। যেভাবে অন্য কোন পাক পবিত্র নারীর উপর অপবাদ আরোপের কারণে হয়ে থাকে। তার দলিল হল মহান আল্লাহর বাণী—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করে এবং চার সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না। এরা ফাসিক।' উক্ত আয়াতে ব্যাপকভাবে সকল সতী সাধ্বী নারীর কথা বলা হয়েছে এবং অপবাদকারী স্বামী বা অন্য কোন পুরুষ সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে উক্ত আয়াত থেকে লি'আনের বিষয়টি প্রমাণিত হল না। তাই হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর হাদীসের প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। হাদীসটি হচ্ছে :

قَالَ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ اَنْصَارِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ اِمْرَاَتِي رَجُلًا فَاِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَ اِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَ اِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, একদা আমরা জুমার রাতে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন একজন আনছারী সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেমন মনে করেন যে কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পায় সে যদি তাকে হত্যা করে দেয় তবে আপনারা তাকে হত্যা করে দেবেন। আর যদি সে কিছু বলে তবে তাকে বেত্রাঘাত করবেন। আর যদি সে চুপ থাকে তবে সে ক্রোধের সাথে চুপ থাকবে। অতঃপর লোকটি বলল, হে আল্লাহ! তুমি এ বিষয়ে ফায়সালা দান করো। অতঃপর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ※ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ※ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ※ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ※

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন স্বাক্ষী নেই। তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত অবতীর্ণ হবে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে যে তার (নিজের) স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।' —সূরা নূর

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা লি'আন শরয়ী বিধানরূপে গণ্য হল। তবে লি'আন যেহেতু স্ত্রীর অধিকার তাই অন্যান্য অধিকার এর ন্যায় স্ত্রী তার তলব করা আবশ্যক। কেননা, স্বামী কর্তৃক অপবাদের কারণে তার উপর যে দোষ তথা কলঙ্ক অর্পিত হয়েছে, স্ত্রী লিআন তলবের মাধ্যমে তার উপর ব্যভিচারের লজ্জা জনক অপবাদ দূর হয়ে যাবে। গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, যেভাবে স্বামী সরাসরি ব্যভিচার এর অপবাদ ব্যক্ত করা এবং স্ত্রী তার অস্বীকার করার সূরতে লিআন আবশ্যক হয় তদ্রূপ স্বামী যদি তার সন্তানের নসব অস্বীকার করে তবুও লিআন স্বামীর উপর আবশ্যক হবে। কেননা, এ সুরতেও স্ত্রীর উপর অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে।

قوله : فَإِنْ أَبَى حُبِسَ الخ : স্বামী যদি লিআন করতে অস্বীকার করে। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে ক্বাজী তাকে আটক করে রাখবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিআন না করে অথবা তার কথা মিথ্যা তা স্বীকার না করে।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে স্বামী লিআন অস্বীকার করলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। উক্ত মতানৈক্যের মূল ভিত্তি হচ্ছে আমাদের মতে অপবাদের কারণে স্বামীর উপর লিআন ওয়াজিব হয়। আর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) এর মতে হদ্দ ওয়াজিব হয়। আমাদের যুক্তি নির্ভর দলীল হচ্ছে স্বামীর উপর লি'আন নামক হক ওয়াজিব হয়েছে। এখন স্বামী লিআন করতেও সক্ষম্ তাই তাকে আটক রেখে লিআন করতে বাধ্য করা হবে। আর যখন সে যে মিথ্যাবাদী তা স্বীকার করে নেবে, তখন লিআনের কারণ শেষ হওয়াতে তার উপর থেকে লিআন যা ওয়াজিব ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তার মিথ্যার স্বীকৃতি প্রদান করাতে লিআন এর কারণ দূর হয়ে গেছে। লিআনের কারণ তো হচ্ছে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ, পরস্পরকে মিথ্যাবদী বলার কারণে লিআন আবশ্যক হয় আর যদি স্বামী তার কথা মিথ্যা হিসাবে স্বীকার করে নেয় তবে তো আর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিচ্ছে না বরং এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা মেনে নিচ্ছে। আর যদি স্বামী তার কথা মিথ্যা একথা স্বীকারোক্তি দিয়ে দেয়, তবে সকলের মতে তার উপর حدقذف অপবাদের দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে।

قوله : فَإِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا الخ : যদি স্বামী লিআন করে নেয়, তাহলে স্ত্রীর উপর লিআন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, স্ত্রী লিআন করতে হবে। কেননা, লিআনের আয়াতে স্ত্রীর উপর থেকে শাস্তি রহিত করার জন্য তাকেও লিআন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এখন স্ত্রী যদি লিআন করতে অস্বীকার করে তাহলে আমাদের মতে তাকে বিচারক আটক করে রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিআন না করবে অথবা তার স্বামীর কথা সত্যায়ন না করবে। কেননা, যেভাবে স্বামীর উপর লিআন ওয়াজিব তদ্রূপ স্ত্রীর উপরও তা ওয়াজিব। এবং স্ত্রী তা আদায় করতেও সক্ষম। তাই এ হকের কারণে তাকে আটক করা হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে স্ত্রী যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে তবে তার উপর জেনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। তাকে আটক করে বল প্রয়োগ পূর্বক লিআন বা স্বামীর কথার সত্যতা প্রকাশ করনো যাবে না।

فَإِنْ لم يَصْلُحْ شَاهِدًا حُدَّ وَإِنْ صَلُحَ وَهِيَ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَصِفَتُهُ ما نَطَقَ بِهِ النَّصُّ فَإِنْ الْتَعَنَا بَانَتْ بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَلَا تَبِينُ قَبلَهُ وَإِنْ قَذَفَ بِوَلَدٍ نَفَى نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَكَذَا إِذَا قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ أو زَنَتْ فَحُدَّتْ وَلَا لِعَانَ بِقَذْفِ الْأَخْرَسِ وَ نَفْى الْحَمْلِ وَتَلَاعَنَا بِزَنَيْتِ وَهٰذَا الْحَمْلُ منه ولم يَنْفِ الْحَمْلَ وَلَوْ نَفْي الْوَلَدَ عِنْدَ التَّهْنِئَةِ وَابْتِيَاعِ آلَةِ الْوِلَادَةِ صَحَّ وَبَعْدَهُ لا وَلَاعَنَ فِيهِمَا وَإِنْ نَفَى أَوَّلَ التَّوْأَمَيْنِ وَأَقَرَّ بِالثَّانِي حُدَّ وَإِنْ عَكَسَ لَاعَنَ وَثَبَتَ نَسَبُهُمَا فِيهِمَا -

অনুবাদ : যদি স্বামী সাক্ষ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তবে দন্ড প্রাপ্ত হবে। আর যদি সাক্ষ্য হওয়ার যোগ্য হয় কিন্তু স্ত্রী এমন হয় যে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হয় না। তাহলে স্বামীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং লিআন ওয়াজিব হবে না।

লিআনের পদ্ধতি যা কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ তাই-ই। আর যখন উভয়ে লিআন করে ফেলবে তখন বিচারকের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াতে স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। আর যদি সন্তানের (পরিচয় অস্বীকারের) সম্পর্কে অপবাদ আরোপ করে (এবং লিআন ও সংঘটিত হয়ে যায়) তাহলে (পিতার সাথে) সন্তানের বংশ পরিচয় নাকচ করে তাকে মাতার সাথে সম্পৃক্ত করে দিবে। (লিআনের পর যদি স্বামী ফিরে আসে) এবং নিজের মিথ্যাবাদীতা স্বীকার করে তাহলে তাকে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে এবং এ স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অধিকার রাখবে। অনুরূপভাবে অন্য কাউকে অপবাদ দানের কারণে হদ্দ প্রাপ্ত হয়, কিংবা স্ত্রী লোকটি ব্যভিচার করে হদ্দ প্রাপ্ত হয়। বোবা ব্যক্তির অপবাদ আরোপে এবং (স্বামী তার স্ত্রীর) গর্ভ অস্বীকার করাতে লি'আন আবশ্যক হবে না। আর (স্বামীর উক্তি) তুমি যিনা করেছ এবং এ গর্ভ তার থেকে সঞ্চারিত। তাহলে উভয়ে লি'আন করবে। তবে (কাজী) বংশ পরিচয় নাকচ করবে না। যদি স্বামী (সন্তানের জন্মের পর) অভিনন্দন গ্রহণকালে কিংবা প্রসবের আসবাব প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম খরিদের সময়কালে (সন্তানের পিতৃপরিচয়) অস্বীকার করে তবে তা সহীহ হবে। কিন্তু এরপর (অস্বীকার করলে তা) সহীহ হবে না। (তবে) উভয় সুরতে লি'আন করবে। আর যদি যমজ সন্তানের প্রথমটিকে অস্বীকার করে আর দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করে তবে স্বামীকে হদ্দ লাগানো হবে। আর যদি এর বিপরীত করে (অর্থাৎ, প্রথমটিকে স্বীকার করে আর দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করে) তবে লি'আন করবে এবং উভয় সুরতে উভয় সন্তানের পিতৃপরিচয় সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ شَاهِدًا الخ : যদি অপবাদ প্রদানকারী স্বামী সাক্ষ হওয়ার যোগ্য হয় না অর্থাৎ, স্বামী দাস হয় কিংবা কাফের হয় অথবা অন্য অপরাধে হদ্দ প্রাপ্ত হয় তবে তার উপর লি'আন ওয়াজিব হবে না। কেননা, লি'আনের জন্য সাক্ষের উপযুক্ততা একান্ত প্রয়োজন। তাই এ ক্ষেত্রে লি'আন ওয়াজিব না হয়ে তার মূল আবশ্যকীয় বিষয় তথা حدقذف (অপবাদের দন্ডবিধি) আরোপ হবে। হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার মূল দলিল হল কুরআনের আয়াত :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

আর যারা সতী সাধ্বী নারীর উপর (জেনার) অপবাদ আরোপ করে। অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত হদ্দে কযফই বিধান ছিল। অতঃপর স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার পরিবর্তে লি'আনের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যদি লি'আন প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, তবে অপবাদ আরোপ করার মূল বিধান যা হদ্ধে কযফ তাই প্রয়োগ করা হবে। আর যদি স্বামী সাক্ষ্য হওয়ার উপযুক্ত হয়। কিন্তু স্ত্রী এমন হয় যে, তার উপর পূর্বে হদ্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, বা ব্যভিচারিনী কিংবা দাসী হয় অথবা এমন স্ত্রীলোক হয়, যার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ কারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হয় না। অর্থাৎ, স্ত্রীলোকটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয়। কিংবা মস্তিস্ক বিকৃত হয়। তাহলে এসব সুরতে স্বামীর উপর অপবাদের দন্ড বিধি প্রয়োগ হবে না এবং লিআন ওয়াজিব হবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে লি'আন ও হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ মহিলা থেকে উদ্ভুত। কেননা, মহিলা সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য না হওয়ার কারণে তথা মস্তিস্ক বিকৃত বা দাসী হওয়ার কারণে স্বামীর উপর লি'আন ওয়াজিব হচ্ছে না। আর ব্যাভিচারিনী হওয়ার কারণে স্ত্রী লোকটি মুহসিনা হতে পারেনি তাই স্বামীর উপর থেকে حدقذف বা অপবাদের দন্ডবিধি রহিত হয়ে যাবে। কেননা, অপবাদের দন্ড বিধিকার্যকর করার জন্য স্ত্রীলোকটি মুহসিনা হওয়া শর্ত দলিল হচ্ছে আল কুরআনের আয়াত اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الخ (যারা মুহসিনা সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করে তাছাড়া হদ্দ রহিত হওয়ার দলীল পবিত্র হাদীস দ্বারাও পেশ করা যায়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে—

أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِمْ اَلْيَهُوْدِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَ الْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ -

'চার প্রকার স্ত্রীলোক ও তার স্বামীর উপর লি'আন আরোপ হয় না। মুসলিমের বিবাহাধীন ইয়াহুদী ও নাসরানী স্ত্রী। স্বাধীন লোকের বিবাহাধীন দাসী স্ত্রী, দাসের বিবাহাধীন স্বাধীনা স্ত্রী।' (তাহাভী)

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে যদি অপবাদের শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে স্ত্রীর উপর স্বামীর অপবাদের কারণে স্বামীকে অপবাদের দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে।

قوله : وَ صِفَتُهُ مَا نَطَقَ الخ : লি'আনের পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আল কুরআনে যা স্পষ্টভাবে বর্ণিত তাই আল কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ *

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতিত তাদের কোন সাক্ষ্য নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে যে সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত

হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং ৫ম বার বলবে যে, তার (নিজের) স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। (সূরা আননুর)

ইমাম কুদুরী (রহ.) উক্ত আয়াতের আলোকে বলেন, (ব্যাখ্যাসহ) স্ত্রী যখন কাজীর নিকট তার স্বামীর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের বিচার প্রদান করবে, তবে কাজী প্রথমে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন। মহিলা যদি এতে সম্মত না হয়ে তার মকদ্দমার উপর জোর দাবী জানায়, আর স্বামী তা অস্বীকার করে, তবে স্ত্রীর পক্ষে দুজন ন্যায় পরায়ন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। যাতে তার দাবী প্রমাণিত হয়। কিন্তু স্বামী যদি তার অস্বীকারের পক্ষে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ হবে এবং লিআন রহিত হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী তার প্রদানকৃত যিনার অপবাদের কথা স্বীকার করে তবে স্বামীকে তার দাবী প্রদানের জন্য চারজন সাক্ষ্য উপস্থিত করার জন্য বলা হবে। যদি স্বামী চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে তবে স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করা হবে সে মুহসিনা না কি মুহসিনা নয়। স্ত্রী যদি মুহসিনা হয় তবে তাকে প্রস্তরাঘাত করা হবে। আর যদি স্ত্রী মুহসিনা হয় না তবে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি স্বামী কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে লি'আন ওয়াজিব হবে। এভাবে যে, প্রথমে স্বামী লি'আন করবে, তাই স্বামী চারজন সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং প্রত্যেক বার বলবে যে, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগের ব্যাপারে আমি সত্যবাদী। আর ৫ম বার বলবে, যে তার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগের ব্যাপারে যদি সে (স্বামী নিজে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার (আমার) উপর আল্লাহর লা'নত হোক। আর উল্লেখ্য যে, প্রতিবারই সাক্ষ্য প্রদানের সময় স্ত্রীর দিকে ইশারা করবে। অতঃপর স্ত্রী অনুরূপভাবে চারবার সাক্ষ্য দেবে এবং প্রতিবারই একথা বলবে যে, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে তার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সে (স্বামীর দিকে ইশারা করে বলবে)— মিথ্যাবাদী। আর ৫ম বার বলবে যদি সে (স্বামী) তার বিরুদ্ধে জেনার অপবাদ আরোপের ব্যাপারে সতবাদী হয়ে থাকে তবে তার উপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হোক।

قوله : فَإِنْ اِلْتَعَنَا بَانَتْ الخ : যখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে লি'আন করে ফেলে তবে আমাদের মতে কাজীর ফয়সালার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে আর এ বিচ্ছেদ বায়েনা হবে। শুধু লি'আনের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হবে না। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে লি'আনের পর তাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কাজীর ফায়সালার প্রয়োজন হবে না। তিনি দলীল প্রদান করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস- اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَايَجْتَمِعَانِ اَبَدًا লি'আনকারী স্বামী স্ত্রী কখনো একত্র হতে পারে না, উক্ত হাদীস প্রমান করে যে শুধু লি'আন দ্বারাই বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল হল : লি'আনের কারণে হুরমত সাবিত হওয়া إِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوْفِ (সদাচার) এর সঙ্গে স্ত্রীকে রাখার অধিকার নষ্ট হয়ে গেছে। তাই স্বামীর উপর تَسْرِيْحٌ بِالْإِحْسَانِ উত্তম পন্থায় তাকে মুক্ত করে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। এখন স্বামী যদি تسريح بالاحسان থেকে বিরত থাকে তবে কাজী স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেবেন। উক্ত দলীল থেকে প্রতিয়মান হল যে, লি'আনের পর কাজীর বিচ্ছেদের প্রয়োজন রয়েছে এমনকি কাজীর বিচ্ছেদের পূর্বে যদি একজন মৃত্যুবরণ করে তবে অপরজন তার ওয়ারিশ সাব্যস্ত হবে অথবা স্বামী যদি যিহার করে কিংবা তালাক দিয়ে দেয় তবে তা কার্যকর হবে। তাছাড়া উয়াইমির আজলানী (রহ.) এর সম্পর্কিত হাদীস দ্বারাও আমাদের সমর্থন পাওয়া যায়। তাহল : উয়াইমির আজলানী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে যা বলেছি তা মিথ্যা বলেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তাকে রেখে দাও। তিনি তার জবাবে বললেন, যদি তাকে রাখি তবে সে তিন তালাক। উয়াইমির (রাযি.) এর শেষ কথাটি লি'আন সংঘটিত হওয়ার পরে ছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন প্রতিবাদ করেননি। তাই প্রতিয়মান

হল যে, তার লি'আন দ্বারা বিচ্ছেদ হয়নি। যদি লি'আন বিচ্ছেদকারী হত তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলতেন এখন আর তালাক প্রদানের সময় নেই। সুতরাং বুঝা গেল লি'আন তালাক নয়, বরং লি'আনের পর কাজী বিচ্ছেদ করে দেয়া প্রয়োজন।

قوله : وَ اِنْ قَذَفَ بِوَلَدٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ আরোপ করে এভাবে যে তোমার গর্ভের সন্তান আমার থেকে নয়। তাহলে কাজী তার থেকে লি'আন গ্রহণ করবেন। স্বামী তার লিআনে বলবে আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে সন্তানের পিতৃপরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করছি এতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী। আর স্ত্রী তার লি'আনে বলবে আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সন্তান অস্বীকার এর মাধ্যমে আমার উপর যে অপবাদ আরোপ করেছ এ বিষয়ে তুমি অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্বামী স্ত্রী উভয়ে যখন লি'আন করে ফেলবে তখন কাজী উক্ত সন্তানের বংশ পরিচয় পিতার দিক থেকে নাকচ করে মাতার দিকে সম্পৃক্ত করে দেবেন।

দলীল হল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনের পর হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রীর সন্তানের পিতৃ পরিচয় হিলাল (রাযি.) থেকে মুক্ত করে তার মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে দেন। উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, কাজী উভয়ের লি'আনের সন্তানের পিতৃ পরিচয় নাকচ করে তার মাতার সাথে সম্পৃক্ত করে দেবেন।

দ্বিতীয় দলীল : এক্ষেত্রে লি'আনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সন্তানের বংশ পরিচয় অস্বীকার করা তাই ক্বাজী যখন উভয়কে পৃথক করে দেবেন তখন এমনিতেই সন্তানের পিতৃপরিচয় নাকচ করা অন্তর্ভুক্ত হবে।

قوله : وَ اِنْ اَكْذَبَ نَفْسَهٗ الخ : লি'আনের পর কাজীর বিচ্ছেদের মাধ্যমে উভয় থেকে পৃথক হওয়ার পর স্বামী যদি তার দাবী প্রত্যাহার করে অর্থাৎ, নিজের মিথ্যার স্বীকার করে তবে তার উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে। এ স্বামী উক্ত বিচ্ছেদ প্রাপ্ত স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তরফাইন (রহ.) এর মতে স্বামী অন্য পুরুষের ন্যায় উক্ত স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও যুফার (রহ.) এর মতে লি'আনের দ্বারা উক্ত মহিলার সাথে حرمت مؤبده তথা চিরস্থায়ী মাহরামাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তাই সে তাকে কখনো বিবাহ করতে পারবে না। তাদের দলীল পবিত্র হাদীস তথা : اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَايَجْتَمِعَانِ اَبَدًا। (লি'আনকারী স্বামী স্ত্রী কখনো একত্র হতে পারে না।) উক্ত হাদীসের বাহ্যিকতার আলোকে তারা বলেন, যে লি'আনকারী স্বামী স্ত্রী তাদের দাবী প্রত্যাহার করলেও পরস্পরের মধ্যে কখনো বিবাহ সাব্যস্ত হবে না।

তরফাইন (রহ.) এর দলীল : স্বামী তার কথাকে মিথ্যা হিসাবে স্বীকার করার অর্থ হল সে তার দাবী প্রত্যাহার করেছে। আর প্রত্যাহারের পর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলীলের জবাব হল :

المتلاعنان لايجتمعان ابدا। উক্ত হাদীসের অর্থ হচ্ছে স্বামী স্ত্রী লি'আনকারী থাকা অবস্থায় একত্র হতে পারবে না। সুতরাং যখন স্বামী তার দাবী প্রত্যাহার করল তখন সে আর লি'আনকারী হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে না। এজন্যই তো হুকুম পরিবর্তীত হয়ে হদ্দে কযফ আবশ্যক হয়। তাই হদ্দের কারণে লিআনের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে। অথচ হাদীসে লি'আনকারী থাকা অবস্থায় একত্র হতে পারবে না বলা হয়েছে। তখন তারা পরস্পরকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া বা বিবাহ করা জায়েয হবে। তা আলোচিত হাদীসের বিরুধী হবে না। والله اعلم।

قوله : وَ كَذَا اِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا الخ : পূর্ব উল্লেখিত হুকুম হবে যদি অন্য কাউকে অপবাদ দানের কারণে হদ্দপ্রাপ্ত হয়। কিংবা স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করে হদ্দপ্রাপ্ত হয়। তাই তাদের মাঝে লি'আনের যোগ্যতা অবশিষ্ট না থাকায় তাদের উপর লি'আন বা তার সংশ্লিষ্ট হুকুম তথা হুরমত সাব্যস্ত হবে না। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর মতে উক্ত ব্যক্তি পূণরায় ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে।

قوله : وَ لَا لِعَانَ بِقَذْفِ الْأَخْرَسِ الخ : বাকশক্তিহীন ব্যক্তি যদি ইশারা দ্বারা তার স্ত্রীর উপর জেনার অপবাদ আরোপ করে তবে তার দ্বারা লি'আন আবশ্যক হবে না। কেননা, লি'আন সরীহ স্পষ্ট শব্দালীর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হদ্দে কযফ স্পষ্ট শব্দাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া বোবা ব্যক্তির ইশারা দ্বারা জেনার অপবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে সন্দেহ বিদ্যমান। আর সন্দেহ দ্বারা হদ্দে কযফ বা লি'আন সব্যস্ত হয় না। কেননা, এ ব্যাপারে মূলনতি হচ্ছে الحدود تندرى بالشبهات 'সন্দেহের দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যায়।' তাই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিত বাকশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কথা বলার স্থলবর্তী। তাই তার ইঙ্গিত দ্বারা লি'আন সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَ نَفْيِ الْحَمْلِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে যে তোমার গর্ভ আমার থেকে নয়। তাহলে ইমাম আনু হানিফা (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে উক্ত সুরতে লি'আন ওয়াজিব হবে না এবং এর দ্বারা হদ্দও ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, স্বামী কর্তৃক অপবাদ আরোপের ছয় মাসের পূর্বেই যদি মহিলা সন্তান প্রসব করে তবে গর্ভ অস্বীকার করার দ্বারা লি'আন ওয়াজিব হবে। আর যদি ছয় মাসের পর সন্তান প্রসব করে তবে সন্দেহের কারণে লি'আন ওয়াজিব হবে না।

তাদের দলীল হল : ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর সন্তান প্রসব করার কারণে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে, স্বামীর অস্বীকার করার সময় সন্তান গর্ভে স্থায়ী ছিল। তাই সে গর্ভ অস্বীকার করার কারণে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে স্বামীর অস্বীকার করার কারণে লি'আন ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : স্বামী যখন গর্ভ অস্বীকার করেছে তখন সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে গর্ভবতী নয়। কেননা, পেটের মাঝে বায়ু পূর্ণ হওয়ার ও সম্ভাবনা রয়েছে। যাকে স্বামী গর্ভ মনে করেছে। এজন্য গর্ভের দিক সুনিশ্চিত না হওয়ার কারণে স্বামী অপবাদকারী সাব্যস্ত হবে না। তাই লি'আনও ওয়াজিব হবে না। তাছাড়া বিষয়টি এমন হলো যে সে যেন অপবাদকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রেখেছে। এভাবে যে তুমি গর্ভবতী হলে তা আমার থেকে নয়। আর কাযফকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা জায়েয নয়। তাই কাযফ কার্যকর না হওয়াতে তার উপর লি'আন আবশ্যক হবে না।

قوله : و تَلَاعَنَا بِزَنَيْتِ الخ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তুমি জেনা করেছ আর এই গর্ভ জেনার দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে লি'আন করবে। কেননা, উক্ত সুরতে জেনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে বিধায় قذف তথা জেনার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাদের উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। তবে আমাদের মতে কাজী সন্তানের পিতৃপরিচয় পিতা থেকে নাকচ করবেন না। কেননা, গর্বের পরিচয় পিতা থেকে হওয়া তা সন্তানের বিধান। যা প্রয়োগ হয় সন্তান জন্ম লাভের পর তাই অপবাদ আরোপ করা তথা গর্ভ অবস্থায় যেহেতু বিষয়টি নিশ্চিত নয়। তাই তার সাথে নিশ্চিত বিষয় প্রয়োগ করা যাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, কাজী সাহেব লি'আনের পরেই সন্তানের পিতৃপরিচয় স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন।

قوله : وَ لَوْ نَفى الْوَلَدَ عِنْدَ التَّهْنِئَةِ الخ : স্বামী যদি তার স্ত্রীর সন্তানকে প্রসবের পরপরই অস্বীকার করে বসে কিংবা সন্তানের অভিনন্দন (تهنئة) গ্রহণ করার সময় সন্তানকে অস্বীকার করে অথবা প্রসবের সময়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করার সময় সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে স্বামী থেকে পিতৃ পরিচয় পৃথক করা সহীহ। আর যদি এরপর অস্বীকার করে তবে স্বামী থেকে সন্তানের পিতৃ-পরিচয় পৃথক করা সহীহ হবে না, তবে উভয় সুরতে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের উপর লি'আন ওয়াজিব ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে স্বামী যদি নিফাসের সময় সীমার ভেতর সন্তান অস্বীকার করে তবে তার অস্বীকার সহীহ হবে। যদি লি'আন করে ফেলে তাহলে কাজী সন্তানের পিতৃপরিচয় স্ত্রীর স্বামী থেকে পৃথক করে দেবেন। **তাদের দলীল হল :** সন্তান অস্বীকার করা কার্যকর হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে অল্প ও দীর্ঘ সময় সীমার সাথে

অর্থাৎ, সন্তান প্রসবের পর অল্প সময়সীমার ভেতর তা অস্বীকার করলে সহীহ্ হবে। আর দীর্ঘ সময় পর তা অস্বীকার করলে সহীহ্ হবে না। সুতরাং দীর্ঘ সময় ও অল্প সময়ের মধ্যখানে পার্থক্যকারী হচ্ছে নিফাস। নিফাস চলাকালীন সময় ধরে নিতে হবে অল্প সময়। আর নিফাস শেষ হলে অল্প সময় শেষ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ, অল্প ও দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নিফাস। কেননা, নিফাস হচ্ছে প্রসবের চিহ্ন। তাই চিহ্ন থাকা পর্যন্ত অল্প সময় ধরা হবে। এজন্য স্বামী তার স্ত্রীর নিফাস চলাকালীন সময়ের ভেতর সন্তান অস্বীকার করলে তা সহীহ্ হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হচ্ছে : কোন সময় সীমা নির্ধারন করার কোন প্রয়োজন নেই। কারন, সময় নির্ধারণ করা হয় চিন্তা ফিকির দ্বারা অবকাশ প্রদানের লক্ষ্যে। আর চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন স্বভাবের হয়ে তাকে। এজন্য আমরা এমন বিষয়কে বিবেচনায় রেখেছি যা সন্তানের পিতৃপরিচয়কে বুঝায়। আর তাহল সন্তানের অভিনন্দন গ্রহনকালে বা প্রসবকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় কালে নীরবতা অবলম্বন করা। কিংবা সন্তান প্রসবের পর এতটুকু সময় অতিবাহিত হওয়া যাতে অস্বীকার পাওয়া যায়নি। তাই তার পর অস্বীকার করলে তা কার্যকর হবে না। কেননা, এসব বিষয় অভিনন্দন গ্রহণ করা বা প্রসবকালীন সামগ্রী ক্রয় করা দ্বারা সন্তান তারই বলে প্রমান পেশ করবে। তার পর অস্বীকার করলে অন্য কারণে অস্বীকার করছে বলে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য আমরা স্ত্রীর নিফাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কে স্বামীর অস্বীকার করা দ্বারা সন্তানের পিতৃ পরিচয় নাকচ করাকে সহীহ্ বলি না।

قوله : وَ اِنْ نَفَى اَوَّلَ التَّوَامَيْنِ الخ : যদি স্ত্রী দুটি যমজ সন্তান প্রসব করে আর স্বামী তাদের প্রথমটিকে অস্বীকার করে অতঃপর দ্বিতীয়টিকে তার সন্তান বলে স্বীকার করে, তাহলে উভয় সন্তানের পিতৃ পরিচয় উক্ত স্বামী থেকে প্রমাণিত হবে। কেননা, দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করার মাধ্যমে সে তার দাবীকে প্রত্যাহারকারী তথা সে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করল। সুতরাং তার এই অপবাদ উত্থাপনের দরুন তাকে হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে।

আর যদি স্বামী যমজ সন্তানের প্রথমটিকে স্বীকার আর দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করে তবুও উভয় সন্তানের পিতৃপরিচয় উক্ত স্বামী থেকেই হবে। কেননা, উভয় সন্তান একই বীর্যের দ্বারা সৃষ্ট সন্তান। তাই হুকুমও এক জাতিয় হবে। তবে প্রথম সুরতে যদিও স্বামীর উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হয়েছিল, কিন্তু এ দ্বিতীয় সূরতে স্বামী স্ত্রীর উপর লি'আন ওয়াজিব হবে। কেননা, এক্ষেত্রে অপবাদের পর তা প্রত্যাহার পাওয়া যায়নি। আর প্রত্যাহার না পাওয়ার কারণে স্বামীর উপর হদ্দে কযফ আরোপ করা যাবে না। আর প্রথমোক্ত সুরতে দ্বিতীয় সন্তানকে স্বীকার করেছে তাই প্রথম সন্তানের ব্যাপারে যা বলেছে তা প্রত্যাহার হয়ে গেছে তাই তাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। والله اعلم

بَابُ الْعِنِّيْنِ

পরিচ্ছেদ : পুরুষত্বহীনতা

هُوَ مَنْ لَايَصِلُ اِلَى النِّسَاءِ اَوْ يَصِلُ اِلَى الثَّيِّبِ دُوْنَ الْاَبْكَارِ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوْبًا فُرِّقَ فِي الْحَالِ وَأُجِّلَ سَنَةً لو عِنِّيْنًا أو خَصِيًّا فَإِنْ وطىء وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيْقِ إِنْ طَلَبَتْ فَلَوْ قال وَطِئْتُ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ بِكْرٌ خُيِّرَتْ وَإِنْ كانت ثَيِّبًا صُدِّقَ بِحَلْفِهِ وَإِنْ اخْتَارَتْهُ بَطَلَ حَقُّهَا ولم يُخَيَّرْ أَحَدُهُمَا بِعَيْبٍ -

অনুবাদ : عنين (পুরুষত্বহীনতা) হল যে মহিলাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। (অর্থাৎ, মহিলাদের উপর সহবাসে সক্ষম হয় না) অথবা অকুমারী নারীর উপর সক্ষম আর কুমারী নারীর উপর সক্ষম হয় না। (তাহলে সে عنين 'পুরুষত্বহীন' প্রমাণিত হবে।) স্ত্রী যদি তার স্বামীকে পুরুষাঙ্গ কর্তিত পায়। (আর যদি স্ত্রী তার দাবী করে) তবে সাথে সাথে পৃথক করে দেয়া হবে। আর যদি পুরুষত্বহীন বা খাসীকৃত পায়। আর যদি স্ত্রী বিচ্ছেদের দাবী করে তবে এক বৎসরের অবকাশ দেয়া হবে। যদি স্বামী সহবাস করে তাহলে ভাল। নতুবা স্ত্রী কাজীর বিচ্ছেদের মাধ্যমে বায়েনা হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী বলে আমি সহবাস করেছি আর স্ত্রী তার অস্বীকার করে আর (বিশেষজ্ঞ) মহিলারা বলে (সে) কুমারী তাহলে স্ত্রীকে ইচ্ছাধিকার দেয়া হবে। আর যদি স্ত্রী অকুমারী হয় তাহলে স্বামীর কথা শপথসহ সত্যায়ন করা হবে। আর যদি স্ত্রী তার স্বামীকে গ্রহণ করে তাহলে তার (স্বামী প্রত্যাহারের দাবী উত্থাপনের) হক শেষ হয়ে যাবে। আর স্বামী স্ত্রীর কাউকে (অন্য) দোষের দরুন ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : هُوَ مَنْ لَايَصِلُ الخ : তালাকের সমস্ত শ্রেণী বিভাগের যেহেতু ইহা একটি শ্রেণী, তাছাড়া যেহেতু عنين এর মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান নেই, বরং অসুস্থতা ও রুগ্ন সংশ্লিষ্ট তাই গ্রন্থকার (রহ.) তা পৃথক পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন।

عنين শব্দটি (ع) বর্ণে যের যোগে عِنٌّ থেকে নির্গত। এর অর্থ আটকে রখা অথবা তা (ع) বর্ণে যবর যোগে عَنٌّ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ বাধা, বিরত থাকা। অথবা عنين শব্দটি عنى عن الشئ থেকে নির্গত। যার অর্থ কোন বস্তু থেকে বিরত থাকা।

শরীয়াতের পরিভাষায় عنين বলা হয় যার লিঙ্গ থাকা অবস্থায়ও নিজ স্ত্রী বা অন্য কোন মহিলার সাথে সহবাস করতে সক্ষম হয়। তার লিঙ্গ উত্তেজিত হউক বা না হউক। অকুমারীর সাথে পারা আর কুমারীর সাথে না পারা এতে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, যার সাথে সে সহবাস করতে অক্ষম তার বেলায় সে عنين বলে বিবেচিত হবে। আবার তার নপুংসকতা রোগ জনিত কারণে হউক বা জন্মগত কারণে হউক বা বয়সের আধিক্যতার দরুন হউক এতেও কোন পার্থক্য নেই। আর পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তিও নপুংসকের পর্যায়ভুক্ত। তবে হা বিবাহকালীন সময়ে স্বামীর নপুংসকতা বা পুরুষাঙ্গ কর্তিত জানা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর জন্য তার সাথে বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর অকরিৎকর্মা তথা স্ত্রীলোকের সাথে কথা বলার পরই সঙ্গমের পূর্বেই বীর্য স্খলন হয়ে যায় এমন ব্যক্তিও নপুংসকের অন্তর্ভুক্ত।

قوله : وَجَدَتْ زَوْجَهَا الخ : স্ত্রী যদি বিবাহের পর স্বামীকে কর্তিত পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট পাওয়ার কারণে কাজীর নিকট বিচ্ছেদ কামনা করে তাহলে কাজী সুযোগ প্রদান ব্যতিত সাথে সাথেই তাকে পৃথক করে দেবেন। কেননা, কর্তিত পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে কখনও সহবাসের আসা করা যায় না। তাই তাকে এক বৎসরের জন্য সুযোগ প্রদান করা অনর্থক হবে।

قوله : وَ أُجِلَّ سَنَةً الخ : স্ত্রী যদি বিবাহের পর স্বামীকে নপুংসক পাওয়ার কারণে কাজীর নিকট বিচ্ছেদ কামনা করে তাহলে কাজী তাকে এক বৎসরের জন্য চিকিৎসার সুযোগ দেবেন। সুতরাং যদি স্বামী এক বৎসরের ভেতর ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে সহবাসের উপর সক্ষম হয় এবং সহবাস করে তবে তো আর সমস্যা বাকী থাকল না। কিন্তু যদি এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও সে আরোগ্যতা লাভ করেনি তথা সহবাসে সক্ষম হয়নি, তাহলে কাজী তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন। আর এ বিচ্ছেদ দ্বারা স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে।

হযরত উমর (রাযি.) হযরত অলী (রাযি.) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাযি.) এর সূত্রে বর্ণিত :

قَالَ قَضٰى عُمَرُابْنُ الْخَطَّابِ فِى الْعِنِّيْنِ اَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً

তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) নপুংসকের জন্য এক বৎসরের সুযোগ দানের ফায়সালা করেছেন।

তাছাড়া এক বৎসরের অবকাশ এবং এরপর অক্ষম হওয়াকে পৃথক করণ এবং স্ত্রীর উপর তালাকে বায়েনা পতিত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) স্বীয় কিতাবুল আছার গ্রন্থে বর্ণনা করেন :

عَنْ عُمَرَابْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ اِمْرَأَةً اَتَتْهُ فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا لَايَصِلُ اِلَيْهَا فَاَجَّلَهُ حَوْلًا فَلَمَّا اِنْقَضٰى حَوْلٌ وَ لَمْ يَصِلْ اِلَيْهَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا وَ جَعَلَهَا تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً -

এক মহিলা হযরত উমর (রাযি.) এর নিকট এসে তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করল যে, তার স্বামী তার নিকট আসে না (তথা অক্ষমতার দরুন সহবাস করে না) তখন হযরত উমর (রাযি.) তাকে এক বৎসরের অবকাশ দিলেন। অতঃপর যখন এক বৎসর অতিবাহিত হল, কিন্তু সে তার নিকট আসল না তথা সহবাসে সক্ষম হল না, তখন হযরত উমর (রাযি.) মহিলাকে ইচ্ছাধিকার দিলেন। মহিলা সে নিজেকেই গ্রহণ করল। তখন হযরত উমর (রাযি.) তাদের উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিলেন। এ বিচ্ছেদকে তালাকে বায়েন সাব্যস্ত করলেন। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে—

يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ سَنَةً وَصَلَ اِلَيْهَا اِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

'পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে এক বৎসরের সুযোগ প্রদান করা হবে। এর মাঝে যদি সক্ষম হয়ে যায় তবে তো ভাল। অন্যথায় উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে।'

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযি.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

যুক্তির নিরিখে প্রমাণ হল : স্ত্রীর অধিকারসমূহের মধ্য থেকে একটি হল তার সাথে সহবাস করা। সুতরাং সে তা থেকে বিরত থাকে তবে দেখতে হবে সে কেন বিরত থাকছে। যদি সে অসুস্থতার দরুন বিরত থাকে তবে তাকে সুস্থতার (চিকিৎসার) জন্য অবকাশ দেয়া অপরিহার্য। তাই তার এ অসুস্থতা স্বভাবগত নাকি রোগের দরুন তা যাচাই বাছাই করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে তার চিকিৎসার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। সুতরাং তা পরিস্কারভাবে বুঝার জন্য আমরা এক বৎসর নির্ধারণ করেছি। কেননা, এক বৎসরের ভেতর চারটি

মওসুম বিদ্যমান। মওসুমের পরিবর্তনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং যদি এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও সে সুস্থ হয়নি এবং স্ত্রী সহবাসের সক্ষমও হয়নি তবে বুঝে নিতে হবে তার অক্ষমতা স্বভাবগত কারণে বা জন্মলগ্ন কারণেই তাই তার থেকে সহবাসের আসা করা যাবে না। এজন্য সে স্ত্রীকে امساك بالمعروف সদাচরণ এর মাধ্যমে রাখার ক্ষমতা হারালো এবং تسريح بالاحسان উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দেয়া তার উপর আবশ্যক হল। এখন স্বামী যদি তাকে উত্তম পন্থায় মুক্ত না করে তবে বিচারক তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিচ্ছেদ করে দেবেন। যাতে মহিলার উপর স্বামীর জুলুম না হয় ।

কাজী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ করা আমাদের মাযহাব মতে তা তালাকে বায়েন। ইমাম মালেক (রহ.) ও এ মত ব্যাক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে কাজীর বিচ্ছেদকে فسخ نكاح তথা বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ করা বলা হবে। তিনি বলেন, ইহা তো মহিলার পক্ষ থেকে সংগটিত হয়েছে। আর মহিলার পক্ষ থেকে তালাক সংঘটিত হয় না, বরং বিবাহ ভঙ্গ করা হয়। আমাদের দলীল হল : মূলত কাজী স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেছে। তাই কাজীর এ বিচ্ছেদ স্বামীর দিকেই সম্পৃক্ত হয়ে তা তালাক হবে। তাছাড়া বিবাহ কার্য সম্পাদনের পর তা আর ভঙ্গ হয় না এবং যেহেতু কাজী স্ত্রীকে জুলুম থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। এখন যদি তা তালাক না হয় তবে তো স্বামী চাইলে স্ত্রীকে রুজু করতে পারে। আর দ্বিতীয় বার রুজু করলে সে তো জুলুমের মধ্যেই থেকে যাবে। এজন্য সার্বিক দিক বিবেচনা করে কাজীর বিচ্ছেদকে তালাকে বায়েন হিসাবে গণ্য হবে।

قوله : فَلَوْ قَالَ وَطِئْتُ الخ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি সহবাস হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয় অর্থাৎ, স্বামী বলে আমি সহবাস করেছি আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে দেখতে হবে স্ত্রী باكرة (কুমারী) না ثيبة (অকুমারী) সুতরাং যদি স্ত্রী অকুমারী হয় তবে স্বামীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, স্বামী মূলত বিবাহ বিচ্ছেদের অস্বীকারকারী আর স্ত্রী বিচ্ছেদের অধিকারের দাবীদার।

তাছাড়া যৌনাঙ্গ সহীহ থাকা স্বাভাবিক। তাই স্বামীর সহবাসের কথা স্বীকার করার দ্বারা তা ছহীহ হওয়ার বিষয়কে আরো জোরদার করে। আর স্ত্রী স্বামীর সহবাসকে অস্বীকার করা দ্বারা মূলত স্বাভাবিক অবস্থা তথা যৌনাঙ্গ সহীহ থাকাকে অস্বীকার করেছে। তাই স্ত্রী مدعى তথা দাবীদার। আর স্বামী مدعى عليه তথা যার উপর দাবী পেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, অস্বীকারকারী। সুতরাং স্ত্রীর উপর কর্তব্য হল, তিনি দলিল-প্রমাণ পেশ করা। আর যদি তিনি দলিল-প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হন তবে স্বামীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করে তবে তাকে চিকিৎসার জন্য এক বৎসরের অবকাশ দেয়া হবে।

আর যদি কুমারী হয় তবে অন্যান্য অভিজ্ঞ নারীরা তার গুপ্তাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখবেন যে সে কুমারী কি না। অতঃপর পরীক্ষা করে তারা যদি বলে যে, সে কুমারী তবে তার স্বামীকে এক বৎসরের অবকাশ চিকিৎসার জন্য দেয়া হবে। আর যদি নারীরা সে অকুমারী হওয়ার কথা বলে তবে স্বামীকে শপথ করার কথা বলা হবে। যদি স্বামী শপথ করে নেয়, তবে স্ত্রীর আর কোন আপত্তি তোলার অধিকার থাকবে না। আর যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করে তবে স্বামীকে এক বৎসরের অবকাশ দেয়া হবে।

قوله : وَإِنْ اِخْتَارَتْهُ الخ : আর যদি স্বামী নপুংসক জানা সত্ত্বেও স্ত্রী এতে রাজি হয়ে বিবাহ হয়, কিংবা বিবাহের পর জানার পর সে এতে রাজি হয়ে যায় তবে স্ত্রী পরবর্তীতে স্বামী থেকে বিচ্ছেদের দাবী উত্থাপনের অধিকারী হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে স্ত্রী তার নিজের হক সে নিজে নষ্ট করার উপর রাজি হয়েছে। বিধায় পরবর্তীতে তা বাতিল করার হক রাখবে না।

قوله : وَلَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُهُمَا الخ : যদি স্ত্রীর মধ্যে কোন প্রকার দোষ পাওয়া যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সহ আমাদের মাশায়েখদের মতে স্বামীর জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে না। কেননা, স্বামী স্ত্রী

কারোর মৃত্যুতে সম্ভোগ-সুখ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। অথচ বিবাহ রদ হয় না। তাই সম্ভোগ সুখের ব্যাঘাত ঘটা দ্বারা তাদের বিবাহ বন্ধন প্রত্যাহারের দাবি করা সহীহ হবে না। তাছাড়া সম্ভোগ সুখ তো হচ্ছে বিবাহ দ্বারা অর্জিত একটি সুফল। সুতরাং সুফলটি হাতছাড়া হলে তা বিবাহ-বন্ধনে কোন প্রভাব ফেলবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, স্ত্রীর মাঝে পাঁচ ধরনের দোষ থাকলে স্বামীর জন্য স্ত্রী বিচ্ছেদের দাবী গ্রহণীয়। (১) কুষ্ঠরোগ (২) শ্বেত রোগ (৩) মস্তিস্ক বিকৃত (৪) সঙ্গম-পথ বন্ধ থাকা (৫) যোনিপথে হাড় বের হয়ে থাকা। তিনি বলেন, উক্ত পাঁচ প্রকার দোষ طبعا و حسا (রুচিগত ও বাস্তবগত কারণে) সম্ভোগ লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। তাই স্বামীর বিবাহ রদ করার অধিকার থাকবে।

আমাদের পক্ষ থেকে জবাব : উক্ত সুরতে স্বামীর অধিকার বিদ্যমান রয়েছে, স্বামী যদি চায় তবে এসব রোগ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও স্ত্রী থেকে সম্ভোগ অধিকার অর্জন করতে পারবে। কেননা, কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ এবং মস্তিস্ক বিকৃত স্ত্রী থেকে সম্ভোগসুখ অর্জন করা তো অত্যন্ত স্পষ্ট। আর যোনিপথ বন্ধ বা তাতে হাড় বের হয়ে থাকা তা তো চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে নেয়া সম্ভব। তাই ইহাও সম্ভোগ-সুখ হাসিলের প্রতিবন্ধক থাকল না বিধায় স্বামী প্রতাহার করতে পারবে না।

আর যদি স্বামীর মধ্যে দোষ তথা কুষ্ঠরোগ, শ্বেতরোগ বা মস্তিস্ক বিকৃতি বিদ্যমান থাকে তাহলে শায়খাইন (রহ.) এর মতে স্ত্রীর জন্য বিবাহ প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে না। কেননা, বিবাহ প্রত্যাহার এর অধিকার না থাকাটা মৌলিক অধিকার। কারণ, এতে করে স্বামীর অধিকার খর্ব করা আবশ্যক হয়। তাই স্ত্রীর জন্য এ অধিকার না থাকাই যুক্তিযুক্ত বিষয়। আর পুরুষত্বহীনতা বা লিঙ্গ কর্তিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

কেননা, এখানে বিবাহের মূল বিষয় তথা যার জন্য বিবাহকে বৈধ করা হল অর্থাৎ, সঙ্গম করা তা সম্পূর্ণ খর্ব করে দেয়। তাই এক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার বাকী থাকবে। অথচ আলোচ্য মাসআলায় কোন না কোনভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব। তাই উভয় সূরতে পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে স্বামীর মাঝে দোষ বিদ্যমান থাকার সূরতে স্ত্রী বিবাহ প্রত্যাহারের এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে। কেননা, পুরুষত্বহীন ও কর্তিত লিঙ্গ হওয়ার সূরতে যেমনি ভাবে স্ত্রীর ক্ষতিরোধ কল্পে বিবাহ প্রত্যাহারের বিষয়টি তার এখতিয়ারাধীন থাকে তদ্রূপ এক্ষেত্রেও স্ত্রীর এখতিয়ার বাকী থাকবে। তবে হা স্ত্রীর মধ্যে এসব রোগ ব্যধি বিদ্যমান থাকলে স্বামীর জন্য বিবাহ প্রত্যাহারের এখতিয়ার থাকবে না। কেননা, যদি স্বামী চায় তবে তার ক্ষতি তালাক দেয়ার মাধ্যমে রোধ করতে পারে।

بَابُ الْعِدَّةِ
পরিচ্ছেদ : ইদ্দত

هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ لِلطَّلَاقِ أَوِ الْفَسْخِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَيْ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ وَ لِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لِلْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ نِصْفُ الْمُقَدَّرِ وَ الْحَامِلُ وَضْعُهُ وَ زَوْجَةُ الْفَارِّ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ وَ مَنْ عُتِقَتْ فِيْ عِدَّةِ الرَّجْعِيِ لَا الْبَائِنِ وَ الْمَوْتِ كَالْحُرَّةِ -

অনুবাদ : তা হল অপেক্ষা করা যা মহিলার উপর আবশ্যক হয়। স্বাধীনার ইদ্দত তালাক বা বিচ্ছেদের কারণে তিন কুরু তথা তিন হায়েজ আর যদি হায়েজ না হয় তবে তিন মাস। আর (স্বামীর) মৃত্যুর কারণে চার মাস দশদিন। আর দাসীর ক্ষেত্রে দুই কুরু তথা দুই হায়েজ। আর (যাদের হায়েজ হয় না তাদের ক্ষেত্রে) স্বাধীনার অর্ধেক। আর গর্ভবতী তার গর্ভ প্রসব করা। মিরাস থেকে পলায়নকারীর স্ত্রীর (ইদ্দত হবে,) দুই মিয়াদের দীর্ঘতমটি। আর যে তালাকে রেজঈ এর ইদ্দত পালনের মধ্যে স্বাধীন হয় কিন্তু তালাকে বায়েন বা স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দতপালনরত না হয় তাহলে সে স্বাধীনা মহিলার ন্যায়। (অর্থাৎ, তার ইদ্দত হবে স্বাধীনার ন্যায় তিন হায়েজ বা তিন মাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এযাবত বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাকের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে বিচ্ছেদ বা তালাকের ফলাফল নিয়ে আলোকপাত করতে চাচ্ছেন। এ হিসাবে গ্রন্থকার (রহ.) তার কিতাবে 'ইদ্দত' নাম দিয়ে এ পরিচ্ছেদ উপস্থাপন করতেছেন।

عدة এর সংজ্ঞা : عدة শব্দটি باب نصر এর মাসদার যার অর্থ الاحصاء। বা গণনা করা। عناية গ্রন্থে বলা হয়েছে اَلْعِدَّةُ فِي اللُّغَةِ أَيَّامُ أَقْرَاءِ الْمَرْأَةِ অর্থাৎ শাব্দিকভাবে ইদ্দত বলা হয় স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন দিনসমূহ।

عدة এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এর ভাষ্য অনুযায়ী هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ তা হল অপেক্ষা করা যা মহিলার উপর আবশ্যক হয়। শরহে নেহায়া গ্রন্থকার বলেন (যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট) :

هِيَ عِدَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ تَلْزِمُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ حَقِيْقَةً أَوْ تَشْبِيْهَةً الْمَنَاكِحِ بِالدُّخُوْلِ أَوِ الْمَوْتِ

عدة এমন একটি বিশেষ সময় যা প্রকৃতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বা বিবাহিতা স্ত্রী সন্দেহে সহবাসের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যুর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে মহিলাকে নির্দিষ্ট কিছু দিন গণনা করতে হয়।

জ্ঞাতব্য বিষয় ইদ্দতের জন্য জরুরী হচ্ছে, সহবাসকৃতা বা নির্জনবাসী হওয়া বা স্বামী মৃত্যু বরণ করা। ইদ্দতের জন্য শর্ত হল : বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়া।

ইদ্দতের রুকুন হল : ঐ সমস্ত হুরমত যা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় প্রমাণিত হয়।

ইদ্দতের হুকুম হল : বিবাহ জায়েয না হওয়া। মহিলাদের শ্রেণীভেদে ইদ্দত চার প্রকার (১) তিন ঋতু দ্বারা

ঋতুস্রাব হলে (২) তিন মাস দ্বারা ঋতুস্রাব না হলে। (৩) গর্ভবতী স্ত্রী লোকের ইদ্দত সন্তান প্রসব করা দ্বারা (৪) চার মাস দশদিন দ্বারা স্বামীর মৃত্যু হলে।

قوله : عِدَّةُ الْحُرَّةِ الخ : স্ত্রী যদি তালাকে বায়েন বা রেজঈ প্রাপ্ত হয়ে বা অন্য কোন কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক বন্ধন বিচ্ছেদ ঘটে আর স্ত্রীও এমন যার ঋতুস্রাব হয় এবং সে স্বাধীন। তাহলে তার ইদ্দত আমাদের হানাফীদের মতে পূর্ণ তিন হায়েজ অতিক্রান্ত করা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে উক্ত মহিলা তিন তুহুর অতিক্রান্ত করবে।

উভয় মাযহাবের দলীল হচ্ছে কুরআনের আয়াত وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন 'কুরু' পর্যন্ত নিজেকে আটকিয়ে রাখবে। উক্ত আয়াতের কুরু শব্দের অর্থ নিয়ে মতানৈক্য। অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতে قروء শব্দের অর্থ হায়েজ, আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে قروء শব্দের অর্থ তহুর। তাই ইদ্দত তিন তুহুর অতিক্রান্ত করার মাধ্যমে পালন করতে হবে। আর আমাদের মাযহাব অনুযায়ী قروء শব্দের অর্থ হায়েয হতে হবে। কেননা, পবিত্রতা কোরআনের উক্ত আয়াতটি খাস। অর্থাৎ, ثلثة শব্দটি খাস যার অর্থ 'তিন'। অর্থাৎ, ثلثة قروء এর অর্থ হবে ثلثة حيض 'তিন হায়েজ' আর যদি قروء এর অর্থ তুহুর নেয়া হয় তাহলে خاص তথা তিনের উপর আমল করা যাবে না। কেননা, ইহা অসম্ভব যে, طهر আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই তালাক দেয়া যাবে। অতএব যে طهر এর মধ্যে তালাক হবে তা অবশ্যই আংশিক হবে। সুতরাং যদি তালাক প্রদানকৃত طهر ছাড়া পৃথক তিন طهر ধরে নেওয়া হয় তবে ইদ্দত তিন طهر হতে বেশি হবে না। বস্তুতঃ কুরআনের خاص শব্দের ওপর আমল অকাট্যভাবে ওয়াজিব। অতএব, বাধ্যতামূলকভাবে قروء অর্থ حيض গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় দলীল : ইদ্দত পালন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় মুক্ত করা আর তা হায়েয দ্বারাই অর্জিত হবে। তুহুর দ্বারা নয়।

তৃতীয় দলীল : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ 'দাসীর তালাক দু'টি এবং তার ইদ্দত দুই হায়েজ। উক্ত হাদীসে হায়েজের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা রয়েছে। তাই উক্ত হাদীসকে ইদ্দত সংক্রান্ত আয়াতের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ গ্রহণ করা যাবে। সুতরাং আলোচিত নারী তিন হায়েজ দ্বারা তার ইদ্দত পূর্ণ করবে।

قوله : وَ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ الخ : তালাকের কারণে বা অন্য কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর হায়েজ আসে না তার স্বল্প বয়সের কারণে বা অতিবৃদ্ধ হওয়ার দরুন কিংবা মহিলা বয়সে প্রাপ্তা কিন্তু এখনো তার হায়েজ আসে না এমন মহিলা যদি স্বাধীন হয় তবে তার ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস গণনা করা। যা মূলত তিন হায়েজের স্থলাভিষিক্ত। দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَللّٰئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ وَ اللّٰئِى لَمْ يَحِضْنَ 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ যদি তাদের বিষয়ে সন্দিহান হও তাহলে তাদের ইদ্দত হল তিন মাস আর যারা এখনো রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও (তিন মাস)।

قوله : وَ لِلْمَوْتِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرٌ الخ : যদি কোন স্ত্রী লোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করে আর সে স্বাধীনা হয় তবে তার ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশদিন। দলীল হল, আল্লাহর বাণী—

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে সেই স্ত্রীরা চার মাস দশদিন নিজেদেরকে আটকিয়ে রাখবে।'

পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন যে, স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীর ইদ্দত হবে দুটি (১) عِدَّةٌ طَوِيْلَةٌ দীর্ঘ ইদ্দত। তা

হল এক বৎসর। এর উপর আমল করা হচ্ছে আজিমত। (২) عِدَّةٌ قَصِيرَةٌ সংক্ষিপ্ত ইদ্দত। আর তা হল চার মাস দশদিন। এর উপর আমল করা হচ্ছে রুখসত। তাদের দলীল হচ্ছে : পবিত্র কুরআনের আয়াত :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ -

তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায়, তারা যেন স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে এক বৎসরের ভরণ-পোষণের অসিয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বাহির হয়ে যায় তবে বিধি মতো নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করবে তাদের ইদ্দত হচ্ছে এক বৎসর, তবে যদি চার মাস দশদিনের পর তারা বের হয়ে যায় তথা ইদ্দত শেষ করে দেয় তবে তাও তাদের জন্য বৈধ। এর জবাবে বলা যায় যে, তা ইসলামের প্রাথমিক কালের সাথে নির্ধারিত এবং পরবর্তী يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا দ্বারা তা রহিত হয়ে যায় এবং তাদের ইদ্দত চার মাস দশদিন নির্ধারিত হয়ে যায়।

قوله : وَ لِلْأَمَةِ قُرْأَنِ الخ : তালাক প্রাপ্তা বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন সংঘটিত হওয়া স্ত্রীলোক যদি বাদী হয় এবং তার ঋতুস্রাব হয় তবে তার ইদ্দত হচ্ছে এক মাস ও অর্ধমাস। আর যদি বাদীর স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে তার ইদ্দত হচ্ছে দুই মাস পাঁচ দিন।

এ সবের ক্ষেত্রে দলীল হল : আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ— فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 'তাদের উপর (দাসীর উপর) স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তির বিধান। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দাসীদের উপর শাস্তি ও নিয়ামত অর্ধেক করেছেন।

সুতরাং দাসীর ক্ষেত্রে তা পূর্ণ ধরা হবে। এ হিসাবে দাসীর ইদ্দত হায়েজ দ্বারা পালন করলে দুই হায়েজ হবে। আর তিন মাসের ক্ষেত্রে এক মাস ও অর্ধমাস এবং চার মাস দশ দিনের ক্ষেত্রে দুই মাস পাঁচ দিন নির্ধারিত হবে। আর হায়েজ ও দুই তালাককে অর্ধেকের স্তরে রাখা হবে। আর তাই দাসীর ক্ষেত্রে পূর্ণ হিসাবে গণ্য হবে। এদিকেই হযরত উমর (রাযি.) ইঙ্গিত করে বলেন : لو استطعت لجعلتها حيضة و نصفا 'আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি দাসীর ইদ্দত এক হায়েজ ও অর্ধ হায়েজ নির্ধারণ করে দিতাম।' কিন্তু তা সম্ভব নয়, তাই পূর্ণ হায়েজ ধরা হবে।

قوله : وَ الْحَامِلُ وَضْعُهُ الخ : উল্লিখিত সর্ব সূরতে স্বাধীন বা দাসী স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তবে তাদের ইদ্দত হবে গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। দলীল হল আল্লাহ তাআলার বাণী : وَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আর যারা গর্ভবতী তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ হলো গর্ভ প্রসব করা।

উক্ত আয়াতে গর্ভবতী তালাক প্রাপ্তা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্বামী মৃত্যুবরণের সূরতে স্ত্রী স্বাধীনা বা দাসী সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) (স্বামীর মৃত্যু জনিত করণে ইদ্দত পালনের ব্যাপারে) বলেন, গর্ভবতী নারীর ইদ্দত চার মাস দশদিন রহিত হয়ে তার ইদ্দত সাব্যস্ত হয়েছে প্রসবকাল দ্বারা। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রাযি.) বলেন, মৃত স্বামীকে খাটে রাখা অবস্থায় যদি স্ত্রীর প্রসব হয় তাহলেও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং উক্ত নারীর জন্য অন্যত্র বিবাহ করা বৈধ হবে। সুতরাং এ দলিলসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, গর্ভবতী নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা।

قوله : وَ زَوْجَةُ الْفَارِّ الخ : স্বামী মৃত্যু শয্যায় অসুস্থ অবস্থায় যদি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন বা তিন তালাক প্রদান করে আর স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে তরফাইনদের মতে উক্ত মহিলা

ابعد الاجلين তথা দুই ইদ্দতের দীর্ঘতম মেয়াদ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ, তালাকের কারণে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। আর স্বামীর মৃত্যুর কারণে তার ইদ্দত হবে চার মাস দশ দিন। সুতরাং যদি চার মাস দশদিন চলে যায়, কিন্তু তিন হায়েজ শেষ হয় না, তবে সে তিন হায়েজ পূর্ণ করবে। আর যদি তিন হায়েজ পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু চার মাস দশ দিন শেষ হয় না তবে সে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতে উক্ত নারীর ইদ্দত হবে তিন হায়েজ। তিনি বলেন, ইদ্দত পালন করতে হয় বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থা দ্বারা। সুতরাং চার মাস দশদিন দ্বারা ইদ্দত তখন পালন করতে হয় যখন স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন করতে হয়। সুতরাং আলোচ্য অবস্থায় যেহেতু স্ত্রী স্বামীর তালাকে বায়েনে বা তিন তালাকে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাই তালাকে বায়েন বা তিন তালাকে যা আবশ্যক করে তথা তিন হায়েজ তা দ্বারাই ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই উক্ত তালাক প্রাপ্তা নারী হায়েজের মাধ্যমেই ইদ্দত পালন করবে।

তরফাইন (রহ.) এর দলীল : যেহেতু মহিলা মিরাস লাভের ক্ষেত্রে বিবাহ বিদ্যমান হিসেবে ধরে নেয়া হয়। তাই সতর্কতা বশত ইদ্দতের ক্ষেত্রেও বিবাহ বিদ্যমান হিসাবে ধরে নেয়া হবে। সুতরাং এ মহিলার ক্ষেত্রে ইদ্দতের উভয় পদ্ধতি কার্যকর হবে। তালাকের কারণে তিন হায়েজ আর স্বামীর মৃত্যুর কারণে চার মাস দশদিন তাই উক্ত মহিলা উভয়টি পালন করবে। যা উভয়টির দীর্ঘতম মেয়াদ দ্বারা ইদ্দত পালন করলে অর্জিত হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতের জবাব হল : যদি বিবাহ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায় তবে তা সে মিরাস থেকেও বঞ্চিত থাকা প্রয়োজন ছিল অথচ তিনি এক্ষেত্রে বলেন যে, উক্ত মহিলা মিরাস প্রাপ্ত হবে। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, যেহেতু সে বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে গণ্য করে মিরাস প্রাপ্ত হবে তাই ইদ্দতের ক্ষেত্রেও বিবাহ বিদ্যমান রয়েছে গণ্য করতে হবে।

আর যদি স্বামী তাকে তালাকে রেজঈ প্রদান করে অতঃপর স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রী চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে।

قوله : وَ مَنْ عُتِقَتْ الخ : বিবাহিত দাসীকে যদি তার স্বামী তালাকে রেজঈ প্রদান করে আর সে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় থাকে এমতাবস্থায় দাসীর মনিব তাকে স্বাধীন করে দিল তাহলে উক্ত স্ত্রী তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলাদের ইদ্দতের ন্যায় তথা তিন হায়েজ পালন করতে হবে।

তদ্রূপ দাসী যদি হায়েজ গ্রস্থা না হয় তাহলেও স্বাধীন মহিলার ন্যায় তিন মাস পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা, তালাকে রেজঈ এর সূরতে স্বাধীন করা আর সম্পূর্ণ বিবাহিত অবস্থায় স্বাধীন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তাই তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলার ন্যায় পালন হবে। তবে হা যদি বিবাহিত স্ত্রীকে বায়েন তালাক বা তিন তালাক কিংবা স্বামী মৃত্যুবরণ পরবর্তী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মনিব দাসীকে স্বাধীন করে দেয় তবে সে দাসীর ইদ্দত পালন করবে। কেননা, এসব সূরতে বিবাহের আকদ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়।

وَمَنْ عَادَ دَمُهَا بَعْدَ الْأَشْهُرِ الْحِيضُ وَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْحِيضُ لِلْمَوْتِ وَغَيْرِهِ وَزَوْجَةِ الصَّغِيرِ الْحَامِلِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَضْعُهُ وَالْحَامِلِ بَعْدَهُ الشُّهُورُ وَالنَّسَبُ مُنْتَفٍ فِيهِمَا ولم تَعْتَدَّ بِحَيْضٍ طُلِّقَتْ فيه وَتَجِبُ عِدَّةٌ أُخْرَى بِوَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَتَدَاخَلَتَا وَالْمَرْئِيُّ مِنْهُمَا وَتَتِمُّ الثَّانِيَةُ إِنْ تَمَّتِ الْأُولَى وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وفي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ أو الْعَزْمِ على تَرْكِ وَطْئِهَا وَلَوْ قالت مَضَتْ عِدَّتِي وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ لها مع الْحَلْفِ وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ وَطَلَّقَهَا قبل الْوَطْءِ وَجَبَ مَهْرٌ تَامٌّ وَعِدَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ وَلَوْ طَلَّقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لم تَعْتَدَّ

অনুবাদ : আর যার মাসের পর (তথা মাস দ্বারা ইদ্দত পালনের পর ঋতুস্রাব ফিরে আসে তাহলে (তা বাতিল হয়ে তার) ইদ্দত হবে ঋতুস্রাবসমূহ। নিকাহ ফাসেদ দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রী, সন্দেহ মূলক সঙ্গম পিড়িতা এবং উম্মে ওয়ালাদের জন্য স্বামী মৃত্যু বা অন্য কারণে (তথা আজাদ করে দিলে) উভয় ক্ষেত্রে (তাদের ইদ্দত হচ্ছে) তিন হায়েজ। অপ্রাপ্তা বয়স্ক স্বামীর মৃত্যুর সময় (স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত হল গর্ভ প্রসব করা। আর মৃত্যুর পর গর্ভবতীর ইদ্দত হচ্ছে মাসসমূহ দ্বারা। উভয় সূরতে বংশ সাব্যস্ত হবে না।

স্ত্রী যে হায়েজে তালাক প্রাপ্তা হয়েছে তা (ইদ্দতে) গণনা করা হবে না। ইদ্দত পালনকারিণীকে সন্দেহমূলক সহবাস দ্বারা আরেকটি ইদ্দত ওয়াজিব হবে এবং দু'টি ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। আর যা দেখা যাবে (পরবর্তীতে যে ঋতুস্রাব দেখা যাবে।) তা উভয় ইদ্দত থেকে গণ্য হবে। যখন প্রথম ইদ্দত শেষ হবে তখন দ্বিতীয় ইদ্দত শেষ করতে হবে। ইদ্দতের সূচনা হবে তালাকের পর থেকে বা স্বামী মৃত্যুর পর থেকে। আর নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে উভয়ের বিচ্ছেদের পর থেকে বা (সহবাসকারীর) সহবাসের ইচ্ছা ত্যাগের ঘোষণার পর থেকে।

ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীলোক যদি বলে আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর স্বামী তা প্রত্যাখান করে তাহলে কসমসহ স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্বামী তার ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীকে বিবাহ করে অতঃপর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তবে পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি জিম্মি তার জিম্মিয়া স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার কোন ইদ্দত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَنْ عَادَ دَمُهَا الخ : তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক হায়েজ হতে নৈরাশ অবস্থায় মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করা শুরু করল এমতাবস্থায় যদি তার হায়েজ শুরু হয়ে যায় তা হলে সে পুণরায় হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করা শুরু করবে। তবে এক্ষেত্রে তার পূর্বেকার হায়েজের অনুরূপ হায়েজ হলে সে হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। কিন্তু যদি তার হায়েজ পূর্বেকার ন্যায় না হয় তাহলে তার মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করা বহাল থাকবে। কেননা, পূর্বের অভ্যাসের ন্যায় পূণরায় ঋতুস্রাব দেখা দিলে ঋতু থেকে নৈরাশ্যকে বাতিল করে দেয়। এক্ষেত্রে মাস তার স্থলবর্তী

হতে পারে না। তা এজন্য যে মৃত্যু পর্যন্ত নৈরাশ্যতা যদি ধারাবাহিক না হয় তবে ঋতু নৈরাশ্যতা সুনিশ্চিত হয় না। অথচ মাস হচ্ছে ঋতুর স্থলবর্তীতা আর স্থলবর্তীতা তখনই কার্যকর হয় যখন নিশ্চিত জ্ঞান হয় যে মূল পাওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ শায়েখেফানী বা অতী বৃদ্ধের জন্য রোজার ফিদয়া প্রদানের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু যদি সে পরবর্তীতে রোজা রাখতে সক্ষম হয়ে যায় তবে ফিদয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে।

আর যদি কোন মহিলা হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করা শুরু করে অতঃপর এক বা দু হায়েজ অতিক্রম করার পর ঋতু নৈরাশ হয়ে পড়ে তবে সে হায়েজের স্থলাভিষিক্ত তথা মাস দ্বারা নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা, আসল ও খলিফাকে একত্ব করা জায়েয নয়। অর্থাৎ, দুই হায়েজ আর এক মাস বা এক হায়েজ আর দু মাস। এজন্য স্ত্রী হয়তো হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ করবে কিংবা মাস দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ করবে। কিন্তু উভয়টিকে একত্র করা যাবে না।

قوله : وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا الخ : যদি কোন মহিলার সাথে নিকাহে ফাসিদ হয়। যেমন সাক্ষি বিহীন, বা মাহরামাত এর মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয়। অতঃপর সহবাস পাওয়া যায়। কিংবা সন্দেহমূলকভাবে সহবাস পাওয়া যায়। তাহলে সঙ্গমকারীর উপর মহর ওয়াজিব হবে এবং মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। সঙ্গমকারীর মৃত্যু বা বিচ্ছেদ উভয় ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য। মহিলা যদি স্বাধীন হয় তবে সে তিন হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে আর যদি দাসী হয় তবে দুই হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। আর যদি মহিলা হায়েজ থেকে নৈরাশ হয় তাহলে স্বাধীনার ক্ষেত্রে তিন মাস আর দাসীর ক্ষেত্রে দেড় মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। উভয় ক্ষেত্রে (বিচ্ছেদ বা সঙ্গমকারীর মৃত্যুতে) হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করার বিধান হওয়ার কারণ এসব সূরতে শুধু গর্ভ মুক্তির বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়া উদ্দেশ্য। নিকাহের অন্যান্য হুকুম আদায় করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, উভয় সূরতে বিবাহের কোন হক সংশ্লিষ্ট নয়।

قوله : وَ أُمُّ الْوَلَدِ الخ : যদি উম্মে ওয়ালাদের মনিব মৃত্যুবরণ করে বা তাকে আজাদ করে দেয় তবে উক্ত উম্মে ওয়ালাদ ইদ্দত পালন করবে। আমাদের মতে উক্ত মহিলা তিন হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। আর ইমাম শাফেয়ী, মালিক, মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে উক্ত মহিলা এক হায়েজ দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। তাদের দলিল হচ্ছে তার ইদ্দত পালন করাটা استبراء এর সদৃশ। আর استبراء এর জন্য এক হায়েজ যথেষ্ট। তাই এখানেও এক হায়েজ পালন করা যথেষ্ট হবে।

আমাদের দলিল হচ্ছে : মনিবের শয্যাবাস বিলুপ্ত হওয়ার কারণে যেহেতু তার ইদ্দত সাব্যস্ত হয়েছে তাই তা বিবাহের ইদ্দতের সদৃশ্য হলো। তাই বিবাহের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তিন হায়েজ ওয়াজিব হবে। তাছাড়া হযরত উমর (রাযি.) বলেন, عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلْثُ حِيَضٍ উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দত হলো তিন হায়েজ। আর যদি হায়েজ না হয় তাহলে তার ইদ্দত তিন মাস। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

قوله : وَ زَوْجَةُ الصَّغِيرِ الخ : অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে তার স্ত্রী গর্ভবতী তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে উক্ত স্ত্রীর ইদ্দত হচ্ছে গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে উক্ত গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন। তাদের দলিল হচ্ছে : যেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর সাথে গর্ভের বংশ সাবিত হয় না, বিধায় ধরে নিতে হবে তা তার মৃত্যুর পর সঞ্চারিত। তাই যেভাবে একজন স্ত্রী মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করা শুরু করে অতঃপর গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলেও তার ইদ্দত মাস দ্বারা পালন করতে হয়। তদ্রূপ এখানেও উক্ত স্ত্রী মাস দ্বারা তথা ইদ্দতে ওফাতই পালন করবে।

আমাদের দলিল : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 'গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত হচ্ছে গর্ভ প্রসব করা পর্যন্ত।' উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই সকল প্রকার

গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রদান করেছেন। অর্থাৎ, তাদের ইদ্দত গর্ভ প্রসব করা। এ গর্ভবতী মহিলা তালাকের কারণে বা স্বামী মৃত্যুর কারণে হোক কিংবা গর্ভ স্বামীর ঔরষজাত হোক বা না হোক সকলের ক্ষেত্রে ইদ্দত সমান এবং কোন এক প্রকারকে নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং আয়াতে এ বিষয়টি عام তথা ব্যাপক হয়েছে। তাই আলোচ্য বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও গর্ভের বংশ অপ্রাপ্তের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে গর্ভ প্রসবকালকে ইদ্দতে ওফাত নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত মেয়াদ দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক। আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহের হক আদায় করা। গর্ভ মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা নয়। আর তা এভাবে যে ঋতুমতি নারীর ক্ষেত্রে ও ইদ্দতে ওফাত মাস দ্বারা তথা চার মাস দশদিন ধার্য করা হয়েছে। তাই প্রতিয়মান হল যে, ইদ্দতে ওফাত দ্বারা বিবাহের হক আদায় করা উদ্দেশ্য। আর বিবাহের হক আদায়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী সমান। তাই উক্ত স্ত্রী গর্ভ প্রসব করা দ্বারা তার ইদ্দত পালন করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও সমমনাদের দলিলের জবাব : হানাফী উলামাগণ বলেন- القائم عند الموت।কে الحادث عند الموت। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কেননা, উভয় সূরত এক নয়, বরং পার্থক্য বিদ্যমান। আর তা হল স্বামী মৃত্যুর সময় গর্ভ না থাকার দরুন তার ইদ্দত মাস দ্বারা পালন করা ধার্য হয়ে গেছে, যাতে বিবাহের হক আদায় হয়ে যায়। এখন যদি পরবর্তীতে তার গর্ভ প্রকাশ পায় তাহলে তার ইদ্দত পালন পরিবর্তন হবে না। আর উক্ত মাসআলায় তার প্রথম থেকেই ইদ্দত নির্ধারণ করা হয়েছে গর্ভপাত পর্যন্ত দ্বারা। কেননা, উক্ত নারী গর্ভবতী আর গর্ভবতী নারীর ইদ্দত গর্ভ প্রসব দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই উভয় সূরত ভিন্ন প্রকাশ হলো। তবে হা গর্ভের বংশ উক্ত নাবালকের দিকে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা, তার বীর্য না থাকার কারণে তার থেকে গর্ভ ধারণের কল্পনা করা যায় না।

قوله : لَمْ تَعْتَدَّ بِحَيْضٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক প্রদান করে তাহলে তালাক প্রদানকারী গুনাহগার হবে। আর স্ত্রী তার ইদ্দত পালনে উক্ত হায়েজকে গণনা করতে পারবে না। কেননা, ইদ্দত হচ্ছে মোট তিন হায়েজ হওয়া অথচ এখানে তিন থেকে কমে যায়। পূর্ণ তিন হায়েজ হওয়ার পিছনে দলিল হচ্ছে কুরআনের আয়াত : يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকহের কিতাবে দ্রষ্টব্য।

قوله : وَ تَجِبُ عِدَّةٌ اُخْرٰى الخ : যদি কোন স্ত্রী লোকের উপর দু'টি ইদ্দত আবশ্যক হয়। তাহলে একটি অপরটির ভেতর প্রবিষ্ট হবে কি না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। প্রথম সূরত : যদি একই পুরুষের কারণে দু'টি ইদ্দত আবশ্যক হয় যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের বায়েন দিল। অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত রত এমতাবস্থায় স্বামী তাকে হালাল মনে করে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হল। কিংবা তালাকে বায়েনের পর আবার বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হল তাহলে এসব সূরতে সকলের ঐক্যমতে দুই ইদ্দত পরস্পর প্রবিষ্ট হবে।

আর যদি দু পুরুষ থেকে দুটি ইদ্দত ওয়াজিব হয় এবং ইদ্দত পালনের পদ্ধতিও এক হয়, যেমন তালাক প্রাপ্তা ইদ্দত পালন রত এমতাবস্থায় অন্যজন তাকে বিবাহ করল এবং সে সঙ্গম পীড়িতা হল। অতঃপর দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হল। এ সূরতে আমাদের মতে উভয় ইদ্দত পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে এবং পরবর্তীতে যা সে দেখবে অর্থাৎ ঋতুস্রাব উভয় ইদ্দত থেকে গণ্য করা হবে। এতে প্রথম ইদ্দত শেষ হলে পর দ্বিতীয় ইদ্দত শেষ করা তার জন্য কর্তব্য। যেমন কোন স্ত্রী লোককে তার স্বামী তালাক দেয়ার পর এক হায়েজ অতিবাহিত করেছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী থেকে যে সঙ্গম পীড়িতা হল সুতরাং সে আরো তিন হায়েজ পালন করবে এবং তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় হায়েজ প্রথম ও দ্বিতীয় ইদ্দত থেকে গণ্য হবে।

আর চতুর্থ হায়েজ শুধু মাত্র দ্বিতীয় ইদ্দত থেকে গণ্য করা হবে। অনুরূপ যদি প্রথম স্বামীর তালাকের পর কোন হায়েজ পালনের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক সে সঙ্গম পীড়িতা হয়ে যায় তাহলে তিন হায়েজই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ, দু ইদ্দত এর জন্য মোট ছয় হায়েজ তা তিন হায়েজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে দু'টি ইদ্দত পালন করতে হবে। এক ইদ্দত অপরটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আদায় হবে না। বরং পূর্ণ দু ইদ্দত পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ইদ্দত পালন হচ্ছে ইবাদাত সুতরাং দু ইবাদাত যেভাবে একত্রে আদায় করা যায় না। তদ্রূপ দুই ইদ্দত একত্রে প্রবিষ্ট হবে না। যেমন একই দিনে দুই রোজা পালন করা যায় না। তদ্রূপ একই ইদ্দত দু ইদ্দতের স্থলাভিষিক্ত হবে না।

আমাদের দলিল : ইদ্দতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে গর্ভাশয়টি মুক্ত থাকার পরিচয় লাভ করা। আর এ উদ্দেশ্য একটি ইদ্দত দ্বারাই অর্জিত হয়। তাই উদ্দেশ্যগতভাবে একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলিলের জবাব : ইবাদাতের বিষয়টি হচ্ছে আনুষাঙ্গিক তা মৌলিক নয়। তাই তো অনেক সময় মহিলার অবগতি ভিন্ন মহিলার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। অথচ ইবাদাত নিয়ত ও অবগতি ছাড়া আদায় হতে পারে না। তা ছাড়া ইদ্দত রত অবস্থায় যদি অন্য কোন স্বামীর কাছে বিবাহ বসে তবুও সকলের মতে ইদ্দত বাতিল হবে না। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, এখানে ইবাদাতের বিষয় মূল নয়। আর যদি দু পুরুষ থেকে দুটি ইদ্দত আবশ্যক হয়। আর ইদ্দত দুটি পালনের পদ্ধতি ভিন্নতর হয়। যেমন বৈধব্যের ইদ্দত পালনরত অবস্থা সে অন্য যে কোন পুরুষ কর্তৃক وطی شبه তথা সন্দেহমূলক সঙ্গম পীড়িতা হয় তাহলে যথারীতি মাস ভিত্তিক ইদ্দত পালন করবে এবং এ চার মাস দশ দিনের মাঝে যে হায়েজের রক্ত দেখবে তা দ্বিতীয় ইদ্দত থেকে গণ্য হবে। যাতে যথাসাধ্য পারস্পরিক প্রবিষ্টতা সাব্যস্ত হয়।

قوله : وَ مُبْتَدأُ الْعِدَّةِ الخ : ইদ্দতের সূচনা : স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর থেকেই ইদ্দত শুরু হয়ে যাবে। তদ্রূপ স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তার ইদ্দত শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ইদ্দত শুরু হওয়ার কারণ স্বামীর তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু। এক্ষেত্রে স্ত্রীর অবগতির কোন প্রয়োজন নেই। কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর চারমাস দশদিন অতিবাহিত হয় অথচ স্ত্রী সে সম্পর্কে অবগত না থাকে তবুও তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। অবগতির পর পুনরায় ইদ্দত আদায় করা প্রয়োজন নেই। কেননা, তালাক বা মৃত্যুর কারণেই ইদ্দত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে ইদ্দতের আরম্ভ বিবেচ্য হবে।

قوله : وَ فِيْ نِكَاحِ الْفَاسِدِ الخ : নিকাহে ফাসিদের ক্ষেত্রে ইদ্দতের সূচনা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে যখন কাজী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন। তখন থেকে বা সহবাসকারী সহবাস পরিত্যাগের ইচ্ছা ঘোষণা করে তখন থেকে তার ইদ্দত শুরু হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, শেষবার যখন সহবাস করেছে তখন থেকে ইদ্দত শুরু হয়েছে। তিনি দলিল দেন, যেহেতু সহবাস ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার কারণ তাই শেষ সহবাস থেকেই ইদ্দত ওয়াজিব হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, এ মহিলার সাথে সহবাস না হলে ইদ্দত ওয়াজিব হতো না।

আমাদের দলিল : আকদে ফাসিদের মাঝে যতোসব সহবাস হয়েছে সবগুলোকে এক সহবাসের পর্যায়ে গণ্য করা হবে। এজন্য তো সব সহবাসের জন্য এক মহর ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং সর্বশেষ সহবাস যার উপর ভিত্তি করে ইদ্দতের অস্তিত্ব লাভ হয় সেটা কাজীর বিচ্ছেদের পর থেকে বা সহবাসকারীর সহবাস ত্যাগের ইচ্ছা ঘোষণা করার পর থেকে ইদ্দত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কাজীর বিচ্ছেদ বা সহবাসকারীর সহবাস ত্যাগের ঘোষণার পূর্বে প্রতিটি সহবাসের পর আবার সহবাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া প্রকৃত সহবাসের বিষয়টি গোপনীয়। যার কারণ স্পষ্ট। আর প্রত্যেক গোপনীয় বিষয় যার কারণ স্পষ্ট তাকে প্রকৃত বিষয়ের স্থলবর্তী করা হয়। তাই এখানে সহবাসের সক্ষমতাকে প্রকৃত সহবাসের স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং সহবাসে সক্ষম হওয়া

পর্যন্ত শেষ সহবাস প্রমাণিত হবে না। এজন্য আমরা কাজির বিচ্ছেদের পর বা সহবাসকারীর সহবাস ত্যাগের ঘোষণার পর থেকে ইদ্দতের শুরু নির্ধারণ করেছি।

قوله : وَاِنْ قَالَتْ مَضَتْ عِدَّتِىْ الخ : ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীলোক সে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার দাবী করল আর স্বামী তা প্রত্যাখ্যান করল। তাহলে মহিলার কথা শপথসহ গ্রহণ করা হবে। কেননা, ইদ্দতের সংবাদের ক্ষেত্রে মহিলা হচ্ছে আমানতদারের ন্যায়। তাই যেভাবে আমানতদারের কথা শপথসহ গ্রহণ করা হয় তদ্রূপ এখানেও মহিলার কথা গ্রহণ করা হবে।

قوله : وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় উক্ত তালাক প্রদানকারী স্বামী পুনরায় বিবাহ করল। কিন্তু সহবাস বা নির্জন বাসের পূর্বে তাকে আবার তালাক প্রদান করল। তাহলে স্বামীর উপর পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। এবং স্ত্রীর উপর নতুন করে পূর্ণ ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। ইহা ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতামত পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, স্বামীর উপর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। এবং স্ত্রীর উপর প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা ওয়াজিব। তিনি দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু স্বামী দ্বিতীয় বিবাহের পর সহবাসের বা নির্জনবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করল তাই পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে না। বরং এ সুরতে অর্ধেক মহর ওয়াজিব হয় এবং ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। তবে প্রথম ইদ্দত পূর্ণ করা আবশ্যক এজন্য যে, তার উপর প্রথম তালাকের কারণে তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু বিবাহের কারণে তা প্রকাশ পায়নি। অতঃপর যখন সহবাস ছাড়াই তাকে পুণরায় তালাক দিয়ে দিল তাই দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে গেল এজন্য প্রথম তালাকের বিধান প্রকাশ পাবে এবং মহিলার উপর তা পালন করা আবশ্যক হবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় স্বামীর উপর অর্ধেক মহর ওয়াজিব হবে। আর মহিলার উপর প্রথম তালাকের বিধান ও দ্বিতীয় তালাকের বিধান তথা কোন ইদ্দত ওয়াজিব হবে না।

তিনি দলিল দেন : দ্বিতীয় বিবাহের কারণে প্রথম ইদ্দত রহিত হয়ে গেল। এজন্য তা আর পুণরায় ফিরে আসবে না। কেননা, কায়দা হল : اَلسَّاقِطُ لَايَعُوْدُ 'রহিত বস্তু ফিরে আসে না'। আর দ্বিতীয় ইদ্দত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হচ্ছে, দ্বিতীয় বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছে। আর সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করলে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না।

শায়খাইন (রহ.) এর দলিল : প্রথম বিবাহের কারণে প্রকৃতই সে স্বামীর অধিকার রয়েছে। কেননা, প্রথম সহবাসের চিহ্ন বাকী রয়েছে আর তা হল ইদ্দত। আর স্বামী পুণরায় তাকে বিবাহ করা তা তো আপন অধিকারে থাকা অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং প্রথম সহবাস দ্বারা অর্জিত অধিকার দ্বিতীয় বিবাহ দ্বারা প্রাপ্য অধিকারের স্থলবর্তী হবে। যেমন জবর দখলকারী দখলকৃত দ্রব্যটি খরিদ করল। এখন শুধু বিক্রয় চুক্তি হওয়া দ্বারাই বিক্রিত বস্তুর দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ থেকেই পরিস্কার হয়ে গেল যে, দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রদত্ত তালাকটি সহবাস পরবর্তী তালাকরূপেই সাব্যস্ত।

قوله : وَلَوْ طَلَّقَ ذِمِّىٌّ ذِمِّيَّةً الخ : জিম্মি পুরুষ যদি তার জিম্মিয়াহ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উক্ত সুরতে মহিলার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। তাই মহিলা যদি অন্যত্র বিবাহ বসে তবে তার বিবাহ সহীহ। তবে হা যদি গর্ভবতী হয় তাহলে বিবাহ জায়েয হবে না। হাঁ, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত তখন কার্যকর যখন জিম্মিয়াহ মনে করে তার উপর ইদ্দত পালন আবশ্যক নয়। কেননা, কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন : لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ 'অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। যদি তোমরা তাদের মহর প্রদান কর।' উক্ত আয়াতে মুহাজেরা মহিলাকে বিবাহ করার নিঃশর্ত বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এখন যদি

ইদ্দত পালনের শর্তারোপ করা হয় তবে তা আয়াতের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন হবে। যা বৈধ নয়। তা ছাড়া যৌক্তিক দলিল হল, যে জায়গাতে ইদ্দতের বিষয় সাব্যস্ত হয় সেখানে মানুষের হক রক্ষায় বিষয়টি জড়িত হয়ে থাকে। এজন্যই স্বামীর পানী তথা বীর্য রক্ষা করার জন্য মহিলার উপর ইদ্দত আবশ্যক করা হয়েছে। তাই তো সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়াতে ইদ্দত ওয়াজিব হয় না। আলোচ্য মাসআলায় স্বামী যেহেতু কাফের তাই সে জড়বস্তুর সমতুল্য, তার মর্যাদা না থাকার কারণে তার বীর্যের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হবে না। তাই তার স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয় তবে প্রসব পর্যন্ত তাকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কেননা, তার গর্ভের সন্তানের বংশ সাব্যস্ত রয়েছে। তাই অন্যত্র বিবাহ করার মধ্যে দু শয্যা (ফরাশ) একত্র করা লাযেম হয়। আর তা বৈধ নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে দ্বিতীয় এক মত বর্ণিত আছে যে, উক্ত গর্ভবতী নারীকে বিবাহ করা জায়েয তবে তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দ্বিতীয় মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই গর্ভ ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কেননা, ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভ তার তো বংশ সাব্যস্ত নয়। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বংশ সাব্যস্ত। তাই উভয় সুরতকে একত্র করা যাবে না। والله اعلم -

---

فصل : تُحِدُّ مُعْتَدَّةُ الْبَتِّ وَالْمَوْتِ بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ إِلَّا بِعُذْرٍ وَالْحِنَّاءِ وَلُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ إِنْ كانت مُسْلِمَةً بَالِغَةً لَا مُعْتَدَّةُ الْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا تُخْطَبُ مُعْتَدَّةٌ وَصَحَّ التَّعْرِيضُ وَلَا تَخْرُجُ مُعْتَدَّةُ الطَّلَاقِ وَمُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَخْرُجُ يَوْمًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ وَتَعْتَدَّانِ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فيه إِلَّا أَنْ تُخْرَجَ أو يَنْهَدِمَ بَانَتْ أو مَاتَ عنها في سَفَرٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا أَقَلُّ من ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ رَجَعَتْ إِلَيْهِ وَلَو ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ رَجَعَتْ أو مَضَتْ مَعَهَا وَلِيٌّ أو لَا وَلَوْ كانت فِي مِصْرٍ تَعْتَدُّ ثَمَّهْ فَتَخْرُجُ بِمَحْرَمٍ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : তালাকে বায়েন বা স্বামী মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারিণী যদি প্রাপ্ত বয়স্কা মাসুলিমা হয় তাহলে সাজসজ্জা গ্রহণ, খোশবু ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার, সুগন্ধি তৈল ব্যবহার, তবে ওজরের কারণে হলে ভিন্ন কথা মেহেদী ব্যবহার, কুসুম বা জাফরান রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থেকে শোক পালন করবে। স্বাধীনা হওয়া বা নিকাহে ফসিদের কারণে ইদ্দত পালনকারিণীর শোক প্রকাশ নেই। ইদ্দত পালনকারিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া যাবে না। পরোক্ষ প্রস্তাব বিশুদ্ধ। তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী তার ঘর থেকে বের হবে না। আর স্বামী মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারিণী দিনে এবং রাত্রের কিছু অংশে বের হতে পারবে। আর তারা দু'জন (তথা তালাক প্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী ও বিধবা ইদ্দত পালনকারিণী) যে ঘরে ইদ্দত ওয়াজিব হয়েছে। (অর্থাৎ স্বামী মৃত্যুর সময় কিংবা বিচ্ছেদের সময় যে ঘরে সে বসবাস করত) সে ঘরের মধ্যে ইদ্দত পালন করবে। তবে যদি বের করা হয় অথবা (সে ঘর) ধ্বংস হয়ে যায়। (তাহলে সে ঘর পরিত্যাগ করা জায়েজ) স্ত্রী সফরে বায়েন

প্রাপ্তা হল কিংবা স্বামী মৃত্যুবরণ করল। আর তার ও তার শহরের মধ্যে তিন দিনের কম দুরুত্ব হয় তাহলে তার শহরে প্রত্যাবর্তন করবে। আর যদি তিন দিনের দুরুত্ব থাকে তবে (চাইলে) ফিরতে পারবে কিংবা গন্তব্যস্থলের দিকেও যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে। তার সাথে অভিভাবক থাকুক বা না থাকুক। যদি কোন শহরে থাকে (অর্থাৎ, কোন শহর বা নগরে অবস্থানকালে স্বামী তালাক দেয় কিংবা তাকে রেখে মৃত্যুবরণ করে) তাহলে সেখানেই ইদ্দত পালন করবে। অতঃপর কোন মাহরামের সাথে বের হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

تُحِدُّ ইহা واحد مؤنث غائب তা باب افعال থেকে ব্যবহৃত তার মাসদার إِحْدَادٌ আবার তা باب نصر ينصر থেকে حِدَادٌ অর্থ শোক প্রকাশ করা। حداد এর পারিভাষিক অর্থ : স্ত্রী তার ইদ্দত পালনরত অবস্থায় খোশবু ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার, সুগন্ধি ব্যবহার ও সুগন্ধি তৈল ব্যবহার ইত্যাদি সাজ-সজ্জা ত্যাগ করে শোক প্রকাশ করা।

قوله : تُحِدُّ مُعْتَدَّةَ الخ : প্রাপ্ত বয়স্কা মুসলিমাহ মহিলা তালাকে বায়েনের কারণে বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় শোক পালন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, স্বামী মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন অবস্থায় শোক পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু তালাকে বায়েনের কারণে ইদ্দত পালন অবস্থায় শোক পালক করা ওয়াজিব নয়। কেননা, শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব হয়েছে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের কারণে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য। আর তা তো মৃত স্বামীর ক্ষেত্রে হতে পারে। কেননা, স্বামী তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত তাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রেখেছে। কিন্তু বায়েন তালাক প্রদান করে স্ত্রীকে স্বামী বিপদের মধ্যে এবং শাস্তির মধ্যে ফেলেছে তাই এ ধরনের স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক প্রকাশ করার মাঝে কোন সার্থকতা নেই। এজন্য তালাকে বায়েনের কারণে ইদ্দত পান কালে শোক প্রকাশ করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়।

আমাদের দলিল : হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُعْتَدَّةَ أَنْ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَاءِ وَ قَالَ الْحِنَاءُ طِيبٌ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী লোককে মেহেদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, মেহেদি হলো একটি খোশবু। উক্ত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদ্দত পালনকারিণীর ধরণ নির্ধারণ করেননি। তাই প্রতিয়মান হয় যে সব ধরনের ইদ্দত পালনকারিণী এর অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়া ইমাম তাহাবী (রহ.) একটি হাদসি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তা হল :

اَلْمُطَلَّقَةُ وَ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الْمُلَاعِنَةُ لَا يَخْتَضِبْنَ وَ لَا يَتَطَيَّبْنَ وَ لَا يَلْبِسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَ لَا يَخْرجن مِنْ بُيُوتِهِنَّ الخ

তালাক প্রাপ্ত, খোলাকারিণী, স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে এমন নারী, লিআন প্রাপ্তা নারী খিজাব লাগাবে না। খোশবু ব্যবহার করবে না, রং করা কাপড় পরিধান করবে না। উক্ত হাদীসে স্পষ্ট তালাক প্রাপ্তার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিধায় তা হানাফী মাযহাবকে আরো শক্তিশালী করল।

যৌক্তিক দলিল : বিবাহের মাধ্যমে একজন স্ত্রীলোক তার ভরণ-পোষণ ও সম্ভ্রম রক্ষা করার সুযোগ পায়। তাই তা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মহান নিয়ামত। আর এ নিয়ামত বিলুপ্তির কারণে মূলত শোক প্রকাশ করা স্ত্রীর উপর আবশ্যক হয়েছে। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে বা তালাকপ্রাপ্তা হলে উভয় অবস্থায়ই সে নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

তাই সে শোক প্রকাশ করবে। আর নিয়ামত বিচ্ছেদ তা তালাকের কারণ অধিক কর্তনকারী। এজন্য স্বামীর মৃত্যুর কারণে বা তালাক প্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীর উপর শোক পালন করা ওয়াজিব। সুতরাং স্ত্রীকে তার ইদ্দত পালনকালে শোক প্রকাশ করবে এমন সব বস্তু পরিহার করার মাধ্যমে যা স্ত্রীকে বিবাহের দিকে ধাবিত করে এবং তার প্রতি অন্য পুরুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তাই মহিলা সাজ-সজ্জা, সুগন্ধি, সুরমা, তৈল, মেহেদি, কুসুম বা জাফরানের রং এ রঞ্জিত কাপড় পুরিধান থেকে বিরত থাকবে। স্ত্রী লোক ইদ্দত পালনরত অবস্থায় সাজ-সজ্জা বা সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কেননা, এতে হারাম বিবাহের প্রতি ধাবিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তদ্রূপ সুরমা ব্যবহার করবে না। কেননা, হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহবীর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দেননি। তদ্রূপ স্ত্রীলোক তৈল ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু যদি কারো সুরমা ব্যবহার বা তৈল ব্যবহার ওজরের কারণে হয় তবে তার জন্য তা ব্যবহার করা জায়েজ। তদ্রূপ মেহেদি ব্যবহার বা কুসুম বা জাফরানের রং এ রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা, এগুলোর মধ্যে সুগন্ধি থাকার পাশাপাশি তা মানুষের সাজ-সজ্জার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া হাদীসে তা ব্যবহার করা বা পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

قوله : إِنْ كَانَتْ بَالِغَةً الخ : শোক পালন, পূর্ব আলোচনা অনুযায়ী মহিলা যদি প্রাপ্ত বয়স্কা এবং মুসলিমা হয়। কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীলোকের উপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। যেহেতু তার থেকে শরীয়তের বিধিনিষেধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তদ্রূপ অমুসলিম নারীর ক্ষেত্রে ও শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা, সে তো শরীয়াতের বিধিবিধানের مكلفة বা সম্বোধনপাত্রী নয়। অথচ শোক শরীয়াতের বিধান ও আল্লাহর হক। আর যদি মুসলমান বালেগা দাসীর স্বামী মৃত্যুবরণ করে কিংবা বায়েন তালাক প্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত পালন রত হয় তবে তার উপরও শোক প্রকাশ করা ওয়াজিব। কেননা, সেও শরীয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে হা এমন বিষয়ে যাতে তার মনিবের হক নষ্ট না হয়।

তাই দাসী তার ইদ্দতের ঘর থেকে বের হতে পারবে। তা তার শোক পালনের পরিপন্থী নয়। কেননা, যদি দাসী তার ইদ্দতের ঘরে অবস্থানের হুকুম দেয়া হয় তবে সে তার মনিবের খেদমত আঞ্জাম দানে অক্ষম হবে। অথচ মনিবের খেদমত করা দাসীর কর্তব্য। তাই দাসী তার ঘর থেকে বের হয়ে মনিবের খেদমতে নিয়োজিত হতে পারবে। এক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধানের উপর বান্দার হককে অগ্রগণ্য করা হবে। কেননা, বান্দা তো মুখাপেক্ষী, তার খেদমত ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে।

قوله : وَ لَا مُعْتَدَّةَ الْعِتْقِ الخ : যদি উম্মে ওয়ালাদের মনিব তাকে স্বাধীন করে দেয়, কিংবা তার মনিব মৃত্যুবরণ করে তবে তো তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব। তবে হ্যাঁ এ জন্য তার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ নিকাহে ফাসেদের বিচ্ছেদের পর ইদ্দত পালনকালে মহিলার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা, শোক পালনের বিধান রাখা হয়েছে বিবাহের নিয়ামত থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার দরুন। অথচ এখানে বিবাহের কোন নিয়ামত ছিল না। যার দরুন সে নিয়ামত উপভোগ করছিল। সুতরাং দাসীর দাসত্ব মুক্তির কারণে বা উম্মে ওয়ালাদ এর মনিব মৃত্যু কিংবা নিকাহে ফাসেদের পর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় তার জন্য সাজ-সজ্জার সুগন্ধি, সুরমা, জাফরান বা কুসুম রং এ রঞ্জিত কাপড় পরিধান বা সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করতে পারবে।

قوله : وَ لَا تَخْطُبُ مُعْتَدَّةً الخ : ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মহিলাকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেয়া ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ

'নির্দিষ্ট কাল (তথা ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না।' তবে হাঁ পরোক্ষভাবে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যায়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا -

'স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে কিংবা অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা তাদের আলোচনা করবে। কিন্তু তাদের সাথে গোপন বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া নেওয়া করবে না। তবে সুসঙ্গত কোন কথা বলতে পার।'

উক্ত আয়াতে سرا শব্দের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের কথা বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর মতে تعريض অর্থ যে কোনভাবে বিবাহের কথা জানানো। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাযি.) قول معروف এর ব্যাখা করেছেন এভাবে যে, আমি তোমার প্রতি আগ্রহী। আমরা দু'জন একত্রে মিলিত হতে চাই। মোটকথা ইশারা ইঙ্গিতে সব কিছু বলা যাবে। কিন্তু স্পষ্টভাবে বিবাহের কথা বলা যাবে না।

قوله : وَ لَا تَخْرُجُ مُعْتَدَّةُ الطَّلَاقِ الخ : তালাক প্রাপ্তা নারী ইদ্দত পালন রত অবস্থায় নিজ ঘর থেকে দিনে বা রাতে কোন সময়ই বের হতে পারবে না। তবে হাঁ, যদি ঘর ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিংবা ঘরের মালিক ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করে অথবা অন্য কোন কারণে নিজের জান মালের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে বের হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তালাক প্রাপ্তার ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে :

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যিনি তোমাদের প্রভু এবং (তালাকপ্রাপ্তা) নারীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া। এবং তারা নিজেরাও বের হবে না। তবে যদি স্পষ্ট কোন লজ্জাহীন কাজে লিপ্ত হয়ে যায়।' অর্থাৎ যদি তারা ব্যভিচার বা চুরি বা অন্য কোন লজ্জাকর কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। তাহলে তাদের শাস্তির জন্য ঘর থেকে বের করার অনুমতি আছে। আর বিধবা স্ত্রী লোক তার ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। তবে তার পক্ষে দিনে এবং রাতের কিছু অংশে বের হওয়া জায়েজ আছে। কিন্তু নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র রাত যাপন করা নিষেধ। কেননা, বিধবার তো স্বামী থেকে খরচ পাওনা নেই। এজন্য জীবিকা নির্বাহের জন্য তার বের হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর বাহিরে কাজের চাপে অনেক সময় দিন শেষ হয়ে রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত চলতে পারে। এজন্য রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত বাহির হওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু তালাক প্রাপ্তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপরই ওয়াজিব। বিধায় তার বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।

ইদ্দত পালনকারী স্ত্রী যে ঘরে অবস্থান করত সে ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَلَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ - 'নারীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না'। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘরকে নারীদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আর তাদের ঘর সেটাই যেখানে তার অবস্থান।

দ্বিতীয় দলিল : এক মহিলার স্বামী নিহত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার বসবাসের ঘরেই অবস্থা করে ইদ্দত পালন কর। ইদ্দতের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, স্ত্রী তার অবস্থান কৃত ঘরেই ইদ্দত পালন করা জরুরী।

উল্লেখ্য যে স্ত্রী তিন তালাকে বায়েনের মাধ্যমে ইদ্দত পালনরত হয় তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিন তালাকে বায়েনের মাধ্যমে স্ত্রী ইদ্দত পালন রত হয় তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পর্দা রক্ষা করা অপরিহার্য। পর্দার বিধান ঠিক রাখার পর এক ঘরে বসবাস করতে কোন দোষ নেই। কেননা, স্বামী তো নিজেই স্ত্রীকে হারাম করেছে। তাই তার পক্ষে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বাচা সম্ভব। তবে হাঁ, যদি স্বামী ফাসেক হয় বা ফাজের হয় যে, তার থেকে নিজেকে বাচানো সম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী লোকটি অন্যত্র চলে যাওয়াই ভাল।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, যদি ঘর এত সংকীর্ণ হয় যে, পর্দা বজায় রেখে দুজন থাকা সম্ভব নয় তবে পুরুষ ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে ঘরে রেখে বের হয়ে যাওয়া উত্তম। কেননা, স্ত্রী স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করা জরুরী।

قوله : بَانَتْ اَوْ مَاتَ عَنْهَا الخ : স্বামী স্ত্রী উভয় যদি কোন দূর এলাকায় সফর করে। চলার পথে অর্থাৎ, শহরের বাইরে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে। তবে দেখতে হবে উক্ত স্থান থেকে স্বামী বাড়ির দূরত্ব তিন দিনের কম কি না। যদি তিন দিনের কম হয় তবে স্ত্রী স্বামীর ঘরে ফিরত এসে ইদ্দত পালন করবে। স্ত্রীর এরকম রাস্তা থেকে স্বামীর বাড়ির দিকে বের হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এটাতো নতুন বের হওয়া নয়। আর যদি ঘটনাস্থল থেকে স্বামীর বাড়ি তিন দিনের দুরুত্ব হয় এবং গন্তব্যস্থল ও তিন দিনের দূরত্ব হয়। তবে স্ত্রীর ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে। যদি সে চায় তবে স্বামীর বাড়িতে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করতে পারবে। আর তাহাই উত্তম। আর যদি চায় তবে সে তার গন্তব্যস্থলের দিকে চলা অব্যাহত রাখতে পারে এবং গন্তব্যে পৌঁছে সেখানে ইদ্দত পালন করবে। আর যদি কোন শহরে অবস্থানকালে তালাক প্রাপ্তা হয় বা স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্ত্রী উক্ত শহরে ইদ্দত পালন করবে এবং ইদ্দত পালন করে বের হবে যদি তার সাথে কোন মাহরাম বিদ্যমান থাকে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে যদি তার সাথে মাহরাম থাকে তবে সে ইদ্দত পূর্ণ করার পূর্বেই উক্ত শহর ত্যাগ করতে পারবে। তাদের দলিল হল, প্রবাসের কষ্ট ও একাকিত্বের কষ্ট দূর করার জন্যই মূলত সফর বৈধ করা হয়েছে। এজন্য সফরের কম দূরত্বে বের হওয়ার অনুমতি সকলের মতেই রয়েছে। তাই একষ্টকে ওজর হিসাবে গণ্য করা হবে। আর ওজর এর কারণে সকলের মতে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। এদিকে সফরের বেশি দূরত্বে যাওয়ার বিষয়টি মাহরামের কারণে বৈধ হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : মাহরাম ছাড়া সফর করার নিষেধাজ্ঞা যেমন শরীয়তে রয়েছে। তেমনি ইদ্দতের মাঝে নিষেধাজ্ঞা আর প্রকট। কারণ, সফরের কম দূরত্বে মহিলা মাহরাম ছাড়াই বের হতে পারে। কিন্তু ইদ্দত রত অবস্থায় বের হওয়ার অনুমতি নেই। সুতরাং সফরের দূরত্বে মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া যেমন বের হওয়া হারাম অনুরূপভাবে ইদ্দতকালে বের হওয়া হারাম হওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য স্ত্রী লোকটি ঐ শহরেই অবস্থান করবে এবং এখানেই ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষ হলে মাহরাম সাথে থাকলে বের হবে।

بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ

পরিচ্ছেদ : বংশ প্রমাণ

وَمَنْ قَالَ إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا لَزِمَهُ نَسَبُهُ وَمَهْرُهَا وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مَا لَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ وَكَانَتْ رَجْعَةً فِي الْأَكْثَرِ مِنْهُمَا لَا فِي الْأَقَلِّ مِنْهُمَا وَالْبَتُّ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا وَإِلَّا لَا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَالْمُرَاهِقَةِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَا وَالْمَوْتِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا وَالْمُقِرَّةِ بِمُضِيِّهَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا لَا -

অনুবাদ : যদি (কোন পুরুষ) বলে আমি যদি তাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। অতঃপর বিবাহের দিন থেকে ছয় মাসের মাথায় স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করল। তবে সন্তানের নসব তার (স্বামীর) সাথে এবং স্ত্রীর মহর আবশ্যক হবে। আর রেজঈ তালাক প্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণীর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে, যদিও দু' বৎসরের উর্ধ্বে সন্তান প্রসব করে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারুক্তি করে নাই। অতঃপর দু' বৎসরের উর্ধ্বে সন্তান প্রসব করলে রাজআত সাব্যস্ত হবে। তবে দু' বৎসরের কমে হলে রাজআত সাব্যস্ত হবে না। আর তালাকে বায়েন প্রাপ্তা দু' বৎসরের কমে সন্তান প্রসব করলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। নতুবা সাব্যস্ত হবে না। (অর্থাৎ, যদি দু' বৎসর বা তদুর্ধ্ব সময়ে সন্তান প্রসব করে তবে সন্তানের বংশ উক্ত স্বামীর সাথে যুক্ত হবে না।) কিন্তু যদি স্বামী তার দাবী করে তবে নসব সাব্যস্ত হবে। আর (বায়েন তালাকপ্রাপ্তা) বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপণীতা 'নয় মাসের' কমে সন্তান প্রসব করলে তার বংশ সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না। আর স্বামী মৃত্যুর দু' বৎসরের কমে সন্তান প্রসব করলে তার বংশ সাব্যস্ত হবে। আর ইদ্দত পালনকারিণী তার ইদ্দত শেষ হওয়ার স্বীকারুক্তির ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করলে তার নসব সাব্যস্ত হবে। ছয় মাস বা তদুর্ধ হলে সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) পূর্বে باب العدة এর আলোচনা করেছেন। আর তাতে গর্ভ ও ইদ্দত নিয়ে সারগর্ভ বর্ণনা করেছেন। আর এখান থেকে গর্ভ এর অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তথা ثبوت نسب বা বংশ প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قوله : وَلَوْ قَالَ اِنْ نَكَحْتُهَا الخ : যদি কোন পুরুষ অন্য কোন মহিলাকে লক্ষ করে বলে আমি যদি তাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক। অতঃপর উক্ত পুরুষ তাকেই বিবাহ করল। আর বিবাহের পর থেকে ছয় মাসের মাথায় উক্ত স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে তবে সন্তানের বংশ সূত্র উক্ত পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকটি পূর্ণ মহর পাবে। আর যদি ছয় মাসের পূর্বে কিংবা ছয় মাসের পর সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, ছয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, গর্ভ সঞ্চার বিবাহের পর ও তালাক পতিত হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। এজন্য সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে এবং স্ত্রী পূর্ণ

মহর প্রাপ্ত হবে। কিন্তু যদি বিবাহের সময় থেকে ছয় মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব করে তবে সম্ভাবনা রয়েছে এ গর্ভ উক্ত স্বামী কর্তৃক নয়, বরং বিবাহের পূর্বে গর্ভ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, গর্ভের সর্বনিম্ন সময় ছয় মাস আর সে তো ছয় মাসের পূর্বে গর্ভ প্রসব করেছে। তাই এক্ষেত্রে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না এবং স্ত্রীও পূর্ণ মহর প্রাপ্ত হবে না। তদ্রূপ যদি ছয় মাসের পরে সন্তান প্রসব করে তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে উক্ত স্ত্রী তালাক পতিত হওয়ার পর গর্ভবতী হয়েছে। সুতরাং এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারণে সন্তানের বংশ স্বামীর সাথে যুক্ত হবে না এবং স্ত্রীও পূর্ণ মহর প্রাপ্ত হবে না। বংশ সাব্যস্ত করার সূরতে মূলত সতর্কতার ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

قوله : وَ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ الخ : যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাকে রাজঈ দেয়, অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালন রত, আর সে এ পর্যন্ত ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়নি, এমতাবস্থায় দু' বৎসর বা তদুর্ধ্বে উক্ত স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করল উক্ত সন্তানের বংশধারা উক্ত পুরুষের সাথে সাব্যস্ত হবে এবং এতে স্ত্রী রাজআত হয়েছে বলে হুকুম প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, রাজআত সাব্যস্ত হবে।

দলিল : তুহুর দীর্ঘ হওয়ার যেহেতু চূড়ান্ত সময়সীমা নেই, তাই হতে পারে স্ত্রীর ইদ্দতের সময়কালের তুহুরগুলোও দীর্ঘ ছিল। যার কারণে তার ইদ্দত দীর্ঘ হয়েছে। আর যেহেতু তালাকে রাজঈর পর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস জায়েজ তাই এ সন্তানের নসব উক্ত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। আর এতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়াও প্রমাণিত হবে। এমন কি স্ত্রী যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা ছাড়া দুবৎসর কেন, অনেক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি সন্তান প্রসব করে তবে সে সন্তান স্বামীর সাথে নসব সাব্যস্ত হবে। এবং স্ত্রীকে রাজআত করাও প্রমাণিত হবে। কেননা, গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে দুই বৎসর। তাই তালাকের সময় হতে দুই বৎসর পর সন্তান প্রসব হলে নিঃসন্দেহে তার গর্ভ সঞ্চার তালাকের পর হয়েছে। আর এদিকে স্ত্রীর উপর যেহেতু জিনার কোন তুহমতও নেই তাই প্রকাশ্য তার গর্ভ সঞ্চার স্বামীর মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং সন্তানের নসব স্বামীর সাথে হবে এবং স্ত্রীও রেজআত হয়েছে তা প্রমাণিত হবে। আর যদি রেজঈ তালাকের পর দু' বৎসরের পূর্বে স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং ইতিপূর্বে ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা না দেয় তবে সন্তানের বংশ সূত্র উক্ত তালাক প্রদানকারী স্বামীর সাথে সংযুক্ত হবে, কিন্তু স্ত্রী রাজআত হবে না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার দরুন স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কেননা, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা হচ্ছে ছয় মাস। তাই উক্ত সুরতে গর্ভ সঞ্চার তালাকের পূর্বে বা পরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু রাজআত প্রমাণিত হবে না। কেননা, যদি মিলন ও গর্ভ সঞ্চার তালাকের পূর্বে হয় তবে তো গর্ভ প্রসব দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে গেল। আর যদি তালাকের পর মিলন ও গর্ভ হয়ে থাকে তবে তো রাজআত হবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে সন্দেহ বিদ্যমান। আর সন্দেহের সাথে রাজআত প্রমাণিত হয় না। তাই আমরা দুই বৎসরের কমে সন্তান প্রসব কারিণীর সন্তান প্রসব দ্বারা ইদ্দত শেষ হওয়ার এবং স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুকুম প্রদান করি।

قوله : وَ الْبَتُّ لِاَقَلِّ مِنْهُمَا الخ : বায়েন তালাক প্রাপ্তা বা তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যদি তালাকের সময় হতে নিয়ে দু' বৎসরের কম সময় কালে সন্তান প্রসব করে, তবে তার সন্তানের নসব স্বামীর দিকে সাব্যস্ত হবে। কেননা, সন্তান গর্ভে থাকার সর্বোচ্চ সময়কাল হল দু' বৎসর। তাই এ সূরতে তালাকের পূর্বে গর্ভ সঞ্চার ও তালাকের সময় সন্তান গর্ভে বিদ্যমান থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিকে তালাকের পর গর্ভ সঞ্চার হওয়া নিশ্চিত নয়। তাই গর্ভ সঞ্চারের পূর্বে স্ত্রী স্বামীর জন্য বৈধ শয্যা হওয়া বিলুপ্ত হওয়াও নিশ্চিত নয়। সুতরাং সতর্কতা হিসাবে বায়েন ও তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর এ সন্তানের নসব তার স্বামীর থেকে সাবেত হবে। আর যদি তালাকের সময় হতে নিয়ে দু' বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রীর সন্তান প্রসব হয় তাহলে যেহেতু তালাকের পর গর্ভ সঞ্চার হওয়া নিশ্চিত, তাই এ সন্তানের নসব স্বামীর দিকে সম্পৃক্ত হবে না। কেননা, গর্ভ দু' বৎসরের বেশি বিলম্বিত হয় না। তবে হ্যাঁ, স্বামী যদি এ সন্তানের নসবের দাবী করে যে এ সন্তান আমার ঔরসের তাহলে স্বামী

থেকে নসব সাব্যস্ত হবে। যদিও সন্তান দু' বৎসরের পর প্রসব হয়। কেননা, এক্ষেত্রে স্বামী সে নিজে সন্তানের নসবের দায়ভার গ্রহণ করেছে। আর এর গ্রহণযোগ্য সূরতও রয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর ইদ্দতরত অবস্থায় সন্দেহজনকভাবে সহবাস করে ফেলেছে এবং এতেই এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। সুতরাং সন্তানের নসবের দাবি করলে তার থেকে নসব সাবেত হবে। অন্যথায় সাবেত হবে না।

قوله : وَ الْمُرَاهِقَةُ الخ : সহবাসযোগ্য নাবালেগা তথা মুরাহিকাহ (বয়:সন্ধিক্ষণে উপনিতা) স্ত্রী স্বামী কর্তৃক বায়েন তালাকের ইদ্দত পালন শেষে সন্তান প্রসব করে তাহলে উক্ত সন্তানের বংশ স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হওয়ার সময়সীমা নিয়ে হানাফি ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে যদি উক্ত মুরাহিকাহ স্ত্রী তালাকের সময় থেকে নিয়ে 'নয় মাসের' কমে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানের নসব উক্ত তালাকদাতা স্বামীর সাথে যুক্ত হবে। আর যদি 'নয় মাসে' প্রসব করে তবে সন্তানের নসব উক্ত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে তালাকের সময় থেকে নিয়ে দুই বৎসরের ভেতরে সন্তান প্রসব করলে স্বামী থেকে সন্তানের বংশধারা সাব্যস্ত হবে।

তিনি দলিল পেশ করেন : যেহেতু উক্ত স্ত্রী مُرَاهِقَةٌ مَدْخُوْلٌ بِهَا বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী সহবাসকৃতা, তাই সে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর সে তার ইদ্দত শেষ হওয়ারও ঘোষণা দেয়নি, তাই সে প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর অনুরূপই হবে। এবং তালাকের পূর্বে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তাই সে তালাকের সময় থেকে দু' বৎসরের ভিতর সন্তান প্রসব করলে তার পিতৃ পরিচয় স্বামীর সাথেই সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলিল : যে সকল মহিলার ঋতুস্রাব হয় না তাদের ইদ্দত এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاللَّٓئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّٓئِى لَمْ يَحِضْنَ

'তোমাদের যে সকল স্ত্রীদের আর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ পোষণ করলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস এবং যারা এখনো রজঃস্বলা হয়নি, তাদেরও।' সুতরাং মহিলা তার ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা না করলেও যখন তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। কেননা, ইদ্দত হায়েজ দ্বারা পালন করলে ইহা মহিলার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তাই যখন সে ইদ্দত শেষ হওয়ার ঘোষণা করবে তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মাস দ্বারা ইদ্দত পালন করতে হয় তবে মাস অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মহিলার ইদ্দত শেষ এরকম ঘোষণার প্রয়োজন নেই। বরং তার স্বীকারোক্তির তুলনায় শরীয়াত কর্তৃক ইদ্দত শেষ হওয়ার বিষয়টি বেশি কার্যকর হবে। আবার কখনো মহিলার স্বীকারোক্তি শরীয়াতের বিপরীত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। যেমন সে স্বীকারোক্তি করল যে, তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এ স্বীকারোক্তির ছয় মাসের ভেতর সে সন্তান প্রসব করল তবে তার এ স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে না। কেননা, সন্তান তার মায়ের গর্ভে সর্বনিম্ন ছয় মাস থাকতে হয়। সুতরাং আমাদের আলোচিত মহিলার তালাক প্রাপ্ত হওয়ার তিন মাসের মাথায় ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে।

এখন যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পর থেকে ছয় মাসের ভেতরে বা তালাক প্রদানের নয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করে তবে এসন্তানের নসব তার স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপভাবে যদি مراهقة বা বয়ঃসন্ধি নিকটবর্তী স্ত্রীর রাজঈ তালাকের ইদ্দতের পর সন্তান প্রসব করে, তাহলেও তরফাইন (রহ.)-এর মতে যদি নয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করে তবে নসব সাব্যস্ত হবে। আর নয় মাসে বা নয় মাসের উর্ধ্ব সময়ে প্রসব করে তবে নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, مراهقة তথা বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী স্ত্রী যদি ইদ্দত রত অবস্থায় গর্ভবতীর দাবী করে তবে তার এ দাবী গ্রহণ করা হবে। এবং তার এ দাবীর কারণে বালেগা হিসেবে গণ্য হবে।

কেননা সে নিজে নিজের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। তখন আর তার হুকুমের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কা থেকে ভিন্ন হবে না। বরং তখন তার হুকুমও প্রাপ্ত বয়স্কদের একই হুকুম হবে।

قوله : وَ الْمَوْتِ لِأَقَلِّ مِنْهُمَا الخ : যদি مراهقة বা বয়ঃসন্ধির নিকটবর্তী স্ত্রীর স্বামী মৃত্যুবরণ করে তবে তার সন্তান মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে কি না এ ব্যাপারে তরফাইন (রহ.) এর মতে ইদ্দত তথা চার মাস দশদিন শেষ হওয়ার পরে ছয় মাসের কমে মোট দশমাস দশ দিনের কমে সন্তান প্রসব করলে উক্ত সন্তানের নসব মৃত স্বামীর সাথে যুক্ত হবে। আর এর পরে প্রসব করলে তার নসব স্বামীর সাথে যুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে দুই বৎসরের কমে প্রসব করলে মৃত ব্যক্তির সাথে নসব সাব্যস্ত হবে। দুই বৎসর বা তদুর্ধ্বে প্রসব করলে নসব স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে না। উভয় পক্ষের দলিল ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি মৃত স্বামীর স্ত্রী প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। অর্থাৎ, مراهقة না হয় তবে স্বামী মৃত্যুর সময় থেকে যদি দু বৎসরের ভেতর সন্তান প্রসব করে তবে সন্তানের নসব মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, যদি স্বামী মৃত্যুর পর চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ছয় মাসের ভেতর সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তানের নসব মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। তিনি দলিল পেশ করেন, স্বামী মৃত্যুর সময় যেহেতু তার গর্ভ প্রকাশ পায়নি তাই তার ইদ্দত চার মাস দশদিন দ্বারা ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং যখন তার চার মাস দশদিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। তা শরীয়ত কর্তৃক হুকুমকৃত। তার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। সুতরাং যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করে তবে প্রমাণিত হবে যে, এ গর্ভ অবশ্যই ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। এজন্য সন্তানের নসব মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার ছয় মাসে বা তদুর্ধে সন্তান প্রসব করে তবে গর্ভ সঞ্চার ইদ্দতের ভেতরে হওয়া বা পরে হওয়ার মধ্যে সন্দেহ যুক্ত, তাই এ গর্ভস্থ সন্তানের নসব মৃত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে মহিলা স্বামীর জন্য ফেরাশে সহিহ দূরীভূত হওয়ার পর গর্ভ সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এর নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম যুফার (রহ.) এর দলিলের জবাব : স্বামীর মৃত্যুর কারণে প্রাপ্ত বয়স্কার ইদ্দত পালনের দিক অল্প বয়স্কা স্ত্রীর ইদ্দতের দিকের মত নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার ইদ্দত হয়ত চার মাস দশ দিন হবে অথবা গর্ভ প্রসব পর্যন্ত হবে। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে চার মাস দশদিনকে স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত নির্ধারণ করা সহীহ নয়। পক্ষান্তরে অল্প বয়স্কা তথা নাবালেগার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতী হওয়া অসম্ভব। তার বালেগা হয়ে যাওয়াটা সন্দেহযুক্ত। আর না বালেগা হওয়াটা পূর্ব থেকে সাব্যস্ত বিষয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সন্দেহ বিদ্যমান থাকায় আসলের দিকে ধাবিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তার ইদ্দত চার মাস দশদিন দ্বারা ধার্য করা হবে। পক্ষান্তরে বালেগার ক্ষেত্রে গর্ভ না থাকার অবস্থায় ইদ্দত চার মাস দশ দিন ধার্য করা হবে। আর যদি গর্ভবতী হয় তবে তো তার ইদ্দত গর্ভ প্রসব পর্যন্ত বিলম্বিত করা হবে। আর মৃত স্বামীর স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই চার মাস দশ দিনেও যদি গর্ভ প্রকাশ নাও হয় তবুও যদি স্বামী মৃত্যুর দু বৎসরের ভেতর সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত হবে।

قوله : وَ الْمُقِرَّةِ بِمُضِيِّهَا الخ : যদি ইদ্দত পালনকারিণী কোন মহিলা এই দাবী করে যে তার ইদ্দত শেষ হয়েছে। অতঃপর এ স্বীকারোক্তির সময় থেকে ছয় মাসের ভেতর সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, যখন সন্তান তার স্বীকারোক্তির ছয় মাসের পূর্বে প্রসব হয়েছে তাই তা প্রমাণ হল যে, স্বীকারোক্তির সময় মহিলা গর্ভবতী ইদ্দত পালনকারিণী ছিল। আর গর্ভবতীর ইদ্দত শেষ হয় গর্ভ প্রসবের মাধ্যমে। সুতরাং মহিলার দাবী 'আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে তা নিশ্চিত অসত্য ও অসার। তাই সন্তান প্রসবের

সাথে সাথে তার ইদ্দত শেষ হবে এবং সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্বীকারোক্তির ছয় মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ে সন্তান প্রসব করে তবে উক্ত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। কেননা, যেহেতু স্বীকারোক্তির পর ছয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময়ে সন্তান প্রসব করাটা প্রমাণ করে তার গর্ভ সঞ্চার স্বীকারোক্তির পর হয়েছে তাই এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, ইদ্দত পালনকারী স্বামী মৃত্যু বা তালাকে রেজঈ বা তালাকে বায়েন এর কারণে হউক সকল ক্ষেত্রে সমান বিধান প্রযোজ্য।

وَالْمُعْتَدَّةِ أن جُحِدَتْ وِلَادَتُهَا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أو رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو حَبَلٍ ظَاهِرٍ أو اِقْرَارٍ بِهِ أو تَصْدِيقِ الْوَرَثَةِ وَالْمَنْكُوحَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا إِنْ سَكَتَ وَإِنْ جَحَدَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ على الْوِلَادَةِ فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فقالت نَكَحْتَنِي مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَادَّعَى الْأَقَلَّ فَالْقَوْلُ لها وهو ابْنُهُ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِوِلَادَتِهَا وَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ على الْوِلَادَةِ لم تُطَلَّقْ وَإِنْ كان أَقَرَّ بِالْحَبَلِ طُلِّقَتْ بِلَا شَهَادَةٍ -

---

অনুবাদ : ইদ্দত পালনকারিণী সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে যদি তার প্রসূত সন্তানকে অস্বীকার করা হয় তবে দুজন পুরুষের বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষীতে কিংবা দৃশ্যমান গর্ভ, অথবা স্বামী স্বীকৃতি কিংবা মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ সন্তান প্রসবের সত্যতা স্বীকার করে অথবা বিবাহিতা (বিবাহের পর থেকে) ছয় মাস বা তদুর্ধ্বে সন্তান প্রসব করে আর স্বামী চুপ থাকে (তবে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে) আর যদি অস্বীকার করে তবে প্রসবের পক্ষে একজন মহিলার সাক্ষীতে সন্তানের নসব স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। আর যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে অতঃপর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় আর স্ত্রী বলে তুমি আমাকে বিবাহ করার ছয় মাস হয়েছে। আর স্বামী এর চেয়ে কমের দাবী করে তাহলে স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে। এবং সন্তান স্বামীরই হবে। যদি স্বামী-স্ত্রীর তালাককে শর্তযুক্ত করে তার সন্তান প্রসবের সাথে অতঃপর একজন মহিলা সন্তান প্রসবের সাক্ষী দেয় তাহলে স্ত্রী তালাক হবে না। আর যদি স্বামী গর্ভ সঞ্চারের স্বীকার করে তবে সাক্ষ ছাড়াই তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ الْمُعْتَدَّةِ اِنْ جُحِدَتْ الخ : ইদ্দত রত স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে আর তার গর্ভে যে সন্তান ছিল এ বিষয় পূর্ব থেকে দৃশ্যমান থাকে অথবা এ ব্যাপারে স্বামীর স্বীকৃতি থাকে তাহলে কারো সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী উক্ত সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উক্ত সন্তান স্ত্রী থেকে প্রসবের অনুকূলে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষী প্রয়োজন। যদি তারা সাক্ষী প্রদান করে তবে উক্ত সন্তানের নসব উক্ত স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে সর্ব অবস্থায় একজন ন্যায়পরায়ণ নারীর সাক্ষীতে নসব সাব্যস্ত হবে। সাক্ষ্য ছাড়া নসব সাব্যস্ত হবে না। পূর্ব থেকে গর্ভ দৃশ্যমান থাকুক বা না থাকুক, স্বামী গর্ভের স্বীকৃতি প্রদান করুক বা না করুক। ইমাম আহমদ (রহ.) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে চারজন মহিলার সাক্ষ্য শর্ত। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইবনে আবি লায়লা (রহ.) এর মতে দু'জন মহিলার সাক্ষীতে নসব সাব্যস্ত হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : মহিলার ইদ্দত বিদ্যমান থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী এখনো তার স্বামীর শয্যা রয়ে গেছে। আর শয্যারূপে বহাল থাকাই নসব সাব্যস্তকারী। সুতরাং পৃথকভাবে নসব সাব্যস্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে হাঁ এখন শুধু ইহা প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত সন্তান উক্ত স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে প্রসব হয়েছে। আর তা একজন ন্যায় পরায়ণ স্ত্রী লোকের সাক্ষীতে যথেষ্ট হয়। যেভাবে বিবাহে বিদ্যমান থাকাকালীন সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে প্রসব হওয়ার উপর একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ এখানেও একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : তিনি বলেন, ইদ্দত পালন রত অবস্থায় স্ত্রী যে আংশিকভাবে স্বামীর শয্যা বহাল থাকে তা তো স্পষ্ট। কিন্তু যখন সে গর্ভ প্রসবের কথা স্বীকবার করেছে তখন তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং যা গত হয়ে গেল তা প্রমাণ হিসাবে স্থির থাকেনি। কেননা, প্রমাণ বা হুজ্জত তো হয় যা বিদ্যমান। এজন্য আমরা বলি শয্যাধিকারকে নসবের অনুকূলে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে না। তাই নসব সাব্যস্ত করার জন্য নতুনভাবে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর তা পরিপূর্ণ প্রমাণ হতে হবে।

আর পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ হচ্ছে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষী। আর যদি পূর্ব থেকে গর্ভ দৃশ্যমান থাকে কিংবা স্বামী গর্ভের কথা স্বীকার করে থাকে তবে প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, এক্ষেত্রে পূর্ব থেকেই গর্ভ ও গর্ভস্থ সন্তান সাবিতুননসব বা নসব সাব্যস্ত হয়ে আছে। এখন এমন প্রমাণ পেশ করা জরুরী যে যা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, উক্ত সন্তান ঐ স্ত্রীলোকের। আর তা তো একজন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়। আর যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত রত থাকে, অতঃপর দু বৎসরের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, আর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ সন্তান প্রসবের সত্যায়ন করে তাহলে সন্তান প্রসবের উপর সাক্ষী না থাকলেও সন্তানের নসব মৃত ব্যক্তির সাথে সাব্যস্ত হবে এবং উক্ত সন্তান অন্যান্য ওয়ারিশদের ন্যায় সমমিরাসের মালিক হবে।

قوله : وَ الْمَنْكُوحَةِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ الخ : যদি কোন স্ত্রীলোক তার বিবাহের ছয় মাসের মাথায় বা তদুর্ধ্বে সন্তান প্রসব করে। অতঃপর স্বামী চুপ থাকে, তাহলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি একান্ত অস্বীকার করে তাহলে উক্ত স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে সন্তান প্রসব হয়েছে বলে একজন নারী সাক্ষ্য প্রদান করে তবে উক্ত সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। আর যদি একান্ত অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর সাথে সাব্যস্ত হবে। কেননা, এক্ষেত্রে সহীহ বিবাহ বিদ্যমান। এবং গর্ভের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস ও অতিক্রম করেছে। তাছাড়া হুজুর (সা.) এর হাদীস اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ সন্তান শয্যা-সঙ্গীর। সুতরাং বিবাহ থাকাকালীন সময়কালও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে সন্তানের বংশসূত্র স্ত্রীর স্বামীর সাথেই সাব্যস্ত হবে।

قوله : فَاِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اِخْتَلَفَا الخ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ হল এবং স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহের সময়কাল নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, অর্থাৎ, স্বামী দাবী করে যে আমি তোমাকে চার মাস হল বিবাহ করেছি। আর স্ত্রী দাবী করে যে, তুমি আমাকে ছয় মাস হল বিবাহ করেছ। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সন্তানের নসব স্বামীর দিকেই সাব্যস্ত হবে। কেননা, উক্ত মাসআলায় স্ত্রী হচ্ছে مدعى عليه আর স্বামী হচ্ছে مدعى তা এভাবে যে স্ত্রীর কথা বাহ্যত বিষয় এর অনুকূলে। কেননা, বাহ্যত বিষয় হচ্ছে স্ত্রী লোকটি জেনার মাধ্যমে নয়, বরং বিবাহের মাধ্যমেই সন্তান জন্ম দিয়েছে। তাই আমরা স্ত্রীকে مدعى عليه হিসেবে ধার্য করেছি আর যেহেতু স্বামী مدعى এর নিকট কোন দলিল প্রমাণ নেই, তাই مدعى عليه স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে কেননা হাদীসে এসেছে : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَ الْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ এজন্য স্বামীর নিকট সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকাতে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله : وَ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তুমি যদি সন্তান প্রসব কর তবে তুমি

তালাক। অতঃপর একজন মহিলা সন্তান প্রসবের সাক্ষ প্রদান করল আর স্বামী তা অস্বীকার করল। আর স্ত্রীরও গর্ভ বাহ্যত প্রকাশ ছিল না। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তালাক হবে না। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তালাক হয়ে যাবে। সাহাবইন (রহ.) দলিল পেশ করেন : হুজুর (স.) এর হাদীস : شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لَايَسْتَطِيْعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ اِلَيْهِ যে সকল বিষয় পুরুষরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয় সে সকল বিষয়ে স্ত্রী লোকদের সাক্ষ্য বৈধ। সুতরাং মহিলার সাক্ষ্যে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই তালাকও সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : আলোচ্য মাস্আলায় স্ত্রী মূলত তালাকের দাবী করছে যা স্বামীর ইয়ামিন ভঙ্গ হওয়ার দাবী করছে। আর স্বামী তা অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ণ সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া স্ত্রীর কথা গ্রহণ করা হবে না। আর এক মহিলার সাক্ষ্যে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অনিবার্য কারণে যা নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমিত থাকে। সুতরাং এর উপর অনুমান করে তালাক সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া সন্তান প্রসবের সঙ্গে তালাকের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই। কেননা, তালাক সন্তান প্রসব থেকে পৃথক হতে পারে।

قوله : وَاِنْ كَانَ اَقَرَّ بِالْحَبْلِ الخ : স্বামী যদি স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার কথা স্বীকার করে এবং তালাককে সন্তানের প্রসবের সাথে সংযুক্ত করে, এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে কোন সাক্ষ্য ছাড়াই প্রসবের দাবী করার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তালাক পতিত হওয়ার জন্য কোন নারীর সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : স্ত্রী তার কথা দ্বারা একথার দাবী করতে চায় যে স্বামী তার ইয়ামিনের মাঝে حانث বা ইয়ামিন ভঙ্গকারী। আর তা প্রমাণ করার জন্য একজন নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। পূর্বের মাসআলার ন্যায়। এজন্য অনিবার্যভাবে একজন নারীর সাক্ষ্য প্রয়োজন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : স্বামীর গর্ভ সঞ্চারের বিষয়টি স্বীকার করার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সে সন্তান প্রসবকেও স্বীকার করছে। এজন্য স্বীকারোক্তির পর আর সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। তাই আলোচ্য মাসআলায়ও সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় দলিল : স্বামী তার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার এর কথা স্বীকার করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তার স্ত্রী আমানতদার একথার স্বীকারোক্তি করা। আর স্ত্রীর পেটে আমার সন্তান রয়েছে যা আমানত, আর আমানত ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে আমানতদার এর কথাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এখানেও আমানতদার তথা স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এতে সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَأَقَلُّهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَلَوْ نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَاشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ منه لَزِمَهُ وَإِلَّا لَا وَمَنْ قال لِأَمَتِهِ إِنْ كان في بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ بِالْوِلَادَةِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَمَنْ قال لِغُلَامٍ هو ابْنِي وَمَاتَ فقالت أُمُّهُ أنا امْرَأَتُهُ وهو ابْنُهُ يَرِثَانِهِ وَإِنْ جُهِلَتْ حُرِّيَّتُهَا فقال وَارِثُهُ أَنْتِ أُمُّ وَلَدِ أبي فَلَا مِيرَاثَ لها -

অনুবাদ : গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল হলো দুই বছর। আর তার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস। যদি কেহ দাসী বিবাহ করে (সহবাসের পর) তাকে তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর তাকে ক্রয় করে। অতঃপর এ দাসী (খরিদ করার দিন থেকে) ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করে তবে সন্তানের নসব তার থেকে (খরিদকারীর সাথে) সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না। যদি মনিব তার দাসীকে বলে তোমার গর্ভে কোন সন্তান থাকে তবে তা আমার। অতঃপর একজন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে এ দাসী তার উম্মেওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যদি কেহ কোন বালক সম্পর্কে বলে যে, এ আমার পুত্র। অতঃপর সে মারা যায় অতঃপর বালকের মা এসে বলল, আমি তার স্ত্রী এবং সে তার ছেলে তাহলে উভয়েই মৃতের ওয়ারিস হবে। আর যদি স্ত্রীলোকটির স্বাধীনতা অপরিচিত হয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বলে তুমি আমার পিতার উম্মে ওয়ালাদ তবে তার সে মিরাস পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ الخ : গর্ভধারণের সময়কাল নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। আহনাফ হযরাতদের মতে গর্ভে সন্তান সর্বোচ্চ দুই বৎসর বিদ্যমান থাকতে পারে। কেননা, হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত-

اَلْوَلَدُ لَايَبْقٰى فِى الْبَطْنِ اَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَ لَوْ بِظِلِّ مِغْزَلٍ -

'সন্তান গর্ভে দুই বৎসরের অধিক সময়ে এক মুহূর্তেও অবস্থান করতে পারে না। যদিও ঘুর্ণিত চরকির ছায়ার সমপরিমাণ সময়ও হয়।' উক্ত হাদীস হযরত আয়েশা (রাযি.) নবী করীম (সা.) থেকে শুনে বর্ণনা করাটাই স্বাভাবিক। বিবেক-বুদ্ধি এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তাই গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ মেয়াদ দুই বৎসর প্রমাণিত হল। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল চার বৎসর তাদের দলিল : কিছু ঘটনা ও ইতিহাস যেমন মুহাম্মদ ইবনে আজলান মায়ের গর্ভে চার বৎসর ছিলেন। তাছাড়া আরো অনেকের ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা এসব ঘটনার উপর ভিত্তি করে গর্ভে মিয়াদকাল চার বৎসর ধার্য করেছেন। আর গর্ভের সর্বনিম্ন মিয়াদ হচ্ছে ছয়মাস। কেননা, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَ حَمْلُهٗ وَ فِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্য ছাড়ানোর সময় কাল হলো ত্রিশ মাস—অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَ فِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ বলে স্তন্য ছাড়ানোর সময়কালকে আলাদা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে ত্রিশ মাস থেকে দুই বৎসর বাদ দিলে গর্ভের জন্য বাকী থাকল ছয় মাস। সুতরাং গর্ভের সর্বনিম্ন মিয়াদ ছয় মাস।

قوله : فَلَوْ نَكَحَ اَمَةً الخ : যদি কোন ব্যক্তি অন্যের দাসীকে বিবাহ করে অতঃপর সহবাসের পর তালাক দিয়ে দেয় তারপর উক্ত দাসীর মনিব থেকে তাকে ক্রয় করে ফেলে। এখন ক্রয় করার সময় থেকে নিয়ে ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান প্রসব করল। তাহলে উক্ত সন্তানের নসবের দাবী করা ছাড়াই তার থেকে নসব সাবেত হয়ে যাবে। আর যদি ছয় মাসের বেশি সময়ের পর সন্তান প্রসব করে তবে দাবির প্রেক্ষিতে নসব সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রথম সূরতে মহিলা ছয় মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব করেছে। যা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ক্রয়ের পূর্বে তার ইদ্দত রত অবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। তাই কোন প্রকার দাবী ছাড়াই তার নসব সাব্যস্ত হবে। তার কারণ হচ্ছে ইদ্দত রত অবস্থায় স্ত্রী বিধানগত দিক দিয়ে স্বামীর বৈধ শয্যা। এর জন্য কোন প্রকার দাবি ছাড়াই নসব সাব্যস্ত হয়।

আর দ্বিতীয় সুরতে যেহেতু ছয় মাসের অধিক সময়ে সন্তান প্রসব হয়েছে, তাই ক্রয়ের পরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেননা, যথা সম্ভব গর্ভকে নিকটতম সময়ের সাথে যুক্ত করা হয়। সুতরাং আলোচিত ক্ষেত্রে গর্ভের নিকটতম সময়ে দাসী হওয়ার বিষয়টি কার্যকর। তাই দাসীর সন্তানের নসব মনিবের সাথে যুক্ত হতে হলে মনিবের দাবী উত্থাপন আবশ্যকীয়। যদি সে দাবী করে না তবে সন্তানের নসব মনিবের সাথে যুক্ত হবে না।

قوله : وَمَنْ قَالَ لِاَمَتِهِ اِنْ كَانَ الخ : যদি কোন ব্যক্তি আপন দাসীকে বলে তোমার গর্ভে যদি কোন সন্তান থাকে তবে সেটা আমার ঔরসজাত। অতঃপর দাসী সন্তান প্রসব করেছে বলে দাবী করে। আর একজন নারী দাসী থেকে সন্তান প্রসবের সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহলে দাসী তার মনিবের উম্মে ওয়ালাদ প্রমাণিত হবে।

এবং সন্তানের নসব মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, দাসীর গর্ভের সন্তান মনিবের সাথে সংযুক্ত হতে হলে মনিবের দাবী উত্থাপন করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ, মনিব তার দাসীর সন্তানের ব্যাপারে বলবে সে আমার ঔরসজাত। সুতরাং আলোচিত মাসআলায় মনিবের স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল। এখন শুধু প্রয়োজন দাসী থেকে সন্তান প্রসবের। আর ইহা সকলের ঐক্যমত যে সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। সুতরাং যখন একজন নারী সাক্ষ্য দেবে যে দাসী সন্তান প্রসব করেছে তখন সন্তানের নসব মনিবের সাথে যুক্ত হবে। এবং দাসী উম্মেওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে উক্ত কথার পর যদি দাসী ছয় মাসের কমে সন্তান প্রসব করে তবে তা মনিবের সাথে যুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি মনিবের উক্তির পর থেকে ছয়মাস বা তদুর্ধ্বে সন্তান প্রসব করে তবে তা মনিবের সাথে যুক্ত হবে না।

قوله : وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ الخ : যদি কেহ কোন বালক সম্পর্কে বলে যে সে আমার ছেলে অতঃপর সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে বালকের মাতা দাবী করে যে, আমি উক্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী। তাহলে উক্ত স্ত্রী লোকটি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবে এবং বালক মৃত ব্যক্তির পুত্র হিসাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইহা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। অন্যথায় সাধারণ কিয়াসের দাবী হল স্ত্রী লোকটি মিরাস না পাওয়া। কেননা, নসব যেভাবে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় তদ্রূপ নিকাহে ফাসিদ বা সন্দেহ মূলক সহবাস বা মালিকানা সূত্রে সহবাস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির স্বীকার উক্তি শুধু শুদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। তাই সন্দেহের সাথে এক দিক তথা শুদ্ধ বিবাহ গ্রহণ করে স্ত্রীকে উততরাধিকারী সাব্যস্ত করা যাবে না। সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হল। মিরাস সাব্যস্ত হবে যখন স্ত্রী স্বাধীনা হবে এবং উক্ত ছেলের মাতা হিসাবে সুপরিচিত হবে। আর শরীআতের দৃষ্টিকোণে এবং সাধারণ অবস্থা হিসাবে শুদ্ধ বিবাহই সন্তান গ্রহণের মাধ্যম। অতএব, সন্তান সাবেতের অন্যান্য সম্ভাব্য সুরতসমূহের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে। তাই উক্ত মহিলা মৃত ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তার সম্পদের মিরাস পাবে।

قوله : فَاِنْ جُهِلَتْ حُرِّيَّتُهَا الخ : যদি স্ত্রীলোকটি স্বাধীন হিসাবে পরিচিত না হয়, আর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা উক্ত স্ত্রীলোকের ব্যাপারে বলে তুমি তো উম্মেওয়ালাদ তাহলে সে মিরাস পাবে না। কেননা, দাসত্ব আরোপ রোধ করার জন্য দারুল ইসলামের বিবেচনায় স্বাধীনতার প্রকাশ্য হওয়াকে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে। মিরাসের হক সাব্যস্ত করার জন্য নয়। অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীলোক স্বাধীন হবে ঠিক তবে অন্যের মিরাস সাব্যস্ত করার জন্য গ্রহণ করা হবে না।

بَابُ الْحَضَانَةِ

পরিচ্ছেদ : সন্তান প্রতিপালন

أَحَقُّ بِالْوَلَدِ أُمُّهُ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَبَعْدَهَا ثُمَّ أُمُّ الْأُمِّ ثُمَّ أُمُّ الْأَبِ ثُمَّ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْخَالَاتُ كَذٰلِكَ ثُمَّ الْعَمَّاتُ كَذٰلِكَ وَمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ سَقَطَ حَقُّهَا ثُمَّ تَعُودُ بِالْفُرْقَةِ ثُمَّ الْعَصَبَاتُ بِتَرْتِيبِهِمْ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتّٰى يَسْتَغْنِيَ وَقُدِّرَ بِسَبْعٍ وَبِهَا حَتّٰى تَحِيضَ وَغَيْرُهُمَا أَحَقُّ بِهَا حَتّٰى تَشْتَهِيَ وَلَا حَقَّ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ مَا لَمْ يُعْتَقَا وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ عِنْدَنَا وَلَا تُسَافِرُ مُطَلَّقَةٌ بِوَلَدِهَا إِلَّا إِلٰى وَطَنِهَا وَقَدْ نَكَحَهَا ثَمَّهُ

অনুবাদ : (স্বামী স্ত্রীর মাঝে) বিচ্ছেদের পূর্বে ও পরে সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে মা অধিক হকদার। অতঃপর নানি, তারপর দাদি, তারপর সহোদর বোন তারপর বৈপিত্রিয় বোন। অতঃপর ফুফুদের সেভাবেই শ্রেণী বিন্যস্ত করা হবে। আর যে (লালন-পালনকারীনী) সন্তানের মাহরাম ভিন্ন বিবাহ করে তবে তার অধিকার রহিত হয়ে যায়। অতঃপর বিচ্ছেদের দরুন অধিকার ফিরে আসবে। অতঃপর আসাবা তাদের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। বালকের লালন-পালনে মা ও নানী অধিক হকদার অমুখাপেক্ষী হওয়া পর্যন্ত। (অর্থাৎ, বালক অন্যের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত) আর তা নির্ধারণ করা হয়েছে সাত বৎসর দ্বারা। আর (মা ও নানী) বালিকার ক্ষেত্রে (লালন-পালনের অধিক হকদার) হায়েজওয়ালী হওয়া পর্যন্ত। আর মা ও নানী ভিন্ন অন্যরা বালিকার লালন-পালনে অধিক হকদার কামাকর্ষনের বয়স পর্যন্ত। দাসী ও উম্মেওয়ালাদ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন হবে না সন্তানের লালন-পালনে তাদের কোন অধিকার নেই। আর জিম্মী নারী তার মুসলিম সন্তানের প্রতিপালনের অধিক হকদার যতদিন সে ধর্ম পার্থক্য বুঝার আকল বুদ্ধিমান না হয়। সন্তানের কোন ইচ্ছাধিকার নেই। তালাক প্রাপ্তা নারী তার সন্তান নিয়ে সফরে বের হতে পারবে না। তবে যদি (স্ত্রী) তার দেশে (নিয়ে যেতে চায়) যেখানে তার বিবাহ হয়েছে, (তাহলে অনুমতি আছে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

পূর্ব বর্ণিত পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার (রহ.) সন্তানের পিতৃ পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ পরিচ্ছেদে সন্তানের লালন-পালন নিয়ে আলোকপাত করেতেছেন। কেননা, যখন সন্তানের পিতৃ পরিচয় সংঘটিত হল, তখন অবশ্যই তার লালন-পালনের দিক মিমাংসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই এ পরিচ্ছেদে লালনের পালনের বিধানসমূহের বর্ণনা করেছেন।

قوله : أَحَقُّ بِالْوَلَدِ أُمُّهُ الخ : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারে অধিক হকদার সন্তানের মা। দলিল : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَ حِجْرِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَتَزَوَّجِي -

জনৈক মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পুত্রের জন্য আমার উদর ছিল আধার এবং আমার কোল ছিল তার জন্য আশ্রয়স্থল এবং আমার স্তন ছিল তার জন্য পানপাত্র। অথচ তার পিতা বলছে সে আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে তুমি অধিক হকদার।

দ্বিতীয় দলীল : সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা অপেক্ষা মা অধিক স্নেহময়ী এবং সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে মা-ই অধিক সক্ষম। কেননা, সন্তান মূলত মায়েরই অংশ। তাই প্রসবের সময় কাচি দ্বারা সন্তানকে তার মা থেকে পৃথক করতে হয়। এজন্য সন্তানকে মায়ের হাতে অর্পন করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় দলীল : হযরত উমর (রাযি.) তার স্ত্রীকে তালাক দানের পর সন্তানের ব্যাপারে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) বলে ছিলেন :

رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدٍ وَ عَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ

হে উমর! তোমার কাছে শহদ মধুর চেয়ে তার মায়ের মুখের থুথু তার জন্য অনেক ভালো।

হযরত আবু বকর (রাযি.) এর উক্ত মন্তব্য সাহাবাদের উপস্থিতিতে হয়েছিল। কোন সাহাবী তার প্রতিবাদ করেননি। এতে বুঝা যায় সন্তান প্রতিপালনে মা অধিক হকদার।

قوله : ثُمَّ أُمُّ الْأُمِّ الخ : আর মাতার অনুপস্থিতিতে নানি সন্তানের লালন-পালনের অধিক হকদার হবেন। কেননা, সন্তান প্রতিপালনে মমতার দিকই বেশি কার্যকর। আর স্নেহ-মমতা মায়ের দিকেই বেশি পাওয়া যায় আর নানি না থাকা অবস্থায় দাদি সন্তান লালন-পালনের বেশি হকদার।

قوله : ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ الخ : সন্তান প্রতিপালনে প্রথমে মাতা, তিনি না থাকা অবস্থায় নানি, তিনিও না থাকা অবস্থায় পর-নানি, তিনিও না থাকা অবস্থায় দাদি, তিনিও না থাকা অবস্থায় সহোদর বোন তথা পিতা-মাতা শরিক বোন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। যেনে রাখা ভাল যে, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের আত্মীয় পিতৃত্বের আত্মীয়ের তুলনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। অতঃপর বৈপিত্রিয় বোন তারপর বৈমাত্রিয় বোন অগ্রগণ্য হবে। তারপর খালারা তার পর ফুফুরা পর্যায়ক্রমে অগ্রগণ্য হবে।

قوله : وَ مَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ الخ : উল্লিখিত মহিলাগণের মধ্যে বা সন্তান লালন-পালন যার দায়িত্বে পতিত হয়েছে সে যদি অন্যত্র বিবাহ করে তবে তার দুটি সুরত রয়েছে :

১। হয়তো উক্ত মহিলা উক্ত সন্তানের মাহরামের কাছে বিবাহ হয়েছে তাহলে সন্তান লালন-পালনের হক রহিত হবে না। যেমন সন্তানের দাদা উক্ত সন্তানের নানিকে বিবাহ করল বা সন্তানের চাচা সন্তানের খালাকে বিবাহ করল। তাহলে নানি বা খালার হক রহিত হবে না। কেননা, দাদা বা চাচা স্নেহময়িতায় পিতার স্থলবর্তী। সুতরাং তারা সন্তানের ভাল-মন্দের দিকে নজর রাখবে। তদ্রূপ অন্য মাহরামাত এর ক্ষেত্রেও। কেননা, নিকটাত্মীয়তার কারণে স্নেহ বিদ্যমান আছে।

২। আর যদি উক্ত মহিলার বিবাহ সন্তানের মাহরাম ভিন্ন অন্যত্র হয় তাহলে তার থেকে উক্ত সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। কেননা, ইতিপূর্বে বর্ণিত হযরত আমর ইবনে শুআইব (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীসের শেষে রয়েছে : انت احق به مالم تتزوجى 'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে ততক্ষণ তার ব্যাপারে তুমি অধিক হকদার।' তাছাড়া একারণে সৎপিতা অপরিচিত ও অনাত্মীয় হলে সে তো খরচ করবে অতি স্বল্প।

আর তার দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ম। তার থেকে কল্যাণের আশা নেই। আর যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে তার হক পুণরায় ফিরে আসবে। কেননা, এক্ষেত্রে হক রহিতকারী তথা অন্যত্র বিবাহ তা তো দূর হয়ে গেছে।

قوله : ثُمَّ الْعَصَبَاتِ الخ : শিশুটির যদি কোন নিকটাত্মীয় নারী না থাকে তাহলে عصابه দের দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে এবং আসাবাগণের মধ্যে তাদের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ, পিতা-পিতামহ প্রপিতামহ কিংবা তদুর্ধ্ব কেউ থাকলে তিনি, নতুবা সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, সহোদর চাচাতো ভাই, এ প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তি না থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় জন। আর দ্বিতীয় জন না থাকা অবস্থায় তৃতীয় জন। এভাবেই প্রত্যেক পরবর্তী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির বিদ্যমানে লালন-পালন থেকে বঞ্চিত হবে। আর যে সন্তানের কোন আসাবা থাকবে না তার লালন-পালনের দাবি দার আজাদকারী মনিব।

উল্লেখ্য যে, শিশুটি যদি বালিকা হয় তবে তার লালন-পালনের দায়িত্ব চাচাতো ভাই বা আজাদকারী মনিব প্রাপ্ত হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা রয়েছে। কেননা, চাচাতো ভাই বা আজাদকারী মনিব বালিকার মাহরাম নয়। যার দরুন ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

قوله : وَ الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ اَحَقُّ بِهِ الخ : ছেলে সন্তানের লালন-পালনের অধিক হকদার সন্তানের মা বা নানি। আর এ হক শিশুর একা একা পানাহার করা। ও পোশাক পরিচ্ছেদ পরিবর্তন করা এবং একা একা ইস্তিঞ্জা করা পর্যন্ত। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকবে। আর তার পরনির্ভর শীলতা শেষ হলে তাদের দায়িত্ব ও শেষ হয়ে যাবে। গ্রন্থকার (রহ.) পরনির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার বয়স নির্ধারণ করেছেন সাত বছরের মাধ্যমে। আল্লামা আবু বকর খাসসাফ (রহ.) সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে এমন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে বাচ্চা সাবালক হওয়া পর্যন্ত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, শিশুকে সাত বৎসর বয়সে এখতিয়ার দেয়া হবে সে মা-বাবা থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

قوله : وَ بِهَا حَتّٰى تَحِيْضَ الخ : আর বালিকার ক্ষেত্রে মাতা, নানি, লালন-পালনের হকদার হবে। বালিকা ঋতুস্রাব বয়সে উপনিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা, কন্যা লালন-পালনের ব্যাপারে স্বনির্ভরতা হওয়ার পরে ও নারী সুলভ আচরণ ও আদাব, আখলাক শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন। আর এসব বিষয়ে নারীরাই অধিক সক্ষম। তাই ঋতুস্রাব বয়স পর্যন্ত মা ও নানির নিকট থাকাই অধিক বাঞ্ছনীয়। আর যখন তার বয়স ঋতুস্রাব পর্যন্ত হয়ে গেল তখন তার নিরাপত্তা বিধান ও বিবাহ-শাদী দানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য তখন তাকে তার পিতার নিকট সোপর্দ করা হবে। কেননা, এসব বিষেয়ে পিতাই অধিক বিচক্ষণ ও সক্ষম।

তবে হিশাম (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, বালিকা যখন কামাকর্ষণের বয়সে উপনিত হবে তখন তাকে পিতার নিকট সোপর্দ করা হবে। কেননা, তখনই তার নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে। তবে কামাকর্ষণের বয়স সম্পর্কে ফকীহ আবুল লাইছ বলেন, নয় বৎসর। কেহ কেহ বলেন, এগার বৎসর।

قوله : وَ غَيْرُهُمَا اَحَقُّ الخ : আর মা, নানি, দাদি ভিন্ন অন্য কাহারো উপর ন্যাস্ত হলে বালিকার কামাকর্ষণ বয়স পর্যন্ত লালন-পালনের হক থাকবে। কেননা, যদিও নারীসুলভ আচরণ শিক্ষা করা প্রয়োজন তথাপি তাদের দ্বারা সেবা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর মা, নানি ও দাদি ছাড়া অন্যের জন্য তাদের সেবা কাজে ব্যবহার করার অধিকার নেই। তাই তো তারা তাকে অন্যত্র পরিশ্রমের ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং কামাকর্ষণের বয়সে উপনীত হওয়ার পর মা, নানি, দাদি ছাড়া অন্যের উপর অর্পণ করা হয়, তাহলে আদব শিক্ষা গহণের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। আর মা, নানি, দাদির জন্য তাদের খেদমত নেয়া যেহেতু জায়েয আছে, তাই তাদের হাতে সোপর্দ করা যায়।

قوله : وَلَاحَقَّ لِلْاَمَةِ الخ : দাসী বা উম্মে ওয়ালাদ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে শিশুদের লালন-পালনের ব্যাপারে

কোন অধিকার নেই। কেননা, তারা তো মনিবের খেদমতে ব্যস্ত থাকবে। সন্তান লালন-পালনের মতো কোন সময় বের করা সম্ভব হবে না। তবে হা যদি মনিব স্বাধীন করে কিংবা উম্মেওয়ালাদ এর মনিব মৃত্যুবরণ করে তাহলে তারা স্বাধীন নারীদের মত সন্তান প্রতিপালন করার হক সংরক্ষণ করেন। কেননা, যখন হক সাব্যস্ত হচ্ছে তখন তো তারা স্বাধীন।

قوله : وَالذِّمِّيَّةُ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا الخ : যদি কোন মুসলমান পুরুষ জিম্মীয়াহ কিতাবীকে বিবাহ করে। অতঃপর তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে উক্ত জিম্মিয়া সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে অধিক হকদার যতদিন পর্যন্ত সন্তানের মাঝে ধর্ম পার্থক্য করার বুদ্ধি সৃষ্টি না হয় অথবা কু-প্রবৃত্তির প্রতি আসক্তি হওয়ার সন্দেহ না হয়। কেননা, সন্তানের মাঝে আকল-বুদ্ধি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তার মায়ের লালন-পালন তার জন্য কল্যাণকর আর বুদ্ধি বা আকল সৃষ্টি হওয়ার পর সন্তান خَيْرُ الْاَبَوَيْنِ হিসেবে পিতার ধর্মানুযায়ী মুসলমান হবে।

قوله : وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ الخ : মুসলমান পিতা আর আহলে কিতাবী মাতার সন্তানকে এ অধিকার প্রদান করা যাবে না যে সে তার পসন্দ অনুযায়ী একজনকে গ্রহণ করবে ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সন্তানের জন্য মাতা-পিতা থেকে যে কোন একজনকে গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। সুতরাং সে যাকে গ্রহণ করবে তার কাছেই সন্তানকে সোপর্দ করা হবে।

দলিল : পবিত্র হাদী :

رَافِعُ بْنُ سِنَانٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ وَ اَبَتْ اِمْرَاَتُهُ اَنْ تَسْلَمَ فَاَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِبْنَتِيْ وَ هِيَ فَطِيْمٌ وَ قَالَ رَافِعٌ اِبْنَتِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْعُدْ نَاحِيَةً قَالَ لَهَا اُقْعُدِيْ نَاحِيَةً فَاَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اُدْعُوَاهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلَى اُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ اِلَى اَبِيْهَا فَاَخَذَهَا -

হযরত রাফে ইবনে সিনান (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর তার স্ত্রী ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছিল। (তাদের একটি কন্যা সন্তানও ছিল) স্ত্রী লোকটি হুজুর (সা.) এর দরবারে এসে তার সন্তান দুগ্ধপায়ী হিসাবে সে তার নিকট রাখার আবেদন করল। এদিকে হযরত রাফে' (রাযি.) তার নিকট রখার আবেদন করলেন। হুজুর (সা.) তাদেরকে দুই পাশে বসিয়ে সন্তানকে তাদের মাঝে বসালেন। অতঃপর তারা সন্তানকে ডাক দিলে সে মায়ের দিকে ধাবিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জন্য দোয়া করলেন- اللهم اهدها। হে আল্লাহ তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। অতঃপর সে পিতার দিকে ধাবিত হলো এবং পিতা তাকে গ্রহণ করলেন। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন।

আমাদের দলিল : সন্তান অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে সল্পতা রয়েছে। তার মধ্যে কল্যাণ বা অকল্যাণ নির্বাচন করার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি হয়নি। যার দরুন সে তাকেই গ্রহণ করবে যে তাকে সঠিকভাবে খেল-তামাশা বা অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ করে দেয়। অথচ তার কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করলে তা তার জন্য কল্যাণকর হল না। কেননা, এর দ্বারা তার ভবিষ্যত অকল্যাণকর হয়ে যাবে। এজন্য সন্তান লালন-পালনে সন্তানের এখতিয়ারকে অগ্রগণ্য করা যাবে না। তাছাড়া একথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে সাহাবায়ে কেরামগণ বাচ্চাদেরকে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দেননি।

قوله : وَ لَاتُسَافِرُ مُطَلَّقَةٌ الخ : যদি তালাকপ্রাপ্তা নারী সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চায় তবে তার এ অধিকার থাকবে না। কেননা, এতে সন্তানের পিতার কষ্ট আবশ্যক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে হা যদি সে এমন শহরে যেতে চায় যেখানে তার স্বামী তাকে বিবাহ করেছে, তবে তা বিশুদ্ধ। কেননা, শরয়ীভাবে ও রেওয়াজ

অনুযায়ী সে সেখানে বসবাস করাকে নিজের উপর আরোপ করে নিয়েছে। কেননা, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন— مَنْ تَأَهَّلَ بِبَلْدَةٍ فَهُوَ مِنْهُمْ যদি কেউ কোন শহরে বিবাহ করে তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তো দারুল হারবের কোন পুরুষ বা নারী দারুল ইসলামে বিবাহ করলে জিম্মি হয়ে যায়। তাছাড়া যখন কোন স্থানে আকদে নিকাহ সম্পন্ন হয়। তখন তার বিধানসমূহ সে স্থানেই কার্যকর হবে। যেমন বিক্রয়ের ব্যাপারে বিক্রয়স্থানে বিক্রিত দ্রব্য অর্পন করা ওয়াজিব হয়।

আর এসকল বিধান হলো ঐ সময় যখন উভয় শহরের মধ্যে বেশি দূরত্ব হয়। পক্ষান্তরে যদি এতটা কাছাকাছি হয় যাতে পিতার পক্ষে সন্তানকে এসে দেখে শুনে নিজের বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে সক্ষম হয় তাহলে সেখানে নিয়ে যেতে কোন আপত্তি নেই। অনুরূপভাবে যদি শহরের নিকটবর্তী গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে যেতে চায় তবে তাতেও কোনরূপ আত্তি নেঈ। কেননা, এতে শিশুর কল্যাণ রয়েছে। এই হিসাবে যে সে শহরের আদব কায়দায় গড়ে উঠবে। আর পিতারও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থায় শিশুর ক্ষতি রয়েছে। কেননা, সে তখন গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে উঠবে। সুতরাং মায়ের জন্য সে অধিকার নেই।

بَابُ النَّفَقَةِ

পরিচ্ছেদ : ভরণ-পোষণ

تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ على زَوْجِهَا وَالْكِسْوَةُ بِقَدْرِ حَالِهِمَا وَلَوْ مَانِعَةً نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ لَا نَاشِزَةً وَصَغِيرَةً لَا تُوطَأُ وَمَحْبُوسَةً بِدَيْنٍ وَمَغْصُوبَةً وَحَاجَّةً مع غَيْرِ الزَّوْجِ وَمَرِيضَةً لم تُزَفَّ وَلِخَادِمِهَا لو مُوسِراً -

অনুবাদ : স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও খোরপোশ উভয়ের অবস্থা অনুপাতে স্বামীর উপর আবশ্যক। যদিও স্ত্রী মহরের জন্য নিজেকে (সমর্পণ করা থেকে) বাধা দানকারিণী হয়। তবে অবাধ্য অথবা অল্প বয়সী যার সাথে সহবাস করা যায় না, কিংবা ঋণের দায়ে বন্দীনী অথবা অপহৃত হয় কিংবা স্বামী ভিন্ন অন্যের সাথে হজ্ব পালনকারিণী হয় অথবা অসুস্থ (যাকে স্বামীর নিকট).অর্পণ করা হয়নি তবে স্বামীর উপর ভরণ পোষণ ওয়াজিব হবে না। স্ত্রীর চাকরের খরচ ওয়াজিব হবে যদি স্বামী সচ্ছল হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

نفقة শব্দটি انفاق। তথা খরচ করার অর্থে ব্যবহৃত হয় পরিভাষায় نفقة বলা হয় :

هِيَ شَرْعًا اَلطَّعَامُ وَ الْكِسْوَةُ وَالسُّكْنٰى وَ عُرْفًا هِيَ الطَّعَامُ -

শরয়ীভাবে نفقه বলা হয় : অন্য-বস্ত্র-বাসস্থান এ তিনটির সমষ্টিকে। আর প্রচলিতভাবে শুধুমাত্র খাদ্যকে نفقه বলা হয়।

قوله : تَجِبُ النَّفَقَةُ الخ : স্বামীর উপর তার নিজ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও খোরপোষ আবশ্যক। যখন স্ত্রী তার নিজেকে স্বামীর কাছে অর্পণ করে দেবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী : وَلْيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ - 'সচ্ছল ব্যক্তি তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।' উক্ত আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে খরচ করার বিষয়টিকে মহান আল্লাহ امر এর শব্দ দ্বারা ব্যবহার করেছেন। আর امر দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : সন্তানের পিতার কর্তব্য হলো স্ত্রীদের খোরপোশ সদাচারে সাথে প্রদান করা।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা على শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা আবশ্যকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজ্বে ইরশাদ করেন : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - তোমাদের (স্বামীদের) উপর আবশ্যক হলো স্ত্রীদের খাদ্য, বস্ত্র সদাচারের সঙ্গে প্রদান করা।

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত হিন্দা বিনতে উতবা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে নালিশ করলেন যে, আবু সুফিয়ান (আমার স্বামী) এক কৃপণ লোক সে আমার এবং আমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ নফকা প্রদান করে না।

আমি কি তার অজান্তে তার সম্পদ থেকে কিছু নিতে পারব?

হুজুর (সা.) এরশাদ করলেন, সদাচারের সাথে তোমার প্রয়োজন মুতাবিক নিয়ে নাও। কিয়াসের দাবিও তাই। কেননা, আবদ্ধ ব্যক্তির খোরপোশ আবদ্ধকারীর উপর আবশ্যক হয়। তাইতো যদি কেহ তার নিজ উদ্দেশ্য পুরণার্থে আবদ্ধ করে তবে তার ভরণ-পোষণ খোরপোশ তার উপরই আবশ্যক হয়। আর স্ত্রীকে তো স্বামী তার কল্যাণে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং স্ত্রী ও স্বামীর সম্পদ ও সন্তানাদীদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। তাই তার খোরপোশ এবং ভরণ-পোষণ স্বামীর উপরই আবশ্যক হবে। ঠিক তদ্রূপ বিধান জনগণের কাজে নিয়োজিত তথা জনগণের কল্যাণে আবদ্ধ কাজী, যাকাত উসুলকারী, মুফতী, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুজাহিদদের ভরণ-পোষন ও খোরপোশে জনগণের টাকা তথা বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করতে হয়।-

قوله : بِقَدْرِ حَالِهِمَا الخ : আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ (রহ.) স্ত্রীর খোরপোশ, ভরণ-পোষণ এর ব্যাপারে বলেন, তা স্বামী স্ত্রী উভয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ করে নির্ধারণ করা হবে।

সম্মানিত হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম খাসসাফ (রহ.) এর গ্রহণযোগ্য অভিমত তাই এবং ফতোয়াও এরই উপর। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) ইমাম খাসসাফ (রহ.) এর অভিমতের বিশ্লেষণ এভাবে প্রদান করেন যে, স্বামী স্ত্রীর অবস্থার মোট চারটি সুরত হতে পারে :

১। স্বামী স্ত্রী উভয়জন সচ্ছল। এমতাবস্থায় স্বামীর উপর সচ্ছলতার খোরপোশ দেয়া ওয়াজিব।

২। উভয়জনই অসচ্ছল। এমতাবস্থায় স্বামীর উপর অসচ্ছলতার খোরপোষ দেয়া আবশ্যক হবে।

৩। স্বামী সচ্ছল আর স্ত্রী অসচ্ছল।

৪। স্বামী অসচ্ছল আর স্ত্রী সচ্ছল।

এ দু সুরতে স্বামীর উপর স্ত্রীর মধ্যম ধরনের খোরপোশ দেয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে ইমাম কারখী (রহ.) বলেন, সর্ব অবস্থায় স্বামীর অবস্থা হিসাবে খোরপোশ দেয়া আবশ্যক হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনুরপ মত ব্যক্ত করেছেন। হানাফী মাযহাবের জাহেরী রেওয়ায়েত তাই। ইমাম কারখী (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল হচ্ছে কোরআনের আয়াত :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

উক্ত আয়াতে কারিমাতে উভয় অবস্থাতে স্বামীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, স্বামীর অবস্থা হিসাবে খরচ করার নির্দেশ করা হয়েছে।

ইমাম খাসসাফ (রহ.) এর দলিল বুখারী শরীফ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর (সা.) হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) এর স্ত্রী হিন্দার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন :

خُذِىْ مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ

তুমি তোমার স্বামীর সম্পদ থেকে সদাচারের সাথে ঐ পরিমাণ গ্রহণ কর যা তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়।

উক্ত হাদীসে হুজুর (সা.) হিন্দা (রাযি.)-কে তার প্রয়োজন অনুপাতে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি শুধু স্বামীর দিক বিবেচনা করা হতো তবে হুজুর (সা.) হিন্দা (রাযি.)-কে বেশি পরিমাণ নেয়ার নির্দেশ দিতেন। কেননা, হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ করেননি। তাছাড়া যুক্তি নির্ভর দলিল হল : স্ত্রীর প্রয়োজন পরিমাণ ওয়াজিব হবে। কেননা, নফকা প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই তো ধার্য করা হয়েছে। তাই গরীব মহিলার জন্য ধনী মহিলার অনুপাতে ধার্য করা তা তার প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে।

ইমাম কারখী (রহ.) এর দলিলের জবাব কুরআনের আয়াত : لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ الخ উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে স্বামী তার সামর্থানুযায়ী নিজ স্ত্রীর খোরপোশ নগদ আদায় করবে। অবশিষ্টাংশ পরে সচ্ছলতা আসলে পরে আদায় করবে। অর্থাৎ, যেমন ধরে নেয়া হল, স্বামী অসচ্ছল আর স্ত্রী সচ্ছল। সুতরাং এমতাবস্থায় স্বামীর উপর মধ্যম ধরনের খোরপোশ প্রদান করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় যদি স্বামী মধ্যম ধরনের খোরপোশ দিতে অপারগ হয় তবে যা সম্ভব হবে তাই উপস্থিত আদায় করবে এবং পরে সচ্ছলতা আসলে অবশিষ্টাংশ আদায় করবে।

قوله : وَ لَوْ مَانِعَةً نَفْسَهَا الخ : যদি স্বামী মহর মু'আজ্জল (معجل) আদায় করে না আর এমতাবস্থায় স্ত্রী তার নিজেকে স্বামীর কাছে অর্পণ করতে অস্বীকার করে তবুও স্বামীর উপর উক্ত স্ত্রীর খোরপোশ ও ভরণ-পোষন প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা, এ ক্ষেত্রে স্বামী তার হককে সেই বারণ করছে।

অর্থাৎ, স্ত্রী তার শরীয়াত কর্তৃক ধার্য প্রাপ্য অধিকারের কারণে সমর্পণ থেকে নিজেকে বিরত রাখার অর্থ হচ্ছে স্বামী তার স্ত্রীর হক আদায় করতঃ নিজ প্রাপ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

قوله : لَانَاشِزَةً الخ : স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ ভরণ-পোষণ আবশ্যক হয় কেবল স্বামীর আওতায় আবদ্ধ পাওয়া গেলে। অন্যথায় স্বামীর উপর নফকা আবশ্যক হয় না। সুতরাং যে স্ত্রী অবাধ্য হয়ে যায় সে তো স্বামীর আবদ্ধতা থেকে অন্যায়ভাবে বের হয়ে গেল বিধায় তার নফকা রহিত হয়ে গেল। তবে হা যদি সে পুনরায় বাধ্য হয়ে যায় তবে স্বামীর উপর তার নফকা দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে স্বামীর নগদ মহর আদায় করে দেয়ার পরও যদি স্বামী প্রথম বারই নিজেকে স্বামীর কাছে অর্পণ করা থেকে বিরত থাকে তবে সে নফকা প্রাপ্ত হবে না।

قوله : وَ صَغِيْرَةً لَاتُوطَأُ الخ : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী স্ত্রী যদি অল্পবয়স্কা হয় যার সাথে সহবাস বা সম্ভোগ করা যায় না তবে তার নফকা স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না। উক্ত স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাক বা নিজ পিত্রালয়ে থাক। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে অল্প বয়স্কা স্ত্রী খোরপোশ পাবে। যদি সে একান্ত শিশু হয় না কেন। তিনি দলিল দেন নফকা আবশ্যক হয় অধিকার লাভের দ্বারা। যেমন, অধিকার লাভ হওয়া বাদীর নফকা তার মুনিবের উপর আবশ্যক হয়। তদ্রূপ স্বামীর বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর অধিকার লাভ হওয়ার দ্বারা উক্ত স্ত্রীর নফকা স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে।

তাছাড়া নফকা আবশ্যক করা হয়েছে স্ত্রীর প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য আর প্রয়োজন তো ছোট বড় সকলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। আমাদের দলিল হল অল্প বয়স্কা স্ত্রী নফকা না পাওয়ার কারণ হচ্ছে স্বামী সম্ভোগ করা বা সহবাস করা থেকে অক্ষমতা স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত। কেননা, স্ত্রী অল্প বয়স্কা তাই সে নিজেকে সহবাসের জন্য স্বামীর নিকট অর্পণ করেনি। সুতরাং সে যেন অবাধ্য স্ত্রীর ন্যায় হয়ে গেল। আর খোরপোশ এমন আবদ্ধতা দ্বারা আবশ্যক হয় যার মধ্যে বিবাহের উদ্দেশ্যাবলী বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে এ ধরনের আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি বিধায় অল্পবয়স্কা স্ত্রী খোরপোশ পাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিলের জবাব হচ্ছে : স্বামীর অধিকার লাভের বিনিময়ে নফকা নয়। কেননা, অধিকার লাভের বিনিময় তাই হবে যা অধিকার লাভের সময় উল্লেখ থাকে। আর তা মহর হয়ে থাকে, নফকা নয়। সুতরাং স্ত্রীর অধিকার লাভের বিনিময় মহর। তাই অল্প বয়স্কা স্ত্রীর অধিকার লাভের বিনিময় হিসাবে মহর প্রাপ্ত হবে, কিন্তু নফকা পাবে না। আর দ্বিতীয় বক্তব্যের আলোকে আমরা বলবো যে, স্বামী যদি অল্পবয়স্ক হয় তবে স্বামীর মাল থেকে স্ত্রীর খোরপোশ ও ভরণপোষণ প্রদান করতে হবে।

কেননা, এক্ষেত্রে স্ত্রী তার নিজকে স্বামীর কাছে অর্পণ করা পাওয়া গেছে।

قوله : وَ مَحْبُوسَةٌ بِدَيْنٍ الخ : যদি ঋণের দায়ে স্ত্রীকে বন্দী করা হয় তবে স্বামীর উপর থেকে নফকা আদায় করা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, স্বামী কর্তৃক আবদ্ধতা পাওয়া গেলে নফকা আবশ্যক হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি।

স্ত্রী ঋণ পরিশোধ করতে গড়িমসি করার কারণে তাকে বন্দী করা হয়েছে। সুতরাং তা এমন হল যে, সে স্বামীর নিকট নিজেকে অর্পণই করেনি। সে যেন অবাধ্য স্ত্রীর ন্যায় হয়ে গেল। অবাধ্য স্ত্রী যেভাবে নফকা থেকে বঞ্চিত হয় সেও তদ্রূপ নফকা থেকে বঞ্চিত হবে।

قوله : وَ حَاجَّةٌ مَعَ غَيْرِ الزَّوْجِ الخ : স্ত্রী যদি স্বামী ভিন্য অন্য কারো সাথে হজ্বে গমন করে তবে সে খোরপোশ পাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় স্ত্রী খোরপোশ পাবে। কেননা, ফরয হজ্জ পালন করা হচ্ছে ওজর। তাই এ ওজর এর কারণে যদিও সে স্বামীর আবদ্ধতা থেকে মুক্ত তথাপি সে খোরপোশ পাবে। তবে হা এ অবস্থায় স্ত্রী গৃহে অবস্থান করার মতো নফকা প্রাপ্ত হবে। সফরে নফকা প্রাপ্ত হবে না। কেননা, আয়াত হাদীস দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে, স্বামীর উপর গৃহবাসে নফকা আবশ্যক হয়।

তবে হা যদি স্বামী সফর সঙ্গী হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে নফকা ওয়াজিব হবে। কেননা, এক্ষেত্রে যেহেতু স্বামী সাথে আছে তাই আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। এ অবস্থায়ও স্ত্রী গৃহে বাসের নফকা প্রাপ্ত হবে। সফরের অতিরিক্ত নফকা বা ঘরভাড়া ইত্যাদি প্রাপ্ত হবে না।

قوله : وَ مَرِيْضَةٌ لَمْ تُزَفَّ الخ : স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় আর তাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ করা হয়নি তাহলে স্ত্রী স্বামী কর্তৃক খোরপোশ প্রাপ্ত হবে না। আর যদি স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকা অবস্থায় অসুস্থ হয় তবে সে অবস্থায় স্ত্রী নফকা প্রাপ্ত হবে। স্ত্রী অসুস্থতার কারণে সহবাসের উপযোগী থাকুক বা না থাকুক। কিয়াসের দাবী হল যেহেতু স্ত্রীকে সহবাসের জন্য স্বামী আবদ্ধ করে রেখেছে তাই তার খোরপোশ আবশ্যক হবে। কিন্তু যেহেতু এখানে আবদ্ধ করার কারণ বিলুপ্ত তাই খোরপোশ আবশ্যক হবে না। আর ইসতিহসানের দাবি হল, এমতাবস্থায়ও স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্ত হবে। কেননা, এখানেও আবদ্ধতা পাওয়া গেছে। যদিও স্ত্রী সহবাসের যোগ্য নয়। তথাপি সে স্বামীর ঘরে বিদ্যমান থাকাতে স্বামীর ঘরের হেফাযত, সন্তান-সন্ততির লালনপালন বা স্বামী তার থেকে বাহ্যিক আনন্দ উপভোগ করতে পারছে। তাই এখানেও আবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে হিসাবে ধরে নিতে হবে। এবং এ হিসাবে স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্ত হবে। তাছাড়া সহবাস করতে না পারাটা ইহা সাময়িক বিষয়। যেমন হয়েছে নেফাস

চলাকালিন সময়। হায়েয, নেফাসগ্রস্ত মহিলার সাথে যদিও সহবাস করা নিষিদ্ধ তথাপি তাকে খোরপোশ অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

قوله : وَ لِخَادِمِهَا لَوْ مُوسِرًا الخ : স্বামী সচ্ছল হলে স্ত্রীর খোরপোশের সাথে স্ত্রীর প্রয়োজন মেটাতে চাকরেরও খরচা প্রদান করা আবশ্যক। কেননা, স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন সাপেক্ষ বিষয়াদির ব্যবস্থা করা। স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজনের মধ্যে চাকর বা চাকরানীর খরচ দেয়া স্বামীর উপর আবশ্যক। তবে যদি স্ত্রীর কোন চাকর-চাকরানী না থাকা অবস্থায় স্ত্রী ঘরের কার্যাদী আঞ্জাম দিতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীকে কাজের প্রতি বাধ্য করা যাবে না। কেননা, স্ত্রীর জন্য ওয়াজবি হল স্বামীর উপভোগের জন্য নিজেকে পেশ করা। ঘরের অন্যান্য কাজ তার উপর আবশ্যক নয়। ব্যাপারটি চাকর-চাকরানীর বিপরীত। অর্থাৎ, তারা যদি কাজ করতে অস্বীকার করে তবে সে খোরপোশ পাবে না। কেননা, সে তো কাজ আঞ্জাম দানের জন্যই ধার্য। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর সন্তানাদির আধিক্য হেতু কার্য আঞ্জাম দানে অক্ষম অবস্থায় চাকরের ব্যবস্থা করা বা চাকরের খরচা আঞ্জাম দেয়া স্বামীর উপর আবশ্যক। আর যদি স্ত্রী স্বাভাবিক অবস্থায় হয় এবং স্বামী সচ্ছল হয় তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম শাফেঈ (রহ.) এর মতে স্বামীর উপর একজন চাকরের খরচা আঞ্জাম দেয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় দুজন চাকরের খরচা আঞ্জাম দেয়া ওয়াজিব।

وَلَا يُفَرَّقُ بِعَجْزِهِ عن النَّفَقَةِ وَتُؤْمَرُ بِالْاِسْتِدَانَةِ عليه وَتَمَّمَ نَفَقَةَ الْيَسَارِ بِطُرُوِهِ وأن قَضَى بِنَفَقَةِ الْاَعْسَارِ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةٌ مَضَتْ إِلَّا بِالْقَضَاءِ أو الرِّضَا وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا تَسْقُطُ الْمَقْضِيَّةُ وَلَا تُرَدُّ الْمُعَجَّلَةُ وَيُبَاعُ الْقِنُّ في نَفَقَةِ زَوجَتِهِ وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ إِنَّمَا تَجِبُ بِالتَّبْوِأَةِ -

---

অনুবাদ : নফকা প্রদান করতে স্বামীর অক্ষমতায় (বিবাহ) বিচ্ছেদ করা হবে না। (বরং বিচারকের পক্ষ হতে) স্ত্রীকে হুকুম করা হবে স্বামীর নামে ঋন চাইবে (এবং তা খরচ করবে) স্বচ্ছলতার নফকা পূর্ণ করা হবে সচ্ছলতা ফিরে আসাতে যদি কাজি অসচ্ছলতার নফকার ফয়সালা করে দেন। চলে যাওয়া (অতীত হওয়া) নফকা ওয়াজিব হবে না। তবে হাঁ বিচারকের ফায়সালার ভিত্তিতে কিংবা (স্বামীর) সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ওয়াজিব হবে। যে কোন একজনের মৃত্যুতে ফয়সালাকৃত নফকা রহিত হয়ে যাবে। আর ফেরত নেয়া হবে না যে কোন একজনের মৃত্যুতে অগ্রীম নফকা প্রদান করা হলে। স্ত্রীর নফকা পরিশোধে দাস (তথা স্ত্রীর দাস স্বামী)-কে বিক্রি করা হবে বিবাহিতা দাসির নফকা ওয়াজিব হবে স্বামীর ঘরে বাস করার সুযোগ করে দেয়াতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : و يفرق بعجزه الخ : স্বামীর উপস্থিত থাকা অবস্থায় স্ত্রীর নফকা প্রদান করতে অক্ষমতায় অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ করা হবে না। বরং কাজী স্ত্রীকে বলবেন, তুমি স্বামীর নামে ঋণ করে চলতে থাক। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মাযহাব ইমাম যুহরী (রহ.) আতা ইবনে ইয়াছির (রহ.) হাসান বসরী (রহ.) সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ফুকাহাদেরও অভিমত।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) এরও অনুরূপ অভিমত। তারা দলিল দিতে গিয়ে বলেন, স্বামী খোরপোশ দিতে অক্ষম হওয়ায় সে সদাচার করতে অক্ষম হল। সুতরাং তার জন্য করণীয় দ্বিতীয়াংশ তথা تسريح باحسان সদভাবে ছেড়ে দেয়া এর উপর আমল করা। কিন্তু যেহেতু স্বামী সদয়ভাবে ছেড়ে দেয়নি, তাই কাজী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন। যেভাবে কর্তিত লিঙ্গ বা পুরুষত্বহীন স্বামী নিজ স্ত্রীকে বিচ্ছেদ না করার বেলায় করা হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দ্বিতীয় দলিল : হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ تَقُوْلُ لِزَوْجِهَا اَطْعِمْنِىْ اَوْ طَلِّقْنِىْ

রাসূল (সা.) বলেন, মহিলা তার স্বামীকে বলবে, আমাকে খোরপোশ দাও কিংবা তালাক দাও। উক্ত হাদীস থেকেও বুঝায় যাচ্ছে যে, খোরপোশ প্রদানে অক্ষম স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ করবে।

আমাদের দলিল হল আল্লাহর বাণী :

وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, খোরপোশ ইহা এক প্রকার ঋণ, যা স্বামীর উপর আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু স্বামী অসচ্ছল হওয়ার কারণে এ ঋণ আদায় করতে পারছে না। এদিকে কুরআনের বিধান হল ঋনগ্রস্থ ব্যক্তি অসচ্ছল হয়ে গেলে ঋণ দাতা তাকে সুযোগ দিবে। সুতরাং এক্ষেত্রেও স্বামী তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে না। বরং স্বামীকে অবকাশ দেয়া হবে।

কেননা যদি বিচ্ছেদ করে দেয়া হয় তবে স্বামীর হক একেবারে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি বিচ্ছেদ না করা হয় তবে স্ত্রীর হক তথা নফকা পেতে বিলম্বিত হবে। সুতরাং এ দুটি ক্ষতি থেকে সহজ হচ্ছে স্ত্রীর বিলম্বে হলেও নফকা পাওয়ার বিষয়টি। তাছাড়া বিচ্ছেদ না করাতে স্ত্রীর তেমন কষ্ট হবে না কেননা, কাজী যখন স্ত্রীকে বলে দেবেন যে, তুমি স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণ করে তোমার প্রয়োজনীয় খরচা চালিয়ে যাও, বিধায় বিবাহ বিচ্ছেদের ফায়সালা প্রদান করা মোটেও ঠিক হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নফকা প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিকে লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তিবা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন তা কিয়াসের বিপরীত। কেননা, অসচ্ছলতা এবং লিঙ্গ কর্তিত, বা পুরুষত্বহীনতা মোটেও এক নয়, অসচ্ছলতার দরুন নফকা দিতে অক্ষমতা তা তো বিবাহের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং প্রাসঙ্গিক বিষয় আর কর্তিত লিঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা তা বিবাহের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কেননা, সে সন্তান সন্ততিও বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং মৌলিক বিষয়ে অক্ষমতার দরুন কাজী বিবাহ বিচ্ছেদের রায় দিতে পারেন। কিন্তু এ হুকুমের দরুন ইহা আবশ্যক নয় যে তিনি বিবাহের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অক্ষমতার দরুন বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন।

قوله : ثُمَّ نَفَقَةُ الْيَسَارِ الخ : স্বামী অসচ্ছল থাকা কালে যদি কাজী অসচ্ছলতার খোরপোশ তার স্ত্রীর জন্য ধার্য করে দেন অতঃপর স্বামী স্বচ্ছল হয়ে যায় আর স্ত্রী কাজীর নিকট স্বচ্ছলতার খোরপোশের দাবী উত্তাপন করে। তাহলে কাজী স্বচ্ছলতার খোরপোশের ফায়সালা করে দেবেন। আর ইহা এজন্য যে মানুষের অবস্থা সব সময় এক থাকে না, বরং পরিবর্তন হয়। সুতরাং পরিবর্তন হওয়ার সময় পূর্বের খোরপোশ বহাল থাকবে না। আর ইহাও বলা যাবে না যে, কাজীর পূর্বেকার ফায়সালা বাতিল করা হচ্ছে বরং নফকা এক সাথে ওয়াজিব হয় না বরং ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হতে থাকে। সুতরাং যা ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হয় তা পরিবর্তন হতে পারে। এজন্য স্বামীর

অবস্থার পরিবর্তনে স্ত্রী তার খোরপোশ ও ভরণ পোষণের পরিবর্তনের দাবি করতে পারে।

قوله : وَلَاتَجِبُ نَفَقَةٌ الخ : বিবাহের পর কিছুদিন এমন অতিবাহিত হল যে স্বামী স্ত্রীকে কোন খোরপোশ প্রদান করেনি অতঃপর স্ত্রী কিছুদিন পর কাজী সাহেবের নিকট তার খোরপোশের দাবী উত্তাপন করল তবে চলে যাওয়া দিলগুলোর খোরপোশ স্ত্রী প্রাপ্ত হবে না। তবে হা যদি প্রথমে কাজী সাহেব খোরপোশ নির্ধারিত করে দেন অথবা স্বামী-স্ত্রী নির্দিষ্ট কোন এক পরিমাণ খোরপোশের উপর একমত হয় তবে এখন স্ত্রীর দাবীর প্রেক্ষিতে কাজী সাহেব চলে যাওয়া দিনগুলোর খোরপোশ স্বামীর উপর আবশ্যক করে দেবেন।

দলিল হল : খোরপোশ স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে সৌজন্যমূলক দান। তা তো কোন কিছুর বিনিময়ে আবশ্যক হয়নি। এজন্য তা হুকুম গতভাবে দৃঢ় হয়নি। এজন্য পূর্বে উল্লেখ করা না হলে তা আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি পূর্বে কাজী সাহেব ধার্য করে দেন কিংবা স্বামী-স্ত্রী কোন এক পরিমাণের উপর একমত হয়ে যান কিন্তু স্বামী তা আদায় করে না তাহলে কাজী সাহেব বিগত দিনের খোরপোশের ঋণ স্বামীর উপর চাপিয়ে দিবেন তা পূর্বেই আবশ্যক হওয়ার দরুন। নতুন করে ধার্য করা হিসাবে নয়। কিন্তু মহর এর ব্যতিক্রম। কেননা, তা কাজীর মাধ্যমে ধার্য করানোর প্রয়োজন নেই। কেননা, তা তো আকদ এর বিনিময় তা আকদ এর সাথে সাথেই স্বামীর উপর আবশ্যক হয়ে যায়।

قوله : وَ بِمَوْتِ اَحَدِهِمَا الخ : স্বামীর উপর খোরপোশ ধার্য করা হল কিন্তু স্বামী তা আদায় করেনি, এমতাবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হল আবার কাজী সাহেব ও স্ত্রীকে স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণ করার নির্দেশ করেননি। এমতাবস্থায় যদি স্বামি মৃত্যুবরণ করে তবে স্বামীর উপর থেকে খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রীর উত্তরাধিকারীদের জন্য স্বামীর কাছ থেকে মৃত স্ত্রীর বিগত দিনের খোরপোশের দাবি করতে পারবে না। কেননা, খোরপোশ হচ্ছে সৌজন্যমূলক দান। আর এ ধরনের দান মৃত্যুর দ্বারা রহিত হয়ে যায়। যা হেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, কেহ হেবা করল বকরকে কোন বস্তু, কিন্তু বকর তা গ্রহণ করার পূর্বেই হেবাকারী বা বকর মৃত্যুবরণ করল। তবে এ হেবা বাতিল বলে গণ্য হবে। আলোচ্য মাসআলায় তদ্রূপ খোরপোশ গ্রহণ করার পূর্বে স্ত্রী বা স্বামী মৃত্যুবরণ করলে এ খোরপোশ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলে স্বামীর মৃত্যুতে খোরপোশ রহিত হবে না। তা অন্যান্য ঋণের মতো তা স্বামীর সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। তিনি বলেন, খোরপোশ ইহা সাধারণ দান নয়, বরং ইহা বিশেষ অংগের বিনিময় স্বরূপ। আমরা ইহার জবাব ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি। যে বিশেষ অঙ্গের বিনিময় হচ্ছে মহর। এক বিষয়ের বিনিময় একটিই হয় একাধিক হয় না। والله اعلم -

قوله : وَلَاتَرُدُّ الْمُعَجَّلَةَ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে অগ্রিম কিছু দিনের খোরপোশ দিয়ে দেয় অতঃপর স্বামী বা স্ত্রী ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্ত্রীর নিকট থেকে বা স্ত্রীর সম্পদ থেকে তা ফেরত নেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে অগ্রিম প্রদানকৃত নফকা থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে ততদিনের হিসাব করে বাকি দিনগুলোর নফকা ফেরত নিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হল, স্বামী স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখার বিনিময়ে খোরপোশ আবশ্যক হয়ে থাকে। সুতরাং স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে আবদ্ধতা উঠে গেল। তাই যে কারণের ভিত্তিতে স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্ত হয়েছে এ কারণের অনুপস্থিতিতে বিনিময় বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন বিচারক বায়তুলমাল থেকে অগ্রিম বেতন নেয়ার পর সে সময় পূর্ণ না হওয়ার পূর্বে বিচারকের মৃত্যু হলে বিচারকের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নেয়া হয়, তদ্রূপ এখানেও স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে অতিরিক্ত টাকা স্ত্রীর সম্পদ থেকে ফেরত নেয়া হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলিল হচ্ছে : খোরপোশ হচ্ছে স্বামীর পক্ষ

থেকে স্ত্রীকে সৌজন্য দান। আর এ দান অন্যান্য দানের ন্যায় স্ত্রীর তথা মা ওহাবা এর হাতে পৌঁছে গেছে যা পরিপূর্ণ মালিকানায় চলে এসেছে। সুতরাং অন্যান্য দান যেভাবে দান গ্রহণকারীর হাতে পৌঁছার পর তা ফেরতের কোন অবকাশ রাখে না তদ্রূপ উক্ত অগ্রিম দান স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে ফেরতের কোন অবকাশ রাখে না।

قوله : وَ يُبَاعُ الْقِنُّ الخ : যদি কোন গোলাম তার মনিবের অনুমতিক্রমে কোন স্বাধীন নারীকে বিবাহ করে, তবে এ গোলামের উপর খোরপোশ প্রদান করা ওয়াজিব হয়। আর এ খোরপোশ স্বামীর উপর ঋণ স্বরূপ থাকবে। সুতাং দাসের মনিব উক্ত দাসকে বিক্রি করে তার অর্থ দ্বারা দাসের উপর আপতিত ঋণ আদায় করতে পারবে। আর হ্যা যদি মনিব উক্ত দাসকে বিক্রি না করে তার পক্ষ থেকে আদায় করে ফেলে তবে তো দাসকে বিক্রি করার প্রয়োজন হবে না। কেননা, মনিবের অনুমতিক্রমে দাসের বিবাহ হওয়াতে বিবাহের মহর ও খোরপোশ ইত্যাদি মনিবের উপরই আপতিত হবে। মনিব যদি তা যে কোনভাবেই আদায় করে ফেলে তবে দাস বিক্রি করতে হবে না।

قوله : وَ نَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ الخ : যদি স্বাধীন কোন পুরুষ অন্যের দাসীকে বিবাহ করে আর দাসীর মনিব দাসীকে তার স্বামীর সাথে রাত যাপন করার অনুমতি দিয়ে দেয় তবে উক্ত দাসীর খোরপোশ স্বামীর উপর আবশ্যক হবে। তার কারণ হল, এখানে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে আবদ্ধ করা পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে মনিব যদি তার দাসীকে স্বামীর ঘরে রাত্র যাপন করতে না দেয় তাহলে স্বামীর উপর উক্ত স্ত্রীর খোরপোশ আবশ্যক হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে আবদ্ধতা পাওয়া যায়নি। অনুরূপ যদি মনিব প্রথমে দাসীকে তার স্বামীর ঘরে থাকার অনুমতি প্রদান করেন অতঃপর তা পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তবে স্বামীর উপর থেকে স্ত্রীর খোরপোশ রহিত হয়ে যাবে। তবে হা যদি স্ত্রী মাঝেমধ্যে মনিবের আদেশ ভিন্ন মনিবের খেদমত করে তবে স্বামীর উপর থেকে খোরপোশ রহিত হবে না।

وَالسُّكْنٰى فِي بَيْتٍ خَالٍ عَنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا وَلَهُمُ النَّظَرُ وَالْكَلَامُ مَعَهَا وَفُرِضَ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ وَطِفْلِهِ وَأَبَوَيْهِ فِي مَالٍ لَه عِنْدَ مَن يُقِرُّ بِهٖ وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَيُؤْخَذُ منها كَفِيلٌ وَلِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ لَا الْمَوْتِ وَ الْمَعْصِيَةِ -

---

অনুবাদ : (স্বামীর জিম্মায় আবশ্যক হল) এমন ঘরে (স্ত্রীর) বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যা স্বামীর পরিবার পরিজন এবং স্ত্রীর পরিবার-পরিজন থেকে মুক্ত। আর (স্ত্রীর পরিবার-পরিজন) তার সাথে দেখা করা বা কথা বলার অধিকার রয়েছে। অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর জন্য, অপ্রাপ্ত সন্তানের জন্য এবং মাতা-পিতার জন্য খোরপোশ ধার্য করা হবে তার এমন মাল থেকে যার কাছে তা আছে সে সম্পদ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্বীকার করে। (অনুপস্থিত ব্যক্তির সার্থের দিক বিবেচনা করে) স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন জামিন নির্ধারিত করা হবে। তালাকে ইদ্দত পালন কারীর জন্য নফকা ওয়াজিব। তবে (স্বামীর) মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারীর জন্য এবং নাফরমানীর দরুন বিচ্ছেদের দরুন নফকা প্রাপ্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَالسُّكْنٰى فِى بَيْتٍ الخ : স্বামীর উপর কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর খোরপোশের পাশাপাশি সতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া। যেখানে স্বামী বা স্ত্রীর অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন থাকবে না। কেননা, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর

মধ্য থেকে ইহাও একটি বিষয়। যা খোরপোশের ন্যায় স্বামীর উপর আবশ্যক। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত :

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم وَ اَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ -

'তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দাও যেখানে তোমরা থাক এবং তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা কর, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খোরপোশের সাথে বাসস্থানকে আবশ্যক করে দিয়েছেন তাই প্রতিয়মান হল যে, খোরপোশের সাথে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া স্বামীর উপর আবশ্যক। উক্ত বাসস্থান যেহেতু স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাপ্ত তাই স্বামী তার পরিবারের অন্য সদস্যকে এ বাসস্থানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। কেননা, এতে স্ত্রীর অনেক কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। যেমন তার সম্পদের নিরপত্তাহীনতা, স্বামীর সাথে তৃপ্তি সহকারে আমোদপ্রমোদ করতে না পারা। সহবাসের অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি নানা অসুবিধার সম্মুখিন হতে হবে। এজন্য স্ত্রীর বাসগৃহে স্বামীর অন্য কোন সদস্যকে সংযুক্ত করতে পারবে না। তবে হা যদি স্ত্রী সেচ্ছায় অন্য কোন সদস্যকে মেনে নেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। কেননা, এক্ষেত্রে সে নিজেই তার হক ছাড়তে সন্তুষ্ট। তদ্রূপ এ ঘরে স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন প্রবেশ করা বা বসবাস করা থেকে স্বামী বাধা প্রদান করতে পারবে। কেননা, এ ঘর যদিও স্ত্রীর বসবাসের জন্য ধার্য কিন্তু মূল মালিকানা স্বত্ব স্বামীর রয়েছে। তাই সে তার নিজ জায়গাতে অন্য কারো প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা করতে পারবে। তবে স্ত্রীর পিতা, মাতা বা মুহাররামাত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের ও কথাবার্তা বলার সুযোগ করে দিতে হবে। এতে বাধা প্রদানের অধিকার স্বামীর নেই। কেননা, এর দ্বারা আত্মীয়তা ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করা হারাম। এ ব্যাপারে হযরত যুবায়ের ইবনে মুতয়িম (রাযি.) থেকে বর্ণিত :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

'তিনি নবী করীম (সা.) কে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' অধিকন্তু স্ত্রী তার মাতা-পিতা বা অন্য কোন মাহরামাত এর সাথে কথা বলাতে স্বামীর কোন ক্ষতি নাই। কেহ কেহ বলেন, কথাবার্তার ন্যায় তাদের আসতেও বাধা দেয়া উচিত নয়। তবে হা দীর্ঘ দিন অবস্থান করা যা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয় এমন করা থেকে নিষেধ করতে পারে।

قوله : وَ فُرِضَ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ الخ : যদি কোন স্বামী সফরে চলে যায় আর তার কিছু সম্পদ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে যায় এবং উক্ত ব্যক্তির জিম্মায় যাদের ভরণ-পোষণ অপরিহার্য তাদেরকে খোরপোশ দিয়ে যায় নাই। তাহলে আমানতদার ব্যক্তি যদি আমানতের কথা স্বীকার করে এবং ঐ মহিলা আমানতদাতার স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে তাহলে কাজী সাহেব উক্ত সম্পদ থেকে স্ত্রী সন্তানাদি মাতা পিতাদের খোরপোশ এর ফায়সালা করে দেবেন। এমনিভাবে যদি আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি আমানতের কথার অস্বীকার করে কিন্তু কাজী সাহেবের জানা থাকে তাহলে কাজী সাহেব স্ত্রীগংদের খোরপোশের ফায়সা করে দেবেন। কেননা, যার কাছে আমানত রাখা হল সে যখন উক্ত ব্যক্তির সম্পদ এবং তার স্ত্রী হওয়া উভয়টির স্বীকার করল তখন সে যেন একথারও স্বীকৃতি দিল যে এ স্ত্রী তার কাছে গচ্ছিত মাল থেকে খোরপোশ নেয়ার অধিকার রাখে। আর ত এভাবে যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া যদি তার প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে নেয় তবে তা জায়েজ। আর তার প্রমাণ হল হুজুর (সা.) হযরত হিন্দা (রাযি.) এর প্রয়োজন অনুযায়ী তার স্বামী হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)-এর সম্পদ থেকে নিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে :

خُذِىْ مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

তোমার প্রয়োজন এবং সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বামীর সম্পদ থেকে নিয়ে নাও।

قوله : وَ يُؤْخَذُ كَفِيْلٌ الخ : অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার স্ত্রীর খোরপোশ ও ভরণপোষণের ফায়সালা করার পূর্বে কাজী সাহেব স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন জামিন গ্রহণ করবেন। যদি এ স্ত্রী খোরপোশের হকদার না হয় তবে উক্ত জিম্মাদার ব্যক্তি স্বামীর সম্পদ তার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। ইমাম শারখসী (রহ.) এর মতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে জামিন নেয়া ভাল। ইমাম সদরুস শহীদ (রহ.) বলেন, অনুপস্থিত স্বামীর স্বার্থের দিক বিবেচনা করে স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন জামিন নির্ধারণ করা জায়েয। উল্লেখ্য যে, কাজী সাহেব স্ত্রীর খোরপোশের ফায়সালা দেয়ার পূর্বে স্ত্রী থেকে শপথ নিবেন যে তার স্বামী তাকে কোন খোরপোশ দিয়ে যায়নি। কেননা, হতে পারে কখনো তার স্বামী তাকে খোরপোশ দিয়ে গেছে। কিন্তু সে তা গোপন করে অতিরিক্ত নিতে চাচ্ছে। তাই আমরা বলি যে, কাজী সাহেব স্ত্রীর নিকট থেকে শপথ নিবেন এবং একজন জিম্মাদার নিবেন।

قوله : وَ لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ الخ : রেজঈ বা বায়েন তালাক প্রাপ্তা ইদ্দতপালনকালীন সময়ে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী স্বামী থেকে খোরপোশ ও ভরণপোষণ পাওয়ার দাবী রাখে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যে স্ত্রী লোক তালাকে রাজঈ ভিন্ন অন্য তালাকের পর ইদ্দত পালনরত হয় সে স্বামী থেকে খোরপোশ, ভরণ-পোষণ প্রাপ্ত হবে না। ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে যদি উক্ত ইদ্দত পালনকারিণী গর্ভধারিণী হয়। অথবা রেজঈ তালাকের পর ইদ্দত পালনকারিণী হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে খোরপোশ প্রাপ্ত হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিল : হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমাকে আমার স্বামী তিন তালাক প্রদান করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমার জন্য খোরপোশের ফায়সালা করেননি।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর অধিনে থাকে না। অথচ খোরপোশ স্বত্বাধিকারের বিনিময়ে হয়ে থাকে। তাই বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর স্বত্বাধিকারের অন্তর্ভুক্তই থাকে না। তাই সে খোরপোশও পাবে না। এজন্যই তো মৃত স্বামীর স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থা খোরপোশ প্রাপ্ত হয় না।

আমাদের দলিল : উক্ত অধ্যায়ের সূচনাতেই বলা হয়েছে, স্বামীর উপর স্ত্রীর খোরপোশ মৌলিকভাবে ওয়াজিব হয় স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখার জন্য। আর সন্তানের বিষয় লক্ষ করে তালাকের পরও এ আবদ্ধতা ইদ্দত পালন পর্যন্ত রয়েছে। সুতরাং আবদ্ধতা পাওয়ার কারণে স্ত্রীকে খোরপোশ ও ভরণপোষণ দিতে হবে। তাই ইদ্দত পালনরত গর্ভবতী ও গর্ভহীন উভয়ই এক হয়ে গেল। অর্থাৎ, উভয়ের জন্য ইদ্দত পালনরত অবস্থায় খোরপোশ আবশ্যক। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিলের জবাব হচ্ছে হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযি.) এর হাদীসকে হযরত উমর (রাযি.) রদ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

لَانَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ اِمْرَاَةٍ لَانَدْرِىْ صَدَقَتْ اَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلٰثِ النَّفَقَةُ وَ السُّكْنٰى مَا دَامَتْ فِى الْعِدَّةِ -

আমরা আমাদের প্রভুর কিতাব এবং নবীর সুন্নাত একজন মহিলার কথার দ্বারা ত্যাগ করতে পারি না। জানি না সে নারী সত্য বলেছে মিথ্যা বলেছে। স্বরণ রেখেছে না কি ভুলে গেছে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী খোরপোশ ও বাসস্থান পাবে, যতদিন সে ইদ্দতের মধ্যে থাকবে।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রযি.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাযি.) ও ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে রদ করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী থেকে খোরপোশ ও ভরণপোষণ পাওয়ার হকদার।

قوله : لَا الْمَوْتِ الخ : স্বামীর মৃত্যুবরণ পরবর্তী ইদ্দতপালনকারী স্ত্রী খোরপোশ ও বাসস্থান প্রাপ্ত হবে না। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে অনুরূপ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) থেকে এরূপ একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অন্য রেওয়ায়েত হচ্ছে স্ত্রী বাসস্থান প্রাপ্ত হবে এবং স্বামীর সম্পদ খুব বেশি হলে স্ত্রীর মিরাস থেকে তাকে নফকা প্রদান করা হবে। আর যদি স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ কম হয় তবে সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে স্ত্রীর খোরপোশের ব্যবস্থা করা হবে।

স্ত্রী খোরপোশ ও বাসস্থান না পাওয়ার দলিল হচ্ছে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ থেকে বিরত থাকার করণ স্বামীর আবদ্ধতা বা স্বামীর হক হিসাবে নয়, বরং শরীয়াতের হক হিসাবে। এজন্যই তো স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েজ দ্বারা ধার্য করা হয়নি, বরং চার মাস দশদিন দ্বারা ধার্য করা হয়েছে। এমনকি যদি কোন মহিলার চার মাস দশদিনে মাত্র এক হায়েজ অতিক্রান্ত হয় তবুও তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং এ ইদ্দত পালন করা অবস্থায় স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খোরপোশের ব্যবস্থা করা হবে না।

দ্বিতীয় দলিল : খোরপোশ এক সাথে এক মাসের বা এক বৎসরের বা পূর্ণ জীবনের আবশ্যক হয় না, বরং পালাক্রমে বার বার ওয়াজিব হয়। এদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর তার মালে কোন মালিকানা নেই। বরং এ মালের মালিক হয় তার ওয়ারিছগণ। সুতরাং ওয়ারিশদের সাথে স্ত্রীর খোরপোশের ব্যবস্থা করার বিধান কোথাও বিদ্যমান নেই। এজন্য স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্ত হবে না।

قوله : وَ الْمَعْصِيَّةِ الخ : স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন রূপ অন্যায়ের কারণে যদি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় এবং সে ইদ্দত পালনরত হয় তাহলে সে খোরপোশ পাবে না। কেননা, সে না হকভাবে নিজেকে ইদ্দতে আবদ্ধ করেছে। সুতরাং সে অবাধ্য স্ত্রীর ন্যায় হয়ে গেল। তবে হা এ মহিলা বাসস্থান প্রাপ্ত হবে। কেননা, ইদ্দতরত মহিলার জন্য আবশ্যক হল ঘরেই অবস্থান করা। সুতরাং মহিলার অন্যায়ের কারণে বাসস্থান রহিত হবে না।

وَرِدَّتُهَا بَعْدَ الْبَتِّ تُسْقِطُ نَفَقَتَهَا لَا تَمْكِينُ ابْنِهِ وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَلَا تُجْبَرُ أُمُّهُ لِتُرْضِعَ وَيَسْتَأْجِرُ مَن تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا لَا أُمَّهُ لو مَنْكُوحَةً أو مُعْتَدَّةً وَهِيَ أَحَقُّ بَعْدَهَا ما لم تَطْلُبْ زِيَادَةً وَلِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ لو فُقَرَاءَ وَلَا تَجِبُ مع اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوِلَادِ -

---

অনুবাদ : তালাকে বায়েনার পর স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যাওয়া নফকাকে রহিত করে। তবে স্বামীর ছেলেকে সম্ভোগ সুযোগ দানে রহিত হয় না। দরিদ্র নাবালক সন্তানের খোরপোশ-ভরণপোষণ প্রাপ্য। মাতাকে (সন্তানের দুধ পানের উপর বাধ্যবাধকতা করা যাবে না। পিতা এমন কোন স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, যে শিশুকে মায়ের কাছে রেখে স্তন্যদান করবে। তবে সন্তানের মাতাকে যদি সে বিবাহিতা হয় কিংবা ইদ্দতপালনরত অবস্থায় হয় তবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করতে পারবে না। আর মাতা ইদ্দতের পর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানের হকদার হবে যতক্ষণ পর্যন্ত অধিক পারিশ্রমিক চাইবে না। নফকা পিতা-মাতা, দাদা-দাদির জন্য প্রাপ্য, যদি তারা দরিদ্র হয়ে থাকেন। বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ভিন্ন ধর্মের

বৈপরিত্যে নফকা ওয়াজিব হবে না। (অর্থাৎ, স্ত্রী, পিতা, মাতা, দাদা, দাদি মুসলমান না হলেও তাদের খোরপোশ ও ভরণপোষণ প্রদান করা ব্যক্তির উপর অপরিহার্য)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَرِدَّتُهَا بَعْدَ الْبَتِّ الخ : স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মুরতাদ্দাহ হয়ে গেলে (العياذ بالله) স্বামী থেকে নফকাপ্রাপ্তা হবে না। কিন্তু যদি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত পালনরত অবস্থায় স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলেকে সম্ভোগ সুযোগ দান করে তবে সে নফকা প্রাপ্ত হবে।

এ দু' মাসয়ালায় পার্থক্য উভয় সুরতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে স্বামী কর্তৃক তালাকের মাধ্যমে তাই সে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় খোরপোশ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু পরক্ষণে মুরতাদ্দাহ হয়ে গেলে নফকা প্রাপ্ত হবে না। কেননা, তখন তাকে বন্দী করা হবে তাওবা করার জন্য। আর বন্দিনীর জন্য স্বামী কর্তৃক খোরপোশ রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে স্বামীর ছেলেকে সম্ভোগ সুযোগ দানের কারণে তাকে বন্দী করা হয় না বিধায় খোরপোশের বিধান রহিত হবে না।

قوله : وَ لِطِفْلِهِ الْفَقِيْرِ الخ : নাবালক সন্তানের খোরপোশের দায়িত্ব পিতার উপর। তার নফকা প্রদানে পিতার সাথে আর কেহ শরীক নয়। যেভাবে স্ত্রীর খোরপোশ একমাত্র স্বামীর উপরই ওয়াজিব। দলিল : আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা : وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ অর্থাৎ, এ মহিলাদের খোরপোশ যার জন্য সন্তান তার জন্য আবশ্যক হবে। আর আয়াতে مولود له দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াত দ্বারা এভাবে প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, স্বামীর উপর সন্তানের দরুন স্ত্রীদের খোরপোশ আবশ্যক হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তানের খোরপোশ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্ত্রী সন্তানের খোরপোশ প্রদানে সন্তানের পিতা এবং স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ শরীক নয়। কেননা, স্ত্রী সন্তান অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করে না। অর্থাৎ, একই সময়ই দুজনের স্ত্রী হতে পারে না। তদ্রূপ সন্তানের দু পিতাও হতে পারে না। ঠিক তেমনি তাদের জন্য যে খোরপোশ ওয়াজিব হবে তাও অংশিদারিত্বকে গ্রহণ করে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, সন্তানের খোরপোশ মিরাস হিসাবে দুই তৃতীয়াংশ পিতার উপর তার এক তৃতীয়াংশ মায়ের উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন নাবালক সন্তান যদি দরিদ্র হয় তবে তার খোরপোশ দিতে পিতাকে বাধ্য করা হবে। সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। আর সাবালক সন্তান যদি দরিদ্র হয় তাহলে কন্যা সন্তানের খোরপোশের জন্য পিতাকে বাধ্য করা হবে। পুত্র সন্তানের খোরপোশের জন্য নয়। তবে সাবালক পুত্র সন্তান যদি প্রতিবন্দী হয়। যেমন অন্ধ বা খোড়া, অবশ ইত্যাদি তাহলে তার খোরপোশের জন্যও পিতাকে বাধ্য করা হবে।

قوله : وَ لَاتُجْبَرُ أُمُّهُ الخ : দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানের দুধের ব্যবস্থা করা পিতার উপর ওয়াজিব। কেননা, ইহা তার খোরপোশের অন্তর্ভুক্ত আর আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সন্তানের খোরপোশ, ভরণপোষণ পিতার উপরই আবশ্যক। সুতরাং মাতাকে সন্তানের দুগ্ধ পান করানোর ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেন—

وَلَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهٖ কোন মাকে সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। অর্থাৎ, সন্তানকে ঘিরে মাতা-পিতাকে কোনরূপ ঝগড়া ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না। বরং মাতার যদি কোনরূপে অসুবিধা না থাকে তবে সন্তানকে দুগ্ধপান করাবে। ইহা বৈবাহিক কারণে শরীয়াতের পক্ষ থেকে তার উপর দায়িত্ব। তবে হা ইহা আদালতগত আইনের কথা নয়। বিবাহ বন্ধন থাকাকালিন পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। আর যদি সে তালাক পরবর্তী ইদ্দত শেষ করে পেলে তবে দুগ্ধপান করানোর জন্য বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে।

আর যদি সে দুগ্ধ পান করাতে অস্বীকার করে তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না। হা যদি সন্তান অন্য কোন মহিলার দুগ্ধপান করতে চায় না তবে তাকে বাধ্য করা হবে। আর যদি মাতা আগ্রহী থাকে সন্তানের দুগ্ধ পান করাতে আর তার দুগ্ধে কোনরূপ জিবানু না থাকে তবে পিতার জন্য উক্ত সন্তানের মাতাকে দুগ্ধ পান করানো থেকে বাধা প্রদান করা জায়েয নয়।

قوله : وَ يَسْتَاجِرُ الخ : আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, শিশু সন্তানের খোরপোশ পিতার উপরই ওয়াজিব। সুতরাং পিতা বিনিময়ের ভিত্তিতে কোন স্ত্রীলোককে তার সন্তানের দুগ্ধ পান করানোর দায়িত্ব প্রদান করবে। কেননা, ইহা পিতার দায়িত্ব। তবে হা সন্তানকে তার মাতার নিকট রেখে দুগ্ধ পান করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, সন্তান লালন-পালনের অধিক হক মার জন্য। যদি দুগ্ধ পান করানোর জন্য সন্তানকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয় তবে সন্তানের মাতার অধিকার খর্ব করা হল। সুতরাং মা যদি চায় তার নিকট রাখা হোক তবে পিতা সন্তানকে তার মাতার নিকট রেখে তার খোরপোশের ব্যবস্থা করতে হবে।

قوله : لَا أُمَّهُ الخ : সন্তানের মাতা সন্তানের পিতার স্ত্রী থাকাকালিন বা ইদ্দত পালনরত থাকা কালিন সময়ে সন্তানকে দুগ্ধপান করায় তবে তাকে বিনিময় প্রদান করা বা সে বিনিময় গ্রহণ করা কোনটিই জায়েজ নয়। কেননা, সন্তানকে দুগ্ধ পান করানো মায়ের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন :

وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

মা তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করাবে। يتربص ন্যায় يرضعن শব্দকে আবশ্যকীয়তার অর্থে ধরা হয়ে থাকে। আর মাকে মাজুর ধরা হয় যখন অপারগতা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং যখন দেখা যাবে সে বিনিময়ে দুগ্ধ পান করাতে সক্ষম তখন তার থেকে অক্ষমতা চলে যায় বিধায় সে এখন থেকে দুগ্ধ পান করাবে তবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্ত্রীলোক খোঁজে আর সন্তানের মা সচরাচর অন্যান্য মহিলার ন্যায় পারিশ্রমিক দাবি করে তবে স্বামীর জন্য সন্তানের মাকে বাদ দিয়ে অন্য মহিলাকে নিয়োগ দেয়া জায়েয নয়। কেননা সন্তানের প্রতি মায়ের অধিক মমতা, ভালবাসা বিদ্যমান। সুতরাং তার কাছে সন্তানকে প্রদান করা সন্তানের প্রতি অধিক কল্যাণকামিতা হবে। তবে হা অন্যান্য মহিলা থেকে যদি মাতা অধিক বিনিময় দাবী করে তবে সে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে না। কেননা, এতে পিতা আর্থিক ক্ষতি রয়েছে। অথচ কুরআনের বাণী হচ্ছে :

وَ لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَامَوْلُوْدٌ لَهٗ بِوَلَدِهٖ

'সন্তানের কারণে মাকে কষ্ট দেয়া হবে না, এবং পিতাকেও তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া হবে না।' সুতরাং এমতাবস্থায় পিতা অন্য মহিলাকে সন্তানের দুগ্ধ পানের জন্য নির্ধারণ করবে। যে মহিলা এ সন্তানকে তার মাতার নিকট রেখে দুগ্ধ পান করাবে।

قوله : وَ لِأَبَوَيْهِ الخ : ব্যক্তির উপর ওয়াজিব তার দরিদ্র পিতা, মাতা, দাদা, দাদির খোরপোশ প্রদান করা। যদি তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হন। দলিল হল :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ -

যদি তারা দুজন তোমাকে বাধ্য করে এমন কাউকে আমার সাথে শরীক করতে যার পক্ষে কোন দলিল নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। আর দুনিয়াতে সদাচারের সাথে তাদের সাহচর্য রক্ষা কর। আর যারা আমার দিকে ধাবিত তাদের পথ অনুসরণ কর।

উক্ত আয়াতখানা হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাযি.) এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সা'দ (রাযি.) মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সা'দ (রাযি.) এর মাতা ছিলেন কাফেরা। সা'দ (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করলে তার মাতা পানাহার বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হযরত সা'দ (রাযি.) এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে সন্তানাদিগণ মাতা-পিতার অনুসরণ করবে না। তবে দুনিয়াবী বিষয়াদিতে তাদের সাথে সদভাব বজায় রেখে চলাফেরা করবে। আর উক্ত সদাচার এর ভেতরই হচ্ছে মাতা-পিতাকে ভরণ পোষণ দেয়া। কেননা, তুমি থাকবে মহান প্রভুর নিয়ামতরাজির মধ্যে আর তোমার মাতা-পিতা, দাদা-দাদি না খেয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আর পিতা মাতা কাফের হলেও যখন তাদের ভরণপোষণ সন্তানের উপর ওয়াজিব। সুতরাং তারা যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তবে তো তাদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, পিতা-মাতা, দাদা-দাদি দরিদ্র হলে সন্তানের উপর ওয়াজিব হয় তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া কোরআনের আয়াত ولاتقل لهما اف, এবং তাদেরকে উফ শব্দও বলতে দিও না। উক্ত আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর প্রয়োজনের সময় তাদের প্রয়োজন পূর্ণ না করা তথা নফকা প্রদান না করা তাদের কষ্ট দেয়ার শামিল। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার পিতা-মাতা, দাদা-দাদিদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব। আর উক্ত আয়াত যেহেতু নিঃশর্ত তাই পিতা-মাতা ভিন্ন ধর্মালম্বী হওয়ার পরও তাদেরকে খোরপোশ-ভরণপোষণ প্রদান করা ওয়াজিব। তাছাড়া হুযুর (সা.) এরশাদ করেন :

اِنَّ اَطْيَبَ مَالِ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهٖ وَ اِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلَادِهِمْ

মানুষের সর্বোত্তম খানা হল নিজ উপার্জিত খানা। আর তার সন্তান ও তার উপার্জন। সুতরাং সন্তানের উপার্জন থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। উক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা সন্তানের পক্ষ থেকে খোরপোশ প্রাপ্ত হবে।

তবে হা যদি পিতা-মাতা দারুল হরবের বাসিন্দা হয় এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তবে এমতাবস্থায় সন্তানের উপর তাদের ভরণ-পোষণ করা ওয়াজিব নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন—

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে।'

সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যুদ্ধবাজদের সাথে সদাচরণ করা হবে না। তবে হা যে কাফের যুদ্ধবাজ নয়, তাদের সাথে সদাচরণ করা হবে। সুতরাং পিতা-মাতা যদি যুদ্ধবাজ না হয় তবে তাদের সন্তানাদির উপর তাদের ভরণ-পোষণ করা কর্তব্য।

قوله : وَلَاتَجِبُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ الخ : ধর্ম ভিন্ন হওয়ার দরুন শুধু স্ত্রী, সন্তানাদি, পিতা-মাতা, দাদা-দাদির ভরণপোষণ ওয়াজিব হয়। অন্য কারো ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না। স্ত্রী ধর্ম ভিন্ন হওয়ার পরও তার খোরপোশ ওয়াজিব হয়। কেননা, আকদে নিকাহ এর কারণে সে তার নিজেকে স্বামীর অধিনে আবদ্ধ রেখেছে। তাই সে স্বামী থেকে খোরপোশ প্রাপ্ত হবে।

আর স্ত্রী ছাড়া পিতা-মাতা, সন্তানাদিদের খোরপোশ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল তাদের সাথে ব্যক্তির দেহের সম্পর্ক তথা রক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। আর মানুষের অংশ তার সত্তারই সমার্থক। সুতরাং কোন ব্যক্তি কাফের হওয়ার কারণে যেভাবে তার নিজের ভরণপোষণ রহিত হয়নি তেমনি তার অংশ বা আসল এর খোরপোষ তার থেকে রহিত হয়নি।

وَلَا يُشَارِكُ الْأَبَ وَالْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ أَحَدٌ وَلِقَرِيبٍ مَحْرَمٍ فَقِيرٍ عَاجِزٍ عن الْكَسْبِ بِقَدْرِ الْإِرْثِ لو مُوسِرًا وَصَحَّ بَيْعُ عَرْضِ ابْنِهِ لَا عِقَارِهِ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ أَنْفَقَ مُودَعُهُ على أَبَوَيْهِ بِلَا أَمْرٍ ضَمِنَ وَلَوْ أَنْفَقَا ما عِنْدَهُمَا لَا وَلَوْ قَضَى بِنَفَقَةِ الْوِلَادِ وَالْقَرِيبِ وَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي بِالْاِسْتِدَانَةِ وَلِمَمْلُوكِهِ فَإِنْ أَبَى فَفِي كَسْبِهِ وَإِلَّا أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ -

অনুবাদ : পিতা, মাতা ও ছেলের ভরণপোষণে পিতা ও ছেলে ভিন্ন আর কেহ শরীক নয়। নিকটাত্মীয় উপার্জনে অক্ষম দরিদ্র হলে মিরাস অনুপাতে নফকা প্রাপ্ত হবে যদি নফকা প্রদান কারী স্বচ্ছল হয়। পিতা তার ভরণ-পোষণের (প্রয়োজনে) ছেলের মাল-সামান বিক্রি করা সহিহ। তবে তার জমি বিক্রয় করা সহিহ নয়। যদি অনুমতি ছাড়া মু'দা (আমানত গ্রহীতা) মু'দি (আমানতকারী)-এর মাতা-পিতার উপর তা (আমানতের সম্পদ) ব্যয় করে তবে সে (মু'দা) জামিন (তথা ক্ষতিপূরণ দিতে) হবে। আর যদি পিতা-মাতা তাদের হস্তে মজুদ (সন্তানের মাল) খরচ করে তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি কাজী কর্তৃক পিতা-মাতা সন্তানাদির নফকা নির্ধারণ করা হয় অতঃপর কিছুকাল অতিবাহিত করা হয়। তবে তা রহিত হয়ে যাবে। তবে যদি কাজি (ঐ অবর্তমান ব্যক্তির নামে) ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে থাকেন, (তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে তা রহিত হবে না)। মনিবের দাস দাসীর জন্য (মনিব কর্তৃক) খোরপোশ ওয়াজিব হবে। যদি মনিব খোরপোশ দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের উপার্জন থেকে খোরপোশ গ্রহণ করবে। নতুবা (যদি উপার্জনক্ষম হয়) তবে মনিবকে দাস বিক্রির হুকুম প্রদান করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

পিতা, মাতা দরিদ্র হলে এবং তাদের সন্তান স্বচ্ছল হলে সন্তানের উপর তার মাতা, পিতার ভরণপোষণ ওয়াজিব। সন্তানের সাথে অন্য কেহ শরীক হবে না। কেননা, সন্তানের সম্পদে তাদেরকে স্বচ্ছল গণ্য করা হয় সুতরাং স্বচ্ছল ব্যক্তির খোরপোশ অন্যের উপর ওয়াজিব হয় না। কেননা, হাদীসে এসেছে أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য'। উক্ত হাদীসে সন্তানের সম্পদের বেলায় এমন কথা বলা হলেও অন্যের ক্ষেত্রে এরূপ বলা হয়নি। তাছাড়া ভরণপোষণ ইহা হাদিয়া উপঢৌকন মূলক তা সাধারণভাবে ওয়াজিব হয় না, বরং নৈকট্যের কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং সন্তান পিতা-মাতার অধিক নিকটতম বিধায় তাদের উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে সমান। কেননা ভরপোষণের কারণ দুজনের ক্ষেত্রে সমভাবে বিদ্যমান। শাসসুল আইম্মাহ সারখসী (রহ.) পিতার ভরণপোষণকে মিরাসের সাথে তুলনা করে কুরআনের আয়াত وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 'পুরুষ মেয়ের দ্বিগুণ পাবে।' এ বর্ণিত নীতি অবলম্বন করে বলেন, পিতার ভরণপোষণ ছেলে মেয়ের মাঝে তিনভাগে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ, দুই ভাগ হবে ছেলের উপর আর একভাগ মেয়ের উপর ধার্য করা হবে।

قوله : وَلِقَرِيبٍ مَحْرَمٍ الخ : মাহরাম আত্মীয় দরিদ্র উপার্জনে অক্ষম হয় তবে তাদেরকে তাদের মিরাস অনুপাতে ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব সচ্ছল ব্যক্তির উপর। মাহরাম আত্মীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল যার সাথে

চিরতরের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। সুতরাং খোরপোষ পেতে হলে আত্মীয় মাহরাম ও নিকটতম হওয়া আবশ্যক। যদি শুধু কোন একটি পাওয়া যায় তবে নফকাকে আবশ্যক করতে প্রতিবন্ধক হবে। যেমন শুধু আত্মীয় যেমন চাচাতো ভাই অথবা শুধু মাহরাম হয় যেমন দুধ ভাই, কিংবা মাহরাম ও আত্মীয় তবে নিকটতম পাওয়া না যায় যেমন চাচাতো ভাই সে আবার ব্যক্তির দুধ ভাই। উল্লিখিত কাহারো জন্য খোরপোষ ওয়াজিব হবে না। আর মাহরাম নিকটাত্মীয় দরিদ্র উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তির জন্য খোরপোষ ওয়াজিব। কেননা, নিকটাত্মীয় তা ইহসান ও অনুগ্রহকে আবশ্যক করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ওয়ারিসদের জন্য অনুরূপ আবশ্যক। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) এর বর্ণনায় রয়েছে وَعَلَى الْوَارِثِ ذِى الرَّحِمِ الْمُحْرِمِ مِثْلُ ذٰلِكَ প্রত্যেক এমন ওয়ারিশদের যার সাথে সর্ব সময় বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাদের উপর অনুরূপ রয়েছে। দ্বিতীয়ত উক্ত নিকটাত্মীয়গণ খোরপোশ পেতে হলে দরিদ্র এবং উপার্জনে অক্ষম হতে হবে। যদি তারা উপার্জনে সক্ষম হয় তবে তাদের উপার্জন দ্বারা তাদের খরচা চালাবে। তবে হ্যাঁ, পিতা, মাতা যদিও উপার্জনে সক্ষম হয় তবুও সন্তানের উপর তাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। কেননা, তাদেরকে যদি উপার্জন করতে হয় তবে তাদের কষ্ট হবে অথচ তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

قوله : لَوْ مُوْسِرًا الخ : (ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, মাতা, পিতা, দাদা, দাদি ব্যতীত) অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ভরণপোষণ দরিদ্র ব্যক্তির উপর আবশ্যক নয়, বরং সচ্ছল হলে তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, যে নিজেই দরিদ্র তাই সে অন্যের মুখাপেক্ষী, এমতাবস্থায় তার উপর কিভাবে অন্যের নফকা আবশ্যক হবে। তবে এমতাবস্থায় স্ত্রী সন্তানের নফকা তার উপর আবশ্যক হবে। কেননা, সে তা নিজের উপর নিজে আবশ্যক করেছে।

উল্লেখ্য যে, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার পরিমাণ নিয়ে হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সচ্ছলতার পরিমাণ হলো নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া। অর্থাৎ, যার কাছে নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে সে সচ্ছল। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যার নিকট নিজের পরিবারের এক মাসের ভরণপোষণ পরিমাণ মালের পর আরো কিছু অবিশষ্ট থাকবে সে সচ্ছল। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে তা হল দৈনন্দিন উপার্জন থেকে ভরণপোষণের পর কিছু অবশিষ্ট থাকে সে সচ্ছল।

قوله : وَصَحَّ بَيْعُ عَرَضِ اِبْنِهِ الخ : ইসতিহসানের দাবি অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে নিরুদ্দিষ্ট ছেলের সম্পদ বিক্রি করে নিজের খোরপোষের জন্য ব্যয় করা জায়েজ। তবে সন্তানের স্থাবর সম্পত্তি তথা ঘর-জমি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। আর কিয়াসের দাবী অনুযায়ী সাহাবাইন (রহ.) এর মতে নিরুদ্দিষ্ট ছেলের সম্পত্তি বিক্রি করা পিতার জন্য জায়েয নয়। তাদের দলীল হল : প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মালে পিতার কর্তৃত্ব নেই। এজন্য সর্বসম্মতিক্রমে খোরপোশ ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনে পিতা তার সন্তানের মাল বিক্রি করতে পারে না। ছেলের উপস্থিতিতেও এবং অনুপস্থিতিতেও বিক্রি করতে পারে না। ঠিক তেমনি খোরপোশের জন্য সন্তানের মাল বিক্রি করতে পারবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে পিতা তার নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের সম্পদ সংরক্ষণ করার অধিকার রাখে। এজন্যই তো অসী অধিকার রাখেন যে সে নিরুদ্দিষ্ট সাবালক ওয়ারিশের সম্পদ বিক্রি করে দেবেন। তাহলে সংরক্ষণের অসীর যদি বিক্রি করার অধিকার হাসিল হয় তবে পিতা তার নিরুদ্দিষ্ট সাবালক ছেলের সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন। কেননা, অসীর তুলনায় পিতার দয়া অনেক বেশি। তবে হ্যা স্থাবর সম্পদ এমন নয়। কেননা, স্থাবর সম্পদ তা নিজেই সংরক্ষিত। তাই পিতার স্থাবর সম্পদ বিক্রি করার অধিকারী নেই।

আর পিতা ছাড়া আর কেহ বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, তাদের জন্য তাদের ছেলে নাবালক থাকা অবস্থায়ও সে অধিকার অর্জিত হয়নি, বিধায় সাবালক হওয়ার পর তা বিক্রি করার অধিকারী হবে না। সুতরাং পিতার যেহেতু অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষমতা অর্জিত হল। তখন তিনি তা বিক্রি করে তার নিজের খোর-

পোশ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হবে।

قوله : وَ لَوْ اَنْفَقَ مُوْدَعُهُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তার সম্পদ রেখে যায় আর উক্ত আমানত গ্রহীতার কাজীর অনুমোদন ছাড়া মালের মালিকের পিতা মাতার খোরপোশ দিয়ে দেয় তবে ক্ষতিপূরণ তাকেই বহন করতে হবে এবং তার দানকে সাধারণ দান হিসাবেই গণ্য করা হবে। কেননা সেতো শুধু সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষমতা পেয়ে ছিল। কিন্তু সে অতিরিক্ত প্রয়োগ করেছে। বিধায় তাকেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। তবে হা যদি কাজীর অনুমতিক্রমে ব্যয় করে থাকে তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, কাজির হুকুম মান্য করা তার জন্য আবশ্যকীয়। উল্লেখ্য যে, সে জরিমানার অর্থ মালের মালিকের পিতা-মাতা থেকে পুনরায় উসুল করতে পারবে না।

قوله : وَ لَوْ اَنْفَقَا الخ : সন্তানের মাল যদি মাতা-পিতার নিকট যায় আর পিতা মাতা দরিদ্র হয়ে থাকেন, তবে অনুমতি ছাড়াই মাতা-পিতা ঐ মাল তাদের ভরণপোষণে ব্যবহার করতে পারবেন। তাদের উপর পরবর্তীতে কোনরূপ জরিমানা বা ক্ষতিপুরুণ আবশ্যক হবে না। কেননা, তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন।

قوله : فَلَوْ قَضٰى بِنَفَقَةٍ الخ : যদি কাজি কোন ব্যক্তির উপর তার সন্তানাদি, মাতা-পিতা, নিটক আত্মীয়দের ভরণপোষণ ধার্য করেন অতঃপর নাফকা না দেয়া অবস্থায় একটি কাল অতিক্রম করে তবে অতিবাহিত সময়ের ভরণপোষণ আর প্রদান করতে হবে না। কেননা, এসব লোকের ভরণপোষণ প্রয়োজনের তাগিদে ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং তারা যদি সচ্ছল হয়ে থাকেন তবে তাদের ভরণপোষণ কারো উপর ওয়াজিব হয় না। এখন যেহেতু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তারাও প্রয়োজন পূর্ণ করেছে তাই অতিবাহিত হওয়া কালের নাফকা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু স্ত্রীর বিষয় এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ, কাজি যদি স্ত্রীর নাফকা নির্ধারণ করে দেন এমতাবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হয় আর স্বামী তা আদায় করে না, তবে তা পরবর্তীতে তা ঋণের ন্যায় আদায় করতে হবে। কেননা, স্ত্রীর নাফকা ইহা একটি ঋণ আর ঋণ সময় অতিবাহিত হওয়া দ্বারা রহিত হয় না। এজন্যই তো স্ত্রী সচ্ছল হলেও স্বামী তাকে খোরপোষ, ভরণপোষণ, বাসস্থান সব দেয়া ওয়াজিব। আর যদি আলোচিত নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে কাজী নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে ঋণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সময় অতিবাহিত হওয়া দ্বারা নফকা রহিত হবে না। কেননা, কাজীর ব্যাপক কর্তৃত্বের অধিকার রয়েছে। সুতরাং কাজীর নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যেন সে নিজেই অনুমতি দিল। এজন্য এ ঋণ তাকেই পরিশোধ করতে হবে। বিধায় সময় অতিবাহিত হলেও তা রহিত হবে না।

قوله : وَ لِمَمْلُوْكِهِ الخ : মনিবের উপর আবশ্যক তার দাস-দাসীদের নফকা প্রদান করা। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

اِنَّهُمْ اِخْوٰنُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَ اَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبِسُوْنَ وَلَا تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ -

তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের করতলগত করেছেন। সুতরাং তোমরা যা আহার কর তাদেরকেও তাহা আহার করাও এবং তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তা পরিধান করাও তোমরা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে শাস্তি দিও না।

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, মনিবের উপর দাস-দাসীদের ভরণপোষণ ওয়াজিব। তবে সে যে ধরনের খানা খাবে বা যে ধরণের পোষাক পরিধান করবে হুবহু তাই দাস-দাসীকে খাওয়াবে বা পরাবে ইহা উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদীসের মূল ভাষ্য হচ্ছে তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া ও পোষাক দান করা। সুতরাং মনিব তার সামর্থানুযায়ী

তার থেকে নিম্ন মানের খানা বা পোষাক প্রদানে কোনরূপ গুনাহ হবে না।

قوله : فَإِنْ أَبَى الخ : মনিব যদি তার দাস-দাসীর ভরণপোষণ প্রদানে অস্বীকার করে বসে তাহলে দেখতে হবে সে দাস-দাসীর উপার্জন করা সক্ষম কি না। যদি সক্ষম হয়ে থাকে তবে সে উপার্জন করবে এবং তা দ্বারা তাদের প্রয়োজনীয় খরচা আঞ্জাম দিবে। এতে দাস-দাসী ও মনিব উভয়ের কল্যাণ নিহিত আছে। দাস-দাসীর কল্যাণ হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রাণ রক্ষা পেল। আর মনিবের কল্যাণ হচ্ছে দাসের তার মালিকানা বাকি থাকল, ইচ্ছা করলে বিক্রি করতে পারে। আর যদি দাস-দাসী উপার্জনে সক্ষম না হয়ে থকে, তবে মনিবকে বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেয়া হবে, তুমি তাকে বিক্রিয় করে দাও। কেননা, দাস-দাসী সফকা পাওয়ার অধিকার রাখে। সুতরাং বিক্রি করে দিলে পরবর্তী মনিব থেকে নফকা প্রাপ্ত হবে এবং বিক্রিকারী মনিব ও মূল্য পেয়ে লাভবান হল।

كِتَابُ الْعِتَاقِ

অধ্যায় : গোলাম আজাদ করা

هُوَ إِثْبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمَمْلُوكِ وَيَصِحُّ من حُرٍّ مُكَلَّفٍ لِمَمْلُوكِهِ بِأَنْتِ حُرٌّ أو بِمَا يُعَبَّرُ بِهِ عن الْبَدَنِ وَعَتِيقٌ ومُعْتَقٌ ومُحَرَّرٌ وحَرَّرْتُك وأَعْتَقْتُك نَوَاهُ أو لا وَبِلَا مِلْكَ وَلَا رِقَّ وَلَا سَبِيلَ لي عَلَيْك إنْ نَوَى -

অনুবাদ : ইতাক হচ্ছে গোলামের জন্য শরয়ী ক্ষমতা প্রদান করা। তা স্বাধিন মুকাল্লাফ (প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন) ব্যক্তি আপন মালিকানার গোলামকে বলে তুমি স্বাধীন, অথবা এমন কথা বলে যা দ্বারা দেহ বিবেচনা করা হয়, তুমি বন্ধ-মুক্ত, তুমি আজাদ, আমি তোমাকে আজদ করলাম, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, (এসব কথা দ্বারা স্বাধীন করার) নিয়ত করুক বা না করুক স্বাধীন করা সহীহ। আর তোমার উপর আমার মালিকানা, বন্ধন বা অধিকার নেই—কথা দ্বারা স্বাধীন করার নিয়ত করলে সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كتابُ الْعِتَاقِ الخ : তালাক ও ইতাক দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিনতা অর্জন হয়, তবে তালাক দ্বারা শুধু স্ত্রীর উপর থেকে স্বামীর সম্ভোগ অধিকার উঠে যায়। ইত্ক দ্বারা অর্জিত গুনাগুনের মাধ্যমে যেন সে নতুন জীবন পেল। কেননা, এতদিন পর্যন্ত সে মৃতের ন্যায় অন্যের অধিনে ছিল। কিন্তু যখন স্বাধীনতা অর্জন করল তখন তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হওয়ার পাশাপাশি সে সকল মানবীয় গুণাবলির অধিকারী হয়ে গেল।

عتاق শব্দটি عتق এর বহুবচন। عتق এর অর্থ স্বাধীনতা, মর্যাদা।

শরীয়াতের পরিভাষায় عتق বলা হয় :

قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ يَصِيرُ الْمَرْأُ بِهَا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْقَضَاءِ

عتق হল এমন এক শক্তি যার দরুন ব্যক্তি সাক্ষদান, কর্তৃত্ব ও কাজী বিচারক) হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আজাদ হওয়ার কারণ : গোলাম-বাদী দু কারণে স্বাধীন হয়। ১। বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন। ২। সেচ্ছাধীন স্বাধীনতা। বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন হওয়ার উদাহরণ অপরাধের কাফফারা স্বরূপ গোলাম বাদি স্বাধীন করা। বা মান্নতের কারণে গোলাম বাদি স্বাধীন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গোলাম স্বাধীন করা ওয়াজিব। আর স্বেচ্ছাধীন স্বাধীনতা দুভাবে হতে পারে : মনিব ছওয়াবের আশায় গোলাম স্বাধীন করা বা নিকটাত্মীয় গোলাম হওয়ার পর তা নিজ মালিকানাতে আসার কারণে স্বাধীন হওয়া।

গোলাম স্বাধীন করার শর্ত : নিজে স্বাধীন হতে হবে। বিবেক সম্পন্ন হতে হবে। সাবালক হতে হবে। উক্ত গোলামের মালিক হতে হবে।

স্বাধীনতা প্রদানের রুকন ও হুকুম :

عتق এর রুকন হল এমন বিষয় যার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তার হুকুম হল পরাধিনতা দূর হয়ে স্বাধিনতা অর্জিত হওয়া।

قوله : وَ يَصِحُّ مِنْ حُرٍّ مُكَلَّفٍ الخ : গোলাম বাদি স্বাধীন করার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। ১। স্বাধীনকারী বক্তি নিজে স্বাধীন হতে হবে। কেননা, সে প্রথমে দাসের মালিক হতে হবে। আর নিজে স্বাধীন না হলে সে গোলামের মালিক হতে পারে না। এজন্য নিজে স্বাধীন হতে হবে।

২। আজাদকারী সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। কেননা, পাগলের তো নিজের উপর নিজের কর্তৃত্ব নেই, বিধায় আজাদ করার মতো মহান কাজ তার থেকে সম্পাদন হওয়া কার্যকর নয়।

৩। প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা নাবালকের মাঝে আজাদ করার যোগ্যতা বিদ্যমান নেই। কেননা, আজাদ করা ইহা বাহ্যিক অর্থ আর্থিক ক্ষতি। তাইতো নাবালকের অভিভাবক নাবালকের গোলাম স্বাধীন করার ক্ষমতা রাখেন না। ৪। গোলাম আজাদকারীর অধিনস্ত হবে। তাই অন্যের গোলাম আজাদ করলে তা কার্যকর হবে না। জমহুর ফুকাহায়ে কেরামগণের অভিমত তাই। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, পিতা তার নাবালক সন্তানের গোলামকে আজাদ করতে পারেন। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের গোলামকে আজাদ করতে পারবেন না। জমহুর ফুকাহায়ে কেরামগণের দলিল রাসূল (সা.)-এর বাণী : لَا عِتْقَ فِيمَا لَايَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ মানুষ যার মালিক নয় সে তা আজাদ করতে পারবে না।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অন্যের গোলাম আজাদ করলে তা বাস্তবায়ন হবে না। তবে আজাদ কর বিশুদ্ধ। যদি প্রকৃত মনিব তা অনুমোদন করে দেয় তবে তা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, অন্যের গোলাম আজাদ করলে মনিবের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে।

قوله : وَ بِاَنْتِ حُرٌّ الخ : যদি মনিব তার গোলামকে বলে, তুমি স্বাধীন অথবা এমন শব্দ প্রয়োগ করে যা দ্বার দেহসত্ত্বা বুঝানো হয় যেমন, তুমি মুক্ত, আমি তোমাকে স্বাধীন করে দিয়েছি, অথবা মুক্ত করে দিয়েছি। তবে তার একথা দ্বারা গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, এসকল শব্দ গোলাম আজাদ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীয়াত ও প্রচলন উভয় দিক থেকেই তা স্বাধীন অর্থে স্পষ্ট। আর স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার দ্বারা বিষয়টি কার্যকর করার জন্য নিয়াতের প্রয়োজন হয় না। যেমন بيع ও طلاق এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, গঠনগত দিক দিয়ে যদিও স্পষ্ট বাচক শব্দটি সংবাদ মূলক হয়ে থাকে তবুও আমরা প্রয়োজনের তাগিদে انشاء (সংঘটিত হওয়া) এর অর্থে গ্রহণ করব। যেমন انت حر (তুমি স্বাধীন) বা حررتك (আমি তোমাকে স্বাধীন করলাম) এরূপ শব্দকে بيع ও طلاق এর ন্যায় انشاء এর অথে গ্রহণ করে গোলাম আজাদ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করব। আর যদি কেহ এরূপ স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তার নিয়াতের কথা বলে এভাবে যে এ শব্দ দ্বারা গোলাম স্বাধীন করার নিয়ত করিনি, বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। অর্থাৎ, তুমি একাজ থেকে স্বাধীন অথবা আমি তোমার থেকে কোন কাজ নিব না. তাহলে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝের সম্পর্ক হিসাবে তা গ্রহণ করা হবে। কেননা, মূল অর্থ হিসাবে শব্দটির এরূপ

অর্থ নেয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার বিচারে তার এরূপ কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এরূপ শব্দ এ অর্থে ব্যবহার হওয়া বাহ্য পরিপন্থি। আর বাহ্যপরিপন্থি আইনগত গ্রহণযোগ্য হয় না।

قوله : وَ بِلَا مِلْكَ وَ لَارِقَّ الخ : যদি মনিব তার গোলাম বা দাসীকে বলে তোমার উপর আমার কোন মালিনাকা নেই, উক্ত বাক্য দ্বারা যদি গোলাম আজাদ করার নিয়াত করে তবে তো গোলাম আজাদ হবে। পক্ষান্তরে যদি গোলাম আজাদ না করার নিয়াত করে তবে তাও কার্যকর হবে। অর্থাৎ, গোলাম আজাদ হবে না। কেননা, উক্ত বাক্যের অর্থে এক সম্ভাবনা হল আমি তোমাকে স্বাধীন করার কারণে তোমার উপর আমার কোন মালিকানা নেই। আর এ হিসাবে গোলাম স্বাধীন হবে। অথবা এ বাক্যে এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, আমি তোমাকে বিক্রি করে দেয়ায় তোমার উপর আমার কোন মালিকানা নেই। এ হিসাবে গোলাম স্বাধীন হবে না। সুতরাং বাক্যটি আজাদীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট বাক্য রইল না, বরং অস্পষ্ট হয়ে গেল। আর অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা গোলাম স্বাধীন করতে হলে নিয়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তদ্রূপ যদি বলে তোমার উপর আমার কোন বন্ধন নেই তবে নিয়াত সাপেক্ষে আজাদী সংঘটিত হবে। আর যদি আজাদির নিয়ত করে না তবে আজাদি সংঘটিত হবে না। কেননা, তার উক্তিতে বন্ধন মুক্তির কথা হয়তো বিক্রি করার মাধ্যমে হতে পারে, কিংবা স্বাধীন করার মাধ্যমে হতে পারে।

সুতরাং এরূপ উক্তি দ্বারা গোলাম আজাদ করতে হলে নিয়তের আবশ্যক। তদ্রূপ মনিবের উক্তি তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই—এ উক্তির পর স্বাধীনতা প্রমাণিত হতে হলে নিয়তের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, উক্ত উক্তিতেও বিক্রির কারণে অধিকার রহিত হওয়া কিংবা স্বাধীন করার কারণে অধিকার রহিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, গোলাম আজাদ করার ক্ষেত্রে মনিব স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তবে মনিব আজাদের নিয়ত করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করে তবে দেখতে হবে সে স্বাধীন করার নিয়ত করেছে কি না। যদি আজাদ করার নিয়ত করে তবে তো আজাদ হবে। অন্যথায় গোলাম আজাদ হবে না।

وَهٰذَا ابْنِي أو أبِي أو أُمِّي وَهٰذَا مَوْلَايَ أو يا مَوْلَايَ أو يا حُرُّ أو يا عَتِيقُ لَا بِيَا ابْنِي وَيَا أَخِي وَلَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ وَأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَأَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ وَعَتَقَ بِمَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ -

---

অনুবাদ : (আর যদি মনিব বলে) এ আমার ছেলে, অথবা পিতা, কিংবা মাতা (অথবা বলে) এ আমার মাওলা অথবা হে আমার মাওলা কিংবা হে স্বাধীন বা হে মুক্ত, তাহলে স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে (যদি মনিব বলে) হে আমার ছেলে, হে আমার ভাই, তোমার উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই বা তালাকের শব্দাবলী ব্যবহার করে (কিংবা বলে) তুমি স্বাধীনের ন্যায় তাহলে স্বাধীন হবে না। আর স্বাধীন হয়ে যাবে (মনিবের উক্তি) তুমি স্বাধীন ছাড়া অন্য কিছু নয় দ্বারা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ هٰذَا اِبْنِىْ الخ : যদি কোন মনিব তার গোলামকে বলে এটা আমার ছেলে আর অবস্থাও এমন হয় যে, উক্ত গোলাম মনিবের চেয়ে ছোট অর্থাৎ এ বয়সের সন্তান মনিবের হতে পারে তবে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। মনিবের উক্ত দাবীর উপর অটল থাকা শর্ত নয়, বরং যদি এটা বলার সাথে সাথে বলে আমি ভুল বলেছি

তবুও গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে হা, বংশ সাবেত করার জন্য এরূপ উক্তির উপর অটল থাকা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় যদি গোলামের সুপরিচিত অন্য কোন বংশ সূত্র বিদ্যমান না থাকে তবে মনিবের সাথে তার বংশসূত্র সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বাধীন হওয়া অতি স্পষ্ট। কেননা, রাসূল (সা.) বলেন :

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ

যে তার কোন নিকটাত্মীয়ের মালিক হবে সে তার পক্ষ থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি গোলামের বংশ পরিচিতি বিদ্যমান থাকে তাহলে মনিবের কথার দ্বারা তার বংশসূত্র মনিব থেকে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, তার তো বংশ অন্যের থেকে প্রমাণিত। এমতাবস্থায় গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা এভাবে যে, পুত্র হওয়া। আজাদ হওয়ার سبب (কারণ) আর سبب বলে مسبب উদ্দেশ্য নেয়ার নিয়ম বিদ্যমান আছে। সুতরাং শব্দটির রূপক অর্থ গ্রহণ করে বলা হবে যে গোলামটি আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি গোলাম বয়সে মনিবের বড় হয়ে থাকে, আর মনিব বলে এটা আমার ছেলে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও সাহাবাইন (রহ.) এর মতে গোলাম আজাদ হবে না।

তিনি দলীল পেশ করেন : মনিব যাকে তার পুত্র বলে সম্বোধন করেছে সে মনিব থেকে বয়সে বড় হওয়ার কারণে মনিবের কথাকে প্রকৃত অর্থে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। যেমন কোন মনিব তার গোলামকে বলল, তোমার সৃষ্টির পূর্বে তোমাকে স্বাধীন। তার একথা প্রকৃতভাবে সম্ভব না হওয়াতে তার একথা বাতিল বলে গণ্য হয় তদ্রূপ এখানেও মনিবের কথা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়াতে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি বলা হয় যে এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করা হবে, এবং গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে তবে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, যখন প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা পাওয়া গেল না তখন উক্ত বাক্যের রূপক অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই গোলাম স্বাধীন হবে না।

আমাদের দলীল : মনিবের উক্ত কথা প্রকৃতভাবে যদিও নেয়া সম্ভবপর হচ্ছে না, তথাপি মনিবের উক্ত কথাকে রূপকার্থে গ্রহণ করে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, ছেলে হওয়া আজাদ হওয়ার কারণ বা সবব মনিবের উক্ত কথার অর্থ হচ্ছে যখন থেকে আমি এ গোলামের মালিক তখন থেকে সে আজাদ। তার কথা থেকে এ অর্থ নেয়া তখন কার্যকর হবে যখন গোলাম হবে। কেননা, গোলামটি স্বাধনি হলেই সে ছেলে হতে পারে অথবা ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে বা আত্মীয়তা বজায় রাখার ভিত্তিতে ছেলে হওয়া আজাদ হওয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং এখানে ছেলে তথা সবব বলে স্বাধীন তথা মুসাব্বাব অর্থ উদ্দেশ্য হবে। দ্বিতীয়ত গোলাম ছেলে হওয়ার জন্য আজাদ হওয়াটা অনিবার্য। কেননা ছেলে তার পিতার গোলাম হতে পারে না। সুতরাং ছেলে মালযুম যার জন্য আবশ্যক আর আজাদ হওয়া লাযিম। আর পরস্পর দুটোর মাঝে অনিবার্য সম্পর্ক হলে এটা বলে একটা বলে অপরটা উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। সুতরাং তার কথাকে বাতিল না করে উক্ত পদ্ধতিতে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেয় হবে। এজন্য আমরা বলি গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মালিক যদি স্বীয় গোলামকে সম্বোধন করে বলে ইনি আমার পিতা, অথবা তার দ্বাসীর ক্ষেত্রে বলে ইনি আমরা মাতা তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টি পূর্বে আলোচিত মাসআলার ন্যায়, অর্থাৎ, যদি উক্ত দাস-দাসী মনিবের চেয়ে বয়সে বড় হয় এমনভাবে যে তারা বয়স হিসাবে মনিবের মাতা-পিতা হতে পারেন, তবে তো সর্বসম্মতিক্রমে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি দাস, দাসী মনিবের চেয়ে বয়সে ছোট হন বা সমবয়সী হয়ে থাকেন, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতে মনিবের কথা রূপকার্থে গ্রহণ করে গোলাম, দাসী স্বাধীন হয়ে যাবেন। আর সাহাবাইন (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এক্ষেত্রে গোলাম, দাসী স্বাধীন হবে না। বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

قوله : هٰذَا مَوْلَایَ الخ : মনিব যদি তার গোলামকে উদ্দেশ্য করে বলে هذا مولى এটা আমার মাওলা কিংবা বলে يا مولى হে আমার মাওলা, তাহলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। মনিব স্বাধীন করার নিয়ত করুক বা না করুক।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম যুফার (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে মনিবের গোলাম স্বাধীন করার নিয়তের সাপেক্ষে গোলাম স্বাধীন হবে। আর যদি নিয়ত পাওয়া না যায় তবে গোলাম স্বাধীন হবে না।

আমাদের দলিল হচ্ছে : আলোচ্য মাসআলায় مولا 'মাওলা' শব্দটি আর তা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- ১। সাহায্যকারীর অর্থে। যেমন اَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ অর্থাৎ, কাফেরদের সাহায্যকারী কেউ নেই। (সূরা মুহাম্মদ)। ২। চাচাতো ভাই। যেমন, اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَائِیْ আমি আমার মৃত্যুর পর চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারে আশংকা করছি। (সূরা মারইয়াম)। ৩। মাওলাতে দ্বীনী। অর্থাৎ, ধর্মীয় সম্পর্ক। অর্থাৎ, স্বাধীন প্রাপ্ত মুসলমান দুজনের চুক্তি এভাবে যে একজন মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হওয়ার ও জীবিতাবস্থায় অপরাধ হলে জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে অন্যের সাথে চুক্তি করল। ৪। আজাদকারীর ক্ষেত্র মাওলা শব্দ ব্যবহার হয়। ৫। তদ্রূপ আজাদকৃতের ব্যাপারে মাওলা শব্দ ব্যবহার হয়। সুতরাং এখানে প্রথমোক্ত ৪টি অর্থ কার্যকর নয়; বরং পঞ্চম অর্থ গ্রহণ করা যাবে যা বাস্তব ও প্রকৃত সম্মত। কেননা, প্রথম অর্থ অর্থাৎ, সাহায্য করা ইহা হতে পারে না। কেননা, মনিব তার দাসকে হুকুম করবে। তার থেকে সাহায্য চাইবে না। আর দ্বিতীয় অর্থ তথা চাচাতো ভাই তাও উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না। কেননা, গোলামের সাথে তার কোন আত্মীয় সম্পর্ক নেই। আর তৃতীয় অর্থ তথা মাওলাতে দ্বীন তাও নেয়া সম্ভব নয়। কেননা, সেতো গোলাম। বা গ্রহণ করলে তা রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অথচ আলোচনা হচ্ছে প্রকৃত অর্থের ব্যাপারে। তদ্রূপ চতুর্থ অর্থ তথা আজাদকারী এ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, সেতো নিজেই গোলাম সে কিভাবে আজাদকারী হতে পারে। সুতরাং এখানে ৫ম অর্থ তথা আজাদকৃত অর্থ নেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, ইহা স্পষ্ট শব্দের ন্যায়। আর স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার কোন হুকুম সাবেত করতে হলে নিয়াতের প্রয়োজন হবে না। বিধায় আমরা বলি মনিব তার গোলামকে هذا مولى বলে তবে নিয়ত ছাড়াই গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে হা যদি মনিব বলে সে একথা দ্বারা গোলাম আজাদ করার নিয়াত করছে না, বরং অন্য অর্থ গ্রহন করেছে তবে তারও আল্লারহ মধ্যকার সম্পর্ক হিসাবে বলা যাবে, যে গোলাম স্বাধীন হয়নি। কিন্তু তা দুনিয়ার বিচারে কার্যকর নয়। আলোচিত মাসআলার অনুরূপ يامولى হে আমার মাওলা, শব্দ দ্বারা আজাদ হওয়ার দলীল হচ্ছে যখন মাওলা দ্বারা আজাদকৃত গোলাম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তখন তা আজাদের জন্য স্পষ্ট শব্দের মতো হয়ে গেল। আর স্পষ্ট শব্দ দ্বারা আহ্বান করলে আজাদ করার নিয়াতের প্রয়োজন হয় না। কেননা, নিয়াতের প্রয়োজন হয় সে সব স্থানে যেখানে শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জন করে রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হয়। আর এখানে যেহেতু শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব বিধায় এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

قوله : يَا حُرُّ يَا عَتِيْقُ : যদি মনিব তার দাস-দাসীকে বলে হে স্বাধীন হে মুক্ত তাহলে উক্ত গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, আহ্বান করতে যে শব্দে ডাকা হয় সে শব্দ গুণ হিসাবে উক্ত ব্যক্তির মাঝে পাওয়া বাক্যের দাবী। আবার যিনি আহ্বান করেছেন তার থেকেও গোলাম স্বাধীন হওয়া সম্ভব। তাই গোলাম তার মনিবের পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। তবে হা মনিব যদি তার কোন গোলামের নাম 'হুর' বা আজাদ রেখে নেয় অতঃপর তার গোলামকে এ নামে আহ্বান করে তবে গোলাম স্বাধীন হবে না। পক্ষান্তরে যদি হুর বা আজাদ নাম রাখার পর উক্ত নামদ্বয়ের অর্থবোধক শব্দ দ্বারা আহ্বান করে তবে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, তখন আর তা নাম বিশেষ হবে না; বরং তা গুণ বিশেষ হয়ে যাবে। তাই মনিব তাকে যে গুণ বিশেষ দ্বারা আহ্বান করেছে গোলাম সে গুণ বিশিষ্ট তথা স্বাধীন হয়ে যাবে। নিয়তের কোন প্রয়োজন নেই।

قوله : لَابِيَا اِبْنِيْ : মনিব যদি তার গোলামকে বলে, হে আমার পুত্র বা হে আমার ভাই তবে তার একথা দ্বারা গোলাম স্বাধীন হবে না। কেননা, আহ্বানের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আহ্বানকৃত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করা। আর আহ্বান যদি এমন কোন গুণ উল্লেখপূর্বক হয় যা তার থেকে সাব্যস্ত করা যায় না তা নিছক আহ্বান মূলক হবে। আর যদি এমন শব্দ ব্যবহার করে যা তার থেকে দাসের মধ্যে উক্ত গুণ সাব্যস্ত করা এবং ঐ বিশেষ গুণে ভূষিত অবস্থায় তাকে উপস্থিত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বা সাব্যস্ত করা যায় এমন হয় যেমন হে স্বাধীন, হে মুক্ত তবে তো স্বাধীন বা মুক্ত গোলামের গুণ হয়ে গোলাম মনিবের পক্ষ থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আলোচিত মাসআলায় আহ্বানের উদ্দেশ্য নিছক অবহিত করা। তার মাঝে কোনরূপ গুণ সাব্যস্ত করণ নয়। কেননা, তা সম্ভব নয়। তাই এমতাবস্থায় গোলাম স্বাধীন হবে না। ইহা জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে শাজ একটি বর্ণনা রয়েছে যে, সম্বোধন করাতে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। والله اعلم بالصواب -

قوله : وَلَا سُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ الخ : মনিব যদি তার গোলামকে বলে لَاسُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ তোমার উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে স্বাধীন করার নিয়ত করুক বা না করুক গোলাম স্বাধীন হবে না। কেননা, ক্ষমতা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ অধিকার। এ শব্দ দ্বারা স্বাধীন না হওয়ার কারণ হচ্ছে, বাদশাহকেও سلطان বলা হয়। এজন্য যে দেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকার মালিকানাকে আবশ্যক করে না; বরং কোন ক্ষেত্রে মালিকানা থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ অধিকার নাও থাকতে পারে। যেমন মুকাতাব গোলাম। যদিও মনিব তার মালিক তথাপি তার সাথে চুক্তি হয়ে যাওয়ায় তার উপর মনিবের নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিদ্যমান নয়।

قوله : وَ اَلْفَاظُ الطَّلَاقِ الخ : মনিব যদি তার গোলাম বা দাসীর ক্ষেত্রে তালাক বা তালাক জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করে, যেমন তুমি তালাক। তুমি বায়েন, তুমি নিজে উড়না দ্বারা আবৃত কর ইত্যাদি তালাকের স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করুক বা অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে স্বাধীন করার নিয়ত করুক বা না করুক গোলাম দাসী স্বাধীন হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উক্ত শব্দ দ্বারা স্বাধীনতা করার নিয়ত করলে গোলাম দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে এ ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে। একটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতানুযায়ী। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলিল : বিবাহসূত্রের মালিকানা এবং দাস সূত্রের মালিকানার মাঝে সামাঞ্জস্য রয়েছে। কেননা, উভয় সূত্রেই ব্যক্তি সত্তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস সূত্রের মালিকানা অতি স্পষ্ট আর বিবাহ সূত্রর মালিকানা ও সত্তাগত মালিকানার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং মনিব তার বক্তব্য দ্বারা এমন অর্থের নিয়ত করেছে, শব্দের মাঝে যার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দলিল হল : মনিব তালাক বা তার সমগোত্রীয় শব্দ আজাদ এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলেও তা উক্ত শব্দাবলী বুঝায় না। কেননা, তালাকের শব্দে আর আজাদ করার শব্দের মাঝে কোনরূপ মিল নেই।

তালাক বা তার সমশ্রেণীয় শব্দাবলী স্ত্রীর উপর প্রয়োগ করা এর অর্থ হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। আর আজাদ করা হচ্ছে ব্যক্তিকে শক্তি প্রদান করা। কেননা, এ যাবত গোলাম বা দাসী ছিল মৃতের ন্যায়। তাদের মানবীয় কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজাদ করা দ্বারা সে ঐ শক্তি পুণরায় অর্জন করে। কিন্তু স্ত্রীর বিষয় এরকম নয়। বরং স্ত্রীর জন্য সার্বক্ষণিক ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে আকদে নিকাহ এর কারণে তা একটি নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হল। এখন যদি স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে নিজ ক্ষমতা বলে পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, শক্তি অর্জনের দিক দিয়ে আজাদ করাটা উর্ধ্বে। আর তালাক হল নিম্ন পর্যায়ের। এদিকে কায়দা হল নিম্ন পর্যায়ের বিষয়কে উর্ধ্ব পর্যায়ের বিষয়ের জন্য রূপকভাবে ব্যবহার করা যায়। তাই আজাদ বলে তালাক উদ্দেশ্য নেয়া যাবে। কিন্তু তালাক বলে আজাদ উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না।

তাছাড়া বিবাহের অধিনস্থতা থেকে দাসত্বের অধিনস্থতা উর্ধ্বে। কেননা, দাসত্বের অধিনস্থতা দ্বারা ঐ অঙ্গের মালিক হয়ে যায় যা বিবাহের দ্বারা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিবাহের দ্বারা ঐসব অঙ্গের মালিক হয় না, যা দাসত্বের দ্বারা হয়ে থাকে। সুতরাং দাসত্বের অধিনস্থতা যেমন উচ্চে ঠিক তা বিদুরিত করাও উচ্চেই হবে। আর শব্দ তার নিজস্ব মূল অর্থের উচ্চের বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। বিধায় তালাক শব্দ দ্বারা আজাদ করা যাবে না।

قوله : وَ اَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ الخ : যদি মনিব তার গোলামকে বলে انت مثل الحر তুমি আজাদের মতো, তবে তার উক্ত কথা দ্বারা দাস আজাদ হবে না। কেননা, ব্যবহৃত مثل (মতো) শব্দটি ভিন্ন গুণের সথে মিল থাকার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং মনিব কোন গুণের সাথে সামঞ্জস্য করেছে তাতো স্পষ্ট হয়নি, বরং তা অস্পষ্ট রয়ে গেল। এজন্য সন্দেহের কারণে আজাদী সংঘটিত হতে পারে না। তাই আমারা বলি উক্ত কথা দ্বারা গোলাম স্বাধীন হবে না।

قوله : وَ عَتَقَ بِمَا اَنْتَ اِلَّا حُرٌّ الخ : যদি মনিব তার দাসকে বলে ما انت الا حر তুমি আজাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাহলে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এখানে نفى তথা নেতিবাচক কথার পর ইতিবাচক কথার উল্লেখ রয়েছে। যা দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হওয়াকে বুঝায়। যেমন لا اله الا الله উক্ত শব্দের মর্ম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মাবুদ তদ্রূপ ما انت الا حر এর মর্ম হচ্ছে তুমি অবশ্যই আজাদ।

وَبِمِلْكٍ قَرِيبٍ مَحْرَمٍ وَلَوْ كان الْمَالِكُ صَبِيًّا أو مَجْنُونًا وَبِتَحْرِيرٍ لِوَجْهِ اللّٰهِ وَلِلشَّيْطَانِ وَلِلصَّنَمِ وَبِكُرْهٍ وَسُكْرٍ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى مِلْكٍ أو شَرْطٍ صَحَّ وَلَوْ حَرَّرَ حَامِلًا عَتَقَا وَإِنْ حَرَّرَهُ عَتَقَ فَقَطْ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ في الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ وَوَلَدُ الْأَمَةِ من سَيِّدِهَا حُرٌّ -

---

অনুবাদ : মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হলে যদিও মালিক নাবালক হয়, অথবা পাগল হয় কিংবা আল্লাহর নামে, শয়তানের নামে বা মুর্তির নামে স্বাধীন করলে এবং জোরপূর্বক বা নেশা অবস্থায় স্বাধীন করলে স্বাধীন হয়ে যাবে। যদি (মুক্তি দানের বিষয়কে) মালিকানার সাথে কিংবা কোন শর্তের সাথে যুক্ত করে তবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি গর্ভবতী দাসীকে স্বাধীন করে তবে সে (দাসী) ও গর্ভের সন্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি গর্ভকে স্বাধীন করে তবে সে (গর্ভের সন্তান) শুধু স্বাধীন হবে। সন্তান মালিকানা, স্বাধীন, দাস, মুদাব্বার, উম্মেওয়ালাদ, মুকাতাব, হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অনুগামী হবে। দাসীর সন্তান তার মনিবের ঔরসজাত স্বাধীন সন্তান হিসাবে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ بِمِلْكٍ قَرِيْبٍ : যদি কোন ব্যক্তি মাহরাম নিকটাত্মীয়ের মালিক হয় তবে সাথে সাথেই তার থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ مَلَكَ ذَارَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ যে মালিক হবে মাহরাম নিকটাত্মীয়ের তবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসে محرم বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের সাথে কখনোই বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয নয়। তা জন্মসূত্রের কারণে হোক বা অন্য কারণে হোক।

জন্মসূত্রের যেমন ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী ইত্যাদি আর অন্য সূত্রে যেমন চাচা, মামা, ভাই, বোন ইত্যাদি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, জন্মসূত্র ভিন্ন অন্য সূত্রের মাহরাম আত্মীয় স্বাধীন হবে না। কেননা, প্রথমত মালিকের ইচ্ছা ছাড়া গোলাম স্বাধীন হওয়া কিয়াস বিরোধী। আর যা কিয়াসবিরোধী হয় তার উপর কিয়াস করে অন্য বিষয় এর হুকুম সাব্যস্ত করা যায় না। জন্মসূত্রের নিকট আত্মীয়ের উপর কিয়াস করে অন্য সূত্রের নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতার হুকুম প্রদান করা যাবে না।

সুতরাং ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতা গংদের উপর কিয়াস করে ভাই, চাচা, মামা গং এর মালিক হওয়ার সাথে সাথে স্বাধীনতার হুকুম প্রদান করা যাবে না। তাছাড়া সন্তান সূত্রের আত্মীয়দের তুলনায় অন্য সূত্রের আত্মীয়দের স্তর নিম্নমানের। সুতরাং এ দুশ্রেণীর আত্মীয়তা সমপর্যায়ের নয়। তাই একটি অপরটির সাথে কিয়সা করে হুকুমে সমান করা যাবে না।

আমাদের দলীল : আমাদের বর্ণিত হাদীস مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস যেহেতু ব্যাপকার্থক তাই জন্মসূত্রের মাহরাম আত্মীয় এবং অন্য সূত্রের মাহরাম আত্মীয় হুকুমের দিক দিয়ে সমান হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, স্বাধীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ আজাদ হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে মাহরাম হওয়া। অর্থাৎ, যখন কেহ মাহরাম আত্মীয়ের মালিক তখন সে মাহরাম স্বাধীন হয়ে যাবে। আর এখানে মাহরাম দ্বারা এমন আত্মীয় বুঝানো হয়েছে যার সাথে স্থায়ীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। সুতরাং বুঝা গেল যে, জন্মসূত্রে মাহরাম হওয়া স্বাধীন হওয়ার কারণ নয়; বরং মাহরাম (তা জন্মসূত্রে হোক বা অন্য সূত্রে হোক) তা স্বাধীন হওয়ার কারণ। সুতরাং স্বাধীন হওয়ার কারণ বা সূত্র মাহরাম হওয়া নির্ধারিত হল। তাই যাদের মধ্যে মাহরাম শব্দ প্রয়োগ করা যাবে। স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তারা সকল সমান।

قوله : وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ صَبِيًّا الخ : যদি শিশু সন্তান বা পাগল ঐ মাহরামের মালিক হয় তাহলেও সেই আত্মীয় স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রেও বান্দার অধিকার ও গোলাম হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে। তাই তা নফকা প্রদানের মতো হল। অর্থাৎ, দরিদ্র অসহায় নিকটাত্মীয়ের নফকা বাচ্চা বা পাগল এর সম্পদ থেকে আবশ্যক হয়। তাই এখানেও ঐ আত্মীয়তার কারণে মাহরাম আত্মীয় স্বাধীন হয়ে যাবে।

قوله : وَبِتَحْرِيرٍ لِوَجْهِ اللهِ الخ : যদি কোন মনিব তার দাস-দাসীকে আল্লাহর নামে স্বাধীন করে তবে সর্ব সুরতে তার গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, স্বাধীন করার রুকন পাওয়া গেছে সে ব্যক্তি থেকে যে আজাদ করতে পারে এবং তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যাকে আজাদ করা যায়। অর্থাৎ, যেহেতু আজাদকারী স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেক সম্পন্ন আর যাকে আজাদ করছে সে তারই গোলাম, তাই গোলাম স্বাধীন হওয়াতে কোন বাধা পাওয়া যায় না। তবে হা, আল্লাহর নাম বা শয়তানের নাম, বা দেবতার নাম উল্লেখের কারণে আজাদ হওয়ার মধ্যে কোনরূপে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না। কেননা, তা উল্লেখ করা ছাড়াও গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। তা নিছক অতিরিক্ত উক্তি মাত্র। তবে মুসলমানের জন্য শয়তানের নাম বা দেবতার নাম যুক্ত করা অত্যন্ত গুনাহের কাজ এক্ষেত্রে অবশ্যই আজাদকারী তাওবা করতে হবে।

قوله : وَبِكُرْهٍ وَسُكْرٍ الخ : পূর্বের মাসআলার ন্যায় যদি কোন ব্যক্তিকে গোলাম স্বাধীন করার প্রতি বাধ্য করা হয় বা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তার দাস-দাসীকে স্বাধীন করে তবে তা কার্যকর হবে। কেননা, আজাদ করাট বিবেক-সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে তারই দাস এর প্রতিই সম্পর্কিত হয়েছে। এজন্য জোরপূর্বক বা নেশাগ্রস্থ অবস্থায়ও স্বাধীন করলে তা কার্যকর হবে।

قوله : وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى مِلْكٍ الخ : যদি কেহ গোলাম স্বাধীন করাকে নিজ মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করে. যেমন বলল, إِنْ مَلَكْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ আমি যদি তোমার মালিক হই তবে তুমি স্বাধীন। অথবা কোন শর্তের সাথে

সম্পৃক্ত করে বলে إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি স্বাধীন। তাহলে উভয় অবস্থায় গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। যেভাবে তালাককে কোন শর্তে শর্তযুক্ত করা বা মালিকানার দিকে সম্পর্কিত করা বিশুদ্ধ। তেমনি স্বাধীন করা ও মালিকানার দিকে সম্পর্কিত করা বা কোন শর্তে শর্তযুক্ত করা বিশুদ্ধ।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে স্বাধীন করাকে মালিকানার সাথে সম্পৃক্ত করা যেমন আমি মালিক হলে তুমি আজাদ, এরূপ উক্তি দ্বারা গোলাম স্বাধীন হবে না। (বিস্তারিত আলোচনা তালাক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। আর আজাদ করাকে কোন শর্তে শর্তযুক্ত করা জায়েয। এজন্য যে এর অর্থ হল ইচ্ছা করে নিজ অধিকার রহিত করা। যদিও তার মধ্যে শক্তি অর্জনের অর্থ গৌনভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর রহিত করণকে শর্তযুক্ত করা জায়েয আছে। তাই আজাদ করাকেও শর্তযুক্ত করা জায়েয আছে।

قوله : وَلَوْ حَرَّرَ حَامِلًا الخ : মনিব যদি তার গর্ভবতী দাসীকে স্বাধীন করে তবে গর্ভস্থ সন্তান তার মায়ের অনুগামী হিসাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, মনিব যখন দাসীকে স্বাধীন করল তখন দাসীর সকল অংশকে স্বাধীন করেছে। সে হিসাবে গর্ভস্থ সন্তান দাসীর অংশ বিশেষ। তাই দাসীর অন্যান্য অঙ্গ যেভাবে স্বাধীন হয়েছে তদ্রূপ তার গর্ভস্থ সন্তানও স্বাধীন হবে।

قوله : وَإِنْ حَرَّرَهُ عَتِقَ فَقَطْ الخ : আর যদি মনিব গর্ভস্থ সন্তানকে শুধু স্বাধীন করে তাহলে গর্ভস্থ সন্তানই শুধু স্বাধীন হবে। তার মাতা অর্থাৎ, গর্ভধারিণী স্বাধীন হবে না। কেননা, এ অবস্থায় দাসী আজাদ হওয়ার দুটি পদ্ধতি হতে পারে : ১। মনিব ইচ্ছাপূর্বক দাসী আজাদ করা। আর তা এখানে সম্ভব নয়। কেননা, আজাদ করা দাসীর দিকে সম্পর্কিত করেনি। ২। গর্ভস্থ সন্তানের অনুগামী হিসাবে গর্ভধারিণী তথা মা স্বাধীন হওয়া। কিন্তু মা গর্ভস্থ সন্তানের অনুগামী হতে পারবে না। কেননা, এতে বিষয়টি উল্টো করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তা এভাবে যে গর্ভস্থ সন্তান যা অনুগামী তা মূলে আর গর্ভধারিণী যে মূল তা অনুগামী হওয়া আবশ্যক হয়। আর ইহা কিয়াস বিরোধী। এজন্য আমরা বলি যে, এরূপ কথা দ্বারা দাসী আজাদ হবে না।

قوله : وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ الْأُمَّ الخ : সন্তান তার মায়ের অনুগামী হবে। যেভাবে গর্ভস্থ তার মায়ের অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং স্বাধীনা মহিলার সন্তান স্বাধীনা হবে, যদিও উক্ত সন্তানের পিতা দাস থাকে না কেন। তদ্রূপ বাদীর সন্তান গোলাম, বাদীই থাকবে যদিও সন্তানের পিতা স্বাধীন থাকেন না কেন। অর্থাৎ, মায়ের দিক প্রধান্য হবে। তাই মা আজাদ হলে সন্তান আজাদ আর মা দাসী থাকলে সন্তান দাস-দাসী হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং মনিব যদি দাসীকে অন্যত্র আজাদ পুরুষের সাথে বিবাহ দিয়ে দেয় আর উক্ত দাসী তার স্বামীর বীর্যে সন্তান প্রসব করে তবে সে সন্তান মনিবের দাস হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, সন্তান দুজনের বীর্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট হয়। তাই যদি মাতার দিককে প্রাধান্য দেয়া হয় তবে সন্তান দাস হবে আর পিতার দিক প্রাধান্য দেয়া হলে সন্তান আজাদ হবে। তাই প্রধান্য দেয়ার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং যেহেতু মাতা লালন-পালন করতে হয়, স্বামীর বীর্য দাসীর বীর্যের সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ের গর্ভে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরয়ীভাবে ও বাহ্যিকভাবে সন্তান মায়ের অংশ বিশেষ। সুতরাং প্রধান্য দেয়ার এসব কারণের ভিত্তিতে সন্তান মায়ের অনুগামী হবে। এমনিভাবে মনিব যদি তার সাথে অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তিবদ্ধ দাসীকে অন্য কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় আর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে ঐ বাচ্চা মাতার অনুগামী হবে। এমনিভাবে মনিব যদি মুদাব্বারকে কারো সাথে বিবাহ দিয়ে দেয় আর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে ঐ বাচ্চাও মাতার অনুগামী হবে।

قوله : وَوَلَدُ الْأَمَةِ الخ : মনিব থেকে দাসীর সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে সন্তান আজাদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, সন্তান মনিবের বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আর মনিবের বীর্য থেকে সে সন্তান সৃষ্ট হবে সে আজাদই হবে। আর মূলনীতি হচ্ছে, বীর্যের মালিকেরই সন্তান হয়ে থাকে। তাছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ দাসীর বীর্য মনিবের বীর্য হিসাবেই গণ্য হবে। তাই উভয় বীর্য যেন মনিবেরই। তাই সন্তান আজাদ হয়ে যাবে।

بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

পরিচ্ছেদ : এমন দাস সম্পর্কে যার কিছু অংশ স্বাধীন করা হয়।

مَن أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لم يَعْتِقْ كُلُّهُ وَسَعَى فِيمَا بَقِيَ وهو كَالْمُكَاتَبِ وان أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ ان يُحَرِّرَ أو يستسعى وَالْوَلَاءُ لَهُمَا أو يَضْمَنُ لو مُوسِرًا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ وَلَوْ شَهِدَ كُلٌّ بِعِتْقِ نَصِيبِ صَاحِبِهِ سَعَى لَهُمَا

অনুবাদ : আর যে তার গোলামের (কোন) অংশ আজাদ করে তাহলে সম্পূর্ণ গোলাম স্বাধীন হবে না, সে মনিবের জন্য অবশিষ্ট অংশের (মূল্য পরিশোধের) জন্য উপার্জন করবে। আর সে مكاتب (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) এর ন্যায় হবে। আর যদি (শরীকানাধীন গোলামের একজন শরীক তার অংশ স্বাধীন করে দেয়। তাহলে তার অন্য শরীকের ইচ্ছাধিকার থাকবে হয়তো স্বাধীন করবে নতুবা (গোলামকে) উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে আর (এ ক্ষেত্রে) ওয়ালা উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। অথবা যদি স্বাধীনকারী সচ্ছল হয় তবে মূল্য পরিশোধের জামিন হবে। এবং তা গোলাম থেকে উসূল করে নেবে। আর ওয়ালা স্বাধীনকারীর হবে। আর যদি প্রত্যেকেই তার শরীকের অংশ স্বাধীন করেছে বলে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে উভয় শরীকের (অনুকূলে তার অংশের অর্থ পরিশোধের) জন্য উপার্জন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মনিব যদি তার গোলামের অংশ বিশেষ স্বাধীন করে দেয় তবে গোলাম আংশিক আজাদ হবে এবং বাকী অংশের মুক্তির জন্য সে উপার্জন করবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এমতাবস্থায় পূর্ণ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। উক্ত মত পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে স্বাধীন করাটা বিভক্ত হতে পারে, কিন্তু সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতামত সাহাবাইন (রহ.)-এর অনুরূপ। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সাহাবাইন (রহ.) এর সাথে এ অবস্থায় যে, যখন দাসের মনিব একজন হবেন। পক্ষান্তরে যদি দাসের মালিক দুজন হয়ে থাকেন তবে আজাদকারী মনিবের সচ্ছলতার শর্তে বাকী অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধ করতঃ আজাদ করা তার দায়িত্বে থাকবে। আর অসচ্ছল হলে দাস নিজে উপার্জন করে তা মনিবকে প্রদান করতঃ স্বাধীন হয়ে যাবে।

মোটকথা, সাহাবাইন (রহ.) এর মতে স্বাধীন করাটা বিভক্ত হয় না, তাই যা বিভক্ত হতে পারে না তার অংশ-বিশেষ উল্লেখ দ্বারা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই আংশিক আজাদ করা দ্বরা সম্পূর্ণ আজাদ হয়ে যাবে।

তাছাড়া সাহাবাইন (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দলিল এই যে, স্বাধীন করার অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা সাব্যস্ত করা। আর স্বাধীনতা হচ্ছে শরয়ী বিধানগত একটি শক্তি। অর্থাৎ, শরীয়তের পক্ষ থেকে দাসের জন্য বিভিন্ন লেনদেনের শক্তি অর্জিত হওয়া। আর তা এভাবে অর্জিত হয় যে, তার বিপরীতে যা আছে তা দূর করে দেয়া। সুতরাং স্বাধীনতার বিপরীতে রয়েছে পরাধীনতা যা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি দুর্বলতা। এদিকে সতসিদ্ধ কথা

হচ্ছে শরীয়তের পক্ষ থেকে শক্তি ও দুর্বলতা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না বিধায় আজাদ করা ও বিভক্ত হতে পারে না। যেমনিভাবে তালাক অর্ধাংশকে গ্রহণ করে না। কিসাস অর্ধাংশ ক্ষমা করে দেয়াকে গ্রহন করে না। অর্ধেক দাসীকে উম্মেওয়ালাদ বানানো সম্ভব হয় না। তেমনি স্বাধীন করাটাও অর্ধাংশকে গ্রহণ করে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : স্বাধীন করার অর্থ হচ্ছে দাসত্ব দূর করার মাধ্যমে স্বাধীনতা সাব্যস্ত করা। কেননা, আজাদকারীর মালিকানা থাকা অবস্থায় অধিকার তারই হবে। আর দাসত্ব হচ্ছে শরীয়তের অধিকার। কেননা, যখন কাফের আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে এভাবে শাস্তি দিয়েছেন যে, তাদেরকে নিজের বান্দাদের গোলাম বানিয়েছেন। তাছাড়া এভাবেও বলা যায় যে, দাসত্ব সাধারণ মানুষের অধিকার। কেননা, মুজাহিদগণ যেভাবে যুদ্ধে প্রাপ্ত অন্যান্য সামানপত্র বন্টন করে নেন তদ্রূপ গোলাম-বান্দিদেরকেও বন্টন করে নেন। তদ্রূপ নিজ অধিকার ও দূর করে দেয়ার অধিকারও থাকবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনিব শুধু মালিকানা দূর করতে পারে দাসত্ব দূর করতে পারে না। আর মালিকানার বিষয়টি বিভক্তিযোগ্য তাই আজাদ করার বিষয়টিও বিভক্তিযোগ্য হবে।

যেমন ক্রয়-বিক্রয় বা দান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভক্তি হতে পারে। সুতরাং যেভাবে অর্ধেক গোলাম বিক্রি করা বা দান করা জায়েয তদ্রূপ স্বধীন করার বিষয়টিও বিভক্তিযোগ্য। আর বাকী অংশ যা আজাদ করা হয়নি তার ব্যাপারে গোলামের উপার্জন করা এবং তা মালিককে পরিশোধ করে স্বাধীনতা গ্রহণ করার বিষয়টি এজন্য যে, যে অংশ স্বাধীন করা হয়নি তার মূল্য গোলামের নিকট আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। তাই তা তার থেকে উসুল করা হবে। আর যে গোলাম নিজ উপার্জনের দরুন আজাদ হবে সে মুকাতাব এর ন্যায়। কেননা স্বাধীন করার কোন অংশকে যখন দাসত্বের দিকে সম্পর্কিত করা হবে তখন যেন সে পুরু নিজ সত্তার মালিক হয়ে গেল। তাই আজাদ হওয়াটা বিভক্ত হলো না। আবার কোন অংশে মনিবের মালিকানা না থাকাটা বুঝায় যে সে পুরু গোলামের মালিক নয়। তাই আমরা উভয় দিক বিবেচনা করে বলি যে, উক্ত গোলাম মুকাতাব এর ন্যায় হয়ে যাবে। কেননা যেভাবে মুকাতাব নিজ উপার্জনের মালিক, কিন্তু দেহ্ সত্তার মালিক নয়। আর তার উপার্জন চুক্তি বিনিময়ের মতো বিধায় মনিবের অধিকার থাকবে সে উক্ত গোলাম দ্বারা উপার্জন করিয়ে বিনিময় গ্রহণ করবে। অথবা বিনিময় ছাড়া থাকে স্বাধীন করে দেবে। তদ্রূপ উক্ত গোলাম থেকে তার উপার্জিত মাল গ্রহণ করতঃ স্বাধীন করতে পারে বা চাইলে বিনিময় ছাড়াও স্বাধীন করতে পারবে। কিন্তু মুকাতাব ও উক্ত গোলামের মধ্যে পার্থক্য হলো মুকাতাব যদি তার সাথে কৃত চুক্তি পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তবে সে গোলাম হিসাবে বাকী থাকবে। আর এ গোলাম যার কিয়দাংশ স্বাধীন করা হয়েছে সে যদি বাকী অংশের মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে তাকে সম্পূর্ণ গোলাম বলা যাবে না। কেননা, মালিকানা অন্য কারোর দিকে যাওয়ার মতো নয়। সুতরাং তা রহিত করণকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু কিতাবাতের চুক্তি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিলের জবাব : তালাক ও কিসাসের বিনিময়ে মাফ করার ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার দিককে প্রাধান্য দিয়ে পুরোর দিকে প্রাধান্য দিয়ে পুরোর দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। এ জন্য আলোচ্য মাসআলাকে উক্ত মাসআলার সাথে তুলনা করা যাবে না। তদ্রূপ উম্মেওয়ালাদের মাসআলার সাথে উক্ত মাসআলার তুলনা করা সঠিক নয়। কেননা, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উম্মে ওয়ালাদ বিভক্ত হয়। যেমন দুজন একটি দাসীর মালিক এমতাবস্থায় দাসী একটি সন্তান প্রসব করল। অতঃপর যে কোন একজন দাবী করল এ সন্তান আমার ঔরস থেকে হয়েছে। তাহলে তার অর্ধেক উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে হা সে বাকী অর্ধেকের স্বাধীন করার ন্যায়। এজন্য এমতাবস্থায় বিক্রি করা জায়েয নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় উম্মে ওয়ালাদের দাবীদার এর উপর আবশ্যক হচ্ছে অন্য অংশিদার এর জরিমানা প্রদান করা। তাই যখন জরিমানা পরিশোধ করে দেবে তখন সে উক্ত বাদীর পূর্ণ মালিক হয়ে যাবে এবং পুরু দাসীই উম্মেওয়ালাদ হয়ে যাবে। সুতরং প্রমাণিত হল যে, উম্মে ওয়ালাদ বিভক্তি হতে পারে।

قوله : وَ اِنْ اَعْتَقَ نَصِيْبَهُ الخ : ইমাম কুদুরী (রহ.) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যদি কোন গোলাম দুই শরিকানাধীন হয় এবং একজন তার অংশ স্বাধীন করে দেয় তাহলে এ অংশটুকু স্বাধীন হয়ে যাবে। অতঃপর আজাদকারী মনিব যদি সচ্ছল হয় তাহলে অপর শরীকের এখতিয়ার থাকবে। সে চাইলে তার অংশ স্বাধীন করে দিতে পারে। অথবা নিজ অংশের স্বাধীন করার মূল্য পরিশোধের দায় স্বাধীনকারীর উপর আরোপ করবে। অথবা গোলামকে উপার্জন করতে বাধ্য করা হবে। দ্বিতীয় মনিব যদি আজাদকারীর উপর মূল্যের দায় আবশ্যক করে তাহলে আজাদকারী পরিশোধকৃত অর্থ গোলামের উপার্জন থেকে উসূল করে নেবে। আর পরবর্তীওয়ালা সম্পর্ক আজাদকারীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর যদি দ্বিতীয় শরীক তার অংশকে স্বাধীন করে দেয়, কিংবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করে তাহলে উভয়ের সাথে ওয়ালা সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর যদি আজাদকারী অসচ্ছল হয়, তবে অপর শরীকের দুটি এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে গোলামকে স্বাধীন করে দেবে। অথবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। উভয় অবস্থায় ওয়ালা সম্পর্ক উভয়ের সাথে হবে।

ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে সচ্ছলতার অবস্থায় ক্ষতিপুরণ আদায় এবং অসচ্ছলতার অবস্থায় উপার্জনে নিযুক্ত করা ছাড়া দ্বিতীয় শরীকের আর কোন পন্থা থাকবে না। আর আজাদকারী পরিশোধ কৃত অর্থ গোরামের নিকট থেকে উসুল করতে পারবে না। অবশ্যই ওয়ালা এর সম্পর্ক আজাদকারীর সাথেই হবে। (কুদুরী কিতাবুল ইতাক)।

ইমাম কুদুরীর বক্তব্যের বিশ্লেষণ : আজাদকারী তার নিজ শরীককে জরিমানা পরিশোধের পর এ পরিশোধকৃত টাকা দাস থেকে ফেরত নেওয়া দু'টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। ১ম মূলনীতি : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে আজাদ করাটা বিভক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজাদ করা বিভক্তিযোগ্য নহে। যা ইতিপূর্বে আমরা দলিল প্রমাণ দ্বারা আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় মূলনীতি : আজাদকারী সচ্ছল হলেও গোলামের উপার্জন থেকে শরীককে প্রদানকৃত টাকা উসুল করতে পারবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজাদকারীর সচ্ছলতা গোলামের উপার্জন থেকে গ্রহণ করা থেকে বাধ সাধবে। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল হচ্ছে : আজাদকারী তার অংশ আজাদ করার কারণে তার শরীক ব্যক্তির অংশ বিনষ্ট করে ফেলেছে। কেননা, যদি সে এখন চায়ও তবুও তার অংশ তার মালিকানার বহাল করতে পারবে না। তাই তার উপর অপর শরীক ব্যক্তির অংশ নষ্ট করার দরুন জরিমানা আবশ্যক হবে। সে সচ্ছল বা অসচ্ছল ইহার কারণে কোন ব্যবধান হয় না।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে : আজাদকারীর উপর কোন রূপ জরিমানা আবশ্যক না হওয়া। কেননা, সে তো তার মালিকানা বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। তাই সে সীমালঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হবে না। যদিও তার স্বাধীন করার দরুন অন্যের ক্ষতি হয়েছে। যেমন কেহ তার মালিকানা জমিতে খড়কুটা জ্বালাল আর তাতে নিকটবর্তী মালিকের জমিনে কিছু জলে গেল তাহলে খড়কুটা জালানেওয়ালার উপর জরিমানা আবশ্যক হয় না।

উল্লিখিত উভয় সুরতেই পরস্পর বিরোধী। তাই সাহাবাইন (রহ.) উভয় যুক্তিকে পরিহার করে হাদীসের উপর আমল করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে : হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হুজুর (সা.) এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যে তার অংশ স্বাধীন করে দিয়েছে :

اِنْ كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ وَ اِنْ كَانَ فَقِيْرًا سَعٰى فِى حِصَّتِهٖ

আজাদকারী যদি সচ্ছল হয় তবে অপর অংশের জামিন হবে। আর যদি অসচ্ছল হয় তাহলে গোলাম সে নিজে উপার্জন করবে।

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিষয়টিকে দু অবস্থার সাথে বিভাজন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, আজাদকারী

যদি সচ্ছল হয় তবে সে শুধু জরিমানা আদায় করবে। গোলামের উপর উপার্জনের দায়িত্ব অর্পিত হবে না। আর যদি আজাদকারী অসচ্ছল হয় তবে গোলামের উপর দায়িত্ব দেয়া হবে উপার্জন করার। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, আজাদকারী যদি সচ্ছল হয় তবে গোলাম উপার্জন করতে হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : শরীকের অংশের মূল্য গোলামের কাছে আবদ্ধ হয়ে আছে। সুতরাং শরীকের জন্য অনুমতি থাকবে সে গোলাম থেকে উপার্জনের মাধ্যমে তার জরিমানা উসুল করে নেবে। তা এমন হলো যে কার কাপড় অন্য কোন একজনের রং এর পাত্রে পতিত হল এবং উক্ত কাপড় রঞ্জিত হয়ে গেল। সুতরাং এ সুরতে যেহেতু কাপড়ের মালিকের কাপড় রঞ্জিত হওয়ায় অন্যের কিছু রং কাপড়ে আবদ্ধ হয়ে আছে, তাই রং এর মালিক কাপড় এর মালিকের কাছ থেকে জরিমানা নেয়া এবং কাপড়ের মালিককে জরিমানা দেয়ার হুকুম প্রদান করা হবে। অনুরূপ হুকুম অত্র মাসআলায় প্রদান করা হবে। তবে এখানে গোলামের মাধ্যমে উপার্জন করানোর সুযোগ রয়েছে।

সাহাবাইন (রহ.) এর পেশকৃত হাদীসের জবাব : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ,. উপার্জনকে স্বাধীনকারীর অসচ্ছলতার উপর শর্ত যুক্ত করেছেন। আর ইহা অসচ্ছলতা না থাকার সময়ের বিপরীত নয়। কেননা যখন কোন বস্তুকে শর্তযুক্ত করা হয়। শর্ত পাওয়ার সময় ঐ বস্তু পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু শর্ত পাওয়া না গেলে ঐ বস্তুও না পাওয়াটা জরুরী নয়। যেমন কেহ তার গোলামকে বলল, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি আজাদ, তাহলে ঘরে প্রবেশ করলে নিঃসন্দেহে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর ঘরে প্রবেশ না করা অবস্থায় আজাদী সংঘটিত হতে পারে না বলা যাবে না। বরং আজাদ হতে পারে। কেননা, পরে যখন মনিব বিনা শর্তে انت حر বলে দিলে সে আজাদ হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে আজাদকারী সচ্ছল থাকা অবস্থায়ও গোলামের মাধ্যমে উপার্জন করানো যাবে। উল্লেখ্য যে, আজাদকারী যার উপর জরিমানা আবশ্যক হয়, তার সচ্ছলতার ক্ষেত্রে সহজতর সচ্ছলতাই যথেষ্ট। ধনাঢ্য সচ্ছলতা জরুরী নয়। আর সহজতর সচ্ছলতা হচ্ছে এতটুকু সম্পদের মালিক হওয়া যার দ্বারা শরিকের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে পারে। আর এতটুকু পরিমাণ সম্পদ তার নিত্য প্রয়োজনীয় খরচাদির অতিরিক্ত হতে হবে। আর যদি আজাদকারী অসচ্ছল হয়, তাহলে শরীক এর ইচ্ছাধিকার থাকবে। হয়তো সে স্বাধীন করে দেবে তার অংশ নতুবা গোলাম থেকে উপার্জনও করাতে পারবে। কেননা তার অংশের মালিকানা বহাল রয়েছে। আর এই দুই অবস্থায় উক্ত দ্বিতীয় শরীক গোলামের ওয়ালার অধিকারী হবে। কেননা এতটুকু অংশ আজাদ করাটা তার দিকেই সম্পর্কিত হবে। এ বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবাইন (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সাথে একমত।

قوله : وَلَوْ شَهِدَ كُلٌّ بِعِتْقٍ الخ : যদি কোন গোলামের দু শরীক মালিক হয়, আর তারা পরস্পরের বিপক্ষে সাক্ষ দেন যে, সে তার অংশ আজাদ করেছে। তাহলে গোলামের উপর আবশ্যক হচ্ছে সে উভয়ের জন্য উপার্জন করবে এবং প্রত্যেকের অংশকে সে উপার্জন করে পরিশোধ করে দেবে। তারা উভয় সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, কিংবা দু' জনের একজন সচ্ছল আর অপরজন অসচ্ছল। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) বলেন, যদি উভয় শরীক সচ্ছল হয়, তাহলে গোলামকে উপার্জন করতে হবে না। কেননা প্রত্যেকেই গোলামকে উপার্জন থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। কেননা, তারা তাদের সাক্ষ্যের কারণে একজন অপরজনের কাছে জরিমানা আদায়ের দাবী করছে। কেননা, সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজাদকারী সচ্ছল হলে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা যায় না, বরং তাদের দাবী অপরজনের উপর এজন্য সাব্যস্ত হয়নি যে সে তা অস্বীকার করেছে। আবার গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা যায় না বরং তাদের দাবী অপর জনের উপর এ জন্য সাব্যস্ত হয়নি যে সে তা অস্বীকার করেছে। আবার গোলামকে উপার্জন থেকে মুক্তির ঘোষণা করছে। কেননা, নিজের ব্যাপারে নিজ স্বীকরোক্তি গ্রহণযোগ্য। আর ঐ গোলামের ওয়ালা স্থগিত থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : উভয়ের প্রত্যেকেই দাবী করছে যে অপরজন তার অংশ স্বাধীন করে

দিয়েছে। সুতরাং তাদের দাবী অনুযায়ী গোলাম মুকাতাব হয়ে যাবে। তাই গোলামকে এখন একান্ত দাস বানানো যাবে না। যদিও একজনের ব্যাপারে অপরজনের ধারণা সঠিক নয়। তার পরেও তা নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। এ জন্য তাদের বলা হবে তারা যেন এ গোলামকে একান্ত দাস হিসাবে ব্যবহার না করে, বরং তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। কেননা, ইহা নিশ্চিত যে সে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার রাখে। সে তার দাবীতে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী। কেননা, সে যদি তার দাবীতে সত্যবাদী হয় তবে তো গোলাম মুকাতাব হবে, আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে গোলাম তো তার অধিনস্থই থাকবে। আর দাসের উপার্জন তার মনিবের জন্যই তো হবে।

সুতরাং গোলাম হয় তো মুকাতাব হবে অথবা অধিনস্থ দাস হবে। তাই উভয় শরীকই গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। উভয় সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। তাদের সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতা কোন প্রকার ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। কেননা উভয়ই অপরজনের অংশ স্বাধীন করে দেয়ার দাবী করছে। উভয় অবস্থায় দুটির একটি হবে। অর্থাৎ, সচ্ছলতার অবস্থায় জরিমানা গ্রহণ করা বা গোলামকে উপার্জনে নিয়োজিত করা। কেননা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে সচ্ছল অবস্থায় বা অসচ্ছল অবস্থায় গোলামকে উপার্জন নিযুক্ত করতে কোন বাধা নেই। আবার এ মাসআলার জরিমানা নেয়া অসম্ভব। কেননা শরীক ব্যক্তি আজাদ করাকে অস্বীকার করছে অধিকন্তু সে অপরকে দাবী করেছে যে অপরজন তার অংশ আজাদ করে দিয়েছে। এ জন্য জরিমানা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই গোলাম দ্বারা উপার্জন করে নিজ নিজ অংশের বিনিময় গ্রহণ করতঃ গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকেই গোলমের ওয়ালা সম্পর্ক প্রাপ্ত হবে। কেননা প্রত্যেকেই দাবী করছে যে গোলাম অপরের অংশ স্বাধীন করায় স্বাধীন হয়েছে। যার ওয়ালা সে নিজে প্রাপ্ত হবে।

وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِتقَهُ بِفِعلِ فُلَانٍ غَداً وَعَكَسَ الْآخَرُ وَمَضَى ولم يَدْرِ عَتَقَ نِصْفُهُ وَسَعَى فِي نِصْفٍ لَهُمَا وَلَوْ حَلَفَ كُلٌّ وَاحِدٍ بِعِتقِ عَبْدِهِ لم يَعْتِقْ وَاحِدٌ وَمَن مَلَكَ ابْنَهُ مع آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ ولم يَضْمَنْ وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُعْتِقَ أو يَسْتَسْعِيَ وَإِنْ اشْتَرَى اَجْنَبِيٌّ ثُمَّ الاَبُ مَا بَقِيَ فَلَهُ اَنْ يَضْمَنَ الاَبُ اَوْ يَسْعِى وَ اِنِ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِمَّنْ يَمْلِكُ ابْنَهُ لَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ عَبْدٌ لِمُوسِرِيْنِ دَبَّرَهُ وَاحِدٌ وَحَرَّرَهُ آخَرُ ضَمَّنَ السَّاكِتُ الْمُدَبِّرَ وَالْمُدَبِّرُ الْمُعتِقَ ثُلُثَهُ مُدَبَّرًا إِلَّا مَا ضَمِنَ وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ هِيَ أُمُّ وَلَدِكَ وَأَنْكَرَ تَخْدِمُهُ يَوْمًا وَتَتَوَقَّفُ يَوْمًا -

---

অনুবাদ : যদি শরীকদের একজন তার গোলামের স্বাধীন হওয়াকে আগামীকাল অমুকের কাজের সাথে শর্তযুক্ত করে। আর অন্যজন এর বিপরীত করে (অর্থাৎ, অন্যজন অমুকের কাজের সাথে না করার শর্তে স্বাধীন করে) এবং আগামী দিন অতিবাহিত হয়, কিন্তু জানা যায়নি তাহলে গোলামের অর্ধাংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। আর বাকী অর্ধাংশের জন্য উভয়ের অনুকুলে উপার্জন করবে। যদি (দুই মনিব নিজ নিজ স্বতন্ত্র মালিকানার দুই

গোলামের সম্বন্ধে) প্রত্যেকে শপথ করে (অমুক আগামী কাল প্রবেশ করলে বা না করলে) তার গোলাম স্বাধীন হওয়ার (আর আগামীকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রবেশ করা না করা জানা যায়নি) তাহলে (দু গোলামের) কেহই আজাদ হবে না। যে ব্যক্তি অন্যের সাথে তার ছেলের মালিক হবে। তার অংশ স্বাধীন হয়ে যাবে এবং সে (অন্য অংশ স্বাধীন হওয়ার) জামিন হবে না। আর অপর শরীকের অধিকার রয়েছে সে ইচ্ছা করলে সে নিজের অংশকে আজাদ করে দেবে। আবার ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করবে। আর যদি অনাত্মীয় ব্যক্তি প্রথমে ক্রয় করে অতঃপর পিতা বাকী অংশ খরিদ করে তাহলে অনাত্মীয় ব্যক্তির অধিকার আছে সে (সন্তানের পিতাকে দায়বদ্ধ করবে অথবা গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করতে পারবে। (তার অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য) যে ব্যক্তি পূর্ণ গোলামের মালিক তার থেকে (পিতা) তার ছেলের অর্ধেক ক্রয় করে তবে পিতা বিক্রেতার জন্য (বাকি অর্ধেকের) জামিন হবে না। তিন সচ্ছল ব্যক্তির একটি গোলাম (শরীকানাধীন) অতঃপর একজন (তার অংশ) মুদাব্বার বানালো। আর একজন তার অংশ স্বাধীন করল, তাহলে নিরব ব্যক্তি মুদাব্বিরকে (তার এক তৃতীয়াংশের) জামিন বানাবে। আর মুদাব্বির ব্যক্তি মুক্তি দানকারীকে মুদাব্বির অবস্থায় গোলামের মোট মূল্যের এক তৃতীয়াংশের জামিন বানাবে। তবে সে যে পরিমাণের জামিন হয়েছে তার নয় আর যদি (দু শরীকানাধীনের একজন) তার শরীককে বলে সে তোমার উম্মেওয়ালাদ আর দ্বিতীয় শরীক তা অস্বীকার করে, তাহলে দাসী একদিন অস্বীকার কারীর সেবা করবে এবং একদিন বিরত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ عَلَّقَ اَحَدُهُمَا الخ : যদি দু ব্যক্তি একটি গোলামের মালিক হয়। আর তাদের একজন বলল গোলাম যদি আগামীকাল এ ঘরে প্রবেশ করে তবে সে আজাদ, আর অন্য শরীক বলল, গোলাম যদি আগামীকাল এ ঘরে প্রবেশ না করে তবে সে আজাদ। অতঃপর আগামীকাল অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু গোলামটি ঘরে প্রবেশ করছিল নাকি প্রবেশ করেনি তা জানা যায়নি। তাহলে গোলামের অর্ধেক স্বাধীন হয়ে যাবে। এবং বাকী অর্ধাংশের জন্য উপার্জন করবে এবং সমভাবে উভয় মনিবকে প্রদান করতঃ সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে যদি উভয় মনিব অসচ্ছল হয় তবে গোলাম তার পূর্ণমূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি উভয় মনিব সচ্ছল হয় তাহলে গোলামের উপার্জন করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম মোহাম্মদ (রহ.)-এর দলিল হল : যার ব্যাপারে বলা হয়েছে উপার্জন রহিত হয়ে যাবে, সে অজ্ঞাত, আর অজ্ঞাত ব্যক্তির উপর শরীয়তের কোন হুকুম প্রযোজ্য করা যায় না। সুতরাং বিষয়টি এমন হল যেমন কেহ বলল, অন্যকে তুমি আমাদের মধ্য থেকে কোন একজনের নিকট এক হাজার টাকা পাবে। এক্ষেত্রে কাহারো উপর টাকা আবশ্যক করা যাবে না। কেননা, বিষয়টি অজ্ঞাত রয়েছে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় অজ্ঞাত থাকার দরুন হুকুম প্রয়োগ করা যাচ্ছে না।

শায়খাইন (রহ.) এর দলিল : শপথকারী দুজনের এক জনের শপথ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আর একজনের শপথ ভঙ্গ হবে। তাই অর্ধেক উপার্জন রহিত হওয়াটা নিশ্চিত। কেননা হয় তো গোলাম ঘরে প্রবেশ করছে বা করেনি। এ দু অবস্থায় একটি অবশ্যই সংগটিত হয়েছে। আর যে কোন একটি শর্ত পাওয়ার কারণে গোলাম অবশ্যই অর্ধেক স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যে অর্ধাংশ স্বাধীন হয়েছে তার জন্য উপার্জন করার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং পূর্ণ গোলামের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনের ফয়সালা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য গোলাম উপার্জন করে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে।

ইমাম মোহাম্মদ (রহ.) এর দলিলের জবাব হচ্ছে : যার জন্য উপার্জনের ফায়সালা প্রদান করা হবে সে

অজ্ঞাত তা তো ঠিক আছে, কিন্তু যখন আজাদকৃত গোলামকে দুজনের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়, তখন উভয় মনিব ফয়সালার স্থানে পরিণত হলো। আর দুজনকে ফয়সালার স্থানে পরিণত করতে কোন অজ্ঞতা নেই। আর যখন অজ্ঞতা দূর হয়ে গেল তখন গোলাম বাকী অর্ধাংশের জন্য উপার্জন করতে কোন বাধা রইল না। আর উপার্জনের টাকা উভয় শরীকের মাঝে বন্টন করে দেবে। উক্ত মাসআলার একটি উদাহরণ হচ্ছে কেহ তার দুজন গোলাম থেকে একজনকে অনির্দিষ্টভাবে স্বাধীন করল বা নির্দিষ্টভাবে স্বাধীন করার পর ঐ নির্ধারিত গোলামের কথা ভুলে গেল। অতঃপর মনিবের স্বরণ হওয়া বা বলার পূর্বে মুত্যুবরণ করল। তাহলে উভয় গোলাম অর্ধাংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। আর বাকী অর্ধাংশের জন্য উপার্জন করবে।

قوله : وَ لَوْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ الخ : দুজন গোলামের পৃথক পৃথক মনিব রয়েছে। আর উক্ত মনিবদ্বয় তৃতীয় আর এক জনের কাজ হওয়া না হওয়ার উপর গোলামের স্বাধীনতা শর্তযুক্ত করে যেমন এক মনিব বলল, যদি যায়েদ আগামীকাল ঘরে প্রবেশ করে তবে আমার গোলাম আজাদ। আর অন্যজন বলল দি আগামীকাল যায়েদ ঘরে প্রবেশ করে তবে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর আগামীকাল অতিবাহিত হল। কিন্তু যায়েদ প্রবেশ করল কি না তা জানা গেল না। তাহলে কোন গোলাম আজাদ হবে না। ইহা সর্বসম্মত অভিমত। কেননা, যায়েদের ঘরে প্রবেশ হওয়া বা না হওয়া অজ্ঞাত থাকার দরুন বিষয়টি অজ্ঞাত রয়ে গেল। এমতাবস্থায় অজ্ঞাতভাবে একজনের গোলাম আজাদ এর ফায়সালা দেয়া সম্ভব হবে না। এমনিভাবে যে গোলাম আজাদ হবে সে অজ্ঞাত। এজন্য কাজী কোনরূপ ফায়সালা দিতে পারবেন না। তাই কোন গোলাম আজাদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি এক গোলামের ব্যাপারে হতো তবে গোলামের ব্যাপার জ্ঞাত ছিল আর মনিবের ব্যাপার অজ্ঞাত এক্ষেত্রে জ্ঞাতকে অজ্ঞাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে গোলাম আজাদ হওয়ার ফায়সালা প্রদান করা সহজ। কিন্তু আলোচ্য মাসআলা এর ব্যতিক্রম। কেননা, এখানে উভয় দিক তথা মনিব ও গোলাম এর দিকে অজ্ঞতা বিদ্যমান। তাই কোন গোলামই আজাদ হবে না।

قوله : مَنْ مَلَكَ اِبْنَهُ الخ : যদি দুজন ব্যক্তির একজনের ছেলেকে ঐ দুজন ব্যক্তি ক্রয় করে। অর্থাৎ, গোলামের অনাত্মীয় একজন আর আত্মীয় একজন মিলে গোলাম খরিদ করে। তাহলে পিতার অংশ বা আত্মীয়ের অংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, নিকটাত্মীয় মালিক হওয়ার সাথে সাথে গোলাম স্বাধীন হয়ে যায়। অর্থাৎ, নিকটাত্মীয়ের ক্রয় করা আজাদ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। আর এ অবস্থায় পিতা বা নিকটাত্মীয়ের উপর শরীক ব্যক্তির অংশের দায়ভার আবশ্যক হবে না। শরীক ব্যক্তি অপর জনের গোলামটি তার নিকটাত্মীয় হওয়ার সংবাদ পূর্বে থেকে জানা থাকুক বা না থাকুক। অনুরূপ বিধান যদি মিরাস সূত্রে নিকটাত্মীয় পেয়ে থাকে। যেমন এক মহিলা তার স্বামীর ছেলেকে ক্রয় করল। অতঃপর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করল। এখন তার স্বামী তথা গোলাম ছেলের পিতা স্ত্রীর পরিত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে নিজ সন্তানের এক অংশ প্রাপ্ত হল। তাহলে পিতার অংশ বা নিকটাত্মীয়ের অংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। উল্লিখিত মাসআলায় শরীক ব্যক্তি চাইলে তার অংশ স্বাধীন করে দিতে পারে। অথবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যদিও নিয়মের ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। অর্থাৎ, মিরাস হিসাবে যদি কেহ তার নিকটাত্মীয়ের আংশিক মালিক হয় তবে তার অংশ স্বাধীন করে দেবে কিংবা গোলামকে তার অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে নিযুক্ত করবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য নয়। বরং পিতা সচ্ছল হলে পুত্রের অর্ধেক মূল্যের জামিন হবে। আর যদি পিতা অসচ্ছল হয় তবে পুত্র তার অর্ধাংশের জন্য উপার্জন করবে। তাদের দলিল হচ্ছে : পিতা তার অংশ আজাদ করার কারণে অন্যের অংশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কেননা, নিকটাত্মীয় ক্রয় করার অর্থই হচ্ছে আজাদ করে দেয়া। তা এমন হল যেমন দুজন ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করে একজন তার অংশ আজাদ করে দিল। সুতরাং যেহেতু স্বাধীন কর বিভক্তি হতে পারে না তাই আজাদকারী সচ্ছল হলে সে তার শরীকের অংশের জামিন হবে। আর যদি অসচ্ছল

হয়, তবে গোলাম বাকী অর্ধাংশের জন্য উপার্জন করবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : আলোচ্য মাসআলার শরীক তার অংশ বিনষ্ট করার জন্য সন্তুষ্ট। আর সন্তুষ্টির অবস্থায় অপরের অংশ স্বাধীন হয়ে গেলে এ অংশের জামিন হতে হয় না।

সুতরাং সে পিতা থেকে জরিমানা উসুল করতে পারবে না। যেমন কেহ নিজ ইচ্ছায় তার শরীককে তার অংশ স্বাধীন করার অনুমতি প্রদান করে অতঃপর শরীক ব্যক্তি তার অংশ স্বাধীন করে দেয়। তাহলে দ্বিতীয় শরীকের অংশ স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল, আর আলোচ্য মাসআলার অপর শরীক নিজ অংশ বিনষ্টের ব্যাপারে রাজি থাকার প্রমাণ হল সে অপর শরীক গোলামের পিতার সাথে এমন ব্যাপারে শরীক হয়ে ক্রয় করেছে যা পিতার অংশ স্বাধীন হওয়ার কারণ। উল্লেখ্য যে নিকটাত্মীয় ক্রয় করা স্বাধীন হওয়ার কারণ নয়, বরং ক্রয়ের কারণে বা অন্য কারণে মালিক হওয়া স্বাধীন হওয়ার কারণ। সুতরাং ক্রয় করা আজাদের কারণ নয়, বরং তা কারণের কারণ।

قوله : وَاِنِ اشْتَرٰى اَجْنَبِيٌّ الخ : যদি কোন গোলামকে প্রথমে অনাত্মীয় একজন অর্ধেক ক্রয় করে অতঃপর গোলামের পিতা বাকী অর্ধেক ক্রয় করল। আর পিতা সচ্ছল তাহলে গোলামের অর্ধাংশের মূল্যের জামিন পিতা হবে। কেননা, এমতাবস্থায় শরীক ব্যক্তি কোন ক্রমেও তার অংশ বিনষ্ট করতে সন্তুষ্ট ছিল না। তবে হা যদি শরীক ব্যক্তি চায় তবে সে অর্ধাংশের মূল্য গোলামকে পরিশোধ করার জন্য উপার্জনে বাধ্য করতে পারবে। কেননা, এ মূল্য গোলামের কাছে আবদ্ধ হয়ে আছে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতামত। কেননা তার মতে শরীক ব্যক্তি সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল হোক। অন্য শরীক ব্যক্তি তার অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য গোলামকে উপার্জনে বাধ্য করতে পারবে।

পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজাদকারী ব্যক্তি সচ্ছল হলে গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করা যাবে না। বরং আজাদকারী সে পিতাই হোক যদি সচ্ছল হয় তবে জরিমানা তাকেই আদায় করতে হবে। সারকথা আলোচ্য মাসআলার শরীক ব্যক্তি পিতার নিকট থেকে জরিমানা অথবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করে তার উপার্জন থেকে অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে।

قوله : وَاِنِ اشْتَرٰى نِصْفَ اِبْنَهٗ الخ : যদি কোন ব্যক্তি পূর্ণ গোলামের মালিক হয়, আর তার থেকে উক্ত গোলামের কোন নিকটাত্মীয় অর্ধেক ক্রয় করল, এমতাবস্থায় যে উক্ত নিকটাত্মীয় সচ্ছল; তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে বিক্রেতার জন্য নিকটাত্মীয় থেকে জরিমানা উসুল করা আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যদি নিকটাত্মীয় সচ্ছল হয় তবে জামিন হবে। (বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে।)

قوله : عَبْدٌ لِمُوْسِرِيْنَ الخ• : যদি তিন ব্যক্তির শরীকানাধীন একটি গোলাম থাকে। আর তাদের একজন তার অংশকে মুদাব্বার বানিয়ে দেয়। আর একজন তার অংশকে স্বাধীন করে দেয় আর একজন চুপ থাকে। আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী এবং আজাদকারী উভয়ই সচ্ছল থাকে। তাহলে এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে চুপ ব্যক্তির অধিকার থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের জামিন মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে বানাবে। সুতরাং মুদাব্বার ব্যক্তি চুপ ব্যক্তিকে সাধারণ গোলামের এক তৃতীয়াংশের মূল্য আদায় করবে। আর মুদাব্বার ঘোষণা কারীর অধিকার থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের জামিন আজাদকারীকে বানাবে। তবে সে যে পরিমাণ চুপ ব্যক্তিকে প্রদান করেছে বা জামিন হয়েছে তার দায় স্বাধীনকারীর উপর আরোপ করতে পারবে না। সুতরাং স্বাধীনকারী ব্যক্তি মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে মুদাব্বার গোলামের এক তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করবে। উদাহরণের পূর্বে একথা জেনে রাখা ভাল যে শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণ গোলামের দুই তৃতীয়াংশের মূল্য হয়ে থাকে মুদাব্বারের। যেমন : সাধারণ গোলামের মূল্য যদি হয় ৫৪ দিনার। তাহলে মুদাব্বারের মূল্য ৩৬ দিনার তাই মুদাব্বারের এক তৃতীয়াংশ হবে ১২ দিনার, আর সাধারণ গোলামের এক তৃতীয়াংশ হবে ১৮ দিনার।

মোটকথা হচ্ছে মুদাব্বার ঘোষণাকারী আজাদকারী ব্যক্তির নিকট থেকে ১২ দিনার গ্রহণ করবে। আর চুপ ব্যক্তি মুদাব্বার ব্যক্তির নিকট থেকে ১৮ দিনার গ্রহণ করবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) বলেন, মুদাব্বার ঘোষণাকারী ব্যক্তি পূর্ণ গোলামের মালিক হবে এবং সে তার বাকী দুশরীকের জরিমানা আদায় করবে। অর্থাৎ, মুদাব্বার ঘোষণাকারী স্বাধীনকারীর এক তৃতীয়াংশ এবং চুপ ব্যক্তির এক তৃতীয়াংশের জামিন হবে। মুদাব্বার ঘোষণাকারী সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও সাহাবাইন (রহ.) এর মধ্যকার মত পার্থকের কারণ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মুদাব্বার বানানোটা বিভাজ্য যোগ্য। আর সাহাবাইন (রহ.) এর নিকট মুদাব্বার বানানোটা বিভাজ্য যোগ্য নয়। সুতরাং এ মূল ভিত্তির আলোকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, যেহেতু মুদাব্বার বানানো বিভাজ্য যোগ্য, তাই তা শুধু মুদাব্বার ঘোষণাকারীর অংশে সিমাবদ্ধ থাকবে। আর এ ঘোষণার কারণে যেহেতু বাকী দুশরীকের অংশ বিনষ্ট করে দিয়েছে তাই তারা ইচ্ছা করলে তাদের অংশ আজাদ করে দেবে। অথবা মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে জরিমানা গ্রহণ করবে। অথবা গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করে দেবে। অথবা পূর্বাবস্থায় বহাল রেখে দেবে, কেন না তাদের প্রত্যেকের তাদের অংশে পূর্ণ মালিকানা রয়েছে। তবে হা এক শরীক তার অংশকে মুদাব্বার ঘোষণা করার কারণে বাকী দুই শরীকের অংশ বিক্রি করা বা হেবা করার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

আবার তাদের একজন তার অংশ আজাদ করার কারণে অন্যান্য সুযোগ যথা উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। আর তৃতীয়জন যিনি তার অংশের ক্ষেত্রে নিরবতা পালন করেছেন তার সামনে দুটি পথ বিদ্যমান। একটি হল, মুদাব্বার করা আর দ্বিতীয়টি হল অপর শরীক কর্তৃক স্বাধীন করা। কিন্তু উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে জরিমানা গ্রহণ করবে। আজাদকারী থেকে জরিমানা গ্রহণ করতে পারবে না। যাতে করে তার গৃহীত জরিমানাটা বিনিময়ের জরিমানায় পরিণত হয়। কেননা, জরিমানার ক্ষেত্রে বিনিময়ের জরিমানাই আসল। আর মুদাব্বার থেকে যে জরিমানা গ্রহণ করা হয় তা বিনিময়ের জরিমানা। আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী জরিমানা আদায়ের পর তার অধিকার থাকবে যে সে ইচ্ছা করলে আজাদকারী থেকে এক তৃতীয়াংশ মূল্য মুদাব্বার হিসাবে উসুল করে নিবে। কেননা, গোলাম মুদাব্বার হিসাবে তার এক তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হয়েছে। আর জরিমানার ক্ষেত্রে বিনষ্ট পরিমাণই জরিমানা আবশ্যক হয়ে থাকে।

আর মুদাব্বার যা নিরবতা পালনকারীকে জরিমানা স্বরূপ প্রদান করেছে তা আজাদকারী থেকে উসুল করতে পারবে না। কেননা, সে যখন মুদাব্বার ঘোষণা করেছে তখনই সে জরিমানা আদায় সাপেক্ষে গোলামের মালিক হয়ে গেল। তবে হা এর মালিকানা আসল অবস্থা হিসাবে নয়, বরং জরিমানা আদায় সাপেক্ষে মালিক হয়েছে। সুতরাং এ মালিকানার কারণে সে যা আদায় করেছে তা আজাদকারী থেকে গ্রহণ করতে পারবে না।

قوله : وَلَوْ قَالَ لِشَرِيْكِهٖ هِيَ أُمُّ وَلَدِكَ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে যদি কোন দাসীর দুজন মনিব থাকে অথবা দুজনের মধ্যে দাসী মালিকানায় শরীক থাকে। আর তাদের একজন অপরজনের ব্যাপারে বলে যে এ দাসী তোমার উম্মে ওয়ালাদ, কিন্তু দ্বিতীয়জন তা অস্বীকার করে তাহলে এ দাসী এক দিন খেদমত করা থেকে বিরত থাকবে। আর অন্য দিন অস্বীকারকারীর সেবায় নিয়োজিত থাকবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অস্বীকারকারী ইচ্ছা করলে বাদীকে উপার্জনে নিযুক্ত করে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করে নেবে। আর বাদী যদি উপার্জন করে অর্ধ মূল্য আদায় করে ফেলে তবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। অস্বীকারকারী মনিব তার থেকে কিছুই চাইতে পারবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : একজন যখন অপরজনের উপর উক্ত দাসী উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবী উত্থাপন করল অতঃপর যখন সে তা অস্বীকার করল তখন প্রথম ব্যক্তি যেন স্বীকার করে নিল যে উক্ত দাসীকে আমি উম্মে ওয়ালাদ বানিয়েছি। যেমন কোন ক্রেতা দাবী করল যে এ গোলাম বিক্রেতা স্বাধীন করে দিয়েছে, কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করল। অতঃপর ক্রেতা উক্ত গোলামকে ক্রয় করে নিল। তাহলে এ গোলাম

ক্রেতার পক্ষ থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, যখন বিক্রেতা স্বাধীন করার কথা অস্বীকার করেন তখন তা ক্রেতার উপরই বর্তাবে। অনুরূপভাবে উক্ত মাসআলায় দাবী উত্থাপনকারীর উপর যেহেতু গড়িয়ে আসল তখন সে আর উক্ত দাসী থেকে খেদমত গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, তার ধারণা অনুযায়ী এ দাসী অন্যের উম্মেওয়ালাদ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি তা অস্বীকার করার কারণে তার মালিকানা সম্পূর্ণভাবে অক্ষত থাকলো। তাই সে উক্ত দাসীকে আজাদ হওয়ার জন্য উপার্জনে নিযুক্ত করবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : প্রতিপক্ষের উম্মেওয়ালাদ হওয়ার দাবীকারী যদি তার দাবীতে সত্য হতো তবে অস্বীকার করায় পূর্ণ দাসী তারই সাব্যস্ত হয়ে যেতো। তাই দাসী তার পূর্ণভাবে খেদমত করতে হতো। কেননা, অপরপক্ষের দাবী অনুযায়ী সে তার উম্মেওয়ালাদ আর যদি দাবীকারীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয় তাহলে অস্বীকারকারী শরীকের জন্য অর্ধেক খেদমত করতে হয়। কেননা, দাসীটি উভয়ের শরীকানাধীন। সুতরাং দাসীর নিশ্চিত অর্ধেক খেদমত অস্বীকার করার জন্য আর অপরের জন্য কোন খেদমত করতে হবে না। এজন্য আমরা বলি যে এ দাসী একদিন অস্বীকারকারী শরীকের খেদমত করবে। আর একদিন বিরত থাকবে। অন্য কারো খেদমত করবে না।

সুতরাং স্বীকারকারী অপর শরীক সেবা অধিকার পাবে না এবং উপার্জনে নিযুক্ত করারও অধিকার পাবে না। কেননা সে সন্তান জন্মদাতা এবং ক্ষতি পূরণের দাবী করে সব কিছু থেকেই অধিকার মুক্ত হয়ে গেছে।

وما لِأُمِّ وَلَدٍ تَقَوُّمٌ فَلَا يَضْمَنُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِهَا له أَعْبُدٌ قال لِاثْنَيْنِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَخَرَجَ وَاحِدٌ وَدَخَلَ آخَرُ وَكَرَّرَ وَمَاتَ بِلَا بَيَانٍ عَتَقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّابِتِ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ من الْآخَرَيْنِ وَلَوْ فِي الْمَرَضِ قُسِمَ الثُّلُثُ عَلَى هَذَا وَالْبَيْعُ وَالْمَوْتُ وَالتَّحْرِيرُ وَالتَّدْبِيرُ بَيَانٌ فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ لَا الْوَطْءُ وهو وَالْمَوْتُ بَيَانٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ وَلَوْ قال إِنْ كان أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا أو أُنْثَى ولم يُدْرِ الْأَوَّلَ رَقَّ الذَّكَرُ وَعَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَالْأُنْثَى ولو شَهِدَا أَنَّهُ حَرَّرَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ أو أَمَتَيْهِ لَغَتْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي وَصِيَّةٍ أو طَلَاقٍ مُبْهَمٍ -

---

অনুবাদ : উম্মেওয়ালাদের কোন মূল্য নেই। সুতরাং উভয় শরীকের একজন তাকে স্বাধীন করে দিলে (অন্যজনের অংশের) জামিন হবে না। কারও তিনটি গোলাম, সে দুজনকে বলল, তোমাদের একজন আজাদ অতঃপর একজন বের হয়ে গেল এবং অন্যজন প্রবেশ করল মনিব তার কথায় পুণরাবৃত্তি করল এবং (কথার) ব্যাখ্যা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করল, তাহলে বিদ্যমান গোলামের (অর্থাৎ, যার উপস্থিতিতে বক্তব্যটি দু'বার উচ্চারিত হয়েছে) চারভাগের তিন ভাগ এবং অপর গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক আজাদ হবে। আর (মনিবের এ বক্তব্য) যদি মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় হয়ে থাকে) তাহলে এক তৃতীয়াংশকে এই হারে বন্টন করা হবে। বিক্রি করা, মৃত্যু হওয়া স্বাধীন করা মুদাব্বার বানানো অস্পষ্ট আজাদীর ক্ষেত্রে বর্ণনা। তবে সহবাস বর্ণনা হবে না। আর অস্পষ্ট

তালাকের ক্ষেত্রে সহবাস ও মৃত্যু বর্ণনা হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি মনিব (তার দাসীকে) বলে তুমি যে সন্তানটি প্রসব করবে তা যদি ছেলে হয় তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর সে একটি ছেলে ও মেয়ে প্রসব করল তাহলে মাতা ও মেয়ের অর্ধেক মুক্ত হবে। যদি (দুজন লোক) সাক্ষ্য প্রদান করে (অন্যলোকের ব্যাপারে) যে সে তার দু' গোলাম বা দু' দাসীর মধ্যে একজনকে স্বাধীন করেছে তাহলে সাক্ষ্য অনর্থক হবে। তবে হা যদি তা অসিওয়াত কিংবা অস্পষ্ট তালাকের ক্ষেত্রে হয়। (তবে তা গ্রহণযোগ্য।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَمَا لِأُمِّ وَلَدٍ الخ : যদি দু' ব্যক্তির শরীকানায় কোন দাসী থাকে আর উক্ত দাসী সন্তান প্রসব করে, আর উভয় শরীক এ সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করে, তাহলে তাদের দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। এবং সন্তানের বংশ উভয় থেকে সাব্যস্ত হবে এবং এ দাসীকে দুজনের উম্মেওয়ালাদ বলে গণ্য করা হবে। অতঃপর যদি দুজনের একজন তার অংশকে স্বাধীন করে দেয় এবং সেও সচ্ছল হয় তাহলে অপর অংশের জন্য সে জামিন হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আজাদকারীর উপর অন্য শরীকের অংশের জরিমানা আবশ্যক হবে। অন্য শরীক তার আজাদকারী শরীক থেকে তার অংশের জরিমানা উসুল করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম সাহাবাইন (রহ.) এর মধ্যকার মতানৈক্য মূলত অপর একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হয়েছে।

আর তা হচ্ছে উম্মেওয়ালাদ মূল্য যোগ্য সম্পদ কি না। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উম্মেওয়ালাদ মূল্য যোগ্য সম্পদ। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তা মূল্যযোগ্য সম্পদ নয়। সাহাবাইন (রহ.)-এর দলিল হচ্ছে : উম্মেওয়ালাদ দ্বারা মনিব উপকৃত হতে পারে, মনিবের জন্য এ দাসীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ। তদ্রূপ এ দাসীকে ইজারা দেয়াও জায়েয। তার থেকে খিদমাত নেয়া জায়েয। আর এসব বিষয় দাস-সত্তার মালিক না হলে সম্ভব নয়। আর মূল্যবান হওয়া ছাড়া দাস সত্তার মালিকানা হওয়া অযৌক্তিক। সুতরাং প্রমাণিত হল যে উম্মে ওয়ালাদ মূল্যবান সম্পদ।

তাছাড়া উম্মেওয়ালাদ বিক্রিযোগ্য না হওয়াতে তা মূল্যবান না হওয়াকে আবশ্যক করে না। কেননা, মুদাব্বারকেও বিক্রি করা যায় না। তদুপরি তা মূল্যবান হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। এজন্যই তো যদি কোন নাসরানী উম্মেওয়ালাদ মুসলমান হয়ে যায় তবে তার উপর উপার্জন আবশ্যক। উম্মেওয়ালাদের উপার্জন করা প্রমাণ করে যে সে মূল্যবান। তবে হা সাধারণ দাসীর মতো তার মূল্য নয়, বরং সাধারণ দাসীর মূল্যের এক তৃতীয়াংশ মূল্য উম্মেওয়ালাদের হবে। কেননা, বিক্রয়যোগ্য হওয়ার সুবিধা এবং মনিবের মৃত্যুর পর ওয়ারিশদেরও পাওনাদারদের অনুকুলে উপার্জনের সুবিধা রহিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার থেকে শুধু বিক্রি করার সুবিধা রহিত হয়ে যায়। অন্যান্য সুবিধা রহিত হয় না। যেমন মনিবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারদেরও পাওনাদারের অনুকুলে উপার্জনে বাধ্য করা বা মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত খেদমত নেওয়ার সুবিধা রহিত হয় নি। তাই তার মূল্য সাধারণ দাসের দুই তৃতীয়াংশ। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : ঐ বস্তুর মূল্য ধার্য করা হয় যা মূল্যবান হওয়ার কারণে নিজের অধিনে রাখা হয়। কিন্তু উম্মে ওয়ালাদকে শুধু বংশ সংরক্ষণের জন্য নিজ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। সম্পদ হিসাবে রাখা হয় না। তাই তো মনিবের মৃত্যুতে তাকে ওয়ারিশের ও পাওনাদারদের অনুকুলে উপার্জনে বাধ্য করা যাবে না। তাছাড়া উম্মেওয়ালাদের সাথে মনিবের সম্পর্ক বহাল রয়েছে। অর্থাৎ, সন্তানের মাধ্যমে মনিব ও উম্মে ওয়ালাদদের সাথে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে হা এ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে মালিকানা রহিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। কেননা, এখনে উম্মেওয়ালাদ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা যদি সে এখনই আজাদ হয়ে যায় তাহলে

আর তাকে সাথে রাখা বৈধ হবে না। এজন্য তার মালিকানা বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু মূল্য নির্ধারণ হিসাবে তার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু মুদাব্বার এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুদাব্বারকে বংশ সংরক্ষণের জন্য বরং সম্পদ হিসাবেই তাকে সংরক্ষণ করা হয়। আর মুদাব্বারের মাঝে স্বাধীন হওয়ার কারণ মৃত্যুর পর প্রকাশ পাবে। যা এখন বিদ্যমান নেই। তবে তাকে বিক্রি করা যায় না এর কারণ হচ্ছে মুদাব্বার ঘোষণা করার উদ্দেশ্য যাতে অব্যাহত না হতে হয়। সুতরাং দুজনের মাঝে ব্যবধান রয়েছে। তাই একজনের সাথে অন্যজনকে তুলনা করা যায় না। আর নাসরানী উম্মে ওয়ালাদ যে মুসলমান হয়েছে তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা যখন সে মুসলমান হয়েছে তখন সে নাসরানির পক্ষ থেকে মুকাতাব হয়ে যায়, যে নাসরানী বা উম্মে ওয়ালাদের কারো কোন ক্ষতি না হয়। আর বদলে কিতাবাতের জন্য মূল্যবান হওয়া জরুরী নয়।

قوله : لَهُ أَعْبُدٌ قَالَ لِإِثْنَيْنِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তিন গোলামের মালিক থাকে। আর তার সামনে উপস্থিত দুজন গোলামকে সম্বোধন করে বলে যে তোমাদের একজন আজাদ। অতঃপর একজন তার সামনে থেকে বের হয়ে যায় এবং তৃতীয়জন এসে উপস্থিত হয়, অতঃপর মনিব তাদের উদ্দেশ্য করে পুনরায় বলে তোমাদের একজন আজাদ। মনিব তার উক্ত কথা বলার পর তার কথার উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে মনিব মৃত্যুবরণ করে। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে প্রথম ও দ্বিতীয় বারের মনিবের আজাদ সম্পর্কীয় কথা বলার সময় উপস্থিত গোলামের চার ভাগের তিন ভাগ এবং বাকী দুজন গোলামের অর্ধেক স্বাধীন হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তার মতে প্রবেশকারী তৃতীয় গোলামের এক চতুর্থাংশ আজাদ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, যেহেতু দ্বিতীয় বারের কথার মধ্যে প্রথম জন তথা অবস্থানকারী গোলামের সাথে তৃতীয় গোলাম একত্র হয়েছে তাই উভয়ের মাঝে সমহারে বন্টিত হবে। সুতরাং অবস্থানকারী গোলামের যেহেতু এক চতুর্থাংশ আজাদ হবে তাই তৃতীয় গোলামেরও এক চতুর্থাংশ আজাদ হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : মনিব কর্তৃক প্রথমোক্ত কথার যেহেতু কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে না, যার আলোকে উভয় থেকে যে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করা হবে। তাই আজাদী উভয় গোলামের মাঝে সমহারে বন্টিত হবে। সুতরাং মনিবের প্রথম বারের কথা দ্বারা প্রথমে যে দুজন গোলাম উপস্থিত ছিল তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

তদ্রূপ মনিবের দ্বিতীয় কথা দ্বারাও উভয় গোলামের অর্ধাংশ আজাদ হবে। কিন্তু যেহেতু উভয় গোলামের মধ্যে অবস্থানরত গোলামের অর্ধাংশ পূর্ব থেকেই স্বাধীন, তাই মনিবের দ্বিতীয় কথার আজাদী তার অর্ধাংশে পতিত হয়ে সে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারবে না। কেননা, স্বাধীন অংশে স্বাধীন করা কার্যকর নয়। বরং মনিবের আয়ত্বে তথায় মালিকানাধীন যা আছে (অর্থাৎ, তার অর্ধাংশ) তাতে কার্যকর হবে তা অন্য গোলামের সাথে অর্ধাংশ হিসাবে গণ্য হবে। এজন্য আমরা বলি অবস্থানরত গোলামের অর্ধাংশ পূর্ব থেকে স্বাধীন আর এখন প্রাপ্ত একচতুর্থাংশ মিলে অবস্থানরত গোলামের চার ভাগের তিন ভাগ আজাদ হবে। আর বাকি দু গোলাম অর্ধেক স্বাধীন হবে।

আলোচ্য মাসআলায় যদি মনিব উক্ত কথা বলার পর জীবিত থাকে তাহলে তাকে তার প্রথম কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আপনি আপনার কথা দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যদি সে বলে যে আমার (তোমাদের মধ্য থেকে একজন স্বাধীন) কথা দ্বারা যে বের হয়ে গেল তাকে উদ্দেশ্য করেছি। তাহলে তার বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী যে বের হয়ে গেল সে স্বাধীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মনিবকে দ্বিতীয় বারের কথার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। যদি মনিব বলে তৃতীয় গোলাম প্রবেশকারীকে আমি উদ্দেশ্য করেছি তাহলে তৃতীয় গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি মনিব তার প্রথম কথার ব্যাখ্যা বলে যেই গোলাম অবস্থান করছে তাকেই উদ্দেশ্য করেছি, তাহলে সে পূর্ণ আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় গোলাম প্রবেশের পর যখন বলল তখন তার কথার অর্থ হবে

পূর্বের কথার পূণরাবৃত্তি করা এবং তা সংবাদ প্রদানের অর্থ বহন করবে আর মনিব যদি প্রথমে তার দ্বিতীয় কথার ব্যাখ্যা বলে যে, আমার উদ্দেশ্য তৃতীয় গোলাম আজাদ করা তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর প্রথম কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হবে। মনিব তার উত্তরে যার কথা উল্লেখ করবে সেই আজাদ হবে।

قوله : وَ لَوْ فِى الْمَرَضِ الخ : পূর্বে উল্লিখিত মাসআলায় যা বর্ণিত তথা মনিবের নিকট অবস্থানরত গোলামদ্বয়কে সম্বোধন করে বলে যে তোমাদের উভয় থেকে একজন স্বাধীন। অতঃপর তৃতীয়জন মনিবের নিকট আসে আর বিদ্যমান দু'জন থেকে একজন বের হয়ে যায়। অতঃপর মনিব উভয়কে লক্ষ করে বলে তোমাদের উভয় থেকে একজন স্বাধীন আর মনিব এ সকল কথা মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এদিকে মনিবের আর কোন সম্পদ না থাকে তাহলে এক তৃতীয়াংশ আজাদ হওয়াকে পূর্বোল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী তিন গোলামের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। অর্থাৎ, শাইখান (রহ.) এর মতে আজাদকৃত অংশসমূহকে একত্রিত করা হবে।

মনিবের উভয় কথা বলার সময় অবস্থানরত গোলামের যেহেতু চার ভাগের তিন ভাগ আজাদ হওয়া প্রয়োজন সে হিসেবে আমরা প্রত্যেক গোলামকে চার ভাগে বিভক্ত করব। সুতরাং বিদ্যমান গোলামের চার ভাগের তিন ভাগ এবং বাকী দু গোলামের দুভাগ করে মোট সাত ভাগ আজাদ হবে। বাকী থাকবে চৌদ্দভাগ। বিদ্যমান গোলামের সাত ভাগ থেকে চার ভাগ স্বাধীন আর বাকী তিন ভাগের জন্য উপার্জন করবে। আর বাকী দু গোলামের প্রত্যেকজনের সাত ভাগের দুভাগ করে স্বাধীন হবে। আর বাকী পাঁচ ভাগের জন্য উপার্জন করবে।

সুতরাং সর্বমোট একুশ ভাগ হবে তন্মধ্যে সাত ভাগ আজাদ হবে। আর বাকী চৌদ্দ ভাগের জন্য উপার্জন করতে হবে। অর্থাৎ, এ পদ্ধতিতে হিসাব করলে পূর্ণভাবে মনিবের কথার এক তৃতীয়াংশ ও দুই তৃতীয়াংশ বের করা সহজ হয়ে যায়। কেননা, মৃত্যু আসন্ন তথা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির উক্ত কথাকে ওয়াসিত হিসাবে গণ্য করা হবে। আর ওয়াসিয়াতের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ কার্যকর হয়।

সুতরাং মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পদ এর যেন এক তৃতীয়াংশ গোলামদের জন্য ওয়াসিয়াত হিসাবে গণ্য হবে। আর ওয়াসিয়াতের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ কার্যকর হয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পদ এর যেন সে এক তৃতীয়াংশ গোলামদের জন্য ওয়াসিয়াত করে দিল আর বাকী দুই তৃতীয়াংশ ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হবে। আর এখানে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদ হচ্ছে এ তিন গোলাম। বিধায় প্রত্যেক গোলামকে সাত ভাগ করতে হবে। তাই তিন গোলাম মিলে একুশ ভাগ হল। গোলামগণ তাদের মধ্যকার বন্টন অনুযায়ী সাত ভাগ প্রাপ্ত হবে। আর ওয়ারিশগণ চৌদ্দ ভাগ প্রাপ্ত হবে। এজন্য আমরা বলি গোলামগণ চৌদ্দ ভাগ স্বাধীন করার জন্য উপার্জন করবে। আর এ উপার্জন ওয়ারিশগণ প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে পূর্বোক্ত মাসআলা অনুযায়ী তৃতীয় গোলামের মাত্র এক অংশ আজাদ হবে। তাই প্রত্রেক গোলামকে ছয় ভাগে বিভক্ত করতে হবে। তাই সর্বমোট আজাদ হওয়া অংশ ছয় হবে। এজন্য সম্পূর্ণ ধরা হবে আঠারো অংশ হিসাবে, যার মধ্য থকে ছয় অংশ গোলামগণ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ, ছয় অংশ আজাদ হয়ে যাবে। আর বাকী বার অংশকে আজাদ করার জন্য উপার্জন করবে।

قوله : وَ الْبَيْعُ وَ الْمَوْتُ الخ : অস্পষ্ট আজাদীর ক্ষেত্রে এক জনকে বিক্রি করলে বা একজনের মৃত্যু হলে কিংবা একজনকে মুদাব্বার বানানো হয় তবে অপরজন স্বাধীন হয়ে যাবে। অর্থাৎ, কারো দুইজন গোলাম আছে, সে তাদের প্রতি লক্ষ করে বলল, তোমাদের একজন আজাদ অতঃপর তাদের দুজন থেকে একজনকে বিক্রি করে দিল কিংবা একজনের মৃত্যু হল অথবা একজনের ব্যাপারে মনিব বলে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আজাদ তাহলে যার ব্যাপারে বিক্রি বা মৃত্যু কিংবা মুদাব্বার হওয়া প্রমাণিত হয়নি তবে সে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, বিক্রির কারণে মালিকানা রহিত হয়ে গেল তাই সে উচ্চারণ কারীর দিক থেকে মুক্তির ক্ষেত্র থাকে নি। এমনি

মৃত্যুর কারণে গোলাম সত্তাগত দিক থেকে সে মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। এমনিভাবে মুদাব্বার ঘোষণা করার কারণে পুর্ণরূপে মুক্তির ক্ষেত্র থাকেনি। এজন্য অপরজন মুক্তি লাভের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। তাছাড়া মুদাব্বার করার অর্থ হল তার মৃত্যু পর্যন্ত তার থেকে খেদমত গ্রহণ করা আর বিক্রি করার অর্থ হচ্ছে তার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা তথা মূল্য লাভের ইচ্ছা করা। আর এ উদ্দেশ্য দুটি অনিবার্য মুক্তির পরিপন্থী। সুতরাং মনিবের আচরণগত কাজের কারণে অপরজন মুক্তি লাভের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হবে। কেননা তোমাদের উভয় থেকে একজন আজাদ— মনিবের উক্ত কথা বলার পর অন্য গোলামের সাথে উক্ত আচরণ করাটা যেন মনিবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বয়ান হয়ে গেল যে, তাই এ বিক্রয় শুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ কবজাসহ হোক বা কবজা ছাড়া হোক, তদ্রূপ শর্তহীন হোক বা যে কোন একজনের অনুকুলে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের শর্ত হোক সবই শামিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করাও বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এসব থেকে যা-ই একজন গোলামের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে অপরজনের জন্য আজাদী নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মনিব যদি তার দুজন দাসীকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমাদের একজন স্বাধীন, অতঃপর যে কোন একজনের সাথে সহবাস করে তবে অন্যজন নির্দিষ্টভাবে স্বাধীন হবে না, অর্থাৎ, মনিবের এরূপ কাজ অপর দাসী স্বাধীন হওয়ার প্রমাণ সরূপ সাব্যস্ত হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতামত। কিন্তু সাহাবাইন (রহ.) বলেন, অপর দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে। তাদের দলিল হচ্ছে, নিজ মালিকানা ছাড়া সহবাস বৈধ নয়। সুতরাং অনির্দিষ্ট একজন আজাদ করার পর যখন একজনের সাথে সহবাস করল তখন প্রমাণিত হল যে, সে উক্ত দাসীর মালিক। তাই তার সাথে সহবাস করছে। এজন্য ধরে নিতে হবে যে, তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে আর অপরজন স্বাধীন হয়ে গেল।

قوله : وَ هُوَ وَ الْمَوْتُ : যদি কোন ব্যক্তি তার দুজন স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমাদের একজন তালাক, অতঃপর একজনের মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা একজনের সাথে সহবাস করে তবে অপর জনের উপর তালাক পতিত হবে। স্বামীর কাজ একথার প্রমাণ করবে যে, সে অপর জনকে তালাক দিয়েছে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলা থেকে প্রমাণিত হল যে, স্বামীর সহবাস দ্বারা তালাকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা যায়, কিন্তু দাসীর স্বাধীন করাকে সহবাস দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না। কেননা, বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সন্তান লাভ। সুতরাং সহবাস দ্বারা সন্তান লাভের চেষ্টা সহবাসকৃতা স্ত্রীর মালিকানা অব্যাহত রাখার ইচ্ছা প্রমাণ করে। যাতে সন্তান রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ নয়, বরং যৌন চাহিদা পূর্ণ করা। সুতরাং দাসীর সাথে সহবাস উক্ত দাসীর মালিকানা অব্যাহত রাখার ইচ্ছার প্রমাণ নয়।

قوله : وَ لَوْ قَالَ اِنْ كَانَ اَوَّلُ وَلَدٍ الخ : যদি কেহ তার দাসীকে বলে যে, তুমি যে সন্তানটি প্রথমে প্রসব করবে তা যদি ছেলে হয় তাহলে তুমি আজাদ। অতঃপর সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করল। কিন্তু কোন সন্তানটি প্রথম প্রসব করেছে তা জানা গেল না, তাহলে মাতা ও মেয়ের অর্ধাংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। আর ছেলেটি পূর্ণ গোলাম থেকে যাবে। কেননা, এখানে কোন সন্তান প্রথমে প্রসব করেছে তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না বিধায় তা দু অবস্থা থেকে খালি নয়। তা হচ্ছে হয় তো বা প্রথমে ছেলে সন্তান প্রসব করেছে আর এ অবস্থায় দাসী শর্তের অস্তিত্ব পাওয়ার কারণে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর মেয়ে সন্তান যেহেতু মায়ের অনুবর্তী তাই সেও আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, মাতা যখন পুত্র সন্তান প্রথমে প্রসব করেছে তখন সে স্বাধীন হয়ে গেছে। অতঃপর মেয়ে সন্তান স্বাধীন মায়ের গর্ভ থেকে প্রসব হওয়ায় স্বাধীন হিসাবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থা হয়তো বা প্রথমে মেয়ে সন্তান প্রসব করেছে তখন শর্তের অনুপস্থিতির দরুন কাহারো সাথে আজাদী সম্পৃক্ত হবে না। সুতরাং প্রথম অবস্থায় দাসী ও মেয়ে উভয়েই সম্পূর্ণ আজাদ হয়ে যায়, কিন্তু ছেলে আজাদ হয় না। তেমনি দ্বিতীয় সুরতে কেহই আজাদ হয় না এজন্য আমরা বলি যদি এরূপ পরিস্থিতিতে প্রথম জন্ম কার হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে দাসী ও মেয়ের অর্ধাংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম প্রসব হওয়া ছেলে না কি মেয়ে এ নিয়ে

মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যেমন দাসী মাতা দাবী করে যে সে প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। আর কন্যা সন্তানটিও ছোট। আর মনিব তা অস্বীকার করে তাহলে শপথ করার শর্তে মনিবের কথা গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ, মনিব 'আমার জানা মতে' বাক্য প্রয়োগ করে শপথ করে নিলে কেহই স্বাধীন হতে পারবে না। কেননা, মনিব আজাদীর শর্তের অস্তিত্ব লাভের দাবী অস্বীকার করেছে। আর যদি মনিব শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে দাসী ও কন্যা উভয়ই আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, মাতার পক্ষ থেকে অপ্রাপ্ত মেয়ের আজাদীর দাবীটি যেহেতু কন্যার জন্য শুধুমাত্র কল্যাণজনক তাই মনিবের শপথ থেকে অস্বীকার করণ তাদের পক্ষে শর্তের অস্তিত্ব বিদ্যমান হওয়ার প্রমাণ বহন করবে এবং দাসীও মেয়ে উভয়ই স্বাধীন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় আর সে দাবী করে না বরং দাসী মা দাবী করে যে পুত্র সন্তান প্রথমে প্রসব করেছে। আর মনিব শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে শুধু দাসী আজাদ হবে। কন্যা সন্তানটি আজাদ হবে না। কেননা, প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের জন্য মাতার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। আর মনিবের শপথ অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে দাবীদারের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর যদি প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা ছেলে প্রথমে জন্ম গ্রহণ করার দাবী করে থাকে, আর মাতা নিরবতা পালন করে আর মনিব শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে মনিবের অস্বীকৃতি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক কন্যা স্বাধীন হয়ে যাবে। আর মাতা স্বাধীন হবে না। কেননা, মাতা তো দাবী উত্থাপন করেনি, যে তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য হবে মনিবের শপথ অস্বীকৃতি করণ।

قوله : وَلَوْ شَهِدَا اَنَّهُ حَرَّرَ الخ : যদি দুজন পুরুষ সাক্ষ দান করে অন্য এক লোকের ব্যাপারে যে সে তার দু গোলামের একটিকে স্বাধীন করেছে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এবং তার কোন গোলাম স্বাধীন হবে না। তবে অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে অসিয়তের ক্ষেত্রে বা তালাকের ক্ষেত্রে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অসিয়াত ও তালাকের ক্ষেত্রে যেভাবে গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ গোলাম-দাসী স্বাধীন করার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে। উক্ত মতপার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে গোলামের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন ছাড়া গোলামের মুক্তি বিষয়ক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে যখন গোলামের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন পাওয়া গেল না তখন অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন সাব্যস্ত হয় না, তাই এ দাবীর উপর সাক্ষ্য প্রদান ও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যেহেতু দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। তাই দাবীর অনুপস্থিতিতেও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। আর দাসীর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, যদিও দাসীর ক্ষেত্রে দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। কেননা, তাতে যৌনাঙ্গ হারাম হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে তা তালাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রয়েছে। আর এটা বিধিবদ্ধ কথা যে অনির্ধারিত মুক্তি দান যৌনাঙ্গ হারাম হওয়া সাব্যস্ত করে না। সুতরাং তা দুটি গেলামের মধ্যে একটি স্বাধীন হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানের ন্যায় হয়ে গেল। আর এ সকল সুরত তখনই কার্যকর হবে যখন সাক্ষ্য প্রদান হবে ব্যক্তির সুস্থ অবস্থায়। পক্ষান্তরে ব্যক্তির মৃত্যুশয্যায় অসুস্থতাকালিন সময়ে দুটি গোলাম থেকে একটিকে অনির্দিষ্টভাবে স্বাধীন করেছে বলে দুজন পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করে অথবা ব্যক্তির দুজন স্ত্রীর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে একজনকে তালাক দিয়েছেন বলে দুজন পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে তা ওসিয়াত হিসাবে। আর অসিয়তের ক্ষেত্রে অসয়িতকারী হচ্ছে অসিয়ত বাস্তবায়ণের জন্য বাদীপক্ষ। আর সে তো অসী বা ওয়ারিশ। আর তালাকের ক্ষেত্রে দাবীর অনুপস্থিতি সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেননা, এক্ষেত্রে তা শর্ত নয়। - والله اعلم

بَابُ الْحَلْفِ بِالْعِتْقِ

পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত মুক্তি

وَمَنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَوْمَئِذٍ حُرٌّ عَتَقَ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَهُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ يَوْمَئِذٍ لَا وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي أَوْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي يَتَنَاوَلُ مَنْ مَلَكَهُ مُنْذُ حَلَفَ فَقَطْ وَبِمَوْتِهِ عَتَقَ مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ مِنْ ثُلُثِهِ أَيْضًا -

---

অনুবাদ : যদি কেহ বলে যখন আমি গৃহে প্রবেশ করব তখন আমার সে দিনের মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ, তাহলে এ শর্তের পরে সে যার মালিক হবে আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি (শর্তারোপের সময়) يومئذ 'সে দিন' না বলে তবে আজাদ হবে না। আর مملوك শব্দ গর্ভস্থ সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। (তাই যদি কেহ বলে) আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম অথবা (বলে) আমি যার মালিক সে আগামী কালের পর অথবা আমার মৃত্যুর পর স্বাধীন, তাহলে (আগামীকালের ক্ষেত্রে) শধু শপথের সময় যার সে মালিক তা অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ, তা স্বাধীন হবে।) আর তার মৃত্যুতে শপথের পরও যার সে মালিক হয়েছে তা তার ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে আজাদ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ مَنْ قَالَ اِنْ دَخَلْتُ الخ : যদি কেহ বলে যখন আমি গৃহে প্রবেশ করব তখন আমার সে দিনের মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ। সুতরাং যদি তার মালিনাধীন কোন গোলাম থাকে তবে তো প্রবেশের সাথে সাথে স্বাধীন হয়ে যাবে। এমনকি যদি শর্তারোপের সময় তার মালিকানাধীন কোন গোলাম থাকে না, পরে সে একটি গোলাম ক্রয় করল এবং তার পরে ঘরে প্রবেশ করা পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা বক্তার কথার মধ্যে يومئذ সেদিন এর অর্থ হল গৃহে প্রবেশ করার দিন। এজন্য গৃহে প্রবেশের সময় মালিকানা বিদ্যমান থাকাই শর্ত। এমনকি যদি শর্তারোপের সময় তার কাছে কোন গোলাম থাকে। আর তা গৃহে প্রবেশের সময় পর্যন্ত তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকে অতঃপর প্রবেশ করা পাওয়া যায়। তবুও সে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি মনিব তার শর্তে يومئذ শব্দ ব্যবহার করে না তবে যে গোলামের মালিক হল শর্ত করার পর শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময়ের আগে সে যে গোলামের মালিক হবে তা স্বাধীন হবে না। কেননা এমতাবস্থায় (অর্থাৎ, يومئذ ছাড়া) আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম দ্বারা বর্তমান মালিনাধীন সমস্ত গোলাম উদ্দেশ্য হবে। তার চাহিদা হল তা তাৎক্ষণিক স্বাধীন হয়ে যাওয়া। তবে এ স্বাধীনতা যেহেতু শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে তাই শর্ত পাওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করা হবে। এজন্য আমরা বলি শর্তাপের সময় যেসব গোলাম তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকবে যদি শর্ত কার্যকর তথা গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকে তবে তা আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু পরে প্রাপ্ত গোলাম এ শর্তের আওতায় না পড়ার দরুন গৃহে প্রবেশ করলে তারা স্বাধীন হবে না।

قوله : وَ الْمَمْلُوْكُ لَايَتَنَاوَلُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, مملوك দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন যদি কেহ বলে, আমার যত পুরুষ গোলাম রয়েছে তা আজাদ। অথচ তার একটি গর্ভবতী দাসী ছিল। আর সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাহলে ঐ পুত্র সন্তানটি স্বাধীন হবে না। দাসী মনিবের উচ্চারিত কথার ছয় মাস বা তার পরে প্রসব করুক বা ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর প্রসব করুক, গর্ভস্থ সন্তান স্বাধীন হবে না। কেননা, যদি ছয় মাস বা ছয় মাসের পর সন্তান প্রসব করে তবে তো সম্ভাবনা রাখে মনিবের উক্ত কথা বলার সময় গর্ভস্থ সন্তানের অস্তিত্ব গর্ভে পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। তাই তার সাথে স্বাধীনতাকে যুক্ত করা যাবে না। আর যদি ছয় মাসের ভেতর সন্তান প্রসব করে তবুও সন্তান স্বাধীন হবে না। কেননা, মনিবের কথা বর্তমানে মালিকানাভুক্ত দাসকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ গর্ভস্থ সন্তান সতন্ত্রভাবে মালিকানাভুক্ত নয়; বরং মায়ের অনুগামী হিসাবে মনিবের মালিকানাধীন। তাছাড়া তা এক হিসাবে মায়ের অংশ বিশেষ। এজন্য আমরা বলি যে, মনিবের বাক্যে ব্যবহৃত গোলাম যা পূর্ণ সত্তাকে বুঝায় কোন অঙ্গকে বুঝায় না। আর এজন্যই তো গর্ভস্থ সন্তানকে আলাদা করে বিক্রি করা যায় না। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, গর্ভস্থ সন্তান স্বতন্ত্র গোলাম হিসাবে গণ্য হবে না। বিধায় মনিবের কথা كلم مملوك لى এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قوله : كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ الخ : আর যদি কেহ বলে, যে সমস্ত ক্রীতদাসের আমি মালিক রয়েছি বা আমি মালিক হব সে আগামী পরশু বা আমার মৃত্যুর পর স্বাধীন। উক্ত বক্তব্যে লক্ষণীয় হচ্ছে যদি মনিব তার ক্রীতদাসদের স্বাধীনতাকে আগামী পরশুর সাথে শর্তযুক্ত করে আর মনিবের অবস্থা এমন যে, বক্তব্য উচ্চারণকালে মনিবের মালিকানায় একজন গোলাম ছিল। অতঃপর অন্য একটি গোলামের মালিক হল। আর আগামী পরশুও আসে তবে শর্তযুক্ত করবার সময় যে গোলাম বিদ্যমান ছিল সে আজাদ হবে। কিন্তু পরবর্তীতে যে গোলামের মালিক হয়েছে সে আজাদ হবে না। কেননা মনিবের كل مملوك لى 'সমস্ত ক্রীতদাসের আমি মালিক' তা এবং املكه 'আমি যার মালিক' তা দ্বারা বুঝানো হয় এমন প্রত্যেক গোলাম যার শর্ত উচ্চারণের মুহূর্তে সে মালিকানাধীন। অর্থাৎ বর্তমানে মালিকানাধীন। املكه শব্দটি প্রকৃত বর্তমান জ্ঞাপক। সুতরাং মনিবের এমন বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে বর্তমান মালিকানাধীন গোলামের মুক্তি আগামী পরশুর সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায়। এজন্য শর্তারোপের পর মনিব যেসব গোলামের মালিক হল তারা স্বাধীন হতে পারে না।

قوله : وَ بِمَوْتِهٖ عَتَقَ مَنْ الخ : আর যদি উক্ত শর্তকে তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে তার শপথ থেকে নিয়ে তার মৃত্যু পর্যন্ত সে যার মালিক হবে তা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থকে স্বাধীন হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে নাওয়াদিরের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যক্তির শর্তারোপের দিন তার মালিকানায় যে গোলাম ছিল তা শুধু আজাদ হবে। তারপর যে গোলাম সে হাসিল করেছে তা আজাদ হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি শপথ করল যে, আমার সমস্ত গোলাম বা আমি যার মালিক আমার মৃত্যুর পর তারা আজাদ। সুতরাং শপথের সময় তার মালিকানাধীন একটি গোলাম ছিল। অতঃপর সে আর একটি গোলাম ক্রয় করল, তা হলে যে গোলাম তার শপথের সময় বিদ্যমান ছিল তা মুদাব্বার হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু পরে অর্জিত গোলাম মুদাব্বার হবে না। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উভয় গোলাম তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে আজাদ হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় গোলাম আজাদ হবে না। তিনি দলিল দেন যে, বক্তার বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ বর্তমান কালের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তার কথার শর্তের মধ্যে শর্তারোপের পর সে যার মালিক হবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই তো সর্বসম্মতিক্রমে শর্তারোপের সময়ে বিদ্যমান গোলাম মুদাব্বার হয় কিন্তু পরবর্তীতে অর্জিত গোলামটি মুদাব্বার হয় না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : উচ্চারিত বক্তব্যটি যুগপৎ মুক্তিদান ও অসিয়াত করণের সমার্থক

তাই তো মুদাব্বার এর মুক্তির বিষয়টি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ভেতর বিবেচিত হয়ে থাকে। আর অসিয়াতের ক্ষেত্রে বর্তমান সময় এবং প্রতিক্ষিত সময় উভয়টি বিবেচ্য হয়ে থাকে এজন্যই তো মালের অসিয়াতের ক্ষেত্রে অসিয়াতের পর অর্জিত মালও অসিয়াতের গন্ডির ভেতর বিবেচ্য হয়। আর মুক্তি দানের বিষয়টি শুদ্ধ হয় মালিকানার সাথে অথবা মালিকানার কারণের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায়। এজন্য বর্তমান অবস্থার বিবেচনায় অর্থাৎ, শর্তারোপ কালের অবস্থায় বিদ্যমান গোলামই শুধু অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই সে মুদাব্বার হয়ে যাবে। যার দরুন তাকে বিক্রয় করা যাবে না। আর যে গোলামের মালিক হল শর্তারোপের পর তাও ব্যক্তির কথার অন্তর্ভুক্ত হবে অসিয়াত হিসাবে। কেননা, এক্ষেত্রে শর্তারোপ প্রতিক্ষিত অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রতিক্ষিত অবস্থা হলো মৃত্যুর অবস্থা তাই ধরা হবে সে যেন মৃত্যুর সময় বলেছে আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আজাদ এজন্য আমরা বলি ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে তা আজাদ হয়ে যাবে।

بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ

পরিচ্ছেদ : অর্থের বিনিময়ে মুক্তিদান

حَرَّرَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَ عَتَقَ وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَائِهِ صَارَ مَأْذُونًا وَعَتَقَ بِالتَّخْلِيَةِ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِأَلْفٍ فَالْقَبُولُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ حَرَّرَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً فَقَبِلَ عَتَقَ وَخَدَمَهُ فَلَوْ مَاتَ تَجِبُ قِيمَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا فَفَعَلَ وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ عَتَقَتْ مَجَّانًا وَلَوْ زَادَ عَنِّي قُسِمَ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرِ مِثْلِهَا وَيَجِبُ مَا أَصَابَ الْقِيمَةَ فَقَطْ -

অনুবাদ : কেহ তার গোলামকে মালের বিনিময়ে স্বাধীন করল। অতঃপর গোলাম তা গ্রহণ করল, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি দাসের মুক্তিকে মাল পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করে তাহলে সে অনুমতি প্রাপ্ত দাসরূপে গণ্য হবে। মাল পেশ করার দ্বারা গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেহ যদি (তার গোলামকে) বলে আমার মৃত্যুর পর তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ। তাহলে প্রস্তাবটি গ্রহণের সময় হবে তার মৃত্যুর পর। আর যদি মনিব তাকে স্বাধীন করে এ শর্তে যে, সে এক বৎসর তার খিদমাত করবে। আর গোলাম তা গ্রহণ করে তাহলে সে আজাদ হবে এবং (এক বৎসর) তার খিদমাত করবে। আর যদি মনিব মৃত্যুবরণ করে, তবে গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে। যদি কেহ (অন্যকে) বলে এক হাজারের বিনিময়ে তাকে (তোমার দাসীকে) মুক্ত কর এ শর্তে যে, তাকে আমার কাছে বিবাহ দিবে। মনিব তাই করল। কিন্তু দাসী প্রস্তাবককে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। তাহলে দাসী মুফত (বিনা মূল্যে) স্বাধীন হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, প্রস্তাবকের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। (আর যদি আদেশ দাতা عَنِّي 'আমার পক্ষ থেকে' শব্দ বাড়িয়ে দেয় তাহলে এক হাজার দাসীর মূল্য ও মহরের মধ্যে বন্টিত হবে। মূল্যের বিপরীতে যে পরিমাণ দিরহাম সাব্যস্ত হয়েছে শুধু তা আদায় করা (আদেশ দাতার উপর) আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : حَرَّرَ عَبْدَهٗ عَلٰى مَالٍ الخ : جعل ঐ মালকে বলে যা কোন বস্তুর বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়। বা বিনিময়ে প্রদান করা হয়। যদি কোন মনিব তার গোলামকে মালের বিনিময়ে স্বাধীন করে আর গোলাম তা গ্রহণ করে তাহলে কবুল করা মাত্রই গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, এখানে সম্পদ অসম্পদের বিনিময়ে হয়েছে। মনিবের এ চুক্তির কারণে দাসের হাতে কোন সম্পদ অর্জিত হয়নি। তবে হা সে শরীয়াত কর্তৃক একটি বিশেষ ক্ষমতা তথা দাসত্ব মুক্তি অর্জন করেছে। আর তা তো কোন সম্পদ নয়। আর বিনিময়ের অনিবার্য দাবী হচ্ছে প্রতিপক্ষের বিনিময়ের দায় গ্রহণ করতঃ সঙ্গে চুক্তির হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া। যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই গোলাম তাৎক্ষণিক আজাদ হয়ে যাবে। আর যে পরিমাণ মালের কথা মনিব উল্লেখ করেছে। তা তার জিম্মায় ঋণ হিসাবে আবশ্যক হবে। তা কিন্তু কিতাবাত চুক্তির পরিপন্থী কেননা তা তো দাসত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থা গোলামের জিম্মায় আবশ্যক হচ্ছে। অর্থাৎ, আলোচ্য মাসআলায় কবুল করার সাথে সাথে গোলাম পূর্ণ আজাদ হয়ে যাবে। আর কিতাবাত চুক্তিকৃত গোলাম তার উপর আবশ্যকীয় বিনিময় পরিশোধ করার পর আজাদ হবে।

قوله : وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهٗ الخ : আর যদি তার দাসের মুক্তিকে মাল পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করে তবে তা বৈধ হবে এবং সে অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন মনিব বলল, তুমি আমাকে এক হাজার টাকা পরিশোধ কর তবে আজাদ। তবে হা এক্ষেত্রে সে মুকাতাব হবে না। কেননা, মনিবের বক্তব্যে মুক্তির বিষয়কে পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। আর দাসটি অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে মনিব অর্থ দাবী করে তাকে উপার্জন উৎসাহিত করছে। আর তাতে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া। মজদুরিতে নয়। তাই মনিবের বক্তব্য অনুমতি প্রদানের ইঙ্গিত বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর যখন গোলাম শর্ত অনুযায়ী মাল পেশ করবে তখন সে আজাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মাল উপস্থিত করার পর মনিবকে অর্থ গ্রহণে ও দাসকে মুক্তি দানে বাধ্য করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, মনিবকে অর্থ গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। আর কিয়াসের দাবীও তাই। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে শর্তমূলক বক্তব্য। কেননা, এখানে শব্দগতভাবে মুক্তি দানকে শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এজন্য গোলামের গ্রহণ করার উপর বিষয়টি নির্ভর করে না। আর তা বাতিল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে না। আর শর্তযুক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে শর্ত সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধ্য করা যায় না। তার কারণ হচ্ছে শর্তের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে অপরপক্ষের কোন হক বা অধিকার সাব্যস্ত হয় না। আর তা কিতাবাতের সাথে ও তুলনা করা যাবে না।

আমাদের দলিল হচ্ছে : যদি শব্দগত দিক থেকে তা শর্তায়ন মূলক বক্তব্য। কিন্তু উদ্দেশ্য বিবেচনায় এটা বিনিময়। কেননা, মুক্তি দানকে অর্থ পরিশোধের সাথে শর্তযুক্ত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দাসকে অর্থ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে স্বাধীনতার মর্যাদা লাভ করে। আর মনিব এর বিনিময়ে অর্থ লাভ করতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় শব্দগত দিক বিবেচনায় এবং মনিবের ক্ষতিগ্রস্ততা বোধ করার লক্ষ্যে বক্তব্যটিকে আমরা শর্তায়ণ বলে সাব্যস্ত করেছি। তাই তো গোলামটিকে মনিব চাইলে বিক্রি করে দিতে পারে। গোলামের উপার্জনে গোলাম মনিব অপেক্ষা বেশি হকদার নয়। পক্ষান্তরে পরিণতি পর্বে অর্থ পরিশোধের সময় বক্তব্যটিকে আমরা বিনিময় বলে সাব্যস্ত করেছি। যাতে গোলামের ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করা যায়। একারণে তা মনিবকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে।

قوله : وَاِنْ قَالَ اَنْتَ حُرٌّ الخ : যদি কেহ তার মালিকানাধীন গোলামকে বলে আমার মৃত্যুর পর তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত। তাহলে গোলামের জন্য প্রস্তাবটি গ্রহণের সময় হচ্ছে মনিবের মৃত্যুর পর। কেননা, মনিব প্রস্তাবটিকে তার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তাই মনিবের প্রস্তাবটিকে তার

মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তাই মনিবের কথা সাদৃশ্য পূর্ণ একথার যে মনিব তার দাসকে বলল আগামী কাল তুমি এক হাজারের বিনিময়ে মুক্ত। আর যদি মনিব বলে এক হাজারের বিনিময়ে তুমি মুদাব্বার হবে, তবে তা ভিন্ন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়টি বর্তমানের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। তবে দাসত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। কেননা, মুদাব্বার ঘোষণার বিষয়টি বর্তমানের সাথে যুক্ত। আমাদের আলোচিত মাসআলার ক্ষেত্রে মাশায়েখে কেরামগণ বলেন, উক্ত গোলামটি মনিবের পক্ষ থেকে আজাদ হবে না। যদিও মৃত্যুর পর সে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। যতক্ষণ না ওয়ারিশ তাকে মুক্তি দান করবে। কেননা, মৃত ব্যক্তির মুক্তিদানের অধিকার নেই।

قوله : وَ لَوْ حَرَّرَهُ عَلٰى خِدْمَتِهِ الخ : যদি মনিব এ শর্তে আজাদ করে যে, দাস তার এক বৎসর খেদমত করবে। আর গোলাম তা গ্রহণ করে তবে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে এবং গোলামের উপর এক বৎসর খেদমত করা অপরিহার্য। কিন্তু যদি চুক্তির পর ঐ মুহূর্তে দাস কিংবা মনিব মৃত্যু বরণ করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে গোলামের সম্পদ থেকে তার দাস সত্তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, এক বৎসর তথা নির্ধারিত দিনের খেদমতের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তিনি দলিল দেন, নির্দিষ্টকৃত বস্তু তথা এক বৎসর খেদমতের মূল্য পরিশোধ করার কারণ হচ্ছে কোন বস্তু নির্ধারিত করার অর্থ হচ্ছে তা বিনিময় হওয়া। আর যার বিনিময় আবশ্যক হয়েছে তা মাল নয়। অর্থাৎ, আজাদ হওয়া বিনিময়। কেননা, শরীয়াতের দৃষ্টিতে আজাদ হওয়া মালের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বস্তুর নির্দিষ্ট করণ তার আসলকে বুঝায়। এজন্য তার মূল্য আদায় করা আবশ্যক হবে।

শায়খাইন (রহ.) এর দলিল হচ্ছে : নির্দিষ্ট বস্তু গোলামের বিনিময়। আজাদের বিনিময় নয়। আর ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে গোলাম মূল্যবান বস্তু। এই জন্য গোলাম তার মনিবের প্রস্তাব কবুল করার পর খেদমাত আঞ্জাম দানের পূর্বে মারা যায় তাহলে গোলামের সম্পদ থেকে তার ব্যক্তি সত্তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে হা গোলাম মনিবের প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথেই আজাদী সংঘটিত হয়ে যাবে। তার দৃষ্টান্ত এই যে মনিব এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে গোলামকে আজাদ করছে। আর গোলাম এ প্রস্তাব গ্রহণের পর আদায়ের পূর্বে মৃত্যুবরণ করছে।

শাইখাইন (রহ.) এর সাথে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতানৈক্য মূলত অন্য একটি মাসআলার উপর ভিত্তি করে হয়েছে। তা হল بيع العبد بالعين আর তার সুরত হচ্ছে, কেহ তার গোলামকে বলল, আমি তোমাকে তোমার কাছে এই নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে যেমন কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলাম। অতঃপর ঐ নির্দিষ্ট জিনিস মনিবের কবজা করার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে শাইখাইন (রহ.) এর মতে গোলামের মূল্য আবশ্যক হবে। তদ্রূপ পূর্বোক্ত মাসআলায় নির্দিষ্ট বস্তু তথা খেদমতের বিনিময় রয়েছে। কেননা, এটা গোলামের ব্যক্তিসত্তার বিনিময়। আর গোলামকে মাল হিসাবে গণ্য করা হয়। আর যখন খেদমতকে বিনিময় হিসাবে সাব্যস্ত করা গেল না তখন গোলামের মূল্য প্রদান করাই যথাযথ। কিন্তু গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কেননা, আজাদ করা রহিত করণকে গ্রহণ করে না। তাই তার মূল্য প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) দৃষ্টান্তের মাসআলার ব্যাপারে বলেন, ঐ নির্দিষ্ট বস্তু তথা কাপড়ের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, নির্দিষ্ট বস্তু এমন বস্তুর বিনিময় যা মাল নয়। (অর্থাৎ, আজাদ এর বিনিময়।) আর শরীয়াতে عتق এর কোন মূল্য নেই। তাই নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট বস্তুর মূল্যই ওয়াজিব হবে। সুতরাং পূর্বোক্ত মাসআলায় গোলামের উপর এক বৎসরের খেদমতের মূল্য ওয়াজিব হবে। আর ফকীহ ঈসা ইবনে আবান (রহ.) বলেন, উল্লিখিত গোলাম বাকী সময় ওয়ারিশদের খেদমত করবে। কেননা, খেদমত তার উপর ঋণ। আর ওয়ারিশগণ মনিবের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেরূপ যদি মনিব গোলামকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আজাদ করে আর মনিব তা থেকে আংশিক আদায় করে অতঃপর সে

মারা যায়। তাহলে ওয়ারিশগণ বাকী দিরহাম উসুল করবে। কিন্তু জাহিরী রেওয়ায়েত হল ওয়ারিশদের খেদমত না করা। কেননা, খেদমত মাল নয়। বরং উপকারিতা আর منفعة এর মাঝে উত্তরাধিকারী চলে না। তাছাড়া খেদমত গ্রহণের ক্ষেত্রে লোকজনের অবস্থা বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই একজন তার খিদমতে রাজী থাকার দ্বারা আবশ্যক নয় যে অন্যের খেদমতের প্রতি রাজি থাকবে।

قوله : وَ لَوْ قَالَ اَعْتِقْهَا : যদি কেহ অন্য একজনকে বলে তুমি তোমার দাসীকে আজাদ কর আমার জিম্মায় এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে যে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিবে। মনিব তাই করল, কিন্তু দাসী প্রস্তাবককে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। তাহলে মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু প্রস্তাবকের উপর কোন কিছুই সাব্যস্ত হবে না। তা এমন হল যেমন কেহ বলল তোমার গোলামকে আমার উপর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে স্বাধীন করে দাও। আর মনিব তাই করল। তাহলে আদেশদাতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা, নিজের মালিকানা বস্তুকে অন্যের মালের পরিবর্তে শর্তযুক্ত করা ঠিক নয়। তবে হা এটা অপর একটি মাসআলার বিপরীত। তাহল কেহ অন্য কোন ব্যক্তিকে বলল, আমার উপর এক হাজার দিরহাম আবশ্যক হওয়ার শর্তে তোমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির কথার প্রেক্ষিতে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তাহলে আদেশ দাতার উপর এক হাজার দিরহাম আবশ্য হবে। কেননা, খোলার ক্ষেত্রে তালাকের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু মুক্তিদানের ক্ষেত্রে তা জায়েয নয়।

قوله : وَ لَوْ زَادَ عَنِّىْ : আলোচ্য মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলার সাদৃশ। তাহল যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলে তোমার দাসীকে আমার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ, আরবীতে عَنِّىْ শব্দ ব্যবহার করে) এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে স্বাধীন কর এ শর্তে যে তাকে আমার নিকট বিবাহ দিবে। অতঃপর মনিব তার দাসীকে আজাদ করল, কিন্তু দাসী প্রাস্তাবককে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। তাহলে উক্ত এক হাজার দাসীর মূল্য ও মহরে মিছিলের মধ্যে বন্টিত হবে। সুতরাং দাসীর মূল্যের বিনিময়ে যে অর্থ নির্ধারিত হবে তা আদেশ দাতার উপর আবশ্যক হবে। আর মহরের বিপরীতে যা আবশ্যক হবে তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে আদেশ দাতার কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে সে যেন মনিবকে বলছে তুমি তোমার গোলাম আমার নিকট বিক্রয় কর। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে তাকে আজাদ করে দাও। মনিব তা পালন করায় আদেশদাতার উপর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়। আর মহরের বিনিময়ে যে পরিমাণ মাল আবশ্যক হবে তা পরিশোধ করতে হবে না। কেননা, দাসী বিবাহকে অস্বীকার করেছে। কেননা, এক্ষেত্রে আদেশদাতার এক হাজারকে ক্রয় এর দিক থেকে দাসীর দাস সত্তার বিপরীতে এবং বিবাহের দিক থেকে তার সম্ভোগ অংশের বিপরীতে সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং এক হাজার দিরহাম উভয়ের বিপরীতে বন্টিত হবে। তাই আদেশ দাতার অনুকুলে সংরক্ষিত দাস-সত্তার অংশটুকু তার উপর সাব্যস্ত হবে।

بَابُ التَّدْبِيرِ

পরিচ্ছেদ : মুদাব্বার ঘোষণা

هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِمُطْلَقِ مَوْتِهِ كَاِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ وَأَنْتَ حُرٌّ يوم أَمُوتُ أَو عن دُبُرٍ مِنِّي أو مُدَبَّرٌ اَوْ دَبَّرْتُكَ فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَيُستَخدَمُ وَيُؤَجَّرُ وَتُوطَأُ وَتُنكَحُ وَبِمَوْتِهِ يَعْتِقُ من ثُلُثِهِ وَيَسْعَى في ثُلُثَيهِ لَوْ فَقِيرًا وَ كُلِّهِ لَوْ مَديُونًا وَيُبَاعُ لو قال إنْ مِتُّ من مَرَضِي أوْ مِنْ سَفَرِي أو إلَى عَشْرِ سِنِينَ أو عِشْرِينَ سَنَةً أو أَنْتَ حُرٌّ بَعدَ مَوتِ فُلَانٍ وَيَعتِقُ إنْ وُجِدَ -

অনুবাদ : তাদবীর হচ্ছে মুক্তিদানকে শুধু তার মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা। যেমন আমি যখন মরে যাব তখন তুমি আজাদ অথবা যেদিন আমি মরে যাব তুমি আযাদ। কিংবা (বলে) আমার পরে তুমি আজাদ অথবা (বলে তুমি) মুদাব্বার কিংবা (বলে) তোমাকে আমি মুদাব্বার ঘোষণা করলাম। তাহলে উক্ত গোলামকে বিক্রয় করা যাবে না এবং দান করা যাবে না। তার থেকে খেদমত নেয়া যাবে উপার্জনে দেয়া যাবে। সহবাস করা যাবে বিবাহ দেয়া যাবে। মনিবের মৃত্যুতে তার ত্যাজ্য সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে আর যদি মনিব ফকির হয় তবে দুই তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি মনিব ঋণগ্রস্থ হয় তবে তার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি মনিব বলে আমি যদি এ অসুস্থতায় মারা যাই কিংবা এ সফরে মারা যাই অথবা দশ বা বিশ বৎসরে মারা যাই (তাহলে তুমি আজাদ।) (অথবা বলল,) অমুকের মৃত্যুর পর তুমি আজাদ তবে তাকে বিক্রয় করা যাবে। আর যদি শর্ত পাওয়া যায় তবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ الخ : যদি কেহ তার গোলামকে বলে আমি যখন মরে যাব কিংবা আমি যেদিন মরে যাব সেদিন তুমি আজাদ অথবা বলে আমার পরে তুমি আজাদ অথবা বলল, তুমি মুদাব্বার কিংবা বলল, আমি তোমাকে মুদাব্বার বানালাম, তাহলে গোলামটি মুদাব্বার হয়ে যাবে। কেননা, এ শব্দগুলো মুদাব্বার বানানোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট। সুতরাং এ গোলামের হুকুম হচ্ছে জমহুর ফুকাহায়ে কেরামের মতে এক জনের মালিকানা থেকে অন্য জনের মালিকানায় স্থানান্তরিত করা যায় না। কেননা, বর্তমানে তার মধ্যে আজাদ হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, মুদাব্বার তো তার মনিবের মৃত্যুতে স্বাধীন হয়ে যায়। আর তখন তার আজাদ হওয়ার কারণ সর্বসম্মতিক্রমে এটাই হবে যে, মনিব জীবদ্দশায় তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে। তবে হা তা প্রকাশ হয়েছে মনিবের মৃত্যুর পর। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি গোলামকে বিক্রি করা বা হেবা করা জায়েয রাখা হয় তাহলে আজাদ হওয়ার কারণকে রহিত করন লাজিম হয়। অথচ তা জায়েয নয়। তাছাড়া আমাদের দলিল হল হুজুর (সা.) এর হাদীস :

اَلْمُدَبَّرُ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَ هُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

'মুদাব্বার গোলামকে বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং তার উপর উত্তরাধিকারী প্রয়োগ করা যাবে না, বরং এক তৃতীয়াংশ (ত্যাজ্য) সম্পদ থেকে সে আজাদ হবে।' পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উক্ত গোলামকে বিক্রি করা জায়েয আছে। তিনি হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদসি দ্বারা দলিল পেশ করেন তা হল আনসারী সাহাবাদের এক জন তার গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছিল। অথচ এ গোলাম ছাড়া তার কাছে আর কোন সম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার পক্ষ থেকে গোলামটিকে কেউ ক্রয় করবে, তখন হযরত নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাযি.) একশত দিরহামের বিনিময়ে এ গোলামটিকে ক্রয় করেছিলেন। আর ঐ দিরহামগুলো আনসারী সাহাবীকে প্রদান করা হল। হুজুর (সা.) বললেন, তার থেকে ঋণ পরিশোধ কর।

তাছাড়া তিনি বলেন, ইহা হচ্ছে মুক্তিদানকে শর্তের সাথে সংযুক্ত করণ। সুতরাং অন্যান্য শর্তারোপের মত শর্তযুক্ত মুদাব্বারের মতো তাকেও বিক্রি বা দান করা জায়েয। তাছাড়া তিনি আরো বলেন, যে মুদাব্বার ঘোষণার অর্থ হচ্ছে অসিয়ত করা। আর অসিয়ত কৃতকে বিক্রয় ও দান জাতীয় পদক্ষেপ থেকে বাধা দেয় না।

আমাদের পক্ষ থেকে হাদীসের জবাব হচ্ছে, হুজুর (সা.) তার মুদাব্বার ঘোষণাকে মূলত সঠিক সাব্যস্ত করেননি। অথবা সে মুদাব্বার ঘোষণার ইচ্ছা পোষণ করেছিল মাত্র। আর অন্য সকল শর্তায়নের বিষয়ের সাথে তুলনা করা ভিন্ন। কেননা কারণ, রোধকারী বিষয়টি শর্তের পূর্বেই বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু এটা হচ্ছে ইয়ামিন, আর ইয়ামিন হচ্ছে বাধা দানকারী এবং বাধা দেওয়াই হচ্ছে ইয়ামিনের উদ্দেশ্য। আর কারণকে শর্ত বিদ্যমান হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা সম্ভব। কেননা, তখন যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল। তবে মনিবের অধিকার রয়েছে মুদাব্বার থেকে খেদমত গ্রহণ করতে। তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে, আর যদি দাসী হয় তবে তার সাথে সম্ভোগ করতে বা অন্যত্র বিবাহ দিতে। কেননা, মনিবের অনুকূলে তার মালিকানা সাব্যস্ত রয়েছে। আর মালিকানা দ্বারা তখন কর্মের অধিকার অর্জিত হয়ে থাকে।

قوله : وَ بِمَوْتِهِ عُتِقَ مِنْ ثُلُثِهِ الخ : মুদাব্বার ঘোষণার পর যদি মনিব মৃত্যুবরণ করে তবে মুদাব্বার গোলাম তার মনিবের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে এক তৃতীয়াংশ হিসাবে আজাদ হয়ে যাবে। দলিল হচ্ছে আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস, তাছাড়া তা অসিয়ত হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, তা হচ্ছে মৃত্যুর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি স্বেচ্ছাদান। সুতরাং তা এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যেই কার্যকর হয়। এমনকি যদি উক্ত মনিবের উক্ত গোলাম ছাড়া আর কোন সম্পদ থাকে না, তাহলে গোলাম তার এক তৃতীয়াংশ আজাদ হবে আর বাকী দু তৃতীয়াংশের জন্য ওয়ারিশদের অনুকূলে উপার্জন করবে। আর যদি মৃত মনিব ঋনগ্রস্থ হয় তবে গোলাম তার সমস্ত মূল্যের জন্য উপার্জনে বাধ্য হবে। কেননা, ঋণ ওসিয়াতের উপর অগ্রাধিকার হয়ে থাকে। আবার অসিয়াত ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। এজন্য তার মূল্য আদায় করা ওয়াজিব।

قوله : وَ يُبَاعُ لَوْ قَالَ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার গোলামের ক্ষেত্রে মুদাব্বার ঘোষণাকে তার মৃত্যুর বিশেষ কোন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে অর্থাৎ, নিজের মৃত্যুর সাথে এমন শর্ত যুক্ত করে দেয়া যা সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়, তাহলে গোলাম মুদাব্বার হবে না। যেমন, সে বলে আমি যদি এ অসুস্থায় মারা যাই কিংবা আমি যদি এই সফরে মারা যাই কিংবা দশ বা বিশ বৎসরের মধ্যে মারা যাই তাহলে তুমি আজাদ। মনিবের এরূপ শর্তযুক্ত কথা দ্বারা গোলাম মুদাব্বার হবে না। কেননা, ঐ গুণটি অস্তিত্বের ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কারণে বর্তমানে মুক্তির কারণ সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু সাধারণ মুদাব্বারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সে ক্ষেত্রে নিঃশর্ত মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

قوله : وَ يَعْتِقُ اِنْ وُجِدَ الخ : মনিব যদি তার গোলামকে নিজের মৃত্যুর সাথে এমন শর্ত যুক্ত করে আজাদ করে যা সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। অতঃপর যদি মনিব মৃত্যুবরণ করে তাহলে উক্ত গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন সাধারণ মুদাব্বার গোলাম মনিবের মৃত্যুতে স্বাধীন হয়ে যায়। কেননা, যখন মনিব জীবনের শেষ অংশে উপনিত হবে তখন এ অবস্থাটি সাব্যস্ত হয়ে সে মুদাব্বার হয়ে যায়। একারণেই তা এক তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে। والله اعلم -

بَابُ الْاِسْتِيْلَادِ

পরিচ্ছেদ : দাসী উম্মেওয়ালাদ হওয়া

وَلَدَتْ أَمَةٌ مِن السَّيِّدِ لَم تُمَلَّكْ وَتُوطَأُ وَتَسْتَخْدِمُ وَتُوجَرُ وَتُزَوَّجُ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِلَا دَعْوَةٍ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَانْتَفَى بِنَفْيِهِ وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ مِنْ كُلِّ مَالِهِ وَلَم تَسْعَ لِغَرِيمِهِ وَلَو أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا -

অনুবাদ : দাসী যদি তার মনিবের ঔরষে সন্তান প্রসব করে। (সে মনিবের উম্মেওয়ালাদ হয়ে যাবে।) তাকে মালিকানায় প্রদান করা যাবে না, সহবাস করা যাবে খিদমাত গ্রহণ করা যাবে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে এবং বিবাহ্ দেয়া যাবে। অতঃপর যদি সন্তান প্রসব করে দাবী উত্থাপন ছাড়াই নসব সাব্যস্ত হবে। প্রথম সন্তান এর ব্যতিক্রম আর (দ্বিতীয় সন্তান) মনিবের অস্বীকৃতিতে (বংশ সম্পর্ক) নাকচ হয়ে যাবে। আর উম্মে ওয়ালাদ মনিবের মৃত্যুতে তার সমূহ সম্পদ থেকে আজাদ হয়ে যাবে। মনিবের পাওনাদারের অনুকুরে উপার্জন করতে হবে না। আর যদি খৃষ্টানের উম্মেওয়ালাদ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে বাধ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

اَلْاِسْتِيْلَادُ : এর শাব্দিক অর্থ সন্তান লাভ করা। পরিভাষায় استلاد বলা হয় নিজ দাসির সাথে সহবাস পূর্বক তার থেকে সন্তান লাভ করা। এমতাবস্থায় মনিব যদি সন্তানের নসব তার থেকে মেনে নেয় তবে তার থেকেই বংশসূত্র সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় সাব্যস্ত হবে না। আর বংশসূত্র সাব্যস্ত হলে সে মনিবের সন্তানের মাতা হিসাবে গণ্য হবে।

قوله : وَلَدَتْ اَمَةٌ مِنَ السَّيِّدِ الخ : মনিবের দাসী যদি মনিবের সহবাসের ভিত্তিতে সন্তান প্রসব করে আর মনিব এ সন্তানের বংশসূত্র তার থেকে হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে উক্ত দাসী উম্মে ওয়ালাদ এ কারণে এ দাসীকে আর অন্যের মালিকানায় সোপর্দ করা যাবে না। তা বিক্রির মাধ্যমে হোক বা হেবার মাধ্যমে হোক। কেননা, ইবনে মাজাহ দারাকুতনী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর সূত্রে বর্ণিত 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট তার পুত্র সন্তান হযরত ইব্রাহীমের মাতা হযরত মারিয়া কিবতিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا তার সন্তান তাকে আজাদ করে দিয়েছে।

তাছাড়া হযরত উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বরের উপর উচ্চ আওয়াজে বলেছেন যে, উম্মেওয়ালাদ দাসীকে বিক্রি করা হারম। মনিব থেকে দাসীর সন্তান হলে সে আজাদ। এরপর আর সে সাধারণ দাসী থাকে না। অনুরূপ অর্থবোধক হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) মা'কাল ইবনে সিনান (রাযি.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া একারণে যে সন্তানের মাধ্যমে সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার মাঝে অংশত্ব সাব্যস্ত হয়েছে তবে সন্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অংশত্ব সত্বাগতভাবে বিদ্যমান থাকে। বস্তুগতভাবে বিদ্যমান থাকে না। একারণে অংশত্বের

কারণ দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য মুক্তির হুকুমটি সৃষ্ট পরবর্তী সময় পর্যন্ত মুলতবী অবস্থায় সাব্যস্ত হয়। আর বস্তুগতভাবে অংশত্ব বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নসব দ্বারা বিবেচনা করা হয়। আর বংশ পরিচয় পুরুষের দিক থেকে হয়। এজন্য মুক্তি লাভের বিষয়টিও পুরুষদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং যদি স্বাধীন নারী তার স্বামীর মালিকানা লাভ করে আর অবস্থা এই যে, ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী মুক্তি লাভ করে না। আর উম্মেওয়ালাদের ক্ষেত্রে মুলতবী কৃত মুক্তির সাব্যস্ততা বর্তমানকালে মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তাই মুক্তি করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মালিকানা থেকে বের করা যাবে না। অর্থাৎ, বিক্রি বা দান করার মাধ্যমে তাকে বর্তমানে নিজ মালিকানা থেকে বের করা নিষিদ্ধ।

আর তার মৃত্যুর পর তার মুক্তিকে ওয়াজিব করবে। আর এ দাসীর মালিকানা মনিবের জন্য বিদ্যমান থাকার কারণে সে মুদাব্বার এর ন্যায় হয়ে গেল। তাই মনিব তার সাথে সহবাস করতে পারবে। তার থেকে খেদমাত তলব করতে পারবে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে এবং তাকে বিবাহ দান করতে পারবে।

قوله : فَاِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُ الخ : মনিব কর্তৃক সহবাসে যদি দাসী সন্তান প্রসব করে তবে মনিবের স্বীকৃতি ছাড়া এ সন্তানের নসব মনিবের দিকে সম্পৃক্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মনিব পিতৃত্ব দাবী না করলেও সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তিনি দলিল দেন বিবাহ বন্ধন দ্বারাই যখন বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সহবাস দ্বারা কেন নসব সাব্যস্ত হবে না। অথচ সহবাস সন্তানের জন্মের প্রত্যক্ষ্য কারণ।

আমাদের দলিল : দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ নয়। বরং যৌন চাহিদা পূরণ করা। কেননা, এক্ষেত্রে সন্তান লাভের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে। আর তাহল দাসীর মূল্য রহিত হওয়া কিংবা হ্রাস পাওয়া। এজন্য মনিবের পক্ষ থেকে দাবী আবশ্যক। কিন্তু বিবাহবন্ধনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্যরূপে সন্তান লাভের বিষয়টি নির্ধারিত। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে সন্তানের দাবী করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন মনিবের দাবীর প্রেক্ষিতে দাসীর সন্তানের নসব সাব্যস্ত হলো এবং দাসী উম্মেওয়ালাদ হল, তখন দাসীর দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে মনিবের স্বীকারোক্তি ছাড়াই সন্তানের বংশ মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। কেননা, প্রথম সন্তানের নসবের দাবী করার পর ঐ দাসী দ্বারা সন্তান জন্মগ্রহণ বিষয়টি উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মে ওয়ালাদ তারই শয্যাশায়িনী গণ্য হবে।

قوله : وَانْتَفٰى بِنَفْيِهٖ الخ : মনিব যদি দাসীর তথা উম্মেওয়ালাদের দ্বিতীয় সন্তানকে অস্বীকার করে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে এবং সন্তানের বংশ মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। তা একারণে যে, উম্মে ওয়ালাদের শয্যা দুর্বল। তা হলো মনিব চাইলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে পারে। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীর বিষয় এর ব্যতিক্রম। কেননা, স্বামী চাইলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতে পারবে না। তেমনি সন্তানের নসব অস্বীকার করলে লিআন করতে হয়। কেননা, স্ত্রীর শয্যা সুদৃঢ়। ইহা হচ্ছে আইনগত বিধান। পক্ষান্তরে দিয়ানত বা حق الله এর দাবী হচ্ছে যদি মনিব তার সাথে আজল ছাড়া সহবাস করে থাকে এবং তার সতিত্ব রক্ষা করে থাকে তাহলে সন্তানের বংশ দাবী করা ও স্বীকার করে নেয়া মনিবের জন্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে যদি দাসীর সাথে সহবাস করে কিন্তু তার থেকে আজল করে বা তার সতিত্ব সংরক্ষণ না করে থাকে তবে সন্তানের বংশ দাবী না করা বা অস্বীকার করারও অবকাশ আছে।

قوله : وَ عَتَقَتْ بِمَوْتِهٖ الخ : মনিবের মৃত্যুতে উম্মেওয়ালাদ মনিবের সম্পূর্ণ সম্পদ থেকেই আজাদ হয়ে যাবে। এর দলিল হল, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মে ওয়ালাদগণের মুক্তির ফায়সালা দান করেছেন। এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের বিক্রি না করার এবং তাদের মুক্তির বিষয়কে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গণ্য না করার আদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এ কারণে যে সন্তান লাভ হচ্ছে মানুষের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা ঋণ পরিশোধের এবং ওয়ারিশদের হকের উপর প্রধান্য

লাভ করবে। যেমন কাফন-দাফনের বিষয়টি। তাছাড়া মুদাব্বারের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, ইহা হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন অতিরিক্ত অসিয়াত। সুতরাং তার সাথে উম্মেওয়ালাদের বিষয়কে তুলনা করা যাবে না। আর উম্মেওয়ালাদের মনিব যদি ঋণগ্রস্থ হয় তাহলে উম্মেওয়ালাদের উপর আবশ্যক নয়, তার মনিবের পাওনাদারদের অনুকুলে উপার্জন করা। তার দলিল হচ্ছে, ইতিপূর্বে বর্ণিত আমাদের হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, উম্মেওয়ালাদ অর্থ মূল্য সম্পন্ন মাল নয়। তাই তো ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে ছিনতাই এর কারণে উম্মে ওয়ালাদের ক্ষতিপুরণ আবশ্যক হয় না।

قوله : وَلَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ الخ : যদি খৃষ্টান মনিবের উম্মেওয়ালাদ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার অর্থ মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করা আবশ্যক আর উক্ত উম্মেওয়ালাদ কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ দাসীর সমপর্যায় ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, উপার্জন করে অর্থ পরিশোধ করা ছাড়া সে আজাদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, তৎক্ষণাৎই আজাদ হয়ে যাবে। তবে উপার্জন করে অর্থ পরিশোধ করা তার যিম্মায় ঋন হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম যুফার (রহ.) দলিল পেশ করেন : ইসলাম গ্রহণের কারণে তার থেকে অপমান দূর করা অপরিহার্য। আর তা সম্ভব এভাবে যে, হয় তো বিক্রি করে দেয়া হবে কিংবা আজাদ করে দেয়া হবে। সুতরাং এ দাসী যেহেতু উম্মে ওয়ালাদ তাই সে বিক্রিযোগ্য নয় বিধায় তার ক্ষেত্রে অপরটি তথা আজাদ হওয়া ধার্য হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল হচ্ছে : তাকে কিতাবাত চুক্তির ন্যায় গণ্য করার মধ্যে উভয়ের কল্যাণ রয়েছে। কেননা, কর্মক্ষমতার দিক থেকে স্বাধীন হওয়ার কারণে তার অপমান দূর হয়ে গেল। আর উপার্জনের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের কারণে জিম্মি ব্যক্তি ও তার ক্ষতি হওয়া থেকে বেঁচে গেল। আর যদি প্রথমেই তাকে আজাদ ঘোষণা করা হয় তবে সে উপার্জন করে মূল্য পরিশোধ করতে অবহেলা করবে। তাতে এক পক্ষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের ফুকাহাদের মধ্যে এমত পার্থক্য তখন হবে যখন মনিব ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি সে দাসির সাথে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উম্মে ওয়ালাদ তার পূর্বের গতিতে বহাল থাকবে। এক্ষেত্রে কারো কোন মতানৈক্য নাই। আর যদি জিম্মি মনিব মারা যায় তাহলে উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ ছাড়াই সে আজাদ হয়ে যাবে।

وَإِنْ وَلَدَتْ بِنِكَاحٍ فَمَلَكَهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَلَوِ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وَلَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَنِصْفُ عُقْرِهَا لَا قِيمَتُهُ وَلَوِ ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الْعُقْرِ وَتَقَاصَّا وَوَرِثَ مِنْ كُلٍّ إِرْثَ ابْنٍ كَامِلٍ وَوَرِثَا مِنْهُ إِرْثَ أَبٍ وَلَوِ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَزِمَ النَّسَبُ وَالْعُقْرُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ -

অনুবাদ : যদি দাসীর সন্তান হয় বিবাহের কারণে অতঃপর স্বামী দাসির মালিক হয় তবে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যদি (শরীকদের) কেহ শরীকানাধীন দাসীর সন্তানের দাবী করে তবে সন্তানের বংশসূত্র সাব্যস্ত হবে। এবং দাসী দাবী কারীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর তার (দাবীকারীর) উপর দাসীর অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক মহর আবশ্যক হবে। তবে সন্তানের মূল্য আবশ্যক হবে না। আর যদি উভয় (শরীক) এক সাথে সন্তানের দাবী করে, তাহলে উভয়ের সাথেই বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর দাসী উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মহর সাব্যস্ত হবে। এবং তা পরস্পর থেকে আটকে যাবে। (অর্থাৎ, ঐ অর্ধেকের বিনিময়ে কাটা যাবে যার অনুকুলে অপর জনের উপর অর্ধেক সাব্যস্ত হয়েছে।) আর পুত্র উভয়ের প্রত্যেকের কাছ থেকে পূর্ণ পুত্রের মিরাস লাভ করবে। আর উভয় শরীকদার তার থেকে একজন মুকাতাবের দাসীর সন্তানের দাবী করে এবং মুকাতাব তা স্বীকার করে তাহলে (সন্তানের) বংশ সূত্র ও মহর এবং সন্তানের মূল্য আবশ্যক হবে। তবে দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। আর যদি মুকাতাব তা অস্বীকার করে তাহলে (সন্তানের) বংশসূত্র সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَإِنْ وَلَدَتْ بِنِكَاحٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অন্যের দাসীকে বিবাহ করে অতঃপর তার স্ত্রীর গর্ভ থেকে তার ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর যে কোনভাবে এ দাসীর মালিকানা তার জন্য অর্জিত হয়। তাহলে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। ইহা আমাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না।

আমাদের দলিল : ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, অংশত্বই হচ্ছে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণ। আর সন্তানের মধ্যস্থতায় সন্তানের পিতা মাতার মধ্যে অংশত্ব হয়। আর তা সৃষ্টিগত উপাদানের মাধ্যমে পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয়। আর এখানে বিবাহের মাধ্যমে সন্তানের নসব ও বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এ সংযোগের মাধ্যমে অংশত্বও সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَلَوِ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ الخ : যদি দুজনের শরীকানাধীন দাসীর সন্তান প্রসব হয়। আর শরীকদ্বয়ের কোন একজন সন্তানটির পিতৃত্বের দাবী করে, তাহলে তার থেকে সন্তানের বংশসূত্র সাব্যস্ত হবে। কেননা, পিতৃত্ব দাবীকারী যেহেতু মালিকানার সাথে সংযুক্ত তাই সন্তানটির অর্ধেক অংশে বংশ সাব্যস্ত হবে। আর তা বাকী অর্ধাংশে আবশ্যকীয়ভাবে সাব্যস্ত হওয়াকে দাবী করে। কেননা, গর্ভ সঞ্চার বিভাজ্য হয় না, যা বংশ পরিচয়ের কারণ। কেননা দুই বীর্যের সঞ্চারে একটি সন্তান মাতৃগর্ভে হতে পারে না। এজন্য আমরা বলি বংশ পরিচয় বিভাজ্য হতে পারে না। আর এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা, সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যেহেতু

উম্মে ওয়ালাদ বিভাজিত হয় না। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার অংশ তথা দাবীকারীর অংশ উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অতঃপর সে শরীকদারের অংশের মালিক হয়ে যাবে। কেননা, তা মালিকানার উপযুক্ত। আর সে তার শরীককে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে। এবং সে দাসীর অর্ধেক মহরের জিম্মাদার হবে। কেননা, সে শরীকানাভুক্ত দাসীর সাথে সহবাস করেছে, ফলে সন্তান জন্মের অনিবার্য হুকুম হিসাবে সে তার পূর্ণের মালিক হবে। অপর শরীকদারের অংশের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর দাবীকারী দাসীর সন্তানের মূল্যের জামিন হবে না। কেননা, গর্ভ সঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় সন্তানের বংশ সম্পর্কে দাবীকারী থেকে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সন্তানের গর্ভ সঞ্চারের কোনভাবেই শরীকদারের মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি।

قوله : وَلَوِ ادَّعَيَاهُ مَعًا الخ : আর যদি উভয় শরীকদার এক সাথে সন্তানের দাবী করে তাহলে উভয়ের সাথেই বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি সন্তানের মায়ের দুজন মনিব থাকে আর তারা উভয়েই সন্তানের দাবী করে আর কোন একজন একে প্রাধান্য দেয়ার মতো অন্য কোন যুক্তি বা পন্থা না থাকে তাহলে সন্তান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির কথার উপর নির্ভর করে সন্তানকে একজনের দিকে সম্পৃক্ত করবে। কেননা, এটা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে দুই বীর্য দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হয় না। তাই দুই ব্যক্তি থেকে বংশ সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সন্তানের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দলিল পেশ করেন হযরত আয়েশা (রাযি.) এর হাদীস দ্বারা :

قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ سُرُوْرًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَتَدْرِى اَنَّ مُجَزِّزَ الْمَدْلَجِيْ دَخَلَ عَلَيَّ وَ عِنْدِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ زَيْدٌ عَلَيْهِمَا قَطِفَةٌ وَ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا وَ بَدَتْ اَقْدَامِهِمَا فَقَالَ هٰذِهِ الْاَقْدَامُ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ وَ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ كَانَ اُسَامَةُ اَسْوَدَ وَ كَانَ زَيْدٌ اَبْيَضَ

'হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনন্দিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জান মুজাযযায মুদলাজী কি বলেছে? সে আমার নিকট এসেছিল আর তখন উসমা ও যায়েদ আমার কাছে ছিল। চাদর মুড়ি দিয়ে তারা শুয়েছিল। মাথা ঢাকা আর পা খোলা ছিল। তখন মুজাযযায দেখে বলল, এ পা সমূহের অধিকারীদের মধ্যে পরস্পর পিতা-সন্তানের সম্পর্ক। (এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তায় রয়েছে।) আর ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, হযরত যায়েদ (রাযি.) সাদা বর্ণের আর হযরত উসামা (রাযি.) কালো বর্ণের ছিলেন।'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উক্ত ঘটনায় হুজুর (সা.)-এর আনন্দিত হওয়ার বিষয়কেই দলিল বানিয়েছেন এবং বলেছেন, লোক পরিচয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা গ্রহণযোগ্য।

আমাদের দলিল : এ ধরনের ঘটনায় হযরত উমর (রাযি.) কর্তৃক কাজী শোয়াইহ (রহ.)-এর প্রতি চিঠি, তিনি বলেন :

لَبَسَا فَلَبَسَ عَلَيْهِمَا وَ لَوْ بَيَّنَا لَبَيَّنَ لَهُمَا وَ هُوَ اِبْنُهُمَا وَ يَرِثُهُمَا وَ يَرِثَانِهِ وَ هُوَ لِلْبَاقِىْ مِنْهُمَا

'এরা দুজন বিষয়টিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। তাই তুমিও উভয়ের ব্যাপারে বিষয়টিকে খুলে দাও। তারা যদি বিষয়টিকে পরিস্কার করত তাহলে তাদের জন্যও তা পরিস্কার করে দেওয়া হতো। সে উভয়ের পুত্র হবে এবং উভয়ের ওয়ারিশ হবে। আর উভয়ে তার ওয়ারিশ হবে। পরবর্তীতে দুজনের যে জীবদ্দশায় থাকবে সে তারই পুত্র হবে।'

অনুরূপ হযরত আলী (রাযি.) থেকেও বর্ণিত আছে। তাছাড়া এ কারণে যে পিতৃত্বের অধিকার লাভের কারণ

তথা মালিকানার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। তাই উভয়ের পিতৃত্বের অধিকারে সমান হবে। আর বংশ সম্পর্ক যদিও বিভাজ্য নয়, কিন্তু তার সাথে এমন সকল বিধান সংশ্লিষ্ট রয়েছে যা বিভাজনযোগ্য। সুতরাং যা বিভাজনযোগ্য তা বিভাজনের ভিত্তিতে উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হবে। আর যা বিভাজন যোগ্য নয় তা উভয়ের প্রত্যেকের সপক্ষে এমনভাবে পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হবে যেন তার সাথে অন্য কেউ নেই। তবে হা যদি দু শরীকের একজন পিতা ও অপরজন ছেলে হয় তবে পিতা অগ্রগণ্য হবে। কেননা, পুত্রের অংশের মাঝে পিতার স্বীকৃত অধিকার বিদ্যমান রয়েছে। তদ্রূপ যদি দু শরীকের একজন মুসলমান ও অপরজন জিম্মি বা কাফের হয় তবে মুসলমান অগ্রগণ্য হবে। কেননা, তার মধ্যে ইসলাম বিদ্যমান যা সর্বাবস্থায় কাফের থেকে অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিলের জবাব হচ্ছে হুজুর (সা.) এর আনন্দ প্রকাশ বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তিতে উসামা (রাযি.) যায়েদ (রাযি.)-এর পুত্র হওয়া প্রমাণিত হওয়ার কারণে নয়; বরং কাফেররা হযরত উসামা (রাযি.)-এর বংশ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করতো। সুতরাং পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্য ছিল তাদের অভিযোগ খন্ডনকারী, তাই তিনি তার মন্তব্যে আনন্দিত হয়েছেন। আর দাসীটি উভয় শরীকানদের উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা, সন্তানের নিজ নিজ অংশে উভয় শরীকদের দাবী সঠিক। সুতরাং প্রত্যেকের দাসীর অংশটি তার সন্তানের অনুবর্তী হিসাবে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মহর সাব্যস্ত হবে এবং তা ঐ অর্ধেকের বিনিময়ে কাটা যাবে যার অনুকুলে অপরজনের উপর সাব্যস্ত হয়েছে। আর এ পুত্র উভয় জনের কাছ থেকে পূর্ণ পুত্রের মিরাস পাবে। কেননা, তারা উভয়ই পূর্ণ মিরাস লাভের স্বীকৃতি দিয়েছে। আর উভয় শরীকদার ঐ পুত্র থেকে একজন পিতার মিরাস লাভ করবে। কেননা পিতৃত্বের অধিকার লাভের কারণের ক্ষেত্রে উভয় সমান।

قوله : وَلَوْ اِدَّعٰى وَلَدَ اَمَةٍ الخ : আর যদি মনিব তার মুকাতাব দাসের দাসীর সাথে সহবাস করে এবং দাসী সন্তান প্রসব করে এবং মনিব ঐ সন্তানের দাবী করে আর মুকাতাব দাস তা স্বীকার করে তবে মনীবের সাথে সন্তানের পিতৃত্ব সাব্যস্ত হবে। আর দাসীর মহর মনীবের উপর ওয়াজিব হবে। সন্তানের মূল্য মনিবের উপর আবশ্যক হবে। দাসীটি মনিবের উম্মে ওয়ালাদ হবে না। আর যদি মুকাতাব সন্তানের নসব মনিব থেকে হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মোকাতাব গোলামের স্বীকারোক্তির বিবেচনা করা হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মোকাতাব গোলামের স্বীকারোক্তির বিবেচনা করা হবে না। আর আমাদের দলিল হল : মনিব তার মুকাতাব গোলামের উপার্জনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী নয়। একারণেই প্রয়োজনের সময় সে নিজেই তার মালিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এ কারণে মুকাতাবের সত্যায়ন অপরিহার্য।

كِتَابُ الْاَيْمَانِ

অধ্যায় : শপথ

اَلْيَمِيْنُ تَقْوِيَةُ اَحَدِ طَرَفَيِ الْخَبَرِ بِالْقَسَمِ بِهٖ فَحَلْفُهُ عَلٰى مَاضٍ كَذِبًا عَمَدًا غَمُوسٌ وَظَنًّا لَغْوٌ وَاٰثِمٌ فِي الْأُوْلَى دُوْنَ الثَّانِيَةِ وَعَلٰى اٰتٍ مُنْعَقِدَةٌ وَفِيهَا كَفَّارَةٌ فَقَطْ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ حَنِثَ كَذٰلِكَ -

অনুবাদ : ইয়ামিন (শপথ) হচ্ছে খবরের কোন একদিককে আল্লাহর নাম দ্বারা শক্তিশালী করা। অতীতের কোন বিষয়ে মিথ্যা জেনে বুঝে সেচ্ছায় শপথ করা (ইয়ামিনে) গুমুস। আর ধারণামূলক হলে লাগু। প্রথম প্রকারে (শপথকারী) গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় প্রকারে গুনাহগার হবে না। ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে শপথ করা হচ্ছে মুনআক্বেদাহ। শুধু এক্ষেত্রে (ভঙ্গ করলে) কাফফারা আবশ্যক হবে। যদিও তা জোর জবরদস্তিতে বা ভুলে করে থাকে অথবা এমনি ভঙ্গ করে ফেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

اَيْمَانٌ শব্দের همزه বর্ণে যবর যুক্ত। এটি يَمِيْنٌ এর বহুবচন। যার অর্থ শক্তি, শপথ, ডান হাত। তবে তার প্রকৃত অর্থ শক্তি। আর মানুষের বাম হাত থেকে ডাক হাতে শক্তি বেশি থাকে বিধায় ডান হাতকে يَمِيْنٌ বলা হয়। তদ্রূপ حلف কেও يمين বলা হয়। কেননা, কোন কাজ করা বা না করার উপর শপথ করার দ্বারা তাতে শক্তি সৃষ্টি হয়। ফুকাহাদের পরিভাষায় تعليق ও এমনই। অর্থাৎ কোন অপছন্দনীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা এর থেকে বিরত থাকার দিককে মজবুত করা হয় এবং কোন পছন্দনীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা তা করার দিককে মজবুত করা হয়।

শরীয়াতের পরিভাষায় : ايمان। বলা হয় আল্লাহ তা'আলার নাম বা তার সিফাতসমূহ উল্লেখ করে কোন কথাকে মজবুত ও শক্তিশালী করা।

কুরআনের আলোক শপথ : আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের লগব শপথ এর মধ্যে পাকড়াও করবেন না। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ কিন্তু এসব শপথের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করছে। আরো ইরশাদ হয়েছে : وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা মজবুত করে বাধ।

قوله : اَحَدُ طَرَفَيِ الْخَبَرِ الخ : খবরের উভয় দিক তথা খবর সত্য বা মিথ্যা হওয়া হিসেবে শপথ করা আল্লাহর নামে কিংবা আল্লাহর সিফাতী নামে।

قوله : فَحَلْفُهُ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (রহ.) শপথের প্রকারগুলো বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করতেছেন। সুতরাং শপথ প্রথমত দু প্রকার : (১) يمين بالله তথা আল্লাহর নামে শপথ। শাব্দিক ও শরয়ীভাবে এই প্রকারের শপথই উদ্দেশ্য হয়। (২) يَمِيْنٌ بِغَيْرِ الله তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামের শপথ। উল্লেখ্য যে, اَصْحَابُ الظَّاهِرِ এই প্রকার শপথকে অস্বীকার করেন। কিন্তু জামহুর উলামায়ে কেরাম এই প্রকারের শপথকেও শপথ বলে

গণ্য করেছেন। সম্মানিত গ্রন্থকার প্রথম প্রকার শপথকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন : (১) يَمِيْنُ غَمُوْسٍ (২) يَمِيْنُ لَغْوٍ (৩) يَمِيْنُ مُنْعَقِدَةٌ -

يَمِيْنُ غَمُوْسٍ বা মিথ্যা শপথ : غَمُوْسٌ শব্দটি فَعُوْلٌ এর ওযনে غمس থেকে উদ্গত, যার অর্থ ডুব দেয়া। ডুবিয়ে দেয়া।

يمين غموس বলা হয় : حَلْفُهُ عَلٰى مَاضٍ كَذِبًا عَمَدًا غَمُوْسٌ অতীতের কোন বিষয়ে মিথ্যা জেনে বুঝে সেচ্ছায় শপথ করা।

কুদুরী গ্রন্থকার বলেন :

هِيَ الْحَلْفُ عَلٰى اَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكِذْبَ فِيْهِ فَهٰذِهِ الْيَمِيْنُ يَأْثِمُ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَا كَفَّارَةَ فِيْهَا اِلَّا التَّوْبَةَ وَالْاِسْتِغْفَارَ -

ইয়ামীনে গুমুস বলা হয় অতীতের কার্যের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা। এই ধরনের শপথকারী গুনাহগার হবে। এ ধরনের শপথের ক্ষেত্রে কোন কাফফারা নেই। তবে তাওবা ইস্তিগফার করা আবশ্যক। এই প্রকার শপথকে غموس বলা হয়। এজন্য যে শপথকারী এর দ্বারা নিজেকে গুনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। কেননা يمين غموس এর হুকুম হচ্ছে এটি কবিরা গুনাহ। চাই এর দ্বারা কোন মুসলমানের হক নষ্ট হোক বা না হোক।

হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ حَلَفَ كَاذِبًا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

তাছাড়া হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত :

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اِمْرِءٍ مُسْلِمٍ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ اَدْخَلَهُ النَّارَ -

'যে ব্যক্তি শপথ করল আর সে তাতে ফাজের যাতে একজন মুসলমানের মাল শপথ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করতে পারে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করেছেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।'

আমাদের মাযহাব অনুযায়ী ইয়ামীনে গুমুসের ক্ষেত্রে কাফফারা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে কাফফারা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহর নামের মর্যাদা লংঘনের পাপ মোচনের জন্য শরীয়ত কাফফারার বিধান আরোপ করেছে। আর এ পাপ সাব্যস্ত হয়েছে মিথ্যাভাবে আল্লাহকে সাক্ষীরূপে পেশ করার কারণে। সুতরাং তা ইয়ামীনে মা'কুদাহ সাদৃশ্য হলো। আমাদের দলিল এই যে, আলোচ্য শপথ হচ্ছে একটি সর্বোতভাবে কবিরা গুনাহ। আর কাফফারা হচ্ছে একটি ইবাদত। যা রোযা দ্বারা আদায় করা হয় এবং তাতে নিয়তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং তা কবীরা গুনাহের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। আর ইয়ামীনে মা'কুদাহ এরও ব্যতিক্রম। কেননা, তা শরীয়াত স্বীকৃত বিষয়। আর তাতে যদি কোন গুনাহ হয়ে যায় তবে তা তো তার সাথে বিদ্যমান অবস্থায় হলো না, বরং পরবর্তীতে শপথ ভঙ্গের কারণে আবশ্যক হয়ে থাকে। যার সম্পর্ক হচ্ছে নতুন একটি ইচ্ছা প্রয়োগের সাথে। আর ইয়ামিনে গুমুসের গুনাহ হচ্ছে তার সাতে জড়িত। তাই উভয়টি সমপর্যায়ের নয়।

قوله : وَ ظَنًّا لَغْوٌ الخ : দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ইয়ামীনে লাগব। اللغو শব্দের অর্থ হচ্ছে অনর্থক। অর্থহীন। সুতরাং يمين لغو অর্থ হচ্ছে অনর্থক শপথ।

পরিভাষায় ইয়ামীনে লগব বলা হয় :

اَنْ يَحْلِفَ عَلٰى اَمْرٍ مَاضٍ وَ هُوَ يَظُنُّ اَنَّهُ كَمَا قَالَ وَ الْاَمْرُ بِخِلَافِهِ فَهٰذِهِ الْيَمِيْنُ لَغْوًا

অতীতের কোন বিষয়ে শপথ করা এ ধারণায় যে বিষয়টি তেমনি যেমন সে বলেছে। অথচ বাস্তবে বিষয়টি তার বিপরীত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মানুষ যে কথায় কথায় বলে আল্লাহর শপথ না, আল্লাহর শপথ হা যার মধ্যে শপথের কোন নিয়ত থাকে না। এ প্রকার শপথের হুকুম হচ্ছে এই প্রকার শপথকারীকে আশা করা যায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন— لَايُؤَاخِذُكُمُ اللهُ فِى اللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ আল্লাহ তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য তোমাদেরকে ধরবেন না।

قوله : وَ عَلٰى اٰتٍ الخ : তৃতীয় প্রকার শপথ হচ্ছে يَمِيْنٌ مُنْعَقِدَةٌ আর তা হচ্ছে :

مَا يَحْلِفُ عَلٰى اَمْرٍ فِى الْمُسْتَقْبِلِ اَنْ يَفْعَلَهُ اَوْ لَا يَفْعَلُهُ وَ اِذَا حَنِثَ فِى ذٰلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ

ভবিষ্যতে কোন কাজ করবে বা করবে না মর্মে শপথ করা। যদি এক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ করে তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন :

وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيكُمْ

'কিন্তু তিনি ধরবেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা শক্তভাবে বেঁধেছ। অতএব এর কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য প্রদান করবে যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাকো।'

সুতরাং ইয়ামিনে মুনআকেদাহ ভঙ্গকারীর উপর কাফফারা আবশ্যক হবে।

قوله : وَ فِيْهَا كَفَّارَةٌ فَقَطْ الخ : যদি কোন ব্যক্তি সেচ্ছায় শপথ করে কিংবা জোর প্রয়োগের কারণে শপথ করে অথবা ভুলে যাওয়া অবস্থায় শপথ করে তাহলে সর্বঅবস্থায় তাকে শপথকারী হিসাবে ববেচনা করা হবে। তা ভঙ্গ করলে কাফফারা আবশ্যক হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্বিমত পোষন করেন। তিনি বলেন, ভুলে বা জোর পূর্বক শপথ করলে তা গ্রহণীয় নয়। বিধায় তাতে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর এখানে ভুলে শপথকারী দ্বারা উদ্দেশ্য ভুলে শপথ করা অর্থাৎ অনিচ্ছায় শপথ করে বসা।

শপথের হুকুম : يمين لغو এর ভঙ্গ করার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে কাফফারা আবশ্যক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— لَايُؤَاخِذُكُمُ اللهُ فِى اللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ তবে তিনি সে সব শপথের জন্য ধরবেন তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছ। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : وَ لٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ তবে যে শপথ তোমরা মজবুত করে বেঁধেছ। তার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন, يمين غموس এর ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গকারী গোনাহ গার হওয়ার উপর সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত। তবে এর জন্য কাফফারা আবশ্য হয় কি না এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। মুসান্নিফ (রহ.) এর উক্তি فقط শব্দটির উদ্দেশ্য يمين منعقدة এর মাঝেই শুধু কাফফারা ওয়াজিব হয়। অন্য দুই প্রকারের শপথে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু কেহ কেহ فقط এর উদ্দেশ্য ভিন্ন উল্লেখ করেছেন। তাহল এই প্রকারের শপথ ভঙ্গ করলে শুধু কাফফারা ওয়াজিব হবে। তাছাড়া তাতে কোন গুনাহ আবশ্যক হবে না। যদিও কোন কোন শপথ ভঙ্গ করার মাঝে কোন গুনাহ নেই। বরং কখনো ভঙ্গ করা মুস্তাহাব বা ওয়াজিব হয়। যেমন শপথ করার পর যদি দেখ এর বিপরীত করা উত্তম তবে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করবে। কিন্তু সমস্ত শপথের ক্ষেত্রে এই হুকুম দেওয়া যাবে না যে, বিপরীত দিক উত্তম না হলে শপথ পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং তা ভঙ্গ করা গোনাহ, বরং কোন কোন সময় শপথ ভঙ্গ করা যায়। আর শপথের ক্ষেত্রে সেচ্ছায় জোরপূর্বক সবই বরাবর। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَ الْيَمِيْنُ

তিনটি বিষয় এমন যে, তাদের নিশ্চিতটিও নিশ্চিতই এবং তাদের উপহাসটিও নিশ্চিতরূপে গণ্য। বিবাহ, তালাক, শপথ।

তাছাড়া বল প্রয়োগের কারণে বাস্তব কথা বিলুপ্ত হয় না। আর বাস্তব কর্ম সম্পাদনই হচ্ছে শর্ত। তদ্রূপ বেহুশ অবস্থায় কিংবা পাগল অবস্থায় যদি কর্মটি করে, কেননা, তাতেও প্রকৃত পক্ষে শর্ত সাব্যস্ত হয়।

وَالْيَمِينُ بِاللهِ تَعَالَى وَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَأُقْسِمُ وَأَحْلِفُ وَأَشْهَدُ وَإِنْ لم يَقُلْ بِاللهِ وَلَعَمْرُ اللهِ وَأَيْمُ اللهِ وَعَهْدِ اللهِ وَمِيثَاقِهِ وَعَلَيَّ نَذْرٌ وَنَذْرُ اللهِ وَإِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ لَا بِعِلْمِهِ وَغَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَرَحْمَتِهِ وَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ وَحَقِّ اللهِ وَإِنْ فَعَلْتُهُ فَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ وَسَخَطُهُ أو أنا زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أو شَارِبُ خَمْرٍ أو آكِلُ رِبًا وَحُرُوفُهُ الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالتَّاءُ وقد تُضْمَرُ وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أو إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَهُمَا في الظِّهَارِ أو كِسْوَتُهُمْ بِمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ وَإِنْ عَجِزَ عن أَحَدِهِمَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً وَلَا يُكَفِّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَمَنْ حَلَفَ على مَعْصِيَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَ يُكَفِّرَ -

---

অনুবাদ : আল্লাহ শব্দ যোগে (অথবা) আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য নামের থেকে কোন নাম যোগে) রহমান, রহীম, আল্লাহর ইজ্জত (মর্যাদা) আল্লাহর জালাল (মহিমা) এবং আল্লাহর বড়ত্ব (ইত্যাদি যোগে শপথ সম্পন্ন হয়।) আর 'আমি শপথ করছি, কসম করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' যদিও এগুলোর সাথে আল্লাহ শব্দ বলে না (তথাপি শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। অনুরূপ শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে যদি বলে) ولعمر الله। আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা أيم الله। আল্লাহর শপথ, কিংবা عهد الله। আল্লাহর অঙ্গিকার অথবা ميثاق الله। আল্লাহর অঙ্গিকার কিংবা আমার উপর মান্নত, বা আল্লাহর মান্নত অথবা সে যদি এই কাজ করে তবে কাফের বলে শপথ করে তবে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ইলমের, আল্লাহর ক্রোধের, আল্লাহর অভিশাপের আল্লাহর রহমতের (শপথ), নবীর, কুরআনের, কাবার (শপথ) আল্লাহর হকের (শপথ) অথবা আমি যদি একাজ করি তবে আমার উপর আল্লাহর গজব অথবা আল্লাহর ক্রোধ অথবা (যদি আমি একাজ করি তবে) আমি ব্যভিচারকারী অথবা আমি চোর, কিংবা আমি মদ পান করি কিংবা আমি মদখোর তাহলে শপথ সংঘটিত হবে না।

আর শপথের হরুফ হচ্ছে باء 'বা' تاء 'তা' আর কখনো হরফে কসম কুলাইত হয়। আর শপথ (ভঙ্গের) কাফফারা দাস মুক্তি অথবা দশজন মিসকীনকে আহার দান। যেমন জেহারের কাফফারায় উভয়টি। অথবা তাদেরকে (দশজন গরিব লোককে) এই পরিমাণ বস্ত্র দেয়া যেন তাদের শরীরের অধিকাংশ ঢাকা যায়। যদি শপথকারী উভয় থেকে একটি পালন করতে অক্ষম হয় তবে ধারাবাহিকভাবে তিন দিন রোজা রাখবে। আর শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করবে না। আর যে কোন গোনাহের উপর শপথ করে বসে তার জন্য উচিত তা ভঙ্গ করে কাফফারা আদায় করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ الْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ وَ الرَّحْمٰنِ الخ : যদি কেহ الله শব্দ দ্বারা শপথ করে তবে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন, কেহ বলল بالله - والله - و لله , আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি। অনুরূপ যদি কেহ আল্লাহর গুণবাচক নাম দ্বারা শপথ করে তবে তার শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন কেহ বলল, والرحيم - والرحمن - والحق আমি রহমান, রহিম, হক (আল্লাহর) নামে শপথ করছি। এক্ষেত্রে উরফের প্রচলনের পরওয়া করা হবে না, বরং এর দ্বারা শপথ করে তাহলে উরফে আল্লাহর এমন গুণ দ্বারা শপথ করার প্রচলন থাকলে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন কেহ বলল, قدرة الله - عزة الله - جلالة الله - كبرياء الله عظمة الله - যদি কেউ আল্লাহর এমন গুণ দ্বারা শপথ করে উরফে যার দ্বারা শপথ করার প্রচলন নেই তাহলে শপথ সংঘটিত হবে না। যেমন رحمة الله - علم الله - رضاء الله - غضب الله - سخط الله و عذاب الله - কেননা, এক্ষেত্রে প্রচলন ধর্তব্য। আর এরূপ শব্দ দ্বারা ওরফে শপথ করার প্রচলন নেই। তাছাড়া এরূপ শব্দ দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষ ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে কোন এলাকায় যদি আল্লাহর এমন গুণবাচক শব্দ দ্বারা শপথ করা প্রচলন থাকে যা অন্য এলাকায় নেই তাহলে ঐ এলাকায় তা দ্বারা শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ اَقْسِمُ وَ اَحْلِفُ الخ : যদি কেহ বলে اشهد بالله - اشهد - احلف بالله - احلف - اقسم بالله - اقسم তাহলে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। কারণ, এসব শব্দাবলি উরফ, শরীয়ত ও অভিধানে শপথের অর্থে ব্যবহার রয়েছে। এক্ষেত্রে ماضى - مضارع আল্লাহর নাম উল্লেখ করা না করা সমান। যেমন شهادة শব্দটি শপথের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ 'আমরা শপথের সাথে বলছি আপনি আল্লাহর রাসূল।' অনুরূপ لعمر الله ও ايم الله এর দ্বারাও শপথ সংঘটিত হবে। (উল্লেখ্য যে, ايم শব্দটি ايمن শপথ অর্থে ব্যবহৃত। কুফিয়ীনদের নিকট তা يمين এর বহুবচন। نون ও همزه কে সহজ করনার্থে উহ্য করা হয়েছে। আর বসরীদের নিকট ايم الله এর অর্থ والله, আল্লাহর শপথ। মোটকথা ايم এর সাথে শপথ করা প্রচলন রয়েছে। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত ايم الله ان كان تخليقا بالامارة ইমাম সেবওয়ায়েহ বসরীদের মতামত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম জুজাজ, ইবনে কাইসান প্রমুখগণ কুফিদের মতামত গ্রহণ করেন। কেননা, افعل এর ওযনে একক অর্থ বোধক ব্যবহার হয় না। অতঃপর ايم শব্দের অনেক লুগাত রয়েছে। যেমন ايم الله - هيم الله - من الله - م الله - ام الله - ايمن الله অনুরূপ যদি কেহ বলে عهد الله কিংবা ونذر الله - عَلَيَّ نذر - ميثاقه - على يمين - على يمين الله - على نذر الله - على عهد - على عهد الله - على ميثاق - على ميثاق الله - তাহলে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। কারণ এসব শব্দে শপথের অর্থে ব্যবহার হয়। তাই আল্লাহর নাম যুক্ত না করলেও শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। আর نذر সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَ لَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ (ابوداود) অতএব এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, نذر শপথের অর্থে ব্যবহার হয়। আর عهد ও ميثاق এর অর্থ একই। কেননা, কুরআনে কারীমে عهد শব্দটি কসমের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ইরশাদ করেন : وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا করিও না।

قوله : وَ اِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ الخ : যদি কোন ব্যক্তি বলে اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَاَنَا كَافِرٌ 'যদি আমি তা করে থাকি তবে আমি কাফের' অথবা বলে اِنْ اَفْعَلُ كَذَا فَاَنَا كَافِرٌ আমি যদি তা (ভবিষ্যতে) করি তবে আমি কাফের। তবে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা যে فعل কে كفر এর সাথে সম্পৃক্ত করে নিজের উপর উক্ত فعل কে হারাম করেছে আর حلال কে حرام সাব্যস্ত করা শরীয়াতে ইয়ামিন বলা হয়। অনুরূপ যদি কেহ অন্য ভাষায় 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি' বলে তবে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ النَّبِيِّ وَ الْقُرْاٰنُ الخ : যদি কেহ আল্লাহর নাম ভিন্ন অন্য নামে শপথ করে তবে তার শপথ সংঘটিত হবে না। যেমন কেহ কুরআনের নামে, কাবার নামে, নবীর নামে বা আল্লাহ ভিন্ন অন্য নামে শপথ করে তাহলে

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ তার শপথ সংঘটিত হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : যে শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে। তা না হয় তো চুপ থাকে। (বুখারী, মুসলিম)। তাছাড়া এগুলো দিয়ে শপথ করা উরফে প্রচলন নেই। উল্লেখ্য যে, যদি কেহ أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ إِنْ فَعَلَ كَذَا যদি আমি তা করি তবে কুরআন থেকে মুক্ত। অথবা বলে أَنَا بَرِيءٌ مِنَ النَّبِيِّ إِنْ فَعَلَ كَذَا আমি নবীজী (স.) থেকে মুক্ত যদি আমি তা করি। তাহলে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা, কুরআন বা নবী থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ কুফুরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া, যা কুফুর। অনুরূপ কোন কোন ফকীহের মতে যদি কেহ বলে وَالْقُرْاٰنِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا কুরআনের শপথ আমি এমনটি করব তাহলে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা, আমাদের সমাজে কুরআনের দ্বারা শপথ করার প্রচলন রয়েছে।

قوله : وَ حَقُّ اللّٰهِ الخ : حق الله ও حقا এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান। অধিকাংশ ফকীহদের মতে এটি শপথের শব্দ নয়। তদ্রূপ بحق الصلوة - بحق الايمان - بحق القران কিংবা بحق الرسول ইত্যাদি শপথ হবে না। কেননা, এগুলো সম্মানসূচক শব্দ। তা প্রকৃত অর্থে غير الله এর নামে শপথ। তাছাড়া উরফে এমন শপথের প্রচলন নাই।

قوله : وَ إِنْ فَعَلْتُهُ فَعَلَيَّ غَضَبُهُ الخ : আলোচিত শব্দাবলী দ্বারা শপথ হবে না। কেননা, এটা হলো নিজের উপর বদ দুআ। আর তা শর্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাছাড়া উরফে এমন শপথের প্রচলন নেই। তদ্রূপভাবে এ শব্দাবলীর অনেকটির কার্যগুলোর নিষিদ্ধতা রহিত ও পরিবর্তিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং এগুলো আল্লাহর নামের সমপর্যায়ের নয়।

قوله : وَ حُرُوفُهُ الْبَاءُ وَ التَّاءُ الخ : শপথের অক্ষর সম্পর্কে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) দু'টি উল্লেখ করেছেন আর তা হচ্ছে باء ও تاء -। তাছাড়াও শপথের অক্ষর হিসেবে ব্যবহৃত হয় واو যা শুধু প্রকাশ্য বিশেষ্যের শুরুতে আসে। যেমন والله لافعلن كذا - ياء যা الف বা يا الله সহ الف ছাড়া يالله ব্যবহৃত হয়। ميم مكسورة او مضمومة যেমন مِ الله - مُ الله শপথের শব্দগুলোর কোন কোনটি কখনো উহ্য রাখা হয়। যেমন الله افعله - ك।

বি.দ্র. شرائط القسم শপথের শর্তাবলী : শপথ সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো শপথকারী জ্ঞানবান হতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে এবং মুসলমান হতে হবে। সুতরাং পাগল এবং বাচ্চার শপথ সংঘটিত হবে না যদিও বাচ্চা জ্ঞানবান হয়। অনুরূপ কাফেরের শপথ গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং যদি কোন কাফের শপথ করার পর মুসলমান হয় এবং শপথ ভঙ্গ করে তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে না। অধিকন্তু ক্রীতদাসের শপথও সহীহ। যদি সে শপথ ভঙ্গ করে তবে তার উপর সম্পদের কাফফারা ওয়াজিব হবে না; বরং রোজা রাখার দ্বারা তাকে কাফফারা পরিশোধ করতে হবে।

قوله : وَ كَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ الخ : যদি কেহ শপথ করে এমন যা শপথ হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং শপথকারীও শপথ করার যোগ্য হয় তবে তা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু যদি কেহ শপথ পূর্ণ না করে তবে সে আল্লাহর নামের অপব্যবহার করল এবং তাচ্ছিল্য করল। তাই গুনাহ থেকে বাচার জন্য তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে হবে। এটা তার উপর ওয়াজিব। কাফফারা আদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ -

অতএব, শপথের কাফফারা হচ্ছে দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করা যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে (দশজন মিসকীনকে) বস্ত্র প্রদান করবে কিংবা একজন দাস (বা দাসী)

মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি এর সামর্থ রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা। যখন তোমরা শপথ করবে। তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে রক্ষা কর।

উক্ত আয়াতে করীমা থেকে আমরা মোট কাফফারা আদায়ের চারটি পদ্ধতি পেয়েছি।

১। দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য সকাল বিকাল প্রদান করা, যা হবে নিজ পরিবারের খাবারের ন্যায়। ২। অথবা দশজন মিসকীনকে সতর ঢাকা পরিমাণ বস্ত্র দান করা। সুতরাং একটি পায়জামা (বা লুঙ্গি) যথেষ্ট হবে না। ৩। দাস বা দাসী আজাদ করা যে খেদমাতের উপযুক্ত। যদি এমন গোলাম আজাদ করে যা খেদমাতের যোগ্য নয়, তাহলে কাফফারা আদায় হবে না। অনুরূপ মুকাতাব বা মুদাব্বার গোলাম আযাদ করলে কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, এদের মালিকানা অসম্পূর্ণ। এই তিনটি কাজের কোন একটি করলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর এ তিনটি মালের সাথে সম্পৃক্ত। যদি এর কোন একটিরও উপর শপথ ভঙ্গকারী সক্ষম না হয়। তবে তার কাফফারা হল : ৪। একাধারে তিনদিন রোযা রাখা। ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে রোজা রাখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা প্রয়োজন বা জরুরী নয়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এবং ইমাম আহমদ (রহ.) এর এক ক্বাওল অনুযায়ী ধারাবাহিক রোজা রাখা জরুরী নয়। বরং ধারাবাহিক রোজা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রদান করা হবে। তাদের দলিল হচ্ছে উল্লিখিত আয়াতে করীমা। কেননা, তা নিঃশর্ত।

আমাদের দলিল হল, হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত কেরাত, যেখানে রয়েছে : فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ এবং ইহা মশহুর হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

قوله : وَلَايُكَفِّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ الخ : শপথকারী শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করলে তা আদায় হবে কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী শপথকারী শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করলে তা আদায় হবে না; বরং শপথ ভঙ্গের পর পুনরায় তা আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা প্রদান করা বৈধ। শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা প্রদান করলে শপথ ভঙ্গের পর তা আর আদায় করতে হবে না। তিনি দলিল পেশ করেন : কাফফারার সবব হচ্ছে শপথ। সুতরাং শপথ সংঘটিত হলেই কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর শপথ ভঙ্গ করা হচ্ছে কাফফারা আদায়ের জন্য শর্ত এজন্য শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার পর তা পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া তিনি বলেন, ইহা আঘাত করার পর আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে আদায়কৃত কাফফারার সাদৃশ্য হলো।

আমাদের দলিল : শপথ ভঙ্গ করা কাফফারার সবব (سبب) আর سبب তথা শপথ ভঙ্গ হওয়া পাওয় গেলেই কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, শপথ করা হয় তা পূর্ণ করার জন্য। কাফফারা দেয়ার জন্য নয়। সুতরাং যখনই সে শপথ পূর্ণ করতে পারছে না, তখনই তার উপর এর প্রতিকার হিসাবে কাফফারা ওয়াজিব হচ্ছে। কেননা, কাফফারা হচ্ছে অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্য। অথচ শপথ ভঙ্গের পূর্বে কোন অপরাধ নেই। আর যদি কেহ তা দিয়ে দেয় তবে তা দরিদ্রের কাছ থেকে ফেরত নেয়া যাবে না। কেননা, তা সাদাকা হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বক্তব্য সম্পদ দ্বারা কাফফারা পরিশোধের সুরতের সাথে ধার্য। কেননা, মালের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব যে আগে শুধু মাল ওয়াজিব হবে এবং এর আদায় ওয়াজিব হবে। যেমন, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। বিক্রয় দ্বারা শুধু মূল্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর বিক্রেতা যখন মূল্য চায় তখন তা পরিশোধ ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মালের সম্পর্কিত حقوق الله (যেমন যাকাত, কাফফারা ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে মাল মোটেও উদ্দেশ্য নয়। বরং তা পরিশোধ করাই উদ্দেশ্য। যেরূপ শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে ইবাদত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এ হিসাবে মালী ইবাদত ও শারীরিক ইবাদত বরাবর। তাই যদি শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে অগ্রে ইবাদাত আদায় করা বৈধ না হয় এই ভিত্তিতে যে এই ইবাদতের শধু ওয়াজিব হওয়া এবং আদায় উদ্দেশ্য, তা হলে মালী কাফফারার ক্ষেত্রেও سبب তথা শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

قوله : مَنْ حَلَفَ عَلٰى مَعْصِيَةٍ الخ : যদি কেহ কোন গুনাহ করার শপথ করে বলল নামাজ পড়বে না, রোজা রাখবে না বা মাতা-পিতার সাথে কথা বলবে না তাহলে তার উপর অবশ্য কর্তব্য এধরনের শপথ ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করা। কেননা নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন :

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَ رَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ

যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করে কিন্তু বিপরীত বিষয়টিকে শপথের চেয়ে উত্তম মনে করে তাহলে সে যেন উত্তমটি করে। অতঃপর শপথের কাফফারা আদায় করে। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

لَا نَذْرَ وَ لَا يَمِيْنَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَا فِى مَعْصِيَّةٍ وَ لَا فِىْ قَطْعِيَّةِ رَحْمٍ (ابوداود)

যে বিষয়ে বনী আদম মালিক নয় তাতে শপথ বা মান্নত নেই এবং গুনাহের ও আত্মীয়তা বিচ্ছেদেও নেই (অর্থাৎ শপথ ও মান্নত নেই)। —আবু দাউদ

তাছাড়া এই কারণে যে, আমরা যে সুরত বলেছি, তাতে যদিও শপথ পূর্ণ হওয়া হাত ছাড়া হয়ে যায়, তবুও কাফফারার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর এর বিপরীতে গুনাহের কর্ম করে ফেললে ক্ষতিপূরণের কোন অবকাশ নেই।

وَلَا كَفَّارَةَ على كَافِرٍ وَإِنْ حَنِثَ مُسْلِمًا وَمَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ لم يَحْرُمْ وَ اِنْ اِسْتَبَاحَهُ كَفَّرَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ على الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْفَتْوٰى على أَنَّهُ تَبِيْنُ امْرَأَتُهُ من غَيْرِ نِيَّةٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أو مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَوُجِدَ وَفٰى بِهٖ وَلَوْ وَصَلَ بِحَلْفِهٖ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَرَّ -

---

অনুবাদ : কাফেরের উপর কোন কাফফারা নাই যদিও শপথ ভঙ্গ করে মুসলমান অবস্থায়। আর যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন কোন কিছু নিজের উপর হারাম করে নেয়, তা হারাম হবে না। আর যদি সে তা মুবাহ করে (ব্যবহার করে) তবে কাফফারা আদায় করবে। (যদি কেহ বলে) প্রত্যেক হালাল আমার উপর হারাম তবে তা খাদ্য পানীয় সামগ্রীর উপর পতিত হবে। আর ফাতওয়া হচ্ছে একথার উপর যে, নিয়ত ছাড়াই (একথা বলার কারণে) তার স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি (শর্তহীন) মুতলাক মান্নত করবে বা কোন শর্তের সাথে শর্ত যুক্ত করে আর শর্ত পাওয়া যায় তাহলে সে তা পূর্ণ করবে। যদি কেহ তার শপথের সাথে ان شاء الله মিলিয়ে দেয় তবে সে (শপথ থেকে) মুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَا كَفَّارَةَ عَلٰى كَافِرٍ الخ : কাফের ব্যক্তি শপথ করলে এবং তা ভঙ্গ করলে তার উপর কোন কাফফারা আবশ্যক হবে না। অনুরূপ যদি শপথ করে কুফরী অবস্থায় আর ভঙ্গ করে মুসলমান অবস্থায় তাহলেও তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে না। কেননা, কাফফারা একদিক থেকে ইবাদত। একারণেই তো তা রোজা রাখার দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। আর কাফের ইবাদাতের উপযুক্ত নয়। এমনকি সে শপথেরও উপযুক্ত নয়।

কারণ, শপথ আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য সংঘটিত হয়। আর কুফুর এর পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَ قَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ

তোমরা কুফুর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ এদের কোন শপথ নেই।

আর যেহেতু কাফেরদের শপথ শরীয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। তাই শপথ ভঙ্গের কারণে যে কাফফারা ওয়াজিব হতো তা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর মতে কাফেরও শপথ ভঙ্গ করলে তার উপর মালী কাফফারা আদায় করা আবশ্যক। তা এজন্য যে সে তো আমাদের উপর যা আবশ্যক হয় তা তার উপরও আবশ্যক হবে এ শর্তে জিম্মি হয়েছে। তাই তার উপরও আর্থিক কাফফারা আদায় করা আবশ্য হবে। এর জবাবে আমরা বলি যে, আমাদের সাথে জিম্মিদের শর্ত হয়েছে এসব বিষয়ে যা ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে কাফফারা আদায় করা ইহা একটি ধর্মীয় ইবাদত। সুতরাং তা আবশ্যক হতে হলে ইসলাম শর্ত। ঈমান ছাড়া যেমন কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। তদ্রূপ ঈমান ছাড়া কাফফারা আদায় করা তার উপর মূলগতভাবে আবশ্যক নয়। তাইতো যদি কোন মুসলমান শপথ করে অতঃপর মুরতাদ হয়ে যায় তার পর মুসলমান হয় তবে তার উপরও কাফফারা আবশ্য হয় না।

قوله : وَ مَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন কোন বস্তুকে তার নিজের উপর হারাম করে নেয়, অতঃপর সে তার নিজের উপর তা বৈধ করে নিল। অর্থাৎ, হারাম কৃত বস্তুকে সে হালাল মনে করে ব্যবহার করে নেয় তবে তার উপর কাফফারা আদায় হওয়া আবশ্যক হবে। কোন হালাল বস্তুকে হারাম করার নাম হচ্ছে শপথ। কেননা, এই হালালকে হারাম করার প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে শপথ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তাছাড়া কোন কাজ করার উপর যদি শপথ করে তাহলে সে মুবাহ বস্তুকে ওয়াজিব করে নিল, যে এর বিপরীত করাটা নিজের জন্য হারাম করে নিল। আর যদি কোন কাজ না করার উপর শপথ করে তাহলে তো হালালকে হারাম করে নিল। সুতরাং যেহেতু শপথের মাঝে হারাম করণ পাওয়া যায় তাই হারাম সাব্যস্ত করণের দ্বারা শপথ সংঘটিত হয়ে যায়।

আর উক্ত ব্যক্তির উপর শপথ ভঙ্গের কাফফারা আবশ্যক হবে। কেননা, তার বক্তব্য হারাম হওয়ার অর্থ ব্যক্ত করে। আর তা কার্যকরী করা সম্ভব কসমের হুকুম কার্যকর করার মাধ্যমে। সুতরাং সে হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এখন যদি সে যা হারাম করেছে তা অল্প বা বেশি ব্যবহার করলেই সে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এবং কাফফারা আদায় করা তার উপর আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে না। কেননা, হালালকে হারাম করার অর্থ হচ্ছে শরীয়াতের হুকুমকে পরিবর্তন করা। সুতরাং এর দ্বারা বৈধ একটি বিষয় অর্থাৎ, কাফফারা তা আবশ্যক হবে না।

قوله : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সকল হালাল আমার জন্য হারাম তাহলে তা খাদ্য পানীয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর নিয়ত করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে কিয়াসের দাবী হচ্ছে উক্ত ব্যক্তি শপথ থেকে ফারেগ হওয়ার সাথে সাথে শপথ ভঙ্গকারী হওয়া। কেননা, হালাল বিষয়াবলীর একটি হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। এজন্য এ কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এরূপ শপথকারী শপথ থেকে ফারেগ হওয়ার পর পরই শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী হচ্ছে শপথের দাবী হল শপথ রক্ষা করা। আর শপথে ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করলে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এজন্য শপথে ব্যাপকতার দিকটা রহিত হবে এবং প্রচলিত ব্যবহার হিসাবে

তা পানাহারের দিকেই অভিমুখী হবে। কেননা, হালাল বলতে স্বাধারণত পানাহারকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর ব্যাপকতার দিককে রহিত করার দরুন নিয়ত ছাড়া নিজ স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি কেহ নিজ স্ত্রীর নিয়াত করে তবে স্ত্রী এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ইলা হবে। এমতাবস্থায়ও শপথ খাদ্য পানীয় থেকে রহিত হবে না। এ আলোচনা হচ্ছে জাহিরে রেওয়ায়েতের সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমাদের মাশায়েখে কেরামগণের ফাতওয়া হচ্ছে নিয়ত ছাড়াই তার বক্তব্যের অন্তভুক্ত তার স্ত্রীও হবে। অর্থাৎ, এরূপ শপথের কারণে নিজ স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। কেননা, এ অর্থেই এর ব্যবহার অধিক।

قوله : وَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا الخ : যদি কেহ সাধারণ মান্নত করে। অর্থাৎ, মান্নতকে কোন শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করে না যেমন বলল, আমার উপর আজকের রোজা আবশ্যক। তাহলে তাকে তা পূর্ণ করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ نَذَرَ وَ سَمّٰى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمّٰى যে বক্তি কোন বিষয়ের উল্লেখ করে মান্নত করে তার কর্তব্য হবে উল্লিখিত বিষয়টি সম্পন্ন করা। তাছাড়া কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ তারা যেন তাদের মান্নত পূর্ণ করে। মান্নত সহীহ হওয়া এবং তা পূর্ণ করার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে।

১। মান্নত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নামে হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে তথা غير الله। নামে মান্নত করা হারাম। যেমন মানুষ বিভিন্ন মাজারে গিয়ে মাজারের বাবার নামে মান্নত করে। এভাবে যে বাবা আমার অমুক কাজ হলে তোমার নামে আমি এত টাকা বা অমুক প্রাণী উৎসর্গ করব। তবে তা হারাম। কেননা, এসব মান্নত আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে তথা অলি বুযুর্গদের নৈকট্য লাভের জন্য হয়। অনুরূপ মাজারে শরীয়ত অলি বাবাদের নামে হালুয়া রুটি খিচুড়ি ইত্যাদি তৈরী করে নিয়ে যাওয়া না জায়েয এবং সেখানকার খাদেম, খুদ্দাম, মিসকীন, ফকীরদের জন্য ও তা খাওয়া নাজাজে। কিন্তু যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন করে এবং মাজারে নিয়ে যায়, তবে সেখানকার মিসকীন দরিদ্র খাদেমদের জন্য খাওয়া জায়েজ কিন্তু তারা যদি ধনী হয় তবে তাদের জন্যও তা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা, ধনী ব্যক্তি মান্নতের ক্ষেত্র নয়।

২। হারাম কাজের জন্য মান্নত হয় না। হারাম কাজটি যদি حرام لعينه হয় তবে শপথই সংঘটিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি حرام لغيره হয় তবে শপথ সংঘটিত হবে কিন্তু তা ভেঙ্গে ফেলা আবশ্যক। যেমন ঈদের দিনে রোজা রাখার মান্নাত করা।

৩। যে বিষয়ে সে মান্নাত করবে তা পূর্ব থেকে তার উপর ফরজ/ওয়াজিব না হতে হবে। যেমন কেহ ফরজ নামাযের মান্নাত করল এভাবে যে আমি আল্লাহর নামে মান্নাত করলাম অধ্যকার জোহরের নামাজ আদায় করব। তাহলে উক্ত শপথ নিরর্থক হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা তার উপর অতিরিক্ত কিছু আবশ্যক হবে না।

। যে বস্তুর উপর মান্নত করবে তার সাথে যদি মালিকানার সম্পর্ক থাকে তবে তা শপথকারীর মালিকানাধীন হতে হবে। এজন্য যদি অন্যের বকরীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলে وَ لِلّٰهِ عَلَيَّ اَنْ اَذْبَحَهَا يَوْمَ النَّحْرِ আল্লাহর শপথ আমি কুরবানির দিন এই বকরী জবেহ করব। তবে মান্নত সংঘটিত হবে না।

৫। যে বিষয়ের উপর মান্নত করবে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হতে হবে। যেমন কেহ গতকাল রোজা রাখার মান্নত আজ করে তবে তা কার্যকর হবে না।

৬। যে বিষয়ে মান্নত করছে তা শরীয়ীভাবে ওয়াজিব জাতীয় হতে হবে। যেমন কেহ মসজিদে প্রবেশের মান্নত করে তবে তার মান্নত কার্যকর হবে না। কেননা, মসজিদে প্রবেশ করা শরীয়তভাবে ওয়াজিব শ্রেণীভুক্ত নয়।

৭। মান্নতকৃত বিষয়টি عبادة مقصودة হতে হবে। সুতরাং যদি কেহ অজু কিংবা মৃত্যু ব্যক্তিকে কাফন পরানোর মান্নত করে তবে তা কার্যকর হবে না। কেননা, এগুলো عبادة مقصودة নয়।

উপরোক্ত শর্তগুলোর আলোকে যদি কেহ কোন শর্ত যুক্ত মান্নত করে আর ঐ শর্ত অস্তিত্ব লাভ করে তবে উক্ত মান্নত পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব।

قوله : وَ لَوْ وَصَلَ بِحَلَفِهِ الخ : যদি কেহ শপথ করে এবং শপথের সাথে সাথেই انشاء الله শব্দ জুড়ে দেয় তবে সে শপথকারী হবে না এবং তা ভঙ্গ করলেও শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدْ بَرَّ فِى يَمِيْنِهٖ

কেহ যদি কোন বিষয়ে শপথ করে এবং সেই সাথে انشاء الله বলে তাহলে সে তার কসমের ব্যাপারে দায়মুক্ত হয়ে গেল। তাছাড়া انشاء الله নিশ্চিত কোন বিষয়ের ফায়দা দেয় না। বরং বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে দেয়। পক্ষান্তরে যদি শপথ করার কিছু পর انشاء الله বলে তবে শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। কারণ, বিলম্বে انشاء الله বলা ধর্তব্য নয়।

بَابُ الْيَمِينِ فِي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالسُّكْنَى وَالْإِتْيَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : প্রবেশ করা, বের হওয়া, বসবাস করা, আগমন করা ইত্যাদি বিষয়ক শপথ

حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ كَعْبَةٍ وَالْمَسْجِدِ وَالْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ وَالدِّهْلِيزِ وَالظُّلَّةِ وَالصُّفَّةِ وفي دَارٍ بِدُخُولِهَا خَرِبَةً وفي هذه الدَّارِ يَحْنَثُ وَإِنْ بُنِيَتْ دَارًا أُخْرَى بَعْدَ الْإِنْهِدَامِ وَإِنْ جُعِلَتْ بُسْتَانًا أو مَسْجِدًا أو حَمَّامًا أو بَيْتًا لَا كَهٰذَا الْبَيْتُ فَهُدِمَ أو بنى آخَرُ وَالْوَاقِفُ على السَّطْحِ دَاخِلٌ وفي طَاقِ الْبَابِ لَا -

---

অনুবাদ : কেহ শপথ করল যে, 'সে ঘরে প্রবেশ করবে না' তাহলে সে কাবা ঘরে, মসজিদে, ইহুদী বা খৃষ্টানদের উপাসনালয়ে, করিডোরে (কোন বাড়ির) গেইটের ছায়ায়, ঘরের বারান্দায় প্রবেশ করার দ্বারা সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর دار এর ক্ষেত্রে বিরান যায়গাতে প্রবেশ দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। আর هذه الدار এর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ, শপথ করে বলে এই ঘরে প্রবেশ করবে না) তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে যদিও তা নিঃশেষ করে (ঐ স্থানে) বাড়ি নির্মান করা হয়। আর যদি তা বাগান, মসজিদ, হাম্মাম অথবা তদস্থানে ঘর নির্মিত হয় (আর তাতে প্রবেশ করে) তবে শপথ ভঙ্গ হবে না। যেমন هذا البيت এর ক্ষেত্রে (অর্থাৎ, শপথ করে বলে ঐ ঘরে প্রবেশ করবে না) তারপর যদি তা ধ্বংস করা হল কিংবা অন্য কিছু বানানো হল (অতঃপর তাতে প্রবেশ করে তবে শপথ ভঙ্গ হবে না।) আর ঘরের ছাদে অবস্থান করা প্রবেশ (এর ন্যায়) আর গৃহ দ্বারা (শপথের বেলায়) সমুখস্থ তাকে দাড়ানোতে শপথ ভঙ্গ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : حَلَفَ لَايَدْخُلُ بَيْتًا الخ : যদি কেহ সাধারণভাবে শপথ করে যে সে ঘরে প্রবেশ করবে না অতঃপর যদি সে মসজিদে, কাবা শরীফে, গীর্জায় অথবা করিডোরে অথবা কোন বাড়ীর গেইটের ছায়ায় অথবা ঘরের বারান্দায় প্রবেশ করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, গৃহ দ্বারা রাত্রি যাপনের জন্য নির্ধারিত গৃহকেই বোঝানো হয়। অথচ এসকল ভবন সেজন্য তৈরী করা হয় না। তবে الدهليز। করিডোর বা বারান্দা যদি এমন হয় যে, দরজা বন্ধ করে দিলে তা ঘরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয় এবং এর ছাদ থাকে তাহলে তাতে প্রবেশ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

সুতরাং করিডোর বা বারান্দা যদি ওরফে এমন হয় যে, তাতে রাত্রি যাপন করা হয় তবে তাতে প্রবেশ করার

দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ওরফে তাতে রাত্রি যাপন করা প্রচলিত না হয় আর তাতে প্রবেশ করে তবে শপথ ভঙ্গ হবে না।

قوله : وَ فِىْ دَارٍ يَدْخُلُهَا الخ : যদি কেহ বলে واللّٰه لا ادخل دارا, আল্লাহর শপথ আমি বাড়ীতে প্রবেশ করবো না। বাড়ীকে نكره রেখে অনির্দিষ্ট করে বলে তাহলে বাড়ী যেসব গুণসহ বক্তার বক্তব্যের সময় ছিল তাই ধর্তব্য হবে এবং এসবগুণ দ্বারা উক্ত বাড়ীকে চেনা হয়। সুতরাং বিরান বাড়ীতে প্রবেশ দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, দালান বাড়ীর গুণ। আর চতুর্পার্শ্বের বাউন্ডারীর ভিতরের অংশটি হলো বাড়ী। যাতে দালান নির্মাণ করা হয়েছে। যদি সে دار কে نكره করে বলে তাহলে যেহেতু نكره কে তার গুনের মাধ্যমে চিনতে হয় তাই তখন ঘর (গুণ) নির্মিত বাড়ী উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে دار কে معرفة করে বললে এর গুনের (ঘর এর) কোন প্রয়োজন নেই। গুণটি তখন নিরর্থক হয়ে যাবে।

আর যদি কেহ وَاللّٰهِ لَا اَدْخُلُ هٰذَا الدَّارَ (আল্লাহর শপথ আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করব না) অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি বাড়ীকে ইঙ্গিত করে বলে, অতঃপর ঐ বাড়ী ভেঙ্গে ময়দান হওয়ার পর কিংবা এখানে অন্য বাড়ী নির্মাণ করার পর যদি তাতে প্রবেশ করে তবে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। কারণ, বাড়ী ভেঙ্গে ফেলায় ঐ স্থানের নাম রয়ে গেছে। শপথ যদি কোন কিছুর নামে হয় তবে যতদিন তার নাম বাকী থাকে ততদিন শপথও বাকী থাকে। নাম মিটে যাওয়ার দ্বারা শপথও মিটে যায়। ঐসব গুণের হিসাব করা হবে না যেগুলো এই বাড়ীর মূল ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

قوله : وَ اِنْ جَعَلَتْ بُسْتَانًا الخ : যদি শপথ করে যে, আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করব না, অতঃপর সেই বাড়ী ধ্বংস করে তাতে মসজিদ, বাগান, হাম্মাম কিংবা ঘর নির্মাণ করে অতঃপর তাতে প্রবেশ করে, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, এখন আর তাতে ঐ বাড়ীর নাম নেই, বরং একে অন্য নামে নাম করণ করা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বারে নির্মিত সব কিছুকে ভেঙ্গে দিয়ে অন্য কিছু নির্মাণ করার পরও প্রবেশ করলে শপথ ভঙ্গ হবে না।

قوله : كَهٰذَا الْبَيْتِ الخ : পূর্বের মাসআলার ন্যায় যদি কেহ বলে واللّٰهِ لَا اَدْخُلُ هٰذَا الْبَيْتَ, আল্লাহর শপথ আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। অতঃপর তা ভেঙ্গে ময়দান হওয়ার পর তাতে প্রবেশ করে তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, এমন পরিবর্তনের পর এই ঘরের নামই বহাল থাকবে না। তার কারণ হচ্ছে এখানে اسم اشارة দ্বারা উল্লেখের কারণে তা নির্দিষ্ট হয়ে গেল বক্তব্য পেশ করার সময়ের অবস্থার সাথে। এমন কি যদি এই ঘর ভেঙ্গে অন্য ঘরও নির্মাণ হয় আর তাতে প্রবেশ করে তবেও শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : وَ الْوَاقِفُ عَلَى السَّطْحِ الخ : ঘরের ছাদে দাঁড়ানোতে শপথ ভঙ্গকারী হবে কি না এ নিয়ে ফুকাহায়ে মুকাদ্দিমীন ও ফুকাহায়ে মুতাআখখেরীনদের মধ্যে মতানৈক্য। ফুকাহায়ে মুকাদ্দিমীনদের মতে ছাদের উপর ঘরের ভেতরের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাতে চড়াতে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, তা (ছাদ) ঘরের হুকুমভুক্ত এজন্যই তো معتكف মসজিদের ছাদে আসার কারণে তার ইতেকাফ বাতিল হয় না। আর হায়েজ, নিফাসওয়ালী, জুনুবী ব্যক্তির জন্য মসজিদের ছাদে আরোহণ করা জায়েয নয়। তাই অনুধাবন হয় যে, ঘরের ছাদ ঘরের অভ্যন্তরের হুকুমভুক্ত। আর متاخرين দের মতে ঘরের ছাদ ঘরের ভেতরের হুকুমভুক্ত নয়। তাই ছাদে চড়াতে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : وَ فِى طَاقِ الْبَابِ الخ : যদি কেহ শপথ করে আমি এই ঘরে বা এই বাড়ীতে প্রবেশ করব না অতঃপর সে যদি উক্ত ঘরের গেইটের চৌকাঠের উপর চড়ে তবে সে শপথভঙ্গকারী হবে কি না এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে যদি গেইট বন্ধ করার দ্বারা সে বাইরে থেকে যায় তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি সে এমন জায়গায় দাড়ায় যে দরজা বন্ধ করলে সে বাড়ীর ভেতরে থেকে যায় তাহলে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে।

কেননা, এমন জায়গাকে বাড়ির বা গরের ভেতরের অংশই বলা হয়ে থাকে। আর দরজা বন্ধ করার পর যে জায়গা বাহিরে থাকে তা ভিতরের অংশ হিসাবে গণ্য হয় না। সুতরাং এব্যাখ্যা সাপেক্ষে শপথকারীর হুকুম প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে যদি কেহ শপথ করে যে, لااخرج من هذا الدار (আমি এই বাড়ি থেকে বের হব না) তবে যদি বাড়ির গেটের এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে দরজা বন্ধ করলে সে বাইরে থেকে যায় তবে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি দরজা বন্ধ করার দ্বারা সে ভিতরে থেকে যায় তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না।

وَدَوَامُ اللُّبْسِ وَ الرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى كَالْإِنْشَاءِ لَا دَوَامُ الدُّخُولِ لَا يَسْكُنُ هذ الدَّارَ أو الْبَيْتَ أو الْمَحَلَّةَ فَخَرَجَ وَبَقِيَ مَتَاعُهُ وَأَهْلُهُ حَنِثَ بِخِلَافِ الْمِصْرِ لَا يَخْرُجُ فَأُخْرِجَ مَحْمُولًا بِأَمْرِهِ حَنِثَ وَبِرِضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ أو مُكْرَهًا لَا كَلَا يَخْرُجُ إِلَّا إِلَى جِنَازَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَتى حَاجَةً لَا يَخْرُجُ أو لَا يَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ يُرِيدُهَا ثُمَّ رَجَعَ يَحْنَثُ وفي لَا يَأْتِيهَا لَا لَيَأْتِيَنَّهُ فلم يَأْتِهِ حتى مَاتَ حَنِثَ في آخِرِ حَيَاتِهِ لَيَأْتِيَنَّهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَهِيَ اسْتِطَاعَةُ الصِّحَّةِ وَإِنْ نَوَى الْقُدْرَةَ دِيْنَ لَا تَخْرُجِي إِلَّا بِإِذْنِي شَرْطٌ لِكُلِّ خُرُوجٍ إِذْنٌ بِخِلَافِ إِلَّا أَنْ وَحَتَّى وَلَوْ أَرَادَتْ الْخُرُوجَ فقال أن خَرَجْتِ أو ضَرَبَ الْعَبْدَ فقال إِنْ ضَرَبْتَ تَقَيَّدَ بِهِ كَاجْلِس فَتَغَدَّ عِنْدِي فقال أن تَغَدَّيْتُ وَمَرْكَبُ عَبْدِهِ مَرْكَبُهُ إِنْ يَنْوِي وَلَا دِيْنَ بِهِ -

---

অনুবাদ : পোশাক পরিহিত, আরোহণরত ও বাসস্থানে অবস্থান তা শুরু এর ন্যায়। তবে এই বাড়িতে বা এই ঘরে বা এই এলাকায় বসবাস করব না (বলে শপথ করলে) প্রবেশে স্থায়িত্ব শপথ ভঙ্গ করবে না। অতঃপর (ঐ অবস্থানস্থল থেকে) বের হল আর তাতে তার আসবাবপত্র ও পরিবার-পরিজন অবশিষ্ট থাকল তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। পক্ষান্তরে শহর এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ, কেহ শপথ করল যে, এই শহরে বসবাস করবে, এক্ষেত্রে সে নিজে শুধু বের হয়ে গেলেই যথেষ্ট। পরিবারের সকল সদস্য বা তার সকল আসবাবপত্র নিয়ে বের হওয়া আবশ্যক নয়)। (কেহ শপথ করল) সে বের হবে না অতঃপর তার হুকুমে তাকে বের করা হল তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর হুকুম ছাড়া তার অসন্তুষ্টিতে বা জোরপূর্বক তাকে বের করা হলে শপথ ভঙ্গ হবে না। যেমন (কেহ শপথ করল) সে (এই বাড়ি থেকে) বের হবে না জানাযা ছাড়া। অতঃপর জানাযার দিকে বের হল এবং কোন প্রয়োজনে চলে যায় তবে শপথ ভঙ্গ হবে না (অনুরূপ কেহ শপথ করল) সে মক্কার দিকে বের হবে না বা যাবে না অতঃপর মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে ফিরে আসল তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আর যদি শপথ করে) সে মক্কাতে আসবে না তাহলে মক্কাতে প্রবেশ না করলে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি শপথ করে আমি অবশ্যই তার নিকটে আসব। অতঃপর আসে নাই এমন কি মৃত্যুবরণ করল। তাহলে তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শপথ ভঙ্গ হবে (আর যদি শপথ করে) আমার সম্ভব হলে তার নিকট অবশ্যই আসবো তবে তা সুস্থতার সামর্থ হবে।

আর যদি قدرة (তথা সামর্থ্যের) নিয়ত করে তবে তা গ্রহণ করা হবে। (যদি কেহ শপথ করে) তুমি আমার অনুমতি ছাড়া বের হবে না তবে (তার শপথ পূর্ণ হওয়ার জন্য) শর্ত হল প্রত্যেক বারে বের হতে অনুমতি নিতে হবে, তবে الا ان اذن বা الا ان اذن حتى এর ব্যতিক্রম (অর্থাৎ, শর্তের মধ্যে الا ان اذن বা الا حتى اذن উল্লেখের কারণে এক বারই অনুমতি নিলে চলবে, বার বার অনুমতি নেয়া শপথ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নহে) যদি স্ত্রী বের হওয়ার ইচ্ছা করে অতঃপর স্বামী বলে যদি তুমি বের হও বা স্ত্রী গোলামকে প্রহার করার ইচ্ছা করে। অতঃপর স্বামী বলে যদি তুমি প্রহার করবে (তাহলে তুমি তালাক) তবে স্ত্রী তাতে শর্তযুক্ত হয়ে যাবে। যেমন (কেহ বলল) তুমি বস এবং আমার সাথে সকালের আহার কর, সে বলল যদি আমি সকালের খানা খাই (তাহলে আমার গোলাম আযাদ তবে ঐ ব্যক্তির সাথে খাওয়া শর্ত শপথ ভাঙ্গার জন্য) আর শপথের ক্ষেত্রে মনিবের গোলামের বাহন মনিবের বাহনরূপে গণ্য হবে। যদি তার নিয়ত করে এবং তার উপর কোন ঋণ না থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ دَوَامُ اللُّبْسِ الخ : যদি কেহ শপথ করে আমি এই বাড়িতে বসবাস করব না। অথচ সে তখনও এই বাড়িতে বসবাসরত কিংবা সে একটি কাপড় পরিধানরত অবস্থায় শপথ করল আমি এই কাপড় আর পরিধান করব না কিংবা এক সওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় বলল, আমি এই সওয়ারীতে আর আরোহণ করব না আর বিলম্ব ছাড়া উক্ত বাড়ি থেকে বের হয়ে আসল বা উক্ত কাপড় খুলে ফেল বা উক্ত সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লো তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ, যদি কেহ শপথ করে এমন বিষয় না করার যে বিষয়ের সাথে সে অবস্থান রত তাহলে তার জন্য আবশ্যক তা বিলম্ব ছাড়া পরিহার করা এমনকি যদি সে এর পর তথা শপথের পর এক মুহূর্ত একাগ্রের সাথে বিদ্যমান থেকে যায় তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে সর্বাবস্থায় সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, এমতাবস্থায় শপথের পর কিছু সময় হলেও একাগ্রের সাথে পাওয়া যাবে, যদিও তা একান্ত কম সময়। এর জবাবে আমরা বলব যে শপথ সংরক্ষণ করার জন্য শপথ হয়ে থাকে অর্থাৎ, শপথের মূল হচ্ছে তা সংরক্ষণ করা। তা পূর্ণ করার জন্যই অনুমোদিত হয়েছে। তাই শপথ পূর্ণ করার সময়টুকু শপথ থেকে আলাদা হবে। অন্যথায় تكليف مالايطاق আবশ্যক হবে।

قوله : لَا دَوَامُ الدُّخُولِ الخ : যদি কেহ শপথ করে এই ঘরে বা এই বাড়িতে কিংবা এ এলাকায় বসবাস করবে না। অতঃপর সে এই ঘর থেকে বা এই বাড়ি থেকে কিংবা এই এলাকা থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু তার পরিবার পরিজন কিংবা আসবাবপত্র থেকে যায় এবং সেও এ গৃহে ফিরে আসার নিয়ত না করে তাহলেও শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, প্রচলনগতভাবে সেখানে নিজ পরিবার পরিজন বা আসবাবপত্র বিদ্যমান সেখানের বাসিন্দা হিসাবে ব্যক্তিও গণ্য হয়ে থাকে এক্ষেত্রে ঘর, বাড়ি, মহল্লা সমপর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি শহর সম্পর্কে শপথ করে তবে সে শুধু শহর থেকে বের হয়ে গেলে এবং পরিবার-পরিজন বা আসবাব-পত্রকে না বের করলেও সে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত শহরে ফিরে আসবে। আর আসবাবপত্র স্থানান্তরিতের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, সমস্ত আসবাবপত্র সরাতে হবে। এমনকি যদি একটি খুটিও থেকে যায় তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, সমস্ত আসবাবপত্র দ্বারাই তার বাসস্থান সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তার আসবাবপত্রের একটি অংশও বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বসবাস অব্যাহত থাকবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, সমস্ত সরানো প্রয়োজন নয়। বরং অধিকাংশ সরানোতে শপথ রক্ষা হয়ে যাবে। কেননা, অনেক সময় সম্পূর্ণকে সরানো কষ্টকর হতে পারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে গৃহস্থালী আসবাবপত্র সরানো বিবেচ্য। এর অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরানোর প্রয়োজন নেই। কেননা, অতিরিক্ত আসবাবপত্র বসবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন, এ মতই উত্তম এবং মানুষের জন্য সহজতর। তবে তার জন্য কর্তব্য অবিলম্বে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া, যাতে শপথ রক্ষিত হয়।

قوله : لَا يَخرُجُ فَأُخرِجَ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে সে এই বাড়ি থেকে বের হবে না। এমতাবস্থায় তাকে কেউ উঠিয়ে নেয়, তাহলে যদি তার নির্দেশে তাকে উঠিয়ে নেয় তাহলে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, আদিষ্ট ব্যক্তির কর্ম আদেশদাতার সাথেই সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং তা এমন হল যে, সে কোন বাহনে আরোহণ করল আর বাহন তাকে নিয়ে বের হয়ে গেল। এক্ষেত্রে যেমন শপথ ভঙ্গ হবে তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও শপথ ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তার নির্দেশ ছাড়া কেউ তাকে বের করে নিয়ে যায় তা জোর পূর্বক হোক বা তার সন্তুষ্টিতে হোক তাহেল তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, তার নির্দেশ নেই বলে জোর পূর্বক তাকে বের করা তার কাজ বলে বিবেচিত হবে না। এবং স্থানান্তর সাব্যস্ত হবে আদেশ দ্বারা নিছক সম্মতি দ্বারা নয়।

قوله : كَلا يَخرُجُ اِلَّا اِلٰى جَنَازَةِ الخ : যদি কেহ শপথ করে জানাযার জন্য বের হওয়া ছাড়া সে এই বাড়ি থেকে বের হবে না, অতঃপর জানাযার জন্য বের হয়ে অন্য কাজের জন্য চলে যায় তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, সে তো জানাযার জন্য বের হয়েছে যদিও সে পরোক্ষভাবে অন্য কাজও করেছে। তাছাড়া যেহেতু ব্যতিক্রমকৃত বের হওয়া পাওয়া গিয়েছে আর বের হওয়ার পর কোথাও গমন করা বের হওয়া নয়।

قوله : لَايُخرُجُ اَوْ لَا يَذْهَبُ الخ : যদি কেহ শপথ করে আমি মক্কার অভিমুখে বের হব না বা যাব না। এমতাবস্থায় যদি সে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে ফিরে আসে তবে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। কেননা, خروج (বের হওয়া) ذهاب (যাওয়া) এর ক্ষেত্রে যাওযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া শর্ত। সেখানে পৌছা শর্ত নয়। পক্ষান্তরে বক্তার বক্তব্যে اتيان (আসা) زيارة (সাক্ষাৎ করা) থাকলে এর ক্ষেত্রে সে স্থানে পৌছা শর্ত। সুতরাং যদি কেহ শপথ করে আমি মক্কায় আসব না বা অমুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাব না আর সে তার বাসস্থান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয় কিংবা অমুকের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং মক্কাতে পৌছে না কিংবা অমুকের সাথে সাক্ষাতের আগেই ফিরে আসে তা হলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে اتيان। তথা আসা এর অর্থ হচ্ছে উপনিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَأْتِيَا فِرعَونَ فَقُولَا لَهُ -

قوله : لَيَأْتِيَنَّهُ فَلَمْ يَأْتِهِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে সে অবশ্যই মক্কাতে আসবে। অতঃপর মক্কাতে আসে নাই, এমনকি তার মৃত্যু হয়ে গেল। তাহলে জীবনের সর্বশেষ সময়ে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এ সময়ে উপনিত হওয়াতে মক্কায় না আসা নিশ্চিত হয়েছে। ইতিপূর্বে তার মক্কায় আসারও সম্ভাবনা ছিল। অনুরূপ যদি শপথ করে 'আমি অমুকের নিকট যাব না' তাহলে তাদের কোন একজনের মৃত্যুর মাধ্যমে শপথ ভেঙ্গে যাবে। এ ভিত্তিতেই সব ধরনের مطلق يمين এর হুকুম। সুতরাং যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করার জন্য শপথ করে এবং এর জন্য কোন সময় নির্ধারণ না করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ শপথ বাস্তবায়ন করা অসম্ভব না হবে ততক্ষণ তার শপথ ভঙ্গ হবে না।

قوله : لَيَأْتِيَنَّهُ اِنِ اسْتَطَاعَ الخ : যদি কেহ শপথ এভাবে করে যে, যদি সে সক্ষম হয় তাহলে অবশ্যই মক্কাতে আসবে। তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে স্বাস্থ্যগত সক্ষমতা। তাকদীর সম্পর্কিয় সক্ষমতা নয়। সুতরাং যদি এমন শপথকারী অসুস্থ না হয় কিংবা শাসক কর্তৃক অবরুদ্ধ না হয়, তার পরও সে তথায় পৌছল না তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি সে তাকদীর সম্পর্কিয় সক্ষমতার নিয়ত করে থাকে তবে তা ديانة গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ, যদি সে বলে আমি এই استطاعة। দ্বারা প্রকৃত সামর্থ তথা এ সামর্থ উদ্দেশ্য করেছি যার দ্বারা কাজটি সংঘটিত হওয়া ওয়াজিব হয় এবং যা কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে তার এই নিয়তকে ديانة মানা হবে। কিন্তু তার শপথ ভেঙ্গে গেছে বলে বিচারকের ফায়সালা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, ওরফে 'নিরাপদ' সামগ্রীও নিরাপদ বাহন' এর অর্থে استطاعة। ব্যবহার হয়। সুতরাং এর দ্বিতীয় অর্থ প্রকৃত সামর্থ্য বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। তাই قضاء তা মানা হবে না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলাতে ব্যবহৃত فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ এটি دُيِّنَ مجهول এর শব্দ অর্থাৎ ديانة তাকে

সমর্থন করা হবে যখন استطاعة দ্বারা استطاعة حقيقى উদ্দেশ্য হয়। কেননা, উসূলে ফিকাহ গ্রন্থে استطاعة এর দু'টি অর্থ লিখেছেন। ১। প্রকৃত সামর্থ (استطاعة حقيقى) যে সামর্থ সৃষ্টি হওয়ার সাথে فعل ও সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ, সামর্থ এবং فعل এর কাল এক হয়। শুধু মূল অস্তিত্বের ক্ষেত্রে استطاعة টা فعل এর অগ্রে আসে কারণ উক্ত সামর্থ্য فعل এর علة تامة - । তাই فعل এর থেকে পৃথক হবে না।

২। ঐ সামর্থ্য যার দ্বারা فعل অস্তিত্বে আসা সম্ভব (قدرة ممكنة) যেমন فعل টি সংঘটিত হওয়ার উপকরণ ও আসবাব মজবুত ভালো থাকা এবং সব ধরনের বাধা দূরে সরিয়ে দেওয়া। আর ঐ প্রকারের সামর্থ্যের উপরই বান্দাকে মুকাল্লাফ বানানোর ভিত্তি। কেননা, قدرة টি فعل থেকে مقدم হয় আর ঐ প্রকারই استطاعة আল্লাহর বাণীতে উদ্দেশ্য যে وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - ।

قوله : لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া বের হবে না এর ব্যাপারে। তাহলে তার শপথ পূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হলো : প্রত্যেক বার বের হওয়ার সময় স্বামীর অনুমতি নেয়া। কেননা, لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي এর উদ্দেশ্য হলো সে বের হবে তার অনুমতি নিয়ে। উল্লেখ্য যে, لاتخرج الا باذنى মধ্যকার استثناء হচ্ছে استثناء مفرغ - । যার জন্য এক مستثنى منه কে عام مفهوم হিসাবে উহ্য মানতে হয়। যা مستثنى এর جنس থেকে হয় এবং وصف বা গুণ এর সাথে সম্পর্ক রাখে। সুতরাং বাক্যের রূপ দাঁড়ায় لَاتَخْرُجُ خُرُوجًا إِلَّا خُرُوجًا مُلْصَقًا بِإِذْنِهِ আর نفى এর অধিনে نكره আসলে عام অর্থ হয়। তাই এই عام অর্থ থেকে কিছু فرد কে পৃথক করে দিলে বাকি সমস্ত افراد ঐ عام এর অধিনে থেকে যাবে।

قوله : بِخِلَافِ إِلَّا إِنْ وَحَتّٰى الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, তুমি বের হবে না। যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে অনুমিত দেব। তাহলে প্রতিবার অনুমতি নেয়া শর্ত নয়। কেননা, الا ان বা الا حتى তা শেষ সীমা পর্যন্ত বুঝে নেয়ার জন্যব্যবহার হয়ে থাকে। তাই এক বার অনুমতি দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত মাসআলায় فعل এর সাথে ان মাসদারের অর্থে রূপান্তর হয়। সুতরাং أَذِنَ - إِذْنٌ মাসদারের অর্থে হবে। আর اذن ও خروج এর جنس এক নয়। তাই প্রকৃত অর্থে خروج থেকে اذن কে استثناء করা সহীহ নয়। الا ان রূপকভাবে غاية অর্থে নিতে হবে। অর্থ হবে যে পর্যন্ত না আমি অনুমতি দেব। তাই অনুমতির সময় পর্যন্ত বের হওয়া নিষিদ্ধ থাকবে। যখন একবার অনুমতি পাবে তখন নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে।

قوله : وَلَوْ أَرَادَتِ الْخُرُوجَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে يمين الفور বা তাৎক্ষণিক শপথ এর আলোচনা করেছেন। তা হলো : যদি কারও স্ত্রী নিজ গৃহ থেকে বের হবার ইচ্ছা করে আর সে সময় স্বামী বলে, যদি তুমি বের হবে তবে তালাক অথবা স্ত্রী কোন গোলামকে প্রহার করার ইচ্ছা করে। আর তৎক্ষণাৎ স্বামী বলে, যদি তুমি প্রহার করবে তবে তুমি তালাক। তাহলে আলোচিত এ দুইটি মাসআলায়ও এ জাতীয় অন্যান্য মাসআলায় স্ত্রীর তালাক বা কর্ম সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, যে কাজের উপর শপথ করেছে তা সঙ্গে সঙ্গে করা। সুতরাং স্ত্রী যদি সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় এবং কিছু সময় অপেক্ষা করে বের হয় কিংবা প্রহার করে তার উপর তালাক পতিত হবে না। আর তা এ কারণে যে লোক প্রচলনের আলোকে বক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপস্থিত প্রহার বা উপস্থিত বের হওয়া রোধ করা। আর শপথের ভিত্তিই হচ্ছে প্রচলনের উপর।

قوله : كَاجْلِسْ فَتَغَدَّ الخ : কেহ অন্য জনকে বলল, আস, আমার সাথে খানা খাবে। এখন যদি সে বলে যদি আমি সকালের খাবার খাই, তাহলে আমার গোলাম আজাদ। তাহলে গোলাম আজাদ হওয়া বা তার শপথ পূর্ণ হওয়ার জন্য সকালের খানা ঐ আহ্বান কারীর সাথে খাওয়া জরুরী। এখন যদি সে অন্যত্র সকালের খানা খায় তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি আহুত ব্যক্তি বলে আমি আজকের সকালের খানা খেলে গোলাম আজাদ, তাহলে সে যে কারো সাথে আজকের সকালের খানা খাইবে তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, উত্তরে তার শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, যদি আমি সকালের খানা খাই। তথাপিও যখন সে 'আজকের'

শব্দটি বাড়িয়ে বলেছে। তখন এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে এটি নতুন কথা। তা আহ্বানকারীর নয়। তাই যেখানেই সকালের খানা খাবে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ সুরতে আহ্বানকারীর সাথে খাওয়া শর্ত নয়।

قوله : وَ مَرْكَبُ عَبْدِهِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, অমুকের সওয়ারীতে আরোহণ করবে না, তাহলে অমুকের গোলামের সওয়ারীতে আরোহণ হলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে তা শর্ত সাপেক্ষে। যদি সে অমুকের ঋণগ্রস্ত বা মুক্ত, অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের সওয়ারীতে আরোহণ করে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তবে হা অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত না থাকে এবং শপথকারীর নিয়াতও আম থাকে তাহলে সে গোলামের সওয়ারীতে আরোহণ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, গোলামের মালিকানাধিন বস্তুতে মূল মালিকানা হচ্ছে মনিবের। কিন্তু লোক প্রচলণ ও শরীয়াত উভয়দিক থেকেই উক্ত বস্তুর মালিকানা গোলামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَ لَهُ مَالٌ فَهُوَ لِلْبَائِعِ (رواه السنة) কেউ যদি কোন গোলাম বিক্রি করে। আর তার সাথে কোন মাল থাকে তাহলে ঐ মাল বিক্রেতার হবে। ফলে মনিবের সাথে মালিকানা সম্পৃক্ততা ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে। সুতরাং নিয়ত জরুরী হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সওয়ারী দ্বারা যদি আম সওয়ারী উদ্দেশ্য হয় তাহলে সব সুরতেই তার শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মনিবের প্রকৃত মালিককে বিবেচনায় এনে বলেন নিয়ত না করা সত্ত্বেও (সকল ক্ষেত্রে) শপথ ভঙ্গ হবে। কেননা, উভয়ের মতে ঋণগ্রস্থতা মালিকের মালিকানা হওয়া রোধ করে না।

بَابُ الْيَمِينِ فِى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ

পরিচ্ছেদ : কথা বলা, পরিধান করা এবং পানাহার সংক্রান্ত শপথ

لَا يَأْكُلُ من هذه النَّخْلَةِ حَنِثَ بِثَمَرِهَا وَلَوْ عَيَّنَ الْبُسْرَ وَالرُّطَبَ وَاللَّبَنَ لَا يَحْنَثُ بِرُطَبِهِ وَتَمْرِهِ وَشِيرَازِهِ بِخِلَافِ هذا الصَّبِيِّ وَهٰذَا الشَّابِّ وَهٰذَا الْحَمَلِ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا لَا يَحْنَثُ وفي لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أو بُسْرًا أو لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا حَنِثَ بِالْمُذَنِّبِ وَلَا يَحْنَثُ بِشِرَاءِ كِبَاسَةِ بُسْرٍ فيها رُطَبٌ في لَا يَشْتَرِي رُطَبًا وَبِسَمَكٍ في لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَالْإِنْسَانِ وَالْكَبِدِ وَالْكِرْشِ لَحْمٌ وَبِشَحْمِ الظَّهْرِ في شَحْمًا وَبِإِلْيَةٍ في شَحْمًا وَلَحْمًا -

---

অনুবাদ : (যদি কেহ শপথ করে) সে এই খেজুর গাছ থেকে খেজুর খাবে না, তাহলে তার ফল (খাওয়ার) দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে, আর যদি সে (শপথে) কাচা, পাকা খেজুর, বা দুধকে নির্দিষ্ট করে তবে সে পাকা, শুকনা খেজুর বা ছানা (খাওয়াতে) শপথ ভঙ্গ হবে না তবে তা ব্যতিক্রম এই শিশু বা এই যুবক কিংবা এই মেষ শাবক এর (অর্থাৎ, যদি শপথ করে আমি এই বালকের সাথে কথা বলব না, অতঃপর সে যুবক হয় এবং কথা বলে কিংবা যদি শপথ করে আমি এই যুবকের সাথে কথা বলব না, অতঃপর সে বৃদ্ধ হয় এবং তার সাথে কথা বলে, অথবা শপথ করল আমি এই মেষ শাবকের গোস্ত আহার করব না অতঃপর তা মেষ হয় এবং সে তা আহার করে তাহলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।) (কেহ শপথ করল) কাঁচা খেজুর খাবে না, অতঃপর পাকা খেজুর খেল সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর (কেহ শপথ করল) সে পাকা বা অর্ধপাকা খেজুর খাবে না। তাহলে সে খেজুর নিচের দিকে সামান্য পেকেছে তা (খাওয়ার) দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর শপথ ভঙ্গকারী হবে না কাঁচা খেজুরের গুচ্ছ ক্রয় দ্বারা যার মধ্যে পাকা খেজুর রয়েছে পাকা খেজুর ক্রয় করবে না (বলে শপথ করার) ক্ষেত্রে। (অনুরূপ শপথ ভঙ্গ হবে না) মাছ (খাওয়া) দ্বারা। গোস্ত খাবে না (বলে শপথ করার ক্ষেত্রে। আর শুকরের গোস্ত, মানুষের গোস্ত কলিজী বা পাকস্থলী গোশতের অন্তর্ভুক্ত। (অনুরূপ শপথ ভঙ্গ হবে না) পিঠের চর্বি (খাওয়াতে) চর্বি (খাবে না বা ক্রয় করবে না বলে শপথ করার ক্ষেত্রে এবং দুম্বার নিতম্ব (খাওয়াতে) গোশত বা চর্বি (খাবে না বা ক্রয় করবে না বলে শপথ করার ক্ষেত্রে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

উপরোক্ত পরিচ্ছেদের মাসআলাসমূহ সহজে অনুধাবনের লক্ষ্যে আমরা প্রথমেই সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ্।

১। খাবার বলা হয় এমন বস্তু যা মুখ দিয়ে পেটে পৌছে যা চাবানো উপযোগী। বাস্তবে তা চাবানো হউক বা না হউক। যেমন রুটি, ফলমূল ইত্যাদি। আর পানীয় বলা হয় এমন বস্তু যা মুখ দিয়ে পেটে পৌছে, যা চর্বনযোগ্য

নয়। যেমন পানি, মধু ইত্যাদি। সুতরাং যদি নাকের ভেতর দিয়ে অথবা ডুশ এর মাধ্যমে কোন খাবার বা পানীয় পেটে পৌঁছানো হয় তবে তা খাবার বা পানিয় হিসাবে গণ্য হবে না। আর স্বাদ বলা হয় কোন বস্তুর স্বাদ অনুভবের জন্য মুখের ভেতর দেয়া। তা পেটে যাক বা না যাক। অতএব, اكل খাওয়া شرب পানীয় এবং ذوق স্বাদ এ عموم خصوص مطلق এর সম্পর্ক। এ হিসাবে সকল খাবার ও পানীয় স্বাদ। কিন্তু সকল স্বাদ খাবারও পানীয় নয়।

২। শপথ যখন এমন বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হবে যার প্রকৃত অসম্ভব বা কষ্টসাধ্য তখন তা যথা সম্ভব এমন বিষয়ে প্রয়োগ করা যা প্রচলনগতভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়। যাতে জ্ঞানবান, সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কথাকে অনর্থকতা থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়। আর যদি প্রচলনগত দিক দিয়েও তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র না থাকে, তবে অক্ষমতা বশতঃ তার কথাকে অনর্থক কথাবলির মধ্যে গণ্য করা হবে।

৩। যদি শপথ নির্দিষ্ট ও উপস্থিত বস্তুর বিশেষ গুণের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে লক্ষ্য করা হবে যে, এই গুণ শপথের দিকে ধাবিত নাকি ধাবিত নয়। যদি এগুণ শপথের দিকে ধাবিত হয় তবে তার বিবেচনা করা হবে। অন্যথায় তা শুধু অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। নির্দিষ্টের ক্ষেত্রে নয়। والله اعلم -

قوله : لَايَاكُلُ مِنْ هٰذِهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে এই খেজুর বৃক্ষ থেকে আহার করবে না তাহলে উক্ত খেজুর বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন ফল তথা খেজুর খেলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে খেজুর গাছ থেকে খাওয়ার প্রকৃত অর্থ حسا তথা অনুভব গত দিক থেকে বর্জন করা হবে। সুতরাং উক্ত বৃক্ষের লাকড়ী বা পাতা আহার করাতে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তবে হ্যা উক্ত বৃক্ষের ফল খাওয়াতে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, বৃক্ষ হচ্ছে ফলের উপকরণ। সুতরাং বৃক্ষ দ্বারা রূপক অর্থে ফল উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে উক্ত ফল নতুন কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কারণে অন্য কোন গুণে গুণান্বিত হওয়া পাওয়া না যাওয়া। যেমন, নাবিজেতামার, সিরকা, বা খেজুর জাল দেয়া শিরা ইত্যাদি পান করার কারণে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : وَلَوْ عَيَّنَ الْبُسْرَ الخ : যদি কেহ শপথের ক্ষেত্রে বস্তুর বিশেষ গুণকে নির্দিষ্ট করে এবং ঐ গুণটি যদি শপথের কারণ হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হয় তাহলে ঐ গুণ বিদ্যমান থাকার সাথে শপথের সম্পর্ক হবে। (যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।) সুতরাং যদি কেহ শপথ করে যে, কাঁচা খেজুর খাবে না অতঃপর তা পেকে যাওয়ার পর খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। তদ্রূপ যদি শপথ করে যে, সে এই তাজা খেজুর থেকে খাবে না। বা এই দুধ খাবে না। অতঃপর পাকা খেজুর খোরমা হয়ে গেল এবং ঐ দুধ ছানা হয়ে গেল তারপর তা খেল, তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আলোচ্য মাসআলায় খেজুরের কাঁচা, পাকা গুণ শপথ করার কারণ হতে পারে তদ্রূপ দুধের অবস্থাও শপথের কারণ হতে পারে। তাই শপথ উল্লিখিত গুণ বিশিষ্ট শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। আর দুধ যেহেতু সে নিজেই আহার যোগ্য তাই তা অন্য অর্থের দিকে তথা দই, চা বা পানির ইত্যাদি অর্থের দিকে ধাবিত হবে না।

قوله : بِخِلَافِ هٰذَا الصَّبِيِّ الخ : পূর্বোক্ত মাসআলার সম্পূর্ণ বিপরীত আলোচ্য মাসআলা, আর তা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে ঐ বালকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর বালক যুবক হওয়ার পর কথা বলে কিংবা শপথ করে ঐ যুবকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর যুবক বৃদ্ধে উপনিত হওয়ার পরে কথা বলে। তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, কথা বন্ধের মাধ্যমে মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। অতএব শপথের কারণরূপে বিবেচ্য অবস্থাগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে কারণরূপে গণ্য হবে না। তদ্রূপ যদি কেহ শপথ করে যে, এই মেষ শাবকের গোস্ত খাবে না। অতঃপর শাবক পূর্ণ মেষ হওয়ার পর তার গোস্ত আহার করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, এখানে শাবকত্ব এমন কোন বিশেষ গুণ নয় যা শপথ করার

কারণ হতে পারে। কারণ, শাবকের গুণ পরিহার করার চেয়ে মেষের গুণ পরিহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

قوله : وَ فِي لَايَاكُلُ رُطَبًا الخ : যদি কেহ শপথ করে কাঁচা বা পাকা খেজুর খাবে না অথবা শপথ করে যে, সে পাকা বা কাঁচা খেজুর খাবে না। অতঃপর সে অর্ধপক্ক খেজুর অর্থাৎ গোড়ার দিকে পাক ধরা খেজুর খেল। তাহলে সে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যে পাকা খজুর না খাওয়ার শপথ করেছে। অর্ধপাকা খেজুর খাওয়ার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যে কাঁচা খেজুর না খাওয়ার শপথ করেছে। অর্ধপক্ক খেজুর খেলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : কাঁচা বা পাকার পরিমাণ যাই হোক মিশ্র খেজুর ভক্ষণকারী প্রকৃতপক্ষে কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থার খেজুর ভক্ষণকারী হবে। আর ভক্ষণের ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

قوله : وَلَا يَحْنِثُ بِشَرَاءِ كِبَاسَةِ بُسْرٍ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে পাকা তাজা খেজুর ক্রয় করবে না। অতঃপর কাঁচা খেজুরের গুচ্ছ ক্রয় করে যার মাঝে কিছু পাকা খেজুরও রয়েছে। তাহলে তার শপথ ভাঙ্গবে না। কেননা, এক্ষেত্রে অধিকাংশ খেজুর ধর্তব্য। আর এখানে অধিক হচ্ছে কাঁচা খেজুর। আর সল্প অংশটি অনুগামী হবে। তবে হ্যাঁ যদি কেহ খাওয়ার ব্যাপারে অনুরূপ শপথ করে আর কাঁচা খেজুরের সাথে কিছু কিছু পাকা খেজুরও খেয়ে ফেলে তবে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, ভক্ষণ কর্মটি ধীরে ধীরে বস্তুটির সাথে যুক্ত হয়। তাই কাঁচা ও পাকা উভয় অংশটি উদ্দেশ্যভুক্ত হবে। আর তা এমন হল যে, কেহ যব খাবে না ও ক্রয় করবে না বলে শপথ করল। অতঃপর গম ক্রয় করল যাতে কিছু কিছু যবের দানা ছিল। অতঃপর সে তা খেল। সুতরাং উক্ত গম এর সাথে কিছু কিছু যব এর দানা ক্রয় করতে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কিন্তু তা আহার করার কারণে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

قوله : وَ بِسَمَكٍ فِي لَايَاكُلُ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে গোশত খাবে না। অতঃপর সে মাছের গোশত খেল তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর তা হচ্ছে সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। আর তা হল মাছের ক্ষেত্রে গোশত শব্দ প্রয়োগ হচ্ছে রূপকভাবে। কেননা, মাছের গোশতকে ওরফের প্রচলনে গোশত বলা হয় না। আর তা এজন্য যে গোশত বলা হয় যা রক্ত থেকে সৃষ্ট হয়। আর মাছে কোন রক্ত নেই। আর কিয়াসের দাবী হচ্ছে তা গোশতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : وَمِنْ كُلٍّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا 'আর প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত (মাংস) আহার কর।' কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিয়াস পরিত্যাজ্য। কেননা, শপথের ভিত্তি ওরফের উপর। তবে হ্যাঁ যদি সে বকরী, গরু, মহিষের গোশত আহার করে তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি সে যদি হারাম প্রাণীরও গোশত আহার করে তবুও শপথ ভেঙ্গে যাবে। তাই সে যদি শুকরের কিংবা মানুষের গোশত আহার করে তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এটি প্রকৃত গোশত তবে তা হারাম। আর শপথ সংঘটিত হয় হারাম থেকে রোধ করার জন্য। তদ্রূপ হুকুম হবে যদি সে কলিজা বা পাকস্থলী আহার করে। কেননা, প্রকৃত অর্থে তাও গোশত এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার উৎপত্তি ও বর্ধন রক্ত থেকে আর এগুলোর ব্যবহার ও গোশতের ন্যায় তবে কেহ কেহ বলেন, নাড়ি-ভুঁড়ি, তিল্লী, কলজে খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, তা ওরফে গোশত এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে ওরফের পরিবর্তনের কারণে হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে।

قوله : وَ بِشَحْمِ الظَّهْرِ الخ : যদি কেহ শপথ করে সে চর্বি খাবে না বা ক্রয় করবে না। অতঃপর পিঠের চর্বি ভক্ষণ করে বা ক্রয় করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। তাদের দলিল হল : তা মূলত চর্বি মিশ্রিত গোশত। কেননা, তাতে চর্বির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর তা হল আগুনের উত্তাপে তা গলে যাওয়া। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল পিঠের চর্বি তা রক্ত থেকে তৈরী। তা গোশতের ন্যায় ব্যবহার হয়। আর তা দ্বারা গোশতের

শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই তো কেহ গোশত না খাওয়ার শপথ করলে তা খেলে শপথ ভঙ্গ হয়। অথচ চর্বি বিক্রয় না করার শপথের ক্ষেত্রে তা বিক্রি করলে শপথ ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেহ শপথ করে সে চর্বি বা গোশত আহার করবে না বা বিক্রয় করবে না। অতঃপর সে দুম্বার নিতম্ব ক্রয় করে বা আহার করে। তাহলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, ইহা তৃতীয় প্রকার বস্তু এবং তা গোশত বা চর্বির ন্যায় ব্যবহার হয় না।

وَبِالْخُبْزِ فِي هٰذَا الْبُرِّ وَفِي هٰذَا الدَّقِيقِ يَحْنَثُ بِخُبْزِهِ لَا بِسُفِّهِ وَالْخُبْزُ مَا اعْتَادَهُ بَلَدُهُ وَالشِّوَاءِ وَالطَّبِيخِ عَلَى اللَّحْمِ وَالرَّأْسُ مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ وَالْفَاكِهَةُ التُّفَّاحُ وَالْبِطِّيخُ وَالْمِشْمِشُ لَا الْعِنَبُ وَالرُّمَّانُ وَالرُّطَبُ وَالْقِثَّاءُ وَالْخِيَارُ وَالْإِدَامُ مَا يُصْطَبَغُ كَالْخَلِّ وَالْمِلْحِ وَالزَّيْتِ لَا اللَّحْمُ وَالْبَيْضُ وَالْجُبْنُ وَالْغَدَاءُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْهُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَالسُّحُورُ مِنْهُ إِلَى الْفَجْرِ -

---

অনুবাদ : আর (শপথ ভঙ্গ হবে না) এই গম (খাবে না বলে শপথের) ক্ষেত্রে রুটি (খাওয়া) দ্বারা। আর এই আটা (খাবে না বলে শপথের) ক্ষেত্রে তার (তৈরী) রুটি খাওয়ার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে তার ফালি খাওয়াতে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর রুটি তাই যা খাওয়ায় শহরবাসী অভ্যস্ত। আর কাবাব ও রন্ধনকৃত প্রয়োগ হবে গোশতের উপরে। অর্থাৎ কেহ শপথ করল সে কাবাব খাবে না বা রন্ধন কৃত খাবে না। তাহলে গোশতের কাবাব এবং রন্ধক কৃত গোশত খেলে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর মাথা যা এ শহরে বিক্রয় হয় (অর্থাৎ, কেহ শপথ করল মাথা খাবে না, তবে শপথকারীর শহরে যে ধরনের মাথা বিক্রয় যোগ্য তাই উদ্দেশ্য হবে)। আর ফল দ্বারা (শপথের ক্ষেত্রে) আপেল, তরমুজ খুবানী অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আঙ্গুর, ডালিম, তাজা পাকা খেজুর, শসা, ক্ষীরা (কাকরি) অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর সালন দ্বারা (শপথের ক্ষেত্রে) শুরবাদার এমন কিছু যা দ্বারা রুটি খাওয়া হয়। যেমন, সিরকা, লবন, জয়তুনের তৈল অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে গোশত, ডিম, পনির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর غدا বা সকালের খাবার হচ্ছে যা ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত সময়ে খওয়া হয়। আর عشاء বা রাত্রের খাবার হচ্ছে যা জোহর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সময়ে খাওয়া হয়। আর سحور বা সেহরী হচ্ছে যা অর্ধরাত থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে খাওয়া হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ الْخُبْزُ فِى هٰذَا الْبُرِّ الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে এই গম থেকে ভক্ষণ করবে না তাহলে দাতে চিবানো ছাড়া শপথ ভঙ্গ হবে না। তদ্রূপ যদি উক্ত গমের তৈরী রুটি ভক্ষণ করে তবেও শপথ ভঙ্গ হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে উক্ত গম কিংবা গমের তৈরী রুটি ভক্ষণ করে তা চিবিয়ে খাক বা অন্য পন্থায় থাক তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ গম নামক মূল বস্তুটি খাওয়া উদ্দেশ্য।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দলিল হল : যদি কোন শব্দের معنى حقيقى তথা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তার معنى مجازى তথা রূপক অর্থও প্রসিদ্ধ থকে। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে معنى حقيقى

প্রাধান্য প্রাপ্ত হবে। সুতরাং গম ভক্ষণের একটি معنى حقيقى রয়েছে যা ব্যবহৃ হয়। তা হল গম সিদ্ধ দিয়ে বা ভেজে দাতে চিবিয়ে খাওয়া হয়। তাই এখানেও গম মুখে চিবিয়ে খাওয়ার অর্থই অন্য প্রক্রিয়াতে খাওয়ার উপর প্রাধান্য হবে। আর যদি তা চিবিয়ে খায় তবুও সাহাবাইন (রহ.) এর মতে উক্ত শপথ কারীর শপথ ভঙ্গ হবে। কেননা, তা রূপক অর্থের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

قوله : وَهِيَ هٰذَا الدَّقِيْقِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে আটা থেকে খাবে না, অতঃপর সে আটার তৈরী রুটি আহার করল। তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, শুধু আটা, আটা হিসাবে আহার যোগ্য নয়। তাই তার রূপক অর্থটি প্রকৃত অর্থরূপে নির্ধারিত হয়ে গেল। তাই যদি কেহ আটাকে ফালি/ছাতু করে খেয়ে নেয়। তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, এক সাথে প্রকৃত ও রূপক অর্থ উভয়টি গ্রহণ করা যায় না।

قوله : وَ الْخُبْزُ مَا اَعْتَادَهُ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে রুটি খাবে না। তাহলে শহরবাসী যে ধরনের রুটিতে অভ্যস্ত তাই প্রজোয্য হবে। আর তা হল গম বা যবের রুটি। কেননা, অধিকাংশ শহরে এটিই হচ্ছে অভ্যস্ত রুটি। আর যদি বাদাম বা অন্য কোন কিছুর রুটি আহার করে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, নিঃশর্তভাবে এটিকে রুটি বলা হয় না। কিন্তু যদি এ ধরনের রুটির নিয়ত করে তবে শপথ ভঙ্গ হবে। কেননা, এটা তার বক্তব্যের সম্ভাবনাভুক্ত। তদ্রূপ যদি কেহ চালের রুটি খায়, তাহলে যে শহরে এরূপ রুটিতে অভ্যস্ত এ শহরের শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যে শহরে এরূপ রুটিতে অভ্যস্ত নয় সে শহরের শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হবে না।

قوله : وَ الشِّوَاءِ والطَّبِيْخِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে সে কাবাব খাবে না বা রন্ধনকৃত খাবে না, তাহলে শুধু ভুনা কৃত বা রান্নাকৃত গোশত খেলে শপথ ভঙ্গ হবে। ভুনাকৃত বেগুন বা গাজর বা অন্য কোন সবজী খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, নিঃশর্ত ভুনা বা রান্নাকৃত দ্বারা ভুনা গোশতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ যদি কেহ গাজর ভাজা, ডিম, ভুনা ইত্যাদিরও নিয়ত করে তবে তা কার্যকর হবে। এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা, বক্তব্যের ব্যাপকারণ কঠিন, তাই প্রচলিত বিশিষ্ট অর্থের দিকেই শপথকে অভিমুখি করা হবে। আর রান্নাকৃতের ক্ষেত্রে গোশতের শুরবা খায় তবুও তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এতে গোশতের অংশ রয়েছে। তাছাড়া তাও রান্নাকৃত বলা হয়।

قوله : وَالرَّأْس الخ : যদি কেহ শপথ করে মাথা খাবে না বা বিক্রি করবে না, তাহলে শপথ সংঘটিত হওয়া শহরে রান্নাকৃত বিক্রয়যোগ্য মাথাই ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে হিদায়া গ্রন্থে জামিউস সাগীর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ শপথ করে সে মাথা খাবে না, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে গরু ও খাসীর মাথা উদ্দেশ্য হবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে শুধু খাসির মাথা উদ্দেশ্য হবে। এই মতপার্থক্য মূলত দেশকাল ভিত্তিক মতপার্থক্য। তা প্রমান ভিত্তিক মতপার্থক্য নয়। অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর সময় উভয় মাথার ক্ষেত্রে প্রচলন ছিল। কিন্তু সাহাবইন (রহ.) এর সময় শুধু খাসীর মাথার প্রচলন ছিল। সুতরাং আমাদের সময়ে অভ্যাস ও প্রচলন হিসেবেই ফাতওয়া প্রদান করা হবে। الله اعلم।

قوله : وَ الْفَاكِهَةُ التُّفَّاحُ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে ফল খাবে না তবে আপেল, খুবানী, তরমুজ, কিসমিস ভক্ষণ করে তবে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি আংগুর, ডালিম, তাজা পাকা খেজুর, শসা, ক্ষীরা ভক্ষণ করে তবে শপথ ভঙ্গ হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে আংগুর, ডালিম, তাজা খেজুর ফলের অন্তর্ভুক্ত। তা খেলে শপথ ভঙ্গ হবে। তারা দলিল পেশ করেন যে, উরফে এগুলোকে ফল হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এগুলোর মধ্যে অন্যান্য ফলের তুলনায় স্বাদও বেশি। তাছাড়া এগুলোর মধ্যে বিনোদনগত দিকটি বিদ্যমান রয়েছে। তাই তা ফলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মূলত ফল বলা হয় যা খাবারের আগে বা পরে বিনোদন মূলকভাবে খাওয়া হয়। আর বিনোদন মূলক

হওয়ার ব্যাপারে কাচা, শুকনা দুটোই সমান। যদি এগুলো বিনোদনের হিসাবে ব্যবহারের প্রচলন থাকে আর এই বিনোদনগত দিকটি আপেল ও অন্যান্য ফলে ও বিদ্যমান রয়েছে। তাই এসব ক্ষেত্রে শপথ ভঙ্গ হবে। আর ক্ষীরা, শষা বা এ জাতীয় বস্তুতে তা বিদ্যমান নেই। কেননা, এগুলো সবজী হিসেবে বিক্রি হয় এবং খাওয়া হয়। সুতরাং এ দুটি খাওয়াতে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর আঙ্গুর, আনার আর পাকা খেজুর ও ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তা মূলত খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং পথ্য ও ঔষধ হিসাবে খাওয়া হয়। অতএব, তা জীবন ধারণের ক্ষেত্রে খাওয়া হয় বিধায় ফল হওয়ার বিষয়টি তাতে হ্রাস পেয়ে গেছে।

قوله : وَ الْإِدَامُ مَا يُصْطَبَغُ الخ : যদি কেহ সালন না খাওয়ার শপথ করে তা হলে শুরবাদার এমন কিছু যা রুটি দ্বারা খওয়া হয় তা তরকারী বলে গণ্য হবে। অনুরূপ লবনও তরকারীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভুনা গোশত তরকারী নয়। তা খাওয়া দ্বারা তার শপথ ভঙ্গ হবে না। مغرب নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে ইবনুল আম্বারী (রহ.) বলেন, ادام হচ্ছে এমন জিনিস যা রুটিকে উত্তমভাবে খাওয়ার উপযোগী এবং মজাদার করে তুলে। চাই তা তরল হোক বা না হোক। আর صبغ তরল বস্তুর সাথে খাস বা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, যার মাঝে রুটি ডুবে যায় এবং ভিন্ন রং ধারণ করে ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, সাধারণগত যা কিছু রুটির সাথে খাওয়া হয় তাই সালন।

শাইখাইন (রহ.) এর দলিল হল : সালন হচ্ছে যা সাধারণভাবে অনুগামীরূপে খাওয়া হয়। আর অনুগামীত্ব হল প্রকৃত পক্ষে মিশ্রণের মধ্যে যা মূল খাদ্যের সাথে লেগে থাকে। আর যা গুণগত দিক দিয়ে সতন্ত্রভাবে খাওয়া হয় না। কিন্তু গোশত ও ডিম বা এ জাতীয় বস্তু এর বিপরীত। কেননা, সেগুলো আলাদাভাবে খাওয়ার প্রচলন আছে। তবে যদি কেহ সালন দ্বারা গোশত ডিম বা অন্য কোন বস্তুর নিয়ত করে তবে তা বিবেচ্য হবে।

قوله : وَ الْغَدَاءُ الْأَكْلُ الخ : যদি কেহ শপথ করে غدا তথা সকালের আহার করবে না তবে তা পূর্ণ হবে যদি সূর্য উদয় থেকে নিয়ে জোহর তথা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত না খায়। তদ্রূপ যদি কেহ শপথ করে عشاء তথা বৈকালিক খাবার খাবে না তাহলে তার শপথ পূর্ণ হবে দ্বিপ্রহর থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত আহার না করা দ্বারা। কেননা, প্রচলিত অর্থে সূর্য হেলে পড়া থেকে বিকাল শুরু হয়। তাই তো হাদীস শরীফে জোহরের নামাজকে বৈকালিক দু নামাজের এক নামাজ বলা হয়েছে। অনুরূপ যদি কেহ শপথ করে سحرى সাহরী খাবে না, তাহলে মধ্য রাত থেকে নিয়ে সোবহে সাদিক পর্যন্ত উদ্দেশ্য হবে। কেননা, সাহরী উক্ত সময়কেই অন্তর্ভুক্ত করে।

إِنْ لَبِسْتُ أَو أَكَلْتُ أَو شَرِبْتُ وَنَوَى مُعَيَّنًا لَم يُصَدَّقْ أَصْلاً وَلَوْ زَادَ ثَوبًا أَو طَعَامًا أَو شَرَابًا دُيِّنَ لَا يَشْرَبُ من دِجْلَةَ على الْكَرْعِ بِخِلَافِ مَاءِ دِجْلَةَ إِنْ لم أَشْرَبْ مَاءَ هذا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَكَذَا وَلَا مَاءَ فيه أو كان فَصُبَّ أو أَطْلَقَ وَلَا مَاءَ فيه لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كان فَصُبَّ حَنِثَ حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ أو لَيَقْلِبَنَّ هذا الْحَجَرَ ذَهَبًا حَنِثَ لِلْحَالِ لَا يُكَلِّمُهُ فَنَادَاهُ وهو نَائِمٌ فَأَيْقَظَهُ أو إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ ولم يَعْلَمْ فَكَلَّمَهُ حَنِثَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهرًا فَهُوَ من حين حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ أو سَبَّحَ لَم يَحْنَثْ يوم أُكَلِّمُ فُلَانًا فَعَلَى الْجَدِيدَيْنِ فَإِنْ نَوَى النَّهَارَ خَاصَّةً صُدِّقَ وَ لَيْلَةَ أُكَلِّمُهُ عَلَى اللَّيْلِ -

অনুবাদ : (যদি কেহ শপথ করে) আমি যদি কাপড় পরিধান করি কিংবা আমি যদি আহার করি অথবা আমি যদি পান করি (তাহলে আমার গোলাম আজাদ কিংবা আমার স্ত্রী আজাদ) আর নির্দিষ্ট কোন কিছুর নিয়ত করে তবে তা মূলগতভাবে সত্যায়ন করা হবে না। তবে যদি কাপড়, খাবার পানীয় ইত্যাদি বৃদ্ধি করে তবে ديانة তাকে সত্যায়ন করা হবে। আর যদি কেহ শপথ করে যে, আমি দজলা থেকে পান করব না তাহলে মুখ লাগিয়ে পান করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে। তবে দজলার পানি পান করব না (বলে শপথ এর ক্ষেত্রে) ব্যতিক্রম। আর যদি কেহ শপথ করে বলে আমি যদি আজ এই পেয়ালা থেকে পানি পান না করি তাহলে এমন (তথা আমার গোলাম স্বাধীন বা স্ত্রী তালাক) আর এই পেয়ালাতে পানি না থাকে অথবা (পানি) ছিল অতঃপর (আজ) তা ফেলে দেয়া হয়েছে তবে (তার শপথ ভঙ্গ হবে না) অথবা মুক্তভাবে শপথ করে (অর্থাৎ পানি পান করা বা না করার ক্ষেত্রে আজ শব্দ উল্লেখ না করে আর পানি না থাকে তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি (দ্বিতীয় সূরতে) পেয়ালাতে পানি থাকে অতঃপর তা ফেলে দেওয়া হয় তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। (যদি কেহ) শপথ করে যে, সে অবশ্যই আকাশে আরোহণ করবে অথবা অবশ্যই এই পাথরকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবে তাহলে সাথে সাথে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (কেহ শপথ করল যে,) সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর তাকে আহ্বান করল এমতাবস্থায় যে সে ঘুমন্ত এবং তাকে (ঘুম থেকে) জাগ্রত করে দিল কিংবা (শপথ করল যে) সে তার অনুমতি ছাড়া তার সাথে কথা বলবে না। সে তাকে অনুমতি দিল কিন্তু সে জানে নাই। অতঃপর তার সাথে না জানা অবস্থায় কথা বলল, তাহলে (উভয় সুরতে) সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি (কেহ শপথ করল যে) এক মাস তার সাথে কথা বলবে না। তাহলে তা শপথ করার সময় থেকে গণ্য হবে। যদি কেহ শপথ করে কথা বলবে না, অতঃপর কুরআন শরীফ অথবা তাসবীহ পাঠ করে তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। (যদি কেহ বলে) যে দিন অমুকের সাথে কথা বলব (সেদিন আমার স্ত্রী তালাক বা গোলাম আজাদ) তবে রাত দিন উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি নির্দিষ্ট করে দিনের নিয়ত করে তবে তা সত্যায়ন করা হবে। (আজ যদি বলে) সে রাত অমুকের সাথে কথা বলব তবে শুধু রাতই অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ إِنْ لَبِسْتُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি বলে আমি পরিধান করি বা আহার করি কিংবা পান করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক বা গোলাম আজাদ। অতঃপর সে বলে আমি এ দ্বারা কিছু নির্দিষ্ট করার নিয়ত করছি অর্থাৎ, কিছু বাদ দিয়েছি আর কিছু উদ্দেশ্য নিয়েছি তাহলে তার নিয়ত সংক্রান্ত কথা দিয়ানত হিসাবে বা মূলগত কোন ক্রমেই গ্রহণ করা হবে না। কেননা, নিয়ত গ্রহণযোগ্য হয় উল্লেখ কৃত বস্তুর ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে পরিধেয় ও অন্যান্য বস্তু প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে হা اقتضاء কাপড় বা অন্যান্য বস্তুর কথা বুঝা যায়। আর যা اقتضاء বুঝা যায় তাতে عمومية (ব্যাপকতা) থাকে না তাই তাতে নির্দিষ্ট করণের নিয়তও সহীহ হবে না। আর যদি শপথের সাথে কাপড়, খাবার বা পানিয় ইত্যাদি উল্লেখ করে আর তার নিয়ত দ্বারা তা নির্দিষ্ট করে তবে দিয়ানত হিসাবে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু আইনগত ক্ষেত্রে এ বিশিষ্টতা গ্রহণ করা হবে না। কেননা, শব্দটি عام অনির্দিষ্ট। তাই নির্দিষ্ট করণের নিয়ত বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী হওয়ার কারণে قضاء তা ধর্তব্য নয়।

قوله : لَايَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে যদি কেহ শপথ করে বলে যে, সে দজলা থেকে পান করবে না। অতঃপর সে মুখ লাগানো ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় তথা পাত্র দ্বারা পানি তুলে পান করল। তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পান করলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারা বলেন, প্রচলন অনুযায়ী পাত্র দ্বারা পান করাই বোধগম্য। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'থেকে' من অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপক। আর মুখ লাগিয়ে পান করাই হল তার প্রকৃত অর্থ আর তা ব্যবহৃত হয়। এজন্য প্রকৃত অর্থ গ্রহন করা সম্ভব অবস্থায় রূপক অর্থ গ্রহণের দিকের ধাবিত হয় না বরং রূপক অর্থ গ্রহণকে রোধ করবে। যদিও তা প্রচলিত থাকে। আর যদি সে বলে আমি দজলার পানি থেকে পাত্র করব না, অতঃপর পাত্র দ্বারা দজলা থেকে পানি নিয়ে পান করল। তা হলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, দজলার পানি পাত্রস্থ হওয়ার পরও তার পরিচিত দজলার সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। আর তাই হল শপথ ভঙ্গের শর্ত। আর তা এমন হল যেমন সে দজলা থেকে প্রবাহিত নদী থকে পানি পান করল। আর এ সূরতেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তেমনি দজলা থকে যেভাবেই পান করুক তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قوله : إِنْ لَمْ أَشْرِبْ مَاءَ هٰذَا الكُوْزِ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, যদি কেহ বলে যে, এই পাত্রে যা পানি আছে তা যদি আমি আজ পান না করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক বা আমার গোলাম আজাদ, অথচ উক্ত পাত্রে পানি নেই, তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না এবং তার স্ত্রী তালাক হবে না বা তার গোলাম স্বাধীন হবে না। অনুরূপ যদি পাত্রে পানি থাকে আর ঐ পানি রাত্র হওয়ার আগে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সর্বসুরতে দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ মতানৈক্য যদি আল্লাহর নামে শপথ করে।

মত পার্থক্যের মূল এই যে, তরফাইন (রহ.) এর মতে শপথ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল শপথ পূর্ণ করা সম্ভব হওয়া। অর্থাৎ, শপথ সংঘঠিত হওয়া এবং তা অব্যাহত থাকার জন্য শর্ত হচ্ছে শপথ রক্ষা করার সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে শপথ সহীহ হওয়ার জন্য শপথ পূর্ণ করা সম্ভব হওয়া শর্ত নয়। তিনি বলেন শপথ সংগঠিত হওয়ার কথা এভাবে বলা সম্ভব যে, তা পূর্ণ করা এমনভাবে ওয়াজিব যে তার প্রকাশ ঘটবে স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে। তা হলো কাফফারা। আর তরফাইন (রহ.) এর কথা হচ্ছে বস্তুর মূলের সম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যাতে শপথটি স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে।

قوله : أَوْ أَطْلَقَ وَ لَا مَاءَ فِيْهِ الخ : আর যদি মুক্তভাবে শপথ করে অর্থাৎ শপথের ক্ষেত্রে اليوم 'আজ' শব্দ উল্লেখ করে না। আর পাত্রে পানি থাকে না, তাহলে তরফাইন (রহ.) এর পূর্বোক্ত দলিলের ভিত্তিতে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি শপথের সময় পাত্রে পানি

থাকে, আর তা ফেলে দেয়া হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শপথ ভেঙ্গে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে আজ শব্দ উল্লেখ ও উল্লেখ না করার ক্ষেত্রে পার্থক হচ্ছে যদি আজ শব্দ উল্লেখ করে তবে দিনের শেষে শপথ ভঙ্গ হবে। আর যদি আজ শব্দ উল্লেখ করে না, তবে শপথ করার সাথে সাথে তা পূর্ণ করা আবশ্য হয়ে যায়। তাই সঙ্গে সঙ্গেই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তরফাইন (রহ.)ও অনুরূপ বলেন যে, এক্ষেত্রে শপথের বক্তব্য থেকে অবসর হওয়া মাত্র শপথ পূর্ণ করা আবশ্যক। এখন পানি পড়ে যাওয়ার কারণে যদি শপথ বাস্তবায়ন করতে না পারে তবে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। যেমন যদি পাত্রে পানি থাকা অবস্থায় শপথকারী মৃত্যুবরণ করে। তাহলে তাকে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। আর আজ শব্দ উল্লেখকৃত শপথের ক্ষেত্রে দিনের শেষ মুহূর্তে গিয়ে শপথ পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। আর তাহল শপথ পূর্ণ করার স্থলই বাকী থাকে না। পাত্রে পানি না থাকার কারণে সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। তাই তখন শপথ পূর্ণ করা আবশ্যক নয় এবং শপথ বাতিল হয়ে যাবে। যেরূপ পাত্রে পানি না থাকার সুরতে শুরু থেকেই শপথ সংগঠিত হয় না।

قوله : حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, আমি আসমানে আরোহণ করব কিংবা শপথ করে যে, এই পাথরকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করব, তাহলে শপথ সংঘঠিত হবে এবং সাথে সাথে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, তার শপথ সংগঠিত হবে না। কেননা, তা স্বভাবতঃ অসম্ভব। সুতরাং তা প্রকৃত অসম্ভবের সাদৃশ্য হবে। তাই শপথ সংগঠিত হবে না।

আমাদের দলিল : স্বয়ং এসব বিষয় সংগঠিত হওয়া সম্ভব। আর শপথ সংগঠিত হওয়ার জন্য স্বয়ং সম্ভব হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ, আলোচিত বিষয়গুলো স্বয়ং অসম্ভব নয়। কারণ ফেরেশতারা প্রতিদিন আকাশে উঠেন। হযরত ইদরিস (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। হুজুর (সা.)-কেও মেরাজে আকাশ পথে নেয়া হয়েছে। সুতরাং যদি আকাশে আরোহণ স্বয়ং অসম্ভব হতো তবে কোন সৃষ্টিজীবদের তাতে উঠার প্রমাণ থাকতো না। অনুরূপভাবে পাথর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার দ্বারা স্বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। আর সম্ভাব্যতা যখন বিদ্যমান হলো তখন ইয়ামিনটি তার স্থলবর্তী কাফফারাকে ওয়াজিবকারী অবস্থায় সংগঠিত হয়ে যাবে। অতঃপর বিদ্যমান স্বভাবতঃ অক্ষমতার কারণে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قوله : لَا يُكَلِّمُهُ فَنَادَاهُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর অমুক ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় তাকে ডাক দিল এবং ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি সে জাগ্রত না হয় তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, যদি সে জাগ্রতই না হয় তবে তা এমন হল যে, তাকে দূর থেকে ডাক দিল আর সে এমন দূরত্বে রয়েছে যে, সে তার আওয়াজ শুনতে পারে না।

আর অনেক মাশায়েখে কেরাম জাগ্রত করাকে শর্ত করেন নি। যেমন, ইমাম কুদুরী (রহ.) বলেন, কেহ যদি শপথ করে যে, অমুকের সাথে কথা বলবে না, অতঃপর তার সাথে এমনভাবে কথা বলে যে, সে তা শুনতে পারে, কিন্তু সে ঘুমন্ত। তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। নিহায়া গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা করেন যে, تكلم বলা হয় استماع الكلام কে। যেরূপ নিজের সাথে বলার মর্ম হয়, নিজেকে নিজের কথা শুনানো। কিন্তু অন্য কাউকে এটি শুনানো অস্পষ্ট বিষয়। তাই استماع হাসিল হওয়ার সববকে এর স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে مخاطب এমন জায়গাতে হওয়া যে, যদি সে متكلم এর প্রতি কান দেয় এবং শুনতে কোন বাধা না থাকে তবে শুনে ফেলবে। কিন্তু সে অন্য মনস্কতার কারণে তা বুঝতে পারল না।

قوله : أَوْ إِلَّا بِإِذْنِهِ الخ : পূর্বোক্ত মাসআলার ন্যায় যদি কেহ শপথ করে যে, অমুকের অনুমতি ছাড়া তার সাথে কথা বলবে না অতঃপর অমুক তাকে অনুমতি দিয় দেয়, কিন্তু শপথকারী তা জানতে পারেনি এবং অনুমতির কথা না জানা অবস্থায় সে অমুকের সাথে কথা বলল, তাহলেও তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, অনুমতি বলা হয় অবহিত হওয়া বা তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে। আর তার কোনটিই শ্রবণ ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম

আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, অনুমতির অর্থ হচ্ছে বাধামুক্তি। আর তাতো এককভাবে অনুমতি দাতার দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যেমন, সন্তুষ্টি এককভাবে সন্তুষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়।

قوله : لَايُكَلِّمُهُ شَهرًا الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, সে এক মাস অমুকের সাথে কথা বলবে না তাহলে তা শপথ করার সময় থেকে গণ্য হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে যদি সে সময় তথা মাস উল্লেখ করত না তাহলে শপথ চিরস্থায়ী হয়ে যেত। সুতরাং মাস উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাস পরবর্তী সময়কে শপথ থেকে বাদ দেয়া। সুতরাং অবস্থা অনুযায়ী শপথ সংলগ্ন সময়কে তার অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। তবে আলোচ্য মাসআলা মাসআলার বিপরীত, এ তাহল যদি শপথ করে যে আমি এক মাস রোজা রাখবো। কেননা, এক্ষেত্রে যদি সে মাস উল্লেখ নাও করত তবুও শপথ চিরস্থায়ী হতো না। সুতরাং এখানে মাস উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রোযার মেয়াদ উল্লেখ করা। আর তার সময় যেহেতু অনির্দিষ্ট, তাই তা নির্ধারণের ভার শপথকারীর উপর ন্যাস্ত থাকবে।

قوله : لَايَتَكَلَّمُ فَقَرأَ الْقُرْاٰنَ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে কথা বলবে না। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করে অথবা তাসবীহ পাঠ করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তা নামাযের ভেতরে হোক বা বাহিরে হোক। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবী হল সে শপথ ভঙ্গকারী হওয়া আর তা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অভিমত। কেননা, তাও তো প্রকৃতপক্ষে কথা। আমাদের দলিল হল : প্রচলনগতভাবে বা শরয়ীভাবে নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত কথা নয়। কেননা, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন :

إِنَّ صَلَاتَنَا لَايَصْلِحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

'আমাদের এ নামাযে মানুষের কোন কথা সমীচীন নয়।'

আর নামাযের বাহিরে তেলাওয়াত বা তাসবীহ পাঠের কারণে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, প্রচলনগত দিক থেকে তেলাওয়াত বা তাসবীহ পাঠকে কথা বলা হয় না। বরং তেলাওয়াতকারীকে ক্বারী আর তাসবীহ পাঠকারীকে জিকিরকারী বলা হয়ে থাকে।

قوله : يَومَ اُكَلِّمُ فُلَانًا الخ : যদি কেহ শপথ করে বলে যে, যেদিন অমুকের সাথে কথা বলব সে দিন আমার স্ত্রী তালাক বা আমার গোলাম আজাদ তাহলে দিবা-রাত্রির পূর্ণ সময়ের সাথে শপথের সম্পর্ক হবে। অর্থাৎ, যদি শপথকারী অমুকের সাথে রাত্র বা দিনে কথা বলে তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে বা গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, দিন শব্দটি যখন অপ্রলম্বিত ক্রিয়া فعل غير ممتد এর সাথে যুক্ত হয় তখন সাধারণ সময় উদ্দেশ্য হয়। (যা তালাকের অধ্যায় আলোচনা হয়েছে) আর কথা প্রলম্বিত কর্ম নয়। আর যদি শপথকারী يوم (দিন) দ্বারা نهار (দিন) নিয়ত করে তবে তা আইনগত قضاء গ্রহণ করা হবে। কেননা, তার প্রয়োগ সূর্য উদয় থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কেও বলা হয়ে থাকে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তা قضاء আইনগত দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তা প্রচলনের বিপরীত। আর যদি বলে রাত্রে অমুকের সাথে কথা বললে এই এই, তাহলে শুধু রাত্রকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ ক্ষেত্রে দিনও অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে অন্ধকার অংশ আর তা শুধু রাত্র। যেমন দিন এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আলোকিত অংশ। আর ليل তথা রাত শব্দ দ্বারা সাধারণ সময় বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না এবং তা প্রচলনও নয়।

إِنْ كَلَّمْتُهُ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَيْدٌ أَوْ حَتّٰى أَوْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَوْ حتى فَكَذَا فَكَلَّمَ قبل قُدُومِهِ أَوْ إِذْنِهِ حَنِثَ وَبَعْدَهُمَا لَا وَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ سَقَطَ الْحَلِفُ لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارَهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ إِنْ أَشَارَ أَوْلَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ إِنْ أَشَارَ وَزَالَ مِلْكُهُ وَفَعَلَ لم يَحْنَثْ كَالْمُتَجَدِّدِ وَإِنْ لم يُشِرْ لَا يَحْنَثُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَحَنِثَ بِالْمُتَجَدِّدِ وَفِي الصَّدِيقِ وَالزَّوْجَةِ حَنِثَ فِي الْمُشَارِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَفِي غَيْرِ الْمُشَارِ لَا وَحَنِثَ بِالْمُتَجَدِّدِ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هذا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ فَكَلَّمَهُ حَنِثَ وَالزَّمَانُ وَالْحِينُ وَ مُنَكَّرُهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالدَّهْرُ وَالْأَبَدُ الْعُمُرُ وَدَهْرٌ مُجْمَلٌ وَالْأَيَّامُ وَأَيَّامٌ كَثِيرَةٌ وَالشُّهُورُ وَالسِّنُونَ عَشَرَةٌ وَمُنَكَّرُهَا ثَلَاثَةٌ

অনুবাদ : (কেহ শপথ করল যে,) আমি অমুকের সাথে কথা বলব না তবে যদি যায়েদ আসে কিংবা যে পর্যন্ত না যায়েদ আসে অথবা (আমি অমুকের সাথে কথা বলব না) তবে (যদি) যায়েদ অনুমতি প্রদান করে কিংবা সে পর্যন্ত না যায়েদ অনুমতি প্রদান করবে। তাহলে এমন (তথা শপথ ভঙ্গ) অতঃপর যায়েদের আগমনের বা অনুমতি প্রদানের পূর্বে (অমুকের সাথে) কথা বলে তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর আগমনের বা অনুমতির পর কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি (আগন্তুক বা অনুমতি দাতা) যায়েদ মৃত্যুবরণ করে তবে শপথ রহিত হয়ে যাবে। (যদি কেহ শপথ করে) সে তার (অমুকের) খাবার খাবে না, অথবা তার (অমুকের) ঘরে প্রবেশ করবে না কিংবা তার (অমুকের) কাপড় পরিধান করবে না অথবা তার (অমুকের) বাহনে আরোহণ করবে না কিংবা তার (অমুকের) গোলামের সাথে কথা বলবে না। যদি তার দিকে ইঙ্গিত করে। আর অমুকের মালিকানা (বিক্রি বা দান ইত্যাদির মাধ্যমে) শেষ হয়ে যায়। অতঃপর শপথকারী তা করে তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। যেমন শপথ ভঙ্গকারী হবে না অমুকের নতুন কিছু অর্জন করার ক্ষেত্রে। আর যদি ইঙ্গিত করে না তবে মালিকানা শেষ হওয়ার পর (শপথকৃত বিষয়টি শপথকারী করে ফেললে) শপথ ভঙ্গ হবে না। আর অমুকের নতুন কিছু অর্জন করার ক্ষেত্রে (শপথকারী এ নতুন বিষয়টি করে ফেললে) শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর শপথকারীর ইঙ্গিত করার ক্ষেত্রে তা (অমুকের থেকে) শেষ হওয়ার পরও (অমুকের) বন্ধু ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে (সাথে কথা বলাতে) শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইঙ্গিতহীন অবস্থায় শপথ ভঙ্গ হবে না। (অর্থাৎ, ইঙ্গিত দ্বারা অমুকের বন্ধু বা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করার সুরতে বন্ধুত্ব বা স্ত্রীত্ব শেষ হলে পর তার সাথে কথা বলাতে শপথ ভঙ্গ হবে না।) আর এক্ষেত্রে (ইঙ্গিতহীন অবস্থায়) অমুকের নতুন বন্ধু বা স্ত্রীর সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আর যদি কেহ শপথ করে) এই চাদরের মালিকের সাথে কথা বলবে না। অতঃপর সে চাদর বিক্রি করে দিল। তারপর শপথকারী তার সাথে কথা বলল, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। আর শপথের মধ্যে زمان বা حين নির্দিষ্ট (معرفة) অনির্দিষ্ট (نكرة) এর মিয়াদ ছয় মাস হবে। আর الدهر এবং الابد (তা معرفة নির্দিষ্ট হলে) তার মিয়াদ চিরকাল হবে। আর دهر (তা نكره অনির্দিষ্ট হলে) তা مجمل (সংক্ষেপিত)। আর الايام - ايام كثير ও الشهور এবং السنون (তা معرفة নির্দিষ্ট হলে) তার দ্বারা দশ দশ উদ্দেশ্য হবে। আর তা نكره (অনির্দিষ্ট) দ্বারা তিন তিন উদ্দেশ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَإِنْ كَلَّمْتُهُ إِلَّا أَنْ يَّقْدَمَ الخ : উক্ত বাক্যের মোট চারটি সুরত হতে পারে। ১। কেহ শপথ করল ان كلمت فلانا الا ان يقدم زيد আমি অমুকের সাথে কথা বলবো না তবে যদি যায়েদ আসে। ২। কেহ শপথ করল مَا كَلَّمْتُ فُلَانًا حَتّٰى يَقْدَمَ زَيْدٌ আমি অমুকের সাথে কথা বলবো না যে পর্যন্ত না যায়েদ আসে। ৩। কেহ শপথ করল اِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا اِلَّا اَنْ يَاْذَنَ زَيْدٌ আমি অমুকের সাথে কথা বলবো না তবে যদি যায়েদ অনুমতি দেয়। ৪। কেহ শপথ করল اِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا حَتّٰى يَاْذَنَ زَيْدٌ আমি অমুকের সাথে কথা বলবো না যে পর্যন্ত না যায়েদ অনুমতি দিবে। সুতরাং এ সুরতসমূহের মধ্যে যদি শপথকারী যায়েদের আগমনের বা অনুমতি প্রদানের পূর্বে কথা বলে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি যায়েদের আগমনের বা তার অনুমতির পর কথা বলে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, আগমন ও অনুমতি প্রদান হচ্ছে শপথ রক্ষা করার সীমা। আর সীমার পূর্ব পর্যন্ত শপথ অব্যহত থাকে এবং সীমার পরে সমাপ্তি লাভ করে। সুতরাং শপথের সমাপ্তির পর কথা বলা দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয় না। আর যদি আগমনকারী বা অনুমতি দাতা মৃত্যুবরণ করে তাহলে শপথ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, শপথ রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে শপথ রহিত হবে না, বরং চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

আমাদের দলিল : শপথকারীর জন্য নিষিদ্ধ হচ্ছে তা যার নিষিদ্ধতা আগমন বা অনুমতি দান দ্বারা সমাপ্তি লাভ করবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তার সম্ভাব্যতা বাকী থাকেনি। এজন্য আমরা বলি যে, শপথ রহিত হয়ে যাবে।

قوله : لَايَاْكُلُ طَعَامَ فُلَانٍ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে অমুকের খাবার খাবে না বা অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। অথবা অমুকের কাপড় পরিধান করবে না কিংবা অমুকের বাহনে আরোহণ করবে না। অতঃপর যদি অমুকের মালিকানা থেকে নিঃশেষ হয়ে যায় আর শপথকারী বাহনে আরোহণ করে কিংবা ঘরে প্রবেশ করে বা কাপড় পরিধান করে তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, সে তার শপথকে এমন ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে যা অমুকের সাথে সম্বন্ধিত পাত্রের সাথে সম্পর্কের সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট। আর সে ক্রিয়া সংঘটিত করার সময় এই সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি শপথের সময় ইশারা করে যেমন আমি অমুকের এই ঘরে প্রবেশ করব না ইত্যাদি। অতঃপর অমুকের সাথের বন্ধন বা সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর শপথকারী তার সাথে ক্রিয়া করে ফেলল তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এসবের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেই উদ্দেশ্য করা সম্ভব। আর যখন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা সম্ভব তখন ইশারা দ্বারা নির্ধারণ করার সুরতে অমুকের সাথে বন্ধনের গুণটি অনর্থক হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইশারা করুক বা না করুক সর্ব অবস্থায় যদি অমুকের সাথে বন্ধন নিঃশেষ হওয়ার পর শপথকারী নিজের উপর যা শপথের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করেছে তা বাস্তবায়িত করে ফেলে তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এর কারণ হচ্ছে, এই সম্পর্ক শুধু পরিচয়ের জন্য। মূল উদ্দেশ্য তো হল, উক্ত দুই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাই শপথ ভঙ্গের জন্য উক্ত সম্পর্ক বহাল থাকা জরুরী নয়। সুতরাং ইশারা করার সুরতের ন্যায় হুকুম ব্যক্তির উপর হবে।

قوله : اَوْلَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ الخ : অনুরূপ যদি কেহ শপথ করে যে, অমুকের গোলামের সাথে কথা বলবে না ইশারা করে, যেমন আমি অমুকের এই গোলামের সাথে কথা বলব না এবং গোলামের দিকে কিংবা ইশারা ছাড়া যেমন আমি অমুকের গোলামের সাথে কথা বলব না। অতঃপর অমুকের মালিকানা থেকে এ গোলাম বের হয়ে গেল। তারপর শপথকারী তার সাথে কথা বলল। তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হবে না। ইশারা না করার সুরতে তো স্পষ্ট। কেননা, সে তার শপথকে এমন ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা অমুকের সাথে সম্বন্ধিত পাত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তা হচ্ছে মালিকানার সম্পর্কের সম্বন্ধ। আর কথা বলার সময় তো এই সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল না, তাই কসম ভঙ্গ হবে না। আর ইশারার সুরতেও শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা গোলামদের সাথে কথা বলা বর্জন করা হয় না তাদের সত্তাগত কারণে। কেননা, তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা হয় না। তাছাড়া

সে নিম্ন শ্রেণীর হওয়ার কারণেও কথা বলা বর্জন করা হয়না। বরং মনিবের মাঝে নিহিত কোন কারণেই বর্জন করা হয়। সুতরাং মালিকানা বিদ্যমান থাকা অবস্থার সাথেই কসমটি বন্ধন যুক্ত হবে।

قوله : لَايُكَلِّمُ صَاحِبَ هٰذَا الطَّيْلَسَانِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, আমি এ জুব্বাধারীর সাথে কথা বলব না। অতঃপর সে জুব্বা বিক্রয় করে ফেলল। আর সে তার সাথে কথা বলল, তাহলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, এই সম্বন্ধের উল্লেখ পরিচয় ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা, মানুষ জুব্বার সাথে সম্পৃক্ত কোন কারণে কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে না।

قوله : وَ الزَّمَانُ وَ الْحِيْنُ الخ : আর যদি কেহ আরবী ভাষায় বলে- لَا اُكَلِّمُهُ حِيْنًا اَوْ زَمَانًا اَوِ الْحِيْنَ اَوِ الزَّمَانَ আমি তার সাথে কথা বলব না বিশেষ কালে কিংবা বিশেষ সময়ে, তাহলে এ শপথের মিয়াদ ছয় মাস হবে। এতে زمان বা حين শব্দদ্বয় معرفه বা نكره যে কোনভাবে উল্লেখ করা হোক। কেননা বিশেষ সময় দ্বারা কখনো সামান্য সময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ উক্ত আয়াতে নামাজের সময়কে বুঝানো হয়েছে। আবার কখনো অনেক দীর্ঘ সময় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন : هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ। উক্ত আয়াতে মুফাসসিরিনে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেহ বলেন, গর্ভস্থ সময়, কেহ বলেন, হাজার বৎসরও হতে পারে। সর্বোপরি এতে দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে। আবার কখনো ছয় মাসও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ উক্ত আয়াতে ছয় মাসই বুঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং উচ্চারিত زمان বা حين কে উক্ত ছয় মাসের অর্থের দিকে ধাবিত করা হবে। কেননা, এখানে কথা বলা থেকে বারণ অতি সল্প সময়ের জন্য হয় না। কেননা তা তো সর্বদার স্থলবর্তী। আর যদি সে বিশেষ সময় উল্লেখ না করতো তবে তো সর্বদার জন্য হয়ে যেতো। সুতরাং বিশেষ সময়ের অর্থ মধ্যবর্তী তথা ছয়মাসের অর্থই উদ্দেশ্য হবে। আর ছয় মাসের সিদ্ধান্ত তখনই হবে যখন তার কোন নিয়ত না থাকে। আর যদি কোন সময়ের নিয়াত করে থাকে তাহলে যা নিয়ত করেছে তাই ধর্তব্য হবে।

قوله : وَ الدَّهْرُ الخ : دهر (কাল) শব্দটি যদি ال যুক্ত নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হয়, তবে এক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থে এটা দ্বারা স্থায়ীকাল বোঝানো হয়। আর তা نكره তথা অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল ছয় মাস। কেননা তখন তা حين বা زمان এর সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। আর الابد শব্দটি نكره বা অনির্দিষ্ট হোক বা معرفة বা নির্দিষ্ট হোক তা দ্বারা চিরস্থায়ীকাল বুঝানো হবে।

قوله : وَ الايام و ايام كثيرة الخ : আর যদি শপথকারী الايام বা ايام كثيرة বা الشهور বা السنون ব্যবহার করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে الايام এর ক্ষেত্রে দশ দিন আর الشهور এর ক্ষেত্রে দশ মাস আর السنون এর ক্ষেত্রে দশ বৎসর উদ্দেশ্য হবে। কেননা তা হল নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক বহুবচন। সুতরাং বহুবচন দ্বারা যে সখ্যা বোঝানো হয় তার সর্বোচ্চ পরিমাণ উদ্দেশ্য হবে। আর তা হল দশ। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে الايام এর ক্ষেত্রে এক সাপ্তাহ আর الشهور এর ক্ষেত্রে চার মাস। কেননা, দিন যেহেতু সাপ্তাহ আর মাস যেহেতু বৎসরে আবর্তীত হয় সেহেতু নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক ال দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হবে। আর السنون এর ক্ষেত্রে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। এজন্য পূর্ণ জীবনের উপর ধর্তব্য হবে। আর আলোচ্য শব্দসমূহকে نكره ভাবে উল্লেখ করা হয় তাহলে প্রত্যেক শব্দকে তিন এর উপর প্রজোয্য করা হবে। কেননা বহুবচনের সর্বনিম্ন হচ্ছে তিন। والله اعلم -

بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ

পরিচ্ছেদ : মুক্তিদান ও তালাক সংক্রান্ত শপথ

إِنْ وَلَدْتِ فَأَنْتِ كَذَا حَنِثَ بِالْمَيِّتِ بِخِلَافِ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَيُّ وَحْدَهُ أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدًا عَتَقَ وَلَوْ مَلَكَ عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ آخَرَ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُم وَلَوْ زَادَ وَحْدَهُ عَتَقَ الثَّالِثُ فَلَوْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ عَبْدًا فَمَاتَ لَمْ يَعْتِقْ فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْآخَرُ مُذْ مَلَكَ -

অনুবাদ : যদি তুমি সন্তান প্রসব কর তবে তুমি এরূপ (অর্থাৎ, তুমি তালাক) তাহলে মৃত সন্তান প্রসব দ্বারা সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। (অর্থাৎ তালাক পতিত হবে।) তবে তা ব্যতিক্রম (যদি মনিব বলে) তাহলে সে (সন্তান) স্বাধীন। অতঃপর দাসী মৃত ছেলে সন্তান প্রসব করে তারপর জীবিত সন্তান প্রসব করে তাহলে শুধু জীবিত সন্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। (আর যদি কেহ বলে) আমি যে গোলামের প্রথম মালিক হব সে স্বাধীন। অতঃপর সে একটি গোলামের মালিক হল তাহলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি এক সাথে দু গোলামের মালিক হয় অতঃপর অন্য (তৃতীয়) একটি গোলামের মালিক হল তাহলে তাদের কোনটি আজাদ হবে না। আর যদি وحده (একক) শব্দ বাড়িয়ে দেয় (অর্থাৎ তার বক্তব্যে فهو حر وحده বলে) তাহলে তৃতীয় গোলামটি স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি বলে শেষ যে গোলামটির মালিক হব সে স্বাধীন। অতঃপর সে একটি গোলামের মালিক হল। তারপর শপথকারী মৃত্যুবরণ করল। তাহলে উক্ত গোলামটি স্বাধীন হবে না। আর যদি একটি গোলাম খরিদ করে অতঃপর আর একটি গোলাম খরিদ করে তারপর শপথকারী মৃত্যুবরণ করে তাহলে দ্বিতীয় গোলামটি মালিক হওয়ার সময় থেকে স্বাধীন হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : إِنْ وَلَدْتَ فَأَنْتِ كَذَا الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যদি তুমি সন্তান প্রসব কর তাহলে তুমি তালাক। অতঃপর স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করল তাহলে স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি রয়েছে। আর তা হল : যদি কেহ মৃত সন্তান প্রসব করে তাহলে উক্ত সন্তান তার নিজ ব্যাপারে সন্তান হবে না। এজন্য তার নাম রাখা যাবে না। তাকে গোসল দিতে হয় না। তার উপর নামাজে জানাযা পড়তে হয় না। সে ওয়ারিসও হবে না। তার ব্যাপারে ওয়াসিয়াত জারী হবে না এবং সে আজাদ হবে না। কিন্তু উক্ত মৃত সন্তান অন্যের ব্যাপারে সন্তান হওয়ার হুকুমে বিদ্যমান থাকবে। তাই যদি তার মা গর্ভবতী হয় আর তালাক প্রাপ্তা হয় তাহলে তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। উক্ত সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত আসে তা নেফাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তার মা দাসী হয় তবে সে মনিবের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি সন্তান প্রসবের সাথে তালাক শর্তযুক্ত হয় কিংবা দাসীর স্বাধীনতা সম্পৃক্ত হয় তাহলে

তার জন্মে তার মা তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তা মৃত হলেও প্রচলনগতভাবে তাকে সন্তানই বলা হয়ে থাকে এবং শরীয়াত ও তাকে সন্তান হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং সন্তান জন্ম দানের শর্ত বিদ্যমান হবে।

قوله : بِخِلَافِ فَهُوَ حُرٌّ الخ : আর যদি কেহ বলে তার দাসীকে, তুমি যে সন্তান প্রসব করবে সে আজাদ। অতঃপর দাসী মৃত সন্তান প্রসব করল তাহলে উক্ত সন্তান স্বাধীন বলে গণ্য হবে না। কেননা, মৃত সন্তান প্রসব দ্বারা যদি অন্যের মধ্যে হুকুম বিস্তার করতে সক্ষম কিন্তু নিজের ব্যাপারে তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন হুকুম প্রযোজ্য হবে না যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর যদি উক্ত দাসী প্রথমে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে অতঃপর জীবিত একটি সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে দ্বিতীয় সন্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে কোনটিই স্বাধীন হবে না।

তাদের দলিল হল : দাসীর মৃত সন্তান প্রসবের সাথে তার শপথও শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং ফলাফল ছাড়াই শপথ শেষ হয়ে যাবে। কেননা, মৃত সন্তান আজাদ হওয়ার পাত্র নয়। আর তাই ছিল শপথের ফলাফল দ্বিতীয় সন্তানের সাথে শপথ আর সম্পৃক্ত হবে না। প্রথম সন্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : সন্তান বলতে স্বাধারণত প্রাণ গুণের সাথে সম্পৃক্ত সন্তানকে বুঝানো হয়। আর শপথকারী শপথের ফলাফলরূপে মুক্তি সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। আর এটা হচ্ছে বিধানগত শক্তি যা অন্যের হস্তক্ষেপ রোধ করার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। আর এ গুণ মৃতের মাঝে সাব্যস্ত হয় না। তাই তা প্রাণ গুণের সাথে বিশিষ্ট হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন হল যে মনিব বলেছে যদি তুমি জীবিত সন্তান প্রসব কর তবে সে স্বাধীন। তাই প্রসবকৃত দ্বিতীয় জীবিত সন্তানটি স্বাধীন হয়ে যাবে। আর প্রথমে যা প্রসব করেছে তা মৃত হওয়ার দরুন তার সাথে শপথ সম্পৃক্ত হবে না।

قوله : أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ الخ : আর যদি কেহ বলে আমি প্রথম যে গোলামের মালিক হব সে আজাদ তাহলে উক্ত ব্যক্তি প্রথমে যে গোলামের মালিক হবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত গোলামের সে তো প্রথমেই মালিক হল। আর শপথকেও প্রথমের সাথে শর্তযুক্ত করেছে। আর যদি সে এক সাথে দুটি গোলামের মালিক হয় তাহলে কোনটিই স্বাধীন হবে না। অনুরূপভাবে যদি তার পরে অন্য আরেকটি গোলামের সে মালিক হয় তবুও সে স্বাধীন হবে না। কেননা প্রথম দুটিতে একত্ব নেই। আর তৃতীয়টিতে পূর্ববর্তীতা নেই। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে 'প্রথমত' শর্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর যদি শপথকারী তার শপথে وحده বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ, যদি সে বলে আমি প্রথম যে গোলামটির এককভাবে মালিক হবো সে আজাদ। তাহলে তৃতীয় গোলামটি স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা এর অর্থ হলো মালিক হওয়ার অবস্থায় এককত্ব। আর তৃতীয় গোলামটির মধ্যে এককত্ব পাওয়া যাওয়ার কারণে সে আজাদ হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ الخ : আর যদি কেহ বলে শেষ যে গোলামটির মালিক হব সে আজাদ। অতঃপর সে একটি গোলামের মালিক হল এবং শপথকারী মৃত্যুবরণ করল তাহলে গোলামটি আজাদ হবে না। কেননা, এখানে শেষ পাওয়া যায়নি কেননা শেষ হতে হলে তার পূর্বে এক জাতীয় কোন কিছু বিদ্যমান থাকবে। এবং তা পরবর্তী হবে। সুতরাং যা পরবর্তী হবে তা শেষ বলে গণ্য হবে। অথচ এক্ষেত্রে মালিক হওয়া গোলামের পূর্ববর্তী কোন গোলাম নেই। যার দরুন সে পরবর্তী হলো না। এজন্য উক্ত গোলাম স্বাধীন হবে না। আর যদি সে প্রথমে একটি গোলামের মালিক হওয়ার পর অন্য একটি গোলামের মালিক হল। অতঃপর মনিব মৃত্যুবরণ করে। তাহলে দ্বিতীয় গোলামটি স্বাধীন হয়ে যাবে। আর এ আজাদী ধর্তব্য হবে মনিব যেদিন এ দ্বিতীয় গোলামের মালিক হল সেদিন থেকে এবং মনিবের সমগ্র মাল থেকে তার মুক্তি বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যেদিন মনিবের মৃত্যু হল তখন থেকে তার আজাদী সংঘটিত হবে এবং মনিবের মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে তার আজাদী ধর্তব্য হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল হল : দ্বিতীয় গোলামের মধ্যে শেষোক্ত গুণটি সম্পৃক্ত হবে যখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে একথা জানা যাবে না যে, তার পরে অন্য কোন গোলাম খরিদ করা হবে না। আর সেটা মনিবের মৃত্যুর পরই সাব্যস্ত হল যে, সে-ই সর্বশেষ মনিবের মালিকানাভুক্ত গোলাম। এজন্য তার আজাদী মনিবের মৃত্যুর সময়ই ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ, মনিবের শর্তটি মনিবের মৃত্যুর সময়ই সম্পন্ন হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : এ গোলামের ক্ষেত্রে শেষোক্ত গুণ এর পরিচায়ক হচ্ছে মনিবের মৃত্যু। আর গোলামের এ গুণ সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে ক্রয়ের সময়কাল থেকে সাব্যস্ত হবে। এজন্য আমরা বলি যে, গোলামের ক্রয় থেকে তথা মালিক হওয়া থেকেই তার স্বাধীনতা সাব্যস্ত হবে, যা মনিবের মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কার্যকর হবে।

আর যেহেতু আজাদী তার ক্রয়ের সময় থেকে ধর্তব্য হয়েছে। তাই সে মনিবের সমগ্র সম্পত্তি থেকে আজাদ হবে। যা অসিয়তের সাথে সাদৃশ্যশীল হবে না।

كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِكَذَا فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّرَهُ ثَلَاثَةٌ مُتَفَرِّقُونَ عَتَقَ الْأَوَّلُ وَإِنْ بَشَّرُوهُ مَعًا عَتَقُوا وَصَحَّ شِرَاءُ أَبِيهِ لِلْكَفَّارَةِ لَا شِرَاءُ مَن حَلَفَ بِعِتْقِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ إِنْ تَسَرَّيْتُ أَمَةً فَهِيَ حُرَّةٌ صَحَّ لَو فِي مِلْكِهِ وَإِلَّا لَا كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَتَقَ عَبِيدُهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ لَا مُكَاتَبُهُ هذه طَالِقٌ أو هذه وَهَذِهِ طُلِّقَتِ الْأَخِيرَةُ وَخُيِّرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَكَذَا الْعِتْقُ وَالْإِقْرَارُ -

---

অনুবাদ : (যদি কেহ বলে) অমুক বিষয়ে আমাকে যে গোলাম সুসংবাদ শুনাবে সে আজাদ। অতঃপর পৃথক পৃথকভাবে তিনজন গোলাম তাকে সুসংবাদ শুনাল তাহলে প্রথম জন স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যদি সবাই এক সাথে সুসংবাদ শুনায় তাহলে সবাই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর কাফফারা আদায়ের জন্য পিতাকে ক্রয় করা সহীহ। কিন্তু যদি কোন গোলামের আজাদকে নিজের ক্রয়ের সাথে শর্তযুক্ত করে তাহলে তার ক্রয়ের দ্বারা এবং তার উম্মে ওয়ালাদ দ্বারা কাফফারা আদায় হবে না। (যদি কেহ বলে) যে বাদীকে আমি উপপত্নী বানাবো সে আজাদ তাহলে যদি তার মালিকানায় হয় তাহলে তা সহীহ নতুবা সহীহ নয়। (আর যদি কেহ বলে) আমার যতগুলো দাস-দাসী আছে সে আজাদ। তাহলে তার সকল গোলাম এবং সকল উম্মে ওয়ালাদ এবং তার সকল মুদাব্বার গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে তার মুকাতাব গোলাম আজাদ হবে না। (কেহ তার স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলল) সে তালাক কিংবা সে ও সে তাহলে তৃতীয়জন তালাক প্রাপ্ত হবে। এবং প্রথমোক্ত দুজনের ব্যাপারে স্বামী ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ, প্রথমোক্ত দুজনের মধ্যে স্বামীর ইচ্ছা মতো একজনকে তালাকের জন্য নির্ধারণ করবে।) আর অনুরূপ হুকুম হবে স্বাধীন করা এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كُلُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِى الخ : যদি কেহ বলে আমার প্রত্যেক গোলাম থেকে যে আমাকে অমুক বিষয়ে সুসংবাদ দান করবে সে আজাদ। অতঃপর তিনজন গোলাম পৃথক পৃথকভাবে তাকে সুসংবাদ জানালো তাহলে

প্রথমজন স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, সুসংবাদ এমন যা চেহারার ভাব পরিবর্তন ঘটায়। আর প্রচলনে তা দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্ত আনন্দদায়ক হওয়া শর্ত। সুতরাং চেহারার ভাব পরিবর্তন ও আনন্দদায়ক শুধু প্রথম জনের সংবাদ দ্বারা অর্জিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় বা তৃতীয়জনের সংবাদ দ্বারা নতুব করে আনন্দ অর্জিত হচ্ছে না। এজন্য সুসংবাদের ফলাফল প্রথম জনের ক্ষেত্রে প্রজোয্য। তাই সে আজাদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় জনের মাঝে এরূপ না হওয়াতে তারা আজাদ হবে না। আর যদি তারা সকলে এক সাথে সুসংবাদ দান করে তাহলে সকলেই আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে সুসংবাদের ফলাফল সকলের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পাওয়া যাচ্ছে বিধায় তারা সকলে স্বাধীন হয়ে যাবে।

قوله : وَ صَحَّ شَرَاءُ اَبِيْهِ الخ : যদি কেহ কাফফারা আদায়ের জন্য নিজ পিতাকে খরিদ করে তাহলে আমাদের মতে তা কাফফারা হিসাবে আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তা কাফফারা আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাদের দলীল হল : আত্মীয়তার বন্ধন আজাদের ইল্লত বা কারণ এবং মালিকানা এর জন্য শর্ত। অর্থাৎ, ক্রয় হল মুক্তির শর্ত। আর মুক্তির কারণ হল আত্মীয়তা তথা পিতৃত্ব। তাই তাদের মতে আজাদের علة বা কারণের সাথে নিয়ত যুক্ত নয়। কারণ তারা বন্ধনকে আজাদের علة বা কারণ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং নিয়ত علة বা কারণ এর সাথে যুক্ত না পেয়ে شرط এর সাথে যুক্ত পাওয়ার কারণে কাফফারা আদায় হবে না।

আমাদের দলীল হল : নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করার অর্থ হল মুক্তি দান করা। কেননা, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন কোন সন্তান তার পিতার প্রতিদান দিতে পারে না। তবে যদি তাঁকে গোলাম অবস্থায় পায় আর খরিদ করে এবং আজাদ করে দেয়। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ক্রয়কেই মুক্তি দান সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, আমাদের মতে মালিকানা আজাদের علة বা কারণ এবং পিতৃত্বের বন্ধন এর শর্ত তাই নিঃসন্দেহে মালিকানাই আজাদের علة বা কারণ হবে। সুতরাং যখন সে কাফফারার নিয়তে নিজ পিতাকে ক্রয় করল তখন নিয়ত আজাদের علة বা কারণ এর সাথে যুক্ত হয়ে গেল। তাই কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

قوله : لَاشِرَاءُ مَنْ حَلَفَ الخ : আর যদি কেহ বলে আমি যদি অমুক গোলামটি খরিদ করি তাহলে সে স্বাধীন। অতঃপর কাফফারা আদায়ের নিয়তে উক্ত গোলামকে খরিদ করল। তাহলে তার কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে আজাদের ইল্লত বা কারণ হচ্ছে শপথ এবং ক্রয় করা এর জন্য শর্ত। তাই এখানে আজাদের ইল্লত বা কারণের সাথে নিয়ত যুক্ত হওয়া পাওয়া যায়নি। বরং শর্তের সাথে যুক্ত হওয়া পাওয়া গেছে। আর যদি কেহ কাফফারা আদায়ের নিয়তে তার উম্মে ওয়ালাদকে খরিদ করে তাহলে কাফফারা আদায় হবে না। অর্থাৎ, বিবাহের মাধ্যমে সে দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে। যদি থাকে সে কাফফারা আদায়ের নিয়তে খরিদ করে এবং তাকে স্বাধীন করে তাহলে উক্ত দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে ক্রয়কারীর কাফফারা আদায় হবে না। কেননা, উক্ত দাসী তার ঔরষে সন্তান প্রসবের কারণে মুক্তির অধিকারিণী হয়ে গেছে। তাই মুক্তি বিষয়টি সর্বোতভাবে শপথের সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

قوله : اِنْ تَسَرَّيْتُ اَمَةً الخ : যদি কেহ বলে আমি যদি কোন দাসীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করি তাহলে সে আজাদ। অতঃপর সে তার নিজের মালিকানায় কোন দাসীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করল। তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, এই দাসীর ক্ষেত্রে শপথ সংঘটিত হয়েছে এবং শপথ মালিকানার সাথে যুক্ত হয়েছে। আর ইহা এ কারণে যে এই শর্তায়নের ক্ষেত্রে দাসী শব্দটি অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক। সুতরাং পৃথকভাবে প্রতিটি দাসীকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তবে যদি কোন দাসীকে নতুনভাবে ক্রয় করে উপপত্নী বানায় তহালে আলোচ্য শপথের আওতাধীন হবে না এবং উক্ত দাসী স্বাধীন হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে উক্ত দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, মালিকানা ছাড়া উপপত্নী গ্রহণ বৈধ নয়। সুতরাং উপপত্নী গ্রহণের কথা উল্লেখ করা এর অর্থ হল

মালিকানার কথা উল্লেখ করা। সুতরাং তা এমন হল যে, কেহ পরনারীকে বলল, যদি আমি তোমাকে তালাক প্রদান করি তাহলে আমার গোলাম স্বাধীন। তাহলে এখানে অনিবার্যভাবে বিবাহের বিষয়টি ধরা হবে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় মালিকানাকে অনিবার্যভাবে অন্তর্ভুক্ত ধরা যাবে।

আমাদের দলিল হল : উপপত্নীত্বের বৈধতার অনিবার্য কারণে মালিকানা উল্লেখ রয়েছে বলে ধরা হয়। আর অবৈধতার শর্ত সুতরাং বৈধতার সীমা পর্যন্ত সীমিত থাকবে। তাই তা শপথের পরিণতির ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে বিবাহগত মালিকানা প্রকাশ পায় শর্তের ক্ষেত্রে جزاء বা পরিণতির ক্ষেত্রে নয়। তাই তো যদি সে অপরিচিত কোন স্ত্রীলোককে বলে আমি তোমাকে তালাক দিলে তুমি তিন তালাক অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোককে সে বিবাহ্ করল এবং তাকে এক তালাক দিল তাহলে উক্ত স্ত্রী তিন তালাক প্রাপ্ত হবে না।

قوله : كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِىْ الخ : যদি কেহ বলে আমার মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম স্বাধীন তাহলে তার মালিকানাধীন সাধারণ গোলাম ও উম্মেওয়ালাদ দাসীগণ এবং তার মুদাব্বার গোলামগণ স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, এদের ক্ষেত্রে মালিকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বগত মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে তাই তাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কার্যকর হয়ে যাবে। তবে হা মনিবের উক্ত শপথ তার মুকাতাব গোলমের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ত ছাড়া কার্যকর হবে না। কেননা, তার উপর মনিবের কর্তৃত্বগত মালিকানা বিদ্যমান নেই। তাই তো মনিব মুকাতাবের উপার্জিত মালের মালিক হয় না। এবং মুকাতাবের সাথে সহবাস বৈধ নয়। তাই মুকাতাব আজাদ হতে হলে মনিবের শপথের মধ্যে তাদের নিয়ত করা জরুরী।

قوله : هٰذِهٖ طَالِقٌ اَوْ هٰذِهٖ الخ : যদি কেহ তার স্ত্রীর দিকে ইশারা করে বলে এইটি অথবা এইটি আর এইটি তালাক তাহলে সর্বশেষটি তালাক হয়ে যাবে। আর প্রথম দুটির ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছাধীকার থাকবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। কেননা, অথবা অব্যয় এর দাবী হচ্ছে দুটি থেকে একটিকে সাব্যস্ত করা। আর অথবা অব্যয়টি প্রথম দুটির মাঝে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই স্বামী প্রথম দু'জন থেকে এক জনকে নির্ধারণের অধিকারী হবে। আর তৃতীয় জন তালকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেননা, و। 'আর' অব্যয় এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিন্নতা। সুতরাং বিষয়টি এমন হল যে, কেহ বলল , তোমাদের দুজনের একজন এবং এইজন তালাক। তাহলে তৃতীয় জন তালাকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়ে যাবেন, কিন্তু স্বামীর অধিকার থাকবে দুজনের একজনকে নির্ধারিত করা। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় ও প্রথমোক্ত দুজনের একজনকে নির্ধারণ করার অধিকারী হবে। তদ্রূপ যদি সে তার গোলামদের সম্পর্কে বলে এটি কিংবা এটি এবং এটি আজাদ তাহলে তৃতীয়টি আজাদ হয়ে যাবে। এবং মনিবের অধিকার থাকবে সে প্রথমোক্ত দুজন থেকে একজনকে নির্ধারণ করতে পারবে।

بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيْجِ وَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهَا

পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, নামাজ ও রোজা এবং অন্যান্য বিষয়ে শপথ

ما يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ لَا بِالْأَمْرِ اَلْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَالْاِسْتِئْجَارُ وَالصُّلْحُ عن مَالٍ وَالْخُصُومَةُ وَضَرْبُ الْوَلَدِ وما يَحْنَثُ بِهِمَا النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ وَالْعِتْقُ وَالْكِتَابَةُ وَالصُّلْحُ عن دَمِ الْعَمْدِ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْقَرْضُ وَالْاِسْتِقْرَاضُ وَضَرْبُ الْعَبْدِ وَالذَّبْحُ وَالْبِنَاءُ وَالْخِيَاطَةُ وَالْإِيدَاعُ وَالْاِسْتِيدَاعُ وَالْإِعَارَةُ وَالْاِسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ وَالْكِسْوَةُ وَالْحَمْلُ -

অনুবাদ : যে বিষয়সমূহ নিজে সম্পদন করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয় কিন্তু হুকুম করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয় না। তাহল ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া দেয়া, ভাড়ায় নেয়া, মালের বিনিময়ে সন্ধি চুক্তি, ঝগড়া, সন্তানকে প্রহার (আলোচ্য ক্ষেত্রে শপথ করলে নিজে তা করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু যদি তার নিযুক্ত উকিল তা করে তাহলে আদেশদাতা শপথ ভঙ্গকারী হবে না) আর যে বিষয় নিজে সম্পাদন করা কিংবা সম্পাদনের হুকুম দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয় তা হচ্ছে বিবাহ, তালাক, খুলা, স্বাধীন করা, কিতাবাত, (তথা মুকাতাব বানানো) ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সন্ধি, দান, সদকা, ঋণ দান, ঋণগ্রহণ, গোলামকে প্রহার, জবাই করা, (ঘরবাড়ী) নির্মাণ, সিলাই করা, আমানত দেয়া, আমানত রাখা, ঋণ প্রদান, ঋণ গ্রহণ। ঋণ পরিশোধ, পরিশোধিত ঋণ গ্রহণ, বস্ত্র দান, কোন বস্তু উঠানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মাসআলা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রাথমিক কিছু আলোচনার প্রয়োজন যা আমরা এখানে উল্লেখ করছি। عقود তথা চুক্তিসমূহ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এমন চুক্তি যার হকসমূহ প্রস্তাবক ও প্রত্যক্ষ সংঘটকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে শর্ত হচ্ছে সে প্রস্তাবক হওয়ার বা সংঘটক হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয় ভাড়া দেয়া, নেয়া প্রহারের বিনিময়ে সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার এমন চুক্তি যার হকসমূহ প্রস্তাবক বা প্রত্যক্ষ সংঘটকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বরং যার জন্য চুক্তি হয়েছে তার সাথে সম্পৃক্ত হয়। যেমন বিবাহ, তালাক, স্বাধীন করা কিতাবাত চুক্তি করা ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার যার মধ্যে কোন হকই থাকবে না। যেমন, ধার প্রদান করা, ধার গ্রহণ করা ইত্যাদি। প্রথম প্রকারে সে নিজে তা করাতে শপথ ভঙ্গ হবে। আর অন্যকে হুকুম দিলে পর সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারে সে নিজে এবং অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা করানোর দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

قوله : وَ مَا يَحْنَثُ بِا الْمُبَاشَرَةِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে চুক্তির প্রথম প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয় ভাড়া দেয়া, ভাড়া নেয়া কিংবা মালের বিনিময়ে সন্ধির চুক্তি করা অথবা প্রতিপক্ষের জবাব দানের ক্ষেত্রে যদি করা বা না করার ব্যাপারে কেহ শপথ করে অর্থাৎ, সে শপথ করল ক্রয় করবে না বা বিক্রয় করবে না কিংবা ভাড়া দেবে না। অতঃপর যদি সে শপথকৃত বিষয়টি করে ফেলে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এ ব্যাপারে অন্য কাউকে আদেশ দিয়ে করায় তবে সে নিজে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, এ চুক্তি সম্পাদন হয়েছে চুক্তিকারী (উকিলের) দ্বারা। তাই যাবতীয় দায় দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হয়। তাই তো শপথকারী সরাসরি শপথকৃত বিষয়ের সংঘটক হলে শপথ ভঙ্গকারী হবে, কিন্তু এরূপ চুক্তিতে যেহেতু সমূহ দায়-দায়িত্ব সংঘটকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তাই আদেশ দাতার পক্ষ থেকে চুক্তি করার শর্ত না পাওয়ার কারণে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তবে হা তার অনুকুলে চুক্তির হুকুম সাব্যস্ত হবে। আর যদি শপথকারী তার নিযুক্ত ওকিলেরও নিয়াত করে থাকে তাহলে সেটাও ইয়ামিনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, এতে কঠোরতা রয়েছে। অথবা শপথকারী এরূপ ব্যক্তি হয় যে, সাধারণত নিজে চুক্তি করে না এবং সবসময়ই অন্যের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করায় তাহলে তার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তার শপথকৃত উল্লিখিত চুক্তির বিষয় থেকে কোন বিষয় সম্পাদন করে ফেলে তাহলে সে নিজে তথা আদেশদাতা শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

قوله : وَ مَا يَحْنِثُ بِهِمَا الخ : চুক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যদি সে নিজে শপথকৃত বস্তু করে ফেলে তাহলে তো শপথ ভঙ্গ হবে, তদ্রূপ যদি অন্য কারোর মাধ্যমে তথা ওকীল নিযুক্ত করে তার মাধ্যমে সম্পাদন করায় তাহলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, এরূপ চুক্তির দায়-দায়িত্ব মূল মালিকের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে তাই আদেশদাতা শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর তা হল যদি কেহ শপথ করে বিবাহ করবে না কিংবা তালাক দেবে না অথবা আজাদ করবে না কিংবা কিতাবাত চুক্তি করবে না, ইচ্ছা পূর্বক হত্যার সন্ধি করবে না অথবা দান বা সদকা করবে না কিংবা ঋণ দান করবে না কিংবা গ্রহণ করবে না কিংবা তার গোলামকে প্রহার করবে না অথবা তার বকরী জবাই করবে না ইত্যাদি। অতঃপর সে নিজে বা কারো মধ্যস্থতার বা ওয়াকালতি দ্বারা কাজটি করে ফেলে তা হলে সে নিজে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, এসব ক্ষেত্রে ওকীল হচ্ছে নিছক দূত এবং অন্যের বক্তব্য উচ্চারণকারী। তাই তো ওকীল এসব কর্মকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করবে না, বরং আদেশ দাতার দিকে সম্পৃক্ত করে এবং চুক্তির দায়-দায়িত্ব সমূহ আদেশ দাতার দিকেই প্রত্যাবর্তীত হয়, উকিলের দিকে নয়। তাছাড়া এসব কাজ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত। তাই অন্যকেও এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদানের অধিকার তার রয়েছে। অতঃপর তার হুকুমে তা সম্পাদনের ফলাফল তার দিকেই ফিরে আসে। সুতরাং তাকেই কর্ম সম্পাদনকারী সাব্যস্ত করা হবে। তা ছাড়া এখানে এমন কোন দায়-দায়িত্ব নেই যা আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : যদি কেহ তার নিজ ছেলেকে প্রহার করবে না বলে শপথ করে। অতঃপর অন্য কাউকে আদেশ প্রদান করে তার ছেলেকে প্রহার করার জন্য আর আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রহার করে তহলে আদেশদাতা শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, সন্তানকে প্রহার এর সুফল তথা আদবও শিষ্টাচার সন্তানের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আদেশ দাতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না। এজন্য আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মটি আদেশদাতার দিকে সম্পৃক্ত হবে না এবং সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কিন্তু যদি কেহ শপথ করে সে তার গোলামকে প্রহার করবে না। অতঃপর সে অন্য একজনকে আদেশ প্রদান করে আর তার আদেশে অন্যজন উক্ত গোলামকে প্রহার করে। তাহলে গোলামের প্রহার এর সুফল মনিবের দিকে তথা আদেশদাতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। কেননা, প্রহারে গোলামটি মনিবের পূর্ণরূপে আনুগত্য হবে। তাই আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মটি আদেশ দাতার দিকে সম্পৃক্ত হবে এবং আদেশ দাতার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং উভয় সুরতে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

وَدُخُولُ اللَّامِ على الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ كأن بِعْتُ لَكَ ثَوْبًا لِاخْتِصَاصِ الْفِعْلِ بِالْمَحْلُوفِ عليه بِأَنْ كان بِأَمْرِهِ كان مِلْكُهُ أولا وَعَلَى الدُّخُولِ وَالضَّرْبِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْعَيْنِ كان بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ لِاخْتِصَاصِهَا بِهِ بِأَنْ كان مِلْكُهُ أَمَرَهُ أولا فَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ صُدِّقَ فِيمَا عليه إِنْ بِعْتُهُ أَوِ ابْتَعْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَعَقَدَ بِالْخِيَارِ حَنِثَ وَكَذَا بِالْفَاسِدِ وَالْمَوْقُوفِ لَا بِالْبَاطِلِ إِنْ لم أَبِعْ فَكَذَا فَاعْتَقَ أو دَبَّرَ حَنِثَ قالت تَزَوَّجْتَ على فقال كُلُّ امْرَأَةٍ لي طَالِقٌ طُلِّقَتِ الْمُحَلِّفَةُ -

---

অনুবাদ : আর لام (অব্যয়) এর প্রবেশ ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া প্রদান, গহনা তৈরী, সেলাই, নির্মাণ কাজ, (ইত্যাদি বিষয়) এর উপর হয়। যেমন (কেহ বলল) যদি আমি কাপড়টি তোমার পক্ষে বিক্রয় করি (তাহলে স্ত্রী তালাক) যার সাথে শপথ করা হয়েছে ক্রিয়া তার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার দরুন এভাবে যে তা তার হুকুমে হয়। তা তার মালিকানায় (অব্যয়টি) হোক বা না হোক। আর (لام অব্যয়টি) প্রবেশ, প্রহার, খানা-পিনা এবং মূল বস্তুর উপর প্রবেশ করে। (যেমন কেহ বলল) যদি আমি তোমার জন্য কাপড় বিক্রয় করি (তাহলে স্ত্রী তালাক।) যার সাথে শপথ করা হয়েছে ক্রিয়া তার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার দরুন এভাবে যে তা তার মালিকানায় হয় এবং হুকুম করুক বা না করুক। আর যদি তা ভিন্ন নিয়ত করে তবে তা সত্যায়ন করা হবে এ অবস্থায় যাতে তার ক্রটি হয়। (আর যদি বলে) যদি আমি তাকে ক্রয় করি, কিংবা বিক্রয় করি তাহলে সে স্বাধীন। অতঃপর সে ইচ্ছাধিকারের শর্তে বিক্রয়ের চুক্তি করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। অনুরূপভাবে ফাসেদ বিক্রয় বা স্থগিত বিক্রয়। (অর্থাৎ, যদি ক্রয়-বিক্রয়টি স্থগিত থাকে কিংবা ফাসেদ হয় তাহলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে।) তবে বাতিল ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে না। (আর যদি কেহ শপথ করে বলে) যদি আমি তাকে বিক্রয় না করি তবে এরূপ (তথা স্ত্রী তালাক) অতঃপর স্বাধীন করল কিংবা মুদাব্বার ঘোষণা করল তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে (অর্থাৎ তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে) স্ত্রী (স্বামীকে বলল) তুমি আমার উপর বিবাহ করেছ, তখন স্বামী বলল, আমার প্রত্যেক স্ত্রী তালাক। তাহলে শপথকারিণী তালাক হয়ে যাবে।

قوله : وَ دُخُولُ اللَّامِ الخ : যে ক্রিয়াসমূহের মধ্যে স্থলাভিষিক্ততা চলে যেমন, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া নেওয়া, গহনা তৈরী। সেলাই, নির্মাণ কাজ ইত্যাদি। এ ধরনের ক্রিয়াসমূহের উপর اختصاص لام। তথা নির্দিষ্টকারী لام আসাটা উকিল নিযুক্ত করার চাহিদা রাখে। যাতে لام বর্ণ যার সাথে শপথ করা হয়েছে তার সাথে উক্ত ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করার ফায়দা প্রদান করে। যার সাথে শপথ করা হয়েছে তার মালিকার হোক বা না হোক। তার কারণ হল لام বর্ণ اختصاص। তথা নির্দিষ্ট করণের জন্য নির্দিষ্ট। আর নির্দিষ্টতা হুকুম ছাড়া সংঘটিত হয় না। আর হুকুম পাওয়া গেলে উকিল পাওয়া গেল। যেমন, কেহ শপথ করল إِنْ بِعْتُ لَكَ ثَوْبًا فَعَبْدِى حُرٌّ যদি আমি তোমার জন্য কোন কাপড় বিক্রি করি তবে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর সম্বোধিত ব্যক্তির আদেশ ছাড়া কাপড় বিক্রি করে তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি সম্বোধিত ব্যক্তি তার মালিকানাধীন বা মালিকানাহীন কাপড় বিক্রয়

করার জন্য বক্তাকে উকিল নিযুক্ত করে এবং উল্লিখিত বক্তা তা বিক্রয় করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, এক্ষেত্রে ওকালতি পাওয়া গেছে।

قوله : وَ عَلَى الدُّخُولِ وَ الضَّرْبِ الخ : আর যে ক্রিয়া সমূহের মধ্যে স্থলাভিষিক্ততা চলে না। যেমন, প্রবেশ, প্রহার, খানা-পিনা এবং মূল বস্তু ইত্যাদি এ ধরনের ক্রিয়া-সমূহের উপর لام اختصاص তথা নির্দিষ্টকারী লাম আসা এর দাবি হচ্ছে ঐ জিনিসটি এই ব্যক্তির মালিকানাধিন হওয়া। যেমন, বলল إِنْ بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ فَعَبْدِى حُرٌّ যদি আমি তোমার কাপড় বিক্রি করি তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তাহলে এ সুরতে যদি তার কাপড় বিক্রয় করে তাহলে তার শপথ ভেঙ্গে যাবে। এক্ষেত্রে তার হুকুমের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে তার উক্তি إِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا لَكَ فَعَبْدِى حُرٌّ যদি আমি তোমার খাবার খাই তবে আমার গোলাম স্বাধীন। তদ্রূপ যদি বলে إِنْ شَرِبْتُ فَعَبْدِى حُرٌّ আমি যদি তোমার পানি পান করি তাহলে আমার গোলাম স্বাধীন। এমনিভাবে যদি বলে إِنْ ضَرَبْتُ وَلَدًا لَكَ فَعَبْدِى حُرٌّ আমি যদি তোমার ছেলেকে প্রহার করি তবে আমার গোলাম আজাদ। উল্লেখ্য যে সন্তানকে প্রহার করার শপথে মালিকানার দাবি করা সম্ভব নয়। কেননা, সন্তান অধিনস্থ মাল নয়। হ্যাঁ, যদি মালিকানা ধারা শুধু اختصاص কে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এই সুরতেও মালিকানা প্রয়োগ সহিহ হবে। মোটকথা لام সর্ব অবস্থায় নির্দিষ্টতার ফায়দা প্রদান করে। কিন্তু প্রথম প্রকারে এ নির্দিষ্টতা আদেশের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারে নির্দিষ্টতা মালিকানার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

قوله : وَ إِنْ نَوَى غَيْرَهُ الخ : আর যদি শপথকারী আলোচ্য لام বর্ণ সংক্রান্ত দুই অর্থের কোনটির নিয়ত না করে অন্য কোন অর্থের নিয়ত করে যা বাস্তবের বিপরীত তাহলে যে অবস্থায় কঠোরতা রয়েছে, তার ব্যাপারে দিয়ানত ও বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে। আর যে অবস্থায় কঠোরতা নেই, বরং সহজতা রয়েছে তার ব্যাপারে শুধু দিয়ানত হিসাবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু দুনিয়ার বিচারে তা গ্রহণ করা হবে না। যেমন প্রথমোক্ত সুরতে সম্বোধিত ব্যক্তির মালিকানাধিন কাপড়ে তার হুকুম ছাড়া বিক্রয় করে আর বাক্যে ব্যবহৃত لام বর্ণ দ্বারা মালিকানার সাথে নির্দিষ্টতা নিয়ত করে তবে তো শপথ ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু যদি মালিকানার নিয়ত করে না, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তদ্রূপ দ্বিতীয় প্রকারে সম্বোধিত ব্যক্তির মালিকানাহীন কাপড় তার হুকুমে বিক্রয় করে কিন্তু لام বর্ণ দ্বারা আদেশের সাথে নির্দিষ্টতার নিয়ত করে তাহলে তো সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু যদি আদেশের সাথে নির্দিষ্টতার নিয়ত করে না তা হলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

আর যদি প্রথম সুরত উল্লেখ করে দ্বিতীয় সুরতের নিয়ত করে অথবা দ্বিতীয় সুরত উল্লেখ করে প্রথম সুরতের নিয়ত করে। অর্থাৎ, إِنْ بِعْتُ لَكَ ثَوْبًا فَعَبْدِى حُرٌّ বলল, আর নিয়ত করল إِنْ بِعْتُ ثَوْبًا لَكَ فَعَبْدِى حُرٌّ তাহলে শুধু দিয়ানত হিসাবে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু দুনিয়ার বিচারে তা গ্রহণ করা হবে না।

قوله : إِنْ بِعْتُهُ أَوِ ابْتَعْتُهُ الخ : আমি যদি এই গোলামটিকে বিক্রি করি তাহলে সে আজাদ অথবা কোন ক্রেতা বলল, যদি আমি এই গোলামটিকে ক্রয় করি তবে সে আজাদ। অতঃপর ইচ্ছাধিকারের শর্তে বিক্রয় করল বা ক্রয় করল কিংবা ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হল অথবা স্থগিত ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হল, তাহলে উক্ত গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। তবে বাতিল ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা গোলাম স্বাধীন হবে না। কেননা, প্রথম সুরতে মুক্তির শর্ত অর্থাৎ, বিক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে। এবং গোলামটিতে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। তাই তার পরিণতি সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ, গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, ইচ্ছাধিকারের শর্ত বিদ্যমান থাকায় বিক্রিত বস্তু বিক্রিকারীর মালিকানা থেকে বের হয় না। তদ্রূপ ফাসিদ বিক্রয় এবং স্থগিত বিক্রয় দ্বারা পণ্য মালিকের হাত থেকে বের হয় না। সুতরাং শর্তের বিদ্যমান সময়ে তার মালিকানাও বিদ্যমান পাওয়া গেল এবং স্বাধীন হওয়ার শর্ত তথা বিক্রয় করা ও পাওয়া গেল। তাই গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। আর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সুরত তথা কেহ অন্যের গোলামের ব্যাপারে বলল, إِنْ اِشْتَرَيْتُ فَهُوَ حُرٌّ যদি আমি তাকে ক্রয় করি তাহলে সে স্বাধীন। অতঃপর সে

উক্ত গোলামকে ইচ্ছাধিকারের শর্তে ক্রয় করল বা ফাসিদ ক্রয় সংঘটিত হল। অথবা স্থগিত ক্রয় সংঘটিত হল তাহলে উক্ত গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) উক্ত গোলাম স্বাধীন হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন যে, এখানে ক্রেতা স্বাধীন করাকে শর্তযুক্ত করেছেন। সুতরাং শর্ত পাওয়ার সময় যা শর্ত যুক্ত করেছে তাও সাথে সাথে সংঘটিত হয়ে যাবে। তাই যেমন, সে খরিদ করার সাথে সাথেই বলল, انت حر। তুমি স্বাধীন। সুতরাং সে ক্রয়ের চুক্তি পূর্ণকারীর ন্যায় হয়ে গেল। এবং মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেল। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতেও উক্ত গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। তারা তার কারণ হিসাবে বলেন এমন ক্রয় এর কারণে মূলত ক্রেতা পণ্যের তথা গোলামের মালিক হয়ে গেল। আর শর্ত ও তার মালিকানার মধ্যে পাওয়ার কারণে গোলাম তাৎক্ষণিক স্বাধীন হয়ে যাবে। তবে বাতিল ক্রয় বা বিক্রয় দ্বারা উভয় সুরতের কোন সুরতেই গোলাম স্বাধীন হবে না। কেননা, বাতিল ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তে প্রকৃত পক্ষে বা হুকুমগত দিক থেকে কোন ক্রমে তা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি হিসাবে গণ্য হয় না।

قوله : إِنْ لَمْ أَبِعْ فَكَذَاالخ : যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি যদি এই গোলামটি বিক্রয় না করি তাহলে স্ত্রী তালাক। অতঃপর শপথকারী তার গোলামটিকে আজাদ করে দিল কিংবা মুদাব্বার ঘোষণা করল তাহলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কেননা, গোলামটিকে আজাদ করার কারণে বা মুদাব্বার ঘোষণা করার কারণে বিক্রয়ের পাত্রত্ব বিদ্যমান থাকে নাই। তাই তার বিক্রয় না করার শর্ত পাওয়া গেল এজন্য এ শর্তের সাতে সম্পৃক্ত তথা শর্তযুক্ত বস্তুটিও সংঘটিত হয়ে যাবে। তাই তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

قوله : قَالَتْ تَزَوَّجْتَ الخ : যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে বলে তুমি আমার উপর অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিয়েছ। তখন স্বামী বলল, আমার প্রতিটি স্ত্রী তিন তালাক। তাহলে এ সময় পর্যন্ত যতজন স্ত্রী থাকবে সবাই তালাক হয়ে যাবে। এমনকি ঐ স্ত্রীও তালাক হয়ে যাবে যে স্বামীকে এমন শপথ করার উপর উৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, উক্ত স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হবে না। কেননা, সে তার বক্তব্যকে কথার প্রতিউত্তর রূপে উচ্চারণ করেছে। তাই জবাব প্রশ্নের মাঝেই প্রয়োগ হবে। আর প্রশ্নের মাঝে উক্ত স্ত্রী ছিল না। তাছাড়া স্বামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য স্ত্রীকে তালাক প্রদানের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা। সুতরাং তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে অন্য স্ত্রীদের উপর তালাক পতিত হওয়ার দ্বারা। আর জাহিরী রেওয়ায়েতের উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত বক্তব্যের ব্যাপকতা যা ব্যক্তির বিবাহাধীন সমস্ত স্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর উৎসাহকারিণী সমস্ত স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন উক্ত স্ত্রীও তালাক হয়ে যাবে। তাছাড়া তার উদ্দেশ্য হতে পারে উক্ত স্ত্রীকে বিপদে ফেলার। কেননা, আল্লাহ তার জন্য যা হালাল করেছেন তাতে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তাই সেও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। তার যদি অন্য স্ত্রীদের নিয়ত করে থাকে তাহলে দিয়ানত হিসাবে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু قضاء (দুনিয়ার বিচারে) তা গ্রহণ করা হবে না। কেননা, তার বক্তব্যে كل শব্দটি ব্যাপক অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। যা সমস্ত স্ত্রীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

عَلى الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ أو إِلَى الْكَعْبَةِ حَجَّ أو اعْتَمَرَ مَاشِيًا فَإِنْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمًا بِخِلَافِ الْخُرُوجِ أو الذِّهَابِ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ أو الْمَشْيِ إِلَى الْحَرَمِ أو الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لم يَحُجَّ الْعَامَ فَشَهِدَا بِنَحْرِهِ بِالْكُوفَةِ لم يَعْتِقْ وَحَنِثَ في لَا يَصُومُ بِصَوْمِ سَاعَةٍ بِنِيَّةٍ وفي صَوْمًا أو يَوْمًا بِيَوْمٍ وفي لَا يُصَلِّي بِرَكْعَةٍ وفي صَلَاةٍ بِشَفْعٍ إِنْ لَبِسْتُ من غَزْلِك فَهُوَ هدى فَمَلَكَ قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ فَلَبِسَ فَهُوَ هَدْىٌ لُبْسُ خَاتَمِ ذَهَبٍ أو عِقْدِ لُؤْلُؤٍ لُبْسُ حُلِيٍّ لَا خَاتَمِ فِضَّةٍ لَا يَجْلِسُ على الْأَرْضِ فَجَلَسَ على بِسَاطٍ أو حَصِيرٍ ولا يَنَامُ على هذا الْفِرَاشِ فَجَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا أَخَرَ فَنَامَ عليه أو لَا يَجْلِسُ على سَرِيرٍ فَجَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا أٰخَرَ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ جُعِلَ على الْفِرَاشِ قِرَامٌ أو على السَّرِيرِ بِسَاطٌ أو حَصِيرٌ حَنِثَ -

অনুবাদ : (যদি কেহ শপথ করে বলে) বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা শরীফে পদব্রজে গমন আমার উপর আবশ্যক। (তাহলে) সে পদব্রজে হজ বা উমরা করবে। আর যদি সাওয়ারির উপর আরোহণ করে তাহলে দম দিতে হবে। তবে ব্যতিক্রম (যদি বলে আমার উপর আবশ্যক) বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হওয়া কিংবা ভ্রমন করা অথবা হারামে অথবা সাফা বা মারওয়ায় পদব্রজে গমন করা (তাহলে তার উপর হজ্ব বা উমরা কোন কিছু আবশ্যক হবে না।) (কেহ শপথ করল যে) যদি সে এ বৎসর হজ্জ না করে তবে তার গোলাম স্বাধীন। অতঃপর দুজন পুরুষ সে কুফাতে কোরবানী করেছে বলে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে গোলাম স্বাধীন হবে না। (আর যদি কেহ শপথ করে) সে রোজা রাখবে না (বলার পর) সাথেসাথে রোজার নিয়তে রোজা দ্বারা (শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।) ও একটি বা একদিন রোযা না রাখার শপথে একদিন রাখার দ্বারা (শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে) এবং নামাজ পড়বে না বলে শপথের ক্ষেত্রে এক রাকাত নামাজ পড়া দ্বারা আর একটি নামাজ পড়বে না বলে শপথের ক্ষেত্রে দু রাকাত নামাজ পড়া দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে। (আর কেহ বলল) যদি আমি তোমার চরকায় কাটা সুতার (বস্ত্র) পরিধান করি তবে তা হাদিয়া। অতঃপর সে (অর্থাৎ, শপথকারী) তুলার মালিক হল এবং স্ত্রী তা থেকে সুতা কেটে বস্ত্র বয়ন করল আর সে (স্বামী) তা পরিধান করল তবে তা হাদিয়া হয়ে যাবে। আর স্বর্ণের আংটি বা মুক্তার মালা পরিধান করা তা অলংকার পরিধান করার অন্তর্ভুক্ত। তবে রূপার আংটি পরিধান এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (কেহ শপথ করল) সে জমিনে (মাটিতে) বসবে না। অতঃপর সে বিছানায় কিংবা চাটাইয়ের উপর বসল। অথবা (শপথ করল) সে এই বিছানায় ঘুমাবে না। অতঃপর ঐ বিছানার উপর অন্য একটি বিছানা পেতে নেয় এবং তাতে ঘুমালো কিংবা (শপথ করল) সে এই খাটের উপর বসবে না। অতঃপর ঐ খাটের উপর অন্য একটি খাট পাতল (এবং তাতে বসলো, তাহলে এসব সুরতে) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি বিছানার উপর পাতলা চাদর রাখা হয় কিংবা খাটের উপর বিছানা বা চাটাই রাখা হল (আর সে তাতে বসল) তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : عَلَى الْمَشْيِ الخ : যদি কেহ মান্নত করে সে বায়তুল্লাহ কিংবা কাবায় পদব্রজে গমন করবে তাহলে তার উপর পদব্রজে একটি হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হবে। আর যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে পারে তবে এ ক্ষেত্রে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কিয়াস এর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এ ধরনের মান্নত করার কারণে কোন কিছু আবশ্যক না হওয়া। কেননা সে তার উপর এমন কাজ আবশ্যক করেছে যা ওয়াজিব ইবাদত নয় এবং মূলত উদ্দেশ্যগতভাবেও তা অপরিহার্য হয় নি। কিন্তু কিয়াস বিরুধি আমাদের এই সিদ্ধান্ত মূল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

مَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَ نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ أَنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَ لِيَرْكَبْ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখনই আমাদেরকে খুতবা বা ভাষণ দিতেন আমাদেরকে সদকার হুকুম দিতেন এবং মুসলা (বিকৃত করা) থেকে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন, মুসলা (বিকৃত করা) হচ্ছে ব্যক্তির পদব্রজে হজ্জ করার মান্নত করা। তাহলে সে যেন দম দেয় এবং সওয়ারীর উপর আরোহণ করে। তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) এর বর্ণিত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) এর ঘটনায় রয়েছে : وَلِيَرْكَبْ وَ لِيُهْدِ بَدْنَةً সে যেন আরোহণ করে এবং কুরবানীর পশু জবাই করে। অনুরূপ হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এরূপ বক্তব্য দ্বারা হজ্জ ও উমরা নিজের উপর আবশ্যক করার প্রচলন রয়েছে। সুতরাং সে যেন বলল, আমার উপর পদব্রজে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ওয়াজিব। তাই তার উপর পদব্রজে গমন করা ওয়াজিব। তবে যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তার বাহনের উপর আরোহণ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার উপর দম দেয়া আবশ্যক। যা আমরা পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করেছি। যেখানে দম দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

قوله : بِخِلَافِ الْخُرُوْجِ الخ : আর যদি কেহ মান্নত করে যে আমার উপর বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হওয়া কিংবা গমন করা আবশ্যক। তাহলে তার উপর হজ্জ বা উমরা কোন কিছু আবশ্যক হবে না। কেননা, এরূপ শব্দ দ্বারা হজ্ব বা উমরার মান্নত করার কোন প্রচলন নেই। আর যদি মান্নত করে যে, আমি হারামের দিকে কিংবা সাফা মারওয়ার দিকে পদব্রজে গমন করব, তাহলে তার উপর হজ্জ বা উমরা কোন কিছু ওয়াজিব হবে না, ইহা ইমাম আবু হনিফা (রহ.)-এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) বলেন, হারামের দিকে পদব্রজে যাওয়ার মান্নতের ক্ষেত্রে তার উপর হজ্ব বা উমরা আবশ্যক হবে। অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে যদি মসজিদুল হারামের দিকে যাওয়ার মান্নত করে অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে তার উপর হজ্জ বা উমরা ওয়াজিব হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : হারাম শব্দটি বা মাসজিদুল হারাম তা বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং হারামের উল্লেখ বাইতুল্লাহর উল্লেখের সমতুল্য। এজন্য তার উপর হজ্জ বা উমরা আবশ্যক হবে। কিন্তু সাফা বা মারওয়ার উল্লেখ এর ভিন্ন। কেননা এ দুটি বায়তুল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : ব্যক্তির এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা ইহরামের বাধ্যবাধকতার প্রচলন সমাজে নেই এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ দ্বারা তা আবশ্যকীয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বদিক দিয়েই তা আগ্রহনীয়। এজন্য এসব শব্দ প্রয়োগের দরুন হজ্জ বা উমরা তার উপর আবশ্যক হবে না।

قوله : عَبْدُهُ حُرٌّ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, যদি আমি এ বৎসর হজ্জ না করি তাহলে গোলাম আজাদ। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি হজ্জ করেছি। আর গোলাম অস্বীকার করে এবং তার পক্ষে দুজন লোক সাক্ষ

প্রদান করে যে সে এবৎসর কুফায় কুরবানী দিয়েছে। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে গোলাম আজাদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এটা তো অত্যন্ত প্রকাশ্য বিষয় সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিয়েছে যে, কুফায় কোরবানী দিয়েছে। আর কুফাতো মক্কা থেকে অনেক দূরে। যার পরিণতি হচ্ছে সে এ বৎসর হজ্জ করেনি। সুতরাং শর্ত পাওয়ার করণে শর্তযুক্ত বিষয় তথা গোলাম স্বাধীন হওয়া সংঘটিত হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : এখানে মূলত হজ্জের নেতিবাচক এর উপর সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য কুফায় কুরবানী সাব্যস্ত করা নয়, বরং হজ্জের দাবী প্রত্যাখ্যান করা। কেননা, কুরবানীর বিষয়ে কেহ দাবীদার নয়। তাই তা এমন হল যে, তারা সাক্ষ্য দিল যে, সে হজ্জ করেনি। তাই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া সাক্ষ্য শরীয়ত অনুমোদন দিয়েছে কোন বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য। নেতিবাচক এর জন্য নয়। অথচ এখানে নেতি বাচকের উপর সাক্ষ্য প্রদান হচ্ছে। তাই তা প্রত্যাখিত। অধিকন্তু এখানে না বাচক বিষয় এমন যা সাক্ষ্যদাতার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। কিন্তু সহজ করণের প্রেক্ষিতে দুই না বাচক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হবে না। তাই গোলাম আজাদ হবে না।

قوله : وَحَنِثَ فِي لَايَصُومُ الخ : আর যদি কেহ শপথ করে যে, সে রোযা রাখবে না অতঃপর রোযার নিয়তে কিছু সময় অতিবাহিত করে যাতে রোযা ভঙ্গের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অতঃপর ঐ দিনই ভেঙ্গে ফেলুক বা নাই ভাঙ্গুক তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, রোযা এর অর্থ হচ্ছে রোযা ভঙ্গকারী এমন বিষয়াদি থেকে রোযার নিয়তে বিরত থাকা। সুতরাং এক্ষেত্রে শপথের পরপরই এমন পাওয়া যাওয়ার কারণে শর্ত বিদ্যমান পাওয়া গেল যা দ্বারা শর্তযুক্ত বিষয় সংঘটিত হয়ে যাবে এবং সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি সে শপথ করে যে সে একটি রোযা রাখবে না, কিংবা একদিন রোযা রাখবে না তাহলে পূর্ণ একদিন রোযা রাখলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি সে শপথের পর থেকে রেযার নিয়তে কিছু সময় রোযা ভঙ্গকারী জিনিস থেকে বিরত থাকে, অতঃপর ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, তার একথার দ্বারা এমন রোযা উদ্দেশ্য যা পুর্ণ রোযা যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য।

قوله : وَفِي لَايُصَلِّي الخ : অনুরূপভাবে যদি শপথ করে যে, সে নামাজ আদায় করবে না। অতঃপর সে কিয়াম কেরাত এবং রুকু আদায় করল তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি সেই সাথে সিজদা করে এরপর নামাজ ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে রোযার মাসআলার উপর কিয়াস করলে প্রতিয়মান হয় যে সে শুধু নামাজের নিয়ত করে অল্প সময় নামাজ বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকলেই তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়, বরং এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস হচ্ছে এই যে, নামাজ অর্থ রোকনসমূহের সমষ্টি। সুতরাং সবকটি রোকন আদায় না করা পর্যন্ত সালাত বলা হবে না। কিন্তু রোযা ব্যতিক্রম। কেননা, রোযা হচ্ছে মাত্র একটি রোকন। অর্থাৎ, বিরত থাকা যা রোযা শুরু করার পর পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। আর যদি শপথ করে যে, একটি নামাজ পড়বে না তাহলে পূর্ণ দুরাকাত নামাজ না পড়া পর্যন্ত তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, তা দ্বারা উদ্দেম্য হাদীসে এক রাকাত নামাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই যদি সে এক রাকাত নামাজ পড়ে তবে তা নামাজ না হওয়ার দরুন শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : اِنْ لَبِسْتُ مِنْ غَزْلِكَ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে যদি তোমার (তার স্ত্রীর) চরকায় কাটা সুতার বস্ত্র পরিধান করি তাহলে তা সদকাহ। অতঃপর স্বামী তুলা ক্রয় করল আর স্ত্রী তা থেকে সুতা কেটে বস্ত্র বয়ন করল আর স্বামী তা পরিধান করল তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তা সদকা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) বলেন, শপথ করার দিন স্বামীর মালিকানাধীন তুলা থেকে স্ত্রী সুতা কেটে বস্ত্র বয়ন করল আর তার স্বামী পরিধান করল তাহলে স্বামী শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর শপথের পরবর্তীতে স্বামী তুলার মালিক

হল এবং সে তুলা থেকে স্ত্রী সুতা কেটে বস্ত্র বয়ন করল আর তা স্বামী পরিধান করল, তাহলে স্বামী শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তাদের দলিল হল : মান্নত শুধু মালিকনাধীন বিষয়ে বা মালিকানার করণের দিকে সম্পৃক্ত বিষয়ে বিশুদ্ধ হয়। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। কেননা, পরিধান করা বা স্ত্রীর সুতা কাটা কোনটিই মালিকানার কারণ হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : স্ত্রীর সুতা কাটা ও বয়ন সাধারণতঃ স্বামীর মালিকাধীন তুলা থেকেই হয়। আর যে বিষয়ের প্রচলন আছে তা শপথে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তাই মালিকানার করণ। আর তাই তো শপথের সময়ে বিদ্যমান তুলা কাটা সুতা কেটে বয়ন করা হলে পর স্বামী তা পরিধান দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে শপথ সংঘটিত হয়ে যায়। অথচ শপথের বাক্যের মধ্যে তুলার কোন উল্লেখ নেই।

قوله : وَ لُبْسُ خَاتَمِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে অলংকার পরিধান করবে না। অতঃপর যদি সে স্বর্ণের আংটি বা মুক্তার মালা পরিধান করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, স্বর্ণের আংটি অলংকার আর তার প্রমাণ হল তা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। মুক্তার মালা যদি তা বিন্যস্ত ও খচিত হয় তবে তো তা অলংকার হওয়ার মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আর যদি তা অখচিত ও অবিন্যস্ত হয় আর তা পরে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতে শপথ ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল হল, লোক প্রচলনের উপরই ভিত্তি করে শপথ কার্যকর হয়। আর অখচিত ও অবিন্যস্ত মুক্তাকে প্রচলনগতভাবে অলংকার বলা হয় না, তাই শপথ ভঙ্গ হবে না।

আর সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল হল : আল কোরআনে মুক্তার মালাকে অলংকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাই প্রকৃত অর্থে তা অলংকার। সুতরাং তা পরা দ্বারা শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কেউ কেউ বলেন, এ মতপার্থক্য যুগ ও কালের পার্থক্যের কারণে হয়েছে। মূলত কোন পার্থক্য নেই। আমাদের মাযহাবে উক্ত মাসআলায় সাহাবাইন (রহ.) এর মতামতের উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়। কেননা, মুক্তাকে পৃথকভাবে অলংকার রূপে ব্যবহার করার প্রচলন বিদ্যমান রয়েছে।

قوله : لَايَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে জমিনের উপর বসবে না তথা মাটির উপর বসবে না। অতঃপর সে বিছানা বা চাটায়ের উপর বসে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, এভাবে তথা বিছানার উপর বসা বা চাটাইয়ের উপর বসাকে মাটির উপর উপবেশনকারী বলার প্রচলন নেই। তাই সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কিন্তু যদি তার ও মাটির মধ্যে তার পোশাক আড়াল হয় তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, পোশাক তার অনুবর্তী। তাই তাকে আড়ালকারী গণ্য করা হবে না। আর যদি সে শপথ করে যে, এই বিছানায় সে শয়ন করবে না। অতঃপর সে এই বিছানার উপর অন্য একটি বিছানা রেখে তার উপর শয়ন করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, সমতুল্য জিনিস তার অনুবর্তী হিসাবে গণ্য হয় না। তাই প্রথম বিছানার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হয়ে যাবে। আর যদি শপথ করে এই খাটে বসবে না, অতঃপর এই খাটের উপর অন্য খাট রাখা হয় এবং শপথকারী তাতে বসে তাহলে সেও শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, দ্বিতীয় খাট প্রথম খাটের সমতুল্য। সুতরাং প্রথম খাট থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর বিছানায় বসবে না বলে শপথের ক্ষেত্রে যদি বিছানায় চাদর বিছানো হয় আর সে তাতে বসে তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, চারদ বিছানার অনুবর্তী বস্তু। সুতরাং তাকে বিছানায় উপবেশণকারী হিসাবে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে খাটে বসবে না বলে শপথের ক্ষেত্রে যদি খাটের উপর বিছানা বা চাটাই পাতা অবস্থায় শপথকারী বসে তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, এভাবে বসলেও তাকে খাটে উপবেশণকারীই গণ্য করা হয়। তা এভাবে যে, খাটের উপর সাধারণত এভাবেই বসা হয়।

بَابُ الْيَمِينِ فِى الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : হত্যা প্রহার ও অন্যান্য বিষয়ে শপথ

ضَرَبْتُكَ وَكَسَوْتُكَ وَكَلَّمْتُكَ وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ تَقَيَّدَ بِالْحَيَاةِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَالْحَمْلِ وَالْمَسِّ لَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ إِنْ لَمْ أَقْتُلْ فُلَانًا فَكَذَا وَهُوَ مَيِّتٌ إِنْ عَلِمَ بِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا مَا دُونَ الشَّهْرِ قَرِيبٌ وَهُوَ وَمَا فَوْقَهُ بَعِيدٌ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ زُيُوفًا أَوْ بَنَهْرَجَةٍ أَوْ مُسْتَحَقَّةً بَرَّ وَلَوْ رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً لَا وَالْبَيْعُ بِهِ قَضَاءٌ لَا الْهِبَةُ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقْبِضَ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا لَا بِتَفْرِيقٍ ضَرُورِيٍّ -

---

অনুবাদ : (কেহ শপথ করে বলে যদি) তোমাকে প্রহার করি অথবা তোমাকে পরিধান করাই কিংবা তোমার সাথে কথা বলি, অথবা তোমার উপর প্রবেশ করি (তাহলে গোলাম আজাদ) তাহলে (এরূপ শপথ) জীবদ্দশার সাথে সীমাবদ্ধ হবে। আর তা গোসল দেওয়া, বহন করা, স্পর্শ করার ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ, জীবদ্দশার সাথে সীমাবদ্ধ নয়।) যদি কেহ শপথ করে যে, সে তার স্ত্রীকে প্রহার করবে না অতঃপর তার চুল ধরে টানলো, বা গলা চেপে ধরল কিংবা তাকে কামড় দিল, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। (আর যদি কেহ শপথ করে যে,) যদি আমি অমুককে হত্যা না করি তাহলে এরূপ, অথচ সে মৃত আর সে তার মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞত, তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় শপথ ভঙ্গ হবে না। (তথা তার মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত না হলে শপথ ভঙ্গ হবে না।) আর এক মাসের কম হচ্ছে নিকটবর্তী আর এক মাস বা তার চেয়ে বেশি হচ্ছে দূরবর্তী। (কেহ শপথ করল যে) নিশ্চয় তার ঋণ আজই পরিশোধ করব। অতঃপর সে খুতওয়ালা কিংবা অচল অথবা অন্যের দাবীকৃত টাকা পরিশোধ করে তাহলে সে শপথ থেকে বের হয়ে যাবে। (তথা তার শপথ ভঙ্গ হবে না) আর যদি শীশা বা পিতল (মিশ্রিত) পরিশোধ করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর (দেনাদার) মুদ্রার বিনিময়ে (পাওনাদারের কাছে) বিক্রয় করা তা পরিশোধ করা। তবে (পাওনাদার এ মুদ্রা দেনাদারকে) হেবা (তথা দান করা) শপথ রক্ষা হবে না। (আর যদি কেহ শপথ করে যে,) সে তার ঋণ দিরহাম দিরহাম করে গ্রহণ করবে না। অতঃপর কিছু পরিমাণ উসুল করল তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ না সমগ্র ঋণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে উসুল করবে। (অনুরূপ) জরুরী ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতা দ্বারাও শপথ ভঙ্গ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : ضَرَبْتُكَ وَ كَسَوْتُكَ الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে যে, যদি আমি তোমাকে প্রহার করি তাহলে গোলাম আজাদ অথবা বলে যদি আমি তোমাকে কাপড় পরিধান করাই তাহলে আমার গোলাম আজাদ। তাহলে তা সম্বোধিত ব্যক্তির জীবদ্দশার সাথে সীমাবদ্ধ হবে। কেননা, প্রহার বলা হয় ব্যথা দানকারী কর্মকে, যা শরীরের

সঙ্গে যুক্ত হয়। আর মৃতের ক্ষেত্রে ব্যথা দান পাওয়া যায় না। আর পোশাক পরিধান করানোর বিষয়টিও এরূপ। কেননা, সাধারণভাবে তা দ্বারা বুঝানো হয় মালিকানাসহ পরিধান করানো অথচ মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার কোন মালিকানা হয় না। আর যদি শরীর ঢাকার নিয়ত করে তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির শরীর ঢেকে দেয়ার দ্বারা সে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি শপথ করে যে, যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি তাহলে আমার গোলাম আজাদ কিংবা শপথ করল যদি আমি তোমার উপর প্রবেশ করি তথা তোমার সাথে সাক্ষাৎ করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি সম্বোধিত ব্যক্তির সাথে জীবিত অবস্থায় কথা বললে বা তার উপর প্রবেশ করলে সে শপথ ভঙ্গকারী তথা তার গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি সম্বোধিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সাথে কথা বলে কিংবা তার উপর প্রবেশ করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, কথা বলা বা সাক্ষাৎ করা জীবিত অবস্থায় সম্ভব, কিন্তু পরে সম্ভব নয়। তাই তা ব্যক্তির জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

قوله : بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَ الْحَمْلِ الخ : আর যদি কেহ শপথ করে যে, যদি আমি তাকে গোসল করাই তাহলে আমার গোলাম আজাদ। অথবা যদি তাকে বহন করি কিংবা তাকে স্পর্শ করি তাহলে আমার গোলাম আজাদ। তাহলে উক্ত ব্যক্তির শপথ সম্বোধিত ব্যক্তির জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট হবে না। বরং যদি শপথকারী সম্বোধিত ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর তাকে গোসল করায় কিংবা তাকে বহন করে অথবা স্পর্শ করে তাহলে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। কেননা, আলোচ্য শর্তকৃত বস্তু সমূহে মৃত ব্যক্তি আর জীবিত ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। কেননা, তার গোসল করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল শরীরে পানি প্রবাহিত করানো এবং তার উদ্দেশ্য হল পবিত্র করা। আর এটা মৃতের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য হয়। তদ্রূপ বহন করা এর অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর করা আর তা মৃতের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য হয়। তেমনি স্পর্শ করাও মৃতের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হয়। এজন্য উক্ত কাজগুলো জীবদ্দশার সাথে নির্দিষ্ট হবে না।

قوله : لَايَضْرِبُ اِمْرَأَتَهُ الخ : আর যদি কোন স্বামী শপথ করে যে সে তার স্ত্রীকে প্রহার করবে না, অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর চুল ধরে টানলো কিংবা গলা চিপে ধরল অথবা তাকে কামড়ালো, তাহলে স্বামী শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, প্রহার করবে না বলে যে শপথ করেছে এর অর্থ হল স্ত্রীর সাথে কষ্টদায়ক কোন কর্ম করবে না। অথচ এধরনের ব্যবহারে কষ্ট প্রদান করা পাওয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, সোহাগের অবস্থায় আদরের অবস্থায় এমন করলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, তখন তা প্রহার বলা হয় না। বরং তা কৌতুক বলা হয়ে থাকে। - الله اعلم

قوله : اِنْ لَمْ اَقْتُلْ فُلَانًا الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, আমি অমুককে হত্যা করব। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে অমুক মৃত। সুতরাং শপথকারী যদি তার মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে তার শপথকে এমন প্রাণের উপর সাব্যস্ত করেছে যা আল্লাহ তা'আলা উক্ত মৃত ব্যক্তির মাঝে আপন কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করবেন। সুতরাং তার কল্পনা করা সম্ভব। সুতরাং এমন শপথ সংঘটিত হয়ে যাবে। আর শপথ সংঘটিত হবে এজন্য যে, সাধারণত শপথকারীর জন্য তা অক্ষম। আর তা আকাশ স্পর্শ করার মাসআলার ন্যায় হল। আকাশ স্পর্শের মাসআলা যেভাবে শপথকারীর শপথ তাৎক্ষণিক ভঙ্গ হয় তেমনি উক্ত মাসআলায়ও শপথকারীর শপথ তাৎক্ষণিক ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কথা না জেনে থাকে তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, সে তার শপথকে এমন প্রাণের প্রতি সাব্যস্ত করেছিল যা উক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। আর এমন অবস্থায় শপথ পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা এমন হল যে, পাত্রের পানি পান না করার শপথের ন্যায়, যে পত্রে শপথের সময় পানিই ছিল না। তাই যেভাবে এ শপথ ভঙ্গ হয় না তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও শপথ ভঙ্গ হবে না।

قوله : مَادُوْنَ الشَّهْرِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখানে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে

যদি قريب নিকটতম শব্দ প্রয়োগ করে শপথ করে তবে তা দ্বারা এক মাসের কম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর যদি بعيد দূরবর্তী শব্দ প্রয়োগ করে তবে এর দ্বারা এক মাস বা তার চেয়ে বেশি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যদি কেহ শপথ করে যে, সে অমুকের পাওনা অচিরেই তথা নিকটতম সময়ের ভেতর পরিশোধ করবে তাহলে তা এক মাসের কম গণ্য হবে। এমন কি যদি শপথ থেকে নিয়ে এক মাসের মাথায় বা তার চেয়ে বেশি দিন পর ঋণ পরিশোধ করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি কেহ শপথ করে যে সে অমুকের পাওনা দেরিতে পরিশোধ করবে তাহলে এক মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় বুঝানো হবে। সুতরাং সে যদি এক মাসের পরও পরিশোধ করে তাহলেও সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর তা প্রচলগত দিক থেকেও ধর্তব্য। তাই তো দেরি বা বিলম্বের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে মাস হয়ে গেলো তোমার সাক্ষাৎ হল না।

قوله : لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে সে অমুকের পাওনা আজই পরিশোধ করবে। অতঃপর সে আজই খুতওয়ালা বা অচল কিংবা অন্যের দাবীকৃত টাকা পাওনাদারকে দিয়ে দিল। তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, মুদ্রার মধ্যে অচল বা খুঁতওয়ালা ইহা একটি দোষ। আর দোষ মূল সত্তাকে বিলুপ্ত করে না। তাই তো এ ত্রুটিসহ পাওনাদার মেনে নিলে দেনাদার এর দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এজন্য আমরা বলি যে শপথ রক্ষার শর্ত পূর্ণ হয়েছে। আর দাবীকৃত টাকায় কব্জা ও দখল গ্রহণযোগ্য। আর পরে বিচার মিমাংসার ভিত্তিতে তা দাবীকারীকে ফিরিয়ে দেয়ার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি পাওনাদারকে দেনাদার শীশা বা পিতল মিশ্রিত মুদ্রা প্রদান করে তাহলে এর দ্বারা তার শপথ রক্ষা হবে না। কেননা, এগুলো মূলত দিরহাম বা দিনারের শ্রেণীভক্ত নয়।

قوله : وَالْبَيْعُ بِهِ قَضَاءٌ الخ : আর যদি শপথকারী ঐ মুদ্রার বিনিময়ে ঐ দিন পাওনাদারের নিটক তার মালিকানাধীন কোন কিছু বিক্রয় করে। আর পাওনাদার তা গ্রহণ করে তাহলে শপথকারীর শপথ রক্ষা হবে। কেননা, ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিই হচ্ছে পরস্পর অদল-বদল। আর এখানে বিক্রয় দ্বারা এ অদল-বদল পাওয়া গেছে। আর পাওনাদারের কব্জা শর্ত করা হয়েছে যাতে বিক্রয় পূর্ণভাবে সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে যদি পাওনাদার ঐ ঋণের টাকা দেনাদারকে দান করে দেয় তবে দেনাদারের শপথ রক্ষা হবে না। কেননা, এখানে অদল-বদল পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ঋণ পরিশোধ হচ্ছে দেনাদারের কাজ আর এক্ষেত্রে পাওনাদারের পক্ষ থেকে রহিত করণ পাওয়া গেলেও দেনাদারের কোন কাজ পাওয়া গেল না। তাই তার শপথ রক্ষা হবে না। বরং দিন অতিক্রান্ত হলে পর সে শপথ ভঙ্গকারী গণ্য হবে।

قوله : لَايَقْبِضُ دِرْهَمًا الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, তার ঋণ দিরহাম দিরহাম করে অর্থাৎ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ করবে না। অতঃপর ঋণের কিছু পরিমাণ গ্রহণ করল। তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঋণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গ্রহণ না করে। কেননা, শপথ ভঙ্গ হওয়ার শর্ত হল সমগ্র ঋণ বিক্ষিপ্তাকারে গ্রহণ করা। কেননা, শপথকারী উসূলের বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছে তার দিকে সম্বন্ধকৃত একটি নির্দিষ্ট ঋণের দিকে। সুতরাং তা সম্বন্ধকৃত ঋণের সমগ্রের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে সমগ্র ঋণ উসূল করা ছাড়া শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি শপথকারী তার ঋণ দুইবারের মাপে বা দুই বারের গণনায় উসূল করে থাকে আর দুই বারের মাপ বা দুই বারের গণনার মধ্যে অন্য কোন কাজে জড়িত না হয় কিংবা তা এমন যা এক বারে গ্রহণ করা যাচ্ছে না তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, সমগ্র পরিমাণ একবারে ফরজ করা সাধারণত সম্ভব নয়। তাই এ বিচ্ছিন্নতাকে ব্যতিক্রম ধরা হবে।

إِنْ كَانَ لِي مَالٌ إِلَّا مِائَةً أَوْ غَيرُ أو سِوَى فَكَذَا لم يَحْنَثْ بِمِلْكِهَا أو بَعْضِهَا لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا لَيَفْعَلَنَّهُ بَرَّ بِمَرَّةٍ وَلَوْ حَلَّفَهُ وَالٍ لَيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دخل الْبَلْدَةَ تَقَيَّدَ بِقِيَامِ وِلَايَتِهِ يَبَرُّ بِالْهِبَةِ بِلَا قَبُولٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَا يَشُمُّ رَيْحَانًا لَا يَحْنَثُ بِشَمِّ وَرْدٍ وَيَاسَمِينَ الْبَنَفْسَجُ وَالْوَرْدُ عَلَى الْوَرَقِ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَ بِالْقَوْلِ حَنِثَ وَبِالْفِعْلِ لَا وَدَارُهُ بِالْمِلْكِ وَالْإِجَارَةِ حَلَفَ بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَه وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى مُفْلِسٍ أو مَلِيءٍ لَمْ يَحْنَثْ -

---

অনুবাদ : কেহ শপথ করল যে, যদি আমার নিকট একশত দিরহাম ছাড়া অন্য কিছু থাকে অথবা غير তথা এক শত দিরহাম ভিন্ন কিংবা سوى তথা একশত দিরহাম বাদে অন্য কিছু থাকে তাহলে এরূপ (তথা আমার গোলাম আজাদ) অতঃপর সে একশত টাকার বা তার আংশিকের মালিক হল। তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। (কেহ শপথ করল যে,) অমুক কাজটি করবে না, তাহলে তা সর্বদা বর্জন করতে হবে। (কেহ শপথ করল যে,) অমুক কাজটি অবশ্যই করবে তাহলে তা একবার করার দ্বারা শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। শাসক যদি কোন ব্যক্তিকে এই মর্মে শপথ করায় যে শহরে প্রবেশ করে যে কোন দুষ্কৃতিকারী সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে, তাহলে এ শপথের মেয়াদকাল হবে শুধু তার শাসনকাল পর্যন্ত। গ্রহণহীন দান করা দ্বারা শপথ পুরা হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রয় এর ব্যতিক্রম। (কেহ শপথ করল যে,) রায়হান এর ঘ্রাণ নেবে না তাহলে গোলাব বা ইয়াসমিনের ঘ্রাণ নেয়াতে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেহ শপথ করল যে, সে বিবাহ করবে না। অতঃপর অনুমতিহীন এক ব্যক্তি তার সাথে বিবাহ দিল এবং শপথকারী কথা বলা দ্বারা তার অনুমোদন দিল তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর কর্ম দ্বারা অনুমোদন দিলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। তার ঘর তা মালিকানা বা ভাড়াটিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেহ শপথ করল তার কোন মাল নেই। অথচ কোন দেউলিয়ার উপর বা কোন অনাদায়ী ধনীর নিকট তার ঋণ আছে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : إِنْ كَانَ لِي مَالٌ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, যদি আমার কাছে একশত দিরহাম ছাড়া অন্য কিছু থাকে তবে আমার গোলাম স্বাধীন। অতঃপর তার কাছে একশত দিরহাম বা তার কম থাকে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না তথা তার গোলাম স্বাধীন হবে না। কেননা, এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলনগত দিক থেকে এক শতকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ সে যদি এক শত দিরহামের অতিরিক্ত দিরহামের মালিক হয় তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কেননা, এখানে এক শতকে পৃথককিরণ তারসমূহ অংশসহ সাব্যস্ত হয়েছে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রে غير ও سوى বা এর সমর্থক যে কোন শব্দ ব্যবহার করলে একই হুকুম হবে। কেননা, এসকল শব্দ হল الا এর ন্যায় ব্যতিক্রমের অব্যয়। আর একশত দিরহামের বেশি মালের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো তা যাকাতে প্রদান যোগ্য মাল হওয়া। যেমন, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ী পণ্য ইত্যাদি হওয়া। আর যদি এমন সম্পদ হয় যা একশত ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তা তার ব্যবহারী যার উপর যাকাত আবশ্যক হয় না, তবে সে এমন সম্পদের দরুন শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : لَايَفْعَلُ كَذَا الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে অমুক কাজটি করবে না, তাহলে তা সর্বদা বর্জন করতে হবে। যেমন কেহ শপথ করল সে মিষ্টান্ন খাবে না, তাহলে সে সর্বদা মিষ্টান্ন থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, সে কর্মটিকে নিঃশর্তভাবে বর্জনের কথা বলেছে। তাই বিরত থাকার বিষয়টি ব্যাপক হবে। বর্জনের ব্যাপকতার অনিবার্য দাবী হিসাবে।

قوله : لَيَفْعَلَنَّهُ الخ : যদি কেহ শপথ করে সে অবশ্যই একাজ করবে। অতঃপর সে তা এক বার করল, তাহলে তার শপথ পুর্ণ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার করতে হবে না। কেননা, এমন শপথের কারণে পালনীয় বিষয় হচ্ছে অনির্ধারিত একটি কর্ম। আর বক্তব্যের ক্ষেত্র হচ্ছে ইতিবাচক। তাই যে কাজটিই করবে তা দ্বারা শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। আর হা অবশ্যই যদি ঐ ক্রিয়ার ক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়ে যায় বা শপথকারী মৃত্যুবরণ করে আর ঐ কর্ম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ্য সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ حَلَّفَهُ الخ : যদি কোন শাসক তার অধিনস্থ কাউকে এমর্মে শপথ করায় যে শহরে প্রবেশকারী যে কোন দুষ্কৃতিকারী সম্পর্কে তাকে অবহিত করবে। তা হলে এ শপথের মেয়াদকাল হবে শুধু তার শাসনকাল পর্যন্ত। কেননা, শপথ দমন করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ দুষ্কৃতিকারীকে শাসন করার দ্বারা তার বা অন্যের দুষ্কৃতি দমন করা। সুতরাং তা তার শাসনকাল পর্যন্ত হবে। কেননা, শাসনকাল শেষ হলে পর তার শাসন তেমন উপকারী নয় বা গন্ডির ভেতরে নয় কিংবা অন্যের দুষ্কৃতি দমন করা তার দায়িত্বে নয়। আর শাসন লোপ পাওয়া তার মৃত্যুর দরুন বা তাকে অপসারণ করা দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

قوله : يَبَرُّ بِالْهِبَةِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে সে অমুককে দান করবে অতঃপর সে অমুককে দান করল, কিন্তু অমুক তা গ্রহণ করল না। তাহলে দানকারীর শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে তার শপথ পূর্ণ হবে না। তিনি বলেন, দান পূর্ণ হতে হলে অন্যের গ্রহণ আবশ্যক। সুতরাং তা ক্রয়-বিক্রয়ের মতো হল। আমাদের দলিল হল : দান হচ্ছে সেচ্ছাদান কর্ম। আর তা এককভাবে দাতার দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে যায়। একারণেই বলা হয়ে থাকে সে দান করেছে, কিন্তু অমুক তা গ্রহণ করেনি। তাছাড়া দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদান্যতা প্রকাশ করা। আর তা এককভাবে দানকারীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কেহ শপথ করল সে অমুকের নিকট ইহা বিক্রয় করবে। কিন্তু সে তো বিক্রয় করল, কিন্তু অমুক তা গ্রহণ করল না। তবে বিক্রয় সংঘটিত না হওয়ার দরুন তার শপথ রক্ষা হল না। কেননা, সে বিক্রয় বলা হয় عهد معاوضة তথা ক্রেতা বিক্রেতার আদল-বদলের চুক্তি যা উভয়ের ক্রিয়ার দাবী করে। সুতরাং ক্রেতা তা গ্রহণ না করার কারণে তা পূর্ণতায় উপনিত হবে না।

قوله : لَايَشُمُّ رَيْحَانًا الخ : আর যদি কেহ শপথ করে যে, সে রায়হান ফুলের ঘ্রান নিবে না। অতঃপর সে গোলাব বা ইয়াসমিন ফুলের ঘ্রান নিল। তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, রায়হান ফুল হচ্ছে কান্ডহীন উদ্ভিদ ফুল। অথচ গোলাব ও ইয়াসমিনের কান্ড রয়েছে। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকার দরুন সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : لَايَتَزَوَّجُ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে, সে বিবাহ করবে না। অতঃপর তার ওলী বা ওয়াকীল কোনটিই নয়। এমন এক ব্যক্তি তার সাথে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ দিয়ে দেয় আর শপথকারী এ বিবাহের অনুমোদন কথা বলার মাধ্যমে দিয়ে দেয় তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা, মৌখিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে তা ওয়াকালতীকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন সে প্রথমেই তাকে ওয়াকিল নিযুক্ত করেছে। সুতরাং শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি সে তার কর্ম দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করে তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, এখানে কর্ম দ্বারা ওয়াকীল নিযুক্ত করার প্রচল নেই। তার কর্ম ওকালতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। এজন্য সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قوله : لَادَارَهُ الخ : যদি কেহ শপথ করে যে সে অমুকের বাড়ী যাবে না, তবে অমুকের মালিকানা বাড়ী কিংবা অমুকের ভাড়াবাড়ি বা অন্য কোন ভাবের বাড়ি যাতে সে বসবাস করে তাতে প্রবেশের দ্বারা বা যাওয়ার দ্বারা সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, এখানে অমুকের বাড়ী বলতে অমুকের বসবাসযোগ্য বাড়ীই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর ইহাই প্রচলন।

قوله : حَلَفَ بِاَنَّهُ لَامَالَ لَهُ الخ : আর যদি কেহ শপথ করে বলে যে, তার নিকট কোন মাল নেই। আর এ শপথ এমন অবস্থায় করে যে, তার ঋণের টাকা কোন অনাদায়ী ধনীর নিকট বা কাজী কর্তৃক ঘোষিত কোন দেওলিয়ার নিকট বিদ্যমান থাকে। তবুও তার শপথ ভঙ্গ হবে না।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় : হদ্দ (দন্ডবিধান)

اَلْحَدُّ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالزِّنَا وَطْءٌ فِي قُبُلٍ خَالٍ عَنِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا لَا بِالْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ فَسَأَلَهُمُ الْإِمَامُ عن مَاهِيَّتِه وَكَيْفِيَّتِهِ وَمَكَانِهِ وَزَمَانِهِ وَالْمَزْنِيَّةِ فَإِنْ بَيَّنُوهُ وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطِئَهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَعُدِّلُوا سِرًّا وَجَهْرًا حُكِمَ بِهِ وَبِإِقْرَارِهِ أَرْبَعًا فِي مَجَالِسِهِ الْأَرْبَعَةِ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ وَسَأَلَهُ كما مَرَّ فَإِنْ بَيَّنَهُ حُدَّ فَإِنْ رَجَعَ عن إِقْرَارِهِ قبل الْحَدِّ أو في وَسَطِهِ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ بِلَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أو لَمَسْتَ أو وَطِئْتَ بِشُبْهَةٍ -

অনুবাদ : হদ্দ হল ঐ নির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহর হক হিসাবে সাব্যস্ত হয়। আর যিনা হল (মহিলার) যোনি দিয়ে সহবাস করা (তথা এমন মহিলার সাথে সহবাস করা) যার উপর মালিকানা বা মালিকানা সাদৃশ্যতা নেই। যিনা সাব্যস্ত হয় যিনা শব্দ দ্বারা চার ব্যক্তির সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে। তবে وطی কিংবা جماع শব্দ প্রয়োগে সাক্ষ্য সাব্যস্ত হবে না। (সুতরাং যখন সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন) বিচারক তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, যিনার প্রকৃত (সম্পর্কে) তার আকৃতি সম্পর্কে তার স্থান (সম্পর্কে) তার কাল (সম্পর্কে) এবং مزنية (যিনা কৃত মহিলা) সম্পর্কে। সুতরাং সাক্ষীরা যদি সব কিছু বর্ণনা করে এবং বলে আমরা তাকে এই মহিলার সাথে এমনভাবে যিনা করতে দেখেছি যেমন সুরমাদানীতে সুরমার শলাকা রাখা হয়। আর গোপনে ও প্রকাশ্যে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা যাচাই করা হবে। তাহলে বিচারক ঐ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যিনার ফায়সালা করে দেবেন। (অনুরূপভাবে) তা চার বৈঠকে যিনাকারীর চার বার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যিনা সাব্যস্ত হয়। যখনই সে স্বীকার করবে (তথা প্রতিবারই) বিচারক তার স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং তাকে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। যদি সে যিনার বর্ণনা দিয়ে দেয় তবে তাকে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি দন্ডবিধি কার্যকর করার পূর্বে বা হদ্দ কায়েমের মধ্যখানে সে তার স্বীকারুক্তি থেকে ফিরে আসে তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর মুস্তাহাব হচ্ছে তাকে বলা (এ থেকে ফেরানোর জন্য) যে, সম্ভবত তুমি চুম্বন দিয়েছো বা স্পর্শ করেছো, কিংবা সন্দেহ পূর্ণ সহবাস করেছো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত কিতাবুল আইমান নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা, তাতে كفارة ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ইবাদত ও শাস্তি হিসাবে গণ্য হয়। আর এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) কিতাবুল হুদুদের আলোচনা শুরু করতেছেন। কেননা তাতে শুধু শাস্তি বিদ্যমান। সুতরাং এ দুবাবের মধ্যকার সামঞ্জস্যতার দরুন প্রথমে আইমান এবং পরে হদ্দ হওয়া ও যুক্তিযুক্ত। আর হদ্দ হচ্ছে মোট ছয় প্রকার। ১। حد زنا ব্যভিচারের

শাস্তি। ২। حد شرب خمر মদ পানের শাস্তি। ৩। حد مسكرات নেশাযুক্ত দ্রব্য পানের শাস্তি। ৪। حد قذف অপবাদের শাস্তি। ৫। حد سرقة চুরি করার শাস্তি। ৬। حد قطع الطريق ডাকাত/রাহাজানির শাস্তি। সম্মানিত গ্রন্থকার প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা সামনে করতেছেন।

قوله : اَلْحَدُّ الخ : حد শব্দটি একক। তার বহুবচন حدودٌ অর্থ দন্ড, সাজা, শাস্তি, সীমা, ইত্যাদি। তবে হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অভিধানে হদ্দ অর্থ রোধ করা। তাই তো দার রক্ষীকে حداد বলা হয়ে থাকে। পারিভাষিকভাবে حد বলা হয় : اَلْحَدُّ عُقُوْبَةٌ مُقَدَّرَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى হদ্দ হচ্ছে ঐ নির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহর হক হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া এভাবেও বলা হয় যে, اَلْحَدُّ عُقُوْبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ عَلَى الْجَانِىْ একটি নির্ধারিত শাস্তি বা অপরাধীকে দেওয়া হয়। আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি যা অপরাধীকে দেওয়া হয়। আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি হওয়ার কারণে تعزير বা সাধারণ শাস্তি ও قصاص প্রতিশোধ শাস্তি হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, تعزير আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়, বরং বিচারক যার জন্য যে পরিমাণ সমিচিন মনে করবেন তাই তার জন্য নির্ধারিত হবে। আর قصاص আল্লাহ তা'আলার হক নয়। কেননা, তা নিহত ব্যক্তির অভিভাকদের হক। আর শরীয়াতে হদ্দ বিধি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে রক্ষা পায়। গোনাহ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা বা অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। কেননা, হদ্দ শুধু মুসলমানের জন্য নয়, বরং কাফেরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। তবে যদি কোন মুসলমান এর সাথে তওবা করে এবং গুনাহের মাফী কামনা করে তাহলে মহান আল্লাহ তার করুণা দ্বারা তার পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। যেমন হযরত মইযে আসলামী (রাযি.) এর উপর হদ্দ প্রয়োগের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন :

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ

নিশ্চয় সে এমন তাওবা করেছে যদি তা উম্মতের মধ্যে বন্টন করা হয় তবে তা তাদেরকে বেষ্টন করে নেবে। অনুরূপভাবে গামেদী নারীর ব্যাপারে বলেছিলেন :

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهٗ

قوله : وَالزِّنٰى الخ : আর যিনা (ব্যভিচার) বলা হয় মহিলার যোনি দিয়ে সহবাস করা যার উপর মালিকানা বা মালিকানা সাদৃশ্যতা নেই। সুতরাং যদি কেহ মহিলার যোনি ভিন্ন অন্য কোথাও অর্থাৎ, পিছনের রাস্তায় সহবাস করে তাহলে যিনা হবে না। তদ্রূপ নিজ স্ত্রী বা নিজ দাসির সাথে সহবাস করলে তা যিনা হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে পূর্ণ মালিকানা রয়েছে। তেমনি যদি কেহ মালিকানা সাদৃশ্যতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সহবাস করে তাহলে তাও যিনা হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে তালাক দাতার সহবাস কিংবা নিজ পিতার দাসীর সাথে সহবাস ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, যিনার এ সংজ্ঞা مطلقا তথা সাধারণভাবে প্রদান করা হয়েছে। কেননা উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকেই শুধু হদ্দ কায়েম সম্ভব নয়, বরং এমন যিনা যার কারণে হদ্দ বিধি প্রযোজ্য হয় তা হচ্ছে :

هُوَ وَطْىٌ مُكَلَّفٍ نَاطِقٍ طَائِعٍ فِىْ قُبُلٍ مُشْتَهَاةٍ حَالًا وَ مَاضِيًا خَالٍ عَنْ مِلْكِهٖ وَ شُبْهَتِهٖ فِىْ دَارِ الْاِسْلَامِ اَوْ تَمْكِيْنِهَا مِنْ ذٰلِكَ اَوْ تَمْكِيْنِهٖ -

(হদ্দ আবশ্যক হওয়া) যিনা হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক, আকীল, বাকশক্তি সম্পন্ন, সেচ্ছায় পুরুষের কামভাব সম্পন্না মহিলার যোনি পথে বর্তমানে বা অতীতকালে সহবাস করা, এমতাবস্থায় যে তা মালিকানা সাদৃশ্যতা থেকে মুক্ত (যা সংঘটিত হয়) ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলার উপর পুরুষের বা পুরুষের উপর মহিলার সুযোগ করে দেয়া দ্বারা।

আলোচ্য সংজ্ঞা থেকে প্রতিয়মান হল যে, পাগল, মাতাল, অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তা, বোবা, জোর পূর্বক, বিবাহিতা, দাসী, পিতার দাসী, মুকাতাবা, ব্যবসায় অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের দাসীর (সাথে মনিবের সহবাস) গণিমতের মালে অর্জিত হওয়া দাসী (যা এখন ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি এবং যুদ্ধ কবলিত রাষ্ট্রে তথা দারুল হরবে সহবাস সংঘটিত হলে হদ্দ ওয়াজিব হওয়া যিনা হিসাবে গণ্য হবে না।

قوله : وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اَرْبَعَةِ الخ : যিনা দুভাবে সাব্যস্ত হয়। ১। সাক্ষির ভিত্তিতে। ২। যিনাকারীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। সুতরাং সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) প্রথমে সাক্ষীদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা, সাক্ষ্য হচ্ছে প্রকাশ্য প্রমাণ। বিশেষত যা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে ক্ষতি ও কলংক রয়েছে। আর তাতে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন যেহেতু দুঃসাদ্ধ সেহেতু বাহ্যিক প্রমাণকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। আর সাক্ষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল চারজন সাক্ষী কোন পুরুষ বা মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচার এর সাক্ষ্য প্রদান করবে শাসকের সম্মুখে। আর সাক্ষ্য প্রদানের সময় زنا বা ব্যভিচার শব্দ ব্যবহার শর্ত এমনকি যদি وطى বা جماع শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এ শব্দদ্বয় হারাম বুঝায় না। তাছাড়া এগুলো দ্বারা এমনও বুঝানো সম্ভব হয় যে, সে যোনী ছাড়া অন্য কোথাও সহবাস করেছে, তাই হদ্দ কায়েমকারী সাক্ষ্য সাব্যস্ত হতে হলে যা সরাসরী হারাম বুঝায় তাই ব্যবহার করতে হবে। আর তা হচ্ছে زنا বা ব্যভিচার। আর সাক্ষ্য চার জন হওয়া শর্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ 'তোমাদের মধ্য থেকে চার জনকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে তলব কর। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 'অতঃপর তারা যেন চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে :

اِئْتِ بِاَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ عَلٰى صِدْقِ مَقَالَتِكَ

এমন চারজন লোক পেশ কর যারা তোমার বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাছাড়া চারজন সাক্ষ্য নির্ধারণের বেলায় গোপনীয়তা পাওয়া যায়। আর এ বিষয়ে গোপনীয়তাই মুস্তাহাব।

قوله : فَيَسْأَلُهُمُ الْاِمَامُ الخ : যখন সাক্ষীগণ যিনার সাক্ষ্য প্রদান করবে তখন বিচারক তাদেরকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। ماهيته অর্থাৎ, যিনার প্রকৃত সম্পর্কে। কেননা, মানুষ সাধারণভাবে সব ধরণের অবৈধ সহবাসকে যিনা বলে থাকে। অথচ সব ধরনের অবৈধ সহবাস যিনা নয়। যেমন, ঋতুস্রাবগ্রস্থা মহিলার সাথে সহবাস হারাম অথচ তা যিনা নয়, কিংবা যেথায় মালিকানার সাদৃশ্যতা রয়েছে সেথায় সহবাস হারাম অথচ তা যিনা নয়। তাই সাক্ষীদের সাক্ষী প্রদানের সময় বিচারক এমনভাবে জিজ্ঞাসা করবে যাতে প্রকৃত অবস্থা যানা যায়। ২। كيفيته যিনার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কেননা, কখনো যোনি ছাড়া সহবাস করা হয়। যেমন, কেহ পিছনের রাস্থায় সহবাস করল। তা কিন্তু যিনা নয়। অথবা জোরপূর্বক যিনা করলো। তাহলে তাও যিনা এর আওতাভুক্ত নয়। এজন্য তার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ৩। مكانه যিনার সময় কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা, এমনও হতে পারে, যে তা অনেক পূর্বে ঘটেছে বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় হয়েছে আর এখন তা বিচারকের সামনে পেশ করা হচ্ছে। ৫। مزنية তথা সহবাসকৃতা তথা যিনাকারিণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা, হতে পারে সে তারই দাসী বা তার পিতার বা তার পুত্রের দাসী কিংবা তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যে ইদ্দত পালন করছে। যদি এমন হয় তাহলে হদ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং কাজী সাহেব হদ রহিত করার চেষ্টা হিসাবে এসকল বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

قوله : فَاِنْ بَيَّنُوْهُ الخ : সুতরাং যদি সাক্ষ্যগণ সবকিছু বর্ণনা করে এবং বলে যে, আমরা তাকে এই মহিলার সাথে এমনভাবে সহবাস করতে দেখেছি যেমন, সুরমাদানীতে সুরমার শলাকা রাখা হয়, আর কাজী তাদের

সত্যতা সম্পর্কে প্রকাশ্য ও গোপনে তদন্ত করবে। যখন প্রকাশ্য ও গোপনে তাদের সততা সম্পর্কে মতামত আসতে থাকবে তখন কাজী তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী রায় প্রদান করবেন। হদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিচারক সাক্ষ্যদের বাহ্যিক ন্যায় পরাণয়তার ভিত্তিতে ফয়সালা প্রদানকে যথেষ্ট মনে করবে না, বরং তাদের ব্যাপারে গোপনে ও তথ্য সংগ্রহ করবেন। যাতে হদ্দ রহিত করার কোন বাহানা মিলে যায়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : (الترمذى) إدْرَءُو الْحُدُوْدَ مَااسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা যতদূর পার হদ্দকে রহিত কর।' (তিরমিযী শরীফ)

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তত্ত্ব উদ্ঘাটন পর্যন্ত অপরধের অভিযোগে অভিযুক্তকে বন্দি করে রাখা হবে। কেননা, নবী করীম (সা.) এমন এক ব্যক্তিকে আটক রেখেছিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

قوله : وَ بِإِقْرَارِهِ أَرْبَعًا الخ : যিনাকারীর স্বীকারুক্তির দ্বারাও যিনা সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ, যিনাকারী সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি পৃথক পৃথক চারটি মজলিসে তথা চার বৈঠকে চার বার তার উপর যিনার অপরাধ স্বীকার করবে। আর যখনই সে স্বীকার করবে কাজী তা প্রত্যাখ্যান করবেন। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী চার বার স্বীকার করতে হবে চার বৈধতাকে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এক বারই স্বীকার করলেই তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। তিনি উক্ত স্বীকারোক্তিকে অন্যান্য বিষয়ের স্বীকারোক্তির উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, স্বীকারোক্তি হচ্ছে ঘটনা প্রকাশকারী। যা একবার দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে যায় দ্বিতীয় তৃতীয় বা তার চেয়ে বেশি বার স্বীকারোক্তিতে ঘটনার 'প্রকাশ'-কে বৃদ্ধি করে না। আর সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এর বিপরীত। কেননা, এতে ঘটনার প্রকাশকে সুদৃঢ় করে।

আমাদের দলিল : হযরত মাইজে আসলামী (রাযি.)-এর সম্পর্কীয় হাদীস যা বুখারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা.) তার পক্ষ হতে চার মজলিসে চার বার স্বীকারুক্তি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হদ্দ কায়েম বিলম্ব করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল যদি চার বারের কমে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে নবী করীম (সা.) হদ্দ কায়েম করতে বিলম্ব করতেন না। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যিনার বিষয় নয়। কেননা, অন্যান্য বিষয়ে দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেই ফায়সালা করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা চারে উন্নীত করার বিষয়টি যিনার সাথে বিশিষ্ট হয়েছে। এজন্য যিনার গুরুতরতা প্রকাশের জন্য এবং গোপনীয়তার দিক সাব্যস্ত করার জন্য স্বীকারোক্তির সংখ্যাও চারে উন্নীত করা হবে। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের একত্রিত করণের ক্ষেত্রে মজলিসের অভিন্নতার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং মজলিসের অভিন্নতার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির অভিন্নতায় বাহ্যিক সন্দেহ সাব্যস্ত হয়। আর স্বীকারুক্তি যেহেতু স্বীকারুক্তিকারীর সাথে সংযুক্ত তাই তার ভিন্ন ভিন্ন মজলিশ হওয়া ধর্তব্য। পক্ষান্তরে বিচারকের ভিন্ন ভিন্ন মজলিস হওয়া ধর্তব্য নয়। আর তা এভাবে যে, যখন সে স্বীকার করবে কাজী তা প্রত্যাখ্যান করবেন অতঃপর সে কাজীর চোখের আড়ালে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে স্বীকার করবে এভাবে কাজী তার স্বীকারকে তিনবারই প্রত্যাখ্যান করবেন। অতঃপর চতুর্থবার যখন সে স্বীকার করবে তখন আর কাজী তা প্রত্যাখ্যান করবেন না, বরং তাকে পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তকে কখন যিনা করেছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। কেননা, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় দীর্ঘ কাল আগের যিনা থেকে বিরত থাকার জন্য। আর সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বাধা হয়। স্বীকারুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে তা বাধা হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, এ ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা, হতে পারে সে শৈশবের যিনার কথা স্বীকার করছে। আর সে সময়ের যিনা দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব হয় না। সুতরাং যখন সে কাজীর সকল প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিকভাবে প্রদান করতে পারবে তখন তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে।

قوله : فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ الخ : আর যদি হদ্দ জারী করার পূর্বে মধ্যখানে তার স্বীকারুক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইবনে আবী লায়লা

(রহ.) এর মতে তার স্বীকারুক্তি প্রত্যাহার কার্যকর হবে না। বরং এ অবস্থায়ও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তার স্বীকারুক্তির কারণে তার উপর তা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তাই তার প্রত্যাহার বা অস্বীকারের দরুন তা বাতিল হবে না। যেমন, সাক্ষ্য দ্বারা সাবেত হওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রত্যাহার বা অস্বীকার করার দ্বারা বাতিল হয় না। আর তা কিছাছ ও অপবাদ আরোপ জনিত হদ্দ এর সাদৃশ্য হল।

আমাদের দলিল হল : প্রত্যাহার করাও একটি সংবাদ। আর স্বীকার করাও একটি সংবাদ উভয়টি সত্যতার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী কোন পক্ষ নেই। সুতরাং স্বীকারুক্তির ব্যাপারে সন্দেহ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা কিছাছ বা অপবাদের দরুন হদ্দের উপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা, কিছাছ বা অপবাদের হদ্দ তা মূলত বান্দার হক। তাতে তার প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে মিথ্যা সাব্যস্তকারী প্রতিপক্ষ রয়েছে। কিন্তু হদ্দে যিনার তা তো শরীয়াতের হক। তা অস্বীকার বা প্রত্যাহার করাতে এমন কোন প্রতিপক্ষ নেই।

قوله : وَ نَدُبَ تَلَقِّينَهُ الخ : আর শাসকের জন্য বলা উত্তম যে, হয় তো তুমি তাকে চুমু দিয়েছ বা তাকে স্পর্শ করেছ, অথবা সন্দেহমূলকভাবে সহবাস করেছ। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাইযে আসলামী (রাযি.)-কে বলেছিলেন হয়ত তুমি তাকে স্পর্শ করেছ বা চুম্বন দিয়েছ। অর্থাৎ কাজী তার সামর্থ অনুযায়ী হদ্দ রহিত করার ব্যবস্থা করবে। কেননা, হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন ادرءوا الحدود مااستطعتم। তোমরা যতদূর পার হদ্দকে রহিত কর।

فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا رَجَمَهُ فِي فَضَاءٍ حَتَّى يَمُوتَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ لَوْ مُقِرًّا ثُمَّ النَّاسُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ جَلَدَهُ مِائَةً وَنِصْفٌ لِلْعَبْدِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ مُتَوَسِّطًا وَيَنْزِعُ عَنْهُ ثِيَابَهُ وَفَرَّقَ عَلَى بَدَنِهِ إِلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحُدُودِ وَغَيْرَ مَمْدُودٍ وَلَا يُنْزَعُ ثِيَابُهَا إِلَّا الْفَرْوَ وَالْحَشْوَ وَتُضْرَبُ جَالِسَةً وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ لَا لَهُ وَلَا يَحُدُّ عَبْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْمٍ وَلَا بَيْنَ جَلْدٍ وَنَفْيٍ وَلَوْ غَرَّبَ بِمَا يَرَى صَحَّ وَالْمَرِيضُ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ حَتَّى يَبْرَأَ وَالْحَامِلُ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَلِدَ وَتَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا لَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ -

অনুবাদ : যদি সে মুহসিন হয় তবে কোন ময়দানে এমনভাবে তাকে প্রস্তর মারতে থাকবে যেন সে মারা যায়। প্রথমে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে সাক্ষীগণ। যদি তারা প্রস্তর মারতে অস্বীকার করে তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। অতঃপর বিচারক প্রস্তর মারবে তারপর সাধারণ জনগণ প্রস্তর মারবে। আর যদি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যিনা সাব্যস্ত হয় তাহলে বিচারক প্রথমে প্রস্তর মারবে। অতঃপর জনগণ মারবে। আর যদি যিনাকারী মুহসিন না হয় তাহলে হদ্দ হল স্বাভাবিক শক্তিতে একশত আর গোলামের ক্ষেত্রে তার অর্ধেক দোররা লাগানো হবে। (দোররা এমন হবে) যার মাথার গিট থাকবে না। (আর দোররা মারার সময় লুঙ্গি ছাড়া) পুরুষের দেহ থেকে কাপড় খোলা হবে। আর মাথা, চেহারা, গুপ্তাঙ্গ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আঘাত করা হবে। সব ধরনের হদ্দে পুরুষকে দাড়ানো এবং দীর্ঘায়িত করা ছাড়া (তথা বাধা ছাড়া) অবস্থায় প্রহার করা হবে। চামড়া এবং তুলার পোষাক ছাড়া কোন কাপড় মহিলার শরীর থেকে খোলা হবে না। মহিলাকে বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে। আর প্রস্তর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে মহিলার জন্য গর্ত খনন করা হবে। পুরুষের জন্য নয়। শাসকের অনুমতি ছাড়া মনিব তার গোলামের উপর হদ্দ কায়েম করতে পারবে না। আর প্রস্তর নিক্ষপের ক্ষেত্রে মুহসান হওয়ার অর্থ হল, স্বাধীন হওয়া, সুস্থ মস্তিস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া। বৈধ বিবাহের দ্বারা সহবাস করে থাকা এমতাবস্থায় যে, তারা উভয় মুহসান (অর্থাৎ, এ অবস্থায় যিনা করেছে যে, তারা উভয় বিবাহিত।)

(আর মুহসানের ক্ষেত্রে) বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপ একত্র করা যাবে না। (আর অবিবাহিতার ক্ষেত্রে) বেত্রাঘাত ও নির্বাসন একত্র করা যাবে না। আর যদি শাসক উপকার মনে করে নির্বাসন করেন তবে তা সহীহ। অসুস্থ ব্যক্তিকে (বিবাহিত হলে) প্রস্তরাঘাত করা যাবে আর (অবিবাহিত হলে) সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বেত্রাঘাত করা যাবে না। আর গর্ভবতীকে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত হদ্দ কায়েম করা যাবে না। আর যদি তার হদ্দ বেত্রাঘাত হয় তাহলে নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বের করা হবে না। (তথা বেত্রাঘাত করা যাবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَإِنْ كَانَ مُحْصِنًا الخ : যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বা নিজ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হদ্দ ওয়াজিব হয় আর যিনাকারী মুহসিন হয় তাহলে কোন ময়দানে তাকে এমনভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে, যাতে সে মৃত্যুবরণ করে। কেননা, নবী করীম (সা.) হযরত মাইযে আসলামী (রাযি.) কে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর তিনি মুহসান ছিলেন এবং আঘাতে আঘাতে তাকে নিহত করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রসিদ্ধ হাদিসে উল্লেখ আছে و زنا بعد الاحصان 'যদি মুহসান অবস্থায় যিনা করে (তবে তার খুন হালাল হবে)' আর এর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

قوله : وَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ الخ : সর্বপ্রথম সাক্ষীগণ প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করবে। তারপর শাসক তারপর জনগণ প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। হযরত আলী (রাযি.) থেকে তেমনি বর্ণিত রয়েছে। কেননা, সাক্ষী কখনো মিথ্যা বা সন্দেহ বশতঃ সাক্ষ্য প্রদানের দুঃসাহস করে থাকে। কিন্তু যখন তার দ্বারাই প্রস্তর নিক্ষেপের বিষয়টি সূচনা করা হবে তখন বিষয়টির গুরুতর এর দিক বিবেচনা করে তা প্রত্যাহার করতে পারে। আর এতে সুকৌশলের মাধ্যমে হদ্দ রহিত করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সাক্ষীগণ প্রথমে প্রস্তর নিক্ষেপ করার বিষয়টি শর্ত নয়। কেননা, সাক্ষ্য দ্বারাই তো হুকুম আবশ্যক হয়ে যায়। তাদের দ্বারা রজম মারানো আবশ্যক নয়। তাছাড়া তিনি বেত্রাঘাতের উপর কিয়াস করে বলেন, যেহেতু বেত্রাঘাত সাক্ষ্য দ্বারা সূচনা করানো হয় না তাই এখানেও সাক্ষ্য দ্বারা সূচনা করানো হবে না।

আমাদের দলিল হল : বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সংযমী হয়ে মধ্যম ধরনের বেত্রাঘাতে সবাই সক্ষম নয়। কেননা, অনেকের বেত্রাঘাত প্রাণ নাশের কারণ হতে পারে। অথচ প্রাণনাশ তার প্রাপ্য নয়। কিন্তু রজমের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। বরং এ ক্ষেত্রে প্রাণনাশই উদ্দেশ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সুকৌশলে হদ্দ রহিত করার قرينة বা কারণ পাওয়া যেতে পারে। যাতে হদ্দ রহিত করা সম্ভব হয়। সুতরাং যদি সাক্ষ্যগণ প্রস্তর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তাতো সাক্ষ্য প্রত্যাহারের প্রকাশ্য প্রমাণ। তবে স্বীকার করার সুরতে সরাসরি হদ্দ রহিত হয় না। কেননা, তা স্পষ্টভাবে رجوع عن الشهادة নয়। বরং এর জন্য قرينة মাত্র। আর হদ্দকে রহিত করার জন্য এই قرينة ই যথেষ্ট। কিন্তু حدقذف কায়েম করার জন্য তা যথেষ্ট নয়। আর জাহিরী রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাক্ষ্যগণ গায়েব হওয়ার সুরতে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, সম্ভাবনা আছে যে, তারা তাদের সাক্ষ্য প্রদান থেকে ফিরে এসেছে। আর সাক্ষীদের মৃত্যুর সুরতে সাক্ষ্যই শেষ হয়ে যায়। অথচ রজম করা পর্যন্ত তাদের বহাল থাকা শর্ত। সুতরাং এ সুরতেও হদ রহিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ يَبْدَأُ الإِمَامُ الخ : যদি যিনাকারীর স্বীকারুক্তির ভিত্তিতে রজম সাব্যস্ত হয় তাহলে সর্বপ্রথম শাসক প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। তারপর জনসাধারণ নিক্ষেপ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গামিদিয়া মহিলাকে চানাবুট আকারের একটি পাথর কণা নিক্ষেপ করে রজম আরম্ভ করেছেন। আর সে যিনার স্বীকারুক্তি করেছিল। উল্লেখ্য যে, রজম কৃত ব্যক্তিকে অন্যান্য মৃতগণের মতো গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাযার নামাজ পড়ে কবরস্থ করা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ হযরত মাইয (রাযি.) সম্পর্কে বলেছিলেন : اِصْنَعُوْا بِهِ كَمَا تَصْنَعُوْا بِمَوْتَاكُمْ - 'তোমাদের নিজেদের মৃতদের সাথে যে আচরণ কর তার সাথেও অনুরূপ আচরণ কর।' নবী করীম (সা.) গামিদি মহিলার উপর জানাযার নামাজ পড়েছিলেন। তাছাড়া সে তো একটি 'হক' এর বিপরীতে নিহত হয়েছে। তাই গোসল, কাফন, দাফন ইত্যাদি রহিত হবে না। তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, নবী করীম (সা.) হযরত মাইয আসলামী (রাযি.) এর উপর জানাযার নামায পড়েছিলেন। সর্বোপরি তার উপর জানাযার নামাজ পড়া হবে।

قوله : وَ لَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ جَلَدَهُ الخ : আর যদি ব্যভিচারকারী লোকটি মুহসান না হয় এবং স্বাধীন হয় তাহলে তাকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ -

'ব্যভিচারকারিণী ও ব্যভিচারকারী তাদের প্রত্যেককে একশতটি দোররা মার।' উক্ত আয়াতখানা মুহসান ও মুহসানাহ এর ক্ষেত্রে রহিত হয়ে গেছে। তাই শুধু গায়রে মুহসান ও মুহসানাহের জন্য প্রযোজ্য হবে। শাসক তাকে প্রহার করার জন্য এমন একটি চাবুকের হুকুম দিবেন যার মাথায় গিট নেই। আর তাকে মধ্যম ধরনের প্রহার করা হবে। শরহে বিকায়া গ্রন্থে ثمرة 'গিট' এর ব্যাখ্যা করতে বলেন, মাগরিব গ্রন্থে উল্লেখ আছে ثمرة অর্থ চুড়া বা লাঠির ধার। কেউ বলেন এর অর্থ গিট। মাগরিব গ্রন্থকার বলেন , প্রথম মতটি বিশুদ্ধ। সিহাহ কিতাবে আছে লাঠির মাথার গিঠকে ثمرة বলে। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হযরত আলী (রাযি.) যখন হদ্দ কায়েমের ইচ্ছা করেছিলেন, তখন চাবুকের মাথার গিট ভেংগে নিয়েছিলেন। আর মধ্যমতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন মারাত্মক জখম না হয়। আর এমন সহজও যেন না হয় যে, কোন ব্যাথা অনুভব হয় না। বরং ব্যাথা তো পৌঁছানো উদ্দেশ্যে অধিকন্তু প্রাণ নাশের উপক্রম জখম হবে না।

قوله : وَ نَزَعَ ثِيَابَهٗ الخ : আর পুরুষের শরীর থেকে কাপড় খোলা হবে। তবে হা তার ইজার তথা লুঙ্গি খোলা হবে না। কেননা, হযরত আলী (রাযি.) যখন হদ্দ কায়েম করতেন তখন কাপড় খোলার নির্দেশ দিতেন। তাছাড়া বস্ত্র মুক্ত করার দ্বারা তার দেহে আঘাত বা ব্যথা পৌঁছাবে। কিন্তু লুঙ্গি খোলা হবে না। কেননা, তার দ্বারা গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে যায়। তাই তা পরিহার করা হবে।

قوله : وَ فُرِّقَ عَلٰى بَدَنِهٖ الخ : যাকে বেত্রাঘাত করা হবে তার মাথা, চেহারা এবং গুপ্তাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গে প্রহার করা হবে। আবার কোন এক অঙ্গে শুধু প্রহার করা যাবে না। কেননা, তা প্রাণ নাশের কারণ হতে পারে। অথচ তা শরীয়ত কর্তৃক গৃহিত হয়েছে শাস্তিস্বরূপ, প্রাণ নাশের জন্য নয়। আর চেহারা বা গুপ্তাঙ্গে কিংবা মাথায় প্রহার করতে পারবে না। একারণে যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন اِتَّقِ الْوَجْهَ وَ مَذَاكِيْرَ তার চেহারা ও গুপ্তাঙ্গে প্রহার করা থেকে বেঁচে থাক। তাছাড়া একারণে যে, লজ্জাস্থানে প্রহার দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। আর চেহারা ও মাথাও তেমনি। তাছাড়া মাথা হচ্ছে সকল অনুভুতির কেন্দ্রবিন্দু। আর চেহারা তো সৌন্দর্যের কেন্দ্র। তাই তাতে শরীয়াত প্রহারের অনুমোদন দেয় নাই।

قوله : وَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَائِمًا الخ : সকল হদ্দের ক্ষেত্রে পুরুষকে দাড় করে প্রহার করা হবে। কেননা, হযরত আলী (রাযি.) বলেন :

يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً فِى الْحُدُوْدِ

'হদ্দসমূহে পুরুষদের দাড়ানো অবস্থায় আর মহিলাদের বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে।'

তাছাড়া একারণে যে, তাতে প্রচার হয় বেশি। আর হদ্দের ভিত্তি রাখা হয়েছে প্রচারের উপরই। আর তাকে দীর্ঘায়িত করে রাখা হবে না। তথা টেনে রাখা হবে না। তার ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন যে, দু পা বেঁধে মাটিতে ফেলে দোররা মারবে না। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ চাবুক টেনে ধরে মাথার উপর তুলে প্রহার কারীর আঘাত করা। সুতরাং তা করা যাবে না। কেননা, তা প্রাপ্য শাস্তির অতিরিক্ত।

قوله : وَلَايُنْزَعُ ثِيَابُهَا الخ : আর হদ্দ কায়েমের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের শরীরের কাপড় খোলা হবে না। তবে তার দেহে যদি চামড়া অথবা তুলার পোশাক থাকে তবে তা খোলা হবে। কেননা, তার কাপড় খোলার দ্বারা তার গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা হয়। অথচ তা বৈধ নয়। কিন্তু যদি তার গায়ে চামড়া বা তুলার পোষাক থাকে তবে তা খোলা হবে। কেননা, তা দেহে থাকার দ্বারা সে ব্যথা থেকে বেঁচে যাবে। অথচ প্রহারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরে ব্যথা পৌঁছানো।

আর স্ত্রী লোকদেরকে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রহার করা হবে। কেননা, তার জন্য ইহা সতর। তাছাড়া হযরত আলী (রাযি.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قوله : وَ يَحْضُرُ لَهَا الخ : আর রজমের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের জন্য গর্ত খনন করা জায়েয হবে। কেননা, নবী করীম (সা.) গামেদী মহিলার জন্য বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করেছিলেন। তেমনি হযরত আলী (রাযি.) শারাহা হামদানী মহিলার জন্য গর্ত খনন করেছিলেন। আর যেহেতু নবী করীম (সা.) তা করতে আদেশ দেননি তাই যদি কেহ গর্ত খনন না করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, সে তো তার কাপড়ে আবৃত আছেই। তবে উত্তম হল গর্ত খনন করা। আর তা পূর্বোক্ত হাদীস অনুযায়ী বক্ষ পর্যন্ত হবে। কিন্তু পুরুষের জন্য গর্ত খনন করা হবে না। কেননা, নবী করীম (সা.) হযরত মাইজ (রাযি.) এর জন্য গর্ত খনন করেন নি। আর তা এজন্যও হতে পারে যে, পুরুষের ক্ষেত্রে হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচার প্রসার। যাতে সমাজ তার থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এজন্য বেঁধে রাখা বা ধরে রাখা শরীয়ত সম্মত নয়।

قوله : وَلَا يُحَدُّ عَبْدَهُ الخ : শাসকের অনুমতি ছাড়া মনিব তার গোলামের উপর কোনরূপ হদ্দ কায়েম করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মনিবের জন্য শাসকের অনুমতি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং সে শাসকের ন্যায় তার গোলামের উপর পূর্ণ হদ্দ কায়েম করতে পারবে। কেননা, শাসকের ন্যায় তারও গোলামের উপর পূর্ণ অভিভাকত্ব রয়েছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে সে শাসকের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। তাই তা সাধারণ শাস্তির ন্যায় হল।

আমাদের দলিল হল : নবী করীম (সা.) চারটি বিষয় কায়েমের ক্ষমতা শাসকের উপর ন্যস্ত করেছেন। তন্মধ্যে হদ্দের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া একারণে তাতো শরীয়তের হক। সুতরাং তা বান্দা করে দেওয়ার দ্বারা মাফ হবে না। সুতরাং শরীয়তের যিনি প্রতিনিধি তিনিই তা উসুল করবেন। আর তিনি হলেন শাসক বা তার স্থলবর্তী। সাধারণ শাস্তির বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, তা বান্দার হক। একারণেই বালককে প্রহার করা যায় অথচ শরীয়তের হক তার উপর প্রজোয্য নয়।

قوله : وَ إِحْصَانُ الرَّجْمِ الخ : إِحْصَانٌ ইহা باب افعال এর মাসদার। আর তার থেকে محصن ব্যবহৃত হয়। صاد বর্ণে যবর যোগে বা যের যোগে ব্যবহার হতে পারে। احصان হচ্ছে পবিত্রতা। নিজেকে হারাম থেকে বাচিয়ে রাখা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ (যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়) বিবাহিতা নারী পুরুষকেও محصن ও محصنه বলা হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে فاذا احصن (আর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়) আজাদ অর্থে احصان ব্যবহৃত হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে : نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (স্বাধীনা নারীর অর্ধেক শাস্তি) বিয়ে করে সহবাস (তথা বৈধ সহবাস) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

إِذَا أٰتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ

(যখন তোমরা তাদেরকে মুহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী (সহবাস) করার জন্য। কামভাব চরিতার্থ করার জন্য নয়।)

আর محصن শব্দটি ঐসব শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর اسم فاعل টি مُفْعَلٌ তথা عين বর্ণে যবর হয়েও আসে। যদিও اسم فاعل এর عين كلمة টি যের যুক্ত হওয়া নিয়ম। তবে اسم فاعل হয়েও عين كلمة তে যবর হওয়া شاذ বা বিরল। উল্লেখ্য যে, احصان সাতটি বিষয়ের সমন্বয়ে হয়। (১) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে محصن সাবস্ত হল না। তাই সে হদ্দের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেল। (২) জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। কেননা তাছাড়া শরীয়তের হুকুম প্রজোয্য হয় না। (৩) স্বাধীন হওয়া। (৪) বৈধ বিবাহে আবদ্ধ থাকা (৫) (বৈধ

বিবাহে) সহবাসকারী হওয়া। (৬) صِفَةُ الْإِحْصَانِ এর ক্ষেত্রে উভয় ইনসান হতে হবে। ৭। মুসলমান হতে হবে। এসকল হচ্ছে বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত বড় বড় নিয়ামত। সুতরাং নেয়ামত হিসেবে এগুলো যেমন বড় ও মহান তেমনি তার লঙ্ঘন তথা যিনার শাস্তিও হতে হবে তেমনি। তাই শরীয়ত এর শাস্তি ধার্য করেছে রজম বা প্রস্তরাঘাত।

তাছাড়া স্বাধীন অবস্থায় বিশুদ্ধ বিবাহ করার সামর্থ সৃষ্টি করে। আর বিশুদ্ধ বিবাহ হালাল সহবাসের সামর্থ সৃষ্টি করে। আর হালাল সহাবাস তৃপ্তি দান করে। এদিকে সে মুসলমান হওয়ার দরুন মুসলিম নারী বিবাহ করার সুযোগ করে দিয়েছে। আর যিনা হারাম হওয়ার বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করে। তাই এসকল শর্ত পাওয়া যাওয়ার অর্থ হল সে যিনা থেকে দুরে থাকবে। সুতরাং প্রতিবন্ধকতা পূর্ণ মাত্রায় থাকার পরও যেহেতু যিনা করে বসল তখন অবশ্যই তা অপরাধ হিসাবে অত্যন্ত গুরুতর হবে। محصن এর জন্য আমাদের মতে ইসলাম হওয়া শর্ত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মুসলমান হওয়া محصن এর জন্য শর্ত নয়।

তাদের দলিল হল : নবী করীম (সা.) যিনাকারী দুই ইয়াহুদী (নরনারী)কে রজম করেছেন। যা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে যিনা সাব্যস্ত হতে হলে محصن হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। আমাদের দলীল হল : নবী করীম (সা.) এর ইরশাদ : مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ مُحْصِنٌ যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মুহসিন নয়। আর আল্লাহর রাসূল (সা.) যে ইয়াহুদীকে রজম করেছেন সেটা তাওরাতের বিধান মোতাবেক ছিল।

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) উভয়ের মধ্যে ইহসান হওয়ার গুণ বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং যদি কাফের স্ত্রীর সাথে কিংবা দাসীর সাথে অথবা বিকৃত মস্তিস্ক স্ত্রীর সাথে অথবা নাবালিকা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে তাহলে স্বামী মুহসিন নয়। তেমনি যদি স্বামীর মধ্যে এমন (তথা মুহসিন না হওয়ার) গুণ থাকে আর স্ত্রীর মধ্য محصنة হওয়ার অন্যান্য গুণ বিদ্যমান থাকে তাহলে স্ত্রী মুহসিনাহ নয়। কেননা, বর্ণিত সমস্যাসমূহ থাকলে সহবাসের নিয়ামত পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না। কেননা, যদি স্ত্রী বিকৃত মস্তিষ্ক হয় তাহলে আর প্রতি রুচি কম থাকে তেমনি দাসীর প্রতিও আকর্ষণ কম থাকে। কেননা, সন্তান তো অন্যের গোলাম বাদী হয়ে থাকে। তেমনি অপ্রাপ্ত হলে তার কোন আকর্শণ না থাকায় তার প্রতিও আকর্ষণ কম থাকে। আর ধর্মের ভিন্নতার দরুন অন্তরঙ্গতা কম থাকে। তাই পূর্ণ মাত্রায় সহবাসের নিয়ামত পাওয়া গেল না। এজন্য সে মুহসান হতে পারল না। পক্ষান্তরে কাফের স্ত্রীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ব্যতিক্রম মতামত ব্যাক্ত করেন। তার বিপক্ষে আমাদের দলিল হুজুর (সা.) এর হাদীস مَنْ اَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ যে আল্লাহর সাথে শরীক করে যে মুহসান নয়।

অন্যত্র ইরশাদ করেন : لَا تَحْصُنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُوْدِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْحُرَّةُ وَالْعَبْدُ ইহুদী বা নাসারানী স্ত্রী মুসলিম স্বামীকে এবং স্বাধীনা স্ত্রী গোলাম স্বামীকে মুহসান বানাতে পারে না।

قوله : وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ جَلْدٍ وَ رَجْمٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, (বিবাহিত محصن) এর ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ও রজম একত্র করা যাবে না। কেননা, রাসূল (সা.) এমনটি করেননি। তাছাড়া এজন্য যে রজমের সাথে বেত্রাঘাত উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। কেননা, যখন রজম দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হল। তখন তা সর্বোচ্চ শাস্তি হল। আর তা চুড়ান্তভাবে অন্যকে সতর্ক করে। আর রজম কৃত ব্যক্তিকে তো শেষ করে দেয়া হয়। তাই তার ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত দ্বারা সতর্ক করার প্রশ্নই উঠে না।

قوله : وَ جَلْدٍ وَ نَفْيٍ الخ : অনুরূপভাবে সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অবিবাহিতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনা প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হল শুধু একশত বেত্রাঘাত। এর সাথে এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করার বিধান যুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, হদ্দরূপে উভয় শাস্তিকে একত্র করা যাবে। তিনি দলীল দেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস : اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ 'কুমারের সাথে কুমারীর ব্যভিচারে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের দেশান্তর।'

দ্বিতীয় দলীল হল : দেশান্তর দ্বারা উক্ত ব্যক্তির পরিচয়, পরিচিতি সল্প হওয়ার দরুন সে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আমাদের দলিল : কুরআনের আয়াত : فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে সমগ্র শাস্তি একশত বেত্রাঘাতকেই ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং خبر واحد দ্বারা তার উপর বৃদ্ধি করা যাবে না। তাছাড়া যখন সে দেশান্তর হল তখন আত্মীয়-স্বজনের ভয় বা লজ্জা কিছুই তার মধ্যে থাকবে না। তাই সে অবাধে যিনা করার সুযোগ পাওয়ার আশংকা রয়েছে। এমনিভাবে জীবিকার কষ্টে পতিত হয়ে ইহাকে সে জীবিকার মাধ্যম বানাতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর পেশকৃত হাদীসের পরের অংশের ন্যায় তাও রহিত। পরের অংশ হচ্ছে :

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ

'আর বিবাহিত বিবাহিতার সাথে ব্যভিচার করলে একশত বেত্রাঘাত ও পাথর দ্বারা রজম।'

সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলীল ত্রুটি পূর্ণ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য হল না। তবে হা এ বিষয় শাসকের হাতে ন্যাস্ত হবে। অর্থাৎ, যদি শাসক তা ভাল ও উপকার মনে করে তাহলে দেশান্তর করতে পারবেন। তবে মনে রাখতে হবে তা হদ্দ নয়, বরং সাধারণ শাস্তি ও শাসন।

قوله : وَ الْمَرِيْضُ يُرْجَمُ الخ : যদি যিনাকারী অসুস্থ হয় আর তার শাস্তি হয় রজম তাহলে তা কার্যকর করতে হলে অসুস্থতা বাধা দানকারী হবে না। বরং তার অসুস্থার অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে। কেননা, তার ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রাণনাশ করা। সুতরাং অসুস্থতার দরুন প্রস্তর নিক্ষেপ স্থগিত হবে না। আর যদি তার হদ্দ বেত্রাঘাত হয় তাহলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত হদ্দ প্রয়োগ করা স্থগিত হবে। কেননা, তার ক্ষেত্রে প্রাণ নাশের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং তা চুরের শাস্তির ন্যায় হল। (এভাবে যে চোরের হাত প্রচন্ড গরমে বা শীতে কর্তন করা থেকে স্থগিত রাখা হবে। কেননা, এক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। তাই অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে।

قوله : وَالْحَامِلُ لَاتُحَدُّ الخ : আর যদি গর্ভবতী যিনাকারী সাব্যস্ত হয় তাহলে গর্ভপাত পর্যন্ত তার হদ্দ স্থগিত রাখা হবে। যাতে গর্ভের সন্তানের মৃত্যুর কারণ না হয়। কেননা, সন্তানের কোন অপরাধ নেই। যদি উক্ত গর্ভবতীর উপর হদ্দ আবশ্যক হয় সাক্ষীগণের মাধ্যমে তাহলে তাকে বন্দি করে রাখা হবে। যাতে সে পালিয়ে না যায়। কিন্তু স্বীকারুক্তির বিষয়টি এর ভিন্ন। কেননা, এক্ষেত্রে প্রত্যাহারের সুযোগপূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। তাই বন্দির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

আর যদি উক্ত গর্ভবতী রজমের হদ্দ প্রাপ্ত হয় তাহলে গর্ভপাতের পর নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন , যদি ভূমিষ্ট সন্তানকে অন্য কোন ব্যক্তি লালন-পালনের না থাকে তাহলে উক্ত সন্তান তার উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত হদ্দ বিলম্ব করা হবে। আর যদি উক্ত মহিলা বেত্রাঘাতের হদ্দ প্রাপ্ত হয় তাহলে সে নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে। কেননা, নেফাস একটি অসুস্থতা। সুতরাং তা আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা হবে।

بَابُ الْوَطْئِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِي لَا يُوجِبُهُ

পরিচ্ছেদ : যে সহবাস হদ্দকে আবশ্যক করে আর যা হদ্দকে আবশ্যক করে না।

لَا حَدَّ بِشُبْهَةِ الْمَحَلِّ وَإِنْ ظَنَّ حُرْمَتَهُ كَوَطْءِ أَمَةِ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَمُعْتَدَّةِ الْكِنَايَاتِ وَبِشُبْهَةٍ فِي الْفِعْلِ إِنْ ظَنَّ حِلَّهُ كَمُعْتَدَّةِ الثَّلَاثِ وَأَمَةِ أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ فِي الْأَوَّلِ فَقَطْ وَحُدَّ بِوَطْءِ أَمَةِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ وَإِنْ ظَنَّ حِلَّهُ وَامْرَأَةٍ وُجِدَتْ فِي فِرَاشِهِ لَا بِأَجْنَبِيَّةٍ زُفَّتْ وَقِيلَ هِيَ زَوْجَتُكَ وَعَلَيْهِ مَهْرٌ وَبِمَحْرَمٍ نَكَحَهَا وَفِي أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلٍ وَلِوَاطَةٍ وَبِبَهِيمَةٍ وَبِزِنًا فِي دَارِ حَرْبٍ أَوْ بَغْيٍ وَبِزِنَا حَرْبِيٍّ بِذِمِّيَّةٍ فِي حَقِّهِ وَبِزِنَا صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ بِمُكَلَّفَةٍ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ وَبِإِكْرَاهٍ وَبِإِقْرَارٍ إِنْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْقِيمَةُ وَالْخَلِيفَةُ يُؤْخَذُ بِالْقِصَاصِ وَالْأَمْوَالِ لَا بِالْحَدِّ -

অনুবাদ : হদ্দ আবশ্যক হয় না شبهة المحل বা ব্যভিচারের পাত্র/পাত্রীতে সন্দেহের দরুন। যদিও সে তা হারাম হওয়ার ধারণা করে। যেমন, ছেলের দাসীর সাথে বা নাতির দাসীর সাথে কিংবা কেনায়া তালাক প্রাপ্তার ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে সহবাস করা। আর شبهة الفعل বা ব্যভিচারের কর্মে সন্দেহের দরুন (হদ্দ আবশ্যক হয়) যদি সে তা হালাল হওয়ার ধারণা করে। যেমন তিন তালাক প্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে, তার পিতা বা মাতার কিংবা তার স্ত্রীর অথবা মুনিবের দাসীর সাথে সহবাস করে। আর শুধু প্রথম সুরতে নসব সাব্যস্ত হবে। আর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে তার ভাইয়ের বা তার চাচার দাসীর সাথে সহবাস করা দ্বারা যাকে সে তার বিছানায় পেল। তবে হদ্দ আবশ্যক হবে না এমন অপিরিচিত নারীর সাথে সহবাস দ্বারা যাকে তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হল যে তোমার (নব) বধু। তবে তার উপর (ঐ মহিলার) মহর আবশ্যক হবে আর এমন মাহরামের সাথে সহবাস দ্বারা যাকে সে বিবাহ করেছে। (তদ্রূপ) এমন অপরিচিত মহিলার যৌনাঙ্গ ভিন্ন সহবাস দ্বারা (তদ্রূপ) দারুল হরবে কিংবা বিদ্রোহীদের বসত এলাকায় যিনা হলে। (তদ্রূপ) কোন নাবালক বা পাগলের প্রাপ্ত বয়স্কা ও সুস্থ মস্তিষ্কার সাথে সহবাস দ্বারা, কিন্তু এর বিপরীত হদ্দ আবশ্যক হবে। (অর্থাৎ, যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক পুরুষ কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা পাগলীর সাথে সহবাস করে তাহলে শুধু পুরুষের উপর হদ্দ আবশ্যক হবে। (তদ্রূপ) ভাড়া কৃতার সাথে সহবাসের দ্বারা, জোরপূর্বক সহবাস করানো দ্বারা, (তদ্রূপ) একজনের স্বীকারুক্তি আর অন্যজনের তা অস্বীকার করার দ্বারা, (হদ্দ আবশ্যক হয় না।) কেউ যদি কোন দাসীকে ধর্ষণ করে ফলে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে এবং তার উপর দাসীটির মূল্য ওয়াজিব হবে। আর শাসককে দায়ী করা হবে কেসাস ও মালের মাধ্যমে তবে হদ্দ হিসাবে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এযাবত যিনা এবং তার হদ্দ সম্পর্কে বর্ণনা করার পর এ পরিচ্ছেদে হদ্দ আবশ্যককারী সহবাস নিয়ে আলোচনা করতেছেন। উল্লেখ্য যে, ইবনে হাযম (রহ.) সহ আহলে জাহিরীদের মতে شبهات বা সন্দেহপূর্ণ তা হদ্দ রহিত হয় না। কিন্তু জামহুরে ফুকাহা ও ইমামদের মতে شبهات বা সন্দেহের দ্বারাও হদ্দ রহিত হতে পারে। কেননা, হাদীসে মারফু সাহাবায়ে কেরামের আছার এবং ফুকাহাদের এ ব্যাপারে সর্বসম্মত মত রয়েছে। সুতরাং তা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। যেমন হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন : اُدْرَءُوا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ তাছাড়া অন্যত্র বর্ণনা করেন اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ (তোমরা সন্দেহের কারণে হদ্দকে দূর করে দাও)। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন যে, আমি সন্দেহের দরুন হদ্দকে রহিত করা উত্তম মনে করি, সন্দেহের সাথে হদ্দকে কায়েম করা থেকে। হযরত মুআজ (রাযি.) হযরত উকবা (রাযি.) হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকেও সন্দেহের দরুন হদ্দকে রহিত করার বর্ণনা রয়েছে।

قوله : لَاحَدَّ بِشُبْهَةٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে সন্দেহের দরুন হদ্দ রহিত হওয়ার বিবরণ পেশ করতেছেন। সুতরাং شبهة বা সন্দেহ তা দুভাবে হতে পারে। ১। شبهة المحل (ব্যভিচারের পাত্র/পাত্রীতে সন্দেহ) আর তার উপর নাম شبهة حكمية (অধিকার জনিত সন্দেহ) বা شبهة الملك (মাকিনা জনিত সন্দেহ) যদি এ ধরনের সন্দেহ পাওয়া যায় তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, স্বকীয়ভাবে হারামত্ব নাকচকারী প্রমাণ বিদ্যমান থাকা দ্বারা। আর তা সহবাসকারীর ধারণা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে মালিকানা সাব্যস্তকারী বিষয়সমূহের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আর তা মোট ছয়টি : ১। পুত্র বা পৌত্রের দাসীর সাথে যিনা করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন اَنْتَ وَ مَالُكَ لِاَبِيْكَ তুমিও তোমার মাল তোমার পিতার জন্য। ২। ইঙ্গিতকৃত শব্দাবলী দ্বারা তালাক দানের পর সহবাস। কেননা, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে তা দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হয় নাকি রাজঈ তালাক। (তবে হা আমাদের মতে তা দ্বারা বায়েন তালাক পতিত হওয়া গ্রহণযোগ্য,) ৩। বিক্রেতার জন্য দখল হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রিত দাসীর সাথে সহবাস। কেননা, বিক্রেতার জন্য সহবাসের উপর যে কবজা ছিল তা হস্তান্তর না করার কারণে এখনও বাকী রয়েছে হিসাবে ধারণা করা হয়। ৪। স্বামী কর্তৃক বিবাহের মহররূপে সাব্যস্ত দাসীর সাথে সহবাস যার উপর স্ত্রী কর্তৃক দখল হয়নি। ৫। দু' শরীকানাধীন দাসীর যে কোন একজনের সাথে বৈবাহিক সহবাস। ৬ বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী দাসীর সাথে সহবাস। এসকল সুরতে যদিও যিনাকারী স্বীকার করে যে আমি জানতাম যে এ পাত্রীটি আমার জন্য হারাম তারপও হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আর এক্ষেত্রে যদি সহবাসকারী সন্তানের দাবী করে তাহলে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قوله : وَ بِشُبْهَةِ الْفِعْلِ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (রহ.) সন্দেহের দ্বিতীয় প্রকার শুরু করতেছেন। আর তা হল شبهة الفعل (ব্যভিচার কর্মে সন্দেহ) আর এটাকে شبهة اشباه (হারামত্বের দ্বিধা জনীত সন্দেহ) বলা হয়। আর তা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে প্রমাণগত দ্বিধায় পড়েছে, অর্থাৎ, অপ্রমাণকে প্রমাণ ভেবে নিয়েছে। অবশ্যই এ দ্বিধা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রবল ধারণা বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং তার উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে একথার দাবী করে যে আমি জানতাম তা আমার জন্য হারাম তাহলে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে। আর যদি সন্তানের দাবী করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, তা খালেছ যিনা তবে তার থেকে হদ্দ রহিত হচ্ছে লোকটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি কারণে। আর তা হল তার প্রবল ধারণা মতে হারামত্বের স্পষ্টতা। شبهة الفعل হচ্ছে আটটি। ১। পিতা, দাদার (যত উর্ধ্বতন হোক) দাসীর সাথে সহবাস। ২। মাতার দাসীর সাথে সহবাস। ৩। স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস। ৪। ইদ্দত অবস্থায় তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস। ৫। অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত তালাকের মাধ্যমে বায়েন তালাক প্রাপ্ত

ইদ্দতরত স্ত্রীর সাথে সহবাস। ৬। মালিকের আজাদকৃত ইদ্দত অবস্থা উম্মেওয়ালাদের সাথে সহবাস। ৭। গোলামের জন্য মুনিবের দাসীর সাথে সহবাস। ৮। কিতাবুল হুদুদের বর্ণনা অনুযায়ী বন্ধকী দাসীর সাথে বন্ধক গ্রহীতার সহবাস। সুতরাং আলোচ্য স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাসকারী যদি প্রবল ধারণা মতে বলে যে আমি জানতাম তাদের সাথে সহবাস করা হালাল তাহলেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না।

قوله : وَ حُدَّ بِوَطْيِ اَمَةِ اَخِيْهِ الخ : আর যদি কেহ নিজ ভাইয়ের দাসী বা চাচার দাসীর সাথে সহবাস করে আর বলে যে আমি জানতাম তা আমার জন্য হালাল তাহলেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তাদের মাঝে সম্পদ ব্যবহারের প্রশস্ততা নেই। আর তা জন্মসূত্র ছাড়া বাকী সকল মাহরামাতের বেলায় প্রযোজ্য।

قوله : وَ اِمْرَاَةٌ وَجَدَهَا الخ : আর যদি কোন ব্যক্তি তার শয্যায় কোন মহিলাকে পায়। আর তার সাথে সহবাস করে বসে তাহলে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে। কেননা, দীর্ঘ সম্পর্কের পর অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং তা ধারণাগত ভুল প্রমাণিত হতে পারে না। আর ইহা একারণে যে, স্ত্রীর শয্যায় বাড়ীর অন্য কোন মাহরাম ঘুমিয়ে থাকতে পারে, তাই স্বামীর জন্য উচিত জিজ্ঞাসাবাদ করা। একারণে যদি সহবাসকারী অন্ধও হয় তাহলেও তাকে হদ্দ লাগানো হবে। তবে হা যদি অন্ধ ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে আহ্বান করে আর অন্য কোন রমনী সুযোগ বুঝে এসে পড়ে আর সে তার সাথে সহবাস করে তাহলে তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। কেননা এক্ষেত্রে তার আহ্বানই হচ্ছে প্রমাণ।

قوله : لَا بِاَجْنَبِيَّةٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তির বাসর ঘরে তার নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে দেয়া হয় আর বলা হয় যে, সে তার স্ত্রী। অতঃপর সে উক্ত স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করে বসে তাহলে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। তবে উক্ত স্ত্রীলোকের জন্য মহর ওয়াজিব হবে। কেননা, হযরত আলী (রাযি.) এরূপ মহিলার ক্ষেত্রে মহর ধার্যের এবং ইদ্দত পালন করার ফায়সালা দিয়েছেন। তাছাড়া একারণে যে, এখানে অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে সংবাদ প্রমাণের ভিত্তিতেই কাজটি সংঘটিত হয়েছে। কেননা, মানুষ প্রথমই তার বিবাহিত স্ত্রী এবং অন্য মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সুতরাং সে বিবাহিত মহিলার ভরসায় সহবাস করেছে যা ধোকাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় হল। কিন্তু তার নামে অপবাদ দানকারীদের উপর হদ্দে কাযাফ কার্যকর হবে না। (কেননা, এখানে তো মুলগতভাবে বিবাহ পাওয়া যায়নি।)

قوله : وَ بِمَحْرَمٍ نَكَحَهَا الخ : যদি এমন নারীকে বিবাহ করে যাকে সে বিবাহ করা হারাম অতঃপর তার সাথে সহবাস ও করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। তবে হা যদি সে হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর মতে যদি সে এ বিষয় অবগত থাকে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে। তাদের দলিল হল, সে এমন বিবাহ চুক্তি করেছে যা যথাস্থানে যুক্ত হয়নি। সুতরাং তা অকার্যকর হবে। কেননা, এখানে স্ত্রী লোকটি মাহরাম হওয়ার দরুন কার্যের ফল গ্রহণ বা বিধান গ্রহণের পাত্র হতে পারে না। সুতরাং তা এমন হল যে, কোন পুরুষের সাথে অন্য পুরুষের আকদ সম্পন্ন হওয়া।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : বিবাহ চুক্তি যথাস্থানেই সংগঠিত হয়েছে। কেননা, আদম কন্যা সন্তান প্রজন্মের উপযুক্ত। যা বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু শরীয়তের হারাম করার কারণে প্রকৃত হালালত্ব সংশোধনে তা ব্যর্থ হয়েছে। তাই এ চুক্তির মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল। আর তা এভাবেই যে সন্দেহ যুক্ত অর্থই হলো যা স্বয়ং সাব্যস্ত নয়। কিন্তু সাব্যস্তের সাদৃশ্য। তাই তা হদ্দ ওয়াজিব করবে না, তবে হা সে যা করল এজন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি (تعزير) প্রদান করা হবে।

قوله : وَ بِاَجْنَبِيَّةٍ فِى غَيْرِ الْقُبُلِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী ভিন্ন অন্য রমনির সাথে জরায়ুর বাইরে সঙ্গম করে তাহলে তাকে হদ্দ লাগানো যাবে না। তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। কেননা, এটি এমন অপরাধ যার জন্য হদ্দ বর্ণিত হয়নি।

قوله : وَ بِلَوَاطَةٍ وَ بَهِيمَةٍ : যদি কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে সমকামিতা করে কিংবা কোন চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার উপর কোন হদ্দ নেই। তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর মতে ইহা যিনার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তার উপর হদ্দ জারী করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অন্য মত হল যে উভয়কে হত্যা করা হবে। কেননা, ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُولَ بِهِ (احمد و ابوداود)

'যাকে তোমরা কাওমে লুতের কাজে লিপ্ত পাইবে তাহলে ভোগী ও ভোগা উভয়কে হত্যা কর।'

অন্যত্র বর্ণিত আছে : فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَ الْأَسْفَلَ 'উপরের ও নীচের দুটোকেই রজম কর।' তাছাড়া এটা যিনার মর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এটা তো এমন স্থানে যৌন উত্তেজনা মিটানো যেথায় পূর্ণরূপে উত্তেজনা আসে। আর শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : এটা যিনা নয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এর শাস্তি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন, কেহ বলেন, একে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। কেহ বলেন, একে উঁচু স্থান থেকে ফেলা হবে এবং তার পিছনে পাথর ছোড়া হবে। কেহ বলেন, তাকে দেয়াল ধ্বসিয়ে হত্যা করা হবে। তাছাড়া তা যিনার মর্মের অন্তর্ভুক্তও নয়। কেননা, এতে সন্তানকে নষ্টের মুখে ফেলার বা বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত করার বিষয় নেই। তাছাড়া এরূপ ঘটনার অবতারণা বিরল। এবং তাতে শুধু এক তরফা চাহিদা বিদ্যমান। অথচ যিনার মধ্যে উভয়ের চাহিদা অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বর্ণিত দলিল রাষ্ট্রিয়ভাবে প্রযোজ্য। এটাকে হালাল ধারণাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে হা এমন অপরাধি অবশ্যই শাস্তির যোগ্য হবে।

قوله : وَ بِزِنًى فِى دَارِ الْحَرْبِ الخ : আর যদি কোন দারুল হরবে বা বিদ্রোহীদের বসবাসের এলাকায় যিনা সংগঠিত হয় অতঃপর যিনাকারী আমাদের দেশে তথা দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে।

আমাদের দলিল : রাসূল (সা.) এর হাদীস, তিনি বলেন : لَا يُقَامُ الْحُدُودُ فِى دَارِ الْحَرْبِ দারুল হরবে হদ্দ কায়েম হবে না। তাছাড়া হদ্দ কায়েমের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা থেকে মানুষকে বিরত রাখা। আর উক্ত দু স্থানে যেহেতু শাসকের কর্তৃত্ব নেই। তাই তা কায়েম করা যাবে না। আর যদি যিনাকারী যিনা করে, অতঃপর দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলেও হদ্দ কায়েম করা যাবে না। কেননা, যিনা অপরাধটি হদ্দ কায়েমকারী হয়নি। তাই পরবর্তীতে তা হদ্দ ওয়াজিবকারী হিসেবে গণ্য হবে না।

قوله : وَ بِزِنًى حَرْبِيٍّ بِذِمِّيَّةٍ الخ : যদি কোন হরবি লোক নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং এখানকার কোন জিম্মিয়াহর সাথে যিনা করে অথবা কোন হারবিয়া নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং তার সাথে কোন জিম্মি যিনা করে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে জিম্মি বা জিম্মিয়ার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। হারবী বা হারবিয়ার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে যদি জিম্মি হারবিয়ার সাথে যিনা করে তাহলে যিম্মির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যদি হারবী যিম্মিয়ার সাথে যিনা করে তাহলে যিম্মিয়ার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সকলের উপর সর্বাবস্থায় হদ্দ কায়েম করা হবে। তিনি দলিল দেন যে যিম্মি বা যিম্মিয়ার উপর হদ্দ আবশ্যক হওয়া তো স্পষ্ট কিন্তু হারবী বা হারবিয়া যেহেতু আমাদের কার্যকরী বিষয়াদি দারুল ইসলামে থাকা পর্যন্ত মেনে

চলার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। যেমন যিম্মি সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করেছে তাই তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। তাই তো তার উপর হদ্দে কাযাফ ও কিসাসের বদলা হত্যা করার বিধান রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলিল হল : যিনার ক্ষেত্রে হদ্দ আবশ্যক হয় মূলত পুরুষের ক্রিয়ার কারণে আর মহিলা তার অনুগামী হয় শুধু। সুতরাং যখন মূলের ক্ষেত্রে (তথা হারবীর ক্ষেত্রে) হদ্দ রহিত হয় তখন অবশ্যই অনুগামীর (যিম্মিয়ার) ক্ষেত্রে রহিত হওয়ার দাবী রাখে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল, যে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেনি সে মূলত দারুল ইসলামে প্রবেশ করেনি। তাই তো সে দারুল হরবে ফিরে যেতে সক্ষম। আর তাকে হত্যার কারণে মুসলমান বা যিম্মিকে কিসাসরূপে হত্যা করা হয় না। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, সে এমন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে যা তার উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে বান্দার হকসমূহ। সুতরাং কিসাস ও হদ্দে কাযাফ হচ্ছে বান্দর হক। তাই তা কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে যিনা হচ্ছে হককুল্লাহ বা শরীয়তের হক।

قوله : وَ بِزِنَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ الخ : যদি কোন বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক পুরুষ কোন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার সাথে যিনা করে তাহলে তাদের কারও উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে উক্ত মহিলার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। আর যদি কোন সুস্থ মস্তিষ্ক পুরুষ কোন বিকৃত মস্তিষ্ক মহিলার সাথে বা এমন বালিকার সাথে যিনা করে যার সাথে সহবাস করা সম্ভব তাহলে উক্ত পুরুষের উপর হদ্দ আবশ্যক হবে সর্বসম্মতিক্রমে। ইমাম যুফার ও শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল : নারীর পক্ষ থেকে বিদ্যমান ওজরের দরুন পুরুষ থেকে যেভাবে হদ্দ রহিত হয় না তদ্রূপ পুরুষের পক্ষ থেকে বিদ্যমান ওজরের দরুন নারী থেকে হদ্দ রহিত হয় না। আর তা এজন্য যে প্রত্যেকেই স্বীয় কর্মের জন্য দায়ী এবং জবাবদিহী করতে হবে। আমাদের দলিল : যিনার কর্মটি প্রথমত পুরুষ থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারী নিছক ব্যভিচার কর্মের স্থল। তাই তো পুরুষকে واطى, সহবাসকারী আর মহিলাকে موطئة বা সহবাসকৃতা বলা হয়। তদ্রূপ পুরুষকে زانى ব্যভিচারকারী আর মহিরাকে مزنى بها তথা যার সাথে সহবাস করা হয়েছে বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই নারীকে مزنية (যিনাকারিণী) ও বলা হয়ে থাকে। যেভাবে مرضية অর্থে راضية, শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অথবা مزنية বলা হয় এই ভিত্তিতে যে, সে সুযোগ দানের মাধ্যমে যিনার কারণ হয়েছে। সুতরাং তার উপর হদ্দ আরোপ হবে যিনার মতো ঘৃণ্য কাজের সুযোগ দানের দরুন। আর যিনা হচ্ছে এমন ব্যক্তির কর্ম যে তা থেকে বিরত থাকার সম্বোধন করা হয়েছে এবং তা সম্পন্ন করার কারণে গোনাহগার হয়। অথচ বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি অনুরূপ গুণযুক্ত নয়। সুতরাং উক্ত কার্যের সাথে হক সম্পৃক্ত হবে না।

قوله : وَ بِإِكْرَاهٍ الخ : যদি কারো উপর বল প্রয়োগের ভিত্তিতে যিনা করানো হয় তবে এ বল প্রয়োগ যদি সুলতান বা শাসকের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম হবে না। আর যদি শাসক ভিন্ন কারো থেকে হয় তবে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হয়। প্রথম সুরতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর قول قديم এবং ইমাম যুফার (রহ.)এর মতে হদ্দ আবশ্যক হবে। কেননা, লিঙ্গ উত্থান ছাড়া পুরুষের পক্ষে যিনা হতে পারে না। আর তা সেচ্ছায় প্রনোদিত হওয়ার প্রমাণ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পরবর্তিতে তা প্রত্যাহার করেছেন এবং হদ্দ কায়েম হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা, এক্ষেত্রে বাধ্যকারী কারণ প্রকাশ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু লিঙ্গ উত্থান হচ্ছে দ্বিধাযুক্ত প্রমাণ। কেননা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকৃতিগতভাবে তা উত্থিত হতে পারে। যেমন ঘুমের মধ্যে অনেক সময় হয়ে থাকে। তাই সন্দেহাতীত হওয়ার পর তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতের ক্ষেত্রে সাহাবাইন (রহ.) এর মত হচ্ছে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। কেননা, বল প্রয়োগ শাসক ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকেও হতে পারে। কেননা, মূল কারণ হচ্ছে প্রাণ নাশের হুমকী আর তাতে শাসক ও অন্যান্য সবাই সমান।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর দলিল : শাসক ছাড়া অন্য কার থেকে বল প্রয়োগে তা অতি বিরল। কেনান, যে শাসকের সাহায্য বা অন্য মুসলমান জামাতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া সে নিজ পক্ষ থেকেও অস্ত্র দ্বারা তা প্রতিহত করতে পারে। তাই হদ্দ রহিত হবে না। কিন্তু সুলতানের বিষয় ভিন্ন। কেননা, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ক্ষমতা তার নেই। বা অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই উভয় সুরতে পার্থক্য রয়েছে।

قوله : وَ بِإِقْرَارٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি চার বার চার মজলিসে স্বীকার করে যে সে অমুক স্ত্রী লোকের সাথে যিনা করেছে। আর স্ত্রীলোক তা অস্বীকার করে বলে যে তিনি তো আমাকে বিবাহ করেছেন। তেমনি যদি স্ত্রীলোক চার বার চার মজলিসে স্বীকার করে যে অমুক পুরুষ তার সাথে যিনা করেছে, আর পুরুষ তা অস্বীকার করে বলে যে, আমি তাকে বিবাহ করেছি। তাহলে তাদের কার উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না। বরং উভয় অবস্থায় পুরুষের উপর মহর প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তার কারণ হচ্ছে, দাবিটি সন্দেহাতীত হয়ে গেল। কেননা, বিবাহের দাবিটার সত্যতার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা উভয় থেকেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং হদ্দ রহিত হবে। আর যেহেতু সম্ভোগ-অঙ্গ ব্যবহার করেছে তাই মহর দিতে হবে।

قوله : وَ مَنْ زَنٰى بِأَمَةٍ الخ : যদি কেহ কোন দাসীর সাথে যিনা করে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর হদ্দ কায়েম হবে এবং তার উপর মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, সে এখানে দুটি অপরাধ করেছে। তাই দুটির প্রত্যেকটির বিধান পূর্ণ মাত্রায় আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে যেহেতু মূল্য ওয়াজিব হবে তাই সে উক্ত দাসীর মালিক হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান থাকার কারণে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না।

আমাদের দলিল হচ্ছে : মূল্য হচ্ছে হত্যার ক্ষতিপুরণ। তাই তা মালিকানা সাব্যস্ত করবে না। তবে হা যদি ধর্ষনের কারণে উক্ত দাসীর কোন অঙ্গ ধ্বংস করে ফলে তবে তার উপর উক্ত অঙ্গের মূল্য ওয়াজিব হবে। এবং এ মূল্য পরিশোধের দ্বারা উক্ত অঙ্গে মালিকানা হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টির কারণে তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ الْخَلِيْفَةُ الخ : গ্রন্থকার বলেন, শাসকের উপর কোন হদ্দ জারী হবে না। তবে তার উপর কেসাস বা মাল আবশ্যক হতে পারে। আর এখানে শাসক দ্বারা এমন শাসক বুঝানো হয়েছে যার উপর অন্য কোন শাসক নেই। কেননা, হদ্দ হল শরীয়তের হক। আর সে নিজেই আল্লাহর প্রতিনিধি। সুতরাং সে নিজের উপর হদ্দ কায়েম করা সম্ভব নয়। আর সে ভিন্ন অন্য কারো মাধ্যমেও হদ্দ কায়েম করার কোন বিধান নেই। আর কিছাছ বা মাল আবশ্যক হবে। কেন না তাতো বান্দার হক। কেননা, হক উসুল করার অভিভাবক হক উসুল করবে। আর তা হয় শাসক নিজের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে কিংবা মুসলমানদের সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে। সুতরাং হককুল্লাহ্ আর হক্কুল ইবাদ এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

পরিচ্ছেদ : যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য ও তা থেকে প্রত্যাহার

شَهِدُوا بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ لم يُحَدَّ وَيَضْمَنُ الْمَالَ وَلَوْ أَثْبَتُوا زِنَاهُ بِغَائِبَةٍ حُدَّ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِمَجْهُولَةٍ حُدَّ وَإِنْ شَهِدُوا بِذٰلِكَ لَا كَاخْتِلَافِهِمْ فِي طَوْعِهَا أو فِي الْبَلَدِ وَلَوْ على كل زِنًا أَرْبَعَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ شَهِدُوا على زِنَا امْرَأَةٍ وَهِيَ بِكْرٌ أو الشُّهُودُ فَسَقَةٌ أو شَهِدُوا على شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ شَهِدَ الْأُصُولُ لم يُحَدَّ أَحَدٌ وَلَوْ كَانُوا عُمْيَانًا أو مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ أو ثَلَاثَةً حُدَّ الشُّهُودُ لَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا -

অনুবাদ : (যদি) সাক্ষীগণ হদ্দে কাযাফ ছাড়া বেশ পূর্বের কোন হদ্দ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে (তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে) হদ্দ কায়েম করা হবে না। আর চোরকে চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি সাক্ষীগণ গায়েব মহিলার সাথে যিনাকে প্রমাণিত করে। তবে হদ্দ কায়েম করা হবে। কিন্তু চুরি করার বিষয় ভিন্ন। (অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল চুরি করার সাক্ষী প্রদানের বিষয় ভিন্ন)। আর যদি অপরিচিত মহিলার সাথে যিনা করার স্বীকারোক্তি প্রদান করে তবে হদ্দ কায়েম করা হবে। আর যদি সাক্ষীগণ উহার সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে হদ্দ কায়েম করা হবে না। অনুরূপ যদি তারা মহিলার রাজির বিষয়ে বা স্থান নিয়ে মতানৈক্য করে, যদিও (মতানৈক্যশীল) প্রত্যেক যিনার উপর চারজন সাক্ষ্য থাকে। আর যদি তারা এক ঘরের (কর্ণারের বিবরণের) মধ্যে মতানৈক্য করে তবে, পুরুষ-মহিলা কাউকে হদ্দ লাগানো হবে না। আর যদি সাক্ষীগণ এমন মহিলার সাথে যিনার সাক্ষী দেয় যে কুমারি (হিসাবে প্রমাণিত) অথবা সাক্ষীগণ ফাসিক হয়, কিংবা সাক্ষীগণ চার জন সাক্ষীর উপর সাক্ষী প্রদান করে। যদিও মূল সাক্ষীগণ (পরে) সাক্ষী প্রদান করে। তাহলে কাউকে হদ্দ লাগানো হবে না। আর যদি তারা অন্ধ হয় অথবা মিথ্যা অপরাধ আরোপের দরুন শাস্তি প্রাপ্ত হয়, কিংবা তিন জন (সাক্ষী) হয় তাহলে সাক্ষীদেরকে হদ্দ লাগানো হবে। কিন্তু যে দুজনের ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান করা হয়েছে তাদেরকে হদ্দ লাগানো হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : شَهِدُوا الخ : যদি সাক্ষীরা দীর্ঘ পুরাতন কোন হদ্দ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে অথচ শাসক পর্যন্ত পৌঁছা তাদের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু হদ্দে কাযাফের ব্যাপার তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সব ধরনের হদ্দের ব্যাপারে সাক্ষ্যদের সাক্ষী বিলম্ব সহকারে গ্রহণযোগ্য। তিনি বান্দার হক সম্পর্কে কিয়াস করেন এবং হদ্দ জারীর দু' অবস্থার এক অবস্থা তথা স্বীকারুক্তির উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল : হদ্দ জারী হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে যে, খালেছ আল্লাহর হকরূপে সাব্যস্ত হদ্দসমূহ

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এবং মুসলমানের দোষক্রুটি গোপন করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীকার প্রাপ্ত ছিল। সুতরাং দীর্ঘদিন সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা যদি দোষ গোপন করার জন্য হয়ে থাকে তাহলে এখন তা প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে অন্য কোন কারণ তথা হিংসা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা যা তাকে ক্ষিপ্ত করেছে। তাই সে সাক্ষ্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়বে।

আর যদি বিলম্ব করা গোপনীয়তার জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে সে ফাসেক ও গোনাহগার হবে। তাই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর আল্লাহর হক হিসেবে হদ্দ হলে তা দীর্ঘ বিলম্ব হওয়াতে রহিত হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে যিনার হদ্দ, মদ পানের হদ্দ, চুরির হদ্দ।

কিন্তু যদি তা বান্দার হক হিসেবে হয় তাহলে তা বিলম্ব দ্বারা রহিত হয় না। যেমন হদ্দে কাযাফ। কেননা, এক্ষেত্রে দাবী উত্থাপন শর্ত। তাই দাবী উত্থাপনে বিলম্ব হওয়ার দরুন সাক্ষীও বিলম্ব হতে পারে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরিমাণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) بعد حين বলে ছয় মাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ না করে বিষয়টি প্রত্যেক যোগের কাজী সাহেবের উপর ন্যস্ত করেছেন। অন্যত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে এক মাস সময়কালকে বিলম্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইহা বিশুদ্ধ। আর এ সিদ্ধান্ত তখন হবে যখন কাজী ও সাক্ষ্যদের মাঝে এক মাসের দূরত্ব না থাকে। পক্ষান্তরে যদি তাদের মধ্যে এক মাসের দূরত্ব থাকে তাহলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিবেচনা করা হবে।

قوله : وَ ضَمِنَ السَّرَقَةَ الخ : আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হদ্দে সারাকা হচ্ছে শরীয়তের হক। সুতরং প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন যদি তা পেশ করতে তথা সাক্ষ্য প্রদানে বিলম্ব হয় তবে এ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হদ্দ আবশ্যক হবে না। কিন্তু চুরাইকৃত মালের উপর ক্ষতিপূরণ তার উপর আবশ্যক হবে। কেননা, তা তো বান্দার হক, তা বিলম্ব হওয়ার দ্বারা রহিত হয় না।

قوله : وَلَوْ اَثْبَتُوا زِنًا الخ : আর যদি সাক্ষীগণ কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে সে অমুক নারীর সাথে যিনা করেছে, অথচ সে নারী অনুপস্থিত। তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে অমুকের মাল চুরি করেছে, অথচ অমুক ব্যক্তি অনুপস্থিত তাহলে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চোরের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না।

উভয় মাসআলাতে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে চোরের ক্ষেত্রে যার মাল চুরি হয়েছে তার পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন করা শর্ত। সুতরাং দাবী উত্থাপন না পাওয়ার দরুন শুধু সাক্ষ্য দ্বারা হদ্দে সারাকা কায়েম করা যাবে না। কিন্তু প্রথম মাসআলায় দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। অর্থাৎ, যিনা সাব্যস্ত হওয়া এবং হদ্দ আবশ্যক হওয়র জন্য দাবি উত্থাপন শর্ত নয়।

قوله : وَلَوْ اَقَرَّ بِالزِّنٰى الخ : যদি কোন ব্যক্তি অপরিচিত কোন নারীর সাথে যিনা করেছে বলে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার এ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হদ্দ কায়েম হয়ে যাবে। কেননা, তার নিজের কাছে তার স্ত্রী বা দাসীর পরিচয় তো গোপন থাকবে না। আর যদি সাক্ষীরা সাক্ষী দেয় যে সে এমন এক স্ত্রীলোকের সাথে যিনা করেছে যাকে তারা চিনে না। তাহলে হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা, এ মহিলা তার স্ত্রী বা দাসী হতে পারে। আর তাই তো স্বাভাবিক।

قوله : كَاخْتِلَافِهِمْ الخ : আর যদি সাক্ষ্যদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় আর তা এভাবে যে. দুজন সাক্ষ্য দেয় যে সে অমুক স্ত্রীলোকের সাথে বলপূর্বক যিনা করেছে। আর দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক মহিলার সম্মতি ক্রমে তার সাথে যিনা করেছে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে

পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে শুধু পুরুষের উপর হদ্দ আবশ্যক হবে। কেননা, উভয় হদ্দ ওয়াজিবকারী মূল বিষয়ে একমত রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে একজন তথা পুরুষ অতিরিক্ত অপরাধের ব্যাপারে আলাদা। আর তা হচ্ছে বলপ্রয়োগ। কিন্তু স্ত্রীলোকটির ক্ষেত্রে হদ্দ আবশ্যক না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে হদ্দ আবশ্যক হওয়ার শর্ত হল তার সম্মতি। আর এতে মতানৈক্য থাকার কারণে তা সাব্যস্ত হল না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : এখানে সাক্ষ্যের বিষয় ভিন্ন হয়েছে। কেননা, যিনা এমন কর্ম যা উভয় দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তাই বিপরীত দুই গুণযুক্ত হতে পারে না। তাই কোন পক্ষেই নিসাবে শাহাদাত হয়নি। তাছাড়া সম্মতির সাক্ষ্যদানকারীগণ উক্ত স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দানকারী হয়ে গেল। সুতরাং তারা সাক্ষীর বিপরীতে স্ত্রীলোকটির প্রতিপক্ষ হয়ে গেল। তবে হা উক্ত দু সাক্ষ্যের উপর হদ্দে কাযাফ আবশ্যক না হওয়ার কারণ হচ্ছে বলপ্রয়োগে যিনা হওয়ার উপর দুজন সাক্ষ্যের সাক্ষী।

আর যদি এ মতানৈক্য সহবাসের স্থান নিয়ে সাক্ষ্যদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। অর্থাৎ, দুজন সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত যিনা সংঘটিত হয়েছে কুফার মধ্যে আর অন্য দুজন দাবী করে যে, এ যিনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বসরার মধ্যে। তাহলে নারী-পুরুষ কাহারও উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে দুটি ব্যভিচার হয়ে গেল। যার কোনটিরই নেসাব পূর্ণ হল না। তাই হদ্দ আবশ্যক হবে না। আবার সাক্ষীদের উপর হদ্দে কাযাফ আবশ্যক না হওয়ার কারণ হল স্ত্রীলোকটির অভিন্নতা। আর দৃশ্যগত অভিন্নতার দরুন ব্যভিচারকর্মে অভিন্নতার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর যদিও প্রতিপক্ষে চারজন করে সাক্ষী থাকে তবুও হদ্দ আবশ্যক হবে না। তবে হা এ ক্ষেত্রে সময় অভিন্ন হতে হবে। তা এভাবে যে, চারজন দাবী করল যে সে সূর্যোদয়ের সময় কুফাতে যিনা করেছে। অন্য চারজন দাবী করল যে, সে সূর্যোদয়ের সময় বসরাতে যিনা করেছে। তাহলে সবার পক্ষ থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। পুরুষ মহিলার উপর থেকে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অনির্ধারিতভাবে দু'দল সাক্ষীর এক দলের মিথ্যাচারিতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। আর সাক্ষীদের উপর থেকে হদ্দে কাযাফ রহিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অনির্ধারিতভাবে দু' দলের একদল সত্যবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। সুতরাং কাহারো উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না।

قوله : وَلَوْ اِخْتَلَفُوْا فِىْ بَيْتٍ الخ : আর যদি সাক্ষীরা পরস্পর একই ঘরের কর্ণার নির্বাচনে মতানৈক্য করে তাহলে নারী পুরুষ উভয়ের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। আর তা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে কিয়াসের দাবী হল হদ্দ কায়েম না হওয়া। কেননা, মূলত স্থান তো ভিন্ন হওয়ার দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা, সকল সাক্ষ্যদের মাঝে সমন্বয় সম্ভব। কেননা, ধরা হবে যে তারা যিনা শুরু করেছিল এক কোণে কিন্তু জড়াজড়ি ও গড়াগড়ির কারণে অপর কোণে গিয়ে তা শেষ হয়েছে। তবে সবাই একমত, এ ব্যাপারে যে এই ঘরের মধ্যে যিনা সংঘটিত হয়েছে। আর তাদের মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ হল কেহ সামনের অংশে দেখেছে আর কেহ মাঝের অংশে দেখেছে আর কেহ পিছনের অংশে দেখেছে। এভাবে নিজ নিজ দৃষ্টির ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু মূল ঘটনা এক অভিন্ন হওয়ার কারণে হদ্দ আবশ্যক হবে।

قوله : وَلَوْ شَهِدُوا عَلٰى زِنَاءِ اِمْرَاَةٍ الخ : যদি চারজন সাক্ষী প্রদান করে কোন মহিলার ব্যাপারে যে সে যিনা করেছে। অথচ স্ত্রীলোকটি কুমারী প্রমাণিত হল, তাহলে নারী পুরুষ উভয় থেকে এবং সাক্ষী থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, কুমারিত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যিনা সংঘটিত হতে পারে না। আর কুমারিত্ব প্রমাণিত হল এভাবে যে,মহিলাগণ উক্ত স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকিয়ে তাকে কুমারি বলে রায় দিল। সুতরাং এ মহিলাগণের মতামত হদ্দ রহিত করার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির কুমারীর ব্যাপারে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের থেকে হদ্দ রহিত করা হল। আর যেহেতু বিষয়টি সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে এজন্য সাক্ষীদের উপর থেকে হদ্দে কাযাফ রহিত হয়ে যাবে।

قوله : اَوِ الشُّهُوْدُ فَسَقَةٌ الخ : আর সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে বা পরে ফাসিক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে কাহারও উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, ফাসিক ব্যক্তি সাক্ষ্য ধারণ ও প্রয়োগ করার উপযুক্ত, কিন্তু এক্ষেত্রে ফাসিক হওয়ার কারণে তাদের সাক্ষ্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেল। তাই তো যদি কাজী ফাসিক সাক্ষীর ভিত্তিতে কোন ফায়সালা করেন তাহলে তা কার্যকর হবে। সুতরাং তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে মিথ্যার সন্দেহ থাকার কারণে যিনার হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, ফাসিকীর কারণে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ত্রুটি বিবেচনায় যিনা না হওয়ার সন্দেহও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যিনার হদ্দ ও অপরাধ আরোপের হদ্দ উভয়টি প্রতিহত হবে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)এর মতে ফাসিক এ বিষয়ে গোলামের সমতুল্য। অর্থাৎ গোলাম যেভাবে সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয়, তেমনি ফাসিকও সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয়।

قوله : اَوْ شَهِدُوْا عَلٰى شَهَادَةِ الخ : যদি চারজন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অন্য চারজন লোক উক্ত লোকের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। তাহলে ঐ লোকের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে না এবং ঐ চার জনের উপর হদ্দে কাযাফও আবাশ্যক হবে না। কেননা, সাক্ষীর উপর সাক্ষী তা তো স্পষ্ট সন্দেহের দাবী রখে। তাই পুরুষ মহিলা কারো উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। আর সাক্ষীদের দাবী সঠিক হওয়ার ও সম্ভাবনা রাখে। বিধায় তাদের থেকেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম দল এসে উক্ত স্থানে ব্যভিচার কর্মে অবলোকনের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলেও হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা, যখন অনুবর্তীদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হল তা মূলত মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা হল। কেননা, তারা তো মূল সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে ধারণ করে তাদেরই স্থলবর্তী ছিল। একারণে যা প্রত্যাখিত হয়েছে তা দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা হবে না। আর সাক্ষীদের উপরও হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা, তারা সংখ্যায় পূর্ণ হয়েছে। আর এখানে যিনার ব্যাপারে যেপ্রকার সন্দেহ বিদ্যমান এ ধরনের সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হয় না।

قوله : وَلَوْ كَانُوْا عُمْيَانًا الخ : আর যদি সাক্ষ্যরা অন্ধ বা হদ্দুল কাযাফ প্রাপ্ত হয় কিংবা তিন জন হয়, তাহলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য তো গ্রহণ হবে না। অধিকন্তু তাদের উপর হদ্দুল কাযাফ কায়েম করা হবে। কেননা, তাদের সাক্ষ্য দ্বারা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ই সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যিনার হদ্দের মত গুরুতর বিষয় কিভাবে সাব্যস্ত হবে। আর যেহেতু তা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হলেও শাসকের নিকট পেশ করার মত কোন যোগ্যতা নেই। তাই তাদের সাক্ষ্য দ্বারা যিনা সংঘটিত হওয়ার ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় নাই। একারণে হদ্দে যিনা তো কায়েম হবে না। অধিকন্তু সাক্ষ্যদের উপর হদ্দে কাযাফ কায়েম করা হবে।

وَلَوْ حُدَّ فَوُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا حُدُّوا وَأَرْشُ ضَرْبِهِ هَدَرٌ وَإِنْ رُجِمَ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الرَّجْمِ حُدَّ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَقَبْلَهُ حُدُّوا وَلَا رَجْمَ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْخَمْسَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُدَّا وَغَرِمَا رُبُعَ الدِّيَةِ وَضَمِنَ الْمُزَكُّونَ دِيَةَ الْمَرْجُومِ إِنْ ظَهَرُوا عَبِيدًا كَمَا لَوْ قُتِلَ مَنْ أُمِرَ بِرَجْمِهِ فَظَهَرُوا كَذَٰلِكَ وَإِنْ رُجِمَ فَوُجِدُوا عَبِيدًا فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الزِّنَا تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ قُبِلَ شَهَادَتُهُمْ وَلَوْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ رُجِمَ -

অনুবাদ : আর যদি (সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে) হদ্দ কায়েম করা হয়। অতঃপর তাদের থেকে একজন গোলাম বা হদ্দুল কাযাফ প্রাপ্ত পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে হদ্দে কাযাফ লাগানো হবে। (আর তার হদ্দ প্রহার হলে) তার প্রহারের জরিমানা আবশ্যক নয়। আর যদি রজম হয় তাহলে তার দিয়াত বায়তুল মালের উপর আবশ্যক হবে। আর যদি রজমের পরে চারজনের একজন সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে তার উপর হদ্দে কাযাফ কায়েম করা হবে এবং সে দিয়াতের এক চতুর্থাংশের দন্ড বহন করবে। আর যদি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার উপর) হদ্দ প্রয়োগ পূর্বে কোন একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তা হলে সকলের উপর হদ্দ কায়েম করা হবে এবং তার উপর রজম নেই। আর যদি সাক্ষ্য পাঁচ জনের একজন (তার সাক্ষ্য) প্রত্যাহার করে তাহলে তার উপর কোন কিছু নেই। আর যদি (অবশিষ্ট চার জন থেকে অন্য একজন (তার সাক্ষ্য) প্রত্যাহার করে তাহলে উভয়কে হদ্দে কাযাফ লাগানো হবে এবং তারা দিয়াতের এক চতুর্থাংশের দন্ড বহন করবে। আর সাফাই বর্ণনাকারী রজমকৃত ব্যক্তির দিয়াতের জামিন হবে, যদি (রজমের পর) সাক্ষীগণ গোলাম হিসাবে প্রকাশ পায়। আর তা অনুরূপ যে যার ব্যাপারে রজমের ফায়সালা করা হয়েছে তাকে কেহ হত্যা করে ফেলল, অতঃপর সাক্ষীগণ তেমনি (তথা গোলাম হিসাবে) প্রকাশ পেল, (তাহলে হত্যাকারীর উপর দিয়াত আসবে) আর যদি রজম করা হয় অতঃপর সাক্ষীদেরকে গোলাম হিসাবে পাওয়া হয় তাহলে তার দিয়াত বায়তুল মাল থেকে আবশ্যক হবে। আর যদি যিনার সাক্ষীগণ বলে যে, আমরা ইচ্ছাপূর্বক দেখেছি, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর (যার বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে) সে যদি নিজের মুহসান হওয়া অস্বীকার করে আর একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা তার মুহসান হওয়ার সাক্ষী প্রদান করে কিংবা তার স্ত্রী তার ঔরষে সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকে রজম করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ حُدَّ فَوُجِدَ الخ : যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হদ্দ কায়েম করা হয়, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন গোলাম বা হদ্দে কাযাফ প্রাপ্ত পাওয়া যায়, তাহলে তাদের উপর হদ্দুল কাযাফ কায়েম করা হবে। কেননা, নেসাবে শাহাদত পূর্ণ না হওয়ায় তারা অপবাদ আরোপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর তাদের

সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি বেত্রাঘাত হয় তাহলে সাক্ষীদের উপর বায়তুল মালের উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। আর যদি রজম তার হদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে রজমকৃত ব্যক্তির দিয়াত বায়তুল মালের উপর আবশ্যক হবে। আলোচ্য বর্ণনা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে প্রহারের ও ক্ষতিপুরণ সরকারী বায়তুল মালের উপর আবশ্যক হবে। হিদায়া গ্রন্থকার রহ. বলেন, এখানে প্রহার দ্বারা এমন প্রহার উদ্দেশ্য যে প্রহারে জখম করে দেয়।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল : তাদের সাক্ষ্য দ্বারা অবশ্যই নিঃশর্ত বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, জখম পরিহার করে প্রহার করা অসম্ভব। তাই জখমকারী ও জখমহীন উভয় প্রহারই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তা তাদের সাক্ষ্যের সাথে সমন্বিত হবে। সুতরাং যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তার দায় তাদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। আর যদি প্রত্যাহার পাওয়া যায় না তাহলে বায়তুল মালের উপর এর দায় আবশ্যক হবে। তার কারণ হচ্ছে জল্লাদের কর্ম যেহেতু শাসকের হুকুমে হয়ে থাকে, তাই তা শাসকের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। আর শাসক যেহেতু মুসলমানের কাজে লিপ্ত তাই তাদের মাল থেকেই এ ক্ষতিপুরণ করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা শুধু বেত্রাঘাত সাব্যস্ত হয়েছে। আর তা হল শুধু ব্যথা সৃষ্টি করা, যা জখম বা প্রাণ হরণ নয়। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রহার জখম সৃষ্টিকারী নয়। কিন্তু প্রহারকারী অনভিজ্ঞ হওয়ার দরুন বা অন্য কোন কারণে তথা প্রহারকারী লক্ষ না করার কারণে জখম সৃষ্টি হতে পারে, যার দায় শধু প্রহারকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। তা সাক্ষীদের দিকে সম্প্রসারিত হবে না। আর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তার ক্ষতিপুরণও সাক্ষীদের উপর আবশ্যক হবে না। কেননা, যদি তা প্রহারকারীর দিকে ধাবিত হয় তাহলে মানুষ এর ভয়ে হদ্দ কায়েম করা থেকে বিরত থাকবে।

আর রজমের ক্ষেত্রে তার দিয়াত বায়তুল মালের মধ্য থেকে আদায় করা আবশ্যক হওয়ার কারণ হল, রজমের বিষয়টি সাক্ষীদের দিকেই প্রত্যাবর্তীত হবে। এখন যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান থেকে ফিরে আসে তাহলে তারা এর দায়গ্রস্থ হবে। আর যদি তারা সাক্ষ্য থেকে ফিরে না আসে তাহলে বায়তুলমাল থেকে এর জরিমানা আদায় করবে। কেননা, বিচারকের নির্দেশে তাকে রজম করা হয়েছে।

قوله : وَلَوْ رَجَعَ اَحَدُ الْاَرْبَعَةِ الخ : যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রজম করা হয় অতঃপর তাদের থেকে একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তার উপর হদ্দুল কাযাফ প্রয়োগ করা হবে। এবং সে দিয়াতের এক চতুর্থাংশের দন্ড বহন করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন যে, প্রত্যাহারকারীর উপর অর্থ দন্ড নয় বরং মৃত্যুদন্ড আবশ্যক হবে। তিনি তা কিছাছের সাক্ষীদের ব্যাপারে গৃহীত নীতির উপর ভিত্তি করেছেন। (যা আমরা দিয়াত অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ)। আর ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, প্রত্যাহারকারীর উপর কোন হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, প্রত্যাহারকারীর প্রত্যাহার দ্বারা উক্ত ব্যাপারে অপবাদটি যদি তার জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে হদ্দ আবশ্যক হবে। কেননা, ব্যক্তির মৃত্যু দ্বারা হদ্দে কাযাফ রহিত হয়েছে। কেননা, হদ্দুল কাযাফের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী চলে না। আর যদি তার মৃত্যুর পরের সাথেসম্পৃক্ত হয় তাহলে যেহেতু সে কাজীর রায় অনুযায়ী রজমকৃত হয়েছে, আর তাই তার মোহসান হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, সুতরাং সন্দেহের কারণে হদ্দ কায়েম হয় না। এজন্য উক্ত প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হবে না।

আমাদের দলিল হল : প্রত্যাহার করার দরুন সাক্ষ্যটি অপবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা, যখন সে প্রত্যাহার করল তখন তার থেকে ইহা সাক্ষ্যগুণ রহিত করে ফেলেছে। তাই তাৎক্ষণিকভাবে তা মৃতের নামে অপবাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। আর উক্ত ব্যক্তি তার ক্ষেত্রে (তথা সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রে) মুহসান হল কেননা, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শাসক তাকে রজমের রায় দিয়েছিলেন তা বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। তাই উক্ত ব্যক্তি মুহসান হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক হবে না। তবে হা যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার ক্ষেত্রে অপবাদ তুলে তবে

সে হদ্দের আওতাধীন হবে না। কেননা, আদালতের রায় অন্যের ক্ষেত্রে সে মুহসান না হওয়া বাতিল যোগ্য নয়। আর যদি কোন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান প্রত্যাহার হদ্দ কায়েমের পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে সকল সাক্ষীকে হদ্দে কাযাফ লাগানো হবে। আর যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তার থেকে হদ্দ রহিত করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে শুধু প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা, শাসকের রায়ের দরুন সাক্ষ্য কার্যকর হয়ে গেল। কিন্তু একজনের প্রত্যাহার তো শুধু প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য রহিত হবে। আর তা এমন যেমন, শাসকের রায় কার্যকর হওয়ার পর যদি কেহ তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তবে তা শুধু প্রত্যাহারকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আলোচ্য মাসআলাতেও তেমনি শুধু প্রত্যাহারকারীকে হদ্দে কাযাফ লাগানো হবে।

শায়খাইন (রহ.) এর দলিল : শাসকের শুধু রায় ঘোষণা করাই শেষ নয়, বরং হদ্দ কার্যকর করাও শাসকের রায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি হদ্দ কায়েমের পূর্বে প্রত্যাহার করে তবে তা শাসকের রায় ঘোষণার পূর্বে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার মত হল। তাই তো যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হল সে ব্যক্তি থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যদি রায় ঘোষণার পূর্বে একজন তার সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাহার করে, তাহলে সকলের উপর হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হয়। কেননা, তাদের বক্তব্য মূলতঃ অপবাদ। যখন তা আদালতের রায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা সাক্ষ্য হিসেবে ধর্তব্য হবে।

قوله : وَ لَوْ رَجَعَ اَحَدُ الْخَمْسَةِ الخ : আর যদি সাক্ষী পাঁচজন হয় আর তাদের থেকে একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের উপর কোন কিছু আরোপ হবে না। কেননা, যাদের সাক্ষ্য দ্বারা পূর্ণ হক বহাল থাকে, তারা তো বহাল আছে। (অর্থাৎ, তারা তো চারজন বিদ্যমান আছে।)

অতঃপর যদি অবশিষ্ট এ চারজন থেকে একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে, তাহলে প্রত্যাহারকারী উভয়ের উপর হদ্দ আবশ্যক হবে এবং রজমকৃত ব্যক্তির এক চতুর্থাংশের দায় বহন করবে। কেননা, যারা অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের দ্বারা 'হদ্দ' এর তিন চতুর্থাংশ বহাল রয়েছে। তাই তাদের বহাল থাকা বিবেচ্য। কিন্তু যারা প্রত্যাহার করেছে তাদের এ প্রত্যাহার বিবেচ্য নয়।

قوله : وَضَمِنَ الْمُزَكِّى الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হদ্দে যিনার রজম কার্যকর করা হয়। এ হিসাবে যে তাদের উপর সাফাই সাক্ষ্য দেয়া হয়ে থাকে। অতঃপর সাক্ষীগণ গোলাম বা কাফের প্রকাশ পেল তাহলে সফাই সাক্ষীদাতার উপর রক্তপন আবশ্যক হবে। তবে সফাই বর্ণনাকারীর উপর রক্তপন আবশ্যক হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। ১। সফাই বর্ণনাকারী সাক্ষীগণ আজাদ ও মুসলমান হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া। সুতরাং مزكى তথা সফাই বর্ণনাকারী যদি এতটুকু বলে যে, এই সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ, অতঃপর প্রকাশ পায় যে তারা গোলাম ছিল, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে مزكى রক্তপনের দায়পাপ্ত হবে না। কেননা, সে পূর্ণরূপে সফাই বর্ণনা করেনি। আর এটুকু সফাইকে যথেষ্ট মনে করে তা কার্যকর করা বিচারকের ভুল হল।

২। مزكى এই কথা বলে নিজের تزكية থেকে ফিরে আসতে হবে যে, আমি মিথ্যা বলেছি, কিন্তু যদি সে বলে আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি বুঝে শুনে ভুল করিনি, কিংবা যদি সে তার সাক্ষ্যের উপর অটল থাকে তাহলে তার উপর রক্তপণ আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এই ক্ষতিপুরণ বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে। কেননা, তারা সাক্ষীদের উত্তম প্রশংসা করেছে। সুতরাং এটা যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে ব্যক্তির প্রশংসা করা। অর্থাৎ, তার মোহসান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানের মত হল।

قوله : كَمَا لَوْ قُتِلَ مَنْ اُمِرَ بِرَجْمِهِ الخ : যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজী সাহেব কোন ব্যক্তির ব্যাপারে রজমের রায় জারী করেন, এমতাবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, অতঃপর

প্রকাশ হয় যে, সাক্ষীরা কাফের বা গোলাম, তাহলে হত্যাকারীর উপর উক্ত ব্যক্তির রক্তপণ আবশ্যক হবে। এটা হল সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে, কিন্তু সাধারণ কিয়াসের দাবী হল উক্ত ব্যক্তির উপর কিসাস ওয়াজিব হওয়া। কেননা, সে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে বিনা অধিকারে হত্যা করেছে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হল, প্রকাশ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের ফায়সালা সঠিক ছিল। তাই উক্ত ব্যক্তির সন্দেহ হতে পারে যে, তার জন্য হত্যা করা বৈধ কিন্তু যদি সে বিচারকের ফায়সালার পূর্বে হত্যা করে থাকে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, সাক্ষ্য তখনও প্রমাণরূপে সাব্যস্ত হয়নি। তাছাড়া উক্ত ব্যক্তি বৈধতা দানকারী দলিলের উপর নির্ভর করে হত্যাকারী তাকে হত্যা করা বৈধ ধারণা করেছিল। আর তা এমন হল যে, কাহারও গায়ে হারবীর নিদর্শন দেখে তাকে হারবী ধারণা করে হত্যা করে ফেলল। আর এ দিয়াত হত্যাকারীর মাল থেকেই আদায় করতে হবে। কেননা, হত্যাকারীর হত্যা তার ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে।

قوله : وَاِنْ رُجِمَ فَوُجِدَ الخ : আর যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রজম করা হয়, কিন্তু এ সাক্ষীর উপর কোন সফাই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। অতঃপর তাদের মধ্যে গোলাম বা কাফের প্রকাশ পায় তাহলে রজমকৃত ব্যক্তির দিয়াত বায়তুল মালের উপর আবশ্যক হবে। কেননা এ রজমের কর্মটি শাসকের দিকেই সম্পৃক্ত হবে। তাই দিয়াত বায়তুল মাল থেকেই পরিশোধ করতে হবে।

قوله : وَلَوْ قَالَ شُهُوْدُ الزِّنَا الخ : যদি কারও বিরুদ্ধে চারজন লোক সাক্ষ প্রদান করে বলে যে, আমরা ইচ্ছা করে যিনাকারী ও যিনাকারিণীর দিকেই অবলোকন করেছি। তাহলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। যদিও যিনার মত জঘন্য কাজের প্রতি তাকানো হারাম কিন্তু এখানে সাক্ষ্য ধারণ করার প্রয়োজনে তাদের জন্য দৃষ্টিপাত করা বৈধ হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে তারা ধাত্রী বা চিকিৎসকের সাদৃশ্য হল।

قوله : وَلَوْ اَنْكَرَ الْاِحْصَانَ الخ : যদি চারজন সাক্ষীর ভিত্তিতে হদ্দে যিনা কারো ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়। আর উক্ত বক্তি তার নিজের ব্যাপারে মোহসান হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, অথচ একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা তার মোহসান হওয়ার সাক্ষী প্রদান করে। অথবা উক্ত পুরুষের স্ত্রী তার ঔরষে সন্তান প্রসব করে থাকে, তাহলে তাকে রজম করা হবে। সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে রজম সাব্যস্ত হবে এজন্য যে, ইহসান হচ্ছে কতিপয় উত্তম গুণের সমষ্টি যা ব্যভিচার কর্ম থেকে বাধা দান করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এমনই হল যেন তারা এই পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় তার বিবাহের ও সহবাসের সাক্ষ্য প্রদান করল। এ ব্যাপারে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মাল-সম্পদ ছাড়া অন্য কোন কিছুতে মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। আর স্ত্রীর সন্তান প্রসব হওয়াও তার মুহসিন হওয়ার দাবী রাখে। কেননা, তার থেকে নসব সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হল তার প্রতি সহবাসের হুকুম সাব্যস্ত হওয়া। একারণেই তো যদি সে তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে তালাকে রেজঈ সাব্যস্ত হবে। আর এরূপ দলিল দ্বারা মুসসান হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই মুহসানের যে হদ্দ তথা রজম তা তার উপর প্রয়োগ করা হবে।

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

পরিচ্ছেদ : মদ পানের দন্ডবিধি

مَن شَرِبَ خَمرًا وَأُخِذَ وَرِيحُهَا مَوجُودٌ أو كان سَكرَانَ وَلَو بِنَبِيذٍ وَشَهِدَ رَجُلَانِ أو أَقَرَّ مَرَّةً حُدَّانِ عُلِمَ شُربُهُ طَوعًا وَصَحَّا وَإِنْ أَقَرَّ أو شَهِدَ بَعدَ مُضِيِّ رِيحِهَا لَا لِبُعدِ المَسَافَةِ أو وُجِدَ منه رَائِحَةُ الخَمرِ أو تَقَيَّاهَا أو رَجَعَ عَمَّا أَقَرُّوا وَأَقَرَّ سَكرَانُ بِأَنْ زَالَ عَقلُهُ لَا وَحَدُّ السُّكرِ وَالخَمرِ وَلَو شَرِبَ قَطرَةً ثَمَانُونَ سَوطًا وَلِلعَبدِ نِصفُهُ وَفُرِّقَ على بَدَنِهِ كَحَدِّ الزِنَا -

অনুবাদ : কেউ যদি মদ পান করে এবং মুখে মদের গন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় গ্রেফতার হয় অথবা সে নেশাগ্রস্ত ছিল, যদিও তা নবীযে তামার হয় এবং দুজন পুরুষ (তাই) সাক্ষ্য প্রদান করে কিংবা একবার সে স্বীকার করে। আর যদি জানা যায় যে সে সেচ্ছায় পান করেছে তাহলে মাতাল মুক্ত অবস্থায় তাকে হদ্দ লাগানো হবে। আর যদি তার (মুখে) মদের গন্ধ দূর হওয়ার পর স্বীকার করে কিংবা দুজন পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করে (তাহলে হদ্দ কায়েম হবে না) কিন্তু দূরত্বের কারণ (বিচারকের দরবারে উপস্থিত করতে গিয়ে গন্ধ দূর হলে ভিন্ন, (অর্থাৎ, হদ্দ কায়েম হবে) অথবা তার মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গেল কিংবা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় স্বীকার করল এমতাবস্থায় যে তার জ্ঞান লোপ প্রাপ্ত, তাহলে (এসকল সুরতে) হদ্দ আবশ্যক হবে না। আর নেশাগ্রস্থ ও মদ পানের হদ্দ যদিও তা এক ফোটা পান করে আশিটি বেত্রাঘাত। আর গোলামের হদ্দ তার অর্ধেক (অর্থাৎ, চল্লিশটি বেত্রাঘাত) আর বেত্রাঘাত তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো হবে। যিনার হদ্দের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : مَنْ شَرِبَ خَمَرًا : যদি কোন ব্যক্তি মদ পান করে এবং মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যায় আর এমতাবস্থায় গ্রেফতার করা হয় কিংবা কাউকে মাতাল অবস্থায় পাওয়া যায় আর দুজন পুরুষ তার মদ পানের সাক্ষ্য প্রদান করে কিংবা সে মদ পানের স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে মদ পানের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তার থেকে মদ পানের অপরাধ প্রকাশিত হয়েছে। আর তা নতুন এখনও পুরানো হয়নি। আর উক্ত মদ পান দ্বারা শাস্তির যোগ্য হওয়ার প্রমাণ রাসূল (সা.) এর হাদীস :

وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمَرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ

কেউ যদি মদ পান করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা, যদি সে পুনরায় পান করে তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত কর।

তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, মদ পানের দরুন হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, মদ পানের হদ্দ প্রয়োগ করার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। ১। মুখের মধ্যে মদের গন্ধ বিদ্যমান

থাকা। তবে হা যদি শাসকের দূরত্বের দরুন মুখের গন্ধ দূর হয়ে যায়, তবে তা হদ্দ প্রয়োগের পরিপন্থি নয়। ২। মাতাল হওয়া, মদ পানে বা অন্য কোন নেশাদ্রব্য পানে। ৩। মদ পানের বিষয়ে দু'জন পুরুষ সাক্ষী হওয়া বা সে নিজে স্বীকার করা, যদিও একবার (অর্থাৎ, যদিও একবার স্বীকার করে তবুও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।) ৪। নিজ ইচ্ছায় মদ পান করে থাকা। ৫। মাতাল মুক্ত হওয়া অর্থাৎ হদ্দ কায়েমের জন্য মাতাল অবস্থা থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।

قوله : إِنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ بَعْدَ مُضِيِّ الخ : আর যদি মুখের গন্ধ চলে যাওয়ার পর সে স্বীকার করে বা সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে হদ্দ কায়েম করা হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতেও এ বিলম্ব দ্বারা নির্ধারিত বিলম্ব তথা এক মাস সময় ধর্তব্য। কেননা, তিনি মদ পানের হদ্দ প্রয়োগকে যিনার হদ্দের সাথে কিয়াস করেছেন। আর তা এজন্য যে, কালাতিক্রান্তি ও গন্ধ বিলুপ্তি দুটো দ্বারাই বিলম্ব সাব্যস্ত হয়। কিন্তু গন্ধের বিষয়টি অকাট্য নয়, বরং তা অন্য কারণেও মদ সাদৃশ্য গন্ধ হতে পারে। যেমন কবি বলেন :

يَقُولُونَ لِي أَنَّكَ شَرِبْتَ سَرَامَةً * فَقُلْتُ لَا بَلْ أَكَلْتُ سَفَرْجَلًا

'তারা বলে আমাকে তুমি মদ পান করছো, আমি বললাম মদ পান করিনি বরং নাশপাতী খেয়েছি।'

সুতরাং প্রতিয়মান হল কখনও অন্য কিছু খাওয়াতেও মুখে মদের গন্ধ হতে পারে। তাই গন্ধ থাকা না থাকার দিক বিবেচনা করা হবে না। শায়খাইন (রহ.) এর দলিল হল : বিলম্বতা এক মাস দ্বারা নির্ধারিত হবে না, বরং নির্ধারিত হবে গন্ধ বিলুপ্তির দ্বারা। কেননা, এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন : فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ 'যদি তোমরা মদের গন্ধ পাও তবে তাকে বেত্রাঘাত কর।' তাছাড়া এই জন্য যে, মদের আলামত বিদ্যমান থাকা মদ পানের অধিক মজবুত প্রমান। সুতরাং যদি আলামত বা মদ পানের গন্ধ দ্বারা মদ পানের বিষয়টি প্রমাণিত দুস্কর হলেই শুধু সময় দ্বারা বিলম্বতা নির্ধারণের দিকে যাওয়া যাবে। আর বিভিন্ন বিষয়ের গন্ধের মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব।

সুতরাং গন্ধ বিদ্যমান না থাকলে হদ্দ কায়েম করা যাবে না। কেননা, মদ পানের হদ্দ নির্ধারিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমার ভিত্তিতে। আর ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর কথা ছাড়া তো আর ইজমা সংঘটিত হয় না। অথচ আমাদের পূর্বে বর্ণিত রেওয়াতে অনুযায়ী ইবনে মাসউদ (রাযি.) হদ্দ কার্যকর করার জন্য গন্ধ বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেছেন।

قوله : لَا لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ الخ : আর যদি কোন মদ পানকারীকে মদের গন্ধসহ পাওয়া যায় এবং তাকে নিয়ে সাক্ষীগণ বা সে নিজে এক শহর থেকে এমন এক শহরে যায় যেখানে হদ্দ প্রয়োগকারী শাসক রয়েছেন। কিন্তু এ দীর্ঘ দূরত্বের কারণে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাহলে এক্ষেত্রে সকলের মতেই হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা, ইহা একটি ওযর। যার বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর এ ধরনের অবস্থায় সাক্ষীদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

قوله : أَوْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ الخ : যদি কোন ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যায় অথবা সে মদ বমি করে কিংবা নিজ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে অথবা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মবিপক্ষ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় তাহলে এসকল অবস্থা কোন অবস্থায় হদ্দ আবশ্যক হবে না। শুধু মুখে মদের গন্ধ দ্বারা হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা, সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া বা বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু গন্ধ একটি সম্ভাবনাময় বিষয়। যা দ্বারা শরয়ী হুকুম আবর্তন করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ মদপান জোরপূর্বক বা অনন্যোপায় অবস্থায়ও হতে পারে বা অনুমোদনযোগ্য দ্রব্য দ্বারাও নেশা হতে পারে। যেমন ভাং বা ঘোটকী দুগ্ধ। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মদ পানের সঠিক কোন তথ্য পাওয়া

যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মদ পানের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

আর মদ বমির ক্ষেত্রে বর্ণিত কারণ থাকাটা সম্ভব তাই শুধু মদ বমনের কারণে তার উপর মদ পানের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপভাবে স্বীকার করার পর তা প্রত্যাখ্যান করার দ্বারাও হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা তা তো একমাত্র আল্লাহর হক। সুতরাং যিনার হদ্দের মতো হল। তবে এক্ষেত্রে হদ্দ কায়েমের জন্য একবারের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দুমতের এক মত চুরির অপরাধের ন্যায় দুবারের স্বীকারোক্তি শর্ত। অনুরূপভাবে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির নেশা অবস্থায় স্বীকারোক্তির কারণে হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, তাতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং হদ্দ রহিত করার জন্য সেটাকে অজুহাতরূপে গ্রহণ করা হবে। কেননা, এটা আল্লাহর হক।

قوله : وَحَدُّ السُّكْرِ وَ الْخَمْرِ الخ : স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ ও অন্যান্য নেশাদ্রব্যের পান দ্বারা তার হদ্দ হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত। যা সাহাবা কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তথা ইজমার ভিত্তিতে ধায্য করা হয়েছে। যেমন মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহ.) এর মধ্যে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাযি.) মদ পানের হদ্দ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হযরত আলী (রাযি.) বললেন, আমার অভিমত হল আপনি তার উপর আশিটি বেত্রাঘাত করবেন। কেননা, যখন সে মদ পান করে তখন তার মাঝে মাতলামি আসে এবং অহেতুক কথাবার্তা বলতে থাকে, আর যখন অহেতুক কথাবার্তা বলতে থাকে তখনই সে অন্যের উপর অপবাধ দিতে থাকে, আর অপবাদ দাতার হদ্দ হল আশিটি দোররা। তাই তার উপর অপবাদ দানের হদ্দ নির্ধারিত হোক। সুতরাং হযরত ওমর (রাযি.) এ ভিত্তিতে মদ পানের বা নেশা পানের হদ্দ আশিটি বেত্রাঘাত ধার্য করেন। আর যদি মদ্দপায়ী বা নেশাখোর দাস হয় তবে তার হদ্দ হচ্ছে অর্ধেক তথা চল্লিশ দোররা। কেননা, দাসত্ব শাস্তিকে অর্ধেক করে দেয়।

قوله : فُرِّقَ عَلٰى بَدَنِهٖ الخ : যিনার হদ্দের ন্যায় এক্ষেত্রেও বেত্রাঘাতকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হবে। তবে হা এক্ষেত্রেও ব্যক্তির গুপ্তাঙ্গে বা চেহারায় বা মস্তকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তাকে বিবস্ত্র করে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে শাস্তির লঘুতা বিবেচনা করে তার শরীর বিবস্ত্র করা হবে না। তার কারণ হল শরীয়তে মদ পানের হদ্দের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোন নস নেই। প্রসিদ্ধ বর্ণনার দলিল হল : বেত্রাঘাতের সংখ্যা এক শত থেকে আশিতে হ্রাস করার মাধ্যমে আমরা একবার লঘুতা করেছি। সুতরাং দ্বিতীয়বার আর লঘুতা সাব্যস্ত করা তথা বিবস্ত্র না করার হুকুম দেয়া বিবেচ্য নয়।

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

পরিচ্ছেদ : অপবাদ দানের দন্ড বিধি

هو كَحَدِّ الشُّرْبِ كَمِّيَّةً وَثُبُوتًا فَلَوْ قَذَفَ مُحْصَنًا أو مُحْصَنَةً بِزِنًا حُدَّ بِطَلَبِهِ مُفَرَّقًا وَلَا يُنْزَعُ عنه غَيْرُ الفَرْوِ وَالْحَشْوِ وَإِحْصَانُهُ بِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا حُرًّا مُسْلِمًا عَفِيفًا عن الزِّنَا فَلَوْ قال لِغَيْرِهِ لَسْتَ لِأَبِيكَ أو لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ في غَضَبٍ حُدَّ وفي غَيْرِهِ لَا كَنَفْيِهِ عن جَدِّهِ وَقَوْلُهُ لِعَرَبِيٍّ يا نَبَطِيُّ أو يا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى وَعَمِّهِ و خَالِهِ وَرَابِّهِ وَلَوْ قال يا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ فَطَلَبَ الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ أو وَلَدُهُ حُدَّ وَلَا يَطْلُبُ وَلَدٌ أَبَاهُ وَعَبْدٌ سَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ لَا بِالرُّجُوعِ وَالْعَفْوِ -

অনুবাদ : অপবাদ দানের হদ্দের পরিমাণ ও সাব্যস্ত হওয়া হিসাবে মদ পানের হদ্দের মতো, সুতরাং যদি কেহ ইহসান সম্পন্ন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর সরাসরি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে তাহলে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির দাবীর ভিত্তিতে (অপবাদ আরোপকারীর উপর) শরীরের বিভিন্ন স্থানে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর চামড়া ও তুলার পোষাক ছাড়া অন্য বস্ত্র খোলা হবে না। আর তার মুহসান হওয়ার অর্থ হল সে সুস্থ মস্তিস্ক প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, মুসলমান ও ব্যভিচারের দোষ থেকে পবিত্র হওয়া। যদি কেউ অন্য কাউকে বলে তুমি তোমার পিতার সন্তান নও। বা ক্রুদ্ধ অবস্থায় বলে (তার স্বীকৃত পিতার নাম নিয়ে) তুমি অমুকের সন্তান নাও তাহলে (অপবাদ আরোপিতকারীর উপর) হদ্দ লাগানো হবে। আর ক্রোধের অবস্থা ছাড়া তা বললে হদ্দ লাগানো হবে না। যেমন, হদ্দ লাগানো হবে না তাকে অস্বীকার করা তার দাদা থেকে অথবা কোন আরবীকে বলে হে নাবতী বা হে আসমানের পানির ছেলে কিংবা তার সম্পর্ক করে তার চাচার দিকে, তার মামার দিকে, তার পালক পিতার দিকে (তাহলে হদ্দ লাগানো হবে না) আর যদি কেহ বলে হে ব্যভিচারকারিণীর ছেলে (এমতাবস্থায় যে) তার মাতা মৃতা অতঃপর (মৃতার) পিতা বা ছেলে কিংবা ছেলের ছেলে (অপবাদ আরোপকারীর বিরুদ্ধে হদ্দ) দাবী করে, তাহলে হদ্দ লাগানো হবে। আর ছেলে তার পিতার উপর কিংবা গোলাম তার মনিবের উপর তার মায়ের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করার কারণে (অপবাদের হদ্দের) দাবী করতে পারে না। যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার মৃত্যুর দরুন হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার বা ক্ষমা দ্বারা তা রহিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : هُوَ كَحَدِّ الشُّرْبِ الخ : قذف ইহা باب ضرب থেকে অর্থ : নিক্ষেপ করা, দুর্নাম করা, ছোড়া। অর শরয়ী পরিভাষায় قذف বলা হয় : কোন পুত-পবিত্র পুরুষ বা মহিলার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করা।

সর্বসম্মতিক্রমে قذف হচ্ছে কবীরা গুনাহ। কেননা হুজুর (সা.) সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বাচার কথা বর্ণনা করেছেন এবঙ তন্মধ্যে একটি যিনার অপবাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অপবাদ আরোপের শাস্তি পরিমাণ ও সাবিত হওয়ার দিক থেকে তা মদপানের হদ্দের ন্যায়। অর্থাৎ, মদ পান যদি প্রমাণিত হয় তাহরে যেভাবে তার হদ্দ হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত তেমনি যিনার অপবাদেরও শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। আর যেভাবে মদ পানের বিষয় স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বা দুজন পুরুষের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সাবিত হয়। তেমনি অপবাদের বিষয়টি স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে সাবেত হয়। তবে হা অপবাদের শাস্তির ব্যাপারে দলিল পবিত্র কুরআনের আয়াত। যদিও মদ পানর শাস্তির দলিল ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা অর্জিত। অপবাদের শাস্তির ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

'যারা ইহসান সম্পন্না স্ত্রী লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন সাক্ষী পেশ না করতে পারে। তাদেরকে আশিটি দোররা লাগাও।' উক্ত আয়াতে অপবাদ আরোপের দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য। কেননা, এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া চারজন সাক্ষীর শর্তারোপের মাধ্যমে সে দিকেই ইংগিত রয়েছে। কেননা, চারজন সাক্ষীর বিষয়টি যিনার সাথেই সংশ্লিষ্ট।

قوله : فَلَوْ قَذَفَ مُحْصِنًا الخ : যদি কোন ব্যক্তি ইহসান সম্পন্ন কোন নর বা নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি হদ্দ প্রয়োগ করার দাবী উত্থাপন করে। আর অপবাদ আরোপকারী স্বাধীন হয় তবে শাসক তার উপর আশিটি দোররা লাগাবেন যা আমরা পূর্বোক্ত আয়াত থেকে উপলব্ধি করেছি। আর এক্ষেত্রে দাবী উত্থাপন শর্ত। কেননা অপবাদ ইহা বান্দার হক। তাই সে তা নিজ থেকে অপনোদনের জন্য দাবী উত্থাপন করবে। আর বেত্রাঘাতের সময় উক্ত ব্যক্তির শরীর থেকে তুলা জাতীয় বা চামড়ার বস্ত্র খোলা হবে। কেননা, তা ব্যথা পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আর অন্যান্য বস্ত্র খোলা হবে না। কেননা, আলোচ্য হদ্দ এর কারণ সুনিশ্চিত নয়। তাই পূর্ণ কঠোরতার প্রয়োজন নেই।

আর যদি অপবাদ আরোপকারী দাস হয় তাহলে তাকে তার দাসত্বের গুণের দাবীর ভিত্তিতে অর্ধেক হদ্দ তথা চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রয়োগ করা হবে।

قوله : وَ إِحْصَانُهُ الخ : ইহসান অর্থ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি স্বাধীন, সুস্থ মস্তিস্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিম ও ব্যভিচারের দোষ থেকে পবিত্র হওয়া, উক্ত সংখ্যায় স্বাধীন হওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে। এজন্য যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন ব্যক্তির উপর ইহসান শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

'দাসীর উপর ইহসান সম্পন্না নারীদের অর্ধেক শাস্তি সাব্যস্ত হবে।'

আর সুস্থ মস্তিস্ক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার শর্ত এজন্য যে পাগল বা অপ্রাপ্তদের উপর অপবাদ জনিত কলংক স্পর্শ করে না। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের থেকে ব্যভিচার কর্ম সংঘটিত হয় না।

আর মুসলমান হওয়ার শর্ত এজন্য যে নবী করীম (সা.) বলেন : مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ - যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মুহসিন নয়। সুতরাং আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, মুহসিন হতে হলে মুসলমান হতে হবে। আর ব্যভিচারের দোষ থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত এজন্য যে চরিত্রহীন ব্যক্তির কলংক স্পর্শ করে না। তাছাড়া অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি তার বক্তব্যে সত্যবাদী। এজন্য عفيفا عن الزنا শর্ত বিদ্যমান।

قوله : فَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি ক্রোধের অবস্থায় অন্য কাউকে বলে যে তুমি তোমার-পিতার

সন্তান নও, কিংবা তার স্বীকৃত পিতার নাম নিয়ে বলে তুমি অমুকের সন্তান নও, তাহলে অপবাদকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি ক্রোধ ছাড়া বলে তাহলে তা অপবাদ হবে না এবং এর জন্য কোন হদ্দ প্রয়োগ হবে না।

ক্রোধের অবস্থায় তখনই হদ্দ কায়েম করা হবে যখন তার মাতা মুহসিনা হবে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে ইহা তার মায়ের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা। কেননা, ব্যভিচার থকে বংশ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। আর ক্রোধের সময় এ ধরনের কথা দ্বারা প্রকৃত পক্ষেই তাকে গালী দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। আর ক্রোধ না থাকা অবস্থায় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মন্দ গুণাবলীতে সে তার পিতার মত না হওয়া এবং তাকে তিরস্কার করা।

قوله : كَنَفْيِهِ عَنْ جَدِّهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তিকে বলে, তুমি তোমার দাদার সন্তান নও বা তার দাদার নাম নিয়ে বলে যে তুমি অমুকের পুত্র নও। তাহলে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, সে তো তার বক্তব্যে সত্যবাদী। অনুরূপভাবে যদি কেহ অন্যজনকে তার দাদার সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যে, তুমি অমুকের সন্তান, তাহলে এতে হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, রূপকভাবে দাদার সাথে বংশ পরিচয় সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

قوله : لِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ الخ : যদি কেহ কোন আরবীকে বলে হে নিবতী! তাহলে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, তা এমন শব্দ যা যিনার অপবাদ বুঝায় না। তা হচ্ছে ভাষাগত হীনতা বা চরিত্রগত দুর্বলতা। অনুরূপভাবে যদি কেহ অন্য কাউকে বলে, হে আকাশের পানির ছেলে তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী হবে না। কেননা, এর অর্থ দানশীলতা, বদান্নতা ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তুলনা করা। অনুরূপভাবে যদি কেহ অন্য জনের বংশ সম্পর্ক তার চাচার সাথে সম্পৃক্ত করে, কিংবা মামার সাথে করে অথবা পালক পিতার সাথে করে তাহলেও সে অপবাদ আরোপকারী হবে না। কেননা, এদের সবাইকে পিতৃতুল্য বা পিতা বলা হয়। যেমন চাচাকে পিতা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

অথচ হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইয়াকুব (আ.) এর চাচা ছিলেন।

তদ্রূপ হুজুর (সা.) এর বাণী الخال أبٌ (মামা পিতা তুল্য) উক্ত হাদীসে মামাকে পিতৃতুল্য আখ্যা দেয়া হয়েছে।

আর পালক পিতাকে পালনগত দিক থেকে পিতা বলা হয়ে থাকে।

قوله : وَلَوْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ الخ : যদি কেহ অন্য কাউকে লক্ষ্য করে বলে হে ব্যভিচারিণীর ছেলে। অথচ তার মাতা মৃত ও মুহসিনাহ। এখন যদি মৃত মহিলার পিতা বা পুত্র বা নাতী অপবাদের শাস্তি দাবী করে, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী মৃতের সপক্ষে এমন ব্যক্তি দাবী উত্থাপন করতে পারে, অপবাদের কারণে যার বংশপরিচয় কলংকযুক্ত হয়ে যায়। আর তারা হচ্ছে পিতা বা সন্তানাদিগণ। কেননা তাদের সাথে মৃত ব্যক্তির অংশত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই রূপকভাবে এ কলংক তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, অপবাদের হদ্দের দাবী প্রত্যেক ওয়ারিশই করতে পারে। কেননা, তার মতে অপবাদ জনিত হদ্দ এর দাবীর ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী কার্যকর হয়। আমাদের মতে অপবাদের হদ্দ দাবীর বিষয়টি উত্তরাধিকারী সূত্রে নয়, বরং কলংক সূত্রে হয়ে থাকে। এজন্য আমরা বলি হত্যার অপবাদে মিরাস থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিও আলোচ্য হদ্দ দাবী করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

قوله : وَلَا يُطَالِبُ وَلَدٌ الخ : দাস তার মনিবের বিরুদ্ধে এবং সন্তান তার পিতার বিরুদ্ধে মুহসানা মায়ের উপর অপবাদ আরোপের হদ্দের দাবী করতে পারে না। কেননা, দাসের অনুকূলে মনিবকে এবং পুত্রের অনুকূলে

পিতাকে শাস্তি প্রদানের অবকাশ নেই। তাই তো মনিব দাসকে বা পিতা সন্তানকে হত্যা করলে ও তাদের উপর কিসাস কার্যকর হয় না। তবে হা যদি ঐ মহিলার উক্ত স্বামীর ঔরষ ছাড়া অন্য সন্তান থাকে বা গোলাম ভিন্ন অন্য সন্তান থাকে তাহলে অপবাদের হদ্দের দাবী করতে পারে এবং হদ্দ কায়েমও হবে। কেননা, এক্ষেত্রে হদ্দ কায়েমের প্রতিবন্ধকতা অনুপস্থিত।

قوله : وَ يَبْطُلُ بِمَوْتٍ الخ : যদি কেহ অন্য জনের উপর অপবাদ আরোপ করে অতঃপর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেহ স্বীকার করে যে, সে অপবাদ আরোপ করেছে অতঃপর তা প্রত্যাহার করে নেয় তবে তা প্রত্যাহার প্রাপ্ত বা বাতিল হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির হক বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সে প্রত্যাহার করলেও উক্ত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে অপবাদের হদ্দের দাবী উত্থাপন করে, আর যদি ক্ষমা করে দেওয়া হয় তবুও তা ক্ষমা হবে না। বরং সে চাইলে পরবর্তীতে হদ্দের দাবী করতে পারে।

وَلَوْ قَالَ زَنَأْتُ فِي الْجَبَلِ وَعَنَى الصُّعُودَ حُدَّ وَلَوْ قَالَ يَا زَانِي وَعَكَسَ حُدَّا وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ وَعَكَسَتْ حُدَّتْ وَلَا لِعَانَ وَلَوْ قَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ بَطَلَا وَإِنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَاعَنَ وَإِنْ عَكَسَ حُدَّ وَالْوَلَدُ لَهُ فِيهِمَا وَلَوْ قَالَ لَيْسَ بِابْنِي وَلَا بِابْنِكَ بَطَلَا وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً لَمْ يُدْرَ أَبُو وَلَدِهَا أَوْ لَاعَنَتْ بِوَلَدٍ أَوْ رَجُلًا وَطِىءَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَوْ أَمَةً مُشْتَرَكَةً أَوْ مُسْلِمًا زَنَا فِي كُفْرِهِ أَوْ مُكَاتَبًا مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ لَا يُحَدُّ وَحُدَّ قَاذِفُ وَاطِئِ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ وَحَائِضٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُسْلِمٍ نَكَحَ أُمَّهُ فِي كُفْرِهِ وَمُسْتَأْمَنٌ قَذَفَ مُسْلِمًا وَمَنْ قَذَفَ أَوْ زَنَى أَوْ شَرِبَ مِرَارًا فَحُدَّ فَهُوَ لِكُلِّهِ -

---

অনুবাদ : আর যদি কেহ বলে তুমি পাহাড়ে যিনা করেছ আর তা দ্বারা আরোহণের নিয়ত করে তাহলে হদ্দ লাগানো হবে। আর যদি বলে হে যিনাকারী এবং অন্যজনও তাই বলল, তাহলে দুজনকে হদ্দ লাগানো হবে। আর যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে হে যানিয়া (ব্যভিচার কারিণী) এবং স্ত্রী ও অনুরূপ বলে, তাহলে স্ত্রীকে হদ্দ লাগানো হবে। তবে লি'আন আবশ্যক হবে না। আর যদি স্ত্রী বলে আমি তোমার সাথে যিনা করেছি তাহলে উভয়টি (হদ্দ ও লি'আন) বাতিল হবে। আর যদি কেহ কোন সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে। অতঃপর তা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন সাব্যস্ত হবে। আর যদি এর বিপরীত করে (অর্থাৎ, প্রথমে অস্বীকার করে পরে স্বীকার করে নেয়) তাহলে হদ্দ লাগানো হবে। আর উভয় অবস্থায় সন্তান তারই হবে। আর যদি বলে (স্বামী স্ত্রীকে) এটা আমার সন্তান নয় এবং তোমারও সন্তান নয় তবে (উভয়টি তথা হদ্দ ও লি'আন) বাতিল হবে। আর যে ব্যক্তি এমন মহিলার উপর অপবাদ আরোপ করল, যার সন্তানের পিতার পরিচয় নেই। অথবা সে সন্তানের ব্যাপারে লি'আনকারিণী (তা হলে হদ্দে কাযাফ আসবে না) কিংবা এমন পুরুষের উপর (অপবাদ আরোপ করে) যে তার মালিকানা ভিন্ন সহবাস করে বা অংশীদার দাসীর সাথে সহবাস করে (তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আসবে না।) কিংব

এমন মুসলমানের উপর (অপবাদ আরোপ) করে যে কাফির অবস্থায় যিনা করেছে (তাহলে তার উপর হদ্দে কাযাফ আরোপ হবে না।) অথবা এমন মুকাতাবের উপর (অপবাদ আরোপ করে) যে চুক্তি পরিমাণ মাল রেখে মারা যায়। (তাহলে বর্ণিত সকল সুরতে) অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। আর অগ্নিপুজক দাসীর সাথে, হায়েয গ্রস্তার সাথে বা মুকতাবার সাথে সহবাসকারীর উপর (অপবাদ আরোপকারীকে হদ্দ লাগানো হবে যে এবং মুসলমানের উপর) কুফরী অবস্থায় তার মাকে বিবাহ করেছে (তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দে কাযাফ লাগানো হবে।) অথবা কোন নিরাপত্তা গ্রহণকারী কোন মুসলমানের উপর অবপাদ আরোপ করলে হদ্দে কাযাফ আরোপ হবে। আর কেহ যদি একাধিকবার অপবাদ আরোপ করে কিংবা যিনা করে অথবা মদ পান করে অতঃপর একবার হদ্দ লাগানো হয় তবে তা সবকটির জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَلَوْ قَالَ زَنَأْتَ فِى الْجَبَلِ الخ : যদি একজন অন্যজনকে বলে زَنَأْتَ فِى الْجَبَلِ তুমি পাহাড়ে যিনা করেছ, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তার উপর হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে হদ্দ কায়েম করা হবে না। কেননা, হামযা যুক্ত زنأت শব্দটি প্রকৃতপক্ষে আরোহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন কবি বলেন :

وَارِقٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ زَنَاءٌ فِى الْجَبَلِ

কল্যাণের পানে আরোহন কর, পর্বতারোহণের ন্যায়।

শায়খাইন (রহ.)-এর দলিল হল : زَنَأْتَ فِى الْجَبَلِ এর অর্থ زَنَيْتَ فِى الْجَبَلِ - কারণ زنا শব্দটিতে যেভাবে ناقص يائى আসে, অনুরূপ مهموز اللام ও ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং همزه যুক্ত অবস্থায়ও এধরণের ব্যভিচার অর্থে ব্যবহার করা হয়।

কেননা আরবরা হামযাকে লীন এবং লীনকে হামযায় রূপান্তরিতরূপে উচ্চারণ করে থাকে। আর ক্রোধ ও রাগের সময় শব্দের খারাপ অর্থটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই শুধু زنأت বা يازانى বললে শুধু ব্যভিচারই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর جبل এর উল্লেখ আরোহণই উদ্দেশ্য হবে। যদি তা على অব্যয় যুক্ত হয়।

قوله : وَلَوْ قَالَ يَا زَانِىُ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অপর জনকে বলে يَازَانِىُ হে ব্যভিচারিণী। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে না, বরং তুমি ব্যভিচারিণী তাহলে উভয়ের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, উভয়ই পৃথক পৃথকভাবে অপরজনের উপর অপবাদ আরোপকারী। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও যিনা শব্দ না বলে لا بل انت 'না বরং তুমি' তাহলে ও সে হদ্দের হুকুম প্রাপ্ত হবে। কেননা, বরং শব্দটি প্রমাণ করে যে, প্রথম বাক্যের মূল বিষয়টি বাক্যে উচ্চারিতরূপে বিবেচ্য।

قوله : وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِه الخ : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে হে ব্যভিচারিণী অতঃপর স্ত্রী বলল না, বরং তুমি ব্যভিচারকারী। তাহলে স্ত্রীর উপর অপবাদের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে লি'আন সাব্যস্ত হবে না। কেননা, স্বামী স্ত্রী উভয়েই অপবাদকারী, কিন্তু স্বামীর এ অপবাদ আরোপ দ্বারা তার উপর লি'আন আবশ্যক হবে। আর স্ত্রীর অপবাদের দরুন হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হয়। সুতরাং প্রথমে হদ্দে কাযাফ প্রয়োগ করার কারণে লি'আন রহিত হয়। কেননা, হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি লি'আন করার উপযুক্ততা নেই। আর তা এজন্য যে, লি'আন থেকে হদ্দ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। কেননা, লি'আন থেকে হদ্দ মজবুত। সুতরাং উক্ত মূলনীতির আলোকে যখন হদ্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল তখন লি'আন রহিত হয়ে যায়। কেননা, হদ্দ প্রাপ্তির কারণে তার লি'আন করার উপযুক্ততা রহিত হয়েছে। আর যদি স্বামীর উক্তিতে স্ত্রী বলে, তোমার সাথে যিনা করেছি, তাহলে হদ্দ বা লি'আন কোনটিই

আবশ্যক হবে না। কেননা, উভয়ের কথার মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান। কেননা, হয়তো স্ত্রী ইহা বুঝানোর ইচ্ছা করেছে যে, বিবাহের পূর্বে তোমার সাথে যিনা করেছি। আর তা দ্বারা তো হদ্দ আবশ্যক হয়। লি'আন নয়, অথবা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আমি তো তোমার সাথে যা করার তা করেছি। সুতরাং তোমার সাথে যদি এ সহবাস যিনা হয় তবো তো ঠিক। অন্যথায় আমি তো তোমাকেঁ ছাড়া অন্য কাউকে সুযোগ দান করিনি। সুতরাং এ দ্বিতীয় সুরতে এক দিক বিবেচনা করলে লি'আন আসে। কেননা, স্বামী স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দিচ্ছে। কিন্তু স্ত্রীর কথা অনুযায়ী স্ত্রীর উপর হদ্দ আবশ্যক হচ্ছে না। কেননা, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করার সুরতে স্বামী অপবাদ আরোপকারী হচ্ছে না।

সুতরাং আলোচ্য বক্তব্য দ্বারা স্বামীর উপর লি'আন আর স্ত্রীর উপর হদ্দ কোনটিই সাবিত হচ্ছে না। এজন্য আমরা বলি এধরনের কথা বাতিল।

قوله : وَاِنْ اَقَرَّ بِوَلَدٍ الخ : যদি কোন ব্যক্তি কোন সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে অতঃপর তা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন সাব্যস্ত হবে। কারণ নিজের থেকে সন্তানের বংশঅস্বীকার করা মানে নিজের স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করা। তাই লি'আন আবশ্যক হবে। আর যদি প্রথমে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে অতঃপর তা স্বীকার করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হবে। কেননা, সে পরবর্তীতে সন্তানের বংশ সূত্র নিজের থেকে স্বীকার করার দরুন নিজেকে মিথ্যুক প্রমানিত করেছেন। সুতরাং সন্তান অস্বীকার করার দরুন তার উপর যে লি'আন আবশ্যক হত তা রহিত হয়ে তার আসল তথা হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হবে। আর উভয় সুরতে সন্তান স্বামীর হিসেবে গণ্য হবে। চাই সন্তানের পিতৃত্বের স্বীকারোক্তি আগে হোক বা পরে হোক। এখানে যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, সন্তান অস্বীকার করার কারণে তো লি'আন সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং যখন এখানে সন্তানের বংশ স্বামীর সাথেই সম্পৃক্ত হল তাই লি'আন আবশ্যক না হওয়া। এর জবাবে আমরা বলি যে, মূলত এখানে সন্তান অস্বীকার দ্বারা লি'আন আবশ্যক হচ্ছে না বরং স্ত্রীর উপর অপবাদ দানের জন্য তার উপর লি'আন আবশ্যক হবে। আবার অনেক সময় সাধারণভাবেও লি'আন আবশ্যক হয়। যেমন বাচ্চা না হওয়ার অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর উপর অপবাদ দেয় তবে তা লি'আন আবশ্যককারী হবে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বংশ সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও অপবাদ থেকে যাচ্ছে। যার ভিত্তিতে লি'আন জারী হবে।

আর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে এটা আমার সন্তান নয় এবং তোমারও সন্তান নয়, তাহলে স্বামীর উপর হদ্দে কাযাফ বা লি'আন কিছুই আবশ্যক হবে না। কেননা, সে সন্তানের প্রসবকে অস্বীকার করেছে, যা দ্বারা হদ্দ বা লি'আন আবশ্যক হয় না।

قوله : وَمَنْ قَذَفَ اِمْرَاَةً الخ : যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন মহিলার নামে অপবাদ আরোপ করে যার সাথে সন্তানাদী রয়েছে, যাদের পিতার পরিচয় নেই, কিংবা এমন মহিলার উপর যার সাথে সন্তান আছে আর সে উক্ত সন্তানের ব্যাপারে লি'আনকারী, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, উক্ত মহিলাদ্বয় মুহসিনা নয়। কেননা, পিতৃত্ব পরিচয়হীন সন্তান প্রসব করা দ্বারা তাদের যিনার আলামত বিদ্যমান রয়েছে। তাই যিনার আলামত বিদ্যমান হওয়ার দরুন সে সতীত্বহীন হয়ে গেল। আর যদি লি'আনকারী স্ত্রীলোকের সাথে সন্তান না থাকে আর তার উপর অপবাদ আরোপ করা হয় তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দুল কাযাফ আরোপ হবে। কেননা, তার সাথে যিনার কোন আলামত বিদ্যমান নেই।

قوله : اَوْ رَجُلًا وَطِئَ فِى غَيْرِ مِلْكِهٖ الخ : যদি কেহ তার মালিকানা ছাড়া হারামভাবে সহবাস করে তাহলে তার উপর অপবাদ আরোপকারীর উপর কোন হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সতীত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। অথচ হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হতে হলে মুহসান হওয়া শর্ত। আর মুহসান হওয়ার জন্য সতীত্ব বিলুপ্ত না হওয়া শর্ত। তাছাড়া উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক। এক্ষেত্রে হিদায়া গ্রন্থে একটি মূলনীতি উল্লেখ আছে, তা হল, যে বক্তি এমন সংগম করে, যা সত্তাগতভাবে হারাম তার উপর অপবাদ আরোপ দ্বারা তার উপর হদ্দুল কাযাফ আসবে না।

কেননা, সত্তাগত হারাম সংগমকেই যিনা বলা হয়ে থাকে। আর যদি সংগমটি পরোক্ষভাবে হারাম হয় তাহলে হদ্দুল কাযাফ আসবে। কেননা, এটা যিনা নয়।

সুতরাং আলোচ্য মূলনীতি অনুযায়ী যদি কেহ এমন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে যে তার ও অন্যের মধ্যকার শরিকানাধীন দাসীর সাথে সংগম করে। তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, এক্ষেত্রেও একদিক থেকে মালিকানা অনুপস্থিত। তাই তা সত্তাগত হারাম সংগম এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ যদি কেহ এমন মুসলমানের উপর অপবাদ আরোপ করে যে কুফুর অবস্থায় যিনা করেছে, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সত্তাগত মালিকানা অনুপস্থিত, তাইতো তার উপর হদ্দে যিনা আবশ্যক হয়। তাই সে মুহসান নয়। আর মুহসান নয় এমন কারো প্রতি অপবাদ আরোপ দ্বারা হদ্দে কাযাফ আবশ্যক হয় না। অনুরূপ যদি এমন মুকাতাব গোলামকে অপবাদ দেয় যে তার চুক্তির পরিমাণ সম্পদ রেখে মারা যায়। তাহলে অপবাদ দাতার উপর হদ্দ আসবে না। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্যের কারণে তার স্বাধীনতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

قوله : وَ حُدَّ قَاذِفُ وَاطِئِ اَمَةٍ الخ : আর যদি কোন ব্যক্তি এমন লোকের উপর অপবাদ আরোপ করে, যে তার নিজের মালিকানাধিন অগ্নিপূজক দাসীর সাথে সহবাস করে কিংবা হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীর সাথে। অথবা মুকাতাব দাসীর সাথে সহবাস করে, তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, এখানে পরোক্ষভাবে হারামত্ব রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে, যা যিনারূপে গণ্য নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে মুকাতাব দাসীর সাথে সংগম মুহসান হওয়াকে বিলুপ্ত করে। কেননা, সহবাসের ক্ষেত্রে মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে। আর আমাদের মতে সত্তাগত মালিকানা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আর সাময়িক হওয়ার কারণে হারামত্বটি পরোক্ষ যা দ্বারা হদ্দে কাযাফকে রহিত করা যায় না।

قوله : وَ مُسْلِمٍ نَكَحَ اُمَّهُ فِىْ كُفْرِهٖ الخ : আর যদি এমন মুসলিম পুরুষের উপর অপবাদ আরোপ করা হয়, যে কাফির অবস্থায় তার মাতাকে বিবাহ করেছে। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতে অপবাদ দাতার উপর হদ্দ আসবে। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে হদ্দ আসবে না। আর উক্ত মতপার্থক্যের ভিত্তি হল অন্য একটি মতপার্থক্যময় বক্তব্যের উপর তা হল : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মাহরামের সাথে অগ্নি পূজকের বিবাহ বৈধতা রয়েছে তাদের নিজেদের মাঝে। কিন্তু সাহাবইন (রহ.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

قوله : وَ مُسْتَأْمِنٌ الخ : যদি কোন হারবী লোক নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং কোন মুসলমানের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর হদ্দ আরোপ হবে। কেননা, এতে বান্দার হক রয়েছে। অথচ সে বান্দার হকসমূহের পুর্ণ সংরক্ষণের উপর বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সে নিরাপত্তা গ্রহণের অর্থ হল সে আশা করেছে যে, কারো পক্ষ থেকে তাকে কষ্ট দেয়া হবে না। সুতরাং সেও অন্য কাউকে কষ্ট না দেওয়া ও কষ্ট দানের অনিবার্য পরিণতি ভোগের বাধ্যবাধকতা গ্রহণকারী হবে।

قوله : وَ مَنْ قَذَفَ اَوْ زَنٰى الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, কেহ যদি একাধিক বার অপবাদ আরোপ করে কিংবা যিনা করে কিংবা মদ পান করে অতঃপর তাকে হদ্দ লাগানো হয়, তাহলে একই হদ্দ সবকটির জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ, এক ধরনের একাধিক অপরাধের জন্য একটি হদ্দ যথেষ্ট হবে। আর যদি বিভিন্ন ধরনের একাধিক অপরাধ হয় তাহলে একটি হদ্দ যথেষ্ট নয়। কেননা, যিনার হদ্দ বা মদ পানের হদ্দ তাতো حق الله বা শরীয়তের হক। আর حد قذف এর মধ্যেও حق الله ই অধিক হিসেবে গণ্য তাই প্রত্যেক ধরনের একাধিক অপরাধ একই হদ্দে অন্তর্ভুক্ত হবে। তথা একই হদ্দ প্রয়োগ করা যথেষ্ট হবে। কেননা, মূল লক্ষ হচ্ছে ধমকানো ও সতর্ক করা। যা একবার হদ্দ প্রয়োগ করার দ্বারা অর্জিত হয়। হ্যাঁ, অপরাধ যদি বিভিন্ন হয় তাহলে যেহেতু প্রত্যেক অপরাধের হদ্দের উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়। তাই এক হদ্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা تداخل হবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হদ্দ প্রয়োগ করতে হবে।

فَصْلٌ : فِى التَّعْزِيْرِ

অনুচ্ছেদ : সাধারণ শাস্তি বিধান

وَمَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا أو كَافِرًا بِالزِّنَا أو مُسْلِمًا بِيَا فَاسِقُ يا كَافِرُ يا خَبِيثُ يا لِصُّ يا فَاجِرُ يا مُنَافِقُ يا لُوطِيُّ يا من يَلْعَبُ بِالصِّبْيَانِ يا آكِلَ الرِّبَا يا شَارِبَ الْخَمْرِ يا دَيُّوثُ يا مُخَنَّثُ يا خَائِنُ يا ابْنَ الْقَحْبَةِ يا زِنْدِيقُ يا قَرْطَبَانُ يا مَأْوَى الزَّوَانِي أو اللُّصُوصِ يا حَرَامُ زَادَهْ عُزِّرَ وَبِيَا كَلْبُ يا تَيْسُ يا حِمَارُ يا خِنْزِيرُ يا بَقَرُ يا حَيَّةُ يا حَجَّامُ يا بَابَغَّاءُ يا مُؤَاجِرُ يا وَلَدَ الْحَرَامِ يا عَيَّارُ يا نَاكِسُ يا مَنْكُوسُ يا سُخْرَةُ يَا ضُحْكَةُ يا كَشْحَانُ يا أَبْلَهُ يا مُوَسْوِسُ لَا وَأَكْثَرُ التَّعْزِيرِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَصَحَّ حَبْسُهُ بَعْدَ الضَّرْبِ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا ثُمَّ الشُّرْبُ ثُمَّ الْقَذْفُ وَمَنْ حُدَّ أو عُزِّرَ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ لِتَرْكِ الزِّينَةِ وَالْإِجَابَةِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَ الْغُسْلِ وَالْخُرُوجِ من الْبَيْتِ -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি গোলাম বা কাফেরকে যিনার অপবাদ আরোপ করে অথবা কোন মুসলমানকে এই বলে গালি দেয় হে ফাসিক! হে কাফির, হে খবিস, হে চোর, হে বদকার, হে মুনাফিক, হে সমকামী, হে বাচ্চাদের দ্বারা খোলার পাত্র, হে মদখোর, হে মদ্যপায়ী, হে দুয়্যুস, হে হিজড়া, হে খেয়ানতকারী, হে যিনাকারিণীর বাচ্চা, হে নাস্তিক, হে পতিতাদের দালাল, হে পাপিষ্ঠদের বা চোরদের আশ্রয়দাতা, হে হারামজাদা, তাহলে (উল্লিখিত সকল সুরতে) গালীদাতাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি এই বলে গালি দেয় যে, হে কুকুর, হে ছাগল (হে পাঠা) হে গাধা, হে কুকুর হে গরু, হে সাপ, হে শিঙ্গা লাগানেওয়ালা, হে দুরাচার, হে যিনার উপার্জন ভক্ষণকারী, হে হারামের বাচ্চ, হে ভবঘুরে, হে মাথা নতকারী, হে মস্তকনতকৃত, হে উপহাসের পাত্র, হে হাসির পাত্র হে বেশরমা,হে নির্বুদ্ধ হে কুমন্ত্রনাদানকারী, হে অশুভ, তাহলে গালি দাতাকে শাস্তি দেওয়া হবে না। আর সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে উনচল্লিশ বেত্রাঘাত আর সর্বনিম্ন তিনটি বেত্রাঘাত। আর প্রহারের পর তাকে বন্দি করা সহীহ। প্রহারের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শক্ত প্রহার হল স্বাধারণ শাস্তি। তারপর ব্যভিচারের হদ্দ, তারপর মদ পানের হদ্দ তার পর অপবাদ আরোপের হদ্দ। আর যাকে হদ্দ প্রয়োগ করা হল বা শাস্তি প্রদান করা হল। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করল। তাহলে তার খুন মাফ (দন্ডহীন)। তবে ব্যতিক্রম সৌন্দর্য ত্যাগের জন্য (যা শরীয়ত

অনুমোদিত) বা (স্বামী কর্তৃক) তাকে সহবাসের জন্য আহ্বান করলে সাড়া না দিলে তার দরুন কিংবা নামাজ ও গোসল ত্যাগের জন্য কিংবা ঘর থকে বের হওয়া পরিত্যাগের দরুন শাস্তি প্রদান করে, আর স্ত্রী নিহত হয়ে যায়। (আর স্ত্রী নিহত হয়ে যায় তাহলে তার খুন মাফ বা দন্ডহীন নয়। বরং দিয়াত আবশ্যক হবে।)

প্রাসঙ্গিত আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) নির্ধারিত শাস্তি সমূহের আলোচনার পর এখান থেকে অনির্ধারিত সাধারণ শাস্তির আলোচনা শুরু করছেন।

সাধারণ শাস্তি যা কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শিষ্টাচারিতা বা আদব শিক্ষাদানের নিমিত্তে স্বামীদের নিজ স্ত্রীদেরকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন, যা সাধারণ শাস্তি। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হদ্দসমূহ ভিন্ন দশ বেত্রাঘাতের বেশি যেন না হয়। তদ্রূপ বাচ্চার দশ বৎসর পর নামাজ পরিত্যাগের উপর শাস্তি প্রমাণিত। আর এর উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। আর কিয়াসেরও চাহিদা তাই। কেননা, মন্দ চরিত্র থেকে বেঁচে থাকা বা দুষ্ট চরিত্রে নিজেকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের দিকে পতিত করা থেকে বাঁচানোর জন্য সাধারণ শাস্তির বিধান শরীয়তে থাকা আবশ্যক। যার দরুন নামায কলুষিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং শরীয়তে সাধারণ শাস্তির বিধান রয়েছে।

قوله : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا الخ : যদি কেহ কোন দাস বা দাসী যদি ও সে মুকাতাবা হয় কিংবা উম্মেওয়ালাদ হয়, কিংবা কোন কাফেরের উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ কায়েম করা হবে। কেননা, তা তো মূলত অপবাদ আরোপের হদ্দের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে মুহসিন না হওয়ার দরুন হদ্দ সাব্যস্ত করণ রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং চরম পর্যায়ের সাধারণ শাস্তি অবশ্যই সাব্যস্ত হবে। যাতে পরিপূর্ণ ধমকানো বা সতর্কতা হাসিল হয়।

قوله : أَوْ مُسْلِمًا بِيَا فَاسِقُ الخ : আর যদি কোন মুসলমান অন্য কোন ব্যক্তিকে যিনা ছাড়া অন্য কোন অপবাদ আরোপ করে, যেমন বলে হে ফাসিক, হে কাফির। (উদাহরণগুলি অনুবাদেই স্পষ্ট) তাহলেও অপবাদ আরোপকারীকে সাধারণ শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কেননা, এরূপ কথা বলে সম্বোধিত ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বে কলুষিত ও কলংক লেপন করেছে। আর কিয়াসের আলোকে হদ্দ কায়েম করাও সম্ভব নয়। কেননা, এক্ষেত্রে কিয়াসের কোন দখল নেই। তাই এক্ষেত্রে সাধারণ শাস্তিই প্রযোজ্য হবে। তবে হা ইহা যেহেতু কোন সাব্যস্ত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে না এবং হদ্দ সাব্যস্তের সাদৃশ্যতাও বুঝায় না, তাই তার শাস্তির ব্যাপারে শাসকের বিবেচনা ধর্তব্য হবে।

قوله : وَبِيَا كَلْبُ يَا تَيْسُ الخ : আর যদি কেহ অন্য কাউকে হে কুকুর, হে পাঠা ইত্যাদি বলা দ্বারা অপবাদ আরোপ করে তাহলে তা অপবাদ আরোপ হওয়াকে আবশ্যক করে না বিধায় এমন কথা দ্বারা সম্বোধনকারীর উপর সাধারণ শাস্তি আবশ্যক হবে না। কেননা, যেহেতু বিষয়টির অবাস্তবতা নিশ্চিত, তাই এমন কথায় তার চরিত্রে কোনরূপ কলংক যুক্ত হয় না। এব্যাপারে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (রহ.) একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন. তা হল এই : যদি এমন فعل اختيارى কে উল্লেখ করে গালি দেয় যা শরীয়তে হারাম এবং ওরফে একে দোষ হিসেবে দেখা হয়, তবে তাতে সাধারণ শাস্তি আবশ্যক হবে। তিনি বলেন : আমরা فعل اختيارى এর শর্ত এজন্য করেছি যে, এর দ্বারা যেন জন্মগত ক্রুটি বলে গালি দেওয়ার সুরত থেকে বাঁচা যায়। যেমন কেহ হে গাধা বলে

গালি দিল। তাহলে তার দ্বারা সাধারণ শাস্তি তার উপর আবশ্য হবে না। কেননা, এটা স্পষ্ট বিষয় যে, এর দ্বারা মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং রূপক অর্থ তথা নির্বোধ, বেকুব ইত্যাদি। যা জন্মগত গুণ। অনুরূপ কেহ বলল, হে কুকুর, যার দ্বারা মন্দ চরিত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর যদি সে আলিম কিংবা সায়্যিদ কিংবা নেককার লোককে গালি দেয়, তাহলে সাধারণ শাস্তি আবশ্যক হবে। কেননা, তারা সম্মান মর্যাদার ব্যক্তি। তাই তাদেরকে অপমানিত করার দরুন সাধারণ শাস্তি আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে এজাতীয় কথাবার্তা অহরহ চলতে থাকে। আর তারাও এ জাতীয় কিছু বলার পরোয়া করে না।

قوله : وَ اَكْثَرُ التَّعْزِيرِ الخ : সাধারণ শাস্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে উনচল্লিশটি বেত্রাঘাত। আর সর্বনিম্ন তিনটি বেত্রাঘাত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, এ শাস্তির পরিমাণ পঁচাত্তরটি বেত্রাঘাত। এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হচ্ছে নবী করীম (সা.) এর বাণী :

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِىْ غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ

'হদ্দের ক্ষেত্র ছাড়া যে ব্যক্তি এর পরিমাণে উপনীত হয় সে সীমা লংঘনকারী।'

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, হদ্দের শেষ সীমায় না যাওয়া। তাই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) সর্বনিম্ন হদ্দ কোনটি তা বের করেছেন। আর তা হল গোলামের জন্য অপবাদ জনিত হদ্দ আর তা হল চল্লিশটি। তাই উক্ত হদ্দ থেকে একটি দোররা হ্রাস করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) উক্ত নিয়ম অনুযায়ী স্বাধীন ব্যক্তির জন্য অপবাদ জনিত হদ্দকে নির্ধারণ করেছেন। আর তাহল আশিটি। কেননা, মূল অবস্থা হচ্ছে স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতার দিকই বিবেচনা করা হবে। সুতরাং উক্ত আশিটি দোররা থেকে একটি দোররা কমানো হবে। আর তা কিয়াসেরও দাবী। ইমাম যুফার (রহ.) এরও ইহা অভিমত। আবার ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর অন্য বর্ণনায় পচাত্তরটি হওয়ার কারণ হল হযরত আলী (রাযি.) থেকে তাই বর্ণিত।

আর সর্বনিম্ন তিনটি হওয়ার কারণ হচ্ছে এর কমে সতর্কীকরণ হয় না। তবে আমাদের মাশায়েখে কেরামগণের মতে তার সর্বনিম্ন নির্ধারণ করবেন শাসক। অর্থাৎ, তিনি যে পরিমাণ দ্বারা সতর্কীকরণ সম্পন্ন হবে বলে মনে করবেন সে পরিমাণই ধার্য করবেন। কেননা, মানুষের ভিন্নতার দরুন তা ভিন্ন হয়ে থাকে।

قوله : وَ صَحَّ حَبْسُهُ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, তাকে বন্দী করা অর্থাৎ শাসক যদি বেত্রাঘাতের সাথে তাকে বন্দী করা সংগত মনে করেন, তাহলে তাকে বন্দীও করতে পারেন। কেননা, তাতো এককভাবেও শাস্তি হওয়ার যোগ্য। কেননা সামগ্রীকভাবে এর পক্ষে শরীয়াতের অনুমোদন রয়েছে। এমন কি জেল দেয়ার মধ্যে সীমিত করাও জায়েয আছে। তাই প্রহারের সাথে তাকেও যুক্ত করা জায়েয আছে। আর যেহেতু বন্দী পৃথকভাবেই শাস্তি হওয়ার যোগ্য তাই যার ক্ষেত্রে সাধারণ শাস্তি সাব্যস্ত হয়নি তাকে সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত বন্দী রাখা জায়েয।

قوله : وَ اَشَدُّ الضَّرْبِ الخ : অপেক্ষাকৃত শক্ততম হচ্ছে সাধারণ শাস্তির প্রহার। আর তার উদ্দেশ্য ধমকানো এবং সতর্কতা পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত করা। কেননা, তাতে এক দিক থেকে সংখ্যাগত ব্যাপারে শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু গুণগত দিক থেকে শিথিল করা হবে না, যাতে উদ্দেশ্যের বিফলতায় পরিণত না হয়। অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ততম হচ্ছে যিনার হদ্দ। কেননা, যিনার হদ্দ نص قطعى দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ততম হচ্ছে মদ পানের হদ। কেননা, এ হদ্দ সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর অপেক্ষাকৃত শক্ততম হল হদ্দে কাযাফ। কেননা, হতে পারে অপবাদদাতা সত্যবাদী। কিন্তু যিনার উপর সাক্ষী পেশ করতে পারছে না বলে তার উপর অপবাদের হদ্দ লাগানো হচ্ছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে সাক্ষী দানের যোগ্যতা রদ করার মাধ্যমে কঠোরতা করা হয়েছে। সুতরাং প্রহারের গুণগত দিক থেকে কঠোরতা করা হবে না।

قوله : وَ مَنْ حُدَّ اَوْ عزِّرَ الخ : শাসক যার উপর হদ্দ কায়েম করেন অতঃপর সে এর ফলে মৃতবরণ করে কিংবা যার উপর সাধারণ শাস্তি কায়েম করেন অতঃপর সে এর ফলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার খুন মাফ (দন্ডহীন)। কেননা, শাসক যা করতেছেন তা তো তার ব্যক্তি স্বার্থে করেননি, বরং শরীয়াতের আদেশেই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আর আদিষ্ট ব্যক্তির কর্মটি নিরাপত্তার শর্তে শর্তায়িত নয়। পক্ষান্তরে স্বামীর স্ত্রীকে সাধারণ শাস্তির বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ, স্বামী যদি স্ত্রীকে শাস্তি প্রদান করে আর এ শাস্তিতে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে তবে স্ত্রীর খুন মাফ নয়, বরং স্বামীর উপর দিয়াত আবশ্যক হবে। কেননা, স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য হুকুম প্রাপ্ত হয়নি। বরং তাকে ইচ্ছাধিকার দেয়া হয়েছে। আর ইচ্ছাধিকার পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে কর্ম সম্পাদন করা শর্ত। যেমন রাস্তায় চলাচলের ব্যাপারটি পূর্ণ নিরাপত্তার শর্তে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ রাস্তায় চলাচলের সময় কোন কিছু ধ্বংস হলে তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।

كِتَابُ السَّرِقَةِ

অধ্যায় : চুরি প্রসঙ্গে

هِيَ أَخْذُ مُكَلَّفٍ خُفْيَةً قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مُحْرَزَةٍ بِمَكَانٍ أَو حَافِظٍ فَيُقْطَعُ أَن أَقَرَّ مَرَّةً أَو شَهِدَ رَجُلَانِ وَلَوْ جُمِعَا وَالْآخِذُ بَعْضُهُمْ قُطِعُوا إِنْ أَصَابَ لِكُلِّ نِصَابٌ -

অনুবাদ : চুরি হচ্ছে সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি গোপনে টাকশালে নির্মিত দশ দিরহাম সম পরিমাণ মাল সুরক্ষিত স্থান বা রক্ষক থেকে নিয়ে নেয়া। যদি চোর একবার (চোরি) স্বীকার করে বা দুজন পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে। আর যদি চোরের এক জামাত হয় আর কিছু সংখ্যক চুরি করে তাহলে যদি সকলের নিকট (চুরির) নিসাব পরিমাণ মাল পৌঁছে তবে সকলের হাত কাটা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : كِتَابُ السَّرِقَةِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) হুদুদের আলোচনা পূর্বে করেছেন। আর এখান থেকে চুরির শাস্তির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেছেন। কেননা, হুদুদ দ্বারা নিজ সত্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্মান মর্যাদার সংরক্ষণ উদ্দেশ্য। তাই হুদুদের আলোচনা পূর্বে করেছেন। আর চুরির শাস্তি দ্বারা সম্পদের সংরক্ষণ উদ্দেশ্য, যা দ্বারাও নিজ সত্তা, সম্মান-মর্যাদা সংরক্ষণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এজন্য তার আলোচনা হুদুদের পরপরই এনেছেন। السرقة ইহা باب ضرب يضرب এর ক্রিয়ামূল। যার অর্থ চুরি করা, অপহরণ করা। তথা اخذ الشى من الغير خفية গোপনে অন্যের মাল তুলে নেয়া। পরিভাষায় سرقة হল (গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী) :

أَخْذُ مُكَلَّفٍ خُفْيَةً قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مُحْرَزَةٍ بِمَكَانٍ أَو حَافِظٍ

'চুরি হচ্ছে সুস্থ মস্তিষ্ক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি গোপনে টাকশালে নির্মিত দশ দিরহাম সম পরিমাণ মাল সুরক্ষিত স্থান বা রক্ষক থেকে নিয়ে নেয়া।' এটা হচ্ছে শাস্তি আরোপকারী চুরির সংজ্ঞা। আর সাধারণ চুরির সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া যায় যে :

اَخْذُ مَالٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ حِرْزٍ اَجْنَبِيٍّ لَاشُبْهَةَ فِيهِ خُفْيَةً وَ هُوَ قَاصِدٌ لِلْحِفْظِ فِى نَوْمِهِ اَوْ غَيْبَتِهِ

'গোপনে এমন মূলবান সম্পদ নিয়ে নেয়া। নিঃসন্দেহে যা অপরিচিত লোকের হেফাজতে রয়েছে এবং মালিক এর হেফাজতে যত্নবান থাকে। চাই হেফাজতকারীর ঘুমন্ত অবস্থায় মাল নেক কিংবা তার অনুপস্থিতিতে।

উক্ত সংজ্ঞা থেকে মালের পরিমাণ এবং চোরের গুণের বর্ণনা অনুপস্থিত, এজন্য আমাদের প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটিই সঠিকভাবে মূল্যায়ণযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

قوله : هِيَ اَخْذُ مُكَلَّفٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কেননা, এ দুটির অবিদ্যমানে অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। আর অপরাধ সাব্যস্ত না হলে তো হস্ত কর্তন সম্ভব নয়। সুতরাং যদি কোন বিকৃত মস্তিস্ক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা চুরি করে তবে তাদের হাত কর্তন করা হবে না।

قوله : قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ الخ : আলোচ্য ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার (রহ.) যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হস্ত কর্তন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। আমাদের আহনাফ ফুকাহায়ে কেরামগণের মতে সর্বনিম্ন যদি কেহ দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সর্বনিম্ন ربع دينار বা এক দিনারের এক চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটা হবে। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, সর্বনিম্ন তিন দিরহাম চুরি করা দ্বারা চোরের হাত কাটা হবে।

ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) এর দলিল হল বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস :

قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهٗ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) চোরের হাত কেটেছেন একটি ঢালের পরিবর্তে যার মূল্য ছিল মাত্র তিন দিরহাম। তাছাড়া তিন দিরহাম নির্ধারণ করে নেয়া ভাল। কারণ, তা সর্বনিম্ন যা নিশ্চিত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)ও উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তবে وجه استدلال এভাবে যে, রাসূল (সা.) এর যুগে ১২ দিরহামে এক দিনার হতো। তাই এক দিনারের এক চতুর্থাংশ তিন দিরহামই হচ্ছে। তাছাড়া তিনি হযরত আয়েশা (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلَّا رُبُعَ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, এক দিনারের এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি চুরি করলে চোরের হাত কর্তন করা হবে।

আমাদের দলিল : হদ্দ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার কৌশল হিসাবে সর্বোচ্চ পরিমাণই গ্রহণ করা উত্তম। কেননা, নিম্নতম পরিমাণের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর সন্দেহ দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যায়। আর সর্বোচ্চ পরিমাণটিও নবী করীম (সা.) এর হাদীসে বিদ্যমান। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُقْطَعُ الْيَدُ اِلَّا فِىْ دِيْنَارٍ اَوْ فِىْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, এক দিনার বা দশ দিরহাম চুরিতে চোরের হাত কর্তন করা হবে।

অন্যত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত :

قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلٍ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهٗ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) এক বক্তির (চোরের) হাত কেটেছেন একটি ঢালের পরিবর্তে যার মূল্য ছিল এক দিনার বা দশ দিরহাম। তাছাড়া আমাদের দলিল হল যে, হযরত উমর (রাযি.) দশ দিরহাম চুরি করার কারণে হস্ত কাটার ফাতাওয়া দিয়েছিলেন। আর তা সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে হওয়াতে এর উপর ইজমা সাব্যস্ত হয়ে গেল।

অতঃপর সম্মানিত গ্রন্থকার عشرة دراهم এর صفت বর্ণনা করেছেন مضروبة দ্বারা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকশালে নির্মিত মুদ্রার উপরই দিরহাম নামটি প্রযোজ্য হবে। আর তাই বিশুদ্ধ। কেননা, এতে অপরাধের পূর্ণতার দিকটি পূর্ণ হয়েছে। অতএব, যদি কেহ দশটি রূপাখন্ড চুরি করে, যার মূল্য দশ দিরহাম থেকে কম তাহলে তার

হাত কাটা যাবে না। আর দিরহামের ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাত মিসকালের ওজনই ধর্তব্য। আর দিরহাম ছাড়া অন্য কোন কিছু চুরি করলেও দিরহামের দিকই বিবেচনা করে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত করতে হবে। অতঃপর সম্মানিত গ্রন্থকার مُحْرَزَةٍ দ্বিতীয় صفت হিসাবে ব্যবহার করেছেন যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানটি এমন সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যার সুরক্ষার কোন সন্দেহ নেই। কেননা, সন্দেহ হল হদ্দ প্রতিহতকারী।

قوله : فَيُقْطَعُ إِنْ أَقَرَّ الخ : বয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি সর্বনিম্ন দশ দিরহাম চুরি করে এবং অন্যান্য শর্তসমূহ দ্বারা তার চুরি সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর এক্ষেত্রে স্বাধীন ও গোলাম বরাবর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ

'যে পুরুষ চুরি করে কিংবা যে নারী চুরি করে তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে তাদের হস্ত কেটে দাও।'

উক্ত আয়াতে গোলাম ও স্বাধীনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। তাছাড়া গোলামের অর্ধ হস্ত কর্তন করা সম্ভব নয়। আর চুরি সাব্যস্ত হয় চোরের স্বীকারোক্তি দ্বারা। কিন্তু চোরের কত বার স্বীকার করার দ্বারা তার হস্ত কর্তন করা হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে এক বারই স্বীকার করলে তার উপর হদ্দ আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে অন্তত দু' বার স্বীকার করতে হবে। এক বারের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট হবে না। তিনি চোরের হদ্দ কায়েমের দ্বিতীয় প্রমান তথা সাক্ষ্যের বিষয়ের উপর কিয়াস করেছেন। সুতরাং যেহেতু সাক্ষ্য দুজন হতে হয় তাই চোরের স্বীকারোক্তিও দুবার হতে হবে। তিনি উক্ত মাসআলাকে যিনার মাসআলার সাথে কিয়াস করেছেন।

তরফাইন (রহ.) এর দলিল : চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একবারের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। যেমন কেছাচ বা হদ্দে কাযাফ প্রমাণিত হওয়ার জন্য স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে স্বীকারোক্তির বারংবারতাকে শর্ত করা হয়নি। তাছাড়া সাক্ষীর বিষয়ে আধিক্য এজন্য যে তা মিথ্যা হওয়ার তোহমত হ্রাস করে। কিন্তু স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে বারংবার তা দ্বারা অন্য কোন সুফল লাভ করা যায় না। তাছাড়া মালের ক্ষেত্রে এক বারেরও স্বীকারোক্তি তা প্রত্যাখানের অবকাশ রাখে না। কেননা, মালের মালিক তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলিলের জবাব : জেনার ক্ষেত্রে কিয়াস বিরোধী চার বারের স্বীকারোক্তি শর্তারোপ মূলত নস দ্বারা প্রমাণিত। তাই যিনা ভিন্ন অন্য বিষয়ের হুকুম তার নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ হল সাক্ষ্য সুতরাং এক্ষেত্রে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য ধর্তব্য। কেননা, অন্যান্য হকের ন্যায় এক্ষেত্রে সাক্ষ্য দ্বারা বিষয়টির প্রকাশ সাব্যস্ত হয়ে যায়। তবে এক্ষেত্রে শাসকের কর্তব্য হল সাক্ষীদেরকে চুরির ধরণ, প্রকৃতি, সময় ও স্থান সম্পর্কে অধিকতর সতর্কতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা।

قوله : وَلَوْ جَمْعًا الخ : আর যদি চুরির কাজে কয়েকজন শরীক থাকে তাহলে কোন শর্ত ছাড়া সকলের হাত কাটা হবে এমন নয়, বরং এক্ষেত্রে এমন সকলের হাত কাটা হবে যারা নিসাব পরিমাণ তথা দশ দিরহাম পরিমাণ মাল প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং যদি তারা কেহই দশ দিরহাম পরিমাণ মাল নিজ হিসসায় না পেয়ে থাকে তাহলে কাহারও হাত কাটা হবে না। কেননা, নেসাব পরিমাণ মাল হচ্ছে হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারী। তাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নেছাবের পূর্ণতা বিবেচ্য হবে।

وَلَا يُقْطَعُ بِخَشَبٍ وَحَشِيشٍ وَقَصَبٍ وَسَمَكٍ وَطَيرٍ وَصَيدٍ وَزِرْنِيخٍ وَمغرةٍ وَنورةٍ وَفَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ أو على شَجَرٍ ولَبَنٍ وَلَحمٍ وَزرعٍ لم يُحصَدْ وَأَشْرِبَةٍ وَطُنبُورٍ وَمُصحَفٍ وَلَوْ مُحلِّي وَبَابِ مَسْجِدٍ وَصَلِيبِ ذَهَبٍ وَشَطْرَنْجٍ وَنَرْدٍ وَصَبِيٍّ حُرٍّ وَلَو معه حُلِيٌّ وَعَبدٍ كَبِيرٍ وَدَفَاتِرَ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَدَفَاتِرِ الْحِسَابِ وَكَلْبٍ وَفَهْدٍ وَدُفٍّ وَطَبْلٍ وَ لَهْوٍ وَبربطٍ وَمِزْمَارٍ وَبِخِيَانَةٍ وَنَهْبٍ وَاخْتِلَاسٍ وَنَبْشٍ وَمَالِ عَامَّةٍ أو مُشْتَرَكٍ وَمِثْلِ دَيْنِهِ وَبِشَيْءٍ قُطِعَ فيه ولم يَتَغَيَّرْ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْأَبَنُوسِ وَالصَّنْدَلِ وَالْفُصُوصِ الخضر وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرجَدِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْأَوَانِي وَالْأَبوَابُ الْمُتَّخَذَةُ من الْخَشَبِ -

অনুবাদ : আর লাকড়ী, ঘাস, বাঁশ, মাছ, (শিকারকৃত) পাখি, শিকারকৃত (অন্যপ্রাণী) করতাল, লাল মাটি, চুনা, আদ্রফল বা গাছের ফল, দুধ, গোশত, তরমুজ, অকর্তিত শস্যাদি, নেশাদার পানিয়, ঢাক (বাদ্যযন্ত্র) কুরআন শরীফ যদিও তা স্বর্ণ বা রুপ্যখচিত হয়, মসজিদের গেইট; স্বর্ণ খচিত ক্রুশ, দাবা, পাশা, আজাদ বাচ্চা যদিও তার সাথে অলঙ্কার থাকে, বড় গোলাম, রেজিষ্টার (চুরির দায়ে) হাত কাটা হবে না। তবে অল্প বয়স্ক গোলাম ও হিসাবের রেজিষ্টার ব্যতিক্রম (অর্থাৎ তা চুরি করার দায়ে তার হস্ত কর্তন করা হবে।) কুকুর, চিতা, ঢোল, বিনোদন তবলা, সারিন্দা, বিউগল (ইত্যাদি যাবতীয় সংগীত যন্ত্র) (আমানতের) খিয়ানতে, লুণ্ঠন, অপহরণ, কাপন, জনগণের বা শরীকানার মাল, (অর্থাৎ সে নিজেও মালিকানায় শরিক) ঋণ পরিমাণ মাল, এমন বস্তুতে যার দায়ে তার হাত একবার কর্তন করা হয়েছে যদি তা পরিবর্তীত না হয়, তাহলে এসমস্ত চুরির দায়ে হাত কাটা হবে না। আর শাল কাঠ, বর্শাদন্ড তৈরীর কাঠ, আবলুস কাঠ, চন্দন কাঠ, সবুজ পাথর, ইয়াকুত, পান্না, মুতি, বর্তনসমূহ, কাঠের তৈরী গেইটসমূহ চুরির দায়ে হাত কাটা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لَايُقْطَعُ بِخَشَبٍ الخ : ইসলামী সমরাজ্যে যা অতী নগণ্য বা মোবাহরূপে গন্য এমন মাল চুরির দায়ে হস্ত কর্তন করা হবে না। যেমন লাকড়ি, ঘাস, মাছ, পাখী, বিভিন্ন শিকার, করতাল, লাল মাটি, চুনা, অকর্তিত ফসল, আর্দ্র ফল ইত্যাদি চুরির দায়ে হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস :

كَانَتِ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الشَّيْءِ التَّافِهِ (اى الحقير)

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.)এর যুগে সাধারণ তুচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন করা হতো না।'

আর যে বস্তু মূলত বিনা মূল্যে বৈধ, যা আগ্রহের বস্তু নয়, তাই তুচ্ছ হিসাবে গণ্য। কেননা, তা গ্রহণে তেমন চাহিদা থাকে না এবং কাউকে দিতেও কার্পণ্য করা হয় না। আর তা মালিকের নিকট থেকে সাধারণত জোর

পূর্বক নেয়া হয় না। তাই এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে শাসনের তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাছাড়া আলোচ্য বস্তুসমূহের সংরক্ষণে ত্রুটি বিদ্যমান যেমন লাকড়ী ঘরের বাইরে ফেলে রাখা হয়। আর পাখি তো উড়ে যায়। তাছাড়া পাখির ক্ষেত্রে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত : مَا رَأَيْتُ اَحَدًا قُطِعَ فِى الطَّيْرِ 'আমি পাখি চুরির দায়ে কাউকে হাত কর্তন করতে দেখিনি।' তেমনি হযরত আবু দারদা (রাযি.) থেকেও বর্ণিত : لَيْسَ عَلٰى سَارِقِ الْحَمَامِ قَطْعٌ। 'কবুতর চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নেই।]

তাছাড়া এগুলোর মালিকানার মধ্যে জনগণ রয়েছে। তাই সন্দেহ উদ্রেক হয় আর সন্দেহের দরুন হদ্দ রহিত হয়ে যায়। তেমনি গাছে বিদ্যমান ফল বা ক্ষেতে কর্তিত ফসল চুরির দায়ে হাত কর্তন নেই। কেননা, তা সংরক্ষণে বিদ্যমান নেই। তাছাড়া হযরত রাফে বিন খাদিজ (রাযি.) বর্ণনা করেন :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ

'নবী করীম (সা.) থেকে তিনি বলেন, গাছের ফল বা খেজুরের থোড়া চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা যাবে না।' —তিরমিযী

অনুরূপভাবে দুধ, গোশত, আর্দ্র ফল চুরির দায়ে হস্ত কর্তন নেই। কেননা এগুলো শীঘ্র পচনশীল বস্তু। তাছাড়া এগুলো চুরিতে হস্ত কর্তন না করার ব্যাপারে হাদীস এসেছে।

قوله : وَ مَصْحَفٍ وَ لَوْ مُحَلًّى الخ : আর আমাদের মতে কুরআন শরীফের কপি চুরি করার দ্বারা হস্ত কর্তন নেই। যদি তা স্বর্ণ খচিত হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা, ইহা অর্থমূল্য সম্পদ সম্পন্ন। তাই তো তা বিক্রি করা জায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও অনুরূপ বলেন। তাছাড়া তার থেকে এভাবেও বর্ণিত আছে যে, খচিত নকশা যদি নেসাব পরিমাণ হয় তবে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, তা কুরআন শরীফ ভিন্ন। আমাদের দলিল হল : চোর তা চুরি করে পড়া ও দেখা উদ্দেশ্য হতে পারে। আর তখন যা অর্থমূল্য বস্তু নয়। আর এ লেখার জন্যই মূলত সংরক্ষণ করা হয়। আর তা বাধাই বা অলঙ্কার এর জন্য সংরক্ষণ করা হয় না। কেননা, তা তো হচ্ছে অনুবর্তী বিষয়। আর অনুবর্তী বিষয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য করা হয় না। যেমন কেহ পাত্র ভর্তি মদ চুরি করল। কিন্তু উক্ত পাত্রের মূল্য নেসাব পরিমাণ। তার পরও যেহেতু তা মদের অনুবর্তী বিষয় এজন্য হদ্দ আবশ্যক হবে না।

قوله : وَ بَابِ مَسْجِدٍ الخ : মসজিদের দরজা চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। কেননা এখানে সংরক্ষণ নেই। এমনকি বাড়ির দরজা যা দ্বারা ভেতরে আসবাবপত্র সংরক্ষণ করা হয় তাও চুরির কারণে হস্ত কর্তণ সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন।

قوله : وَ صَلِيْبِ ذَهَبٍ الخ : আর যদি কেহ স্বর্ণের ক্রুশ চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে যদি তা প্রার্থনাস্থলে থাকে তাহলে সংরক্ষণ না হওয়ার দরুন তা চুরির দায়ে হস্ত কর্তন করা যাবে না। কিন্তু যদি তা কারো সংরক্ষণে বা ঘরের মধ্যে থাকে তাহলে তা নৈসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়ার শর্তে চোরের হস্ত কর্তন করা হবে।

আমাদের দলিল হল : এক্ষেত্রে সে অন্যায় ও প্রতিমা পুজা থেকে বাধা দানের জন্য তা গোপণ করার সন্দেহ বিদ্যমান। তবে হা যদি দিরহামে মূর্তির অঙ্কন থাকে তবে তা চুরির দায়ে হাত কর্তনকে বাধা দেবে না। কেননা, তা তো উপসনার জন্য নয়, বরং তা অর্থ-সম্পদ।

قوله : وَ صَبِيٍّ حُرٍّ وَ لَوْ مَعَهُ حُلِيٌّ الخ : আর যদি কেহ স্বাধীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েকে চুরি করে তবে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। যদিও তাদের সাথে অলঙ্কার থাকে। কেননা, স্বাধীন মানুষ মাল নয়। আর এক্ষেত্রে অলঙ্কার মানুষের অনুবর্তী হিসাবে গণ্য হবে। তা ছাড়া তাকে তুলে নেয়ার ক্ষেত্রে কান্না থামানো বা স্তন্য

দানকারিণীর কাছে পৌঁছে দেয়ার সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে। আর সন্দেহ দ্বারা হদ্দ রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে উক্ত চোরের হস্ত কর্তন করা হবে, যদি অলঙ্কার নেসাব পরিমাণ হয়ে থাকে। কেননা তা তো আলাদাভাবে চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়। সুতরাং অন্য কোন কিছুর সাথে চুরি করার সময়ও হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَ عَبْدٍ كَبِيْرٍ وَ دَفَاتِرَ الخ : আর যদি বড় গোলাম বা রেজিষ্টারসমূহ চুরি করে তাহলেও হস্ত কর্তন হবে না। কেননা বড় গোলামের ক্ষেত্রে চুরি সাব্যস্ত হবে না। কেননা এটা হচ্ছে বলপূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে অপহরণ। কিন্তু যদি অল্পবয়স্ক গোলাম চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে। কেননা, এক্ষেত্রে চুরির সংজ্ঞা প্রজোয্য হয়। কিন্তু যদি এ অপ্রাপ্ত বয়স্ক গোলাম ও নিজের কথা প্রকাশ করতে পারে, তাহলে সে প্রাপ্ত বয়স্ক গোলামের ন্যায়। কেননা এক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত আর প্রাপ্ত বয়স্কের পার্থক্য শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারা আর না পারার দিক ধর্তব্য হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে গোলাম চুরিতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা, যদিও সে মাল কিন্তু তার মাঝে মানব সত্তা বিদ্যমান। যা মূলত মাল নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর দলিল হল, গোলাম মূলত মাল সে হয়ত বা এখনই উপকার দানের মাধ্যম হবে বা উপকার দানের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে হয় তাতে মানব সত্তায় যোগ রয়েছে কিন্তু সে মাল হওয়ার ক্ষেত্রে তা বাধা হিসাবে দাড়ায় না। অনুরূপভাবে যদি কেহ রেজিষ্টার খাতা, বই চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, এগুলো চুরির উদ্দেশ্য হচ্ছে তার ভেতরকার লেখা চুরি করা আর লেখা মাল নয়। আর যদি হিসাবের রেজিষ্টার চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা হিসাবের রেজিস্টারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালের হিফাজত করা। আর চোর মালী ফায়দা হাসিলের নিমিত্তেই চুরি করেছে। সুতরাং তা নিসাব পরিমাণ হলে তার হস্ত কর্তন করা হবে।

قوله : وَ كَلْبٍ وَ دَفٍّ الخ : যদি কেহ কুকুর বা চিতা বা এ জাতীয় কোন প্রাণী চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, এ জাতীয় প্রাণী মোবাহরূপে পাওয়া যায়। আর মানুষ এদের প্রতি আগ্রহীও নয়। তাই তা সাধারণ তুচ্ছ মাল পর্যায় হল। তাছাড়া কুকুর সম্পদ কি না এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে সুস্পষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান। তাই এসব চুরির দায়ে হস্ত কর্তন নেই। অনুরূপভাবে যদি কেহ ঢোল, তবলা, সারিন্দা বিউগল ইত্যাদি সংগীতের বাদ্যযন্ত্র চুরি করে তারও হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, সাহাবাইন (রহ.) এর মতে বাদ্যযন্ত্র আইনগত দিক থেকে মূল্যবান সম্পদ নয়। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যদিও তা আইনগত দিক থেকে মূল্যবান সম্পদ বলেও থাকেন কিন্তু এগুলো চুরির কারণে সন্দেহ বিদ্যমান। আর তা হলো এসব অহেতুক বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার জন্য গোপন করার সন্দেহ। তাই এসব সংগীতের বাদ্যযন্ত্র চুরির দায়ে হস্ত কর্তন করা যাবে না।

قوله : وَ بِخِيَانَةٍ الخ : অনুরূপভাবে আমানতের মাল আত্মসাৎকারীর হস্ত কর্তন করা যাবে না। কেননা, এতে সংরক্ষণ নেই। তেমনি ছিনতাইকারীও লুণ্ঠনকারীর হস্ত কর্তন করা যাবে না। কেননা, সে তো তা প্রকাশ্যে করেছে। তাছাড়া হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلٰى خَائِنٍ وَ لَا مُنْتَهِبٍ وَ لَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (ترمذى)

'নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী, লুটতরাজকারীর হাত কাটা যাবে না।' —তিরমিযী

তাছাড়া এসব পদ্ধতিতে কারো সংরক্ষিত সম্পদকে গোপনীয়ভাবে নিয়ে যাওয়ার অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু এসব অশুভ কার্যকলাপের ব্যাপারে অনেক শাস্তির কথা শরীয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এবং এসব কার্যকলাপকে ঈমান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে :

مَنْ اِنْتَهَبَ نَهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا

'যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

قوله : وَ نَبْشٍ الخ : আর যদি কেহ কাফন চুরি করে তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর মতে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তা নেসাবে সারাকা হলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। তাদের দলিল হল নবী করীম (সা.) এর হাদীস :

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ

'নবী করীম (সা.) বলেন, যে কাফন চুরি করবে আমরা তার হাত কেটে দেব।'

তাছাড়া যেহেতু তা সুরক্ষিত কবরের ভেতর তাই সংরক্ষিত মাল, যা চুরি করার কারণে হাত কাটা হবে।

আমাদের দলিল : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস : اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعٌ। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, কাফন চোরের কারণে হাত কাটা হবে না। দ্বিতীয় দলিল : হযরত মুওয়াবিয়া (রাযি.) এর আছার :

اَنَّهُ اُتِيَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَ حِيْنَئِذٍ كَانَ مَرْوَانَ وَالِيًا بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَ الْفُقَهَاءِ فَاَجْمَعَ رَائِهِمْ عَلَى اَنْ يَضْرِبَ وَ يُطَافَ بِهِ -

'হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) এর শাসনামলে একজন কাফন চোরকে আনা হল এমতাবস্থায় যে, মারওয়ান মদীনার গভর্ণর ছিলেন। তখন তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ফুকাহায়ে কেরামদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সুতরাং তাদের সকলের ঐক্যমত একথার উপর হল যে, তাকে বেত্রাঘাত করা ও শহরে প্রদক্ষিণ করানোর উপর।' তাছাড়া এক্ষেত্রে মালিকানার বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান হল। কেননা, মৃত ব্যক্তি কোন বস্তুর মালিক হতে পারে না। তেমনি উক্ত কাফনের মালিক ওয়ারিছও নয়। আর এমন ঘঠনারও অস্তিত্ব বিরল। তাই কাফন চোরের হাত কর্তন করা হবে না। অনুরূপ যদি কবর কোথাও তালাবদ্ধ হয় তবুও আমাদের মতে উক্ত কাফন চোরের হাত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে তাদের মতে হস্ত কর্তন করা হবে।

قوله : وَ مِثْلِ دَيْنِهِ الخ : যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে কিছু দিরহাম পাওনা আছে বলে আর সে তার কাছ থেকে ঋণ সমপরিমাণ দিরহাম চুরি করে নেয় তাহলে তার হাত কাটা হবে না। আর এ ক্ষেত্রে নগদ পাওনা আর মিয়াদী পাওনা সমান। কেননা, সে তো তার পাওনা উসূল করেছে। তেমনি যদি সে তার পাওনার চেয়ে বেশি নিয়ে নেয় তাহলেও তার হাত টাকা হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে নিজের পাওনার কারণে অতিরিক্ত পরিমাণ তার শরিকানা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। আর যদি সে তার কাছ থেকে দিরহামের পরিবর্তে অন্য কোন দ্রব্য চুরি করে তাহ্‌লে তার হাত কাটা হবে। কেননা, পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রয় ছাড়া তা গ্রহণ করার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন তার হাত কাটা হবে না। কেননা, সে তার হক উসুল করার জন্য বা বন্ধক রাখার জন্য অন্য দ্রব্য গ্রহণ করা জায়েয আছে। আমরা বলি এরূপ দলিলের কোন ভিত্তি নেই। কেননা, এটা কোন সুস্পষ্ট দলিলের উপর নির্ভর নয়। অবশ্যই যদি সে তা দাবী করে তবে হদ্দ রহিত হবে। কেননা, সে মত পার্থক্য পূর্ণ ক্ষেত্রে নিজস্ব ধারণা পোষণ করেছে। আর যদি তার পাওনা হয় দিরহাম, কিন্তু চুরি করেছে দিনার, তবে কোন কোন মতে তারও হাত কাটা হবে। কেননা, তা নেয়ার অধিকার তার নেই। আবার কোন কোন মতে তার হাত কাটা হবে না। কেননা, সকল মুদ্রার হুকুম একই বা একই শ্রেণীভুক্ত।

قوله : وَ بِشَيْءٍ قُطِعَ فِيْهِ الخ : যদি কাউকে কোন বস্তু চুরির দায়ে হস্ত কর্তন করা হয়। অতঃপর সে

চুরাইকৃত মাল ফেরত দিয়ে দেয় অতঃপর দ্বিতীয়বার তা চুরি করে কিন্তু উক্ত বস্তুর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করা হয়নি তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে তার উপর দ্বিতীয় বারও হদ্দে সারাকা কায়েম করা হবে। আর কিয়াসেরও তাই দাবী। তাছাড়া নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন : فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ যদি সে পুণরায় চুরি করে তাহলে পুণরায় তার হস্ত কর্তন কর। উক্ত হাদীসে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া দ্বিতীয় বার চুরির কারণে তার হাত কাটা হবে। কেননা প্রথমবার চুরি করার কারণে তার হাত কাটা হল এবং তাকে সতর্ক করা হল। তারপরও সে যে চুরি করল তাতো আরো মন্দ।

আমাদের দলিল : চুরিকৃত মালের সংরক্ষণ রহিত হয়ে গেছে। (যার বিবরণ পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ) এখন যখন চুরিকৃত মাল দ্বিতীয়বারের মতো মালিকের আয়ত্বে এসেছে তখন যদিও মালের সংরক্ষণ ফিরে আসে, কিন্তু সংরক্ষণ রহিত হয়ে যাওয়ার সন্দেহ রয়ে গেছে। যা হাতের কর্তনকে রহিত করে দিতে পারে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দলিল : নবী করীম (সা.) এর হাদীসটি দ্বিতীয় বার চুরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে চুরি কাজটি সঠিকভাবে দ্বিতীয় বার হওয়া। পুর্বের চুরিকৃত মাল আবার চুরি করা উদ্দেশ্য নয়।

আর যদি প্রথম বারের চুরিকৃত বস্তু ফেরত প্রদানের পর তা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন প্রথমবার সুতা চুরি করেছিল, কিন্তু এখন মালিক তা দ্বারা বস্ত্র বুনন করে ফেলছে। আর সেই প্রথম চোর তা চুরি করল তবে তার হাত কর্তন করা হবে। কেননা, বস্তুটির সত্তারূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

قوله : وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الخ : আর যদি কেহ শাল কাঠ, বর্শাদন্ড তৈরীর কাঠ, আবলুস কাঠ, চন্দন কাঠ চুরি করে তাহলে সে ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, এগুলো মূল্যবান হওয়ার দরুন তা সংরক্ষিত হয়ে থাকে। আর তা সচরাচরভাবে মোবাহরূপে পাওয়া যায় না। তেমনি যদি কেহ সবুজ পাথর ইয়াকুত পাথর ও পান্না চুরি করে তাহলেও তার হাত কাটা হবে। (তবে যা বর্ণিত সবকটিই নিসাব পরিমাণ হওয়া ও অন্যান্য শর্তসমূহ বিদ্যমান আবশ্যক)। কেননা, তাও অতী মূল্যবান ও এগুলোর প্রতি আগ্রহ থাকে এবং তা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো স্বর্ণরূপ্য সমতুল্য।

আর যদি কাঠ দ্বারা নির্মিত দরজা বা গেইট কেহ চুরি করে তবেও তার হাত কাটা হবে। কেননা, তাকে নকশা অঙ্কনে বা তাতে কারিগরি করাতে তাও মূল্যবান সম্পদ হয়ে গেল।

فَصْلٌ فِى الْحِرْزِ

অনুচ্ছেদ : সুরক্ষিত স্থান প্রসঙ্গে

وَمَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَا بِرَضَاعٍ وَمِنْ زَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا وَسَيِّدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِ سَيِّدَتِهِ وَمَكَاتِبِهِ وَخَتْنِهِ وَصِهْرِهِ وَمِنْ مَغْنَمٍ وَحَمَّامٍ وَبَيْتٍ أُذِنَ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَرَبُّهُ عِنْدَهُ قُطِعَ وَلَوْ سَرَقَ ضَيْفٌ مِمَّنْ أَضَافَهُ أَوْ سَرَقَ شَيْئًا وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدَّارِ لَا وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حُجْرَةٍ إِلَى الدَّارِ وَأَغَارَ مِنْ أَهْلِ الْحُجْرَةِ عَلَى حُجْرَةٍ أُخْرَى أَوْ نَقَبَ فَدَخَلَ وَأَلْقَى شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ أَخَذَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ قُطِعَ وَإِنْ نَاوَلَهُ آخَرَ مِنْ خَارِجٍ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي بَيْتٍ فَأَخَذَ أَوْ طَرَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنْ كُمٍّ أَوْ سَرَقَ مِنْ قِطَارٍ بَعِيرًا أَوْ حِمْلًا لَا وَإِنْ شَقَّ الْحِمْلَ فَسَرَقَ مِنْهُ أَوْ سَرَقَ جُوَالِقًا فِيهِ مَتَاعٌ وَرَبُّهُ يَحْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقٍ أَوْ جَيْبِ غَيْرِهِ أَوْ كُمِّهِ فَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ -

অনুবাদ : যে দুগ্ধ সম্পর্ক ভিন্ন মাহরাম আত্মীয় থেকে (কিছু চুরি করে) কিংবা তার স্ত্রী থেকে বা তার স্বামী থেকে কিংবা মনিব থেকে অথবা মনিবের স্ত্রী থেকে কিংবা মালিকার স্বামী থেকে অথবা (মনিব) তার মুকাতাব থেকে, কিংবা তার জামাতা থেকে অথবা শ্বশুর থেকে কিংবা গনিমতের মাল থেকে অথবা হাম্মামখানা থেকে কিংবা এমন ঘর থেকে যেখানে তার প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, সেখান থেকে কিছু চুরি করে তাহলে (এসকল সুরতে) হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে এমন মাল চুরি করে যার কাছে তার মালিক আছে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর যদি মেহমান মেযবানের কোন মাল চুরি করে কিংবা (অন্য কেহ) কোন বস্তু চুরি করল কিন্তু তা ঘর থেকে বের করে নাই তাহলে (তাদের) হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি তা বের করে বাড়ীর আঙ্গিনায় নিয়ে আসে কিংবা বাড়ির প্রকোষ্ঠগুলোর কোন একজন বাসিন্দা অন্য প্রকোষ্ঠে হানা দেয় (এবং মাল চুরি করে) কিংবা কেহ সিঁধ কেটে ভেতরে প্রবেশ করে কোন বস্তু রাস্তায় নিক্ষেপ করে দেয় অতঃপর তা নিয়ে নেয় কিংবা গাধার উপর মাল বুঝাই করে তা হাকিয়ে বাড়ী থেকে বের করে তাহলে (সব সুরতে) হাত কর্তন করা হবে। আর যদি (চোর ঘরে প্রবেশ পূর্বক মালামাল হস্তগত করতঃ তা) বাহিরে অপেক্ষমান অন্য একজনকে ধরিয়ে দেয় কিংবা কেহ ঘরের ভেতরে হাত প্রবেশ করালো এবং মাল নিয়ে নিল অথবা আস্তিনের বাইরের থলে কেটে নেয়, অথবা সারিবদ্ধ উট থেকে একটি উট নিয়ে নেয় অথবা (তাদের উটের উপর থেকে) একটি গাঠরী চুরি করে তাহলে হাত কাটা হবে না। আর যদি গাঠরী কেটে তা থেকে কিছু নিয়ে নেয় কিংবা

সামান ভরা বস্তা চুরি করে এমন অবস্থায় মালিক তা হেফাজত করেছে বা তার উপর ঘুমিয়ে আছে অথবা কোন বাক্সে বা অন্যের পকেটে কিংবা অন্যের আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং মাল নিয়ে নেয় তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : فَصْلٌ فِي الْحِرْزِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত কোন ধরণের মাল চুরাই দ্বারা হাত কর্তন ওয়াজিব আর কোন ধরনের মাল চোরাই দ্বারা হাত কর্তন করা আবশ্যক নয় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখান থেকে মালের সংরক্ষণ এর ব্যাপারে আলোকপাত করতেছেন। কেননা, হাত কর্তন আবশ্যক হওয়ার জন্য মালের সংরক্ষণ শর্ত। আর যেহেতু মাল সংরক্ষণ তা চোর থেকে বহিরাগত বিষয়, তাই তার আলোচনা পরবর্তীতে এনেছেন।

قوله : وَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِى الخ : যদি কোন ব্যক্তি তার মাহরাম আত্মীয় থেকে কোন কিছু চুরি করে তবে তার হাত কর্তন করা হবে না। কেননা, জন্ম সূত্রের সম্পর্কের কারণে তাদের পরস্পরের মধ্যে শিথিলতা রয়েছে। তদ্রূপ সুরক্ষিত স্থানে প্রবেশেরও অনুমতি রয়েছে। তাছাড়া শরীয়াত ও মুহরাম আত্মীয়দের প্রকাশ্য সৌন্দর্যের স্থানসমূহে দৃষ্টিপাত করাও বৈধ রয়েছে। তাই তা মালের পূর্ণ হেফাজতের মধ্যে বাধা, এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ মুতাওয়ালাতে বলেন, তার হাত কিভাবে কাটা হবে যখন সে তার ভাই, ফুফু বোন কিংবা খালার মাল চুরি করেছে। অথচ সে যদি দরিদ্র বা মাজুর অথবা ছোট হয় তাহলে তো বিনা অনুমতিতে তার মাল নেয়ার অধিকার রয়েছে। কিংবা যদি সে দরিদ্র হয় তাহলে ধনী আত্মীয় তাদের জিম্মাদার হয়ে থাকে। তাই যেন দরিদ্র আত্মীয়ের হক রয়েছে ধনী আত্মীয়ের সম্পদে। সুতরাং মালের মধ্যে যার হক রয়েছে সে ঐ মাল চুরি করার কারণে কিভাবে তার হাত কাটা হবে।

সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, নিকটাত্মীয় থেকে কোন কিছু চুরি করে তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে না।

আর যদি দুধ সম্পর্কিয় আত্মীয় থেকে চুরি করে তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে। কেননা, দুধ পানের বন্ধন সাধারণত অজ্ঞাত থাকে। তাই দুধ সম্পর্কের আত্মীয়ের ঘরে পরস্পর সাধারণত যাওয়া আসা হয় না। দুধ মার ঘরে প্রবেশের অনুমোদন হাত কাটায় বাধা হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, দুধ বোনের ঘরেও প্রবেশের বৈধতা রয়েছে। অথচ তার মাল চুরি করার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে তার হাত কাটা হবে। তাছাড়া এখানে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা নেই। আর ইহা ছাড়া মাহরাম সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করা তেমন হয় না যেমন যিনার মাধ্যমে সম্পর্ক।

قوله : وَ مِنْ زَوْجَتِهِ الخ : স্বামী স্ত্রী যদি পরস্পর মাল চুরি করে কিংবা গোলাম তার মনিবের মাল চুরি করে অথবা গোলাম তার মনিবের স্ত্রীর মাল চুরি করে কিংবা গোলাম তার মালিকের স্বামীর মাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, এসকল ক্ষেত্রে সাধারণত আসা যাওয়ার অনুমতি বিদ্যমান থাকে। আর স্বামী স্ত্রী যদি একে অন্যের বিশেষ সুরক্ষিত স্থান থেকেও চুরি করে যেখানে তারা এক সাথে বসবাস করে না তদুপরি আমাদের মতে তাদের হাত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে হাত কর্তন করা হবে। হাত কর্তন না করার কারণ হচ্ছে অভ্যাসগত ও বিবাহ সম্পর্কের প্রমানাদির ভিত্তিতে একে অপরের সাথে খোলা-মেলাভাবে চলাফেরার অবকাশ রয়েছে। তাই যতই সুরক্ষিত হোক তা অন্যের ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা সুরক্ষিত বলে ধর্তব্য হবে না। অনুরূপ যদি মনিব তার মুকাতাব গোলামের মাল চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে না। কেননা, মনিবের হক রয়েছে মুকাতাব গোলামের উপার্জনে। অনুরূপভাবে যদি কেহ গনিমতের মাল থেকে চুরি করে তবে তার হাত কর্তন করা হবে না। কেননা, উক্ত মালে তার হিস্সা রয়েছে

অনুরূপভাবে যদি হাম্মামখানা থেকে মাল চুরি করে তবে তার হাত কাটা হবে না। কেননা, এতে প্রত্যেকের প্রবেশের অনুমতিতে ব্যাপকতা রয়েছে। তাই তা সংরক্ষণের ত্রুটি রয়েছে। তেমনি যদি কেহ এমন ঘর থেকে মাল চুরি করে যেখানে তার বা জনসাধারণের প্রবেশের অনুমতি রয়েছে তাহলে তার হাত কাটা হবে না। আর ব্যবসায়ের দোকান, সরাইখানা ও অনুমতি প্রাপ্ত ঘরের ন্যায় কিন্তু যদি তা থেকে রাত্রে চুরি করা হয় তবে হাত কাটা হবে। কেননা, অনুমতি তো শুধু দিনের বেলার জন্য।

قوله : وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ الخ : যদি কেহ মসজিদ থেকে এমন মাল চুরি করে থাকে যার কাছে মালিক রয়েছে তাহলে তার হাত কাটা হবে। এখানে যদিও মসজিদে আসবাবপত্র সংরক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হয়নি। তদুপরি মালিকের উপস্থিতির দরুন তা হেফাজত হয়ে গেছে। আর তা হাম্মামখানা বা সরাইখানা ভিন্ন। কেননা, তা তো মাল সংরক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

قوله : وَ إِنْ سَرَقَ ضَيْفٌ الخ : মেহমান যদি মেযবানের কোন মাল চুরি করে তবে তার হাত কর্তন করা হবে না। কেননা, তাকে তো গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই গৃহাভ্যন্তরীন মাল সংরক্ষিত নয়। তাছাড়া যেহেতু সে সাময়িকভাবে ঘরের অন্য সদস্যের ন্যায় এক সদস্য হয়ে গেল তাই তার চুরি করা তা চুরি হবে না, বরং খিয়ানত হবে। অনুরূপভাবে যদি কেহ অন্য কারও কোন জান-মাল চুরি করে কিন্তু মালিকের বাড়ী থেকে বের হয়নি, বা বের করেনি। তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, পুরু বাড়ী হচ্ছে সংরক্ষিত স্থান তাই চুরি সাব্যস্ত হতে হলে তা সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করতে হবে। অথবা ইহাও বলা যেতে পারে যে, পুরো বাড়ী হচ্ছে মালিকের তাই তাতে বিদ্যমান অবস্থায় মালিকের মালিকানা থেকে বের করা প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা হস্ত কর্তন করা যাবে না।

قوله : وَ إِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حُجْرَةٍ الخ : আর যদি একটি বাড়ীতে বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকে আর চোর এক কামরা থেকে মাল নিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় চলে যায় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ তার অধিবাসীদের দিক হিসাবে সংরক্ষিত স্থান। তেমনি যদি এক বাড়ীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের কোন এক প্রকোষ্ঠের কোন এক বাসিন্দা অন্যকোন প্রকোষ্ঠে হানা দিয়ে তার মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে। অনুরূপ যদি কোন চোর অন্য কারো ঘরে সিঁদ কেটে ঢুকে পড়ে এবং মালামাল রাস্তায় নিক্ষেপ করে দেয় অতঃপর সে তা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন এমন চোরের হাত কাটা হবে না। কেননা, এর থেকে বাহিরে নিক্ষেপ তা হস্তকর্তনকে সাব্যস্ত করে না। আর তা এমনও হতে পারে যে, সে তা আর নিল না। যদি না নেয় তবে তো সর্বসম্মতিক্রমে তার হাত কর্তন করা হবে না। সুতরাং তা এমন হল যে কেহ রাস্তা থেকে মাল চুরি করল। তাই এ সুরতে যেভাবে হস্ত কর্তনকে অপরিহার্য করে না তেমনি বর্ণিত সুরতেও হস্ত কর্তন সঙ্গত হবে না।

আমাদের দলিল হল : চোরদের কৌশল থেকে একটি কৌশল হল মাল দুরে নিক্ষেপ করা। কেননা, তাতে সহজে বের হয়ে যাওয়া বা মালিকের সাথে মুকাবেলা করতে সহজ হওয়া বা পলায়নে সহজতা হওয়া। সুতরাং দুরে নিক্ষেপের পর তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ বিষয়কে আমরা অভিন্নরূপে সাব্যস্ত করি। আর যদি সে তা পরে কুড়িয়ে নেয় না তাহলে সে চোর হল না। বরং মাল নষ্টকারী হল। তাই তার হাত কাটা হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন চোর গাধায় মালামাল বুঝাই করে অতঃপর তা হাকিয়ে বাড়ী থেকে বের করে তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে। এ ক্ষেত্রে গাধা যেহেতু সে চালিয়েছে, তাই গাধার চলাকে তার দিকে সম্বন্ধ করা হবে।

قوله : وَ إِنْ نَاوَلَ آخَرَ الخ : যদি চোর ঘরের ভেতর থেকে বাহিরে অপেক্ষমান অন্য এক জনের হাতে মালামাল ধরিয়ে দেয় তবে সিঁদ কাটা চোরের হস্ত কর্তন করা হবে না। এবং বাহিরের জনেরও হাত কর্তন করা যাবে না।

কেননা, প্রথম জনের হাতে মালামাল বের করা পাওয়া যায়নি। কারণ, তার ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই অন্যজন মালের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। আর বাহিরের জনেরও হাত কাটা যাবে না। কেননা, সে তো সংরক্ষিত মাল চুরি করেনি। তাই কারোরই হাত কর্তন করা যাবে না। তদ্রূপ কেহ যদি সিঁদ কেটে হাত ঢুকিয়ে কোন মাল বের করে নিয়ে যায় তাহলেও তার হাত কাটা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তার হাত কাটা হবে।

কেননা, সে তো সংরক্ষিত মাল বের করেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রবেশের শর্তারোপ করা হবে না।

আমাদের দলিল : অবিদ্যমানতার সন্দেহ পরিহার করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ পূর্ণতার শর্তারোপ করা হয়। আর প্রবেশের দ্বারাই পূর্ণতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তা ছাড়া প্রবেশই হচ্ছে চুরি করার সাধারণ অবস্থা। কিন্তু এখানে এ অবস্থা অবিদ্যমান।

قوله : وَ طَرَّ صُرَّةً الخ : পূর্বোক্ত মাসআলার ন্যায় যদি কেহ কোন ব্যক্তির আস্তিনের বা কোমরের বাহিরে ঝুলে থাকা থলে কেটে নেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে থলের মুখ বাধার রশি বাহিরের দিকে থাকে। সুতরাং তা নেওয়া দ্বারা বাহিরের বস্তু নেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা অসংরক্ষিত।

সুতরাং তার হস্ত কর্তন করা হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, উক্ত চোরের হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, থলে হয় তো আস্তিন দ্বারা কিংবা আস্তিনের মালিক দ্বারা সংরক্ষিত ছিল।

قوله : وَإِنْ شَقَّ الْحَمْلَ الخ : আর যদি গাঠরী কর্তন করে এর থেকে কিছু নিয়ে নেয় তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে। কেননা, বস্তুটাই এ ক্ষেত্রে সংরক্ষণকারীরূপে গণ্য। আর যদি সামান ভরা বস্তু চুরি করে এভাবে যে সামানের মালিক তা হেফাজত করেছে। কিংবা তার উপর ঘুমিয়ে ছিল। তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে। অর্থাৎ, বস্তা যদি রাস্তায় বা অন্য কোথাও সংরক্ষিত কোন স্থানে থাকে আর তা মালিকের হেফাযতে থাকে অর্থাৎ, মালিক তার পাহারা দিচ্ছে বা তার উপর ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তা সংরক্ষণ হিসাবে গণ হবে। আর রীতি ও অভ্যাস অনুযায়ী এ ধরনের পদ্ধতিকেই সংরক্ষণ বলা হয়। সুতরাং বস্তার কাছে বসে থাকে বা তার উপর ঘুমিয়ে থাকে বা তার সন্নিকটেই ঘুমিয়ে থাকে তাহলে তা সংরক্ষণকৃত হিসাবে ধর্তব্য হবে। আর অনুরূপ যদি কেহ বাক্সে হাত ঢুকিয়ে কিছু নিয়ে যায় তাহলেও তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, বক্স তা সম্পূর্ণ সংরক্ষণ। সুতরাং তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে নেয়া দ্বারা চুরির কার্য সম্পন্ন হয়। অনুরূপভাবে কেহ যদি অন্যের পকেটে বা আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে কিছু চুরি করে নিয়ে যায় তাহলেও তার হাত কর্তন করা হবে। কেননা, সে তো পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থা থেকে মাল নিয়েছে। তাই তার পরিণতি তথা হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে।

فَصلٌ : فِى كَيفِيَّةِ القَطعِ وَاثبَاتِه

অনুচ্ছেদ : হস্ত কর্তন ও তা সাব্যস্তের পদ্ধতি সম্পর্কে

وَتُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَتُحسَمُ وَرِجلُهُ الْيُسرَى إِنْ عَادَ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا حُبِسَ حَتّٰى يَتُوبَ ولم يُقطَعْ كَمَنْ سَرَقَ وَإِبهَامُهُ الْيُسرَى مَقْطُوعَةٌ أو شَلَّاءُ أو أُصْبُعَانِ منها سِوَاهَا أو رِجلُهُ الْيُمنَى مَقطُوعَةٌ ولَا يَضْمِنُ بِقَطعِ الْيُسرَى من أُمِرَ بِخِلَافِهِ وَطَلَبُ الْمَسرُوقِ منه شَرْطُ الْقَطعِ وَلَوْ مُودِعًا أو غَاصِبًا أو صَاحِبَ الرِّبَا وَيُقْطَعُ بِطَلَبِ الْمَالِكِ لو سَرَقَ منهم لَا بِطَلَبِ الْمَالِكِ أو السَّارِقِ لو سَرَقَ من سَارِقٍ بَعْدَ الْقَطعِ -

অনুচ্ছেদ : চোরের ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কাটা হবে। অতঃপর (রক্ত বন্দ হওয়ার জন্য) দাগিয়ে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় বার চুরি করলে বাম পা কর্তন করা হবে। অতঃপর যদি তৃতীয়বার চুরি করে তাহলে তাওবা করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। কিন্তু কর্তন করা হবে না। যেমন, কেহ চুরি করল আর তার বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলী কর্তিত হয় অথবা অবশ হয় কিংবা (বাম হাতের) বৃদ্ধাংগুলি ভিন্ন অন্য দু'টি আংগুলী (কর্তিত বা অবশ হয়) অথবা ডান পা কর্তিত হয়। (তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না) আর যে কর্তন করল (চোরের) বাম হাত অথচ সে এর ব্যতিক্রম (তথা ডান হাত কর্তনের) আদিষ্ট হল। তাহলে তার উপর ক্ষতি পুরণ আবশ্যক হবে না। আর হাত কর্তনের ক্ষেত্রে শর্ত হল যার থেকে মাল চুরি করেছে তার দাবি উত্থাপন। যদিও সে আমানতের মাল সংরক্ষণকারী, অন্যের মাল হরণকারী কিংবা সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি হয়ে থাকে। আর যদি তাদের থেকে (আমানতের সংরক্ষণকারী, ছিনতাইকারী বা সুদ গ্রহণকারী থেকে) মাল চুরি করা হয় তবে প্রকৃত মালিকের দাবি উত্থাপন দ্বারা (চোরের হস্ত) কর্তন করা হবে। কিন্তু যদি চোরের হস্ত কর্তনের পর তার থেকে ঐ মাল চুরি হয়ে যায় তবে (প্রথম) চোর বা মালিক দ্বিতীয় চোরের উপর দাবী উত্থাপন করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَتُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ الخ : যখন প্রমাণিত হবে যে, সে চোর তখন তার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত কর্তন করা হবে এবং সাথে সাথেই রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য তাকে দাগিয়ে দেওয়া হবে। হাত কর্তনের দলিল তো আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করেছি তা হল— আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما পুরুষ চোর নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও।

আর ডান হাত কর্তনের ব্যাপারে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর বর্ণিত প্রসিদ্ধ কিরাত দ্বারা প্রমাণ পেশ করি তা হল : فَاقْطَعُوا اَيْمَانَهُمْ (তোমরা তাদের ডান হাত কেটে দাও) আর উক্ত বর্ণনা মশহুর তাই তা দ্বারা কিতাবুল্লাহর مطلق আয়াতকে مقيد করা জায়েয আছে। তাছাড়া দারু কুতনী কিতাবের মধ্যে

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাযি.) এর হাদীস বর্ণিত :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَمِيْنَ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ

'নবী করীম (সা.) চোরের ডান হাত কব্জি থেকে কেটেছেন।'

আর দাগিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিস যাতে নবী করীম (সা.) বলেন, فاقطعوا و احسموه 'তার হাত কর্তন কর এবং দাগিয়ে দাও।' তাছাড়া যদি দাগিয়ে না দেয়া হয় তবে প্রাণনাশ পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ চোরের হদ্দ দ্বারা প্রাণ নাশের অবকাশ নেই। চোরের হাত কাটার পর যদি পরবর্তীতে সে আবার চুরি করে এবং প্রমাণিত হয় তাহলে তার বাম পা কর্তন করা হবে। অতঃপর যদি সে আবার চুরি করে তাহলে তার কোন অঙ্গ কর্তন করা হবে না। তবে তাকে জেলখানায় বন্দি রাখা হবে তাওবা করা পর্যন্ত। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, তাকে সাধারণ শাস্তিও প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তৃতীয় বার চুরি করলে তার বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরি করলে তার ডান পা কর্তন করা হবে। তিনি দলিল পেশ করেন নবী করীম (সা.) এর হাদীস :

مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْاهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْاهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْاهُ

'যে চুরি করে তার হাত কর্তন কর। যদি পুণরায় চুরি করে তবে কর্তন কর। যদি পুণরায় চুরি করে তবে কর্তন কর।' তাছাড়া এমন চোরের তৃতীয় বা চতুর্থ বারের চুরির প্রথম বারের তুলনায় জঘন্য। কেননা, তাকে চুড়ান্ত সতর্ক করার পরও যেহেতু সে চুরি করল তাই তার উপর হদ্দে সারাকা কার্যকর হবে।

আমাদের দলিল : হযরত আলী (রাযি.) এর বাণী :

اِنِّىْ لَاَ تَسْتَحْيِ مِنَ اللّٰهِ اَنْ لَا اَدَعَ لَهٗ يَدًا يَاكُلُ بِهَا وَ يَسْتَنْجِىْ بِهَا وَ رِجْلًا يَمْشِىْ بِهَا

'এ বিষয়ে আমি আল্লাহকে লজ্জা করি যে, তার জন্য একটি হাতও রেখে দেবো না যা দ্বারা সে আহার করবে এবং ইস্তিঞ্জা করবে। তদ্রূপ একটি পাও রেখে দেবো না যা দ্বারা সে হাটাচলা করবে।' হযরত আলী (রাযি.) উক্ত যুক্তি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারা তার এ যুক্তি গ্রহণ করার কারণে ইজমা সংগঠিত হয়ে গেল। তাছাড়া একজন মানুষকে এরূপ করা তাকে ধ্বংস করার সমান। অথচ হদ্দ আবশ্যক হয়েছে শাসনের জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়। তাছাড়া এরূপ ঘটনা বিরল, আর শরীয়তের শাসন ব্যবস্থা সচরাচর ঘটে, এমন কাজের উপর। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বর্ণিত হাদীসের প্রমাণ্য সম্পর্কে ইমাম তাহাবী (রহ.) অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা ইহা উশৃঙ্খলতার অবসানের জন্য শাসকের শাসনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং তা রাজনৈতিক দর্শনের উপর প্রয়োগ হবে।

قوله : كَمَنْ سَرَقَ وَ اِبْهَامُهُ الْيُسْرٰى الخ : আর যদি কেহ চুরি করে আর তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্তিত হয় অথবা অবশ হয় তাহলে তার ডান হাত কাটা হবে না। কেননা এতে ধরা বা চলার ক্ষেত্রে সমগ্র উপযোগিতা বিনষ্ট করা হয়। তেমনি যদি কারো ডান পা অবশ বা কর্তিত হয় তবে তার দ্বিতীয়বার চুরির দ্বারা বাম পা কর্তন করা যাবে না। কেননা, এক্ষেত্রে তার চলার শক্তি সম্পূর্ণরূপে হরণ হয়ে যাবে। আর এটা তো উদ্দেশ্য নয়। আর যদি কারো বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিন্ন একটি আঙ্গুলী কর্তিত বা অবশ হয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, এক আংগুল কর্তিত হলে ধারণ শক্তির ক্ষেত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে না। তবে যদি দু'টি আঙ্গুলী কর্তিত হয় তবে ডান হাত কর্তন করা যাবে না।

قوله : وَلَا يَضْمَنُ الخ : যদি শাসক কাউকে চোরের ডান হাত কর্তনের হুকুম করেন অতঃপর সে ভুলক্রমে

বা ইচ্ছাকৃতভাবে চোরের বাম হাত কর্তন করল, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে কর্তনকারীর উপর কোনরূপ ক্ষতিপুরণ আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যদি সে ইচ্ছাপূর্বক বাম হাত কর্তন করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশক হবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে উভয় সুরতে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। আর তাই কিয়াসের দাবী।

আর এখানে ভুলের অর্থ ইজতিহাদী ভুল অর্থাৎ, কুরআনের আয়াত فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا এখানে ডান বা বাম এর শর্ত মুক্ত। সুতরাং যে কোন এক হাত কর্তন করার অবকাশ রয়েছে মনে করে বাম হাত কর্তন করে ফেলল ইমাম যুফার (রহ.)এর দলিল : সে এক্ষেত্রে অপরাধহীন হাত কর্তন করেছে যা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত। আর বান্দার হক যা অমার্জনীয়, সুতরাং তাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : সে অন্যায়ভাবে একটি হাত কর্তন করেছে যার সাথে অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই আর এ কাজে যেহেতু সে ভুল করে নাই তাই বিকল্প ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কোন সুযোগ নেই। তাই সে অবশ্যই এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের উপর জুলুম করেছে, কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তাই কিছাছ আবশ্যক হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : সে তো একটি অঙ্গ নষ্ট করেছে। কিন্তু সে অঙ্গের সমগোত্রীয় বা তার চেয়ে উত্তম একটি অঙ্গ রেখেছে। তাই ইহা নষ্ট করার অর্থ হল না। যেমন কেহ অন্য একজনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল যে সে তার কোন মাল সমমূল্যে বিক্রয় করেছে। অতঃপর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করল। সুতরাং আমাদের আলোচনা থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, যে হদ্দ কায়েমের হুকুম প্রাপ্ত হল সে ভিন্ন অন্য জনও যদি তা করে তবুও তার উপর কোনরূপ ক্ষতিপুরণ আবশ্যক হবে না। আর যদি চোর তার বাম হাত বের করে বলে যে এটা আমার ডান হাত আর বাম হাত কর্তন করা হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে কর্তনকারীর উপর কোনরূপ ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না।

قوله : وَ طَلَبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ الخ : যার মাল চোরাই হয়েছে তার উপস্থিতি ও তার পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া হস্ত কর্তন কার্যকর হবে না। কেননা, চোরাই অপরাধ প্রকাশিত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন শর্ত। আর আমাদের মতে সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির মাঝে মালের মালিকের উপস্থিতি ও দাবী উত্থাপন শর্ত। কেননা, অন্যের মালের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত ঐ মালের মালিকের দাবী উত্থাপন ভিন্ন সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে স্বীকারোক্তির দ্বারা চুরি প্রমাণিত হলে মালের মালিকের উপস্থিতি বা দাবী উত্থাপন শর্ত নয়। আর আমাদের মতে কর্তনের সময় মালের মালিক উপস্থিত থাকা শর্ত। কেননা, হদুদের ক্ষেত্রে কার্যকারী করা তাও বিচারের অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের মতে মাল যার কাছে গচ্ছিত সেও দাবী উত্থাপন করতে পারবে। তদ্রূপ যে অন্যের মাল ছিনতাই করে নিয়ে গেছে সেও দাবী উত্থাপন করতে পারে। তদ্রূপ সুদ গ্রহণকারীও দাবী উত্থাপন করতে পারে। যখন তাদের থেকে উক্ত মাল চুরি হয়, আবার উক্ত মালের মূল মালিকও দাবী উত্থাপন করতে পারে, ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে হরণকারী ও আমানতের মাল হিফাজতকারীর দাবীর ভিত্তিতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না।

ধারে গ্রহণকারী, লগ্নিতে মাল গ্রহণকারী, ক্রয়মূল্য নিরুপণের শর্তে মাল গ্রহণকারী, বন্ধক গ্রহণকারী তাদের উক্ত মাল চোরাই হওয়ার ভিত্তিতে তাদের দাবী উত্থাপনের দ্বারা হস্ত কর্তন করা যাবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও যুফার (রহ.) এর মতে এদের দাবী উত্থাপনের দ্বারা হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ মতানৈক্য রয়েছে যারা মালিক না হওয়া সত্ত্বেও মালের হিফাজত ও সরংক্ষণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ মাল ফেরত পাওয়ার জন্য দাবী উত্থাপন করার হক নেই। তাই হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে তাদের

দাবী উত্থাপন যথেষ্ট নয়। কেননা, এতে মালের হেফাজত গুণ নষ্ট করা হয়।

আমাদের দলিল : চুরি অপরাধ তা নিজস্বভাবেই হস্ত কর্তনযোগ্য অপরাধ। আর তা শরীয়ত সম্মত একটি প্রমাণের ভিত্তিতেই কাজির নিকট প্রকাশ হয়েছে। আর তা হচ্ছে নিঃশর্তরূপে দাবী উত্থাপনের পর দুজন পুরুষের সাক্ষি প্রদান। কেননা, দাবী উত্থাপনের অধিকার বিবেচ্য হয়েছে তাদের মাল ফেরত পাওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং তাদের দাবী উত্থাপনের ভিত্তিতেই হস্ত কর্তন সম্পন্ন করা হবে।

قوله : لَابِطَلَبِ الْمَالِكِ الخ : যদি কোন চোর মাল চুরির পর তার হস্ত কর্তন করা হয় আর হস্ত কর্তন করার পর উক্ত চুরিকৃত মাল মালিকের নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে দ্বিতীয় কোন চোর তা চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলে প্রথম চোর বা মালের মালিকের জন্য দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তনের জন্য দাবী উত্থাপন করতে পারবে না। কেননা, দ্বিতীয় চোরের ক্ষেত্রে উক্ত মাল মূল্য সম্পন্ন নয়। তাই তো যদি প্রথম চোরের নিকট তা ধ্বংস হয়ে যায় তবে তো তার উপর হস্তকর্তনের পর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। এজন্য দ্বিতীয় চুরিটি নিজস্বভাবেই হস্ত কর্তনকারীরূপে সাব্যস্ত হল না। তবে হা এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী প্রথম চোর উক্ত মালের ফেরতের দাবী উত্থাপন করতে পারবে। কেননা, তার জিম্মায় কিন্তু উক্ত মাল মূল মালিককে ফিরত দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য সে দাবী উত্থাপন করতে পারবে।

আর যদি প্রথম চোরের হস্ত কর্তনের পূর্বে কিংবা অন্য কোন কারণে তার হস্ত কর্তন রহিত হওয়ার পর উক্ত মাল অন্য কোন চোর চুরি করে বসে। তবে প্রথম চোরের দাবির প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে। কেননা, উক্ত মালের মূল্য সম্পন্নতা না হওয়াটা ছিল প্রথম চোরের হস্ত কর্তন। কিন্তু যেহেতু প্রথম চোরের হস্ত কর্তন সংঘটিত হয়নি তাই উক্ত মাল মূল্য সম্পন্ন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং প্রথম চোর ছিনতাইকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে।

وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَّهُ قبل الْخُصُومَةِ إِلَى مَالِكِهِ أو مَلَكَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ أو ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أو نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عن النِّصَابِ لم يُقْطَعْ وَلَوْ أَقَرَّا بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قال أَحَدُهُمَا هو مَالِي لم يُقْطَعَا وَلَوْ سَرَقَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ على سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْآخَرُ وَلَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إِلَى الْمَسْرُوقِ منه ولا يَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ وَتُرَدُّ الْعَيْنُ لو قَائِمَةً وَلَوْ قُطِعَ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ لَا يَضْمَنُ شيئا وَلَوْ شَقَّ ما سَرَقَهُ في الدَّارِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ قُطِعَ وَلَوْ سَرَقَ شَاةً فَذَبَحَهَا فأخرجها لَا وَلَوْ صَنَعَ الْمَسْرُوقَ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ قُطِعَ وَرَدَّهَا وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ فَقُطِعَ لَا يُرَدُّ وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ أَسْوَدَ يُرَدُّ -

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি কোন বস্তু চুরি করল অতঃপর তা অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয় অথবা বিচারের পর সে উহার মালিক হয়ে যায় কিংবা সে দাবী করে যে চোরাইকৃত বস্তু তার মালিকানার জিনিস অথবা চোরাইকৃত বস্তু নেসাবে সারাকা থেকে কম হয় তাহলে (এসব সুরতে) তার হাত কাটা হবে না। আর যদি দু'জন লোক চুরির স্বীকারোক্তি করে, অতঃপর তাদের একজন বলে সেটা আমার মাল, তাহলে উভয়ের মধ্যে কারো হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি দু'জন চুরি করে এবং একজন গায়েব হয়ে যায় আর দুজন পুরুষ তাদের চুরি সম্পর্কে সাক্ষী দেয় তাহলে অপরজনের হস্ত কর্তন করা হবে। আর যদি গোলাম চুরি সম্পর্কে স্বীকার করে তবে তার হাত কাটা হবে। আর চোরাইকৃত মাল যার থেকে চুরি করা হয়েছে তার কাছে ফেরত প্রদান করা হবে। (যদি তা ধ্বংস না হয়) আর হস্ত কর্তনও ক্ষতিপূরণ উভয়টি এক সাথে একত্র হবে না। আর যদি মূল বস্তু (চোরের কাছে) বিদ্যমান থাকে তবে তা ফেরত দেয়া হবে। আর যদি কয়েকটি চুরির কিছুর জন্য হস্ত কর্তন করা হয় তাহলে (বাকিগুলোর জন্য) সে কোন কিছুর জামিন হবে না। আর যদি সে যা চুরি করেছে তা ঘরের মধ্যেই ছিড়ে ফেলে অতঃপর তা বের করে, তাহলে হস্তকর্তন করা হবে। আর যদি কেহ বকরি চুরি করে জবেহ করে ফেলে অতঃপর তা বের করে নেয়, তবে হস্তকর্তন করা হবে। আর যদি চোরাইকৃত মাল দিরহাম বা দিনার বানিয়ে নেয় তাহলেও হস্ত কর্তন করা হবে এবং তা মালিককে ফিরত দিতে হবে। আর যদি কাপড় চুরি করে তা লাল রংয়ে রঞ্জিত করে নেয় তবে হাত কর্তন করা হবে। কিন্তু তা ফেরত দেয়া হবে না এবং ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। আর যদি কালো রংয়ে রঞ্জিত করে তবে তা ফেরত দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ مَنْ سَرَقَ شَيْئًا الخ : যদি চোর কিছু চুরি করার পর তা মালিকের অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বেই ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে তার উপর হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে হস্ত কর্তন সাবস্ত হবে। তিনি অভিযোগ উত্থাপনের পর ফেরত দেয়ার উপর কিয়াস করে এমত ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের দলিল হলো : চুরিকর্ম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন হচ্ছে শর্ত। কেননা, ঝগড়া-বিবাদ

নিরসনের অনিবার্য দাবী হিসাবেই সাক্ষ্য ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর এখানে তার ফেরত দেয়ার মাধ্যমে বিবাদ নিরসন হয়ে গেছে। কিন্তু অভিযোগ দায়েরের পর ফেরত দেয়া তা বর্ণিত ফেরত না দেয়ার মত। কেননা, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপন পূর্ণতা লাভ করেছে। অনুরূপভাবে যদি চোরের অভিযোগ দায়েরের পর উক্ত মালের মালিক হয়ে যায় চোর। তা মালিকের হেবা করার কারণে বা বিক্রি করার কারণে হোক। তাহলেও তার হস্ত কর্তন রহিত হয়ে যাবে। কেননা, আমাদের মতে ফয়সালা কার্যকর করাও বিচারের অন্তর্ভুক্ত। তাই ফয়সালা কার্যকর পর্যন্ত অভিযোগ বিদ্যমান থাকা শর্ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফয়সালা কার্যকর করার পূর্বে চোর উক্ত মালের মালিক হওয়ায় প্রথম মালিকের অভিযোগ বাতিল হয়ে গেল। এজন্য চোরের হস্ত কর্তন রহিত হয়ে যাবে। কেননা, শর্তের অনুপস্থিতিতে শর্তকৃত বস্তু রহিত হয়ে যাবে।

তদ্রূপ যদি উক্ত মালের মূল্য বিচার কার্যকর করার পূর্বে নেসাবে সারাকা থেকে কমে যায় তাহলেও তার হস্ত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, হস্ত কর্তন করা হবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) থেকেও বর্ণিত। তারা মালের মূল্য হ্রাস হওয়াকে মূল মাল হ্রাস হওয়ার উপর কিয়াস করেছেন। আমাদের দলিল হস্তকর্তন করার শর্ত যেহেতু নেসাব পরিমাণ হওয়া। সুতরাং হদ্দ কার্যকর করা পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকতে হবে। পক্ষান্তরে স্বয়ং মাল হ্রাস হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, নষ্ট হওয়া পরিমাণ অংশ ক্ষতিপূরণ যোগ্য। সুতরাং স্বয়ং বস্তু এবং তার দেয় বিদ্যমান হওয়ায় নিসাব পরিপূর্ণ রয়েছে। যেমন সম্পূর্ণ মাল নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মূল্য হ্রাস হওয়ার বিষয় তার ব্যতিক্রম। কেননা, হ্রাস হওয়া পরিমাণের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। অনরূপভাবে চুরি করার পর চোর দাবী করে যে, তা তার মালিকানাভুক্ত জিনিস তাহলেও তার হাত কর্তন করা হবে না। যদিও সে সাক্ষ্য পেশ না করতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, নিছক দাবী করার কারনে হদ্দ রহিত হবে না, বরং তার দাবী প্রমাণিত করতে হবে। কেননা, নিছক দাবী গ্রহণ করলে কোন চোরই দাবী করা থেকে অক্ষম হবে না। আমাদের দলিল মালিকানায় উদ্ভুত সন্দেহ হদ্দকে রহিত করে দেয়। আর এ সন্দেহ শুধু দাবী উত্থাপন দ্বারাই সংগঠিত হয়ে যায়। কেননা, তার দাবী সত্য হওয়ারও দাবী রাখে।

قوله : وَ لَوْ اَقَرَّ بِسَرَقَةٍ الخ : যদি দুজন লোক চুরি করে অতঃপর তারা স্বীকারোক্তিও করে তারপর একজন বলে যে ইহা আমার মাল তাহলে কারোরই হস্ত কর্তন করা হবে না। কেননা, যে প্রত্যাহার করল, তার ক্ষেত্রে তো স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার কার্যকর। আর অপর জনের ক্ষেত্রে তা সন্দেহের উদ্ভুত। তাই উভয় থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

قوله : وَلَوْ سَرَقَ وَ غَابَ الخ : আর যদি দুজন মিলে চুরি করে আর একজন গায়েব হয়ে যায় আর সাক্ষীরা তাদের চুরির উপর সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মত অনুযায়ী অপর জনের হস্ত কর্তন করা হবে। ইহা তার পরবর্তী মতামত। সাহাবাইন (রহ.) এরও তাই অভিমত। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর প্রথম মত হল তার হাত কর্তন করা হবে না। কেননা, যদি অন্যজন উপস্থিত থাকতো তবে সন্দেহ উদ্রেককারী কিছু সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অপরজনের হস্তকর্তন করা হবে না।

তার পরবর্তী মতামতের দলিল হল : অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিতির দরুন তার চুরাই কাজে সন্দেহ সাব্যস্তকারী হতে পারে। সুতরাং সে অস্তিত্বহীন হিসাবে গণ্য হবে। আর অস্তিত্বহীন সে উপস্থিত ব্যক্তির হদ্দ কার্যকর করার উপর সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সম্ভাবনাময় হতে পারে না।

قوله : وَ لَوْ اَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرَقَةٍ الخ : যদি গোলাম চুরির কথা স্বীকার করে তবে তার হাত কাটা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে عبد مأذون (অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম) এবং عبد محجوب (বাধাপ্রাপ্ত গোলাম) এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। মাবসূত গ্রন্থের বরাত দিয়ে নিকায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, গোলাম যদি চুরির

স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার দু অবস্থা হবে, (১) عبد ماذون হবে কিংবা (২) عبد محجوب হবে, অতঃপর প্রত্যেক অবস্থারই আবার দু সুরত। (১) চুরিকৃত মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, (২) হুবহু ঐ মাল তার হাতে রয়ে গেছে, এখন যদি গোলাম مأذون হয় এবং ধ্বংস হওয়া মালের চুরির স্বীকার করে তাহলে আমাদের ائمة ثلاثة এর মতে শুধু তার হাত কাটা হবে। আর যদি মাল বহাল থাকে তবুও আমাদের মতে তার হাত কাটা হবে এবং যার কাছ থেকে মাল চুরি করেছে তাকে মাল ফিরিয়ে দেবে। ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে হাত কাটা হবে না। আর যদি عبد محجوب বহাল থাকা মাল চুরির কথা স্বীকার করে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে হাত কাটা হবে এবং মাল ফিরিয়ে দেবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে হাত কাটা হবে। কিন্তু মাল হবে তার মালিকের। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে হাত কাটা হবে না। বরং মাল হবে গোলামের মালিকের।

قوله : وَ تُرَدُّ السَّرَقَةَ الخ : যদি চোরের হাত কর্তন করার সময় মাল তার হাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর যদি তা ধ্বংস করে ফেলে তবে তার উপর দ্বিতীয়টি তথা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। ইহা আমদের আহনাফের মতামত। আর এখানে ধ্বংস দ্বারা মাল নিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া বা চোর তা নষ্ট করে ফেলার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি চোর তা নষ্ট করে ফেলে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উভয় সুরতে তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে। তিনি বলেন, হস্ত কর্তন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান দুটি বিষয় আলাদা। যাদের কারণও ভিন্ন। সুতরাং একটি দ্বারা অন্যটি রহিত হবে না। কেননা, হস্তকর্তন হচ্ছে শরীয়তের হক। তা এভাবে যে শরীয়াত যা নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাকা, আর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে মালের মালিকের হক। তথা বান্দার হক। তা এভাবে যে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া। সুতরাং তা ইহরাম অবস্থায় কারো মালিকানাধীন কোন প্রাণী হেরেমের ভিতর হত্যা করা বা জিম্মির মদ পান করার মত হল। আমাদের দলিল কোরআনের আয়াত :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ

আমাদের দ্বিতীয় দলিল নবী করীম (সা.) এর হাদিস :

لَاغَرِمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِيْنُهُ

'ডান হাত কর্তিত হওয়ার পর চোরের উপর আর কোন ক্ষতিপূরণ নেই।'

তাছাড়া ক্ষতিপূরণ হস্তকর্তনের সাথে একত্র হতে পারে না। কেননা, কোন জিনিসের যখন ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় তখন সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যায়। সুতরাং প্রতিয়মান হল যে, যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তবে চোর চুরিকৃত মালের মালিক হয়ে গেল। আর এ মালিকানা সাব্যস্ত হবে তার চুরি করার সময় থেকে। সুতরাং যেহেতু সে তার মালে হস্তক্ষেপ করেছে তাই তার হাত কর্তন করা হবে না। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। বিধায় কর্তন করা যা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত তা রহিতকারী নিজেই রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে চুরিকৃত মাল নিরাপত্তারগুণসম্পন্ন থাকে না। যদি নিরাপত্তার গুণ থাকে তবে তা সত্তাগতভাবে হালাল হবে। ফলে হালাল হওয়ার কারণের সন্দেহে তার হাত কর্তন রহিত হয়ে যাবে। সুতরাং শরীয়তের হক হিসাবে তা হারাম গণ্য হবে। তাই তা মৃত প্রাণীর ন্যায় হল। সুতরাং তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। আর যদি মাল ধ্বংস না হয় তাহলে যেহেতু তার মালিক বিদ্যমান আছে তাই তা মালিকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। কেননা, চোরতো এ মালের মালিক হতে পারে নাই। কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয় ভিন্ন।

قوله : وَ لَوْ قَطَعَ لِبَعْضِ الخ : যদি কোন চোর কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটায়। অতঃপর তন্মধ্যে একটির

কারণে তার হাত কর্তন করা হয়, তবে তা সবকটি চুরির বদলা হিসাবে ধর্তব হবে। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তাকে অন্য চুরির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যে চুরির জন্য হস্ত কর্তন করা হল তার তো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু অন্যান্য চুরির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উক্ত মাসআলায় দুটি পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম পদ্ধতিতে কোন মতানৈক্য নেই। তা হল যদি কয়েকটি চুরির দাবী উত্থাপন করা হয়। আর ফায়সালা কার্যকর করার সময় তথা হাত কর্তনের সময় দাবীদার সবাই উপস্থিত থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ কারো জন্য তার উপর আবশ্যক হবে না। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উল্লিখিত মতানৈক্য। তা হল কয়েকজন দাবী উত্থাপন করেছে ঠিকই কিন্তু বিচার কার্যকর করার সময় মাত্র একজন উপস্থিত ছিল। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কারো তরে ক্ষতিপূরণ তার উপর আবশ্যক হবে না। আর সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যে উপস্থিত ছিল তার তরে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। কিন্তু যারা উপস্থিত ছিল না তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ তার উপর আবশ্যক হবে।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি নয়। অথচ চুরির অভিযোগ সাব্যস্তের জন্য অভিযোগ উত্থাপন শর্ত। তাই অনুপস্থিত ব্যক্তি বর্গের ক্ষেত্রে অভিযোগ সাব্যস্ত হয়নি, তাই তাদের মাল নিরাপত্তার গুণসম্পন্ন হয়ে গেল। কেননা, ঐ সকল চুরির জন্য (অভিযোগহীন চুরির জন্য) হস্ত কর্তন করা হয়নি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : আল্লাহর হক হিসাবে সকল চুরির জন্যই একটি হাত কর্তনই সাব্যস্ত হবে। কেননা, হুদূদের ভিত্তি হল একিভূত এর উপর। আর অভিযোগ উত্থাপন হল কাজীর সামনে চুরির বিষয়টি প্রমাণিত করার শর্ত। কিন্তু অপরাধের শাস্তি হিসাবে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা যখন কার্যকর করা হবে। তখন তা সবটি থেকেই ধরা হবে। আর তা এভাবে যে শাস্তির উপকারিতা তো সব কটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে। সুতরাং কর্তনও সব কটির পক্ষ থেকে ধরা হবে।

قوله : وَلَوْ شَقَّ مَا سَرَقَ الخ : কেউ যদি কাপড় ইত্যাদি চুরি করে ঘরের ভিতরেই ছিড়ে দু' টুকরা করে ফেলে এরপর তা বের করে আনে। আর অবস্থা এই যে, তা নেসাবে সারাকা পরিমাণ হয় তাহলে তার হস্তকর্তন করা হবে। কেননা এ কাপড়ে তার মালিকানার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তা হল তার ছিড়ে ফেলা। কেননা, তা মূল্য ওয়াজিব করে এবং ক্ষতিপূরণ আদায়কৃত বস্তুটির মালিকানা সাব্যস্ত করে। সুতরাং তা এমন হল যে বিক্রেতা পণ্যের ব্যাপারে ইচ্ছাধীকার সম্পন্ন হয়েছে তা বিক্রয়ের উপর আর তা ক্রেতা চুরি করল।

সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : এরূপভাবে তা গ্রহণ করার কারণে ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়েছে তার মালিকানা অর্জিত হওয়ার কারণে নয়, মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অনিবার্য ফল স্বরূপ। যাতে দুই বিনিময় এক মালিকানায় একত্র না হয়। আর এ ধরনের কর্ম সন্দেহ উদ্রেগকারী হতে পারে না। আর উক্ত মতানৈক্য তখন হবে যখন মালিক কাপড় ও ক্ষতিপূরণ দু'টুই নেবেন। পক্ষান্তরে যদি মালিক কাপড় বাদ দিয়ে শুধু মূল্য গ্রহণ করেন তবে চোরের হাত কর্তন করা হবে সর্বসম্মতিক্রমে। কেননা, তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে চুরি করে নেয়ার সময় থেকে, তাই মালিকের বিষয়টি সন্দেহের উদ্রেক করে বিধায় তার হাত কর্তন করা হবে না। আর আমাদের বর্ণিত মতানৈক্য তখন হবে যখন ক্ষতি ও খুত গুরুতর হবে। পক্ষান্তরে ক্ষতি সামান্য হলে সর্বসম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন করা হবে। কেননা, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাপড়ের ক্ষতিপূরণ চাপানো সম্ভব নয়। তাই মালিকানার কারণের সন্দেহও হবে না।

আর যদি কেহ বকরী চুরি করে তা জবাই করে বের করে নিয়ে যায় তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে সে গোশত চুরির অপরধকারী হবে আর গোশত চুরির অপরাধে হাত কর্তন নেই।

قوله : وَلَوْ صَنَعَ الْمَسْرُوقَ الخ : যদি কেহ স্বর্ণ বা রৌপ্য চুরি করে অতঃপর তা দ্বারা দিনার বা দিরহাম

বানিয়ে ফেলে তাহলে তা নিসাব পরিমাণ হলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে তাকে তা ফেরত দিতে হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহিবাইন (রহ.) এর মতে যার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে সে তা পাবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর মতে এটা হচ্ছে বস্তুর নতুন মূল্যমান সৃষ্টিকারী কর্ম। আর কোন কোন ভাষ্য মতে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে চোরের হাত কর্তন সাব্যস্ত হবে না। কেননা, চোর তো হস্ত কর্তনের পূর্বেই উক্ত বস্তুর মালিক হয়ে যাচ্ছে। আবার কোন কোন ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবাইন (রহ.) এর মতে চোরের হাত কর্তন করা হবে। কেননা, সে হুবহু চুরিকৃত মালের মালিক হয়নি, বরং সে চুরি করে তা অন্য বস্তুতে রূপান্তর করার কারণে মালিক হচ্ছে। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মত অনুযায়ী চোরের হস্ত কর্তন এর ব্যাপারে কোন ধরনের সন্দেহ নেই। কেননা, সে তো চুরিকৃত মালের মালিক হচ্ছে না।

قوله : وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ الخ : যদি কেহ কাপড় চুরি করে তা লাল রংয়ে রঞ্জিত করে তাহলে চোরের হাত কর্তন করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তার উপর উক্ত কাপড়ের মূল্য প্রদানের দায় চাপানো হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে তার থেকে কাপড় ফেরত নেয়া হবে। কিন্তু রঞ্জনের অতিরিক্ত মূল্য তাকে ফেরত দেয়া হবে। তিনি এটাকে হরণ ও ছিনতাই এর উপর কিয়াস করেছেন। এভাবে হরণ বা ছিনতাইএর পর যদি কাপড়ে অতিরিক্ত রঞ্জন করে তবে তা মালিককে ফিরত দিতে হয়। এবং মালিক অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দিতে হয়।

শায়খাইন (রহ.) এর দলিল : এখানে রং যেমন দেখতে বিদ্যমান রয়েছে তদ্রূপ গুণগতভাবেও বিদ্যমান। তাই তো মালিক তা গ্রহণ করতে চাইলে অতিরিক্ত মূল্য ফিরত দিতে হবে। আবার মালিকের অধিকার দৃশ্যত কাপড়ের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু গুণের মধ্যে মালিকানা বিদ্যমান নেই। আর এভাবে যে যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো চোরের উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয় না। এজন্য আমরা চোরের দিককে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু হরণ বা ছিনতাইর বিষয় ভিন্ন। কেননা, এক্ষেত্রে উভয়ের দৃশ্যত ও গুণগত দিক দিয়ে মালিকানা বিদ্যমান। তাই তারা এদিক থেকে সমান হয়ে গেল।

আর যদি চোর উক্ত কাপড় কালো রংয়ে রঞ্জিত করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে কাপড় ফেরত নেয়া হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে লাল রং করা আর কালো রং করা সমান। তাই তাও ফিরত নেয়া যাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর যুক্তি হল, লাল রং এর ন্যায় কালো রংও হচ্ছে অতিরিক্ত সংযোজন যা মালিকের মালিকানাকে রহিত করে না। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, কালো রং মূলত একটি দোষ। তাই মালিকের হক বিলুপ্ত করে না।

بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

পরিচ্ছেদ : ডাকাতি

أُخِذَ قَاصِدُ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَبْلَهُ حُبِسَ حتى يَتُوبَ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا مَعْصُومًا قُطِعَ يَدُهُ وَرِجْلُهُ من خِلَافٍ وَإِنْ قُتِلَ حَدًّا وَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ قُطِعَ وَقُتِلَ أو صُلِبَ أو قُتِلَ وَصُلِبَ وَيُصْلَبُ حَيًّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ حتى يَمُوتَ ولم يَضْمَنْ ما أَخَذَ غَيْرَ الْمُبَاشِرِ كَالْمُبَاشِرِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرُ كَالسَّيْفِ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَجَرَحَ قُطِعَ وَبَطَلَ الْجَرْحُ وَإِنْ جَرَحَ فَقَطْ أو قَتَلَ فَتَابَ أو كان بَعْضُ الْقُطَّاعِ غير مُكَلَّفٍ أو ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ من الْمَقْطُوعِ عليه أو قَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ على الْبَعْضِ أو قَطَعَ الطَّرِيقَ لَيْلًا أو نَهَارًا بِمِصْرٍ أو بين مِصْرَيْنِ لم يُحَدَّ فَأَقَادَ الْوَلِيُّ أو عَفَا وَمَنْ خَنَقَ في الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ -

অনুবাদ : ডাকাতির পূর্বে ডাকাতির উদ্যোগতাকে ধরা হলে তাকে তাওবা করা পর্যন্ত বন্দী করা হবে। আর যদি নিরাপরাধের (মুসলমান বা জিম্মির) মাল নিয়ে নেয়। তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত পা কর্তন করা হবে। (অর্থাৎ ডান হাত এবং বাম পা) আর যদি সে (ডাকাত) হত্যা করে তাহলে হদ্দ হিসাবে তাকেও হত্যা করা হবে। যদিও মৃত্যের অভিভাবক ক্ষমা করে দেন। আর যদি ডাকাত হত্যা করে এবং মাল লুণ্ঠন করে নেয় তাহলে হাত পা (বিপরীত দিক থেকে) কর্তন করা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে। অথবা শুধু হত্যা করা হবে, কিংবা শুধু শূলে চড়ানো হবে। আর তাকে জীবিতাবস্থায় শূলে চড়ানো হবে তিন দিন পর্যন্ত। আর বর্শাঘাতে তার পেট ফেড়ে ফেলা হবে। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করবে। আর (ডাকাতকে) হত্যার পর সে যা লুণ্ঠন করেছে সে ব্যাপারে তার উপর কোন দায় আরোপ করা হবে না। আর ডাকাতির ক্ষেত্রে যে হত্যা করেনি সেও হত্যাকারীর ন্যায় (অর্থাৎ, হদ্দ সকলের উপর কার্যকর করা হবে) আর লাঠি দ্বারা বা পাথর দ্বারা হত্যা করা তরবারি দ্বারা হত্যা করার ন্যায়। আর যদি মাল লুণ্ঠনের সাথে যখম করে তাহলে তার হাত পা কর্তন করা হবে, আর যখমের দায় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি শুধু যখম করে অথবা হত্যা করে তওবা করে নেয় কিংবা ডাকাতদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল থাকে কিংবা যার উপর ডাকাতি করা হয়েছে তার কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে অথবা কাফেলার কতক লোক অপর লোক থেকে ডাকাতি করে অথবা রাতে বা দিনে শহরের মাঝে ডাকাতি করে তাহলে (এসকল সুরতে) হদ্দ কায়েম করা হবে না। তবে অভিভাবক হয়তো কেসাসের দাবী করবে অথবা মাফ করে দেবে, আর যে ব্যক্তি শহরের মধ্যে কয়েকবার কণ্ঠরোধ করে তাহলে এর দায়ে তাকে হত্যা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ قَطْعِ الطَّرِيْقِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এ পর্যন্ত ছোট চুরি তথা سرقہ এর আলোচনা করেছেন। আর তা প্রথমে আনার কারণ হচ্ছে তা ব্যাপক হারে ঘটে। অতঃপর এখান থেকে বড় চুরি তথা قطع الطريق এর আলোচনা শুরু করেছেন। قطع الطريق এর অর্থ হচ্ছে : قَطْعُ الْمَارَّةِ وَ الْمُسَافِرِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ পথিক এবং সফরকারী লোকদেরকে আটক করে তাদের মালামাল লুঠ করা। এখানে قطع এর মূল مضاف اليه কে উহ্য করে তার متعلق এর দিকে اضافت করে দেওয়া হয়েছে। আবার কেহ কেহ বলেন এখানে طريق দ্বারা পথিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ محل বলে حال উদ্দেশ্য করা হয়েছে। قطع الطريق এর কিছু শর্ত রয়েছে। তা হল : (১) ডাকাতরা এমন শক্তিশালী হতে হবে যে পথিক বা মুসাফির তাদের মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়। (২) স্থানটি শহরের বাইরে দূরে নির্জন স্থানে হতে হবে। (৩) দারুল ইসলামে হতে হবে। (৪) ডাকাতিকৃত মাল চুরির নেসাব পরিমাণ হতে হবে। (৫) সমস্ত অনাত্মীয় হতে হবে। (৬) তাওবার পূর্বে তাকে গ্রেফতার করতে হবে।

قوله : أَخَذَ قَاصِدُ قَطْعِ الطَّرِيْقِ : ১। যদি ডাকাত দলকে মাল ছিনতাই বা মানুষ হত্যার পূর্বেই গ্রেফতার করা হয় তাহলে শাসক তাদেরকে তাওবা করা পর্যন্ত গ্রেফতার করে রাখবেন। ২। যদি ডাকাত কোন মুসলমানের বা জিম্মির মাল ছিনতাই করে কিন্তু কোন প্রকার হত্যাযজ্ঞ করেনি আর পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় তাহলে শাসক তাকে বিপরীত হাত পা অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা কর্তন করবেন। যদি তারা ছিনতাইকৃত মাল সর্বমোট দশ দিরহাম করে ভাগে পেয়ে থাকে তাহলে সকলের হাত পা কর্তন করা হবে। আর যদি তারা মাল লুণ্ঠন না করে শুধু মানুষ হত্যা করে তাহলে শাসক তাদেরকে হদ্দ হিসাবে হত্যা করবেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে যদি মৃতের অভিভাবক তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে তার ক্ষমা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ইহা শরীয়াতের হক্ব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

যারা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। তাদের শাস্তি হল তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা শূলীতে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদের দেশান্তর করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে, জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু। —সূরা মায়িদা : ৩৩-৩৪

উক্ত আয়াতে او শব্দটি تخيير এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিচারক চাইলে আয়াতে উল্লিখিত চার শাস্তির যে কোন একটি প্রয়োগ করতে পারবে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে او এখানে অবস্থার বিভিন্নতা অনুযায়ী تقسيم এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর অপরাধও চারটি। এ পর্যন্ত আমরা তিনটি উল্লেখ করেছি। আর চার নং অপরাধ অচিরেই বর্ণনা করব। (ইনশাআল্লাহ) তাছাড়া যেহেতু অপরাধ বিভিন্ন অবস্থার হয়ে থাকে, তাই তার শাস্তিতে তারতম্য হওয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রথম প্রকার অপরাধের ক্ষেত্রে বন্দি এজন্য যে আয়াত أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ দ্বারা বাহ্যিকভাবে যদিও দারুল ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া বুঝায়। তবে বিশুদ্ধ কথা হল বন্দি অর্থ হবে। কেননা দেশান্তর দ্বারা শাসানো হয় না। বরং সে তো অন্যদেশে গিয়ে এমন ডাকাতি করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বন্দির মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে

বন্দিখানায় নেয়া হল। তাই এ অঞ্চলবাসী তার থেকে রক্ষা পেল। আর তাই নির্বাস দ্বারা উদ্দেশ্য শাসক তাদেরকে বন্দির পরও সাধারণ শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। ইহা রাজনৈতিক হিসাবে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার দলীল হল : কুরআনের উক্ত আয়াত। তা হল :

أَوْ تُقَطَّعُوا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ

অর্থাৎ, 'তাদের হস্তপদ সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে।'

আর এক্ষেত্রে লুণ্ঠিত মাল কোন মুসলমানের বা জিম্মির হওয়া শর্ত। যাতে মালের পূর্ণ নিরাপত্তার গুণ স্থায়ী হয়। তাইতো দারুল হরব থেকে আগত কোন কাফেরের মাল ছিনতাই করার কারণে ডাকাতের হাত-পা কর্তন করা যাবে না। কেননা, তার মাল স্থায়ী নিরাপত্তার গুণ সমৃদ্ধ নয়। আর লুণ্ঠিত বস্তু নেসাবে সারাকা হওয়ার শর্ত দেয়া হয়েছে যাতে একজন মানুষের অঙ্গ একটি নির্ধারিত পরিমাণ লুণ্ঠন করার কারণে হালাল হয়। আর তৃতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে আমরা যা বর্ণনা করেছি তার দলীল হল أَوْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا। তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা তাদেরকে শূলে চড়ানো হবে। আর তা শরীয়াতের হদ্দ হিসাবে কিসাস হিসাবে নয়। তাই তো যদি মৃত ব্যক্তির অভিভাবক ক্ষমা করে দেয় অর্থ রক্তমূল্য দাবি করে তবে তার এ দাবি অনর্থক। কেননা, শরীয়াত কর্তৃক দানকৃত হদ্দ কোন বান্দা রহিত করতে পারে না।

قوله : وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الخ : অপরাধের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে যদি হত্যা করে এবং মালও ছিনতাই করে তাহলে শাসকের এখতিয়ার রয়েছে তিনি হয়তো প্রথমে তার এক হাত ও একপা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবেন। অতঃপর তাকে হত্যা করবেন। কিংবা শূলে চড়াবেন। অথবা শুধু হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, শাসক শুধু হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন, কিন্তু তার সাথে কর্তনযোগ করতে পারবে না। কেননা, ডাকাতি হচ্ছে একটি অপরাধ যা দুটি শাস্তিকে আবশ্যক করে না। তা ছাড়া হদ্দ এর ক্ষেত্রে প্রান দন্ডের নিম্নটিকে প্রান দন্ডের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।

শায়খাইন (রহ.) এর দলীল : অপরাধের গুরুতরের কারনে শাস্তিও গুরুতর হবে। সুতরাং দুটি মিলে একটি শাস্তিই গণ্য করা হবে। তাই তো ডাকাতির ক্ষেত্রে দুটি পদ কর্তন করার বিধান আরোপ করা হয়েছে। অথচ সাধারণ চুরির ক্ষেত্রে এটিকে দুটি হদ্দ হিসাবে গণ্য করা হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বর্ণনা মতে শূলে চড়ানো বাদ দেয়া হবে না। কেননা, ইহা নস দ্বারা সাব্যস্ত। তা ছাড়া শূলের উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক প্রচার, যাতে তা দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা বলি মূল প্রচার হচ্ছে প্রানদন্ড তা দ্বারাই প্রচার হয়ে যাবে। এখন শাসকের এখতিয়ার, সে চাইলে শূলে চড়াবে, নতুবা না।

قوله : وَيُصْلَبُ حَيًّا ثَلٰثَةَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, শূলে দেয়া হলে তাকে জীবিত শূলে দেয়া হবে এবং বর্শাঘাতে তার পেট ফেড়ে দেয়া হবে। আর এভাবে তিন দিন ফেলে রাখা হবে। তবে ইমাম তাহাবী (রহ.) বলেন, মুছলা পরিহার করার জন্য প্রথমে তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর শূলে চড়ানো হবে। আর তিন দিনের বেশি ফেলে রাখা হবে না। কেননা, এতে মানুষের কষ্ট হবে। কেননা, তা থেকে পঁচা দুর্গন্ধ বের হতে থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, তাকে এভাবে শূলে রাখা হবে। যাতে পঁচে টুকরা টুকরা হয়ে নিচে পড়ে। আর মানুষ তা দেখে শিক্ষা অর্জন করে।

قوله : وَغَيْرُ الْمُبَاشِرِ كَالْمُبَاشِرِ الخ : আর ডাকাতি কাজে দলবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি তন্মধ্যে একজন হত্যাযজ্ঞ ঘটায় তাহলে সবার উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা, তারা সকল ডাকাতি কাজে সহায়ক ও একমত ছিল। তাই তো যখন একজন পিছপা হয় তখন সহায়করা তাদের সাথে যোগ দেয়। আর হদ্দ প্রয়োগের জন্য শর্ত হত্যা কান্ড হওয়া। আর তা তো হয়েছে। আর এ হত্যাকান্ড লাঠি দ্বারা প্রহার করে, তরবারী দ্বারা

আঘাত করে বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে করে থাকুক সবটির হুকুম এক ও অভিন্ন। কেননা, হদ্দ সাব্যস্ত হয় পথে পথচারিদের উপর ডাকাতি করার দরুন আর তা তো সংঘটিত হয়েছে।

قوله : وَ إِنْ جَرَحَ فَقَطْ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে ডাকাতির এমন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করতেছেন যা দ্বারা হদ্দ আবশ্যক হয় না। সুতরাং তিনি বলেন, যদি ডাকাতরা শুধু যখম করে কিন্তু মাল লুণ্ঠন করে না কিংবা হত্যা করে। কিন্তু অবস্থা এমন যে, তারা তা থেকে তাওবা করে নিয়েছিল। তাহলে তাদের উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। তবে হা মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের এখতিয়ার আছে তারা চাইলে কিছাছের দাবী করতে পারে অথবা মাফও করে দিতে পারে। কেননা, তাওবার পর এ হদ্দ কায়েমযোগ্য নয়। তার কারণ হচ্ছে, পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে, জেনে রাখ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী দয়ালু।'

তাছাড়া তাওবার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয় লুণ্ঠিত মাল ফেরত দানের মাধ্যমে। আর মাল ফেরত দানের দরুন কর্তন সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং জানের ও মালের ক্ষেত্রে বান্দার হক প্রকাশ হবে। তাই মৃত ব্যক্তির অভিভাবক কিছাছের দাবী করতে পারে। অথবা মাফ করে দিতে পারে। আর লুণ্ঠিত মাল সে নিজে নষ্ট করুক বা এমনিতেই নষ্ট হোক তার ক্ষতিপুরণ তার উপর আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে যদি ডাকাতদের মাঝে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন বালক বা বালিকা থাকে অথবা পাগল থাকে অথবা যার মাল ডাকাতি করা হয়েছে তার সাথে ডাকাতদের কারো নিকটাত্মীয়তা থাকে তাহলে সকল ডাকাত থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। غير مكلف এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর ও ইমাম যুফার (রহ.) এরও। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত। যদি مكلف বা সুস্থ মস্তিস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্করা প্রত্যক্ষভাবে ডাকাতি করে থাকে তাহলে غير مكلف ভিন্ন তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন প্রত্যক্ষ অপরাধ হচ্ছে সূক্ষ্য বিষয়। আর সহায়তা দান হচ্ছে অনুগামী। আর مكلف প্রত্যক্ষ অপরাধকারীর মাঝে কোন বিঘ্নতা নেই। আর অনুগামীদের বিঘ্নতা বিবেচ্য নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : ডাকাতির অপরাধ তা অভিন্ন। যা সবার যোগসাজনে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং কিছুর ক্ষেত্রে যদি হদ্দ রহিত হয়ে যায় তবে সকলের ক্ষেত্রে রহিত হয়ে যাবে। আর তা এমন হল যে, ইচ্ছাকৃত আঘাতকারীর সাথে ভুলক্রমে আঘাতকারীর ন্যায় হল। আর যদি লুণ্ঠনকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দারুল হরবের লোক থাকে তাহলে হদ্দ রহিত করবে না। কেননা, তার মাল লুণ্ঠনে হদ্দ রহিত হওয়ার কারণ হল তার মালের নিরাপত্তা গ্রহণের অসম্পূর্ণতা। আর এটা তার সাথে বিশিষ্ট অবস্থা। আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু হদ্দ রহিত হয়ে গেল তখন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা তার অভিভাবকদের হাতে ন্যস্ত হবে। যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। আর অনুরূপভাবে যদি কাফেলার কিছু সংখ্যক লোক অন্য কিছু সংখ্যক লোকের উপর ডাকাতি করে তাহলে তাদের উপর হদ্দ আবশ্যক হবে না। কেননা, সংরক্ষণ অভিন্ন হওয়ার কারণে সমগ্র কাফেলা এক বাড়ি তুল্য। অনুরূপভাবে যদি দিনে বা রাতে শহরে বা দুশহরের মধ্যবর্তী স্থানে ডাকাতি করে তাহলে তাদের উপর ডাকাতির হদ্দ আরোপ হবে না। আর তা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের দাবী হল তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তাদের মধ্যে ডাকাতের সঙ্গা পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রযোজ্য।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, শহেরর বাইরে যত নিকটবর্তী স্থানই হোক তার উপর হদ্দ সাব্যস্ত হবে। কেননা, তার নিকট সাহায্য যথা সময়ে পৌছবে না। তার থেকে অন্য একটি বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, দিনে বা রাত্রে যদি অস্ত্র বা লাঠি নিয়ে ডাকাতি চালায় তাহলেও তাদেরকে ডাকাত বলে গণ্য করা হবে। কেননা, অস্ত্র সাহায্য চালাতে দেবে না। আর রাতের বেলা সাহায্য পৌছাতে এমনিতেই বিলম্ব হয়। এ ব্যাপারে

হানাফী ফুকাহাদের বক্তব্য হচ্ছে, ডাকাতি সংঘটিত হয় পথিকদের লুষ্ঠন দ্বারা। আর শহর বা শহর সন্নিকটবর্তী স্থানে তা সম্পন্ন হতে পারে না। কেননা, স্বাভাবিক অবস্থা হলো সাহায্য পৌছে যাওয়া। তবে হা এমন রাজাহানীদেরকেও আটক করা হবে হক্বদারদের হক্ব ফেরত দানের জন্য। আর যদি এমন অবস্থায়ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় তবে মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের কিছাছ গ্রহণের জন্য দাবী উত্থাপন করতে পারবে। আর অপরাধ করার কারণে তাদেরকে বন্দি করা হবে এবং রাষ্ট্রিয় শাসন প্রয়োগ করা হবে।

قوله : وَ مَنْ خَنَقَ فِى الْمِصْرِ الخ : যদি কেহ শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে দিয়াত আসবে হত্যাকারীর আকিলার উপর। (উল্লেখ্য যে এ মাসআলা অস্ত্র ছাড়া ভারী কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করার অন্তর্ভুক্ত) আর যদি কেহ বার বার শহরের মধ্যে শ্বাসরোধ করে মানুষ হত্যা করে তাহলে একারণে তাকে প্রানদন্ড দেয়া হবে। কেননা, সে তো জমিনে হাঙ্গামা, ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

كِتَابُ السِّيَرِ وَالْجِهَادِ

অধ্যায় : যুদ্ধ-জিহাদ

اَلْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ابْتِدَاءً فَإِنْ قَامَ بِهِ قَوْمٌ سَقَطَ عَنِ الْكُلِّ وَإِلَّا أَثِمُوا بِتَرْكِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَأَعْمَى وَمُقْعَدٍ وَ اَقْطَعٍ وَفَرْضُ عَيْنٍ أَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ بِلَا إِذْنِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهِ وَكُرِهَ الْجُعْلُ إِنْ وُجِدَ فَيْءٌ وَإِلَّا لَا فَإِنْ حَاصَرْنَاهُمْ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَسْلَمُوا فِيهَا وَإِلَّا إِلَى الْجِزْيَةِ فَإِنْ قَبِلُوا فَلَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا وَلَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَنَدْعُو نَدْبًا مَنْ بَلَغَتْهُ وَإِلَّا نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَ نُحَارِبُهُمْ بِنَصْبِ الْمَجَانِيقِ وَحَرْقِهِمْ غَرْقِهِمْ وَقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ وَإِفْسَادِ زُرُوعِهِمْ وَرَمْيِهِمْ وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِبَعْضِنَا وَنَقْصِدُهُمْ -

অনুবাদ : প্রাথমিকভাবে জিহাদ ফরজে কিফায়া যদি একদল তা পালন করে তাহলে সকলের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়, নতুবা তা ছাড়ার দরুন সকল গুনাহগার হবে। আর জিহাদ অপ্রাপ্ত বালকের উপর, মহিলার উপর, গোলামের উপর, অন্ধের উপর, পঙ্গুর উপর এবং হাত-পা কর্তিত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়। আর জিহাদ ফরজে আইন যখন শত্রুগণ ঝাঁপিয়ে আক্রমণ করে তখন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বের হতে পারবে। জু'ল করা মাকরূহ (অর্থাৎ মুজাহিদদের জন্য লোকদের নিকট থেকে যুদ্ধ কর নির্ধারণ করাকে জু'ল বলে) যদি ফায় পাওয়া যায় (অর্থাৎ যদি সরকারী কোষাগারে মাল পাওয়া যায়) নতুবা নয় (অর্থাৎ সরকারী কোষাগারে মাল না থাকা অবস্থায় জু'ল মাকরূহ নয়।) আর যদি আমরা তাদেরকে (কাফেরদেরকে) অবরোধ করি তাহলে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করব। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ভাল। নতুবা তাদেরকে জিযয়া (কর) প্রদানের জন্য আহ্বান করব। যদি তা তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে আমাদের যাবতীয় সুবিধা তাদের জন্য হবে এবং আমাদের উপর আরোপিত যাবতীয় দায় তাদের উপর হবে। আর আমরা যাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাই নাই তাদের সাথে যুদ্ধ করব না (যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইব না) আর যাদের প্রতি দাওয়াত পৌঁছেছে তাদেরকে মুস্তাহাব হিসাবে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিব নতুবা (যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে) আল্লাহর সাহায্য কামনা করব এবং আমরা মিনজানিক (কামান) স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে জালানোর মাধ্যমে, তাদেরকে পানিতে ডুবানোর মাধ্যমে, তাদের বৃক্ষরাজী জালানোর মাধ্যমে, তাদের ফসলাদি নষ্ট করার মাধ্যমে, তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের সাথে লড়াই করব। আর যদি তারা আমাদের কাউকে (অর্থাৎ কোন মুসলমানকে) ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে তাহলেও আমরা তাদের (তথা কাফেরদের) ইচ্ছা করব। (এবং তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপে অটল থাকব।)

প্রসঙ্গিক আলোচনা :

اَلسِّيَر : শব্দটি اَلسِّيْرَةُ এর বহু বচন। অর্থ : আচার-আচরণ, জীবন-পদ্ধতি, জীবন যাপনের পন্থা। سير বলা হয় কাফেরের সাথে যুদ্ধ করা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

الجهاد শব্দটি جُهْدٌ শব্দমূল থেকে নিস্পন্ন। فِعَالٌ এর ওযনে বাবে مفاعلة এর মাসদার। তার অর্থ (১) চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী : اَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ (الانعام) (২) চূড়ান্ত চেষ্টা করা। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী : وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ (৩) শক্তি প্রয়োগ করা। যেমন : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ -

পরিভাষায় জিহাদ বলা হয় : هُوَ قِتَالُ الْكُفَّارِ لِنُصْرَةِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামের সাহায্যার্থে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন :

هُوَ بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ فِى قِتَالِ الْكُفَّارِ مُبَاشَرَةً اَوْ مُعَاوَنَةً بِالْمَالِ اَوْ بِالرَّأْيِ اَوْ بِتَكْثِيْرِ السَّوَادِ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ -

কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা চালানো, চাই মুজাহিদীনের সহযোগিতার মাধ্যমে হোক অথবা সম্পদ ব্যায় কিংবা পরামর্শ দানের মাধ্যমে অথবা লেখালেখির মাধ্যমে ইত্যাদি যে কোন পন্থায় হোক না কেন।

জিহাদ প্রথমত দু' প্রকার : (১) নিজ নফসের সাথে জিহাদ করা। আর তা হল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনের আহকাম প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বীনের অনুশাসন মেনে চলা। অর্থাৎ, নফসে আম্মারার স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপ পঙ্কিলতার কারণেই সর্বপ্রকার অনৈতিকতা ও পাপ-পঙ্কিলতায় মানুষ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কাজেই নিজ প্রবৃত্তিকে দমন ও বশীভূত করার জিহাদই হলো সব চেয়ে বড় ও কঠিন জিহাদ। রাসূল (সা.) একবার এক ধর্মযুদ্ধ হতে ফিরে এসে মন্তব্য করলেন যে, رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلٰى جِهَادِ الْاَكْبَرِ আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে আসলাম। অন্যত্র হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন : اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ প্রকৃতপক্ষে সেই মুজাহিদ যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে।

(২) ইসলামের বিজয় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাফির, মুশরিক, খোদাদ্রোহী ও অনৈকসালামিক সমাজ ব্যবস্থা ও তার ধারক-বাহকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আর তা হচ্ছে আল্লাহদ্রোহী কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তির প্রত্যক্ষ স্বশস্ত্র সংগ্রাম। এ প্রকার জিহাদকে কোরআনের ভাষায় قتال ও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

١) فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (التوبة :٥)

٢) وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً (التوبة : ٣٦)

٣) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ (البقرة : ٢١٦)

٤) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ (البقرة : ١٩٣)

٥) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا (النساء : ٧٥)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

١) اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ -

٢) اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

٣) لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

٤) اَلْجِهَادُ مَاضٍ مَنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ اُمَّتِى الدَّجَّالَ -

এ দ্বিতীয় প্রকার জিহাদের উৎস হিসাবে আমরা এখানে অগণিত আয়াত ও হাদীস থেকে অতি সামান্য উপস্থাপন করলাম মাত্র।

জিহাদ বাস্তবায়নের দিক দিয়ে দু' প্রকার :

(১) الجهاد الاقدامى (আক্রমনাত্মক জিহাদ)। তাহল কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের কর্তৃক আক্রমণ পরিচালিত হয়ে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাকে আক্রমনাত্মক সংগ্রাম বলে। যেমন ইসলামের ইতিহাসে তাবুক যুদ্ধ।

(২) الجهاد الدِّفاعى : (প্রতিরোধ মূলক জিহাদ) কাফেরদের আক্রমনের শিকার হয়ে মুসলিম সৈন্যগণ কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া, তাকে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বলা হয়।

قوله : اَلْجِهَادُ فَرْضٌ كِفَايَةٌ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি একদল মুসলমান তা আদায় করে ফেলে তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেহই তা আদায় না করে তবে সকল গুনাহগার হবে। গ্রন্থকার (রহ.) এখানে জিহাদের প্রাথমিক অবস্থার হুকুম বর্ণনা করতেছেন। আমাদের উপর বর্ণিত কোরআনের আয়াত ও হাদীস এবং এব্যাপারে আরো বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস দ্বারা জিহাদের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। তবে জিহাদ ফরজে কেফায়া নাকি ফরজে আইন এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সহ অধিকাংশ ইমাম জিহাদকে ফরজে আইন বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)সহ অনেক ফুকাহাদের মতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাথমিকভাবে জিহাদ ফরজে কিফায়া। কেননা এটাকে নিজস্ব গুণের কারণে ফরজ করা হয়নি; বরং শুধু আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বান্দাদের থেকে দুস্কৃতি রোধ করার জন্য এটাকে ফরজ করা হয়েছে। সুতরাং উম্মতের একদল জিহাদে অংশ নিলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অবশ্য কেউ যদি এতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে সকলই গুনাগহার হবে। আর যদি ব্যাপকভাবে আহ্বান করা হয় তখন এটা ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالًا 'তোমরা লঘু রণসম্ভার কিংবা গুরু রণসম্ভার সহ বের হয়ে পড়।' সুতরাং ব্যাপক প্রয়োজনের সময় সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল হবে না বিধায় সকলের উপর তখন জিহাদ ফরজ।

قوله : وَلَايَجِبُ عَلٰى صَبِيٍّ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের উপর জেহাদ ফরজ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ - সুতরাং যেহেতু তারা সকল ফরজ বিধান থেকে মুক্ত তাই তারা জিহাদ থেকেও মুক্ত হবে। অনুরূপ মহিলাদের উপরও জিহাদ নেই। কারণ, তারা তো স্বামীর কর্তৃত্বাধীন। তাছাড়া তাদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা জনিত কারণটিও সঠিক। এ হিসাবে অবিবাহিতা ও বিধবাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তাদের উপর ও জিহাদ ফরজ নয়। সহীহ বুখারী শরীফসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিহাদে যেতেন তখন তার সাথে কতিপয় মহিলাও যেতেন যারা মুজাহিদদের মাঝে যুদ্ধাহতদের সেবা শুশ্রুষা করতেন। সরাসরি জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহিলারা মুজাহিদদের সঙ্গি হতে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে দুর্বলতার কারণে তারা সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন না। অনুরূপভাবে গোলামের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কেননা, সেও তার মনিবের কর্তৃত্তাধীন। তাই মনিবের অনুমতি দানের পূর্বে তার উপর জিহাদ ফরজ হবে না। অনুরূপভাবে অন্ধ, হাত-পা কর্তিত বা পঙ্গু বক্তিদের উপরও জিহাদ ফরজ নয়। অনুরূপভাবে অসুস্থ ব্যক্তির উপরও জিহাদ ফরজ নয়। এ সবের উপর জিহাদ ফরজ না হওয়ার মূল দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

আর মহিলাদের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে :

قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ لَا -

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! মহিলাদের উপর কি জিহাদ আছে (ওয়াজিব)? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করলেন, না।

قوله : وَ فَرْضُ الْعَيْنِ اِنْ هَجَمَ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (রহ.) জিহাদের দ্বিতীয় প্রকারটি বর্ণনা করতেছেন। তিনি বলেন, শত্রুদল ঝাঁপিয়ে আক্রমণ করে। অর্থাৎ, কাফেরগণ যদি মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যাবে। সুতরাং যখন জিহাদ ফরজে আইন হবে তখন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া কাফেরের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে যাবে। কেননা, তা তো তখন ফরজে আইন। আর ফরজে আইন এর বিপরীতে দাসত্ব বন্ধন বা বিবাহ বন্ধন কোন কাজ দিবে না। যেমন নামায, রোজার বিষয়। শরহে ওকায়া গ্রন্থকার (রহ.) জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার সুন্দর পদ্ধতি গ্রন্থনা করেছেন। তা আমরা হুবহু তুলে ধরছি। হয়তো কাফেররা দারুল ইসলামের কোন সীমান্তের মধ্যে আক্রমণ করবে। তখন তার নিকটবর্তী অধিবাসীদের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরজে আইন হবে যখন তারা যুদ্ধ করতে সামর্থ্যবান হবে, আর যারা তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী, তারা যুদ্ধের সংবাদ পেলে তাদের উপর তা ফরজে আইন হবে যখন তাদের প্রতি মুখাপেক্ষিতা দেখা দেবে। আর তা এভাবে যে নিকটবর্তী এলাকার লোকেরা কাফেরদের থেকে ভয় পাচ্ছে এবং তারা তাদের সাথে মোকাবেলা করতে অক্ষম আর তারাও অক্ষম হলে পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী, তারপর তৎ পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অধিবাসী সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হবে।

قوله : وَ كُرِهَ الْجُعْلُ الخ : جعل শব্দের جيم বর্ণে ضمه দিয়ে পড়লে এর অর্থ হয় مَا يَجْعَلُ لِلْعَامِلِ عَلٰى عَمَلِهٖ কর্মচারীকে তার কাজের বিনিময়ে যা দেয়া হয়। আর পরিভাষায় : আল্লাহর পথে জিহাদকারীদেরকে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিত্তবানদের উপর ধার্যকৃত করকে جعل বলা হয়। আর فَىْءٌ এর বহুবচন হল فُيُوْءٌ - اَفْيَاءٌ অপরাহ্নে পূর্ব দিকে গড়িয়ে পড়া ছায়া। অনায়াসলব্ধ বস্তু। পরিভাষায় فى বলা হয় যুদ্ধ ব্যতিরেকে শত্রুপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদক। সুতরাং যদি মুজাহিদদের প্রয়োজন পূরণে যতেষ্ট হয় তাহলে সম্পদশালীদের উপর কর ধার্য করা মাকরূহ। কেননা, বায়তুল মাল তো মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্যই। আর যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যথেষ্ট পরিমাণ মাল না থাকে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তবানদের উপর কর ধার্য করতে পারবেন। কেননা, বড় ক্ষতি রোধ করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষতি গ্রহণ করা শ্রেয়। তাছাড়া নবী করীম (সা.) ছফওয়ান থেকে কিছু সংখ্যক বর্ম নিয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রাযি.) বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার খরচে অবিবাহিত ব্যক্তিকে জিহাদে পাঠাতেন।

قوله : فَاِنْ حَاصَرْنَاهُمْ الخ : মুসলিম বাহিনী যখন কোন কাফের রাষ্ট্র বা দুর্গ অবরোধ করবে তখন তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস :

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَتَلَ قَوْمًا حَتّٰى دَعَاهُمْ

'নবী করীম (সা.) ইসলামের প্রতি দাওয়াত না দিয়ে কোন কাওমের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি।'

সুতরাং দাওয়াত দেয়ার পর যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে না। কেননা, তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তো অর্জিত হয়ে গেল। তাছাড়া নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যা

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন : أُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।' আর যদি তারা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আসতে অস্বীকৃতি জানায় তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে জিযয়া বা কর দেয়ার জন্য বলা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রেরিত বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদেরকে এমনই নির্দেশ দিতেন। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত যুবাইদা (রাযি.) এর দীর্ঘ হাদীসে জিযয়ার প্রতি আহ্বানের কথা রয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কোরআনে রয়েছে :

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ (اِلٰى اَنْ قَالَ) حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ

উক্ত আয়াত থেকেও বুঝা যাচ্ছে যে. জিযয়া হচ্ছে লড়াই থেকে বিরত থাকার অন্যতম পন্থা। কিন্তু মুরতাদ বা আরবের মুর্তিপূজক যাদের ব্যাপারে জিযয়ার কোন বিধান নাই, তাদের বেলায় শুধু ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করা হবে। যদি তারা তা অস্বীকার করে তবে জিযয়ার প্রতি আহ্বান করা হবে না, বরং তাদের সাথে লড়াই করা হবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ 'ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করবে।' সুতরাং যাদের ব্যাপারে জিযয়ার বিধান রয়েছে তারা যদি জিযয়া দেয়ার উপর সম্মত হয় তাহলে মুসলমানদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্য হবে এবং মুসলমানদের উপর আরোপিত যাবতীয় দায় তাদের উপর হবে। কেননা, হযরত আলী (রাযি.) বলেন তারা জিযয়া এ জন্য ব্যয় করেছে যে তাদের রক্ত তোমাদের রক্তের ন্যায় (নিরাপদ) হয়ে যায় এবং তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের ন্যায় (নিরাপদ) হয়ে যায়।

قوله : وَلَاتُقَاتِلُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الخ : আর যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছ নাই তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ভিন্ন লড়াই করা জায়েয নয়। কেননা, বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণের সময় নবী করীম (সা.) বাহিনীর অধিনায়কদের সম্বোধন করে বলতেন :

فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

'তখন তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এর সাক্ষ প্রদানের দাওয়াত দাও।'

তাছাড়া মুসলিম জাতি যে তাদের ব্যক্তিস্বার্থে বা সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য কিংবা তাদের দ্বারা গোলামিত্বের সেবা নেয়ার জন্য লড়াই করছে না তা ইসলামের প্রতি দাওয়াত দানের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যাবে। আর দাওয়াত দেয়ার দ্বারা যদি তারা মুসলমান হয়ে যায় তবে তো আমরা যুদ্ধের মতো এত কষ্টের বিষয় থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো।

আর যদি দাওয়াত দেয়া না হয় আর যুদ্ধ শুরু করা হয় তবে মুজাহিদগণ গোনাহগার হবে। তবে হা এ যুদ্ধ করার কারণে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ আসবে না। যেমন যুদ্ধ ময়দানে যদি শিশু বা মহিলা নিহত হয় তাহলে এর কোন ক্ষতিপুরণ আসে না।

আর যাদের কাছে ইতিপূর্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যুদ্ধ শুরু করা মুস্তাহাব। তা অধিক সতর্কতার জন্য। আর এক্ষেত্রে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে যুদ্ধ শুরু করা গোনাহের কাজ নয়। কেননা, নবী করীম (সা.) বনীল মুস্তালিকদের উপর অতর্কিত হামলা করেছিলেন এবং হযরত উসামা (রাযি.)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার। আর ইহা তো অতি স্পষ্ট যে অতর্কিত হামলা দাওয়াত দিয়ে হয় না।

قوله : وَ اِلَّا نَسْتَعِيْنُ بِاللهِ الخ : যদি কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে অস্বীকার করে অতঃপর কর প্রদান করা থেকেও অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। কেননা, নবী

করীম (সা.) সুলাইমান বিন বোরাইদ (রাযি.) সম্পর্কিয় হাদীসে এরূপই বলেছেন। কাফেরদের পরাস্ত ও বিপন্ন করার জন্য মিনজানিক বা কামান স্থাপন করা হবে। যেমন আবু দাঊদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) তায়েফবাসীর উপর মিনজানিক বা কামান স্থাপন করেছিলেন। আর তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাও পোড়াও পানিতে ডুবিয়ে দেয়া এবং তাদের বৃক্ষরাজী ও ফল-ফসল নষ্ট করে দেওয়া হবে। কেননা, এর উদ্দেশ্য হল তাদেরকে ব্যথিত করা। তাদের শক্তি ও দাম্ভিকতাকে চূণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া আর এ উদ্দেশ্যে তাদের গাছপালা উজাড় করে দেওয়াও জায়েয। এব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে কোরআনের আয়াত :

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ

'তোমরা (কাফেরদের) যে বৃক্ষরাজী কর্তন করেছ, কিংবা যে বৃক্ষগুলোকে (অকর্তিত অবস্থায়) তাদের মূল ও কান্ডের উপর বিরাজমান রেখেছ। সবই আল্লাহর অনুমোদনে হয়েছে। আর অপকর্মকারী (কাফির)দেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই এরূপ করা হয়েছে।' সিহাহসিত্তা গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে যে, মদিনা মুনাওয়ারা হতে নবী করীম (সা.) ইয়াহুদী গোত্র বনু নাযীরকে বিতাড়নের সময় তাদের বৃক্ষরাজী কর্তন করেছেন। এবং সেগুলোতে অগ্নি সংযোগ করেছেন। সুতরাং এমন কর্মকে যুদ্ধের কলা কৌশল আখ্যা দিয়ে এগুলোর বৈধতা দেয়া হবে।

قوله : وَإِنْ تَتَرَّسُوْا بِبَعْضِنَا الخ : আর যুদ্ধ চলাকালিন যদি কাফেররা আমাদের মুসলমানদেরকে যাদেরকে তারা বন্দী করছে তাদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে তবুও আমরা তীর নিক্ষেপ পরিত্যাগ করব না এবং আমাদের উদ্দেশ্য হবে কাফের সম্প্রদায়। কেননা, এ ক্ষেত্রে ইসলামের কেন্দ্র থেকে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষতিরোধ করা হয়। পক্ষান্তরে মুসলীম বন্দী নিহত হওয়া তা তো সীমিত ক্ষতি। আর যদি এ ছোট ক্ষতির দিক বিবেচনা করে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে বসি তবে তো জিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া আমরা যদিও কার্যতঃ তীর নিক্ষেপে মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি না কিন্তু উদ্দেশ্যগত দিক থেকে পার্থক্য করা সম্ভব। তাই আমরা কাফেরদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করব। আর এ তীর নিক্ষেপে যদি কোন মুসলমান নিহত হয় তবে তাদের দিয়াত মুজাহিদদের উপর আবশ্যক হবে না। কেননা, জিহাদ হল ফরয। আর ফরয পালনের সাথে দন্ডযুক্ত হতে পারে না।

وَنُهِينَا عن إِخْرَاجِ مُصْحَفٍ وَامْرَأَةٍ في سَرِيَّةٍ يُخَافُ عَلَيْهِمَا وَغَدْرٍ وَغُلُولٍ وَمُثْلَةٍ وَقَتْلِ امْرَأَةٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَشَيْخٍ فَانٍ وَأَعْمَى وَ مُقْعَدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ ذَا رَأْيٍ في الْحَرْبِ أو مَلِكًا وَقَتْلِ أَبٍ مُشْرِكٍ وَلْيَأْبَ الإِبْنُ لِيَقْتُلَهُ غَيْرُهُ وَنُصَالِحُهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ لو خَيْرًا وَنَنْبِذُ لو خَيْرًا وَنُقَاتِلُ بِلَا نَبْذٍ لَوْ خَانَ مَلِكُهُمْ وَالْمُرْتَدِّينَ بِلَا مَالٍ وَإِنْ أُخِذَ لم يُرَدَّ ولم نَبِعْ سِلَاحًا منهم وَلَمْ يُقْتَلْ من أَمَّنَهُ حُرٌّ أو حُرَّةٌ وَنَنْبِذُ لو شَرًّا وَبَطَلَ أَمَانُ ذِمِّيٍّ وَأَسِيرٍ وَتَاجِرٍ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ عن الْقِتَالِ

অনুবাদ : আর আমাদেরকে কুরআন শরীফ ও মহিলাদেরকে এমন ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে নিয়ে যাওয়া থেকে (নিষেধ করা হয়েছে) যেখানে তাদের উপর ভয় হয়, বিশ্বাস ঘাতকতা করা থেকে, (নিষেধ করা হয়েছে) গণিমতের মাল আত্মসাৎ করা থেকে, (নিষেধ করা হয়েছে) মুসলা (অঙ্গ-বিকৃতি) করা থেকে, (নিষেধ করা হয়েছে) মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অতী বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গুদেরকে হত্যা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি তাদের মধ্যে কেহ যুদ্ধে পরামর্শদাতা বা অধিপতি হয়। আর আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে মুশরিক পিতাকে হত্যা করা থেকে ছেলের জন্য উচিৎ সে যেন বিরত থাকে এবং অন্য কেহ তাকে হত্যা করে ফেলে। আর কল্যাণ কর হলে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করব যদিও মালের বিনিময়ে অথবা যদি কল্যাণজনক হয় তাহলে আমরা প্রত্যাখ্যান করব। যদি তাদের নেতা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে সন্ধি প্রত্যাখ্যান ছাড়াই আমরা (তাদের সাথে) লড়াই করব। মুরতাদদের সাথে মাল ভিন্ন সন্ধি করব। আর যদি (তাদের থেকে) মাল নিয়ে নেয়া হয় তবে তা ফেরত দেয়া হবে না। আমরা কাফেরদের কাছে অস্ত্র সামগ্রী বিক্রয় করব না। যাকে কোন (মুসলমান) স্বাধীন পুরুষ বা নারী-নিরাপত্তা দিবে আমরা তাকে হত্যা করব না। আর যদি অকল্যাণ বা অনিষ্ট থাকে তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব। আর জিম্মির, ব্যবসায়ীর, বন্দির বা যুদ্ধ থেকে বাধা প্রাপ্ত গোলামের নিরাপত্তা প্রদান বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : نُهِينَا عَنْ إِخْرَاجِ الخ : মুসলিম বাহিনী যদি ছোট হয় এবং সাথে কুরআন শরীফ বা নারীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা হয় তাহলে তাদেরকে নেয়া যাবে না। কেননা, এতে কুরআনের অবমাননা এবং নারীদের জান মালের ক্ষতির দিকই প্রবল, আর শত্রুদের চরম শত্রুতা হল কুরআন শরীফের উপর। তাই তারা সুযোগ পেলেই তার অবমাননা করতে পরে। এজন্যই নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন : لَاتُسَافِرُوْا بِالْقُرْاٰنِ فِى اَرْضِ الْعَدُوِّ শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে ভ্রমন করো না। পক্ষান্তরে যদি বাহিনী এত বিশাল হয় যে এতে কুরআন শরীফ বা নারীদের হেফাজত সম্ভবপর তাহলে এতে কুরআন শরীফ বা মহিলাদের নিয়ে যাওয়াতে কোনরূপ বাধা নেই। অথবা যদি কোন মুসলমান তাদের দেশে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং অবস্থা এমন যে তারা নিরাপত্তা রক্ষা করবে তাহলে সেখানে কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা, এতে নিরাপত্তাই প্রবল যা সুনিশ্চিতের মত।

قوله : وَ غَدْرٍ وَ غُلُوْلٍ الخ : মুসলমানদের জন্য অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হল বিশ্বাস ঘাতকতা না করা বা

গনিমতের মাল চুরি না করা এবং লাশ বিকৃত না করা। কেননা, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, (যা ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত বারিরা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন) لَاتَغُلُّوْا وَلَاتَغْدُرُوْا وَلَاتُمَثِّلُوْا। 'তোমরা গণিমতের মাল চুরি করো না বা বিশ্বাস ঘাতকতা করো না এবং লাশ বিকৃত করো না।' আর উরায়না সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে যে বিকৃতির ঘটনা হয়েছিল তা পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়।

قوله : وَ قَتْلُ اِمْرَأَةٍ الخ : যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্ত্রীলোকদের, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বা বিকৃত মস্তিস্ক ব্যক্তিকে, অতি বৃদ্ধ, প্রতিবন্দী ও অন্ধকে হত্যা করা যাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অতিবৃদ্ধ, পঙ্গু ও অন্ধের ব্যাপারে ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন। কেননা, তার মতে কুফরী হচ্ছে হত্যার বৈধতা দানকারী। আমাদের দলীল হল : লড়াই হলো হত্যার বৈধতা দানকারী। আর উল্লিখিত ব্যক্তির দ্বারা তো লড়াই সংঘটিত হয় না। তাছাড়া আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ আছে, হুজুর (সা.) বলেন, তোমরা অতি বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলাদেরকে হত্যা করো না। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম (সা.) এক নিহত নারীকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আহা, এতো লড়াইকারী ছিল না। তাহলে কেন একে হত্যা করা হল।' এ ব্যাপারে সারকথা হল, অনর্থক ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর বাণীর বিজয় ও কাফেরদের অপকর্ম ও বিপর্যয়কে প্রতিহত করাই মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং যাদের তরফ হতে দুষ্কর্ম ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। অপারগ ও অক্ষমদেরকে হত্যা করা যাবে না।

قوله : إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُهُمْ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, তবে যদি এদের কেহ (যাদের ব্যাপারে নিহত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে) যুদ্ধের পরামর্শদাতা বা যুদ্ধের অধিপতি বা কাফের সম্প্রদায়ের নেতা হয় তবে তাকে হত্যা করা জায়েয। কেননা, তার অনিষ্ঠ অন্য লোকদের পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। অনুরূপ যদি তাদের কেহ সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তাকেও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হত্যা করা জায়েয। কেননা, যেহেতু লড়াই হত্যাকে বৈধতা দানকারী তাই তাদের থেকে লড়াই পাওয়ার কারণে শরীয়তের হুকুম তাদের অভিমুখী হবে।

قوله : وَ قَتْلِ اَبٍ مُشْرِكٍ الخ : যুদ্ধ ময়দানে যদি মুশরিক পিতা মুসলিম ছেলের সামনে এসে পড়ে তাহলে মুসলিম ছেলের জন্য পিতাকে হত্যা করা জায়েয নয়। বরং হিদায়ার ভাষ্য অনুযায়ী তা মকরূহ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا 'দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে সদাচারণের সাথে সঙ্গ দান কর।' তাছাড়া পুত্রের দায়িত্ব হল পিতা মুসলিম হোক বা বিধর্মী তাকে ভরণ-পোষণ দিয়ে জীবন রক্ষা করা। সুতরাং তার প্রাণ ধ্বংস করার অনুমতি এর পরিপন্থী। তবে হা যদি পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পিতাকে পেয়ে যায় তাহলে সে এমনভাবে বাধাগ্রস্থ করতে যাবে যাতে অন্য কোন মুসলিম তাকে হত্যা করে ফেলে। তাহলে সে নিজে সরাসরি হতা করার দিকে ধাবিত হতে হলো না। আর যদি পিতা-পুত্রকে এমনভাবে পাকড়াও করে যে এ মুহূর্তে পিতাকে হত্যা করা ছাড়া তার নিজের প্রাণের নিরাপত্তা নেই, তাহলে অপারগতা বশতঃ পিতাকে হত্যা করার মধ্যে তার কোন গুনাহ হবে না। কেননা, সে তো এ মুহূর্তে অক্ষম।

قوله : وَ نُصَالِحُهُمْ الخ : যদি মুসলিম শাসক কাফেরদের সাথে সন্ধির মধ্যে মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন তাহলে সন্ধি চুক্তিতে কোন দোষ নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুকবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবে।' তাছাড়া নবী করীম (সা.) হুদাইবিয়ার বৎসর মক্কাবাসীদের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে তারও তাদের মাঝে দশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত থাকবে। আর যদি সন্ধি গুণগত দিক থেকে মুসলমানদের জন্য কল্যাণজনক হয়ে থাকে তাহলে তাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, জিহাদ দ্বারা যেভাবে অনিষ্ঠ থেকে বাচা সম্ভব, তেমনি সন্ধি

দ্বারাও অনিষ্ঠ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি সন্ধি মুসলমানদের জন্য কল্যাণজনক না হয় তবে সন্ধি করা হবে না। কেননা, তাতে বাহ্যত ও গুণগত উভয়দিক থেকেই জিহাদপরিত্যাগ হয়ে যায়। আর যদি এ সন্ধি নির্ধারিত সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, অতঃপর শাসক যদি দেখেন সন্ধি রদ করা অধিক কল্যাণজনক তাহলে তাদেরকে সন্ধি প্রত্যাখ্যানের সংবাদ দিবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাবতীয় প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বলেছেন, وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো, ভঙ্গ করো না।' আর এক্ষেত্রে সন্ধি প্রত্যাখ্যান ও লড়াই এর মধ্যবর্তী এতটা সময়ের ব্যবধান থাকা জরুরী যাতে কাফেরদের মূল দলের মাঝে সন্ধি বর্জনের সংবাদ পৌঁছে যায়। আর যদি কাফেররা প্রথমে চুক্তি ভঙ্গকারী হয় তাহলে মুসলিম শাসক সন্ধি. প্রত্যাখানের সংবাদ প্রদান ব্যতিরেকে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবেন। কেননা, তারাই চুক্তি ভঙ্গকারী হয়েছে, তাই আমাদের চুক্তি ভঙ্গের প্রয়োজন নেই। তবে হা যদি তাদের মূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সন্ধি ভঙ্গ পাওয়া যায় না, বরং তাদের কিছু সংখ্যক মুসলমানের ভেতর ঢুকে লুটতরাজ করে তাহলে সন্ধি ভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি তারা প্রকাশ্যে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবস্থান নেয় এবং শক্তি সামর্থ্যবান হয় তাহলে শুধু এ দলের ক্ষেত্রে সন্ধি ভঙ্গ সংঘটিত হবে। তবে হা যদি প্রধান নেতৃবর্গের তাতে অনুমতি থাকে তাহলে সমগ্র রাষ্ট্র থেকে সন্ধি ভঙ্গের বিষয়টি ফুটে উঠবে। এক্ষেত্রে মুসলিম শাসক সারা কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন।

قوله : وَالْمُرْتَدِّيْنَ بِلَا مَالٍ الخ : আর মুরতাদের ব্যাপারে শাসক তাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করার সময় পর্যন্ত সন্ধি করতে পারেন। কেননা, এতে তাদের পুণঃ ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়। তাই ইসলাম গ্রহণের আশায় তাদের সাথে লড়াই করাকে বিলম্ব করা হবে। তবে হা যদি এ সন্ধির জন্য তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, তাদের থেকে জিযয়া গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি একান্ত নিয়ে নেয়া হয় তবে তা তাদেরকে ফেরত প্রদান করা যাবে না। কেননা, তাদের সম্পদ নিরাপত্তার গুণে গুণান্বিত নয়।

قوله : وَلَم نَبِعْ سِلَاحًا مِنْهُمْ الخ : আর আমরা কাফেরদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে পারব না। এবং তাদের মাঝ দিয়ে অস্ত্র সামগ্রী নিয়ে যেতে পারব না। কেননা, নবী করীম (সা.) কাফের হরবীর কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে এবং তাদের কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করলে তারা তো এ অস্ত্র দ্বারাই আমাদের সাথে সংগ্রাম করবে, যা পরবর্তীতে আমাদের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি যাদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে তাদের কাছেও বিক্রি করা যাবে না। কেননা, এ সন্ধি ভেঙ্গে যেতে পারে অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ তো অবশ্যই হবে। আমাদের বর্ণিত কারণের ভেতর ঘোড়া বিক্রিরও হুকুম। কেননা, তাও যুদ্ধের অস্ত্র তুল্য। তবে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার বৈধতা নবী করীম (সা.) এর হাদীস থেকে প্রমানিত। কেননা, নবী করীম (সা.) ছুমামাহ (রাযি.) কে মক্কাবাসীকে খাদ্য সরবরাহের আদেশ করেছিলেন। অথচ তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল।

قوله : وَلَمْ نَقْتُلْ مَنْ اٰمَنَه الخ : যদি মুসলমান স্বাধীন নর বা নারী কোন কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে আমরা তার সাথে লড়াই করতে পারব না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ

'মুসলমানদের সকলের রক্ত সমান এবং তাদের আদনা ব্যক্তিও তাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রদানের চেষ্টা করতে পারে।'

আর উক্ত হাদীসে ادناهم এর অর্থ সংখ্যায় আদনা। অর্থাৎ, একজন মাত্র। তাছাড়া এই কারণে যে, সে

শক্তিবলের অধিকারী এবং যুদ্ধে সক্ষম। সুতরাং সে যখন তাকে নিরাপত্তা দিল তখন তা কার্যকরী হবে এবং তা তার থেকে অন্যস্থান তথা অন্য মুসলমানের দিকেও স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু যদি তাতে মুসলমানের অকল্যাণ থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। কেননা, শাসক যদি নিরাপত্তা প্রদান করেন অতঃপর তা ভঙ্গ করার প্রয়োজনীয়তা দেখেন তবে তা ভঙ্গ করতে পারেন। তেমনি এই একজন মুসলমানের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টিও যদি অন্য মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর অনুমান করা হয় তাহলে তা ভঙ্গ করা যাবে।

قوله : وَ بَطَلَ اَمَانَ ذِمِّيٍّ الخ : আর জিম্মির নিরাপত্তা প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা, সে মুসলমানের উপর কর্তৃত্বকারী হতে পারে না। অথবা তার ক্ষেত্রে তুহমতের সম্ভাবনা রয়েছে। অনুরূপভাবে কোন বন্দি বা তাদের এলাকায় গমনকারী কোন ব্যবসায়ীর অধিকার নেই, কোন হরবীকে নিরাপত্তা দেয়ার। কেননা, তারা উভয় তাদের কর্তৃত্বধীনে অসহায়। তাই তারা ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। অথচ যাদের থেকে ভয়ভিতি প্রকাশ হওয়া সহীহ তাদেরই নিরাপত্তা প্রদান করা কার্যকর হয়ে থাকে। অথবা উক্ত বন্দি বা ব্যবসায়ীকে তারা জোর করে তাদের নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে। যাতে মুসলমানের কল্যাণ নেই কিংবা তাদের নিরাপত্তা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হলে তারা তো সুযোগ পেলেই বন্দিদের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিয়ে নিতে পারে। তদ্রূপ যদি কোন হরবী মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে ইসলামী রাষ্ট্রে না আসা পর্যন্ত তার নিরাপত্তার কার্যকারিতা হাসিল হবে না।

قوله : وَ عَبْدٍ مَحْجُوْرٍ الخ : বাধাগ্রস্থ দাসের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মত। কিন্তু যদি মনিব তাকে লড়াই করার অনুমতি প্রদান করে থাকে, তাহলে ভিন্ন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে عبد محجور এর নিরাপত্তা প্রদান করা বৈধ। ইহা ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এরও মতামত। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সাথে আর এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর দলীল : হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস اَمَانُ الْعَبْدِ اَمَانٌ। দাসের নিরাপত্তা প্রদানও নিরাপত্তা। তাছাড়া সে তো শক্তি বলে বলিয়ান মুসলমান, সুতরাং তার ঈমান এবং শক্তিবল তাকে নিরাপত্তা দানের অনুমতি দিয়েছে। ঈমানের শর্ত এজন্য সে জিহাদ একটি ইবাদত তা ঈমান ছাড়া কার্যকর হয় না। আর শক্তি বলের শর্ত এজন্য যে তা কাফেরের জন্য ভয়-ভীতিকারী। সুতরাং যেহেতু তার মাঝে এ দুটোই বিদ্যমান তাই তার নিরাপত্তা দানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতের দলীল হল : যেহেতু সে লড়াই করা থেকে মনিব কর্তৃক বাধাগ্রস্ত তাই কাফেররা তাকে ভয় পাবে না। সুতরাং নিরাপত্তা প্রদান যথা স্থানের সাথে যুক্ত হয়নি। কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের থেকে কাফেরদের ভয় বিদ্যমান আছে, তাই তার থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। তাছাড়া নিরাপত্তা দেয়া তা জিহাদেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং যেহেতু তার জিহাদ করার অনুমতি নেই তাই সে নিরাপত্তা দেয়ারও অনুমতি পেল না। আর তা হল মনিবের অধিকারে এমন হস্তক্ষেপ যা তার বিষয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়।

بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

পরিচ্ছেদ : গণিমতের মাল এবং তার বন্টন

مَا فَتَحَ الْإِمَامُ عَنْوَةً قَسَّمَ بَيْنَنَا أَو أَقَرَّ أَهْلَهَا وَوَضَعَ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ وَقَتَلَ الْأَسْرَى أَو اسْتَرَقَّ أَو تَرَكَهُمْ أَحْرَارًا ذِمَّةً لَنَا وَحَرُمَ رَدُّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَالْفِدَاءُ وَالْمَنُّ وَعَقْرُ مَوَاشٍ شَقَّ إِخْرَاجُهَا فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَقِسْمَةُ غَنِيمَةٍ فِي دَارِهِمْ لَا الْإِيدَاعُ وَبَيْعُهَا قَبْلَهَا وَشَرِكَ الرِّدْءُ وَالْمَدَدُ فِيهَا لَا لِلسُّوقِيِّ بِلَا قِتَالٍ وَلَا مَنْ مَاتَ فِيهَا وَبَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا يُوَرَّثُ نَصِيبُهُ وَيَنْتَفِعُ فِيهَا بِعَلَفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَسِلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ وَلَا يَبِيعُهَا وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لَا وَمَا فَضَلَ رُدَّ إِلَى الْغَنِيمَةِ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَطِفْلَهُ وَكُلَّ مَالٍ مَعَهُ أَو كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ أَو ذِمِّيٍّ دُونَ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَزَوْجَتِهِ وَحَمْلِهَا وَعَقَارِهِ وَعَبْدِهِ الْمُقَاتِلِ -

অনুবাদ : শাসক যা বল প্রয়োগে জয় করবেন (হয়তো) তিনি তা আমাদের মাঝে বন্টন করে দেবেন (অর্থাৎ ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দেবেন) অথবা উক্ত দেশবাসীকে স্ব স্ব স্থানে বহাল রাখবেন এবং তাদের উপর জিযয়া ও খেরাজ নির্ধারণ করবেন। আর বন্দীদেরকে হত্যা করবেন কিংবা দাস বানাবেন। অথবা আমাদের (মুসলমানদের) জিম্মি হিসাবে তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে পারেন। তবে দারুল হরবে ফেরত দেয়া, (বন্দিদের বিনিময়ে) মুক্তিপণ গ্রহণ করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা (নিষিদ্ধ)। দারুল হরব থেকে বের করতে কষ্টকর পশুর হাত পা কর্তন করা নিষিদ্ধ, তবে তা জবেহ করে জ্বলিয়ে দিবে। দারুল হরবে গণিমতের মাল বন্টন করা নিষিদ্ধ। তবে আমানত রাখা নিষিদ্ধ নয়। আর তা বন্টনের পূর্বে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। সাহায্য-সহযোগিতাকারী গণিমতের মালের অংশীদার হবে, তবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ ছাড়া সাধারণ ব্যবসায়ী এবং দারুল হরবে মৃত্যুবরণকারী মুজাহিদ গণিমতের হিসসা পাবে না। আর আমাদের দেশে নিয়ে আসার পর (মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করলে) তার হিসসার উত্তরাধিকারী হবে। আর দারুল হরবে থাকা অবস্থায় বন্টনের পূর্বে মুজাহিদ প্রয়োজনীয় ঘাস, খাবার, লাকড়ী, হাতিয়ার, তেল থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর তা বিক্রি করা যাবে না এবং দারুল হরব থেকে বের হওয়ার পর তা ব্যবহার করা যাবে না। আর (দারুল হরবে ব্যবহারের পর) যা উদ্বৃত্ত হবে তা গণিমতের মালে ফিরিয়ে দেবে। আর দারুল হরববাসী থেকে যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে নিজে এবং তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও তার সাথের সম্পূর্ণ সম্পদ এবং কোন মুসলমান বা জিম্মির নিকট আমানত রাখা সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে তার প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, স্ত্রী, যানবাহন এবং তার যুদ্ধা গোলাম নিরাপত্তা লাভ করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

الغنائم ইহা غنيمة এর বহুবচন। অনুরূপ مغنم এর বহুবচন مغانم শব্দ দুটি একই অর্থবোধক। যার অর্থ যুদ্ধলব্ধ মাল।

المعجم الوسيط গ্রন্থে বলা হয়েছে— مَايُؤْخَذُ مِنَ الْمُحَارِبِيْنَ فِى الْحَرْبِ قَهْرًا - যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধাদের থেকে যা বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হয়। মোটকথা, যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত মুশরিক বাহিনী থেকে অর্জিত মালকে ফিকহ শাস্ত্রে غنيمة বা مغنم বলে। গনিমতের এক পঞ্চমাংশে ইমামের এখতিয়ার থাকে। আর বাকী চার অংশ মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে।

فى - غنيمة - نفل এর মধ্যকার পার্থক্য : শত্রুপক্ষ থেকে আপোষে যা অর্জিত হয় তাকে فى বলা হয়। আর যা বল প্রয়োগে অর্জন হয় তাকে غنيمة বলা হয়। আর মুজাহিদদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য বা কোন মুজাহিদের বীরত্বের উপর শাসক যা উপহার হিসাবে দিয়ে থাকেন তাকে نفل বলা হয়। আবার কোন কোন ফকীহের মতে শব্দগুলোর মধ্য কোন পার্থক্য নেই। কেননা, পবিত্র কুরআনে শব্দগুলোকে সমার্থবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله : مَا فَتَحَ الْإِمَامُ عَنْوَةً الخ : মুসলিম শাসক যদি কোন কাফেরের এলাকাকে যুদ্ধ চালিয়ে বলপূর্বকভাবে জয় করেন, তাহলে এক্ষেত্রে শাসকের ইচ্ছাধিকার আছে তিনি তা চাইলে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে দীনের পারেন, আর তা হাদীস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন নবী করীম (সা.) খায়বার বিজয়ের পর খায়বারের ভূমি সৈনিকদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে সে এলাকাবাসীকে সেখানে বহাল রাখতে পারেন এবং তাদের উপর জিযয়া ও খেরাজ ধার্য করে দিতে পারেন। যেমন ইরাক বিজয়ের পর হযরত উমর (রাযি.) ইরাকের অধিবাসীদরকে নিজ নিজ স্থানে বহাল রেখেছিলেন এবং তিনি তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া থেকে অস্বীকৃতি জানালেন। আর তেলাওয়াত করলেন :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

আর বললেন যে, আল্লাহ জিযয়া ও খেরাজের মধ্যে তোমাদের ভবিষ্যত বংশধরকে অংশী করেছেন। যদি তোমরা একে গনিমত হিসাবে বন্টন করে ফেল, তবে তো তোমাদের পরবর্তীদের জন্য কোন কিছু বাকি থাকবে না। আর কোন কোন ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি মুজাহিদদের প্রয়োজন থাকে তবে তা বন্টন করে দেয়া হবে। আর যদি প্রয়োজন থাকে না তাহলে তা পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চয় হিসাবে রেখে দেয়া হবে। আর বহাল রাখার অর্থ হল তাদেরকে স্থাবর সম্পত্তিতে বহাল রাখা হবে। পক্ষান্তরে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেগুলো তাদেরকে ফেরত দানের মাধ্যমে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। স্থাবর সম্পত্তি তাদেরকে দেয়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। কেননা, তারা তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে জমিতে কাজ করবে। আর খরচা থেকেও মুসলমান রক্ষা পেয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে যারা আসবে তারা এর সুফল ভোগ করবে। আর খেরাজের পরিমাণ যদিও কম কিন্তু তা পর্যায়ক্রমে বা পরবর্তী পরিমাণে অধিক।

قوله : وَ قَتَلَ الْأَسْرٰى الخ : যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে শাসকের এখতিয়ার রয়েছে। চাইলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবে। কেননা, নবী করীম (সা.) বনী কুরায়যার যুদ্ধাদেরকে হত্যা করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন ইবনুল খাতালকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে তাকে হত্যা করার দ্বারা আল্লাহদ্রোহীর মূলোৎপাটন করা হয়। আবার শাসক চাইলে তাদেরকে দাসও বানাতে পারেন। কেননা, তাতে মুসলমানদের উপকার রয়েছে এবং এ দ্বারা তাদের দুষ্কৃতিকারীতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার চাইলে শাসক তাদেরকে মুসলমানের জিম্মি বানিয়ে স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন। কেননা, হযরত উমর (রাযি.) এরূপ করেছেন।

قوله : وَ حَرَم رَدُّهم الخ : আর যুদ্ধ বন্দীদেরকে দারুল হরবে ফেরত প্রদান করা যাবে না। কেননা, তাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জনে সাহায্য করা হয়। কেননা, সে কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আবার যুদ্ধা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

قوله : وَالْفِدَاءُ وَالْمَنُّ الخ : আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপন গ্রহণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তাদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দিদেরকে গ্রহণ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এরও তাই মত। কেননা, এতে মুসলমান মুক্তি পাচ্ছে, যা তাদেরকে দাস বানানো বা হত্যা করে দেয়া থেকে উত্তম।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : এতে মূলত কাফেরদের সাহায্য করা হয়। কেননা, সেতো পরবর্তীতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধা হয়ে ফিরে আসবে। আর তার ক্ষতিরোধ করা মুসলিম বন্দীদেরকে উদ্ধার করার চেয়ে উত্তম। এমন কি আমাদের হাতে বন্দীদের কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তবুও তাকে মুসলমান বন্দীর মুক্তিপণ হিসাবে ফেরত দেয়া হবে না। কেননা, এতে মূলত কোন উপকার নেই, তবে সে যদি সম্মত হয় এবং তার ইসলাম রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় তবে তাকে ফেরত দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

আমাদের মতে কাফের বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ বশত তাদেরকে জিম্মি না বানিয়ে এমনিতে ছেড়ে দেয়া বা হত্যা না করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন। তিনি দলীল দেন, নবী করীম (সা.) বদরের বন্দীদের কারো কারো ব্যাপারে অনুগ্রহ করেছেন। আমাদের দলীল : আল্লাহ তা'আলার বাণী : اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ তোমরা মুশরিক যেথায় পাও হত্যা কর। তাছাড়া বন্দি করে নিয়ে আসার কারণে তাকে দাস বানানোর হক্ব সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কোন কারণ বা বিনিময় ছাড়া তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। আর আমাদের বর্ণিত আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বর্ণিত হাদীস রহিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ عَقْرُمَوَاشٍ الخ : দারুল হরব থেকে ফেরার সময় ইসলামী শাসকের সাথে গবাদী পশু থাকলে তিনি তা ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসবেন আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে উক্ত পশুদেরকে এমনিতে ছেড়ে আসবেন না। বরং তা জবেহ করে জ্বালিয়ে আসবেন। তবে উক্ত পশুদের হাত পা কর্তনকরে ফেলে আসবেন না ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উক্ত পশু ফেলে আসবেন। কেননা, নবী করীম (সা.) খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া বকরী জবাই করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের দলীল হল কোন সৎ ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পশু জবাই করা জায়েয আছে। আর এক্ষেত্রে শত্রুর শক্তি হ্রাস করার চেয়ে কল্যাণকর আর কি হতে পারে। সুতরাং তা শত্রুদের বাড়ী-ঘর নষ্ট করে দেয়ার মতই হল। অনুরূপভাবে শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রসমূহ যা ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসা কষ্টকর তাও জালিয়ে দিবে, আর যদি জালানো সম্ভব না হয় তবে তাদের অচোগরে মাটিতে পুতে ফেলবে।

قوله : وَ قِسْمَةُ الْغَنِيْمَةِ الخ : আর দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বে গণিমতের মালও বন্টন করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তা দারুল হরবে বন্টন করার মাঝে দোষ নেই। আমাদের ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মধ্যকার মতানৈক্যের কারণ হল আমাদের মতে গণিমতের মাল দারুল ইসলামের সিমানায় আসার পর তা সংরক্ষিত হয় এবং তাতে মুজাহিদদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, কাফেরদের থেকে ছিনিয়ে আনার সাথে সাথেই মালিকানা সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনি বলেন, মুবাহ মালের ক্ষেত্রে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া মালিকানার কারণ। আর দখল দ্বারা উদ্দেশ্য মালে কব্জা সম্পন্ন হওয়া। আর তা তো দারুল হরবে সংঘটিত হয়ে যায়। আমাদের দলিল : নবী করীম (সা.) গনিমতের মাল দারুল হরবে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। যা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, তা বন্টন করাও নিষেধ। কেননা, বন্টনও এক পর্যায়ের বিক্রয়। তাছাড়া এ বস্তুতে দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হল রক্ষা ও স্থানান্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়া। অথচ তা দারুল হরবে পূর্ণরূপে সম্ভবপর নয়। কেননা তাদের পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা রয়েছে। তবে হা যদি গনিমতের মাল বহন করে আনার বাহন না থাকে বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তিনি আমানত হিসাবে যোদ্ধাদের

মাঝে তা বন্টন করে দিতে পারেন। দারুল ইসলামে এসে তা একত্রিত করে নিয়ম মাফিক তা বন্টন করে দিবেন। অর্থাৎ গনিমতের মালে যদি বাহন থাকে তবে উক্ত বাহন গনিমতের মাল বহন করবেন। কেননা, সবই মুসলমানদের সম্পদ। আর যদি বায়তুল মালে বাহন থাকে তবে তাতে বহন করাবেন, আর যদি গনিমতের মালে বা বায়তুল মালে বাহন না থাকে তবে সিয়ারে কবীর গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী মুজাহিদদের বাহনে আরোহণ করানোর জন্য বাধ্য করা হবে। আর সিয়ারে ছগীরের বর্ণনা অনুযায়ী মুজাহিদদের বাহনে আরোহণ করানোর ব্যাপারে বাধ্য করানো যাবে না আর অনুরূপভাবে দারুল হরবে থাকা কালীন মালে গনিমত বিক্রি করা যাবে না। কেননা, তাতে এখনো মালিকানা সাব্যস্ত হয় নাই।

قوله : وَ شَرِكَ الرِّدْءُ وَالمدء الخ : বাহিনীতে মূল লড়াইকারী এবং তাদের সাহায্যকারী দল এবং গনিমতের মাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পূর্বে সাহায্যকারী দল সেথায় গিয়ে পৌঁছলে তারা গনিমতের মালে হিসসা পাবে। এক্ষেত্রে মূল নীতি হল আমাদের মতে যুদ্ধের নিয়তে সিমান্ত এলাকা পাড়ি দিলেই সে গনিমতের মালে হিসসা পাবে। তখন এমন কি যদি সেখানে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে যায় বা অন্য কোন কারণে যুদ্ধের মাঠে অবতীর্ণ হতে নাও পারে তবুও সে হিসসা পাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে যুদ্ধে উপস্থিত থাকা শর্ত, তাই যারা পরবর্তীতে সাহায্যের জন্য আসল তারা যদি যুদ্ধে শরীক না হয় তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তারা গনিমতের মালের হিসসা পাবে না। আর আমাদের মতে যেহেতু এ মালে এখনো কারো মালিকানা অর্জিত হয়নি, তাই সাহায্যকারী দল দারুল হরবে পৌঁছার দরুন তারাও মুজাহিদীনের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কিন্তু আমাদের মতে যারা মুজাহিদদের জন্য বাজার বসাবে তাদের কোন হিসসা নেই। তবে হা যদি তারা জিহাদে শরীক হয় তবে তা ভিন্ন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর দু' মতের এক মত হল তারা গনিমতের মালে হিসসা পাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ গনিমত তাদের জন্য যারা যুদ্ধমাঠে হাজির হয়। তাছাড়া লোক সংখ্যা বৃদ্ধির দরুন তারাও গুণগতভাবে যুদ্ধে শামিল ছিল বলে গণ্য করা হবে।

আমাদের দলীল : গনিমতের মাল পেতে হলে লড়াই এর উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে তা অবিদ্যমান। তবে হা তাদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। সরাসরি যদি তাদের থেকে জিহাদ পাওয়া যায়। আর আলোচ্য হাদীসের জবাব হচ্ছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া। সুতরাং দর্শক বা বাজারীরা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قوله : وَلَا مَنْ مَاتَ فِيْهَا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, দারুল হরবে থাকাকালীন সময়ে সে মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করবে গনিমতে তার কোন হিসসা নেই। আর যদি দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর বন্টনের পূর্বে কোন মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তিনি গনিমতের হিসসা প্রাপ্ত হবেন। যা তার উত্তরাধিকারীগণ বন্টন করে নিবেন। কেননা, মিরাস জারী হওয়ার জন্য মালিকানা আবশ্যকীয়। সুতরাং দারুল হরবে মৃত্যুর কারণে সে গণিমতের মালিক হয়নি বিধায় সে গনিমতের হিসসা পাবে না। আর দারুল ইসলামে নিয়ে আসার দরুন সে উক্ত মালে মালিক হল বিধায় এ গনিমতের মালে উক্তরাধিকারী চলবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি গনিমতের মাল সুনিশ্চিতভাবে মুসলমানদের হাতে পৌঁছে যায় আর তার পর মুজাহিদদের মৃত্যু হয় তবে সে উক্ত গণিমতের মালে হিসসা পাবে এবং তাতে ওয়ারাসাতি চলবে। (কারণ, পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।)

قوله : وَ يَنْتَفِعُ فِيْهَا الخ : আর দারুল হরবে থাকা অবস্থায় বন্টনের পূর্বে মুজাহিদ প্রয়োজনীয় ঘাস, খাবার, লাকড়ী, হাতিয়ার, তৈল, থেকে উপকৃত হতে পারবে। কেননা, খায়বারে প্রাপ্ত খাদ্য-দ্রব্যের ব্যাপারে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন : كُلُوْهَا وَاعْلِفُوْهَا وَلَاتَحْمِلُوْهَا 'এগুলো তোমরা খেতে পারো, পশুকে খাওয়াতে পারো কিন্তু বহন করে নিয়ে যাবে না।' তাছাড়া এগুলো ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর প্রয়োজনের প্রমাণ হল তার দারুল হরবে উপস্থিতি। কেননা, মুজাহিদ দারুল হরবে অবস্থানকালে সাধারণত তার সাথে করে নিজের খাবার, পশুর খাবার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যায় না। অথবা অনেক সময় রসদ বিচ্ছিন্নতা হতে পারে।

তাই আমরা মূল প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ব্যবহারের মূল বৈধতার হুকুমের উপর বিদ্যমান থাকব।

তবে হ্যা এসবের কোন কিছু সে বিক্রয় করতে পারবে না। কেননা, বিক্রি করা তা মালিকানার উপর নির্ভরশীল। আর আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, দারুল হরবে থাকাকালীন অবস্থায় এসব গনিমতের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। একান্ত যদি কেহ তা বিক্রি করে বসে তবে তার মূল্য মূল গনিমতের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কেননা, ইহা সবার হক্ক আর যখন মুজাহিদগণ দারুল হরবের সীমানা পেরিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসবে তখন তাদের কাছে অতিরিক্ত গনিমতের খাদ্যদ্রব্য বা অন্য যা কিছু আছে তা সব ফিরত জমা দিতে হবে। দারুল ইসলামে প্রবেশের পর তা ব্যবহার করার বৈধতা নেই। কেননা, এখন এ মালে সকল মুজাহিদ মালিক। তাই তো দারুল ইসলামে প্রবেশের পরই যদি কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করেন তবে তিনি উক্ত মালের মালিক হবেন এবং তার এ অংশে উত্তরাধিকারী চলবে। তাছাড়া দারুল হরবে তা ব্যবহার করার বৈধতা দেয়া হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিতে। কিন্তু এখন আর সেই প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান নেই। তাই তা মালে গনিমতে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি তা বন্টনকৃত হয়ে থাকে তাহলে দারুল ইসলামে প্রবেশের পর উক্ত ব্যক্তি দরিদ্র হলে সে নিজে তা ব্যবহার করবে। আর সে সচ্ছল হলে তা অন্য দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করে দিবে। কেননা, যেহেতু তা বন্টনকৃত তাই তা মুজাহিদদের মধ্যে ফেরত প্রদান করা দুঃসাধ্য। আর যদি দারুল ইসলামে সংরক্ষণ করার পর ব্যবহার করে থাকে এবং অবস্থা এমন যে এখনো মালে গণিমত বন্টিত হয়নি। তাহলে তার মূল্য ফেরত দিবে। কিন্তু যদি তা বন্টিত হয়ে থাকে তাহলে সচ্ছল ব্যক্তি তার মূল্য সদকা করে দেবে। আর অসচ্ছল ব্যক্তি তা নিজেই ভোগ করে ফেলবে। তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

قوله : وَ مَنْ اَسْلَمَ مِنْهُمْ الخ : যদি দারুল হরবে কোন হরবী ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার ইসলাম গ্রহণ করায় তার নিজেকে সে নিরাপদ করে নিল। কেননা, ইসলাম দাসত্বের পরিপন্থী এবং তার ছোট ছোট সন্তানাদীদেরকে নিরাপদ করে নিল। কেননা তারা তার অনুগামী হবে। এবং মুসলমান হিসাবে গণ্যহবে। আর তার সে সমস্ত সম্পদ যা তার হাতে মওজুদ আছে তাও সে নিরাপদ করে নিল। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مَالٍ فَهُوَ لَهٗ (যে কোন মাল নিয়ে ইসলামগ্রহণ করবে সে মাল তার বলে গণ্য হবে) তাছাড়া এমালে তার কব্জা বিজয়ীদের বিজয়গত কব্জা থেকে অগ্রগণ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে সে যদি কোন জিম্মি বা মুসলমানের কাছে আমানত হিসাবে মাল রাখে তবে সে মালও নিরাপদ রেখেছেন। কেননা, তা তো বৈধ ও সম্মানজনক হস্তে হয়েছে। আর আমানত রক্ষাকারীর হস্ত তারই হস্ত বলে গণ্য হবে। আর তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে না। কেননা, সে সাবালক হওয়ায় তার পিতার অনুগামী হয়নি। বরং তার কুফরীর কারণে সে অন্যান্য কাফেরদের সাথে মিশে গেল, সুতরাং অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তার ব্যাপারেও সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অনুরূপভাবে তার স্ত্রী কাফের হলে সেও সাবালক ছেলের ন্যায় তার স্বামীর অনুগামী হবে না। তবে তার গর্ভস্থ সন্তানের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আমাদের মতে তার গর্ভস্থ সন্তান গনিমতরূপেই বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ভূমিষ্ঠ সন্তানের ন্যায় সে তার পিতার অনুগামী হয়ে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর আমাদের মতে সে তার মায়ের অংশ। সুতরাং তার দাসত্বের কারণে সেও দাস হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে তার গোলামের মধ্যে যারা লড়াই করেছে তারা গনিমতের মাল হবে। কেননা, তারা মনিবের বিরুদ্ধাচারনের জন্য মনিবের মালিকানা থেকে বের হয়ে গেল। এবং তারা দারুল হরবের অন্যান্য বাসিন্দাদের মত হয়ে গেল। আর তার স্থাবর সম্পত্তি দারুল হরবের জয়লাভের দরুন মুসলমানদের মালে গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সেটা তারই থাকবে। কেননা, তাতে তার কব্জা রয়েছে। সুতরাং তা অস্থাবর সম্পদের ন্যায় হল। আমাদের দলীল হল, উক্ত সম্পদ দেশের অধিবাসীদের জন্য শাসকের কব্জায় রয়েছে। কেননা, তা দারুল হরবের সমগ্র ভূসম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তাই তা প্রকৃতপক্ষে তার কব্জায় নয়।

فصل

অনুচ্ছেদ

لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلَوْ له فَرَسَانِ وَالْبَرَاذِينُ كَالْعِتَاقِ لَا الرَّاحِلَةُ
وَالْبَغْلُ وَالْعِبْرَةُ لِلْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ وَلِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ
وَالذِّمِّيِّ الرَّضْخُ لَا السَّهْمُ وَالْخُمُسُ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُدِّمَ ذَوُو
الْقُرْبَى الْفُقَرَاءُ منهم عليهم وَلَا حَقَّ لِأَغْنِيَائِهِمْ وَذِكْرُاللهِ تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ وَسَهْمُ
النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَقَطَ بِمَوْتِهِ كَالصَّفِيِّ وَإِنْ دَخَلَ جَمْعٌ ذَوُو مَنَعَةٍ دَارَهُمْ بِلَا
إِذْنٍ خُمِّسَ مَا أُخِذُوا وَإِلَّا لَا وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ بِقَوْلِهِ من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ
وَبِقَوْلِهِ لِلسَّرِيَّةِ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَيُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ مِنَ الْخُمُسِ
فَقَطْ وَالسَّلَبُ لِلْكُلِّ مِنْهَا إِنْ لَمْ يُنَفِّلْ وهو مَرْكَبُهُ وَثِيَابُهُ وَسِلَاحُهُ وما معه -

অনুবাদ : পদাতিকের জন্য এক হিসসা, আর অশ্বারোহীর জন্য দুই হিসসা যদিও তার দুটি ঘোড়া থাকে। আর আজমী ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া সমান। তবে খচ্চর ও উটের ক্ষেত্রে কোন অংশ নেই। আর অশ্বারোহী ও পদাতিক বিবেচ্য হবে, সীমান্ত অতিক্রম করা অবস্থায়। আর গোলাম, মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং জিম্মিদের জন্য দানস্বরূপ অল্প কিছু, তবে পূর্ণ হিসসা নয়। আর গনিমতের এক পঞ্চমাংশ ইয়াতিম, দারিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য। হুজুর (সা.)-এর নিকটাত্মীয় দরিদ্রদেরকে তাদের (উপরিউক্ত ত্রিবিদ প্রকারের) উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। আর তাদের মধ্যকার ধনীদের (একপঞ্চমাংশে) কোন প্রাপ্য নেই। আর আল্লাহর উল্লেখ কেবল বরকতের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর নবী করীম (সা.) এর হিসসা তার ইন্তিকালের কারণে রহিত হয়ে গেছে। আর শাসকের অনুমতি ছাড়া শক্তি-বল সম্পন্ন একটি জামাত দারুল হরবে ঢুকে পড়ে যা তারা হস্তগত করবে তা পঞ্চমাংশ করা হবে। নতুবা নয় (অর্থাৎ দু একজন ঢুকে কিছু হস্তগত করে তবে তা পঞ্চমাংশ করা হবে না) আর শাসকের অধিকার আছে (লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য) হিসসার অতিরিক্ত নফল ঘোষণা করা। তার একথার দ্বারা যে কোন শত্রুকে যে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত জাবতীয় জিনিস পত্র তারই হবে। অথবা কোন ক্ষুদ্র দলকে এ কথা বলা যে এক পঞ্চমাংশের পর তোমাদের জন্য চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলাম। আর দারুল ইসলামে (গনিমতের মাল) নিয়ে আসার পর শুধু এক পঞ্চাংশে নফল ঘোষণা করা যাবে। আর যদি শাসক অতিরিক্ত নফল ঘোষণা না করে থাকেন তবে সলব (নিহতের সম্পূর্ণ মাল-সামান) সকল মুজাহিদদের হবে।

আর সলব হল নিহতের বাহন, তার কাপড়, তার অস্ত্র এবং ঐ মাল যা তার সাথে পাওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لِلرَّجِلِ سَهْمٌ الخ : যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের সমস্ত সম্পদকে প্রথমত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে এবং শাসক এ থেকে তার এক ভাগ পৃথক করবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ আল্লাহর জন্য তার পঞ্চমাংশ এবং রাসূলের জন্য। অতঃপর পাচ ভাগের চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কেননা, নবী করীম (সা.) তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করেছেন। মুজাহিদদের মধ্যে পদাতিক যুদ্ধা পাবে এক হিসসা। আর অশ্বারোহী পাবে দু হিসসা। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অশ্বারোহী পাবে তিন হিসসা। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মত। তাদের দলীল হল, হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীস :

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةً وَ اَسْهَمَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا

'নবী করীম (সা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্বারোহী ব্যক্তির জন্য গনিমতের মালের তিনটি অংশ নির্ধারণ করেছেন আর পদাতিক যোদ্ধার জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন।'

তাছাড়া এ কারণে যে প্রাপক নির্ধারণ হয় তার কাজের উপর ভিত্তি করে, সুতরাং অশ্বারোহী যোদ্ধার কাজ তিনটি। যথা হামলা করা, প্রত্যাবর্তন ও অবিচল থাকা, আর পদাতিক যোদ্ধার কাজ হল একটি। তা হল অবিচল থাকা। এজন্য অশ্বারোহী ব্যক্তি তিন হিসসা আর পদাতিক যোদ্ধা এক হিসসা পাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল : হযরত ইবনে উমর (রাযি.) এর হাদীস :

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْطٰى لِلْفَّارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمًا

'নবী করীম (সা.) অশ্বারোহীদের জন্য দুই হিসসা এবং পদাতিকদের জন্য এক হিসসা দান করেছেন।'

তা ছাড়া আবু দাউদ শরীফের হাদীস :

قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَ
كَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَ خَمْسَ مِأَةٍ فِيْهِمْ ثَلَثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَ الرَّاجِلَ سَهْمًا -

'খায়বারের সম্পদ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। অতঃপর রাসূল (সা.) উহাকে আঠার ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং সৈন্যদের সংখ্যা ছিল পনের শত। তন্মধ্যে তিনশত অশ্বারোহী ছিলেন। সুতরাং অশ্বারোহীদেরকে দুভাগ দিয়েছিলেন এবং পদাতিকদেরকে এক ভাগ দিয়েছিলেন।'

তাছাড়া অশ্বারোহীর কাজ তিনটি নয় বরং দুটি তা হল, আক্রমণ ও প্রত্যাবর্তন একই কাজ। আর অবিচল অন্যটি তাই সে পদাতিক সৈন্যের দিগুণ হল। তাই গনিমত ও পদাতিকদের দ্বিগুণ হবে। তাছাড়া অশ্বারোহীর অনুকুলে দু'টি কারণ আছে তথা সে নিজে এবং তার ঘোড়া। পক্ষান্তরে পদাতিক শুধু একক। তাই অশ্বারোহী পাবে দুটি হিসসা আর পদাতিক পাবে একটি হিসসা। আর যদি অশ্বারোহীর সাথে দু'টি ঘোড়া থাকে তবুও সে এই দুই হিসসাই পাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, দুটি ঘোড়ার পৃথক পৃথক হিসসা করা হবে। কেননা, বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) দু'টি ঘোড়ার আলাদা হিসাব করেছেন।

আমাদের দলীল হল : হযরত বারা বিন আউস (রাযি.) দুটি ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সা.) তাকে একটি ঘোড়ার হিসসা দিয়ে ছিলেন। তাছাড়া এ কারণে যে সে তো এক সাথে দুটি ঘোড়া দিয়ে লড়েনি। তাই দুটি ঘোড়ার হিসসা পাবে না।

قوله : وَ الْبَرَاذِيْنُ كَالْعِتَاقِ الخ : আজমী ঘোড়া আর উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া সমান। কেননা, কুরআনে ভীতি সৃষ্টি করণ অশ্ব শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তাতে ঘোড়ার গুণাগুণ বর্ণনা করেননি। যেমন : وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ। আর অশ্বারোহী প্রস্তুত রাখবে। তা দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।

তাছাড়া আরবী ঘোড়ার যেমনি আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে তেমনি আজমী ঘোড়ারও আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং উভয়টি সমান। আর খচ্চর ও উটের জন্য কোন আলাদা হিসসা নেই।

قوله : وَ الْعِبْرَةُ لِلْفَارِسِ الخ : অশ্বারোহী এবং পদাতিক ধর্তব্য হবে দারুল হরবের সীমান্ত অতিক্রম করার অবস্থায়। অর্থাৎ, যারা দারুল হরবে প্রবেশ করবে অশ্ব নিয়ে তারা অশ্বারোহীর এবং যারা পদাতিকভাবে প্রবেশ করবে তারা পদাতিকের হিসসা প্রাপ্ত হবে। এমনকি যদি কোন পদাতিক দারুল হরবে প্রবেশের পর ঘোড়া ক্রয় করে এবং তা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবুও সে পদাতিকের হিসসাই পাবে। অনুরূপভাবে যে অশ্ব নিয়ে প্রবেশ করে অতঃপর তার অশ্ব অবস হয়ে যায় তবুও সে অশ্বারোহীর হিসসা প্রাপ্ত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন। অর্থাৎ, তার মতে ধর্তব্য হল যুদ্ধ শেষ হওয়ার অবস্থায়। অর্থাৎ, যুদ্ধ শেষ হওয়ার অবস্থায় যারা অশ্বারোহী হবে তারা অশ্বারোহীর হিসসা আর যারা পদাতিক হবে তারা পদাতিকের হিসসা প্রাপ্ত হবে। কেননা, গণিমতের হক্কদারী হল লড়াই ও বিজয়। সুতরাং যুদ্ধার সে সময়ের অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর দারুল হরবে প্রবেশের অবস্থা আর গৃহ থেকে বের হওয়ার অবস্থা সমান।

আমাদের দলীল : দারুল হরবে প্রবেশ, তাই যুদ্ধ। আর তখন থেকেই যুদ্ধের সূচনা ধরা হবে। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য। কেননা, তখন তো কাফির আর মুসলমানদের দুসারীর যুদ্ধ কিভাবে তা বের করা দুঃসাধ্য। সুতরাং সীমান্ত অতিক্রমকেই এর স্থলাভিষিক্ত করা হবে। কেননা, তা তো মূলত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ। তবে এ অতিক্রম যুদ্ধের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এখন যদি কেহ অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করে অতঃপর স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে পদাতিক যুদ্ধ করে তবে সেও অশ্বারোহীর হিসসা পাবে। পক্ষান্তরে যদি অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল হরবে প্রবেশ করে অশ্ব বিক্রি করে বসে বা ভাড়া খাটায় বা দান করে দেয় তবে ইমাম আবু হানিফা থেকে হাসান বিন যিয়াদ (রহ.)-এর বর্ণনায় অশ্বারোহী ছিল। আর জাহেরী রেওয়াত অনুযায়ী সে পদাতিক হিসসা পাবে। কেননা, তার পরবর্তী পদক্ষেপে প্রমাণ করে যে সে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করেনি। আর যদি সে লড়াই শেষ হওয়ার পর তা বিক্রি করে বা দান করে তাহলে সে অশ্বারোহীর হিসসা পাবে।

قوله : وَ لِلْمَمْلُوْكِ وَ الْمَرْأَةِ الخ : আর যুদ্ধে যে কোনভাবে যদি কোন মহিলা, গোলাম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা জিম্মি অংশ নেয় তাহলে তাদেরকে গনিমতের হিসসা দেওয়া হবে না। তবে শাসক তাদেরকে দান স্বরূপ কিছু দিতে পারেন। এখানে গ্রন্থকার (রহ.) الرضخ। শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা সামান্য কিছু দান করাকে বুঝানো হয়েছে যা গনিমতের এক হিসসা থেকেও কম হবে। কেননা, রাসূল (সা.) স্ত্রীলোক, দাস ও বালকদেরকে হিসসা দিতেন না। তবে তাদেরকে কিছু দান করতেন। অনুরূপভাবে যখন খায়বার যুদ্ধে ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে ইয়াহুদীর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তখন তাদেরকে তিনি গনিমতের মাল থেকে কোন কিছু দেন নাই। তাছাড়া জিহাদ হচ্ছে ইবাদত। আর জিম্মি ইবাদাত আদায়ের শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং সে সাধারণ মুজাহিদদের মত হিসসা পাবে না। আর স্ত্রীলোক ও বালক যুদ্ধ করতে অক্ষম। তাই তো তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। আর গোলাম তো মনিবের অধিনস্থ, তাই তাকে মনিব বাধা দিতে পারে। তবে হা তাদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শাসক এমনিতেই কিছু দান করতে পারেন।

قوله : وَ الْخُمُسُ لِلْيَتٰمٰى الخ : আর গনিমতের একপঞ্চমাংশ এতিম-দরিদ্র ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। আর হুজুর (সা.) এর নিকটাত্মীয় দরিদ্রদেরকে তাদের উপরিউক্ত ত্রিবিদ প্রকারের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। আর

তাদের মধ্যকার ধনীদের প্রদান করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর আত্মীয়বর্গের জন্য গনিমতের এক পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত। এক্ষেত্রে তাদের ধনী-দরিদ্র সমান হবে। একজন পুরুষের জন্য দুজন স্ত্রীলোকের পরিমাণ হিসাবে তা বন্টন করে দেয়া হবে। আর তা শুধু বনু হাশীম ও বনু মুত্তালিবের জন্য হবে, অন্যদের জন্য নয়। আর ধনী-দরিদ্র এর পার্থক্য না থাকার কারন হল আল্লাহ তা'আলা তার পার্থক্য ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। তা হল : وَلِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى الخ - বলেছেন।

আমাদের দলীল হল : চার খোলাফায়ে রাশেদীন (রাযি.) এক পঞ্চমাংশকে এ তিন প্রকারে ভাগ করেছেন। সুতরাং তাই অনুসরণীয়। তাছাড়া নবী করীম (সা.) বলেন :

يَا مَعْشَرَ بَنِى هَاشِمٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَرِهَ لَكُمْ غَسَالَةَ لِلنَّاسِ وَ اَوْسَاخَهُمْ وَ عَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ

'হে বনু হাশিম গোষ্ঠী, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের ময়লা ধোয়া পানি এবং তাদের আবর্জনা অপছন্দ করেছেন। এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।'

আর বিনিময় তো তাদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হতে পারে যাদের ক্ষেত্রে বিনিময়কৃত বস্তু সাব্যস্ত রয়েছে। আর তারা হলেন দরিদ্র। (উল্লেখ্য যে, নবী করীম [সা.] তাদেরকে দান করেছেন নবী করীম সা. এর প্রতি তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য।)

قوله : وَ ذِكْرُهُ تَعَالٰى لِلتَّبَرُّكِ الخ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ -

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গনিমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ যে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন সেটা শুধু তার নামের বরকত দিয়ে শুরু করার জন্য। আর নবী করীম (সা.) এর হিসসা তার ইন্তিকালের কারণে রহিত হয়ে গেছে।

নবী করীম (সা.) এর হিসসা এ জন্য নেই যে, তিনি তার রিসালতের কারণে এর হক্বদার হতেন। কিন্তু নবী করীম (সা.) এর তিরোহিতের পর যেহেতু আর কোন রাসূল নেই, তাই এ হিসসার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর নবী করীম (সা.) এর নিকটাত্মীয় হক্বদার হতেন তার জামানায় তাকে সাহায্য করার দরুন। আর তার ওফাতের পর তার হক্বদার হন দারিদ্রতার কারণে। আর ইজমা সংঘটিত হয়েছে তাদের ধনীদের ক্ষেত্রে হিসসা বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু দরিদ্রতা বর্ণিত তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে নবী করীম (সা.) এর হিসসা বন্ধ হয় নাই, বরং তার প্রাপক এখন মুসলিম শাসক। অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) এর ইন্তেকালের পর মুসলিম খলিফার দিকে তা প্রত্যাবর্তিত হবে। (আমাদের দলিল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) আর صفى এর বিশ্লেসনে আল্লামা শা'বী (রহ.) বলেন, নবী করীম (সা.) এর জন্য একটি হিসসা ছিল। তাকে সাফী নেওয়ার জন্য আহ্বান করা হতো। তিনি একটি দাস বা একটি ঘোড়া বা অন্য কিছু নিজের জন্য খুমুছ বন্টনের পূর্বে নিয়ে নিতেন।

قوله : وَ اِنْ دَخَلَ جَمْعٌ الخ : যদি মুসলিম শক্তিবল সমৃদ্ধ একটি দল শাসকের অনুমতি ভিন্ন কাফের রাষ্ট্রে হানা দিয়ে সম্পদ অর্জন করে তবে তা গনীমত হিসাবে গণ্য করা হবে। এবং তা থেকে পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। কেননা, শক্তি বলে বিজয়ের মাধ্যমে তা লাভ করা হয়েছে। তাছাড়া এ অবস্থায়ও শাসকের জন্য কর্তব্য তিনি তাদের সাহায্য করা। নতুবা মুসলমানদের শাক্তি কমে যাবে এবং তারা কাফেরের কাছে পরাজিত হবে। যা শুধু তাদের জন্য লজ্জাজনক নয়, বরং তা গোটা মুসলিম জাতীর জন্য লজ্জাজনক। আর যদি তারা এক দল না হয়ে দু একজন হয় তবে তাদের কাফের রাষ্ট্র থেকে সম্পদ অর্জনকে গণীমতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কেননা, গণীমত

হল যা শক্তিবান বিজয়ের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। তা ছিনতাই বা চুরির মাধ্যমে নয়। আর যদি একজন বা দুজন শাসকের অনুমতিক্রমে গিয়ে থাকে তাহলে তাদের মালে পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তা থেকে পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। কেননা, যখন শাসক তাদেরকে অনুমতি দিলেন তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে সাহায্য যুগিয়ে বিজয়ী করে আনতেন। তাই তারাও অর্থগতভাবে শক্তিবল সমপন্ন হল।

قوله : وَ لِلْإِمَامِ اَنْ يُنَفِّلَ الخ : ইমাম বা শাসক লড়াই চলা কালে যুদ্ধ করার জন্য মুজাহিদদের হিসসার অতিরিক্ত নফল বা পুরস্কার ঘোষণা করতে পারবেন। যেমন তিনি বললেন, যে কেউ শত্রুকে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় জিনিসপত্র তারই হবে। অথবা তিনি বললেন কোন ক্ষুদ্র দলকে, এক পঞ্চমাংশের পর তোমাদের জন্য চতুর্থাংশ নির্ধারণ করলাম। কেননা, এরূপ যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা শরীয়াতে সমর্থন করে। এমনকি তা পছন্দনীয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

'হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন।'

আর লড়াই এর মধ্যে শাসক কর্তৃক উদ্বুদ্ধ করণ উপর উল্লিখিত পন্থায় হতে পারে। তবে শাসকের কর্তব্য হলো যেন সম্পূর্ণ গনীমত পুরস্কার ঘোষণা করা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। কেননা, তাতে সকলের হক বাতিল হয়ে যায়। আর যদি একান্ত শাসক সম্পূর্ণ গনীমত পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে দেন তবে তা জায়েয। কেননা, এতে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার আছে। আর তাতে অন্য বড় ধরনের পরিকল্পনাও থাকতে পারে।

আর গণীমতের মাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর তাতে নফল ঘোষণা করা যাবে না। কেননা, তাতে সংরক্ষণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মুজাহিদদের হক সুদৃঢ় হয়ে গেল। তবে হা তিনি পঞ্চমাংশ ঘোষণা করতে পারেন। কেননা, পঞ্চমাংশে যুদ্ধাদের কোন হক নাই।

قوله : وَ السَّلَبُ لِلْكُلِّ الخ : নিহত কাফের থেকে প্রাপ্ত মাল সম্পূর্ণটা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুরুটা সকল মুজাহিদদের হক হিসাবে ধর্তব্য হবে। যদি শাসক এতে নফলের ঘোষণা না দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি হত্যাকারী গনীমতের হিসসা প্রাপকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে আর সামনাসামনি কাফিরকে হত্যা করে থাকে তবে তার থেকে প্রাপ্ত সমুদয় সম্পদ হত্যাকারীর হবে। কেননা, আবু কাতাদা (রাযি.) এর বর্ণিত হাদীসে হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র তারই হবে।

তাছাড়া একারণে যে মুজাহিদ কোন কাফেরকে সামনাসামনি হত্যা করলে তার দ্বারা যুদ্ধে বেশি উপকার হল। সুতরাং অন্যান্য মুজাহিদদের মধ্যে তার আলাদা মূল্যায়ন করা জরুরী। তাই তাকে ঐ নিহত ব্যক্তির সমুদয় জিনিস তাকে দেয়া হবে।

আমাদের দলীল : উক্ত ব্যক্তির সাথে জিনিসগুলো মুসলমান শক্তিবলে অর্জন করেছে। তাই তা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তা গনীমতের মত বন্টন করা হবে। যেমন নবী করীম (সা.) হাবীব বিন সালামাকে বলেছিলেন : لَيْسَ لَكَ مِنْ سَلَبِ قَتِيْلِكَ اِلَّا مَا طَابَتْ بِهٖ نَفْسُ اِمَامِكَ তোমার হাতে নিহিত ব্যক্তির লব্ধ মালের মধ্যে ততটুকুই তোমার জন্য বৈধ যাতে তোমার শাসকের সন্তুষ্টি রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর বর্ণিত হাদীস তা পুরস্কার ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর সলব দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিহত ব্যক্তির সাথের সরঞ্জামাদী। যেমন তার কাপড়, অস্ত্র, বাহন, তদ্রূপ বাহনে যুক্ত জিন ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদি। এমনকি তার বাহনে বা তার সাথে কুমরের থলিতে প্রাপ্ত অর্থ-কড়িও সালাবের অন্তর্ভুক্ত। তবে তার গোলামের সাথে অন্য বাহনে যা রয়েছে তা সালাব নয়।

بَابُ الْاِسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ

পরিচ্ছেদ : কাফেরদের আধিপত্য বিস্তার

سَبَى التُّرْكُ الرُّومَ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مَلَكُوهَا وَمَلَكْنَا ما نَجِدُهُ من ذلك أن غَلَبْنَا عليهم وَإِنْ غَلَبُوا على أَمْوَالِنَا وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا وَإِنْ غَلَبْنَا عليهم فَمَنْ وَجَدَ مِلْكَهُ قبل الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ مَجَّانًا وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ وَبِالثَّمَنِ لو اشْتَرَاهُ تَاجِرٌ منهم وَإِنْ فُقِأَ عَيْنَيهِ وَأَخَذَ أَرْشَهُ فَإِنْ تَكَرَّرَ الْأَسْرُ وَالشِّرَاءُ أَخَذَ الْأَوَّلَ من الثَّانِي بِثَمَنِهِ ثُمَّ الْقَدِيمَ بِالثَّمَنَيْنِ وَلَا يَمْلِكُونَ حُرَّنَا وَمُدَبَّرَنَا وَأُمَّ وَلَدِنَا وَمُكَاتَبَنَا وَنَمْلِكُ عليهم جَمِيعَ ذلك وَإِنْ نَدَّ اِلَيْهِم جَمَلٌ فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ وَإِنْ أَبَقَ إِلَيْهِمْ قِنٌّ لَا وَلَوْ أَبَقَ بِفَرَسٍ أو مَتَاعٍ فَاشْتَرَى رَجُلٌ كُلَّهُ منهم أَخَذَ الْعَبْدَ مَجَّانًا وَغَيْرَهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ ابْتَاعَ مُسْتَأْمِنٌ عَبْدًا مُؤْمِنًا وَأَدْخَلَهُ دَارَهُمْ أو أَمِنَ عَبْدٌ ثَمَّهُ فَجَاءَنَا أو ظَهَرْنَا عليهم عَتَقَ -

অনুবাদ : (যদি) তুর্কীরা রোমকদের বন্দী করে এবং তাদের সম্পদ অধিকার করে তবে তারা সেগুলোর মালিক হবে। আর আমরা যদি তাদের উপর বিজয়ী হই তবে উহা থেকে যা পাব আমরা তার মালিক হব। আর যদি তারা আমাদের সম্পদের উপর বিজয়ী হয় এবং তাদের দেশে স্থানান্তর পূর্বক সংরক্ষণ করে ফেলে তাহলে তারা সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর যদি আমরা (ঐ সম্পদে) তাদের উপর বিজয়ী হই, তবে বন্টনের পূর্বেই তার (পূর্ববর্তী) মালিক পেয়ে যায় তাহলে সে বিনামূলেই তা নিয়ে নিবে। আর বন্টনের পরে হলে (ইচ্ছা করলে) মূল্যের বিনিময়ে তা নিতে পারে। আর যদি কোন ব্যবসায়ী তাদের থেকে তা ক্রয় করে (এবং দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে প্রথম মালিক যদি চায় তবে) তার ক্রয় মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারে। যদিও গোলামের চক্ষু উপড়ানো হয় এবং ক্রয়কারী ব্যবসায়ী তার দিয়াত গ্রহণ করে থাকে। (অর্থাৎ গোলামের প্রথম মালিক তার ক্রয়মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারে, কিন্তু দিয়াতের অর্থ নিতে পারবে না।)

আর যদি বন্দী করণ ও ক্রয় করণ বারংবার হয় তা হলে প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে ক্রয় মূল্যে নিতে পারবেন। আর প্রাক্তন মালিক তাকে দ্বিগুণ ক্রয় মূল্যে ফেরত নিতে পারবেন। আর কাফেররা আমাদের স্বাধীনদের, আমাদের মুদাব্বারের, আমাদের উম্মেওয়ালাদের, আমাদের মুকাতাবের মালিক হতে পারবে না। কিন্তু আমরা তাদের প্রতিকুলে ঐসব কিছুর মালিক হব। আর যদি কোন উট পলায়ন করে তাদের নিকট চলে যায় (অর্থাৎ দারুল হরবে চলে যায়) এবং তারা তা ধরে ফেলে তাহলে তারা তার মালিক হবে। আর যদি কোন

গোলাম পলায়ন করে তাদের নিকট চলে যায় আর তারা তা ধরে ফেলে তবে তারা মালিক হবে না।

আর যদি গোলাম ঘোড়া ও মালামালসহ পালিয়ে যায়। অতঃপর কোন ব্যক্তি তা খরিদ করে (দারুল ইসলামে নিয়ে আসে) তাহলে মনিব গোলামকে বিনা মূল্যে নিয়ে নিবে আর অন্যান্য বস্তু সামগ্রী ক্রয় মূল্য দিয়ে নিতে পারবে।

আর যদি কোন নিরাপত্তা গ্রহণকারী (দারুল ইসলাম থেকে) কোন মুসলমান গোলাম ক্রয় করে দারুল হরবে নিয়ে যায় অথবা সেখানকার কোন গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের নিকট চলে আসে বা আমরা তাদের উপর জয় লাভ করি তবে সে আজাদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : سَبِىَ التُّرْكُ الرُّوْمَ الخ : তুর্কিরা যদি রোমকদের বন্দী করে এবং তাদের মাল নিয়ে নেয় তাহলে তারা তার মালিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, এক কাফির সম্প্রদায় অন্য কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী হলে বিজয়ীরা পরাজিতদেরকে বন্দী বা তাদের থেকে কোন প্রকার সম্পদ দখল করে তবে তারা তার মালিক হয়ে যাবে। কোন মোবাহ মালের উপর আধিপত্ত বিস্তার হয়েছে। অতঃপর আমরা যদি তুর্কিদের উপর বিজয়ী হই তাহলে আমরা তুর্কিদের থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য মালের সাথে রোমকদের যে সম্পদ তাদের কাছে আছে তারও আমরা মালিক হয়ে যাবো।

قوله : وَإِنْ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْوَالِنَا الخ : আল্লাহ না করুন। যদি তারা আমাদের সম্পদের উপর জয়ী হয়ে যায় এবং তা নিজেদের দেশে স্থানান্তর পূর্বক সংরক্ষণ করে ফেলে তাহলে তারা সেগুলোর মালিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তারা সেগুলোর মালিক হবে না। কেননা, উসুলে ফিকাহ গ্রন্থে রয়েছে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্যাবলী হতে বারণ করা বস্তুর মৌলিক কদর্যতাকে সাব্যস্ত করে থাকে। আর যা মৌলিকভাবে কদর্য তা দ্বারা শরীয়াতের কোন সিদ্ধান্তের সুবিধা হতে পারে না। আর এখানে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত দ্বারা মালিক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাথমিক অবস্থা তথা দারুল ইসলামের এবং সমাপ্তির অবস্থা তথা দারুল হরবে তাদের দখল নিষিদ্ধ।

আমাদের দলীল : আল্লাহ তা'আলা فى এর مصرف বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

'ঐ সকল দরিদ্র মুহাজিরগণের জন্য যারা তাদের ঘর বাড়ী ও সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছেন।'

আলোচ্য আয়াতে এমন সব সাহাবায়ে কেরামগণকে দরিদ্র বলা হয়েছে যারা মক্কাতে প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝা যায় যে, কাফেররা তাদের সম্পদ দখল করে মালিক হয়ে বসে আছে। আর সাহাবারা দরিদ্র হয়ে সদকা খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে পড়েছেন। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ তাদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। যেভাবে আমরা তাদের থেকে চিনিয়ে আনা মালের মালিক হই। আর তা একারণে যে, মোবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তা বান্দার প্রয়োজনের নিমিত্তে তা তার মালিকানার কারণ হবে। তবে হা দখলকৃত সম্পদ তাদের মালিকানায় ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না তারা তা দারুল ইসলাম থেকে দারুল হরবে স্থানান্তরীত করবে না। কেননা, দখল অর্থ হল এসম্পদের উপর বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পূর্ব ব্যবহারের সক্ষমতা হাসিল হওয়া। এখন মুসলমানগণ যদি কাফেরের হস্তে তাদের মাল পেয়ে থাকে আর অবস্থা এমন যে তা এখানে বন্টন করা হয়নি তাহলে সেগুলো বিনামূল্যে মুসলমান মালিকদের হয়ে যাবে। আর যদি বন্টনের পর মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহলে এখতিয়ার রয়েছে যদি পূর্বের

মালিক চায় তা নিতে তবে তার মূল্য পরিশোধ করে নেয়ার এখতিয়ার আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

وَاِنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَاِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِالْقِيْمَةِ

'যদি তুমি বন্টনের পূর্বে তা পেয়ে যাও তাহলে কোন বিনিময় ছাড়াই তা তোমার। আর যদি বন্টনের পরে পাও তাহলে মূল্যের বিনিময়ে তা তোমার।'

তাছাড়া পূর্বের মালিকের সম্মতি ছাড়াই তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রতি অনুগ্রহ ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে তার জন্য তা ফেরত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বন্টনের পর যার কাছ থেকে তা নিবে তার ক্ষতি রয়েছে। কেননা, তার ব্যক্তিমালিকানা হরণ করা হচ্ছে। সুতরাং সে তা তার মূল্য দিয়ে নিবে। যাতে উভয়ের কল্যাণের দিক বিবেচনা করা হয়। আর বন্টনের পূর্বে হলে তাতেও ক্ষতি রয়েছে, তবে তা সল্প।

قوله : وَبِالثَّمَنِ لَوْ اِشْتَرَاهُ الخ : যদি কোন ব্যবসায়ী দারুল হরবে গিয়ে তা ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। তাহলে ঐ জিনিসের প্রথম মালিক যদি চায় তবে ঐ জিনিসের খরিদ মূল্যে নিতে পারবে। আর চাইলে তা ছেড়েও দিতে পারে। কেননা, যদি মূল্য ছাড়া নিয়ে নেয় তাহলে যে খরিদ করল সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। আর যদি সে হরবী থেকে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে খরিদ করে থাকে, তাহলে ঐ দ্রব্যের সমমূল্য দিয়ে প্রথম মালিক তা নিতে পারবে। হুবহু ঐ দ্রব্য দিতে হবে না। আর যদি দারুর হরবের কেহ তা ঐ ব্যক্তিকে দানও করে থাকে তবুও প্রথম মালিক তা দান গ্রহীতার নিকট থেকে মূল্য দিয়ে নিতে হবে। কেননা, দান করার দরুন সে তা তার মালিকানায় দিয়ে দিল। সুতরাং অবশ্য মালিকানা বস্তু নিতে হলে তার বিনিময় দিতে হবে। আর যদি কোন গোলাম দারুল হরব থেকে কোন ব্যবসায়ী খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর কেহ ঐ গোলামের চক্ষু উপড়ে ফেলল এবং ব্যবসায়ী ক্রেতা তার থেকে দিয়াতও গ্রহণ করল। অতঃপর দারুল ইসলামের প্রথম মালিক তা নিতে চাইলো, তাহলে সে হারবী থেকে খরিদ মূল্যে উক্ত গোলাম নিতে পারবে। কিন্তু দিয়াতের অর্থ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে না। কেননা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে গোলামের মালিকানা সিদ্ধ। কেননা সে দিয়াত গ্রহণের সময় এ গোলামের পূর্ণ মালিক ছিল। তাই ক্ষতিপূরণ লাভ করাটা তার মালিকানাতেই সংঘটিত হয়েছে। তাই তা পূর্বের মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে না। আর সৃষ্ট খুতের দরুন হরবী থেকে ক্রয় করা মূল্য থেকেওহ্রাস হবে না। কেননা, গুনের বিনিময়ে মূল্যের কোন অংশহ্রাস সাব্যস্ত হয় না।

قوله : فَاِنْ تَكَرَّرَ الشِّرَاءَ الخ : আর যদি হরবীরা আমদের কোন গোলাম বন্দী করে অতঃপর কোন ব্যবসায়ী তা খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, অতঃপর দ্বিতীয়বার তারা তাকে বন্দী করে এবং অন্য কোন ব্যবসায়ী তা খরিদ করে আনে, তাহলে প্রথম খরিদকারী দ্বিতীয় খরীদকারীর নিকট থেকে ক্রয়মূল্যে নিতে পারবে। কিন্তু সর্বপ্রথম মালিক তা দ্বিতীয় খরীদকারীর নিকট থেকে বা প্রথম খরিদকারীর নিকট থেকে দ্বিতীয় খরিদ কারীর ক্রয় করা মূল্যে নিতে পারবে না। বরং মালিক যদি তাকে নিতে হয় তবে দ্বিগুণ মূল্যে নিতে হবে। কেননা, প্রথম ক্রেতার প্রতিকুলে ঐ গোলামের দুটি মূল্য সাব্যস্ত হয়েছে। তাই সে এ মূল্যের বিনিময়ে নিতে পারবে। তদ্রূপ যদি দ্বিতীয় বার যার কাছ থেকে উক্ত গোলামকে বন্দী করা হয়েছে তথা প্রথম ক্রেতার উপস্থিতিতে সর্ব প্রাক্তন মালিক তা নিতে পারবে না। কেননা, এক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা তা নেয়ার অধিক হকদার। কেননা, তার মালিকানা থেকেই দ্বিতীয়বার তারা তাকে বন্দী করেছে।

قوله : وَلَا يَمْلِكُوْنَ حُرَّنَا الخ : হরবীরা আমাদের উপর বিজয়ী হলে ও আমাদের স্বাধীনের, আমাদের মুদাব্বার গোলামের, আমাদের উম্মে ওয়ালাদের, আমাদের মুকাতাবের মালিক হতে পারবে না। অর্থাৎ, বর্ণিত

ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে দাসত্বগুণ হারবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু আমরা যদি তাদের উপর বিজয়ী হই তবে তাদের স্বাধীন ও বর্ণিত গোলামদেরও আমরা মালিক হব। কেননা, মালিকানার কারণ মালিকানা লাভের পরই শুধু মালিকানা কার্যকর হতে পারে। আর মুবাহ মালই হচ্ছে মালিকানা লাভের পাত্র। আর স্বাধীন ব্যক্তি নিজস্ব সত্তাগতভাবেই নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন।

আর উল্লিখিত গোলামদের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তাই তারাও মুবাহ মালের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কাফেরদের উপর আমারা বিজয়ী হলে তাদের ও তাদের মালের মালিক হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদাতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য বস্তুকে মানুষের তাবেদার বানিয়েছেন।

আর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর ইবাদাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তারা মানুষের পদমর্যাদা থেকে বহিস্কৃত এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো মালিকানাধীনে পরিণত হয়েছে। এখন তাদের স্বাধীনতা জীব-জন্তুর স্বাধীনতার সমান। চাই তারা আমাদের উদারতা ও দয়ায় বেঁচে থাকুক বা নিজের শক্তিতে আত্মরক্ষা করে বাচুক। আমরা যদি তাদের উপর বিজয়ী হই আর দয়া করে জীবিত রাখি, তবে তারা জিম্মি হিসেবে জীবন ধারণ করবে। আর যদি আমরা তাদের সাথে সন্ধি করি তবে তারা বাহ্যিক স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাছাড়া অন্যান্য সকলের এবং তাদের মালামালের আমরা মালিক হব।

قوله : وَإِنْ نَدَّ إِلَيْهِمْ جَمَلٌ الخ : আর যদি উট আমাদের দারুল ইসলাম থেকে পলায়ন করে দারুল হরবে চলে যায় আর তারা তা পাকড়াও করে বসে, তবে সে উট তাদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, বোবা প্রাণী যা তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। যা দারুল ইসলাম থেকে বের হওয়ার প্রকাশ পায়। সুতরাং তার উপর তাদের দখল সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন গোলাম পালিয়ে দারুল হরবে চলে যায় আর তারা তাকে ধরে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তারা তার মালিক হবে না।

কিন্তু সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তারা তার মালিক হয়ে যাবে। কেননা, গোলামের মধ্যে নিরাপত্তার গুণটি হচ্ছে মালিকের অধিকারের ভিত্তিতে। আর দারুল হরবে প্রবেশের ও তাদের হাতে পাকড়াও হওয়ার দরুন মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে নিরাপত্তার গুণটি রহিত হয়ে গেল। তাই তো তারা যদি দারুল ইসলাম থেকে কোন গোলামকে বন্দী করে নিয়ে আসে তবে তার মালিক হয়ে যায়। তদ্রূপ আলোচিত মাসআলায়ও কাফেররা উক্ত গোলামের মালিক হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : আমাদের দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে তার নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ হয়েছে। কেননা, দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় তার উপর মনিবের নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন তার নিজের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত ছিল।

যাতে মনিবের অনুকুলে তার থেকে উপকার লাভের সক্ষমতা থাকে আর এখন মনিবের মালিকানা বিদ্যমান নাই। তাই সে তার নিজের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পাবে। তাই সে এখন থেকে তার নিজস্ব সত্তাগতভাবেই নিরাপত্তা গুণ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই তাকে কেহ দাসত্বের আওতায় আনতে পারবে না। এজন্য হরবী তার মালিক হবে না। সুতরাং যখন হরবী তার মালিক হল না এজন্য প্রাক্তন মনিব তাকে বিনা মূল্যে নিতে পারবে। উল্লিখিত মতানৈক্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত মাসআলাটির সমাধান হবে। তা হল যদি কোন গোলাম ঘোড়া ও অন্যান্য মাল নিয়ে তাদের কাছে পালিয়ে যায়। অতঃপর তাদের থেকে তা কেহ খরিদ করে নিয়ে আসে তাহলে ঘোড়া ও মাল প্রাক্তন মালিক তার খরিদমূল্য পরিশোধ করে নিতে পারবে। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে।

পক্ষান্তরে গোলামের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, তা বিনামূল্যে প্রাক্তন মনিব নিতে পারবে। কেননা, তাতে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অন্য বস্তু সামগ্রীর

ন্যায় গোলামেরও মূল্য পরিশোধ করে নিতে পারবে। কেননা তাদের মতে গোলামের উপর হরবির মালিকানা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং ক্রেতা তার কাছ থেকে খরিদ করার দরুন মালিকানা স্থানান্তরিত হয়ে ক্রেতার মাঝে এসেছে। তাই তা ক্রেতার মালিকানাভুক্ত বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত এজন্য তা নিতে চাইলে অবশ্যই তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

قوله : وَ اِنْ اِبْتَاعَ مُسْتَامِنٌ الخ : যদি হরবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং কোন মুসলমান গোলাম ক্রয় করে তার দেশে নিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উক্ত গোলাম স্বাধীন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.)-এর মতে উক্ত গোলাম স্বাধীন হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত পন্থায় তাকে মুক্ত করা অপরিহার্য ছিল। অর্থাৎ কাজীর জন্য উচিত হল তিনি তাকে তার দেশে নিয়ে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করবেন এবং তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। যদি সে তা গ্রহণ না করে তবে কাজী তাকে বিক্রি করে তার মূল্য কাফের নিরাপত্তাশীল ব্যক্তিকে দিয়ে দিবেন। অধিকন্তু সে যদি যে কোনভাবেই তা নিয়ে চলে যায় তবে উক্ত গোলাম তার হাতে গোলামরূপেই অবশিষ্ট থাকবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : মুসলমানকে কাফেরের লাঞ্ছনা থেকে অবশ্যই মুক্ত করা অপরিহার্য। সুতরাং তার নিরাপত্তার গুণ রহিত হওয়ার বিষয়টি দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের ভিন্নতার সাথে সংশ্লিষ্টত করা হবে। তাই দারুল হরবে নিয়ে যাওয়ার কারণে উক্ত গোলামের নিরাপত্তা গুণ রহিত হয়ে যাবে। উক্ত কাফির থেকে। তাই সে তার নিরাপত্তার অধিকারী হয়ে যাবে এবং স্বাধীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি হরবী গোলাম দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের দারুল ইসলামে চলে আসে বা আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করি তাহলে উক্ত গোলামগণও স্বাধীন হয়ে যাবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, তায়েফ থেকে একদল গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে নবী করীম (সা.) এর নিকট চলে আসেন। অতঃপর নবী করীম (সা.) তাদের আজাদ হওয়ার ফায়সালা দিয়ে বললেন, এরা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাদকৃত। তাছাড়া এ কারণে যে তারা মালিকানা বিচ্ছিন্ন করে নিজেদেরকে সংরক্ষণ করে ফেলেছে বা আমাদের বিজয়ের দরুন আমাদের কাছে আসার কারণে নিজেকে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছে। তাই তাকে আজাদীর হুকুম লাগানো ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নেই।

بَابُ الْمُسْتَامِنِ

পরিচ্ছেদ : নিরাপত্তা অর্জনকারী

دخل تَاجِرُنَا ثَمَّهُ حرم تعرُّضه لِشَيْءٍ منهم فَلَو أَخْرَجَ شيء مَلَكَهُ مِلْكًا مَحظُورًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ أَدَّانَهُ حَرْبِيٌّ أَو أَدَّانَ حَرْبِيًّا أَو غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَخَرَجَ إِلَيْنَا لم يُقْضَ بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ لو كَانَا حَرْبِيَيْنِ وَفَعَلَا ذلك ثُمَّ اسْتَأْمَنَا وَإِنْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ قضى بِالدَّيْنِ بَيْنَهُمَا لَا بِالْغَصْبِ مُسْلِمَانِ مُسْتَأْمَنَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ تَجِبُ الدِيَةُ في مَالِهِ وَالْكَفَّارَةُ في الْخَطَأِ وَلَا شَيْءَ في الْأَسِيرَيْنِ سِوَى الْكَفَّارَةِ في الْخَطَأِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ مُسْلِمًا أَسْلَمَ ثَمَّهُ -

অনুবাদ : আমাদের কোন ব্যবসায়ী দারুল হরবে প্রবেশ করলে তার জন্য তাদের কোন মালে হস্তক্ষেপ করা অবৈধ। যদি নিরাপত্তা অর্জনকারী (বিশ্বাসভঙ্গ করে) কোন জিনিস নিয়ে আসে তাহলে সে নিষিদ্ধ পন্থায় তার মালিকানা লাভ করবে। সুতরাং সে তা সদকা করে দেবে। আর যদি নিরাপত্তা অর্জনকারী ব্যক্তি থেকে কোন হরবী বা সে কোন হরবী থেকে ঋণ গ্রহণ করে অথবা তাদের পরস্পরের কেহ অন্যজন থেকে মাল ছিনতাই করে এবং দু'জন আমাদের দেশে চলে আসে। তাহলে একজনের অনুকূলে অপর জনের প্রতিকূলে কোন কিছুর ফায়সালা দেয়া হবে না। অনুরূপ হুকুম যদি দুই হরবী এরূপ কিছু করার পর নিরাপত্তা গ্রহণ করে দরুল ইসলামে আগমন করোর যদি উভয়ে মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে ঋণের ব্যাপারে তো উভয়ের মাঝে ফায়সালা দেয়া হবে। কিন্তু ছিনতাই সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া হবে না। আর দুই নিরাপত্তা অর্জনকারী মুসলমান (দারুল হরবে) একজন তার অপর সাথীকে হত্যা করে তাহলে তার (হত্যাকারীর) মাল থেকে দিয়াত ওয়াজিব হবে।

আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে আর দুই বন্দীর ক্ষেত্রে কোন জিনিস আবশ্যক হয় না। (অর্থাৎ, এক বন্দী অপর বন্দীকে হত্যা করলে দিয়াত ওয়াজিব হবে না) তবে অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা আবশ্যক হওয়া ভিন্ন, যেমন কোন মুসলমান সেখানে ইসলাম গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা (তাহলে হত্যাকারীর উপর দিয়াত আসবে না, তবে ভুলে হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা আসবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : دَخَلَ تَاجِرُنَا ثَمَّهُ الخ : যদি কোন মুসলমান ব্যবসায়ী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে ব্যবসার জন্য গমন করে তাহলে তার জন্য জায়েয নয় তাদের সম্পদে বা প্রাণে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা। কেননা তার নিরাপত্তা অর্জন করাই প্রমাণ করে যে সে তাদের মালে বা প্রাণে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারাও তার মালে বা প্রাণে হস্তক্ষেপ করবে না। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের দায় গ্রহণ করার নামই হল নিরাপত্তা গ্রহণ করা। সুতরাং

নিরাপত্তা গ্রহণের পর এসব বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বাসঘাতকতা হবে।

আর বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম। আর যদি তাদের শাসক বা তার নির্দেশিত কেহ নিরাপত্তা অর্জিত ব্যক্তির মালামাল লুট করে বা তাকে নির্যাতন করে। অতঃপর মুসলমান নিরাপত্তা অর্জনকারী তাদের মালে বা জানে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে তবে তা বিশ্বাসঘাতকতা হবে না।

কেননা, এক্ষেত্রে তারাই প্রথম চুক্তিভঙ্গ করেছে। কিন্তু তাদের হাতে মুসলিম বন্দিত্ব বিষয়টি ভিন্ন কেননা, তার সাথে তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি নেই। তাই সে যদি তাদের মালে বা জানে হস্তক্ষেপ করে তবে সে বিশ্বাসঘাতক হবে না। এমনকি যদি সে বন্দি থেকে মুক্তির পর তা করে তবুও সে বিশ্বাসঘাতক হবে। কেননা, তার সাথে তাদের দায় গ্রহণের কোন চুক্তি নেই।

قوله : فَلَوْ اَخْرَاجَ شَيْئًا الخ : আর যদি কোন নিরাপত্তা লাভকারী মুসলিম হরবীদের থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে কোন মাল ছিনিয়ে নিয়ে আসে তবে সে নিষিদ্ধ পন্থায় তার মালিকানা লাভ করবে। কেননা, মুবাহ মালের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাস ঘাতকতার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তাই তাকে সদকা করে দেয়ার হুকুম দেয়া হবে।

قوله : فَاِنْ اَدَانَهُ حَرْبِىٌّ الخ : যদি কোন নিরাপত্তা অর্জিত মুসলমান হরবির কাছ থেকে বা হরবী নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা তাদের একজন অপরজনের মাল গছব বা ছিনতাই করে অতঃপর উভয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসে এবং বিষয়টি নিয়ে বিচারকের দারস্থ হয় তবে একজনের অনুকুলে এবং অপরজনের প্রতিকুলে কোন ফায়সালা দেয়া হবে না। ঋনের বিষয়টি একারণে যে ফায়সালা জারী করার ক্ষমতা হাসিল হওয়ার উপর নির্ভর করে। অথচ ঋণ আদান-প্রদানের সময় কারো উপর ক্ষমতা ছিল না এবং ফায়সালা জারী করার সময় নিরাপত্তাধারী হরবির উপরও ক্ষমতা নেই।

কেননা সে তো তার বিগত দিনের কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান পালন করবে বলে নিরাপত্তা গ্রহণ করে নাই বরং দারুল ইসলামে থাকা কালিন ইসলামের বিধান পালন করবে বলে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে গছব এর ক্ষেত্রে দখল ও নিয়ন্ত্রণ লাভের পর সেটা গছবকারীর মালিকানাধীন হয়ে গেছে। কেননা, এ গছব মুবাহ মালের মধ্যে হয়েছে।

আর অনুরূপ হুকুম হবে যদি দু হরবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, অর্থাৎ একজন ঋণগ্রস্থ বা গছবকারী হয় আর দারুল ইসলামে এসে তার বিচারের দাবি করে তাহলে কাজী একজনের অনুকুলে এবং অপর জনের প্রতিকুলে ফায়সালা করতে পারবে না।

আর যদি উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে আসে, আর অবস্থা এমন যে একজন ঋণগ্রস্থ অপর জনের বা একজন অন্যজনের মালের মধ্যে গছবকারী হয়। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে উভয়ের মধ্যে ঋণের ফায়সালা প্রদান করা হবে। কিন্তু গছবের ফায়সালা দেয়া হবে না।

ঋণের ক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়া হবে এজন্য যে তাতো উভয় জনের সম্মতিতে সংঘটিত হয়েছে। তাই তা সিদ্ধান্তরূপে গণ্য করা হবে। আবার উভয়ের ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ফায়সালা প্রদানের ক্ষেত্রে আর কোনরূপ অস্পষ্টতা বাকী থাকেনি। কিন্তু গছবের ক্ষেত্রে ফায়সালা প্রদান না করার কারণ হল বস্তুটি গছবের সময় মুবাহ হওয়ায় গছবকারীর জন্য মালিকানা জারী হয়ে গেছে। আর হারবীর মালিকানায় কোন দোষ নেই। যাতে ফেরত দিতে হবে।

قوله : مُسْلِمَانِ مُسْتَامِنَانِ الخ : যদি দুজন মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং একজন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যজনকে হত্যা করে ফেলে তাহলে হত্যাকারীর মাল থেকে দিয়াত পরিশোধ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে তথা ভুলে হত্যা করে তাহলে তার উপর কাফফারা আবশ্যক হবে।

দিয়াত আবশ্যক হওয়ার কারণ হল : দারুল ইসলামে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে সাব্যস্ত নিরাপত্তাগুণ দারুল হরবে নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক সাময়িক অবস্থানের দ্বারা রহিত হয় না। তবে হা এক্ষেত্রে কিছাছ ওয়াজিব হবে না। কেননা, দারুল হরবে মুসলমানের শক্তিবল প্রয়োগ করে তা কার্যকর করা সম্ভব নয়।

আর তার মাল থেকে দিয়াত আবশ্যক হওয়ার কারণ হল শরীয়াতে ইচ্ছাকৃত হত্যার দায় আকেলাগণের উপর প্রদান করেনি। আর যদি সে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে তবে কাফফারা আবশ্যক হওয়ার কারণ হল কোরআনে পাকে বর্ণিত : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 'কেউ যদি কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে একটি মুমিন দাস আযাদ করবে।' উক্ত আয়াতে ভুলক্রমে হত্যাকে দারুল ইসলামের শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়নি। তাই তার হুকুম ব্যাপক থাকবে, যা দারুল ইসলামে বা দারুল হরবের ভুলক্রমে হত্যাকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

قوله : وَلَا شَيْءَ فِي الْأَسِيرَيْنِ الخ : আর যদি দুজন বন্দী হয় অর্থাৎ একজন মুসলিম আর অপরজন কাফের এবং সে অবস্থায় একজন অপরজনকে হত্যা করে অথবা কোন নিরাপত্তা গ্রহণকারী মুসলমান দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী কোন মুসলমানকে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে কারো উপর কোন দিয়াত আবশ্যক হবে না। তবে ভুলক্রমে হত্যা করা হলে হত্যাকারী মুসলমানের উপর কাফফারা আবশ্যক হবে।

কেননা, বর্ণিত কোরআনের আয়াত স্থানগত শর্ত থেকে মুক্ত। আর দিয়াত আবশ্যক না হওয়ার কারণ হল বন্দিত্বের কারণে সে অসহায় হয়ে পড়েছে। তাই সে তাদের অনুবর্তী হয়ে গেল তাই তো তাদের মুকিম অবস্থায় সেও মুকিম। আর তাদের মুসাফির অবস্থায় সেও মুসাফির হয়ে যাবে।

সুতরাং সে যেহেতু তাদের অনুবর্তী হল তাই তার সংরক্ষণ সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেল। তদ্রূপভাবে এ মুসলমান যে দারুল ইসলামে আসতে পারেনি সেও সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়নি। তাই তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে ফায়সালা একই হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (রহ.)এর মতে বন্দীকৃত উভয়ের ব্যাপারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হত্যা করে থাকুক, দিয়াত আবশ্যক হবে। তাদের মতে তার বন্দীত্বের কারণে নিরাপত্তাগুণ বাতিল হয়নি।

فصل

অনুচ্ছেদ

لَا يُمَكَّنُ مُسْتَأْمَنٌ فِينَا سَنَةً وَقِيلَ له إِنْ أَقَمْتَ سَنَةً وُضِعَ عَلَيْكَ الْجِزْيَةُ فَإِنْ مَكَثَ سَنَةً فَهُوَ ذِمِّيٌّ فَلَمْ يَتْرُكْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ كَمَا لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ أَوْ نَكَحَتْ ذِمِّيًّا لَا عَكْسُهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ وَلَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ دَيْنٌ عَلَيْهِمَا حَلَّ دَمُهُ فَإِنْ أُسِرَ أَوْ ظَهَرَ عليهم فَقُتِلَ سَقَطَ دَيْنُهُ وَصَارَتْ وَدِيعَتُهُ فَيْئًا وَإِنْ قُتِلَ ولم يَظْهَرْ أَوْ مَاتَ فَقَرْضُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ جَاءَنَا حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ وَلَهُ زَوْجَةٌ ثَمَّهُ وَوَلَدٌ وَمَالٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ هُنَا ثُمَّ ظُهِرَ عليهم فَالْكُلُّ فَيْءٌ وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَنَا فَظُهِرَ عليهم فَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وما أَوْدَعَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَهُوَ له وَغَيْرُهُ فَيْءٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ حَرْبِيًّا جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَدِيَتُهُ على عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ وفي الْعَمْدِ الْقَتْلُ أَوْ الدِّيَةُ لَا الْعَفْوُ -

অনুবাদ : কোন হরবী নিরাপত্তা গ্রহণকারীকে আমাদের মধ্যে (তথা দারুল ইসলামে) পূর্ণ এক বছর থাকতে দেয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবে যে যদি তুমি এক বৎসর অবস্থান কর তবে তোমার উপর জিযয়া ধার্য হবে। আর যদি এক বৎসরের পরে অবস্থান করে তবে সে জিম্মি হয়ে যাবে। তখন তাকে দারুল হরবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। যেমন যদি তার উপর খেরাজ ধার্য করা হয়। অথবা কোন যিম্মি পুরুষকে বিবাহ করে (তবে সে যিম্মিয়াহ হয়ে যাবে) কিন্তু এর বিপরীত কার্যকর হবে না। (তা হল, যদি হরবী পুরুষ নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করে কোন যিম্মিয়া নারীকে বিবাহ করে তবে সে যিম্মি হবে না।) আর যদি নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি তার দারুল হরবে চলে যায়, আর মুসলমান বা জিম্মির নিকট তার আমানত বা ঋণ রেখে যায় তাহলে আমানতের বা ঋণের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তার রক্ত হালাল। আর যদি সে বন্দী হয় কিংবা আমরা দারুল হরবের উপর বিজয়ী হই এবং সে নিহত হয় তাহলে তার প্রাপ্য ঋণ রহিত হয়ে যাবে। আর গচ্ছিত আমানতও শত্রু পক্ষ থেকে আপোষে হস্তগত মালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর যদি সে নিহত হয় কিন্তু আমরা দারুল হরবে বিজয়ী না হই অথবা সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঋণ ও

আমানত তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। যদি কোন হরবী নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের কাছে আসে আর দারুল হরবে তার স্ত্রী সন্তান রয়েছে এবং কিছু মাল কোন মুসলমানের নিকট বা জিম্মির নিকট, কিংবা হরবীর নিকট থাকে। এমতাবস্থায় সে এখানে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর দারুল হরব বিজিত হল তাহলে ঐসব গণিমত হয়ে যাবে। যদি দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের নিকট আসে এবং দারুল হরব বিজিত হয় তাহলে তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান স্বাধীন গণ্য হবে। আর যা সে কোন মুসলমান বা জিম্মির কাছে আমানত রেখেছে তা তার জন্য হবে। অন্য কারো কাছে আমানত রাখলে তা গনিমত হয়ে যাবে। আর কেউ যদি যার ওয়ালী নেই এমন কোন মুসলমানকে হত্যা করে কিংবা নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক দারুল ইসলামে আগমন করার পর ইসলাম গ্রহণকারী কোন হরবীকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর আকিলাদের উপর শাসকের অনুকূলে দিয়াত আবশ্যক হবে। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা করার ক্ষেত্রে কেছাছ বা দিয়াত আবশ্যক হবে। তবে ক্ষমা নেই। (অর্থাৎ শাসকের ক্ষমা করার অধিকার নেই।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : لَا يُمَكَّنُ مُسْتَأْمَنٌ الخ : যদি কোন হরবী নিরাপত্তা নিয়ে আমদের দেশে আগমন করে তাহলে তাকে এক বৎসরের কম সময় অবস্থানের সুযোগ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে শাসক তাকে বলে দেবেন যদি তুমি এক বৎসর অবস্থান কর তাহলে তোমার উপর জিযয়া আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যে কোন কাফেরকে দারুল ইসলামে এক বৎসর বা ততোধিক সময়কালের জন্য বসবাসের অধিকার দেয়া হবে জিযয়া প্রদানপূর্বক কিংবা যিম্মি হিসাবে অথবা দাসত্ব হিসাবে। আর এমনিতেই দীর্ঘদিন থেকে পরে তার দেশে ফেরত যাওয়ার দ্বারা সে আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বা খবরাখবর পাচারকারী হয়ে যাবে। ফলে মুসলমানের অনেক অনেক ক্ষতি সাধিত হবে। তবে হা অল্প সময় অবস্থানের অনুমতি দেয়া যাবে। কেননা, তাও বন্ধ করে দিলে খাদ্য বা অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ী সামগ্রী আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং অল্প সময় ও বেশি সময় আমরা এক বৎসরকাল দ্বারা ধার্য করেছি। অর্থাৎ এক বৎসর থেকে কম তা অল্প সময়। আর এক বৎসর বা তার চেয়ে বেশি হল বেশি সময় বা দীর্ঘ দিন।

যদি সে বৎসর পূর্তির পূর্বেই তার দেশে চলে যেতে চায় তাহলে তাকে বাধা প্রদান করা হবে না। আর যদি সে এক বৎসর অবস্থান করে যেতে চায় তাহলে তাকে বাধা প্রদান করা হবে। কেননা, শাসকের ঘোষণার পর এক বৎসর অবস্থানের দরুন সে তার নিজের উপর জিযয়া আবশ্যক করেছে। তাই সে এখন থেকে জিম্মি হয়ে যাবে। তখন তাকে আর দারুল হরবে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না।

قوله : كَمَا لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ الخ : যেমনিভাবে যদি হরবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ পূর্বক কোন খেরাজী ভূমি ক্রয় করে এবং তার উপর খেরাজ আবশ্যক হয় অথবা কোন হরবী নারী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং কোন জিম্মিকে বিবাহ করে তাহলে উভয় অবস্থায় উক্ত নিরাপত্তা গ্রহণকারী যিম্মি হয়ে যাবে। খেরাজী ভূমি ক্রয় করার দরুন যিম্মি হয় এভাবে যে, ভূমির খেরাজ ব্যক্তির খেরাজ এর ন্যায়। আর যখন উক্ত হরবী ভূমির খেরাজ এর দায় গ্রহণ করল তখন সে উক্ত স্থানে বসবাসকারী হয়ে গেল যার দরুন সে যিম্মিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তবে হা শুধু ভূমি ক্রয় করা দ্বারা সে যিম্মি হবে না। কেননা, সে তো তা ব্যবসার জন্যও ক্রয় করতে পারে। আর যখন ভূমিতে জিযয়া আরোপ হবে তখন পরবর্তী বৎসরের জন্যও তার উপর খেরাজ আরোপিত হবে।

সুতরাং খেরাজ ধার্য করার সময় থেকে তার মেয়াদ বিবেচিত হবে। আর হারবী নারী যিম্মি বিবাহ করার দ্বারা সে স্বামীর অনুবর্তী হবে এবং স্বামীর অনুবর্তী হিসাবে সেও অবস্থানের দায় গ্রহণ করল। তাই সেও যিম্মিয়াহ

হয়ে যাবে। আর যদি কোন হারবী পুরুষ নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে কোন যিম্মিয়াকে বিবাহ করে তবে সে যিম্মি হবে না। কেননা, সে স্ত্রীর অনুবর্তী নয়; বরং যখন তার দেশে ফেরার সময় হবে তখন উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে চলে যেতে পারে। সুতরাং তার এ বিবাহ যিম্মি হওয়ার প্রমাণ নয়।

قوله : فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ الخ : আর যদি কোন হারবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, অতঃপর দারুল হরবে ফিরে যায়। কিন্তু মুসলমানের নিকট বা যিম্মির নিকট কোন আমানত বা ঋণ রেখে যায়। তাহলেও সম্পর্কের এই রেশটুকু থাকা সত্ত্বেও ফিরে যাওয়ার কারণে তাকে খুন হালাল হয়ে যাবে। কেননা, নিরাপত্তাধীন থাকা কালে আশ্রয়-চুক্তি বহাল থাকার কারণে তাকে হত্যা করা নিষেধ ছিল। নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আশ্রয়চুক্তি বাতিল হয়েছে এবং অন্যান্য হারবী কাফেরদেরকে হত্যা করা আমাদের জন্য যেমন বৈধ তাকে হত্যা করা তেমনি বৈধ হবে।

قوله : فَإِنْ أُسِرَ أَوْ ظُهِرَ الخ : আলোচিত ঐ হারবী যদি বন্দী হয় কিংবা আমরা দারুল হরবের উপর বিজয় লাভ করি এবং সে নিহত হয় তাহলে তার প্রাপ্য ঋণগুলো রহিত হয়ে যাবে। আর গচ্ছিত আমানত গনীমতের মাল হয়ে যাবে। কেননা, গচ্ছিত আমানতগুলো গত হয়ে তা গনীমতের মালরূপে গণ্য হবে। আর ঋণ রহিত হওয়ার কারণ হল ঋণের ক্ষেত্রে তার তাগাদা প্রদান নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হওয়াই প্রমাণ। অথচ তাগাদা প্রদানের অধিকার রহিত হয়ে গেছে আর যার হাতে ঋন রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ সাধন মুসলমানের নিয়ন্ত্রণ থেকে অগ্রগণ্য তাই তার সাথেই বিশিষ্ট হবে।

قوله : وَإِنْ قُتِلَ وَلَمْ يُظْهَرْ الخ : (আলোচিত মাসয়ালার খণ্ড বিশেষ) আর যদি সে নিহত হয় কিংবা মৃত্যু বরণ করে কিন্তু আমরা দারুল হরবের উপর বিজয় লাভ করতে পারিনি, তাহলে তার ঋণও আমানত তার উত্তরাধিকারীদের জন্য হবে। কেননা, তার দেহ সত্তা গণীমত হওয়ার যোগ্য হয়নি, তাই সম্পদ ও গনীমত হবে না। আর তা এজন্য যে, যেহেতু আমরা এখনও তার রাষ্ট্রে বিজয়ী হয়নি তাই তার মালে পূর্ণ নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে তার পূর্ণ মালিকানা বহাল আছে। সুতরাং এ মাল তাকে বা তার উত্তরাধিকারীকে ফিরত দিতে হবে।

قوله : وَإِنْ جَاءَنَا حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ الخ : যদি কোন হারবী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল ইসলামে আসে এমতাবস্থায় যে দারুল হরবে তার স্ত্রী ও সন্তানাদীগণ আছে এবং কিছু সম্পদ মুসলমানের কাছে আর কিছু যিম্মির কাছে আর কিছু হারবীর কাছে আমানত হিসাবে গচ্ছিত আছে। আর এ অবস্থায় উক্ত নিরাপত্তা প্রাপ্ত হরবী ইসলাম গ্রহণ করে আর অবস্থা এমন যে আমরা দারুল হরব বিজয় করে ফেলি তাহলে উক্ত নিরাপত্তা প্রাপ্ত নব মুসলমানের বর্ণিত সকল বিষয় গণীমতরূপে গণ্য হবে। কেননা, তার স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তার কোনরূপ অনুবর্তী নয়। তাই তারা অপরাপর হরবীর ন্যায় হরবী হিসাবে গণ্য হবে। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও গনীমতের মালরূপে গণ্য হওয়ার কারণ হল তারা পিতার অনুবর্তী হয়ে মুসলমান তখন গণ্য হবে যখন পিতার অভিভাকত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে। অথচ দু' দেশের দুরত্বের দরুন অভিভাবকত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে। অথচ দু' দেশের দূরত্বের দুরত্বের দরুন অভিভাবকত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়নি বিধায় তারা পিতার অনুবর্তী হবে না। তদ্রূপ দু' দেশের দরুন তার দেহ সত্ত্বার নিরাপত্তা লাভের কারণে তার সম্পদের নিরাপত্তা লাভ সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং বর্ণিত সব কিছু গণিমতরূপে গণ্য করা হবে।

قوله : فَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ فَجَاءَنَا الخ : আর যদি কোন হরবী দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে আসে আর তার অপ্রাপ্ত সন্তান দারুল হরবে থেকে যায় বা তার কিছু সম্পদ মুসলমানের কাছে বা যিম্মির কাছে আমানত হিসাবে গচ্ছিত থাকে। অতঃপর আমরা দারুল হরব বিজয় করি তাহলে তার অপ্রাপ্ত সন্তানেরা মুসলমান ও স্বাধীন হবে। আর তার আমানত যা মুসলমানের বা যিম্মির হাতে ছিল তা তাকে ফেরত দিতে হবে।

তাছাড়া তার অন্যান্য মালামাল যা দারুল হরবে পাওয়া যাবে সবই গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। অপ্রাপ্ত সন্তানের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সে যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন দেশের অভিন্নতার দরুন তারা তার অভিভাবকত্বে ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। সুতরাং তাই বিবেচনা করা হবে এবং তাদেরকে তাদের পিতার অনুগামী গণ্য করা হবে।

আর তার যে সম্পদ মুসলমান বা যিম্মির নিকট ছিল তা ফেরত পাওয়ার কারণ হল তা তো সম্মান জনক কব্জায় ছিল। সুতরাং তা তার নিজের কব্জায় থাকার মত হল।

قوله : وَ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَاءً الخ : যদি কেহ এমন কোন মুসলমানকে হত্যা করে যার কোন অভিভাবক নেই অথবা নিরাপত্তা গ্রহণ পূর্বক দারুল ইসলামে আগমন করার পর ইসলাম গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে আর তা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়। তাহলে হত্যাকারীর আকিলার উপর শাসকের অনুকুলে দিয়াত আবশক হবে।

আর হত্যাকারীর উপর কাফফারা আবশ্যক হবে। কেননা, এক্ষেত্রে একটি নিরাপত্তা সম্পন্ন প্রাণকে হত্যা করা হয়েছে। যা অন্যান্য নিরাপত্তা গুণে গুণান্বিত প্রাণের উপর কিয়াস করা হবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি তাদের কোন এক জনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে থাকে তাহলে শাসক চাইলে কিসাস হিসাবে তাকেও হত্যা করতে পারেন। অথবা দিয়াত নিতে পারেন শাসকের এ অধিকার ও তার অনুকুলে দিয়াত আবশ্যক হয় এজন্য যে উক্ত ব্যক্তির কোন অভিভাবক নেই। আর যার কোন অভিভাবক নেই স্বয়ং সুলতান বা শাসক তার অভিভাবক। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ যার কোন অভিভাবক নেই শাসকই হলেন তার অভিভাবক (আবু দাউদ) ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে মূল ওয়াজিব হচ্ছে কিসাস। কিন্তু দিয়াতের অবকাশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তা অধিক কল্যাণজনক। তাই অর্থের বিনিময়ে সমঝোতার অধিকার রয়েছে। কিন্তু শাসক তাকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকারী নন। কেননা, তার অভিভাবকত্ব অসম্পূর্ণ। কেননা, নিহত ব্যক্তির সাথে তার কোন রক্ত সম্পর্ক নেই।

আর ক্ষমা করার অধিকারী একমাত্র প্রকৃত অভিভাবকের। আর নিহত ব্যক্তির প্রকৃত অভিভাক হচ্ছে তার নিকটবর্তী রক্ত সম্পর্কিয় আত্মীয়। তাছাড়া তিনি সর্বসাধারণের অভিভাবক। এজন্য যে তিনি তাদের কল্যাণ সংরক্ষণ করবেন। কিন্তু ক্ষমা করার মধ্যে সর্বসাধারণের হক রহিত করা হয়। অথচ এতে কোন কল্যাণ নেই। তাই তার ক্ষমা করে দেয়ার কোন হক নেই।

بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ

পরিচ্ছেদ : উশর (এক দশমাংশ) খারাজ (ভূমি-কর) জিযয়া (নিরাপত্তা-কর) প্রসঙ্গে

أَرْضُ الْعَرَبِ وما أَسْلَمَ أَهْلُهُ أو فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِّمَ بين الْغَانِمِينَ عُشْرِيَّةً وَالسَّوَادُ وما فُتِحَ عَنْوَةً وَأُقِرَّ أَهْلُهُ عليه أو فُتِحَ صُلْحًا خَرَاجِيَّةٌ وَلَوْ أُحْيِيَ أَرْضًا مَوَاتًا يُعْتَبَرُ قُرْبُهُ وَالْبَصْرَةُ عُشْرِيَّةٌ وَخَرَاجُ جَرِيبٍ صَلُحَ لِلزِّرَاعَةِ صَاعٌ وَدِرْهَمٌ وفي جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وفي جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ الْمُتَّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَإِنْ لم تُطِقْ ما وُظِّفَ نُقِصَ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ وَلَا خَرَاجَ أن غَلَبَ على أَرْضِهِ الْمَاءُ أو انْقَطَعَ أو أَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا أو أَسْلَمَ أو اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضَ خَرَاجٍ يَجِبُ وَلَا عُشْرَ في خَارِجِ أَرْضِ الْخَرَاجِ -

অনুবাদ : আরবের জমি এবং ঐ জমি যে এলাকার লোক নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানগণ যে এলাকা জয় লাভ করেছে এবং গণীমত প্রাপকের মধ্যে বন্টিত জমিকে ওশরী ভূমি বলা হয়। আর ইরাকের ভূমি ও যা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা দখল করে অধিবাসীগণকে তথায় স্থায়ী বাসিন্দা করা হয়েছে এবং সন্ধির ভিত্তিতে যা জয় করা হয়েছে তাকে খেরাজী ভূমি বলা হয়। আর যদি অনাবাদী জমি আবাদ করে তবে তার নিকটবর্তী জমির হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আর বসরা উশরী জমি। আর ক্ষেত উপযোগী এক জারীব জমির খেরাজ হল এক সা (গম বা আটা) এবং এক দিরহাম। আর তরকারী উৎপাদিত এক জারীব জমির খেরাজ হল পাঁচ দিরহাম। আর নিরেট আঙ্গুর বা খেজুর বাগানের এক জারীব জমির খেরাজ হল দশ দিরহাম। আর যদি ভূমি ধার্যকৃত কর বহন করতে না পারে তাহলে হ্রাস করা হবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমে বৃদ্ধি করা যাবে না। আর যদি খেরাজী জমি পানিতে ডুবে যায় বা পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় কিংবা ক্ষেতে কোন দুর্যোগ দেখা দেয় (এবং ফসল নষ্ট করে ফেলে) তাহলে তাতে খেরাজ আসবে না। আর যদি ভূমির মালিক তা পতিত ফেলে রাখে (অথবা খেরাজী ভূমির) মালিক ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা কোন মুসলমান খেরাজী ভূমি খরিদ করে তাহলে তাতেও খেরাজ আবশ্যক। আর খেরাজী ভূমি উৎপন্ন ফসলে উশর নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে ইসলামী সরকারকে নির্দিষ্ট প্রদেয় অর্থ সম্পর্কে আলোকপাত করছেন। আর এ পদের অর্থ সম্পদকে ফিকহী পরিভাষায় وظيفه ও বলা হয়। সুতরাং অজিফা দুই প্রকার। ১।

ভূমি সম্পর্কিয় ২। অন্যান্য যেমন জিযয়া আর তার সাথে জমির কোন সম্পর্ক নেই। আর ভূমি সম্পর্কিয় অজিফা দু প্রকার। ১। উশরী, ২। খেরাজী। উশরী বলা হয় উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশকে। তা মূল ইবাদত আর তা মুসলমান ও বিশেষ এলাকার অধিবাসীদের জন্য নির্ধারিত। আর খেরাজী বলা হয় যা অমুসলমানের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্যই আরোপ করা হয়।

কিন্তু অনেক অবস্থায় তা মুসলমানদের উপরও খেরাজ ধার্য হয়ে যায়। আর খেরাজের পরিমাণ জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ধার্য হয়। আর খেরাজে কম বৃদ্ধি জমির ফসলের ভাল মন্দের উপর অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে।

قوله : اَرْضُ الْعَرَبِ الخ : সমগ্র আরব ভূমি উশরী ভূমি। কুদুরী গ্রন্থকার (রহ.) এর বর্ণনা মতে তার সিমানা হচ্ছে ওযায়ব থেকে নিয়ে ইয়ামানের হাজার অঞ্চলের শেষ সীমা পর্যন্ত তথা মাহরান অঞ্চল থেকে শামের সীমানা পর্যন্ত হচ্ছে আরব। আর উক্ত ভূমি উশরী হওয়ার কারণ হল নবী করীম (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীন আরব ভূমি থেকে খেরাজ গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া এ কারণে যে খেরাজ হচ্ছে গনীমত তুল্য। সুতরাং তা আরব দেশে সাব্যস্ত হবে না। যেমনি আরব দেশে দেহ সত্ত্বার কর সাব্যস্ত হয় না। কেননা, খেরাজ গ্রহণের শর্ত হল ঐ ভূমিতে কুফুরী অধিবাসীদেরকে তার কুফুর অবস্থায় বহাল রাখা। কিন্তু আরবের মধ্যে কোন কাফেরকে তার কুফরীর উপর বহাল রাখা হয় না। কেননা, আরবের কাফেরদের বেলায় হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা তরবারী তার মিমাংসা করবে।

তাই সমগ্র আরব ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ রাষ্ট্রিয় ট্রেজারিতে জমা দেয়া হবে।

আর উশর আবশ্যক হওয়ার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল, যে এলাকার অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য করেছে তাদের উপর উশর আবশ্যক হবে। কেননা, তাতে চাপ কম। তার কারণ তা উৎপাদিত ফসলের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর উশরের মধ্যে যেহেতু ইবাদাত সম্পৃক্ত তাই তাদের উপর আর্থিক দায় আরোপের সুচনাতেই উশর ধার্য করা উপযুক্ত। আর উশর আবশ্যক হওয়ার অন্য একটি ক্ষেত্র হচ্ছে এমন হরবী ভূমি যাতে মুসলিম মুজাহিদগণ বিজয়ী হয়ে তা (অর্থাৎ এলাকা) গনীমতের প্রাপকের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে। কেননা, যেহেতু তা বর্তমানে মুসলমানের দখলে তাই তাদের উপর ইবাদতের গুণ সম্পৃক্ত উশর ধার্য করা যুক্তিযুক্ত।

قوله : وَالسَّوَادُ الخ : আর سواد তথা স্থায়ী বাসিন্দা শস্য উৎপাদনকারী ইরাকী ভূমি এর উপর খেরাজ আবশ্যক আর তার সীমানা হল ওযায়ের থেকে আকাবায়ে হুলওয়ান প্রান্তে আর ছালাবা থেকে আবাদান দৈর্ঘে। সুতরাং উক্ত সীমা রেখার ভেতরকার সমগ্র ভূমি খেরাজী।

কেননা হযরত ওমর (রাযি.) ইরাক ভূমি জয় করার পর সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তাতে খেরাজ ধার্য করেছেন। তদ্রূপ হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) মিশর জয়ের পর তাতেও খেরাজ ধার্য করেছেন। তেমনি শামের উপর ও ছাহাবায়ে কেরামগণ একমত হয়েছিলেন খেরাজ ধার্য করার ব্যাপারে। অনুরূপভাবে যে সকল ভূমি মুসলিম শাসক বল প্রয়োগে জয় করেছেন এবং ভূমির অধিবাসীদেরকে তথায় বহাল রেখেছেন তাদের ভূমিতেও খেরাজ আবশ্যক হবে।

অনুরূপভাবে যে সকল ভূমি শাসক তাদের সাথে সন্ধির মাধ্যমে করতলগত করেছেন তাতেও খেরাজ আবশ্যক হবে। কেননা, এদের উপর আর্থিক দায় আরোপের সূচনা করা আবশ্যক আর তাদের ক্ষেত্রে খারাজ হল অধিকতর উপযুক্ত।

قوله : وَلَوْ اُحْيِيَ مَوَاتٌ الخ : যদি কেহ কোন পতিত ভূমি আবাদ করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে উক্ত ভূমির পার্শ্ববর্তী ভূমির সাথে বিবেচ্য হবে। সুতরাং যদি পার্শ্ববর্তী ভূমি খেরাজী হয় তাহলে খেরাজ আর যদি উশরী হয় তাহলে তাতে উশর আবশ্যক হবে। কেননা, কোন কিছুর পার্শ্বস্থকে তার হুকুমভুক্ত করা হয়ে থাকে।

যেমন বাড়ির পার্শ্ববর্তী তথা সংলগ্ন পতিত ভূমিকে বাড়ির পর্যায়ভুক্ত ধরা হয়। এমনকি (মালিকানা থাকা সত্ত্বেও) তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বাড়ীর মালিকের জন্য বৈধ। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে বসরার সমগ্র এলাকা হল উশরী যদিও কেয়াসের দাবী হল তা খেরাজী হওয়া কেননা তা খেরাজী ভূমির সন্নিকটে।

কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াস বর্জিত তার কারণ হল সাহাবায়ে কেরাম তাতে উশর ধার্য করেছেন। তাই তাদের ইজমার দরুন কিয়াস বর্জিত হল। আলোচ্য মাসআলার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, কূপ খননের মাধ্যমে বা ঝরনা উৎসারিত করার মাধ্যমে অথবা দজলা ফুরাতের পানি দ্বারা অথবা বড় নদীর পানী দ্বারা অথবা এমন পানি দ্বারা যার মালিক কোন মানুষ নয়, তা দ্বারা জমি আবাদ করা হয় তাহলে উক্ত জমির উপর উশর নির্ধারণ করা হবে। আর যদি অনারব আজমীদের খনন করা খালের পানি দ্বারা আবাদ করা হয় তাহলে তা খেরাজী ভূমি হবে। কেননা, ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পানিই হল প্রধান। সুতরাং তার বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া কোন মুসলমানের উপর প্রথমই খারাজ ধার্য করা ঠিক নয়। সুতরাং পানির দিকই বিবেচনা করা হবে।

قوله : وَ خَرَاجُ جَرِيْبٍ الخ : খেরাজ ধার্য করার ব্যাপারে হযরত উমর (রাযি.) কর্তৃক ইরাকবাসীদের উপর ধার্যকৃত খেরাজই ধর্তব্য। আর তা হল ক্ষেত উপযোগী এক জারীব জমির খেরাজ হল এক সা' গম বা আটা এবং এক দিরহাম। আর নিরেট আঙ্গুর বা খেজুরের বাগানের এক জারীব জমির খেরাজ হল দশ দিরহাম।

শরহে বেকায়া গ্রন্থকার (রহ.) এর বর্ণনা মতে এক জারীব হল ষাট গজ দৈর্ঘ্য ও ষাট গজ প্রস্থ সম্বলিত জায়গা।

খেরাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাযি.) এর বর্ণিত পদ্ধতিই আমাদের জন্য খেরাজ নির্ধারণের মাপকাঠি হবে। কেননা তিনি হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ (রাযি.)কে ইরাকের জমি পরিমাপের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আর এ ব্যাপারে হযরত হুযাইফা (রাযি.)কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। জরিপে জমির পরিমাণ হয়েছিল ছত্রিশ লক্ষ জারীব। সেই জমিতে হযরত উমর (রাযি.) সাহাবয়ে কেরামের উপস্থিতিতে খেরাজ ধার্য করেছিলেন। কোন সাহাবা এতে বিপরীত মত পোষণ করেননি।

সুতরাং তার উপর ইজমায়ে সাহাবা সংগঠিত হয়েছে। তা ছাড়া ভূমি ক্রয় এর মধ্যে ফসল এর বিবেচনায় তারতম্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা ফসল উৎপাদনের খরচে তারতম্য রয়েছে। যেমন খেজুর বা আঙ্গুর বাগানের খরচ সব চেয়ে কম। তাই তার উপর ধার্যকৃত খেরাজ সবচেয়ে বেশি। আর ক্ষেত-খামারে খরছ সব চেয়ে বেশি, তাই তার উপর ধার্যকৃত খেরাজ সবচেয়ে কম। আর তরিতরকারী উৎপন্ন জমিতে খরচ উভয়ের মধ্যবর্তী তাই তার উপর ধার্যকৃত খেরাজ মধ্যবর্তী।

আর উল্লিখিত ফসলাদি ভিন্ন অন্য কোন ধরনের ফসলে তথা জাফরান চাষের চা বাগ-বাগিচায় ইত্যাদির উপর খেরাজ ধার্য করা হবে অবস্থাভেদে। কেননা, এসব ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাযি.) কর্তৃক কোন কিছু ধার্যকৃত নেই। কিন্তু যেহেতু হযরত উমর (রাযি.) এর ধার্যকৃত খেরাজের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান তাই আমরা ফসলের উপর বিবেচনা করে তারতম্যপূর্ণ খেরাজ নির্ধারণ করব। আমাদের ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন, সাধ্যের চূড়ান্ত নির্ধারণ হচ্ছে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক। এর বেশি নয়।

قوله : وَاِنْ لَمْ تُطِقْ مَا وُظِّفَ الخ : আর হযরত উমর (রাযি.) এর বর্ণিত খেরাজের পরিমাণ যদি ভূমি বহন না করতে পারে তবে শাসক তা হ্রাস করতে পারবেন। উৎপন্ন ফসল যদি তুলনামূলক হারে কম হয় তবে তাতে সর্বসম্মতিক্রমে খেরাজের পরিমাণ কমানো যাবে। কেননা, হযরত উমর (রাযি.) হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ (রাযি.) ও হযরত হুযাইফা (রাযি.)কে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

لَعَلَّكُمَا حَمَلْتُمَا الْاَرْضَ مَا لَاتُطِيْقُ فَقَالَ لَا بَلْ حَمَلْنَاهَا مَا تُطِيْقُ وَ لَوْ زِدْنَاهَا لَاطَاقَتْ

'হয়ত তোমরা ভূমির উপর সাধ্যাতীত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ। তারা দুজন বলল, না; বরং আমরা জমি যা বহন করবে তাই ধার্য করেছি। এমনকি যদি আমরা আরো বৃদ্ধি করতাম তাহলে ভূমি তাও বহন করত।' সুতরাং আলোচ্য আছার থেকে হ্রাস করার বৈধতা প্রস্ফুটিত হয়।

قوله : وَلَا خَرَاجَ اِنْ غَلَبَ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) এখান থেকে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যার কারণে খেরাজ রহিত হয়ে যায়। সুতরাং তিনি বলেন, যদি খেরাজী ভূমিতে বন্যা দেখা দেয় এবং ফসল নষ্ট করে ফেলে অথবা পানী সংকটে ফসল বিরান হয়ে যায়, কিংবা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগে ফসল নষ্ট হয়ে পড়ে তাহলে তাতে খেরাজ ধার্য করা হবে না।

কেননা এসব কারণে ভূমির উপকার ব্যক্তি নিজেই প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং তার উপর কোন কিছু আবশ্যক করা উচিত নয়। তাছাড়া এসকল ক্ষতি ব্যক্তির নিজ থেকে নয়, বরং তার উপর আরোপিত। সুতরাং খেরাজের দায় তার উপর আবশ্যক করা হবে না। আর যদি ক্ষেত উৎপন্ন হওয়ার উপযোগী জমি ভূমিওয়ালা অলসতা বশত ফেলে রাখে তাহলে তার উপর খেরাজ আসবে। কেননা, ফসল উৎপন্ন করার সামর্থ্য তো বিদ্যমান। যা ভূমিওয়ালা নিজেই হাতছাড়া করেছেন।

মাশায়েখগণ বলেন, যদি কোন সমস্যা ছাড়া উচ্চ মানের চাষ পরিবর্তন করে নিম্নমানের চাষ করে তাহলে তার উপর উচ্চ হারের খেরাজই প্রযোজ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে অধিক লাভ জনক চাষ সে নিজেই ত্যাগ করেছে। তবে হা এ বিধান নিরেট নীতিগত। কিন্তু এর উপর ফাতওয়া প্রদান করা যাবে না। কেননা, অনেক জালিম শাসক তাতে সুযোগ মনে করে মানুষের উপর কষ্ট আরোপ করবে। অনুরূপভাবে যদি খেরাজী জমিওয়ালা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার থেকেও পূর্বের ন্যায় খেরাজ গ্রহণ করা হবে। কেননা, তাতে ভূমির দায় গ্রহণের দিক বিদ্যমান রয়েছে। তাই চলিত অবস্থা হিসাবে ভূমির দায় বহনের দিকটি বিবেচনা করা হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন মুসলমান খেরাজী ভূমি ক্রয় করে তবে তার কাছ থেকেও খেরাজ গ্রহণ করা হবে। কেননা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) খেরাজী জমি ক্রয় করেছেন এবং তারা খেরাজও প্রদান করেছেন।

সুতরাং তা মুসলমানের জন্য খেরাজী জমি ক্রয় ও তা থেকে খেরাজ প্রদান ও উসুল সবই হালাল প্রমাণিত হল।

قوله : وَلَاعُشْرَ فِى خَارِجِ اَرْضِ الْخَرَاجِ الخ : আর খেরাজী ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর উশর আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে খেরাজী ভূমিতে উৎপন্ন ফসলে উশর আবশ্যক হতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের মতে খেরাজ ও উশর আবশ্যক হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের মতে খেরাজ ও উশর এক ভূমিতে একত্র হতে পারে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এক সাথে একই ভূমিতে উশর ও খেরাজ আবশ্যক হতে পারে। তিনি বলেন, এ দুটি হচ্ছে ভিন্ন হক যা পৃথক পৃথক দুটি ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়েছে।

আমাদের দলিল নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন :

لَايَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَ خَرَاجٌ فِى اَرْضِ مُسْلِمٍ

'কোন মুসলমানের ভূমিতে খেরাজ ও উশর একত্র হবে না।' তাছাড়া কোন খলিফা এ দুটিকে একত্র করেননি। সুতরাং তা একত্র না করার উপর ইজমা সংঘটিত হয়ে গেল। তা ছাড়া খেরাজ আবশ্যক হয় শক্তি বলে অর্জিত ভূমিতে আর উশর আবশ্যক হয় যার অধিবাসী সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর এ দুটি অবস্থা একত্র হতে পারে না। তদ্রূপ উশরের ক্ষেত্রে বাস্তবগত ফলনশীলতা বিবেচ্য আর খেরাজের ক্ষেত্রে গুণগত ফলনশীলতা বিবেচ্য হবে।

فصل

অনুচ্ছেদ

الْجِزْيَةُ لو وُضِعَتْ بِتَرَاضٍ لَا يَعْدِلُ عنها وَإِلَّا تُوضَعُ على الْفَقِيرِ في كل سَنَةٍ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَعَلَى وَسَطِ الْحَالِ ضِعْفُهُ وَعَلَى الْمُكْثِرِ ضِعْفُهُ وَتُوضَعُ على كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ عَجَمِيٍّ لَا عَرَبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَفَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَرَاهِبٍ لَا يُخَالِطُ وَتَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ وَالتَّكَرُّرِ وَالْمَوْتِ -

অনুবাদ : যদি জিযয়া পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ধার্য করা হয় তাহলে তাতে রদবদল করা যায় না। নতুবা শ্রমে নিয়োজিত দরিদ্র ব্যক্তি থেকে বৎসর প্রতি বার দিরহাম আর মধ্যবিত্ত ব্যক্তি থেকে বৎসর প্রতি এর দ্বিগুণ (তথা চব্বিশ দিরহাম) আর মালদার ব্যক্তি থেকে বৎসর প্রতি তার দ্বিগুণ (তথা আটচল্লিশ দিরহাম) উশুল করা হবে। আর কিতাবী, মাজুসী এবং আজমী মুর্তি পূজক থেকে জিযয়া উশুল করা যাবে। কিন্তু আরবী মুর্তি পূজক, মুরতাদ, শিশু, মহিলা, গোলাম, মুকাতাব, পঙ্গু, অন্ধ, কর্মহীন দরিদ্র এবং রাহিব (খ্রীষ্টান পাদ্রী) যার সাধারণের সাথে সংশ্রব নেই (তাদের থেকে) জিযয়া উশুল করা হবে না। আর ইসলাম গ্রহণের কারণে, পুনরাবৃত্তির কারণে এবং মৃত্যুর কারনে জিযয়া রহিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

اَلْجِزْيَةُ এক বচন। বহুবচন جِزٰى - অর্থ : কর, জিযয়া, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর। জিযয়া গ্রহণের মাধ্যমে অমুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে তাদের জান ও মালের হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এতে ইসলামী সরকার ব্যর্থ হলে কর বাবত গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, জিযয়া দু প্রকার : (১) যা পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে ধার্য করা হয়। সুতরাং এ প্রকার জিযয়া যে পরিমাণে ঐক্যমতে সংঘটিত হয়েছে, তাই ধার্য করা হবে। এ থেকে কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করার সুযোগ নেই। যেমন হুযূর (সা.) নাজরান বাসীদের সাথে এক হাজার দিরহাম ও দুই শত প্রস্ত পোশাকের উপর সমঝোতা করেছিলেন। তাছাড়া একারণে যে, যেহেতু পারস্পরিক সম্মতি হয়েছে, তাই এ সম্মতিই সাব্যস্তকারী।

قوله : وَإِلَّا تُوضَعُ الخ : জিযয়ার দ্বিতীয় প্রকার হল যা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সাব্যস্ত করা হয় নাই, বরং ইসলামী শাসক কাফিরদের উপর বল প্রয়োগে বিজয় লাভ করেছেন এবং শাসকই নিজ থেকে তাদেরকে তাদের সম্পদের উপর বহাল রেখে কর ধার্য করে থাকেন।

তাহলে আমাদের মতে শাসক তিনটি পদ্ধতিতে কর ধার্য করবেন। তাহল শ্রমে নিযুক্ত দরিদ্র থেকে বাৎসরিক বার দিরহাম বা প্রতি মাসে এক দিরহাম করে উশুল করা হবে। আর মধ্যবৃত্ত ব্যক্তির উপর থেকে

বাৎসরিক চব্বিশ দিরহাম বা প্রতি মাসে দুই দিরহাম করে উশুল করা হবে। আর মালদার সম্পদশালী থেকে বাৎসরিক আটচল্লিশ দিরহাম বা প্রতি মাসে চার দিরহাম করে উশুল করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সর্বাবস্থায় সবার থেকে এক দিনার বা একদিনারের সমপরিমাণ মাল ধার্য করা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-কে বলেছিলেন :

خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَ حَالِمَةٍ دِيْنَارًا اَوْ عَدْلَهٗ مَعَافِرُ

'প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী থেকে এক দিনার কিংবা তার সমপরিমাণ মা'ফেরী চাদর উশুল করো।' উক্ত হাদীসে ধনী দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া জিযয়া আবশ্যক হয় তাদের বেলায় যাদেরকে হত্যা করা জায়েয তাদের উপর। অর্থাৎ হত্যার পরিবর্তে জিযয়া ওয়াজিব হয়। যেমন, শিশু, মহিলা অন্ধ ইত্যাদি। সুতরাং এতে ধনী দরিদ্রের মাঝে তারতম্য করা হবে না।

আমাদের দলিল হল : আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে হযরত উমর (রাযি.) হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) জিযয়া নির্ধারণ করতেন। যেমন হযরত আবু আউন ছাকাফী (রহ.) বর্ণনা করেন :

اَنَّ عُمَرَ رض وَضَعَ فِى الْجِزْيَةِ عَلٰى رُؤُسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِىِّ ثَمَانِيَةً وَّ اَرْبَعِيْنَ وَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ اَرْبَعَةً وَّ عِشْرِيْنَ وَ عَلَى الْفَقِيْرِ اِثْنَا عَشَرَ -

'হযরত উমর (রাযি.) সম্পদশালী ব্যক্তির মাথাপিছু আটচল্লিশ (দিরহাম) আর মধ্যবিত্ত ব্যক্তির মাথাপিছু চব্বিশ (দিরহাম) আর ফকীরের মাথাপিছু বার (দিরহাম) ধার্য করেছেন।'

খুলাফাদের এ নির্ধারণের উপর কোন সাহাবা ব্যতিক্রম মত প্রকাশ করেননি। তাছাড়া ইহা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা হিসাবে ওয়াজিব করা হয়েছে। সুতরাং তা ভূমির খেরাজের মতো তারতম্যপূর্ণ ভাবেই আবশ্যক হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে হাদিস পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে তা ছিল সমঝোতার ভিত্তিতে। নতুবা মহিলাদের থেকেও জিযয়া উশুল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ সর্বসম্মতিক্রমে মহিলা থেকে জিযয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

قوله : وَ تُوْضَعُ عَلٰى كِتَابِىِّ الخ : আর আহলে কিতাবীদের থেকেও জিযয়া উশুল করা হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ -'যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে (তাদের সাথে লড়) যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জিযয়া প্রদান করবে।' তাছাড়া নবী করীম (সা.) ইলার নাযরানীদের থেকে এবং দাউমাতুল জান্দাল এর ইয়াহুদী থেকে জিযয়া গ্রহণ করেছেন। তেমনিভাবে মাজুসী বা অগ্নিউপাসক তেকে জিযয়া গ্রহণ করা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিহর এর মাজুসী থেকে জিযয়া গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তেমনিভাবে আজমী বা অনারবী মূর্তিপূজক থেকে জিযয়া গ্রহণ করা হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মূর্তি পূজকদের উপর থেকে জিযয়া গ্রহণ করা যাবে না। মূর্তিপূজক আরবের হোক বা অনারবী হোক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মূর্তিপূজকদের ব্যাপারে বলেন : وَ قَاتِلُوْهُمْ তাই তাদের বিরুদ্ধে শুধু লড়াই ধর্তব্য। তবে কিতাবীদের সাথে লড়াই ছাড়া জিযয়ার বিষয়টিও কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমন পূর্বোক্ত আয়াত।

আর মাজুসীর ব্যাপারে জিযয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং অন্যান্যদের ব্যাপারে فقاتلوهم এর বিধান যথাযথ প্রযোজ্য।

আমাদের দলিল : অগ্নিপূজক এবং মূর্তিপূজক এর মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। বরং কোন কোন দিক বিবেচনায় অগ্নিপূজক মূর্তিপূজক থেকে আরো নিকৃষ্ট। যেমন মূর্তিপূজক এক আল্লাহর তথা সৃষ্টিকর্তা একজন তা

স্বীকার করে। কিন্তু অগ্নিপূজক কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা একজন আর মন্দের সৃষ্টিকর্তা অন্য জন বলে থাকে।

তেমনি অগ্নিপূজক মুহাররামাতে আবদিয়াকে বিবাহ করা বৈধ বলে থাকে। কিন্তু মূর্তিপূজক এরকম বলে না। যা হউক মূর্তিপূজক থেকে আরো নিকৃষ্ট অীগ্নপূজক। অথচ তাদের থেকে জিযয়া গ্রহন করা হলো যা প্রমান করে যে, মূর্তিপূজক থেকে গ্রহণ করা যাবে। আর হুজুর (সা.) মূর্তিপূজক থেকে জিযিয়া গ্রহণ না করার কারণ হল জিযয়ার বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বেই মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের উপর ইসলাম বিজয় লাভ করেছে। আর তারপর কিতাবী বা অগ্নীপূজকদের সাথে লড়াই করা হয়েছে এবং জিযয়া ধার্য করা হয়েছে অথবা তা শুধু আরবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা তো আমরাও বলি যে আরবী মূর্তিপূজক থেকে জিযয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

قوله : لَا عَرَبِيٌّ وَ مُرْتَدٌّ الخ : আর আরবের মূর্তিপূজক ও আরবী কিংবা অনারবী মুরতাদদের থেকে জিযয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাদের কুফরী অন্যান্যদের তুলনায় প্রকট। তাছাড়া আরবী মুশরিকদের ক্ষেত্রে এই কারণ যে, নবী করীম (সা.) তাদের মাঝেই আবির্ভুত হওয়া এবং পবিত্র কুরআন তাদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হওয়া দ্বারা মুজিযা অধিক প্রকাশ হয়েছে। সুতরাং তা অস্বীকার করার দ্বারা কুফরী প্রকট হল। আর মুরতাদদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের সঠিক সৌন্দর্য প্রদর্শনে ইসলামের উপর অবিচল থাকা তাদের উপর অপরিহার্য ছিল, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে।

তাই তাদেরও কুফরী প্রকট হল। সুতরাং উভয় দলের শাস্তি হিসাবে তাদের থেকে জিযয়া বা দাসত্ব রহিত করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ফায়সালা হল, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তরবারী তাদের মধ্যে শেষ ফয়সালা করবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে। তবে হা, আমাদের মতেও যদি তাদের উপর ইসলামী বাহিনী বিজয় লাভ করে তাহলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও মহিলাদেরকে গোলাম-বাদী বানানো হবে এবং তারা মালে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হযরত আবু বকর (রাযি.) বনু হানিফ সম্প্রদায়ের সাথে এমনই করেছিলেন।

অনুরপভাবে অন্যান্য সম্প্রদায় যাদের উপর জিযয়া ধার্য করা যায় তাদের মধ্যকার শিশু মহিলা, গোলাম, মুকাতাব, পঙ্গু এবং অন্ধের উপর ধার্য করা হবে না। কেননা, জিযয়া হত্যা কিংবা লড়াইয়ে নিযুক্ত হওয়ার বিকল্প হিসাবে ওয়াজিব হয়। আর এদেরকে হত্যা করা যায় না এবং লড়াইয়েও নিযুক্ত করা যায় না। কেননা, তাদের সে ক্ষমতা নেই। অনুরূপভাবে বৃদ্ধের উপর জিযয়া ধার্য করা হবে না। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, তার মাল থেকে জিযয়া ধার্য করা হবে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করার হুকুম বিদ্যমান। যেমন যদি পরামর্শদাতা হয়ে থাকে।

গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, তেমনি কর্মহীন (বেকার) দরিদ্র থেকেও জিযয়া গ্রহণ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে উক্ত দরিদ্র থেকেও জিযয়া ধার্য করা হবে। কেননা, হযরত মা'আজ (রাযি.) সংশ্লিষ্ট হাদীসে নিঃশর্তভাবে বলা হয়েছে। আর আমাদের দলিল হল, হযরত উসমান (রাযি.) কর্মহীন দরিদ্রদের নিকট থেকে জিযয়া গ্রহণ করেন নাই। তাছাড়া তা তো খেরাজের ন্যায়। সুতরাং জমি যদি উৎপাদনশীল না হয় তবে যেভাবে উক্ত জমিতে খেরাজ আবশ্যক হয় না তেমনি কর্মহীন দরিদ্র থেকে জিযয়া গ্রহণ করা হবে না।

গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আর রাহেব বা খ্রীষ্টান বৈরাগী যারা জনসাধারণের সাথে সংশ্রব নেই। তাদের থেকেও জিযয়া উসুল করা হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে তারা যদি কর্মক্ষম হয় তাহলে তাদের উপর জিযয়া ধার্য করা হবে। কেননা, সে নিজেই তার এ সুযোগকে কাজে লাগায়নি। সুতরাং তা হল খেরাজী জমি যা মালিক অলসতা বশত ফেলে রেখেছে তার ন্যায়। আর কর্মক্ষম না হলে জিযিয়া ধার্য না করার কারণ হল, তারা যদি মানুষের সাথে সংশ্রব্ না রাখে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ

নয়। অথচ তাদের উপর জিযয়া আরোপ করার অর্থ হচ্ছে তাদের থেকে হত্যা-শাস্তি রহিত করা।

قوله : وَ تَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ الخ : জিযয়া ধার্যকৃত কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার থেকে জিযয়া রহিত হয়ে যায়। তদ্রূপ যদি কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার থেকেও জিজিয়া রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি কিছু টাকা জিম্মির থাকে আর এমতাবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের নিকট হতে তা উশুল করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উভয় ক্ষেত্রে ভিন্নমত পেশ করেন। তিনি বলেন, জিযিয়া ওয়াজিব হয়েছে নিরাপত্তাগুণ লাভের বিনিময়ে অথবা বসবাসের গুণ লাভের বিনিময়ে। সুতরাং যেহেতু তার নিকট নিরাপত্তাগুণ বা বসবাসের গুণ পৌঁছে গেছে তাই এর বিনিময়ও আবশ্যক হয়ে গেছে। তাই অন্য কোন পরিস্থিতি তা রহিত করবে না। যেমন কিছাছের বিনিময়ে সমঝোতার ভিত্তিতে রক্তপণ সাব্যস্ত হয়ে থাকে বা ভাড়ার ক্ষেত্রে।

আমাদের দলিল হল : নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন : لَيْسَ عَلٰى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ (الترمذى) কোন মুসলমানের উপর জিযয়া নেই। তাছাড়া জিযয়া ইহা কুফরীর শাস্তিরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার ইসলাম গ্রহণের কারণে কুফরীর শাস্তি রহিত হয়ে গেছে। কেননা, মৃত্যুর পর তো শাস্তি কার্যকর করা যায় না। তাছাড়া একারণে যে জিযয়া হল শাস্তি আর এ শাস্তির প্রবর্তন হয়েছে দুস্কৃতি রোধ করার জন্য। আর তা মৃত্যুর কারণে ও ইসলাম গ্রহণের কারণে রোধ হয়ে গেছে। তাছাড়া জিযিয়া সাব্যস্ত হয় যুদ্ধের সাহায্য করার পরিবর্তে। অথচ ইসলাম গ্রহণের পর সে তো নিজেই সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। তাই জিযয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আর যদি কোন জিম্মির কাছে প্রথম বৎসরের জিযয়া বকেয়া থাকে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বৎসর এসে যায় তাহলে প্রথম বৎসরের জিযয়া রহিত হয়ে যাবে। আর শুধু মাত্র দ্বিতীয় বৎসরের জিযয়া আবশ্যক হবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে বিগত বৎসর ও চলিত বৎসরের জিযয়া এক সাথে আবশ্যক হবে। কেননা, তা বিনিময়রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। আর কতগুলো বিনিময় যদি একত্র হয়ে যায় এবং সেগুলো উশুল করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই সেগুলো উশুল করা হবে। আর এক্ষেত্রে উসুল করা সম্ভব, তাই তা উশুল করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : জিযয়া ইহা আবশ্যক করা হয়েছে তাদের কুফরীর উপর অটল থাকার শাস্তিরূপে। কেননা, যদি সে বাহকের কাছে প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং নিজে এসে দাঁড়ানো অবস্থা প্রদান করবে। আর গ্রহীতা তা বসে গ্রহণ করবেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে জামায় ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলা হবে এই যিম্মি জিযয়া দাও। সুতরাং তা শাস্তি হল। আর কয়েকটি শাস্তি একত্র হলে তা একিভূত হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হয়েছে হত্যার বিকল্প হিসাবে। আর আমাদের দিক থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যুদ্ধে সাহায্য করার বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে। আর তাতো ভবিষ্যতের হত্যার বিকল্প বিগতকালের হওয়ার বিকল্প নয়। কেননা, হত্যা শাস্তি তো কার্যকর করা হয় বর্তমানে বিদ্যমান যুদ্ধের কারণে, বিগত যুদ্ধের কারণে নয়। তেমনি সাহয্য করার বিষয়টিও ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যা বিগত হয়েছে তার প্রয়োজনিয়তা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং বিগত বৎসরের জিযয়া আবশ্যক হবে না।

وَلَا تُحْدَثُ بِيعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ فِي دَارِنَا وَيُعَادُ الْمُنْهَدِمُ وَيُمَيَّزُ الذِّمِّيُّ عنا في الزِّيِّ وَالْمَرْكَبِ وَالسَّرْجِ فَلَا يَرْكَبُ خَيْلًا وَلَا يَعْمَلُ بِالسِّلَاحِ وَيُظْهِرُ الْكُسْتِيجَ وَيَرْكَبُ سَرْجًا كَالْأَكُفِّ وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِالْإِبَاءِ عن الْجِزْيَةِ وَالزِّنَا بِمُسْلِمَةٍ وَقَتْلِ مُسْلِمٍ وَسَبِّ النبي عَلَيْهِ السَّلَامِ بَلْ بِاللَّحَاقِ ثَمَّهْ أو بِالْغَلَبَةِ على مَوْضِعٍ لِلْحِرَابِ وَصَارُوا كَالْمُرْتَدِّينَ وَيُؤْخَذُ من تَغْلِبِيٍّ وَتَغْلِبِيَّةٍ ضِعْفُ زَكَاتِنَا وَمَوْلَاهُ كَمَوْلَى الْقُرَشِيِّ وَالْجِزْيَةُ وَالْخَرَاجُ وَمَالُ التَّغْلِبِيِّ وَهَدِيَّةُ أَهْلِ الْحَرْبِ وما أَخَذْنَا منهم بِلَا قِتَالٍ يُصْرَفُ في مَصَالِحِنَا كَسَدِّ الثُّغُورِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَكِفَايَةِ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُمَّالِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَنْ مَاتَ في نِصْفِ السَّنَةِ حُرِمَ عن الْعَطَاءِ -

অনুবাদ : আমাদের দারুল ইসলামে নতুন করে ইয়াহুদীদের উপসনাগার এবং খ্রীষ্টানদের গীর্জা বানানোর সুযোগ দেয়া হবে না। তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরানো উপাসনালয়গুলো পুনঃনির্মান করা যাবে। আর যিম্মিরা পোশাক-পরিচ্ছেদে, বাহনে, বাহন পৃষ্ঠাচ্ছাদনে আমাদের (মুসলমানদের) থেকে পৃথক (বৈশিষ্ট মন্ডিত) হবে। সুতরাং তারা ঘোড়ায় চড়বে না এবং অস্ত্র ব্যবহার করবে না। আর প্রতিকী ডোর (তাগা) প্রকাশ করবে। (অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে পরিধান করবে) এবং খরকুটা সাদৃশ্য মামুলী জীনে আরোহণ করবে। আর জিযয়া দিতে অস্বীকার করলে কিংবা কোন মুসলমান মহিলার সাথে যিনা করলে অথবা কোন মুসলমানকে হত্যা করলে কিংবা নবী করীম (সা.)কে গালি দিলে ও তার (জিম্মির) চুক্তি ভঙ্গ হবে না।

তবে দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হলে কিংবা (আমাদের সাথে) লড়াইয়ের জন্য কোন স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে তাহলে জিম্মি চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তারা মোরতাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর বনী তাগলবীদের প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী হতে (জিযিয়া বাবত) আমাদের (মুসলমানদের) জাকাতের দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। আর তাদের আযাদকৃত দাসের উপর থেকে কুরাইশীর আজাদকৃত দাসের ন্যায় জিযয়া গ্রহণ করা হবে। (অর্থাৎ, জিযয়া এবং ভূমি খেরাজ ধার্য করা হবে।) আর জিযয়া, খেরাজ, বনু তাগলবীর সম্পদ, দারুল হরবের উপহার, তাছড়াা যা আমরা তাদের থেকে বিনা লড়াইয়ে হস্তগত করব তা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন সীমান্ত প্রাচীর, বড় পুল, সেতু নির্মানে এবং (মুসলমানদের বিচার কার্যে নিযুক্ত) কাজীগণের, উলামাগণের, শাসন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের, মুজাহিদগণের এবং তাদের সন্তানাদিগণের বেতন-ভাতায় ব্যয় করা হবে। আর যে বৎসরের মধ্যখানে মৃত্যুবরণ করে সে ভাতা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَاتُحْدَثُ بِيعَةٌ الخ : দারুল ইসলামে নতুনভাবে ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং খ্রীষ্টানদের গীর্জা বানানোর সুযোগ দেয়া হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

لَا خِصَاءَ فِى الْاِسْلَامِ وَ لَا كَنِيْسَةَ

'খোঁজা করন ও গীর্জার অবকাশ নেই।' আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নতুন করে তৈরীর অবকাশ নেই। আর যদি পুরাতন গীর্জা বা উপাসনালয় ভেঙ্গে যায় তাহলে তা মেরামত বা পুনঃনির্মান করা যাবে। কেননা, ভবন তো চিরস্থায়ী থাকে না। তাই তা মেরামত বা ভেঙ্গে গেলে পুনঃনির্মাণ করা যাবে। আর বিদ্যমান গীর্জা বা উপাশনালয় এর অনুমোদন তো আছেই। কেননা, শাসক যখন তাদেরকে দারুল ইসলামে বহাল রেখেছেন তখন তাদের উপাসনালয়সমূহ পুণঃনির্মানেরও অনুমতি দিয়েছেন।

তবে তা স্থানান্তর করা যাবে না। কেননা, স্থানান্তর করা এর অর্থ হল নতুন করে তৈরী করা। আর কেহ যদি তার ঘরের কোন স্থানকে উপাসনালয় নির্ধারণ করে তবে তা নিষেধাজ্ঞার বাইরে। আর এই নিষেধাজ্ঞা আরবের প্রতিটি শহর-গ্রাম সর্বত্রের জন্য প্রযোজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : لَايَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ - 'জাজিরাতুল আরবে দুটি দ্বীন একত্র হতে পারে না।' আর অন্য স্থানের ক্ষেত্রে তা শহরের সাথে নির্দিষ্ট। গ্রামে প্রযোজ্য নয়। কেননা, ইসলামী মারকাজ ও নিদর্শনাবলী শহরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

قوله : وَيُمَيَّزُ الذِّمِّيُّ عَنَّا الخ : আর দারুল ইসলামে বসবাসরত জিম্মিরা তাদের চলাফেরা উঠাবসার মধ্যে মুসলমান থেকে পৃথক বৈশিষ্টে এবং মান-মর্যাদায় হীন হিসাবে থাকতে হবে। সুতরাং তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদে, বাহনে, বাহন পৃষ্ঠাচ্ছাদনে মুসলমানদের থেকে পৃথক বৈশিষ্টে থাকতে হবে তারা ঘোড়ায় চড়বে না। অস্ত্র ব্যবহার করবে না। অনুরূপভাবে তাদের ধর্মীয় ডোর বা তাগা প্রকাশ্যভাবে বাঁধবে। আর এসব জিম্মিদের বেলায় বাধ্যতামূলক। কেননা এতে তুচ্ছতা প্রকাশ করা হবে এবং এ বিশেষ বৈশিষ্ট দ্বারা সহজেই তাদের চেনা যাবে নতুবা অনেক সময় মুসলমান তাদেরকে সালাম করে বসবে। বা রাস্তায় কোন জিম্মি মৃত্যুবরণ করলে মুসলমান ভেবে তার উপর জানাযা পড়া হবে। অথচ এগুলো তাদের প্রাপ্য নয়। তাছাড়া দুর্বল মুসলমানদের ঈমান রক্ষা হবে। কেননা, যদি সাজ-সজ্জার অনুমোদন দেয়া হয় আর সে শানদার ও দর্প করে চলাফেরা করে, তবে দুর্বল মুসলমান তা দেখে নিজেকে হেয় ভাবতে পারে। আর এতে তার ক্ষতি হতে পারে।

তাছাড়া জিম্মি যেহেতু মুল্যায়নের পাত্র নয়, তাই তাকে আগে বেড়ে সালাম দেয়া যাবে না। রাস্তায় তাকে পাশ কেটে যেতে বাধ্য করা হবে। আর তাদের প্রতিকী চিহ্ন হতে হবে মোটা ডোরা। তবে তারা রেশমী ডোর পরতে পারবে না। কেননা, এতে অহংকারী রয়েছে।

অনুরূপ প্রয়োজন ছাড়া তাদেরকে বাহনে আরোহণ না হতে বাধ্য করা হবে। তাদের বাড়ীতে পৃথক নিশানা উড়াতে হবে। যেন ঘর-বাড়ী দেখে মুসলমান অমুসলমানের ঘর-বাড়ীকে মুসলমানের ঘর-বাড়ী মনে করেই বাড়ীওয়ালার জন্য ইস্তিগফার না করে। তদ্রূপ তাদের মহিলারা মুসলমান নারী থেকে পৃথক বৈশিষ্ট নিয়ে চলবে। সর্বোপরি তারা মুসলমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন চলা ফেরা করতে পারবে না। এমনকি সে যদি মুসলমানদের সমাবেশস্থল দিয়ে যেতে হয় তবে সমাবেশের নিকট এসে বাহন থেকে নেমে হেটে যেতে হবে।

قوله : وَلَايَنْتَقِضُ عَهْدُهُ الخ : আর জিম্মির চুক্তি ভঙ্গ হবে না জিযিয়া দেয়া থেকে বিরত থাকলে অথবা কোন মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করলে কিংবা কোন মুসলমানকে হত্যা করলে কিংবা নবী করীম (সা.)-কে গালী দিলে। কেননা, তাদের মধ্যকার লড়াই বন্ধ হওয়ার সীমারেখা হল জিযয়ার দায় গ্রহণ করে নেয়া। আদায় করা নয়। সুতরাং দায় গ্রহণ করার বিষয়টি তো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি নবী করীম (সা.)-কে গালী দেয় তাহলে তার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, সে এমন কাজ করেছে যদি মুসলমান তা করতো তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতো। সুতরাং তার নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাবে তথা ভেঙ্গে যাবে। কেননা, জিম্মি চুক্তি হচ্ছে ঈমানের স্থলবর্তী। এব্যাপারে আমাদের দলিল হল : নবী করীম (সা.)-কে গালী দেয়া হচ্ছে কুফরী আর এ কুফরী তো তার সাথে পূর্ব থেকে বিদ্যমান। সুতরাং পূর্বের কুফরী তার নিরাপত্তাকে হরণ করতে পারে নাই। তাই নতুন উদ্ভুত কুফরী তার নিরাপত্তাকে রহিত করবে না। তবে হা তার এহেন অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ নিশ্চিত।

قوله : بَلْ بِاللَّحَاقِ ثَمَّةُ الخ : জিম্মির জিম্মি চুক্তি শুধু দু কারণে ভঙ্গ হয়। তাহল সে যদি দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হয়। অথবা আমাদের সাথে লড়াই করার জন্য কোন স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। কেননা, সে একাজ করার কারণে আমাদের সাথে লড়াইকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সুতরাং তার সাথে কৃত চুক্তি অর্থহীন হয়ে গেল। অথচ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল তার থেকে আমাদের সাথে যুদ্ধের অনিষ্ট থেকে বিরত রাখা। আর জিম্মি যখন আমাদের সাথে কৃতচুক্তি ভঙ্গকারী হয়ে গেল তখন সে মুরতাদদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। তদ্রূপ তার সাথে যে মাল নিয়ে পলায়ন করল তাও মোরতাদতুল্য হবে। তবে যদি মোরতাদ বন্দী হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু এ যিম্মি যদি বন্দি হয় তাকে দাস বানিয়ে রাখার হুকুম আছে।

قوله : وَ تُؤْخَذُ مِنْ تَغْلَبِيٍّ الخ : আর বনী তাগলবী সম্প্রদায়ের নাসারা থেকে নেয়া হবে, মুসলমান থেকে গ্রহণ কৃত যাকাতের দ্বিগুণ । কেননা, হযরত উমর (রাযি.) তাদের সাথে এভাবেই সমঝোতা করেছিলেন। আর তা সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছিল। আর বনী তাগলবীদের নারীদের থেকেও নেয়া হবে। কিন্তু তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না। কেননা, তাদের সাথে যাকাতের দ্বিগুণের উপর সমঝোতা হয়েছে। আর যাকাত নারীদের উপরও আবশ্যক। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর যাকাত আবশ্যক হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে মহিলাদের উপর তা আবশ্যক হবে না। কেননা, তা তো প্রকৃতপক্ষে জিযয়া।

যেমন হযরত উমর (রাযি.) বলেন : هٰذِهٖ جِزْيَةٌ فَسَمُّوْهَا مَاشِئْتُمْ 'এটা তো জিযয়া, তোমাদের ইচ্ছা যে নামে নাম করণ কর।' তা ছাড়া এ অর্থ যিযয়ার খাতে খরচ করতে হয়। আর স্ত্রীলোকদের উপর জিযয়া আবশ্যক হয় না বিধায় বনু তাগলবী স্ত্রীদের উপর জিযয়া আবশ্যক হবে না। আমাদের দলিল হল, এ মাল সমঝোতার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আর স্ত্রীলোকের উপর এ ধরনের মাল ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য। আর বায়তুল মাল হিসাবে তার সম্পদ তো জনকল্যাণে ব্যয় করা হবেই। এ ব্যয় এর ক্ষেত্র জিযযার সাথে বিশিষ্ট নয়।

قوله : وَ مَوْلَاهُ كَمَوْلَى الْقُرَشِيِّ الخ : আর তাগলবীদের আজাদকৃত দাসের থেকে কুরাইশীর আজাদকৃত দাসের ন্যায় গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, তাদের থেকেও মুসলমানের যাকাতের দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন : اِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ 'নিশ্চয় কোন সম্প্রদায়ের আজাদকৃত দাস তাদের অন্তর্ভুক্ত।' তাই তো হাশেমীদের জন্য যাকাত হারাম হওয়ায় হাশেমীর আজাদকৃত গোলাম হাশেমীর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

আমাদের দলিল দ্বিগুণ গ্রহণের অর্থ হল লঘুতা আনয়ন। আর লঘুতার ক্ষেত্রে মনিবের সাথে তার আজাদকৃত গোলাম সম্পৃক্ত হয় না। তাই তো মুসলমানের আজাদকৃত অমুসলিম দাসের উপর জিযয়া আরোপ করা হয়। পক্ষান্তরে যাকাত হারাম হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, হারাম সন্দেহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং হাশেমীর হকের ক্ষেত্রে হাশেমীর মাওলাকে হাশেমীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু ধনীর আজাদকৃত গোলামের ক্ষেত্রে যাকাত হারাম না হওয়ার কারণে আপত্তি উত্থাপন হবে না। কেননা ধনী সত্তাগতভাবে যাকাত গ্রহন করার পাত্র। কিন্তু স্বচ্ছলতা এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কিন্তু হাশেমী ধনী হোক বা গরীব হোক তাদের সম্মান-মর্যাদার দিক বিবেচনা করে মানুষের ময়লা (যাকাত) গ্রহণের উপযুক্ত নয়। সুতরাং তার মাওলাকে তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

قوله : وَ الْجِزْيَةُ وَالْخِرَاجُ وَ مَالُ التَّغْلَبِيِّ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, জিযিয়া (খেরাজ) বনু তাগলুবী থেকে প্রাপ্ত মাল, দারুল হরবের উপহার, তাছাড়া যা আমরা তাদের সাথে বিনা লড়াইয়ে হস্তগত করব তা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করা হবে। যেমন সীমান্ত প্রাচীর, বড় পুল, সেতু নির্মানে এবং মুসলমানদের বিচার কার্যে নিযুক্ত কাজীগণের বেতন, উলামাগণের ভাতা, শাসন কার্যে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী

বৃন্দের বেতন-ভাতা, সৈনিক ও তাদের পরিবার বর্গের বেতন-ভাতার খাতে তা ব্যয় করা হবে। কেননা বিনা লড়াইয়ে যেহেতু মুসলমানদের হাতে এসেছে তাই তা সম্পূর্ণটাই বায়তুল মালে জমা করা হবে।

আর বায়তুল মাল তো মুসলমানদের জন্য কল্যানার্থে নিবেদিত। উপরে উল্লিখিত ব্যক্তি বিশেষগণ যেহেতু জনকল্যাণে নিবেদিত তাই তাদেরকেও তা থেকে বেতন প্রদান করা হবে। আর যেহেতু তাদের উপর তাদের পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী সন্তানাদিগণের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাই সরকারী কার্যাদী সুষ্ঠ পরিচালনার নিমিত্তে তাদেরও ভাতা প্রদান করা হবে। নচেৎ তারা অন্য কাজে লিপ্ত হবে জিবিকা নির্বাহের জন্য এবং তাতে সরকারী কাজে বিগ্ন সৃষ্টি হবে।

قوله : وَمَنْ مَاتَ فِى نِصْفِ الخ : আর উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ যারা বৎসরের মধ্যখানে মৃত্যুবরণ করবে তারা এ বৎসরের ভাতা প্রাপ্ত হবে না। কেননা, এটা এক প্রকার দান, যাকে عطاء বলা হয়। সুতরাং তা ঋণ নয়। আর দান হস্তগত না করা পর্যন্ত তার মালিক হওয়া যায় না। তাই মৃত্যুর কারণে তা রহিত হয়ে যাবে। والله اعلم

بَابُ الْمُرْتَدِّيْنَ

পরিচ্ছেদ : ধর্মত্যাগীদের প্রসঙ্গে

يُعرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْمُرتَدِّ وتُكشَفُ شُبهَتُهُ ويُحبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ عن الْأَدْيَانِ سِوَى الْإِسْلَامِ أو عَمَّا انْتَقَلَ إِلَيْهِ وَكُرِهَ قَتْلُهُ قَبْلَهُ ولم يَضْمَنْ قَاتِلُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ وَلَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ بَلْ تُحبَسُ حتى تُسْلِمَ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عن مَالِهِ زَوَالًا مَوْقُوفًا فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ مِلْكُهُ وَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ على رِدَّتِهِ وَرِثَ كَسْبَ إِسْلَامِهِ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ إِسْلَامِهِ وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رِدَّتِهِ وَإِنْ حُكِمَ بِلِحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ وَحَلَّ دَيْنُهُ وَتَوَقَّفَ مُبَايَعَتُهُ وَعِتْقُهُ وَهِبَتُهُ فَإِنْ آمَنَ نَفَذَ وَإِنْ هَلَكَ بَطَلَ وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ الْحُكْمِ بِلِحَاقِهِ فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَارِثِهِ أَخَذَهُ وَإِلَّا لَا -

অনুবাদ : মুরতাদের সামনে ইসলাম পেশ করা হবে। (ইসলাম সম্পর্কে) তার সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা হবে। তাকে তিনদিন বন্দী রাখা হবে। যদি ইসলাম গ্রহন করে তবে তো ভাল, নতুবা হত্যা করা হবে। আর তার ইসলামের সুরত হল যে, সে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্মের সাথে নিজের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করবে অথবা সে যে ধর্মের প্রতি ধাবিত হয়েছে তা থেকে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করবে। আর তার পূর্বে (তথা ইসলাম পেশ করার

পূর্বে) তাকে হত্যা করা মাকরূহ। তবে তার হত্যাকারী (রক্তমূল্যের) দায়ী হবে না। আর মুরতাদ্দাহ্ নারীকে হত্যা করা হবে না, বরং তাকে বন্দি করা হবে, ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত। আর মুরতাদের মালিকানা তার মাল থেকে স্থগিত অবস্থায় বিলুপ্ত হবে। যদি সে (পরবর্তিতে) ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে মালিকানা ফিরে পাবে। আর যদি সে মৃত্যুবরণ করে কিংবা তার ধর্ম ত্যাগের কারণে নিহত হয় তাহলে তার মুসলিম উত্তরাধিকারীগণ তার ইসলাম অবস্থায় অর্জিত সম্পদ থেকে তার মুসলমান অবস্থায় ঋণ পরিশোধের পর উত্তরাধিকারী হবে। আর তার মুরতাদ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ তার মুরতাদ অবস্থার ঋণ পরিশোধের পর মালে গনীমত হবে। আর যদি তার দারুল হরবে মিলিত হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয় তাহলে তার মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদ স্বাধীন হয়ে যাবে। আর তার ঋণ দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

আর তার ক্রয়-বিক্রয়, তার স্বাধীন করা, তার দান করা স্থগিত থাকবে। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তা সংগঠিত হবে। আর যদি সে ধ্বংস হয় (অর্থাৎ, মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয় অথবা দারুল হরবে চলে যায়) তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দারুল হরবে মিলিত হওয়ার হুকুম জারীর পর মুসলমান অবস্থায় (দারুল ইসলামে) ফিরে আসে তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের হাতে যা বিদ্যমান পাবে তা গ্রহণ করবে। অন্যথায় তা গ্রহণ করবে না (অর্থাৎ, হুবহু যদি ওয়ারিশদের হাতে না পায় বা মুকাতাব কিংবা মুদাব্বার পায় তবে তা গ্রহণ করতে পারবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْمُرْتَدِّيْنَ : مرتدين শব্দটি مرتد এর বহুবচন যা اسم فاعل এর جمع مذكر এর সিগাহ, যা الارتداد। মাসদার থেকে নিগর্ত। অর্থ : الرجوع। প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় مرتد বলা হয় যে দ্বীনে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে বা ধর্মহীন হয়ে যায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। কিন্তু যদি অন্য কোন ধর্মাবলম্বী তার ধর্ম পরিবর্তন করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাকে মুরতাদ বলা হবে না। আর দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করার অর্থ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহর তাওহীদ ও গুণাবলী, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, রিসালাত, হাশর, কুরআন, হাদীস, ইত্যাদি বিষয়াবলী অস্বীকার করা বা সরাসরি ইসলাম থেকে অন্য কোন ধর্মে চলে যাওয়া।

قوله : يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْمُرْتَدِّ الخ : আল্লাহ না করুন যদি কোন মুসলমান তার ইসলাম ত্যাগ করে তাহলে প্রথমত তার সামনে ইসলামকে পেশ করা হবে এবং তার ভেতরকার সন্দেহসমূহ নিরসনের চেষ্টা করা হবে। তবে হা তার উপর ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়। কেননা তার কাছে তো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। তবে তার দুষ্কৃতি প্রতিরোধে উত্তম পন্থা হল হয়তো পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

তবে এ দুয়ের উত্তমটি হল ইসলাম গ্রহণ করে নেয়া। এজন্য তার কাছে ইসলাম পেশ করা হবে এবং তার ভেতরকার সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা হবে। অতঃপর গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, তাকে তিনদিন বন্দী করে রাখা হবে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সে সময়ের প্রার্থনা করুক বা না করুক তাতে বন্দীত্বের ভেতর দিয়ে তিন দিন অবকাশ দেয়া মুস্তাহাব।

আর তিন দিন এজন্য যে, যে কোন জিনিস যাচাই বাছাই বা অজুহাত ইত্যাদি পরিক্ষা করে দেখার জন্য শরীয়াত তিন দিনকে নির্ধারণ করেছে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিন দিন পর্যন্ত ইচ্ছাধিকারের সুযোগ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তিনদিন বন্দীত্বের ভিতর দিয়ে তাকে অবকাশ দেয়া শাসকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। এর পূর্বে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। কেননা, তার ইসলাম ত্যাগ অবশ্যই কোন সন্দেহের উদ্রেকের দরুন হয়েছে। সুতরাং এমন একটি সময় সীমার প্রয়োজন যে সময় সীমার ভেতরে সে চিন্তাভাবনা

করতে পারে। আর তা হচ্ছে তিন দিন। আমাদের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।'

উক্ত আয়াতে মুশকিরদের অবকাশ দেয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ 'যে ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।' উক্ত হাদীসেও অবকাশ দেয়ার কোন শর্ত নেই। তাছাড়া সে তো হলো এক হরবী কাফের যার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে। তাই তাকে তাৎক্ষণিক হত্যা করা যাবে। এতে কোন অবকাশ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর উপরোক্ত দলিলসমূহের নিঃশর্ততার দরুন স্বাধীন ও গোলামের মাঝে কোন পার্থক্য করা হবে না।

قوله : وَكُرِهَ قَتْلُهٗ قَبْلَهٗ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইসলাম পেশ করার পূর্বে মুরতাদকে হত্যা করা মাকরূহ। তবে হত্যাকারীর উপর রক্তমূল্য আবশ্যক হবে না। আর এখানে মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুস্তাহাব পরিপন্থী। আর ক্ষতিপুরণ আবশ্যক না হওয়ার কারণ হল তার মধ্যকার কুফরী তাকে হত্যার বৈধতা দিয়েছে। আর দাওয়াত পৌঁছার পর তার কাছে ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং তাকে হত্যার দরুন হত্যাকারীর উপর কোন দায় আবশ্যক হবে না।

قوله : وَلَاتُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ الخ : আর মোরতাদ স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তাকে তার কৃত অপরাধের দরুন হত্যা করা হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْاهُ 'যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।' উক্ত হাদীসে من অব্যয়টি ব্যাপকতা বুঝায় যা নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ উক্ত আয়াতের من পুরুষ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তাছাড়া যেভাবে পুরুষের ধর্ম ত্যাগ গুরুতর অপরাধ তেমনি নারীর ধর্ম ত্যাগও গুরুতর অপরাধ। সুতরাং এ গুরুতর অপরাধের দরুন যেভাবে পুরুষকে হত্যা করা বৈধ, তেমনি নারীকেও হত্যা করা বৈধ। কেননা, ধর্ম ত্যাগের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান।

আমাদের দলীল : নবী করীম (সা.) স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন। তাছাড়া মূল তো হল শাস্তি কে আখেরাত পর্যন্ত স্থগিত রাখা। কেননা তড়িৎ শাস্তি প্রয়োগ করে ফেলা তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করে। কিন্তু এ বাস্তব সত্য বিধান থেকে ফিরে আসার কারণ হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ। আর স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ হয় না। তাদের শারীরিক অক্ষমতার দরুন। কিন্তু পুরুষের বিষয়টি ভিন্ন। তাই মুরতাদ নারী প্রকৃত কাফের নারীর সাদৃশ্য হল। কিন্তু সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখতে হবে। কেননা, সে তো আল্লাহর হক্ব স্বীকার করার পর তা আদায় করতে বিরত রয়েছে। সুতরাং তাকে তা আদায়ের জন্য বন্দী করে রাখা হবে, যেভাবে মানুষের হক্ব আদায়ের জন্য বন্দী করা হয়।

قوله : وَ يَزُوْلُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ধর্ম ত্যাগের কারণে মুরতাদের যাবতীয় মালামাল থেকে তার মালিকানা স্থগিত হিসাবে রহিত হবে। সুতরাং যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে মালিকানা পুনরায় ফিরে আসবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.)-এর মতে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না, বরং তা বহাল থাকবে। কেননা, সে তো প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি। সুতরাং তাকে নিহত করা পর্যন্ত তার মালিকানা বহাল থাকবে। যেমন, রজম বা কিছাছের হুকুম প্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানা রহিত হয় না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলীল হল : উক্ত মুরতাদ তার ধর্ম ত্যাগের কারণে এখন আমাদের কাছে সে আমাদের করতলগত এক হরবী হিসাবে সাব্যস্ত। তাই তো তাকে হত্যা করার বিধান রয়েছে। সুতরাং আমাদের

করতলগত হওয়া তার সত্ত্ব ও সত্ত্বাধিকারীকে বিলুপ্তির কারন হল। কিন্তু যেহেতু সে বল প্রয়োগে ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্ত তাই সে আবার মুসলমান হওয়ার আশা করা যায়। এজন্য তার ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। সুতরাং যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার মালিকানা ফিরে আসবে। কিন্তু যদি সে ফিরে না আসে তবে তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে।

قوله : وَ اِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ عَلٰى رِدَّتِهٖ الخ : আর যদি মুরতাদ তার মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয় তাহলে সে যা মুসলমান অবস্থায় উপার্জন করেছে তা থেকে তার মুসলমান অবস্থার ঋণ পরিশোধের পর মুসলমান উত্তরাধিকারীগণ উক্ত মালে উত্তরাধিকারী হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে তা থেকে মুরতাদ অবস্থার ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট মালে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইহাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে উভয় অবস্থায় তথা মুসলমান অবস্থার ও মুরতাদ অবস্থার উপার্জন তার উত্তরাধিকারীদের হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উভয় অবস্থার উপার্জন মালে গনীমত হিসাবে গণ্য হবে। তিনি বলেন, তার তো কাফের অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আর মুসলমান কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না। তাছাড়া এ সম্পদ হল একজন হরবীর নিরাপত্তা গুণ রহিত মাল। সুতরাং তা মালে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাহাবাইন (রহ.) এর দলীল : উভয় অবস্থায়ই তার মালিকানা বহাল রয়েছে। কেননা সে তো প্রয়োজনগ্রস্থ ব্যক্তি। সুতরাং তা তার মৃত্যুর পর পরই উত্তরাধিকারীর মধ্যে বন্টন করা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : ইসলামের অবস্থায় উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে এই সম্পৃক্ততা সম্ভব। কেননা, তা ধর্ম ত্যাগের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ধর্ম ত্যাগের পরবর্তী উপার্জনের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা সম্ভব নয়। কেননা, ধর্ম ত্যাগের পূর্বে তা বিদ্যমান ছিল না। অথচ উত্তরাধিকারী লাভের সম্পৃক্ততার জন্য রিদ্দাতের পূর্বেই তা বিদ্যমান হওয়া শর্ত।

قوله : وَ اِنْ حُكِمَ بِلِحَاقِهٖ الخ : আর যদি সে মুরতাদ অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায় এবং শাসক তার অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা জারী করেন তাহলে তার মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আজাদ হয়ে যাবে এবং তার ঋনগুলো দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তার মাল স্থগিত অবস্থায় থাকবে, দারুল হরবে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে যেমন ছিল। কেননা, তা হলো নিরুদ্দেশ হওয়া। যা দরুল ইসলামে নিরুদ্দেশ্য হওয়ার মত।

আমাদের দলিল : সে দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে চূড়ান্ত মুরতাদ সাব্যস্ত হয়ে গেল। আর ইসলামের যাবতীয় আহকামের ক্ষেত্রে তারা মৃত্যুতুল্য। কেননা, যেভাবে মৃতদের উপর আহকাম প্রয়োগ করা রহিত হয়ে যায় তদ্রূপ তাদের ক্ষেত্রেও আহকাম প্রয়োগ করা রহিত হয়ে গেল। তবে আদালতের ফায়সালা ছাড়া তার অন্তর্ভুক্তি স্থিতিশীল হবে না। কেননা সে আবার দারুল ইসলামে ফেরত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর যখন তার গুণগত মৃত্যু স্থিতিশীল হয়ে গেল তখন এতদসংশ্লিষ্ট বিধানগুলো সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قوله : وَ تُوُقِّفَ مُبَايَعَتُهٗ الخ : আর মুরতাদ অবস্থায় তার ক্রয়-বিক্রয়, আজাদ করা বা দান করা স্থগিত থাকবে। যদি সে পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার উক্ত চুক্তিসমূহ বৈধ হবে। আর যদি সে মারা যায় বা নিহত হয় কিংবা দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। ইহাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (রহ.) এর মতে উভয় অবস্থায়ই কৃতকার্য বৈধতা লাভ করবে।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, মুরতাদদের কৃতকার্য কয়েক প্রকার :

১। সর্বসম্মত রূপে কার্যকর : যেমন দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো। তালাক প্রদান করা। কেননা প্রথমটি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রকৃত মালিকানার প্রয়োজন হয় না। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ শরয়ী কর্তৃত্ব প্রয়োজন হয় না।

২। সর্বসম্মত রূপে তা বাতিল। যেমন বিবাহ, তার জবাইকৃত প্রাণী হারাম হওয়া। কেননা এ দুটো দ্বীন

নির্ভর বিষয়। অথচ তার মাঝে দ্বীন নেই।

৩। সর্বসম্মত রূপে তা স্থগিত। যেমন ব্যবসার সম অংশিদারিত্ব। কেননা এ অংশিদারিত্ব সমতার উপর নির্ভর করে। অথচ পুনঃ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত মোরতাদ ও মুসলমানের মাঝে সমতা নেই।

৪। স্থগিত থাকার মধ্যে মতপার্থক্য। আর তা হল আমাদের পুর্বোল্লিখিত বিষয়সমূহ। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল হল : বৈধতা নির্ভর করে যোগ্যতার উপর। আর কার্যকারিতা নির্ভর করে মালিকানার উপর। আর মুরতাদ যেহেতু শরীয়াতের সম্বোধন পাত্র, তাই তার মধ্যে অবশ্যই যোগ্যতা বিদ্যমান ধরা হবে। তেমনি মালিকানাও বহাল আছে। কেননা, আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণিত করে এসেছি যে, তার মৃত্যু পর্যন্ত মালিকানা বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে। একারণেই তো তার মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ছয় মাসের ভেতর তার মুসলিম স্ত্রীর গর্ভ থেকে সন্তান প্রসব হলে সে তার ওয়ারিস হয়। পক্ষান্তরে রিদ্দতের পর তার মৃত্যুর পূর্বে যদি উক্ত সন্তান মারা যায় তাহলে সে তার ওয়ারিস হবে না। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, তার মৃত্যুর পূর্বের কার্যসমূহ বৈধ হল। এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে এ বৈধতা একজন সুস্থ ব্যক্তির বৈধতার অনুরূপ তথা মৃত্যু শয্যায় সায়িত ব্যক্তির অনুরূপ।

আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল : মুরতাদ হওয়ার দরুন তার ব্যক্তি সত্তা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় তার মালিকানা স্থগিত থাকার কথা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। অথচ কার্যকারিতা নির্ভরশলী মালিকানার উপর। সুতরাং যখন মালিকানা স্থগিত হয় তখন কার্যকারিতা অবশ্যই স্থগিত হবে। তাই তার অবস্থা এখন এমন হল যেন নিরাপত্তা ছাড়া কোন হরবী দারুল ইসলামে প্রবেশ করল। তাকে যেভাবে পাকড়াও করা হবে অপদস্থ করা হবে এবং তার অবস্থা ঝুলন্ত হওয়ায় তার কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। অনুরূপ উক্ত মুরতাদেরও অবস্থা। তাছাড়া হারবী বা মুরতাদ উভয়কে হত্যার যোগ্যতা তাদের মধ্যকার নিরাপত্তা গুণ রহিত হওয়ার কারণে। তাই তা তার যোগ্যতাকে নষ্ট করবে। পক্ষান্তরে রজম বা কেছাছের ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যাযোগ্যতা হচ্ছে তাদের অপরাধের শাস্তি।

قوله : وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا بَعْدَ الْحُكْمِ الخ : মুরতাদ যদি দারুল হরবে অন্তর্ভুক্ত ঘোষনার পর পুনরায় মুসলমান অবস্থায় দারুল ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে ওয়ারিশদের হাতে তার যে সম্পদ বিদ্যমান পাবে তা সে নিয়ে নেবে। কেননা, মুরতাদ তার এ মালের প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার দরুন ওয়ারিশরা তার স্থলবর্তী হয়েছিল। কিন্তু যখন সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতঃ ফিরে আসল তখন তার এ মালের প্রতি মুখাপেক্ষীতা দেখা দিল। তাই তাকে তার ওয়ারিশদের থেকে প্রাধান্য দেয়া হবে। কিন্তু যদি তার মাল ওয়ারিশদের হাত থেকে ছুটে যায় তবে সে তার মালিক হবে না। তদ্রূপ তার মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদের ব্যাপারটি। কেননা তাদের স্বাধীন হওয়ার বৈধতার প্রেক্ষিতে আদালত তাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছ। সুতরাং তা আর বাতিল হবে না।

وَلَوْ وَلَدَتْ أَمَةٌ له نَصْرَانِيَّةٌ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ ارْتَدَّ فَادَّعَاهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ وهو ابْنُه حُرٌّ وَلَا يَرِثُهُ وَلَو مُسْلِمَةً وَرِثَهُ الِابْنُ إِنْ مَاتَ على الرِّدَّةِ أو لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِمَالِهِ فَظُهِرَ عليه فَهُوَ فَيْءٌ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَذَهَبَ بِمَالِهِ وَظُهِرَ عليه فَلِوَارِثِهِ فَإِنْ لَحِقَ وَ قُضِيَ بِعَبْدِهِ لِابْنِهِ فَكَاتَبَهُ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَالْمُكَاتَبَةُ وَالْوَلَاءُ لِمُوَرِّثِهِ فَإِنْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ رَجُلًا خَطَأً وَلَحِقَ أو قُتِلَ فَالدِّيَةُ في كَسْبِ الْإِسْلَامِ خَاصَّةً وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْقَطْعِ عَمْدًا أو مَاتَ مِنْهُ أو لَحِقَ وَ فَجَاءَ مُسْلِمًا فَمَاتَ منه ضَمِنَ الْقَاطِعُ نِصْفَ الدِّيَةِ في مَالِهِ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لم يَلْحَقْ وَأَسْلَمَ وَمَاتَ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَلَوْ ارْتَدَّ مُكَاتَبٌ وَلَحِقَ وَأُخِذَ بِمَالِهِ وَقُتِلَ فَمُكَاتَبَتُهُ لِمَوْلَاهُ وما بقى لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ له وَلَدٌ فَظُهِرَ عليهم فَالْوَلَدَانِ فَيْءٌ وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ على الْإِسْلَامِ لَا وَلَدُ الْوَلَدِ وَارْتِدَادُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ صَحِيحٌ كَإِسْلَامِهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْتَلُ -

অনুবাদ : আর যদি মুরতাদের নাসরানী (খ্রীষ্টান) দাসী তার রিদ্দত থেকে নিয়ে ছয় মাসের মাথায় সন্তান প্রসব করে। অতঃপর (উক্ত) মুরতাদ তার পিতৃত্ব দাবী করে, তাহলে দাসী তার উম্মেওয়ালাদ হবে। আর সে (সন্তান) তার স্বাধীন ছেলে হবে। কিন্তু সে তার উত্তরাধিকারী হবে না। আর যদি (আলোচিত) দাসী মুসলিম হয় আর সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, কিংবা দারুল হরবে মিলে যায়, তাহলে ঐ সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি মুরতাদ তার সম্পদসহ দারুল হরবে মিলে যায়। অতঃপর মুজাহিদগণ ঐ সম্পদের উপর বিজয়ী হয়, তাহলে তা গণীমতরূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের সাথে মিলিত হওয়ার পর পুনরায় দারুল ইসলামে ফিরে এসে সম্পদ নিয়ে চলে যায়। অতঃপর মুজাহিদগণ ঐ সম্পদের উপর বিজয়ী হয় তবে তা তার উত্তরাধিকারীর হবে। আর যদি মুরতাদ দারুল হরবে মিলে যায়। আর তার গোলাম তার পুত্রের মালিকানা ভুক্ত হিসাবে ফয়সালা করা হয়। অতঃপর ছেলে তার সাথে কিতাবাত চুক্তি করে। ইত্যবশরে মুরতাদ (পুনঃ) মুসলমান অবস্থায় (দারুল ইসলামে) চলে আসে তবে মুকাতাবও তার ওয়ালা ফিরে আসা মুসলমানের জন্য। আর যদি মুরতাদ কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করে দারুল হরবে মিলে যায় কিংবা (ধর্মচ্যুতির কারণে) নিহত করা হয় তাহলে মুসলিম অবস্থায় উপার্জন থেকে দিয়াত আদায় করা হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত (হাত) কর্তনের পর (কর্তনকৃত) মোরতাদ হয়ে যায় এবং সে এ কর্তনের দরুন মরে যায়, কিংবা দারুল হরবে মিলে যায় অতঃপর মুসলমান অবস্থায় ফিরে আসে এবং এ কর্তনের কারণে মরে যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অনুকূলে কর্তকারীর মাল থেকে অর্ধেক দিয়াত আবশ্যক হবে। আর যদি দারুল হরবে না মিলে এবং (দারুল ইসলামেই) পূনঃ ইসলাম

গ্রহণ করে আর (এ ক্ষতের কারণে) মারা যায় তা হলে (কর্তনকারী) পূর্ণ দিয়াতের জামিল হবে। আর যদি মুকাতাব মোরতাদ হয়ে যায় এবং (দারুল হরবে) মিলে যায়, অতঃপর তার সম্পদসহ গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয় তাহলে কিতাবাত চুক্তির সমুদয় অর্থ মনিবের হবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তার উত্তরাধিকারীদের হবে। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে মোরতাদ হয়ে যায় এবং দারুল হরবে মিলে যায় এবং স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং সন্তানের একটি সন্তান হয় (অর্থাৎ তাদের সন্তানের কোন সন্তান প্রসব হয়) আর মুজাহিদগণ তাদের উপর বিজয়ী হয় তাহলে তাদের সন্তানদ্বয় গনীমতের মালরূপে গণ্য হবে। আর তাদের সন্তানকে ইসলাম গ্রহনে বাধ্য করা হবে। তবে তাদের সন্তানের সন্তানকে বাধ্য করা হবে না। আর বোধ সম্পন্ন বালকের ধর্ম ত্যাগ বিশুদ্ধ, যেমন তার ইসলাম গ্রহণ করা বিশুদ্ধ। তাকে ইসলাম গ্রহণ করার উপর বাধ্য করা হবে। তবে হত্যা করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَوْ وَلَدَتْ اَمَةٌ لَهُ الخ : যদি কোন মুসলিম তার খ্রীষ্টান দাসীর সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে মোরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে যদি ছয় মাসের পর উক্ত দাসী সন্তান প্রসব করে আর মুরতাদ উক্ত সন্তানের দাবী করে তাহলে উক্ত সন্তান আজাদ হয়ে যাবে। আর দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। কিন্তু উক্ত সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে দাসী যদি মুসলিমাহ হয় আর উক্ত মুরতাদ মৃত্যুবরণ করে কিংবা দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে ঐ সন্তান উত্তরাধিকারী না হওয়ার কারণ হল সন্তানের মা খ্রীষ্টান হওয়ার দরুন তাকে ইসলাম গ্রহণের উপর বাধ্য করা হবে না। পক্ষান্তরে সন্তানের পিতা মোরতাদ হওয়ার দরুন তাকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার জন্য বাধ্য করা হবে। সুতরাং মাতা পিতার মধ্যে পিতা ইসলামের নিকটতম। তাই সন্তানকে পিতার অনুবর্তী হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে এবং তাকেও মোরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে। আর মোরতাদ অপর মোরতাদের উত্তরাধিকারী হয় না। তাই সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে না। আর দ্বিতীয় সুরতে সন্তানের মাতা-পিতার মধ্যে যেহেতু মাতা সরাসরি মুসলমান তাই সন্তান মুসলিমাহ মাতার অনুবর্তী সাব্যস্ত হয়ে তাতে মুসলমান গণ্য করা হবে। আর মুসলমান মোরতাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে। এ হিসাবে সন্তান উক্ত মোরতাদ মারা গেলে বা দারুল হরবে চলে গেলে সন্তান তার উত্তরাধিকারী হবে।

قوله : وَ اِنْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِمَالِهِ الخ : মোরতাদ যদি নিজ সম্পদসহ দারুল হরবে চলে যায়। এরপর মুজাহিদগণ তার উপর বিজয় লাভ করে উক্ত মালে কব্জা করে তাহলে তা গণীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি মোরতাদ দারুল হরবে একা চলে যায়, অতঃপর দারুল ইসলমে ফিরে এসে তার সম্পদ নিয়ে চলে যায়, তারপর মুজাহিদগণ তার উপর বিজয় লাভ করে তার মালে কব্জা করে। অতঃপর ওয়ারিশগণ গনীমতের মাল বন্টন করার পূর্বে তাদের মাল পেয়ে যায় তাহলে তা তাদের হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। কেননা, প্রথম সুরতে উত্তরাধিকারগণ উক্ত মালে উত্তরাধিকার হয়নি। তাই তা এমন হারবীর মালে পরিণত হয়েছে, যার উপর মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেছে। তাই তা সম্পূর্ণই গনীমতের মাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় সুরতে মাল রেখে তার চলে যাওয়ার পর কাজী তার মালের ব্যাপারে তার উত্তরাধিকারীদের অনুকুলে ফায়সালা দেওয়ায় তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে তার উত্তরাধিকারীদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এখন সে দ্বিতীয়বার তা দারুল ইসলাম থেকে নিয়ে যাওয়া অপহরণের নামান্তর। তাই ওয়ারিছরা এ মালে পূর্ব থেকে মালিক বিবেচিত হবে।

قوله : فَاِنْ قَتَلَ مُرْتَدٌّ رَجُلًا الخ : যদি ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে নিহত করে দারুল হরবে গিয়ে মিলিত হয়ে যায় কিংবা তাকে ধর্মত্যাগের অপরাধে নিহত করা হয়। তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর

মতে শুধু তার মুসলিম অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা দিয়াত আদায় করা হবে। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.)-এর মতে মুসলিম ও মুরতাদ অবস্থায় উপার্জিত মাল থেকে তার ক্ষতিপূরণ আদায় তথা দিয়াত আদায় করা হবে। কেননা, এখানে সাহায্য সম্পর্ক (তথা আকিলাহ) না থাকার কারণে নিকটাত্মীয়গণ মোরতাদের রক্তপনের দায় গ্রহণ করবে না। তাই তার সম্পদ থেকেই দিয়াত সাব্যস্ত হবে। এখন তার সম্পদের ব্যাপারে সাহাবাইন (রহ.) বলেন যে, তার ইসলাম অবস্থায় এবং মোরতাদ অবস্থায় উপার্জিত সকল মালই তার মাল। কেননা উভয় অবস্থায় তার উক্ত সম্পদের উপর তার ব্যবহার কার্যকর হয়। আর এ কারণেই উভয় অবস্থায় তার উপার্জিত মাল থেকে দিয়াত কার্যকর করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন : তার সম্পদ হল মুসলিম অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ। কেননা, এ সম্পদই স্থগিত থাকে। তাই তো ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে মুসলিম অবস্থায় সম্পদে উত্তরাধিকারী চলে কিন্তু মোরতাদ অবস্থার সম্পদে উত্তরাধিকারী চলে না। বরং তা গনীমত হয়ে যায়।

قوله : وَلَوْ إِرْتَدَّ بَعْدَ الْقَطْعِ الخ : কোন মুসলমানের হাত যদি ইচ্ছাপূর্বক কর্তন করা হয় আর তারপর উক্ত কর্তিত-হস্ত ব্যক্তি মোরতাদ হয়ে যায় এবং এ ক্ষতের দরুন সে মোরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কিংবা দারুল হরবে চলে যায়, অতঃপর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতঃ দারুল ইসলামে ফিরে আসে এবং ঐ ক্ষতের কারণে মৃত্যু হয়, তাহলে কর্তকারীর উপর তার মাল থেকে অর্ধেক দিয়াত আবশ্যক হবে। আর এ দিয়াতের মাল উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হবে। কেননা হাত কর্তনের জন্য অর্ধেক দিয়াত দিতে হয়। আর হাত কর্তনের পরিণতিতে কর্তিত ব্যক্তির মৃত্যু বরণ হলে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হয়। কেননা তা হত্যার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উপরোক্ত মাসআলায় হাত কর্তন তো তার ইসলামের অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু তার সংক্রামনের অবস্থা বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ, প্রথম অবস্থায় তার সংক্রামন নিরাপত্তা গুণ বর্জিত স্থানে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার দায় বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এর বিপরীত অবস্থা তথা যদি মোরতাদের হাত কাটা হয় অতঃপর সে ইসলাম গ্রহন করে। আর ঐ ক্ষতের কারণে সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তা ভিন্ন। কেননা, এক্ষেত্রে কর্তনকারীর উপর কোনরূপ দায় আবশ্যক হবে না। কেননা, কোন অপরাধ দায়হীন সাব্যস্ত হলে তা পুনরায় দায়গ্রস্তকারী হয় না। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তথা দারুল হরবে চলে যাওয়া এবং ইসলামী শাসক তার দারুল হরবে অন্তর্ভুক্তির ফায়সালা প্রদানের পর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করতঃ দারুল ইসলামে চলে আসার পর সেই ক্ষতের দরুন মৃত্যুবরণ করার পরও শুধু কর্তনের দিয়াত তথা অর্ধ দিয়াত আবশ্যক হওয়ার কারণ হল : তার দারুল হরবে চলে যাওয়া এর অর্থ হল সে গুণগতভাবে মৃত্যু বরণ করা। আর মৃত্যু ক্ষতের সংক্রমণ রহিত করে। আর এরপর ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে গুণগতভাবে উদ্ভুত নবজীবন। সুতরাং পূর্বেকার অপরাধের হুকুম প্রত্যাবর্তন করবে না।

আর যদি উক্ত হস্ত কর্তিত ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর দারুল হরবে না যায়, বরং দারুল ইসলামে পূণঃ ইসলাম গ্রহণ করে এবং পূর্বেকার কর্তনের ক্ষতের দরুন মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে কর্তনকারীর উপর পূর্ণ দিয়াত আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে এক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়াত আবশ্যক হবে। কেননা, মধ্যখানের মুরতাদ হওয়া অবস্থা ক্ষতের সংক্রামনকে দায়মুক্ত করে দিল। সুতরাং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তা ক্ষতিপূরণকারী হিসাবে পরিবর্তিত হবে না। যেমন মুরতাদ অবস্থায় হস্ত কর্তন করার পর মুসলমান হওয়ার পর ঐ ক্ষতে মৃত্যু বরণ করলে কর্তনকারীর উপর কোনরূপ দায় সাব্যস্ত হবে না।

শায়খাইন (রহ.) এর দলীল : অপরাধটির সূচনা ও শেষ নিরাপত্তাগুণ সম্পন্ন অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ দিয়াত আবশ্যক হবে। যেমন মধ্যখানে মুরতাদ না হওয়ার অবস্থায় আবশ্যক হয়ে থাকে। আর এর কারণ হল অপরাধ বিদ্যমান অবস্থায় নিরাপত্তাগুণ বিদ্যমান থাকা বিবেচ্য নয়। বরং বিবেচ্য হল কারণ সংঘটিত

হওয়া এবং হুকুম প্রয়োগ হওয়ার অবস্থায় নিরাপত্তার গুণ বিদ্যমান থাকা। পক্ষান্তরে বিদ্যমানতার অবস্থা এসব কিছু থেকে পৃথক। সুতরাং পূর্ণ দিয়াত আবশ্যক হবে।

قوله : وَ لَوْ اِرْتَدَّ مُكَاتَبٌ الخ : যদি মুকাতাব গোলাম মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং মুরতাদ অবস্থায় সম্পদ উপার্জন করে। তারপর তাকে তার সম্পদসহ মুসলিম বাহিনী গ্রেফতার করল এবং ইসলাম অস্বীকার করার কারণে তাকে হত্যা করা হল। তাহলে তার মুনিবকে উক্ত নিহত গোলামের সম্পদ থেকে কিতাবাতের চুক্তির সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তার ওয়ারিশদের হবে। সাহাবাইন (রহ.) বলেন, যেভাবে আযাদ মুরতাদের উপার্জন তার মালিকানাধীন হয়, তদ্রূপ মুকাতাবের উপার্জনও তার মালিকানাভুক্ত হবে। আর এ হিসাবেই হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতের কারণ হল, মুকাতাব তার কিতাবাত চুক্তির কারণেই উপার্জিত ম্যালের মালিক হল। আর মুরতাদ হওয়ার দরুন কিতাবাত চুক্তি রহিত হয় না। সুতরাং এমতাবস্থায় উপার্জন রহিত হবে না। কেননা, রিদ্দাতের চেয়ে শক্তিশালী কারণ হল দাসত্ব। অথচ তাতে তার ব্যবহার স্থগিত হয় না। তাই নিম্নতর কারণে অবশ্যই তা স্থগিত হবে না। এজন্য তার উপার্জন গনীমত না হয়ে তা থেকে কিতাবাত চুক্তির অর্থ পরিশোধ করা হবে। আর অবশিষ্ট অর্থ তার ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে।

قوله : وَ لَوْ اِرْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَ لَحِقَا الخ : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুরতাদ হয়ে যায় এবং দারুল হরবে চলে যায় আর সেখানে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে সন্তান প্রসব করে, অথবা তাদের সন্তানের কোন সন্তান প্রসব হয়, অতঃপর তাদের সবার উপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলে তাদের সকল সন্তান গনীমত হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কেননা এক্ষেত্রে বন্দীকৃত স্ত্রী দাসীতে রূপান্তরিত হবে। তাই তার সন্তান সমূহ তার অনুবর্তী হয়ে দাস-দাসিতে পরিণত হবে। আর তাদের সরাসরি সন্তানকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু পরবর্তী সন্তনাদিগণকে বাধ্য করা হবে না। তবে হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদেরকে ও তাদের দাদার অনুবর্তী হিসাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। প্রথমোক্ত মতের দলীল হল, সে নিরেট ফাই বা গনীমতের মাল। কেননা, সে দাদা-দাদী ও পিতা কারো অনুগামী নয়। কেননা, যে অন্যের অনুসারী হয় সে অন্যকে নিজের অনুগামী করতে পারে। আর সে তো দারুল হরবে জন্মগ্রহণের কারণে অপরাপর হারবীর অন্তর্ভুক্ত। তাই সে পিতা বা দাদার অনুগামী হয়নি।

قوله : وَ اِرْتَدَّ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, বোধ সম্পন্ন বালকের ধর্ম ত্যাগে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে ধর্মত্যাগরূপে গণ্য করা হবে। তাই তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। তবে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা যাবে না। তদ্রূপ তার ইসলাম গ্রহণও বিবেচিত হবে। তাই তার পিতা মাতা কাফের হলে সে তাদের ওয়ারিশ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তার মুরতাদ হওয়া ধর্তব্য নয়। কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণ বিবেচ্য হবে। আর ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তার রিদ্দাত ও ইসলাম গ্রহণ কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, সে তো ধর্ম মতের দিক থেকে পিতা বা মাতা বা দুজনের অনুবর্তী। সুতরাং তাকে মূল ও স্বতন্ত্র ধরা যাবে না। তাছাড়া এক্ষেত্রে তার উপর এমন কিছু আহকাম আরোপিত হবে, যাতে তার ক্ষতি মিশ্রিত। তাই তাকে ইসলাম গ্রহণের উপযোগী ধর্তব্য করা হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উক্ত সন্তানের রিদ্দাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে বলেন যে, এতো হল তার ব্যাপারে মারাত্মক ক্ষতির হুকুম লাগানো। সুতরাং তা অন্যান্য ক্ষতি পৌঁছার ব্যাপারের হুকুমের ন্যায় হল। যেমন, তার আযাদ করা বা তালাক প্রদান করা কার্যকর হয় না। তেমনি তার রিদ্দত হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করা হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তার ধর্ম

ত্যাগের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে বলেন যে, ইহা তো বাস্তব সত্য হিসাবেই অস্তিত্বে প্রকাশ হয়েছে। আর বাস্তব সত্য প্রত্যাখান যোগ্য নয়। তবে হা তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কেননা, তাতে তার কল্যাণ নিহিত। কিন্তু তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, হত্যা ইহা শাস্তি। আর বালক থেকে দয়া বশত শাস্তি তুলে নেয়া হয়েছে। আর তার ইসলাম গ্রহণ ও গ্রহণযোগ্য। কেননা, হযরত আলী (রাযি.) বালক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর নবী করীম (সা.) তার ইসলাম গ্রহণকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া হযরত আলী (রাযি.) বালক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি দিয়ে গর্ব প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া এই কারণে যে, ইসলামের হাকীকত তথা অন্তরের বিশ্বাস এবং সেই সঙ্গে সে মৌখিক স্বীকৃতি সম্পূর্ণ করেছে। কেননা, তা স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি যা তার প্রকৃত বিশ্বাসেরই প্রমাণ। যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আর ইসলাম গ্রহণ তা কোনরূপ ক্ষতির বিষয় নয়, বরং তা তো হল সৌভাগ্য। পরকালীন মুক্তির মাধ্যম। তাই দুনিয়াবী সামান্যতম ক্ষতি মিশ্রণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না।

بَابُ الْبُغَاةِ

পরিচ্ছেদ : বিদ্রোহীদের আলোচনা

خَرَجَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ عن طَاعَةِ الْإِمَامِ وَغَلَبُوا على بَلَدٍ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَكَشَفَ شُبْهَتَهُمْ وَبَدَأَ بِقِتَالِهِمْ وَلَوْ لهم فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَ أُتْبِعَ مُوَلِّيهِمْ وَإِلَّا لَا ولم تُسْبَ ذُرِّيَّتُهُمْ وحبس أَمْوَالَهُمْ حتى يَتُوبُوا وَإِنْ احْتَاجَ قَاتَلَ بِسِلَاحِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَإِنْ قَتَلَ بَاغٍ مثله فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ فَقَتَلَ مِصْرِيٌّ مثله فَظُهِرَ علَى الْمِصْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا أو قَتَلَهُ بَاغٍ وقال أنا على حَقٍّ وَرِثَهُ وَإِنْ قال أنا على بَاطِلٍ لَا وَكُرِهَ بَيْعُ السِّلَاحِ من أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَإِنْ لم يَدْرِ أَنَّهُ منهم لَا -

অনুবাদ : একদল মুসলমান শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে কোন শহর অধিকার করে নেয়। তাহলে শাসক তাদেরকে তার দিকে (জামাতের দিকে) ফিরে আসার আহ্বান করবেন এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করবেন। আর যদি তারা সংঘবদ্ধ দল থাকে তাহলে শাসক তাদের সাথে প্রথমে লড়াই শুরু করবেন। তাদের আহতকে হত্যা করে ফেলা হবে এবং তাদের পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হবে। নতুবা নয় (অর্থাৎ যদি তারা সংঘবদ্ধ দল না হয় তাহলে তাদের আহতকে হত্যা আর পলায়নকারীকে ধাওয়া করা হবে না। আর তাদের সন্তানদিগকে বন্দী করা হবে না। আর শাসক তাদের তাওবা করা পর্যন্ত তাদের সম্পদ আটক করবেন। আর যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাদের (আটককৃত) অস্ত্র ও ঘোড়া দ্বারা লড়াই করা যাবে। আর যদি কোন বিদ্রোহী

অপর বিদ্রোহীকে হত্যা করে অতঃপর শাসক তাদের উপর বিজয়ী হন, তাহলে কোন জিনিস ওয়াজিব হবে না। আর যদি বিদ্রোহীরা কোন শহরের উপর বিজয়ী হয়, আর শহরবাসীকে অন্য শহরবাসী (ইচ্ছাকৃতভাবে) হত্যা করে, অতঃপর শহরের উপর শাসকের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে হত্যাকারীকে (কেছাছ হিসাবে) হত্যা করা হবে। আর যদি শাসকের অনুগত কোন ব্যক্তি কোন বিদ্রোহীকে হত্যা করে অথবা কোন বিদ্রোহী তাকে হত্যা করে এবং বলে যে আমি সত্যের উপর আছি। তাহলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি বলে আমি অন্যায়ের উপর আছি তাহলে সে উত্তরাধিকারী হবে না। আর ফিতনাকারীদের (তথা বিদ্রোহীদের) নিকট অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ। আর যদি জানা না থাকে যে, সে বিদ্রোহীদের থেকে তাহলে তার কাছে বিক্রি করা মাকরূহ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : بَابُ الْبُغَاةِ الخ : البغاة শব্দটি البغي এর বহুবচন। অর্থ : ১। تَجَاوُزُ الْحَدِّ সীমালঙ্ঘন করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوْا -

২। اَلتَّسَلُّطُ - اَلظُّلْمُ : জুলুম করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

৩। الخروج عن القانون : বিদ্রোহ করা, আইন অমান্য করা।

পারিভাষিকভাবে بغاوة বলা হয় خَرَجَ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ কিছু সংখ্যক মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের ইমামের আনুগত্য ত্যাগ করল।

الفقه الاسلامى গ্রন্থকার (রহ.) বলেন :

اَلْاِمْتِنَاعُ عَنْ طَاعَةٍ تَثْبُتُ إِمَامَتُهٗ فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ

'বৈধ ইসলামী শাসকের শরীয়ত সমর্থিত কাজে তার আনুগত্য থেকে বিরত থাকা এবং তার উপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা।'

قوله : خَرَجَ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ الخ : যদি কোন মুসলিম শাসক থেকে বিমুখ হয়ে একদল মুসলমান তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে কোন শহরের উপর বিজয়ী হয়ে যায়। তাহলে মুসলিম শাসকের প্রথমত কর্তব্য তাদেরকে তার আনুগত্যে ফিরে আসার আহ্বান করা এবং তাদের ভেতরে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করা। কেননা, হযরত আলী (রাযি.) কুফার নিকটবর্তী হারুরা অঞ্চলের সাথে লড়াই করার পূর্বে তা করেছিলেন। তাছাড়া ইহা হল ফিতনা নিরসনের দুটি পদক্ষেপের মধ্যে উন্নত। কেননা, তাতে বিনা রক্তপাতে বিষয়টির সমাধা হয়ে যেতে পারে, যাতে দ্বিতীয়টি তথা লড়াইয়ের প্রয়োজন না হয়।

قوله : وَبَدَأَ بِقِتَالِهِمْ الخ : যদি আলোচনা দ্বারা বিষয়টি নিঃস্পত্তি সম্ভব না হয় তাহলে লড়াই এর প্রয়োজন। সুতরাং গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, তারা যদি সংঘবদ্ধ দল হয় তবে ইসলামী শাসক তাদের সাথে লড়াই শুরু করতে পারবেন না। কেননা এখানে বিদ্রোহীরা মুসলমান। তাই তাদেরকে আগে বাড়িয়ে হত্যা করা জায়েয নয়, বরং প্রতিরোধের স্বার্থে তাদের হত্যা করা জায়েয়। তবে কাফেরের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, তাদের মধ্যকার কুফুরই তাদেরকে হত্যা করার অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের দলীল : এখানে হুকুম প্রযোজ্য হবে লড়াইয়ের প্রমানের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ, তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করা। অস্ত্র ক্রয় করা বা লড়াইয়ের প্রস্তুতি করার উপর ভিত্তি করেই তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য শাসক তাদের সাথে লড়াই শুরু করতে পারবেন। আর তা এজন্য যে, শাসক যদি তাদের পূর্ণ বিদ্রোহের সংবাদ

অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিরোধ করা থেকে বিরত থাকেন এবং তাদের বাস্তব লড়াই এর অপেক্ষা করতে থাকেন, তাহলে হতে পারে তাদের সুগঠিত ও বিন্যস্ত হওয়ার দরুন তাদেরকে প্রতিরোধ করা শাসকের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং তাদের অনিষ্ট থেকে নিজে ও দেশকে রক্ষা করার জন্য নিজ থেকেই প্রথমে তাদের ধরপাকড় ও বন্দী করা শুরু করবেন। যাতে তারা তা থেকে বিরত থাকে এবং তাওবা করে। অতঃপর শাসক যখন উক্ত সংঘবদ্ধ দলের সাথে লড়াই শুরু করবেন তখন তাদের অনিষ্ট রোধ করার জন্য তাদের আহতদেরকে হত্যা করবেন এবং পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করবেন। আর যদি তারা সংঘবদ্ধ দলভুক্ত না হয় তাহলে আহতদেরকে হত্যা করা হবে না এবং পলায়নকারীদের ধাওয়া করা হবে না। কেননা, তাদের সংখ্যা স্বল্প হওয়ার দরুন তাদের থেকে অনিষ্ট তাদের ছত্রভঙ্গ করার দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায়।

قوله : وَ لَمْ تُسْبَ ذُرِّيَّتُهُمْ الخ : বিদ্রোহীদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে না। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাযি.) এর আচরণই দলীল। তা হল তিনি বহু বার বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করেছেন। কিন্তু তাদের সন্তানদেরকে এবং মহিলাদেরকে বন্দি করেন নাই। যেমন, উষ্ট্রের যুদ্ধে, সিফফিনের যুদ্ধে, হারুরার যুদ্ধে তিনি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা নারীকে বন্দী করেননি।

قوله : وَ حُبِسَ اَمْوَالِهِمْ الخ : ইসলামী শাসক তাদের মাল আটক রাখবেন। তবে তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করবেন না এবং তাদের তাওবা না করা পর্যন্ত (সে মাল তাদেরকে ফেরত দেবেন না।) কেননা, জামাল যুদ্ধে হযরত আলী (রাযি.) ঘোষণা করেছিলেন :

وَ لَا يُقْتَلُ اَسِيرٌ وَ لَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَ لَا يُؤْخَذُ مَالٌ

'কোন বন্দীকে হত্যা করা হবে না। কারো আবরু উন্মুক্ত করা হবে না। আর কারো মালকব্জা করা হবে না।' তাছাড়া তারা তো মুসলমান। সুতরাং তার মুসলমানিত্বের দরুন তার মাল নিরপত্তা প্রাপ্ত। তবে তা আটক করে রাখা হবে তাদের শক্তি খর্ব করার লক্ষ্যে, তাদের অনিষ্ট রোধ করার লক্ষ্যে। আর এ ক্ষেত্রে যে সম্পদ আটক রাখা কষ্টকর তা তিনি বিক্রিও করতে পারেন এবং মূল্য সংরক্ষণ করতে পারবেন। কেননা, মূল্য সংরক্ষণ করা অধিকতর সহজ ও কল্যাণকর। আর তাদের তাওবার পর তা তাদের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে। কেননা, তখন তো আটক রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই এবং তাতে গনীমতের কোন বিধান নেই।

قوله : وَ اِنْ اِحْتَاجَ قَاتَلَ الخ : আর যদি শাসকের প্রয়োজন হয় তবে তিনি তাদের ঘোড়া বা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ তাদের ঘোড়া বা অস্ত্র দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন। পক্ষান্তরে এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে তা দ্বারা লড়াই করা জায়েয নয়। কেননা, এগুলো তো অপর মুসলমানের মাল। সুতরাং তার সম্মতি ছাড়া তা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

আমাদের দলীল : হযরত আলী (রাযি.) বসরার মধ্যে তার অনুগামীদের মধ্যে অস্ত্র বন্টন করে দিয়েছিলেন। আর তিনি তা করেছিলেন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে। তাতে মালিকানা প্রদানের জন্য নয়। তাছাড়া শাসকের তো প্রয়োজনে তার অনুগত প্রজাদের মালেও হস্তক্ষেপ করার বৈধতা আছে। সুতরাং বিদ্রোহীর মালে তো আরো অধিক-ভাবে থাকবে। তাছাড়া বড় ধরনের ফিতনা নিরসনের জন্য এ লঘুতর ক্ষতি গ্রহণ করার মাঝে কোন সমস্যা নেই।

قوله : وَ اِنْ قَتَلَ بَاغٍ مِثْلَهُ الخ : যদি কোন বিদ্রোহী অপর বিদ্রোহীকে হত্যা করে অতঃপর শাসক তাদের উপর বিজয়ী হোন তাহলে তাদের উপর কিছাছ বা দিয়াত কোন কিছুরই ফায়সালা প্রদান করা হবে না। কেননা, যখন হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় তখন তো তারা কোন ন্যায়পরায়ন শাসকের কতৃত্বে ছিলো না। তাই তা দারুল হরবের পরস্পরের মধ্যে হত্যাযজ্ঞের ন্যায় হল। আর যদি বিদ্রোহীরা কোন শহর দখল করে নেয় আর উক্ত শহরের এক বসবাসকারী অপর বসবাসকারীকে হত্যা করে ফেলে, তারপর শাসক উক্ত শহরের উপর বিজয়ী হন,

তাহলে হত্যাকারী থেকে কিছাছ নেয়া হবে। আর তা তখন, যখন শহরবাসীর উপর বিদ্রোহীদের কোন আইন কানুন জারী হয় না বরং এর আগেই তারা উৎখাত হয়ে যায়। কেননা, এক্ষেত্রে গুণগত দিক থেকে তাদের উপর শাসকের কর্তৃত্ব বিদ্রমান রয়েছে। তাই তাদের উপর শাসকের জারীকৃত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

قوله : وَاِنْ قَتَلَ عَادِلٌ بَاغِيًا الخ : শাসকের অনুগত কোন ব্যক্তি যদি বিদ্রোহীকে হত্যা করে আর উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারীর কোন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি কোন বিদ্রোহী শাসকের অনুগত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, আর বলে যে, আমি প্রথমে এবং এখনও ন্যায় এর উপর আছি, তাহলে সেও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি বলে যে, আমি জেনে শুনে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি, তাহলে সে তার ওয়ারিশ হবে না। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উভয় অবস্থায়ই বিদ্রোহী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

আলোচ্য মতপার্থক্যের মূল কারণ হল : যদি ইমামের অনুগত ব্যক্তি বিদ্রোহীর প্রাণ না সম্পদ নষ্ট করে তাহলে সে তার দায় গ্রহণ করবে না এবং গোনাহগারও হবে না। কেননা, সে তো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতি আদিষ্ট। পক্ষান্তরে বিদ্রোহী যদি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর قول قديم তথা তার পূর্ববর্তী মতে ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবে বলেছেন। কেননা, সে তো নিরাপত্তা সম্পন্ন মাল নষ্ট করেছে, কিংবা নিরাপত্তা সম্পন্ন জান হত্যা করেছে। সুতরাং প্রতিরোধ শক্তি লাভের পূর্বের অবস্থার উপর কিয়াস করে ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল : কোন বিদ্রোহী শাসকের অনুগত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে ক্ষতিপুরণের দায় গ্রহণ করবে না। এ ব্যাপারে ইজমায়ে সাহাবা সংঘটিত হয়েছে, যা ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া একারণে যে, বিদ্রোহী ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই জান বা মাল নষ্ট করেছে। আর ভুল ব্যাখ্যাজনিত পদক্ষেপের সাথে যদি প্রতিরোধ শক্তি জড়িত হয় তাহলে ক্ষতিপুরণ রোধ করার ক্ষেত্রে তা নির্ভুল পদক্ষেপের সাথে যুক্ত হবে। কেননা, শরীয়াতের বিধান আরোপিত হওয়ার জন্য শাসকের পক্ষ থেকে বা নিজ পক্ষ থেকে বাধ্য-বাধকতা আরোপ অপরিহার্য। কিন্তু এখানে বাধ্যবাধকতা অনুপস্থিত।

কেননা সে তো নিজস্ব ব্যাখ্যায় বৈধ ধারণা করেছে। আর প্রতিরোধ শক্তি বিদ্যমান থাকার দরুন শাসকের কতৃত্ব অনুপস্থিত। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি অর্জনের পূর্বে শাসকের কর্তৃত্ব বহাল থাকে, তেমনি বৈধতার নিজস্ব ব্যাখ্যা না থাকা অবস্থায় বাধ্যবাধকতা গ্রহণের দিকটি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে,শাসকের অনুগত ব্যক্তি কর্তৃক বিদ্রোহীকে হত্যা করা বৈধ হত্যা। সুতরাং উত্তরাধিকারী রহিত হবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বিদ্রোহী কর্তৃক শাসকের অনুগত ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে বলেন যে, এক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ রোধ করার ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচনা হবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচিত হবে না। তরফাইন (রহ.) বলেন, এক্ষেত্রে যেমন ক্ষতিপুরণ রোধ করার প্রয়োজন রয়েছে, তদ্রূপ মীরাস বঞ্চনা রোধ করার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, নিকটাত্মীয় হল উত্তরাধিকারী লাভের কারণ। সুতরাং এক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা বিবেচ্য হবে। তবে এজন্য শর্ত হল নিজ বিশ্বাস ও আকীদার উপর তার বহাল থাকা।

قوله : وَكُرِهَ بَيْعُ السِّلَاحِ الخ : আর ফিতনাকারী তথা বিদ্রোহীদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ। কেননা, এ হলো অন্যায়ের সাহায্য করা। তদ্রূপ তাদেরকে অস্ত্র দান করা বা অন্য কোন পন্থায় মালিক বানিয়ে দেওয়া মাকরূহ। আর যদি তার ব্যাপারে সে যে বিদ্রোহী তা জানা না থাকে আর তার কাছে বিক্রি করা হয় তবে তাতে দোষের কোন কারণ নেই। আর নিষিদ্ধ হল সরাসরি অস্ত্র বিক্রি করা। এমনকি যদি তাদের নিকট অস্ত্র তৈরীর পৃথক সামগ্রী বিক্রি করা নিষেধ নয়। তা এমন যেমন বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করা জায়েয নয়। তবে তার পৃথক সামগ্রী যেমন কাঠের টুকরা বিক্রি করে তবে তা নাজায়েয নয়।

كِتَابُ اللَّقِيطِ

অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া শিশু

نُدِبَ الْتِقَاطُهُ وَوَجَبَ أن خِيفَ الضَّيَاعُ وهو حُرٌّ وَنَفَقَتُهُ في بَيْتِ الْمَالِ كَإِرْثِهِ وَجِنَايَتِهِ وَلَا يَأْخُذُهُ منه أَحَدٌ وَيَثْبتُ نَسَبُهُ من وَاحِدٍ وَمِنْ اثْنَيْنِ وَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَمِنْ ذِمِّيٍّ وهو مُسْلِمٌ إِنْ لم يَكُنْ في مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مِنْ عَبْدٍ وَ هُوَ حُرٌّ وَلَا يُرَقُّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ وُجِدَ معه مَالٌ فَهُوَ له وَلَا يَصِحُّ لِلْمُلْتَقِطِ عليه نِكَاحٌ وَبَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَيُسَلِّمُهُ في حِرْفَةٍ وَيَقْبِضُ هِبَتَهُ -

অনুবাদ : শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু যদি প্রাণ হানির প্রবল আশংকা হয় তাহলে কুড়িয়ে নেওয়া ওয়াজিব। আর সে (কুড়িয়ে পাওয়া শিশু) স্বাধীন। তার ভরণপোষণ বায়তুল মাল থেকে হবে। যেমন তার মিরাস বা অপরাধের ক্ষতিপুরণ বায়তুল মালের উপর প্রযোজ্য। কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি থেকে তাকে কেহ নিতে পারবে না। আর তার নসব সাব্যস্ত হবে এক জনের সাথে। (যদি সে তার সন্তান হওয়ার দাবী করে) এবং দুজনের সাথে। (যদি দুজন দাবী করে আর পৃথকভাবে কারো সাথে কোন প্রমাণ থাকে না) আর যদি উভয় থেকে কোন একজন শিশুর সাথে বিশিষ্ট কোন গুণের উল্লেখ করে তাহলে সে তার অধিক হকদার হবে। আর জিম্মির সাথেও বংশ সাব্যস্ত হবে (যদি সে সন্তানের দাবী করে।) কিন্তু শিশুটি মুসলমান গণ্য হবে যদি তাকে জিম্মিদের কোন লোকালয়ে পাওয়া না যায়। অনুরূপভাবে গোলামের সাথেও বংশ সাব্যস্ত হবে (যদি সে সন্তানের দাবী করে), কিন্তু শিশুটি স্বাধীন গণ্য হবে। দলীল প্রমাণ ছাড়া তাকে গোলাম সাব্যস্ত করা যাবে না। আর যদি তার সাথে মাল পাওয়া যায় তবে তা তারই হবে। আর উদ্ধারকারীর জন্য তাকে বিবাহ দেওয়া, বিক্রি করা বা ভাড়ায় দেওয়া সহীহ নয়। তবে তাকে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করতে বা তার অনুকুলে দান গ্রহণ করতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) لقيط অধ্যায়কে جهاد অধ্যায়ের পর আনার কারণ হল তাতেও জীবনের আশংকা রয়েছে। আর لقيط কে لقطة এর পূর্বে আনার কারণ হল لقيط এর সাথে জীবনের সম্পর্ক আর لقطة এর সাথে মালের সম্পর্ক। সুতরাং كتاب اللقيط কে كتاب اللقطة এর পূর্বে আনাই সঙ্গত। لقيط শব্দের অর্থ হল কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। সুতরাং রাস্তায় বা অন্য কোথাও পড়ে থাকা শিশু সন্তানকে কুড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব। কেননা, এতে তার প্রাণ রক্ষা হয় বা ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। আর যদি উক্ত শিশুর ব্যাপারে এমন হয় যে, তাকে কুড়িয়ে না নিলে তার প্রাণ হানীর প্রবল আশংকা থাকে তাহলে এক্ষেত্রে কুড়িয়ে নেওয়া ওয়াজিব।

قوله : وَهُوَ حُرٌّ الخ : কুড়িয়ে পাওয়া শিশু সাধারণভাবে স্বাধীন হিসাবেই ধর্তব্য হবে। কেননা, আদম সন্তানের মূল হল স্বাধীনতা। তাছাড়া বাসস্থানসূহ হলো স্বাধীনের আবাস ভূমি। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশই হচ্ছে স্বাধীন। তাই স্বাধীনতার আধিক্যের উপর কিয়াস করে আমরা তাকে স্বাধীন হিসাবেই গণ্য করব।

قوله : وَ نَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ الخ : আর তার ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল থেকেই হবে। কেননা, হযরত উমর (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.) থেকে এমনই বর্ণিত আছে। তাছাড়া সে তো উপার্জনে অক্ষম মুসলমান। যার নিজস্ব কোন সম্পদ নাই এবং কোন নিকটাত্মীয় নাই। তাই সে এমন পঙ্গু ব্যক্তির সাদৃশ্য হল যার কোন মাল নাই। তাছাড়া একারণে যে তার মিরাস বায়তুল মালের হয়ে থাকে এবং তার কৃত অপরাধের ক্ষতি পুরণ বায়তুল মালের উপর আসে।

قوله : وَلَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ الخ : যে ব্যক্তি শিশু কুড়িয়ে আনবে তার কাছ থেকে অন্য কেহ নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, যে কুড়িয়ে আনল তার সংরক্ষণ অধিকার অন্যের তুলনায় অগ্রবর্তী। সুতরাং সে-ই তাকে লালন-পালন করবে। আর সে উক্ত শিশুটির জন্য খরচ করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকারী হবে। কেননা, উক্ত শিশুটির ব্যাপারে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু কাজী যদি তাকে খরচ করার আদেশ দিয়ে থাকেন তবে সে খরচ করবে এবং তা ঐ শিশুটির অনুকুলে ঋণ হিসাবে গণ্য হবে, যা সে কর্ম সক্ষম হওয়ার পর পরিশোধ করবে।

قوله : وَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدٍ الخ : উক্ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির ব্যাপারে কেহ যদি তার সন্তান হওয়ার দাবী করে তবে তা গ্রহণ করা হবে। ইহা হচ্ছে সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবী হল তার কথা গ্রহণ না হওয়া। কেননা, এতে কুড়ানো ব্যক্তির হক বাতিল হওয়া অন্তর্ভুক্ত। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হল এর মধ্যে সন্তানের কল্যাণ রয়েছে। কেননা, সে বংশ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে, স্বীকারকারীর সাথে তার মিরাশ জারী হবে।

আর কেহ কেহ বলেন, কুড়ানেওয়ালার হস্তে নিয়ন্ত্রণ বাকী রেখে দাবীদারের সাথে বংশ সম্পর্ক সম্পৃক্ত করা হবে। আর কুড়ানেওয়ালা ব্যক্তি যদি প্রথমে কুড়ানোর স্বীকৃতি প্রদান করে অতঃপর তার সন্তান হওয়ার দাবী করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াস ও সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী তার দাবী বিশুদ্ধ। তবে বিশুদ্ধতম মত হল যে, এ ক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম কিয়াস ও সাধারণ কিয়াস এর দাবী বিপরীতমুখী। আর যদি এক সাথে দুজন ব্যক্তি তার সন্তান হওয়ার দাবী উত্থাপন করে তাহলে উভয়ের মধ্যে যে শিশুটির শারীরিক কোন আলামত বর্ণনা করবে যা তার মধ্যে বিদ্যমান তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, শারীরিক আলামত তার বক্তব্য অনুযায়ী হওয়াতে বাস্তব অবস্থা তার পক্ষে সাক্ষী হচ্ছে। আর যদি তাদের মধ্যে একজন সাক্ষ্য পেশ করতে পারে তবে তা অধিকতর শক্তিশালী। আর যদি উভয়ের কেহ কোন আলামত বলতে না পারে তাহলে সন্তান উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যদি একজন পূর্বে আর অপরজন পরে দাবী করে তাহলে প্রথম জনের সাথে সন্তানের পৈত্রিক সম্পর্ক হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় জনের দাবী অমূলক হবে। তবে হা যদি অপরজন প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তা ভিন্ন।

قوله : وَ مِنْ ذِمِّيٍّ الخ : যদি কোন জিম্মি উক্ত কুড়ানো সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করে আর উক্ত সন্তানকে মুসলমানের শহর বা গ্রামে পাওয়া যায় তাহলেও তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু সন্তান মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। ইহা হল সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কেননা, এখনো জিম্মির দাবী দ্বারা সন্তানের ক্ষেত্রে কল্যাণকর বিষয় যেভাবে আছে তেমনি ক্ষতিকরও আছে। সুতরাং আমরা যা তার ক্ষেত্রে কল্যাণজনক তার ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করব। আর তা হল পিতৃত্বের সম্পর্ক। কেননা, এক্ষেত্রে সন্তানের কল্যাণ রয়েছে। আর যা তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর তা বর্জন করব তাহল জিম্মির ধর্মের অনুগামী সাব্যস্ত করা। তা গ্রহণ করা হবে না। কেননা, এতে সন্তানের ক্ষতি রয়েছে। আর হ্যাঁ যদি তাকে মুসলমান এলাকায় পাওয়া যায় তবে তাকে মুসলমান হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা, এতে তার কল্যাণ জড়িত। আর যদি যিম্মিদের লোকালয়ে বা গীর্জা বা ইহুদীদের উপাসনালয়ে পাওয়া যায় তাহলে তাকে জিম্মিই সাব্যস্ত করা হবে।

আর উদ্ধারকারী জিম্মি হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে পক্ষান্তরে যদি যিম্মির এলাকা বা গির্জা থেকে উদ্ধারকারী মুসলমান হয় কিংবা মুসলমান এলাকা থেকে কোন জিম্মি উদ্ধার করে তাহলে সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতে ভিন্নতা রয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, মাবসূত গ্রন্থের লকীত পর্বে স্থানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা, স্থানের সাথে সন্তানের সম্পর্ক রয়েছে। আবার কোন কোন নুছখাতে কিতাবুদ্দাওয়াতে উদ্ধারকারীর দিকটি বিবেচনা করা হয়েছে।

قوله : وَ مِنْ عَبْدٍ الخ : কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির ব্যাপারে যদি কোন দাস দাবী করে যে, সে তার সন্তান। তাহলে তার দাবী গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তার সাথেই সন্তানের বংশ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে উক্ত সন্তান গোলাম হবে না বরং স্বাধীন হবে। পিতৃত্বের দাবী গ্রহণ করা হবে। কেননা, তাতে সন্তানের কল্যাণ রয়েছে। আর তাকে গোলাম সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, গোলাম স্বামীর স্বাধীন স্ত্রীর ঔরসে সন্তান হতে পরে। সুতরাং শুধু সন্দেহের দরুন তার স্বাধীনতা রহিত করা হবে না। আর যদি কেহ দাবী করে যে, উক্ত শিশু তার গোলাম বা দাসী তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, বাহ্যত সে তো স্বাধীন। তবে হা যদি গোলাম হওয়ার উপর কোন দলীল-প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তা ভিন্ন। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে তাকে গোলাম হিসাবেই গণ্য করা হবে।

قوله : وَ اِنْ وُجِدَ مَعَهٗ مَالٌ الخ : কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের সাথে যদি কোন মালামাল পাওয়া যায় তাহলে তা উক্ত কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানেরই হবে। তেমনি যদি তার বাহনের মধ্যে মাল পাওয়া যায় তবে তা উক্ত সন্তানের বিবেচ্য হবে। উভয় ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা সাক্ষী হবে এবং সে অনুযায়ী হুকুম সাব্যস্ত হবে। অতঃপর উদ্ধারকারী উক্ত মাল থেকে কাজীর অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত সন্তানের জন্য ব্যয় করবেন। অর্থাৎ, তার জন্য অপরিহার্য সামগ্রী ও অন্যান্য সামান খরিদ করবেন। কেননা, কাজীর জন্য এ ধরনের মাল ব্যয় করার কর্তৃত্ব রয়েছে।

قوله : وَ لَا يَصِحُّ لِلْمُلْتَقِطِ الخ : উদ্ধারকারীর জন্য উক্ত সন্তানকে বিবাহ দেয়ার অধিকার নেই। কেননা, বিবাহ দেয়ার অধিকারীর কারণ আত্মীয়তা, মালিকানা, শাসন কর্তৃত্ব। অথচ উদ্ধারকারীর মাঝে কোনটিই নেই। অনুরূপভাবে তার মাল বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, তার মালেও তার অভিভাবকত্ব নেই। অনুরূপভাবে লকীতকে মজুরীর বিনিময়ে কাজে লাগাতে পারবে না। কেননা, এতে শিশুর শ্রম শুবিধা বিনিষ্ট করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সে শিশুর চাচার সমতুল্য হল।

قوله : وَ يُسَلِّمُهٗ فِىْ حِرْفَةٍ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উদ্ধারকারী তাকে শিল্পকর্মে নিযুক্ত করতে পারবেন। কেননা, এতে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম অবস্থায় তাকে উৎকর্ষে নিয়ে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে উদ্ধারকারী তার অনুকূলে দানও গ্রহণ করতে পারেন। কেননা, এতে তার কল্যাণ রয়েছে।

كِتَابُ اللُّقْطَةِ

অধ্যায় : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু প্রসঙ্গে

لُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ أَمَانَةٌ إِنْ أَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا على رَبِّهَا وَأَشْهَدَ وعَرَّفَ إِلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ رَبَّهَا لَا يَطْلُبُهَا ثُمَّ تَصَدَّقَ فَإِنْ جاء رَبُّهَا نَفَّذَهُ أو ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ وَصَحَّ الْتِقَاطُ الْبَهِيمَةِ وهو مُتَبَرِّعٌ في الْإِنْفَاقِ على اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ وَبِإِذْنِ الْقَاضِي يَكُونُ دَيْنًا وَإِنْ كان لها نَفْعٌ أَجَّرَهَا وَأَنْفَقَ عليها وَإِلَّا بَاعَهَا وَمَنَعَهَا من رَبِّهَا حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ وَلَا يَدْفَعُهَا إلا مُدَّعِيهَا بِلَا بَيِّنَةٍ فإن بَيَّنَ عَلَامَتَهَا حَلَّ الدَّفْعُ بِلَا جَبْرٍ وَيَنْتَفِعُ بها لو فَقِيرًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَ صَحَّ عَلَى أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ لو فُقَرَاءَ -

অনুবাদ : (মক্কার) হালাল ও হারাম স্থানে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু আমানত, যদি তা তার মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠিয়ে থাকে এবং সাক্ষী রাখে। আর ঘোষণা দেবে সে (সময়) পর্যন্ত যে, তার মালিক তা অনুসন্ধান করছেন। অতঃপর তা সদকা করে দেবে। তারপর যদি তার মালিক এসে পড়ে তাহলে সে (মালিক) চাইলে ঐ দান বহাল রাখবে অথবা উদ্ধারকারীকে সে জামিন করতে পারে। চতুষ্পদ প্রাণী কুড়িয়ে নেয়া বৈধ। আর উদ্ধারকারী কুড়িয়ে পাওয়া শিশু বা বস্তুর উপর (তথা প্রাণীর উপর) ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাদানকারী হবে। আর বিচারকের অনুমতিক্রমে ব্যয় করলে তা ঋণ স্বরূপ হবে। আর যদি পশুটির শ্রম যোগ্যতা থাকে তাহলে (শাসকের বা বিচারকের অনুমতিক্রমে) তাকে ভাড়ায় খাটাবে এবং তার উপর ব্যয় করবে। নতুবা (অর্থাৎ, দি পশুটি শ্রমযোগ্য না থাকে) তবে তা বিক্রি করে দেবে। আর খরচ প্রদান না করা পর্যন্ত পশুকে তার মালিক থেকে বিরত রাখবে। আর সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া 'লুকতা'র দাবীকারীর কাছে লুকতা প্রদান করা যাবে না। আর যদি দাবীকারী তার (লুকতার) নিদর্শন বা চিহ্ন বর্ণনা করে তাহলে উদ্ধারকারীর জন্য তা তার কাছে প্রদান করা বৈধ কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়া। আর যদি উদ্ধারকারী দরিদ্র হয় তবে সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। নতুবা (অর্থাৎ, সে ধনী হলে) অন্য কাউকে তা সদকা করে দেবে। আর তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান যদি তারা দরিদ্র হয় তবে তাদেরকেও প্রদান করা সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : اَللُّقَطَةُ الْحِلِّ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হালাল বা হারাম স্থানে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু আমানত হিসাবে থাকবে যখন সে তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে থাকে এবং এমর্মে সাক্ষী রাখে। কেননা রাস্তাঘাটে কোথাও মালিক ছাড়া কোন কিছু পেলে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার নিয়াতে কুড়িয়ে নেয়া

শরীয়াত-সম্মত। এমনকি যদি কুড়িয়ে না নিলে তা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা তুলে নেয়া ওয়াজিব। সুতরাং উদ্ধারকারী যদি তা ফিরিয়ে দেয়ার নিয়তে ওঠায় এবং মালিকও তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তা সাক্ষ্যের সমতুল্য। আর যদি উদ্ধারকারী তা তুলে থাকে নিজে দখল করার জন্য তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে তার জামিন হবে। কেননা, সে অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া এবং শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া তুলে নিয়েছে। আর যদি উদ্ধারকারী বস্তু কুড়ানোর সময় কোন সাক্ষ্য রাখে না। অতঃপর বলে যে, আমি তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তুলে ছিলাম। কিন্তু মালিক তা অস্বীকার করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে সে যামীন হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে সে যামীন হবে না। বরং উদ্ধারকারীর কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা, বাস্তবতা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাছাড়া সে তো পুণ্যের পথ বেছে নিয়েছে। পাপের পথ নয়।

তরফাইন (রহ.) এর দলিল : সে তো যামীন হওয়ার কারণ স্বীকার করেছে, অর্থাৎ অন্যের মাল তুলে নেয়ার কথা স্বীকার করেছে। সাথে দায় মুক্তিরও দাবী করছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই সে দায়মুক্ত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যে বাহ্যিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন ঠিক এর বিপরীতে একটি বাহ্যিকতা রয়েছে। তা হল সে তা নিজের জন্য কার্য সম্পাদন করা।

قوله : وَ عَرَّفَ اِلٰى اَنْ عَلِمَ الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এমন সময় পর্যন্ত ঘোষণা করা হবে যে পর্যন্ত অনুমান করা হবে যে, মালিক তার ঐ বস্তুর অনুসন্ধান করবে না। এ ব্যাপারে ইমাম কুদুরী (রহ.) বলেন, যদি বস্তুটির মূল্য দশ দিরহামের কম হয় তাহলে কয়েক দিন ঘোষণা দেবে। আর যদি দশ দিরহামের বেশি হয় তাহলে এক বৎসর ঘোষণা দেবে। ইমাম কুদুরী (রহ.) এর উক্ত আলোচনার ব্যাখ্যায় হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) যা আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম হল, ইমাম কুদুরী (রহ.) যা বর্ণনা করেছেন তা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত। আর তার কথায় যে কয়েকদিন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাসক যে কয়দিন সমীচীন মনে করবেন তাই। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মাবসূত গ্রন্থে কম-বেশির পার্থক্য না করে এক বৎসর নির্ধারণ করেছেন। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এরও মত। কেননা নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন : مَنْ اِلْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيَعْرِفْهُ سَنَةً - যে ব্যক্তি কোন বস্তু কুড়িয়ে নেয় সে যেন তা এক বৎসর প্রচার করে। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কম বেশির কোন পার্থক্য করেননি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল হল : উক্ত হাদীসে এক বৎসরের সময় সীমা নির্ধারণ এমন لقطة এর ব্যাপারে ছিল যা এক শত দিনার সমান এক হাজার দিরহাম সমপরিমাণ। আর চুরির ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন এবং স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান হালাল হওয়ার জন্য দশ ও দশোর্ধ সংখ্যা এক হাজারের সমগুণ সম্পন্ন। কিন্তু তা যাকাতের বিধান সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এক হাজার দিরহামের সমগুণ সম্পন্ন নয়। সুতরাং দশ বা দশোর্ধ পরিমাণে এক বৎসরের শর্তারোপ করা হবে। আর এর নিম্নে এক হাজার দিরহাম সমগুণ সম্পন্ন নয় বিধায় তার কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রন্থকার (রহ.) যা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ এ ধরনের কোন সময়সীমা নির্ধারণ আবশ্যকীয় নয়। বরং উদ্ধারকারীর বিবেচনায় ছেড়ে দেয়া হবে। সে তা এমন সময় পর্যন্ত ঘোষণা করবে এতে প্রবল ধারণা হয় যে, মালিক আর তা খোঁজ করবে না।

উল্লেখ্য যে, বস্তুটি যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত হয় তবে যখন নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হবে তখন তা সদকা করে দেবে। আর বস্তুটির কুড়ানোর স্থানে ঘোষণা দেয়া উত্তম। কেননা, মালিক এখানেই তা অনুসন্ধান করবে। আর যদি এমন হয় যে, সচরাচর মালিক এমন বস্তু খোঁজ করে না, যেমন আনারের খোলস বা দানা। তাহলে তা ফেলে যাওয়া বস্তুটি মুহাব হওয়ার প্রমাণ। এমন কি তা প্রচার করা ছাড়া ব্যবহার করা বৈধ। তবে হা তাতেও মালিকের মালিকানা বহাল থাকবে। আর যদি ঘোষণাযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে ঘোষণার পরও মালিক পাওয়া

না যায়, তাহলে তা সদকা করে দেবে। কেননা, তা মালিকের নিকট পৌছানো ওয়াজিব। সুতরাং সরাসরি যদি বস্তুটি পৌছানো যায় তবে তা ভাল, অন্যথায় তা সদকা করার মাধ্যমে ছওয়াব মালিকের অনুকুলে হওয়ার আশা করা যায়।

قوله : فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا الخ : যদি সদকা করার পর মালিক হাজির হয় তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে সে চাইলে সদকাকে অনুমোদন করে দেবে। কেননা, সদকা তো শরীয়াতের অনুমোদনে হয়েছে। কিন্তু এতে মালিকের অনুমতি পাওয়া যায়নি। তাই তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। তবে হা অনুমোদন দানের পূর্বেই দরিদ্রের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তাই অনুমোদনের সময় বস্তু বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য নয়। আর যদি মালিক ইচ্ছা করে তাহলে উদ্ধারকারীকে যামীন করতে পারবে। কেননা সে (উদ্ধারকারী) মালিকের অনুমতি ছাড়া বস্তু দান করেছে। তবে তা শরয়ীভাবে বৈধ ছিল। কিন্তু যেহেতু তাতে বান্দার হক সম্পৃক্ত তাই তার ক্ষতিপুরণ আবশ্যক হবে। যেমন অতী ক্ষুধার সময় অন্যের মাল ভক্ষণ করা বৈধ। তবে তার ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।

قوله : وَصَحَّ اِلْتِقَاطُ الْبَهِيْمَةِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, চতুষ্পদ প্রাণী কুড়িয়ে নেয়া বৈধ। তবে বকরী থেকে নিয়ে উট, গরুসহ অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে উট, গরু ও ভেড়া যদি মরুভূমিতে পাওয়া যায় তাহলে ছেড়ে দেয়া উত্তম। কেননা, মূল বিধান হল অন্যের মাল তার অনুমতি ছাড়া নেয়া অবৈধ ও হারাম। তার অনুমোদন হল এমন বস্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে যা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং যদি উক্ত বস্তুর সাথে এমন জিনিস থাকে যা তাকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে, তবে তা ছেড়ে দেয়াই উত্তম। হা এক্ষেত্রেও যেহেতু তার অনুভূতি নেই তাই ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই তা গ্রহণ করা মাকরূহ এবং ছেড়ে দেয়া উত্তম হওয়ার ফায়সালা দেয়া হবে।

আমাদের দলিল হল : ইহা এমন হারানো বস্তু যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং একজন মানুষের মাল হিফাজত করার লক্ষ্যে তা সংরক্ষণ করা হবে এবং তার ঘোষণা দেয়া হবে।

قوله : وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِى الْاِنْفَاقِ الخ : আর যদি উদ্ধারকারী উদ্ধারকৃত শিশুরা প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণে শাসকের অনুমতি ছাড়া ব্যয় করে থাকে তাহলে তার এ ব্যায়ের ক্ষেত্রে সে সেচ্ছা দানকারী হবে। পরবর্তীতে সে তার মালিক থেকে বা শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তার থেকে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কেননা মালিকানা দায় এর দিক থেকে তার কর্তৃত্ব অসম্পূর্ণ। আর যদি শাসকের নির্দেশে ব্যয় করে থাকে তাহলে তা ঋণ স্বরূপ হবে। যা মালিক বা শিশু নিজে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে পরিশোধ করতে হবে। কেননা, বিচারকের তো কর্তৃত্ব অনুপস্থিত ব্যক্তির মালে তার কল্যাণার্থে বিদ্যমান রয়েছে।

قوله : وَلَوْ كَانَ لَهُ نَفْعٌ الخ : উদ্ধারকারী যখন বিষয়টি শাসকের নিকট উপস্থাপন করবে তখন উদ্ধারকৃত বস্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে শাসক বিবেচনা করবেন যে, উক্ত প্রাণী বা বস্তু শ্রম উপযোগী কি না। যদি সে শ্রম উপযোগী হয় তাহলে তাকে শ্রমে নিযুক্ত করার হুকুম প্রদান করবেন এবং তার শ্রমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। আর যদি শ্রম উপযোগী না হয় তাহলে শাসক তা বিক্রি করে তার অর্থ সংরক্ষণ করবেন। যাতে বাস্তব সত্ত্বা সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হওয়ার অবস্থায় তার গুণগত সত্ত্বা সংরক্ষণ করা যায়।

قوله : وَمَنَعَهَا مِنْ رَبِّهَا حَتّٰى الخ : গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, মালিক খরচের অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত প্রাণীকে উদ্ধারকারী আটক রাখতে পারবে। কেননা, তার সাথে উদ্ধারকারীর মালিকানা সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। কেননা, তার খরচেই প্রাণীটি বেঁচে ছিল। সুতরাং তা বিক্রিত বস্তুর সাদৃশ হল। আর যদি আটকের পূর্বে উদ্ধারকারীর হাতে মারা যায় তাহলে মালিকের উপর থেকে খরচের ঋণ রহিত হবে না। আর যদি আটকের পর মারা যায় তাহলে মালিকের উপর থেকে খরচের ঋণ রহিত হয়ে যাবে। কেননা, আটক অবস্থা তা বন্ধক সাদৃশ্য হয়ে যাবে।

قوله : وَلَايَدْفَعُهَا اِلٰى مُدَّعِيهَا الخ : যদি কোন ব্যক্তি উদ্ধারকৃত বস্তুর মালিকানা দাবী করে তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত উদ্ধারকৃত মাল তার হাতে অর্পণ করা যাবে না। যদি দাবীকারী কোনরূপ আলামত বা চিহ্ন বলে যা উক্ত উদ্ধারকৃত প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত তাহলে উদ্ধারকারী তা উক্ত দাবীকারীর হাতে অর্পণ করবে। তবে এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক (রহ.) এর মতে তাকে বাধ্য করা হবে। কেননা, উদ্ধারকারী দাবীকারীর সাথে মালিকানায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না, বরং হস্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সুতরাং এক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান থাকার দরুন শুধু লুকতার আলামত বর্ণনা করলেই চলবে। সাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই শুধু আলামত বর্ণনার পরই উদ্ধারকারীকে বাধ্য করা হবে তা দাবীকারীর হাতে হস্তান্তর করা।

আমাদের দলিল : হস্ত নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার ন্যায় উদ্দিষ্ট হক। সুতরাং তা সাক্ষ্য ছাড়া সংঘটিত হবে না। তবে উত্তমভাবে আলামত বর্ণনার ক্ষেত্রে তার কাছে উক্ত লুকতা অর্পণ করা বৈধ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন :

فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ عَرَّفَ عِفَاصَهَا وَ عَدَدَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ (ابوداود)

‘যদি মালিক আসে এবং সেটির থলে এবং তার সংখ্যার পরিচয় বলতে পারে তাহলে তার হাতে তা অর্পণ করো।’

অপরদিকে প্রসিদ্ধ হাদীস আছে : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِّ ‘প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীর দায়িত্ব।’ উক্ত হাদীসের উপর আমল করার জন্য পূর্বোক্ত হাদীসের আদেশকে আমরা বৈধতার অর্থে গ্রহণ করেছি। তবে হা তার পক্ষ থেকে একজন কফীল বা জামিনদার গ্রহণ করা হবে।

قوله : وَ يَنْتَفِعُ بِهَا لَوْ فَقِيْرًا الخ : আর যদি উদ্ধারকৃত বস্তুর মালিক পাওয়া না যায় তাহলে উক্ত বস্তু সদকা করার হুকুম রয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : فَاِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهٖ ‘মালিক যদি না আসে তাহলে বস্তুটি যেন সদকা করে দেয়।’ সুতরাং উক্ত বস্তুর সদকার হুকুম অন্যান্য ফরজ সদকার সাদৃশ্য হল। তাই তা কোন ধনী ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে না। সে হিসাবে যদি উদ্ধারকারী ব্যক্তি দরিদ্র হয় তবে তো তা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে। কেননা, তাতে উভয় পক্ষের কল্যাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি ধনী হয় তাহলে তা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে না। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে উদ্ধারকারী ধনী হলেও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। কেননা, হযরত উবাই (রাযি.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَ اِلَّا فَانْتَفِعْ بِهَا - ‘যদি মালিক এসে যায় তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে অন্যথায় তা দ্বারা তুমি নিজে উপকৃত হও।’ অথচ হযরত উবাই (রাযি.) ধনী ছিলেন। তাই প্রমাণিত হল, উদ্ধারকারী ধনী হলেও তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

আমাদের দলিল : উদ্ধারকৃত মাল মূলত তা অন্যের মাল। তাই মালিকের অনুমতি ছাড়া তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে তা দরিদ্রের জন্য ব্যবহার করা বৈধ হয়েছে আমাদের বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে (অর্থাৎ فان لم يأت فليتصد به) সুতরাং সদকা তো ধনীর প্রাপ্য নয়। তাছাড়া দরিদ্রের বিষয়টি ইজমা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তাই দরিদ্রের জন্য উপকার লাভ করা বৈধ। আর হযরত উবাই (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীসে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া ইমামের অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছে। আর ইমামের অনুমতিতে তো ব্যবহার করা বৈধ। আর যেহেতু উদ্ধারকারী স্বয়ং দরিদ্র হওয়ার দরুন তা ব্যবহার করা বৈধ হল তাই তা উদ্ধারকারী তার স্ত্রী, পিতা, মাতা, সন্তানাদি যদি দরিদ্র হয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে সদকা করতে কোন অসুবিধা নেই।

كِتَابُ الْاَبَاقِ

অধ্যায় : পলাতক গোলাম

أَخْذُهُ أَحَبُّ أَن قَوِىَ عَلَيْهِ وَمَنْ رَدَّهُ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ فَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَلَوْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَإِنْ رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ كَالْقِنِّ وَإِنْ أَبَقَ مِنَ الرَّادِّ لَا يَضْمَنُ وَيُشْهِدُ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ وَجُعْلُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَمْرُ نَفَقَتِهِ كَاللُّقْطَةِ

অনুবাদ : পলাতক গোলামকে ধরা উত্তম (তথা মুস্তাহাব) যদি তাকে ধরতে সক্ষম হয়। আর যে ব্যক্তি পলাতক গোলামকে সফরের দূরত্ব থেকে নিয়ে আসবে সে চল্লিশ দিরহাম পারিতোষিক পাবে। যদিও তার (গোলামের মূল্য) তার (চল্লিশ দিরহামের) চেয়ে কম হয়। আর সে ব্যক্তি সফরের দুরত্ব থেকে কম দুরত্ব থেকে এনে দেয় তাহলে সে হিসাবে পাবে। (আর এ ব্যাপারে) মুদাব্বার ও উম্মেওয়ালাদ সাধারণ দাসের পর্যায়ভুক্ত। আর যদি গোলাম ফেরত আনয়নকারী পলায়ন করে তবে তিনি (ফেরত আনয়ণকারী) জামিন হবে না। আর ফেরতকারী (গোলাম ধরার সময়) একথার উপর সাক্ষ্য রাখবেন যে, তিনি তাকে প্রত্যার্পণের জন্য ধরেছেন। আর পলাতক বন্ধকী গোলামের (ফেরতের ক্ষেত্রে) পারিতোষিক বন্ধক গ্রহণকারীর উপর আবশ্যক হবে। আর পলাতক গোলামের উপর খরচের বিধান লুকতা এর উপর খরচের বিধানের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

الابق। এক বচন, বহুবচন أُبَّاقٌ - آبقون পলায়নকারী, পলাতক। আর পরিভাষায় ابق বলা হয় অবাধ্য এবং দুষ্ট গোলাম-বাদী মনিব থেকে পলায়ন করা। لقطة এর সাথে তার মিল থাকায় গ্রন্থকার (রহ.) তাকে لقطة এর পরবর্তীতেই উল্লেখ করেছেন।

قوله : اَخْذُهُ اَحَبُّ الخ : যদি কেহ কোন পলাতক গোলামের সন্ধান পায় আর অবস্থা এমন যে সে তাকে পাকড়াও করার ক্ষমতা রাখে। তাহলে তার জন্য উত্তম তথা মুস্তাহাব উক্ত গোলামকে পাকড়াও করা। কেননা, এতে একজন মালিকের হক সংরক্ষণ করা হয়। আর যদি পথ হারা গোলাম পাওয়া যায়, তাহলে কেহ কেহ বলেন যে, তাকে ও তার মালিকের নিকট প্রত্যার্পণ করার উদ্দেশ্যে ধরা হবে। আর কেহ কেহ বলেন, উক্ত গোলামকে ধরা হবে না। বরং তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, যাতে তার মনিব তাকে পেয়ে যায়। কেননা, সে স্থান ত্যাগ করবে না। তাই মনিব কোন সময় এসে তাকে খোঁজ করে বের করবে। পক্ষান্তরে পলাতকের বিষয়টি এমন নয়, বরং সে তো পলায়ন করছে বিধায় সে তার স্থানে বিদ্যমান থাকবে না। আর যখন কেহ পলাতক গোলাম ধরল তখন সে শাসকের নিকট তাকে হস্তান্তর করবে। আর শাসক তাকে বন্দী করে রাখবেন। কিন্তু কেহ যদি পথহারা গোলামকে শাসকের নিকট হস্তান্তর করে তাহলে শাসক উক্ত গোলামকে বন্দী করার প্রয়োজন নাই। কেননা, পলাতকের ক্ষেত্রে বন্দী করার বিধান হচ্ছে যাতে দ্বিতীয়বার পালানোর কোন সুযোগ না পায়।

قوله : وَ مَنْ رَدَّهُ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ الخ : আর যে ব্যক্তি সফরের দূরত্ব বা তার চেয়ে বেশি দূরত্ব থেকে পলাতক

গোলামকে ধরে নিয়ে আসে এবং তার মালিকের নিকট হস্তান্তর করে সে মালিক থেকে চল্লিশ দিরহাম পারিতোষিক পাবে। এ ফায়সালা হচ্ছে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের মতে মনিব কর্তৃক পূর্বশর্ত ছাড়া ফেরতকারী কোন কিছু পাবে না। যেমন পথহারা গোলামকে ফেরৎ প্রদানে কোন পারিতোষিক আবশ্যক হয় না। কেননা ফেরৎকারী তার উপকারিতা সেচ্ছায় দিয়েছে। তাই এ সেচ্ছা দানের বিনিময়ে কোনরূপ দায় আবশ্যক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দলিল : ইজমায়ে সাহাবা (রাযি.) সংঘটিত হয়েছে যে পলাতক গোলাম ফেরৎকারীর জন্য পরিতোষিক রয়েছে। যেমন হযরত কাতাদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রাযি.) পলাতক গোলামের ফেরতের উপর পারিতোষিক চল্লিশ দিরহাম ধার্য করেছেন। অনুরূপ হয়ত আমর বিন দিনার (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, পলাতক গোলাম যাকে হারামের বাহিরে পাওয়া যাবে, তার ফেরৎকারীর পারিতোষিক এক দিনার এবং দশ দিরহাম। সুতরাং যদিও পারিতোষিকের পরিমাণের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে কিন্তু পারিতোষিক ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সবই এক মত। আমরা পরিমানের উক্ত মতানৈক্যের উপর এভাবে আমল করি যে যদি সফরের দূরত্ব বা তার ছেয়ে বেশি দূরত্ব থেকে পলাতক কে ফেরত করে তবে সে চল্লিশ দিরহাম পাবে। আর তার ছেয়ে কমে সে হিসাবেই ধার্য্য করা হবে। তাছাড়া এজন্য যে পলাতক গোলামকে ধরার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই পারিতোষিক আবশ্যক করা হয়েছে। যাতে একজন মানুষের মাল সংরক্ষণ হয়। পক্ষান্তরে পথ হারা গোলামের বিষয় ভিন্ন। কেননা পলাতক গোলামের ক্ষেত্রে পুরুস্কারের বিষয়টি শ্রুত দলিলের ভিত্তিতে ধার্যকৃত। কিন্তু পথহারা গোলামের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন শ্রুত দলিল নেই। অথবা পলাতক গোলাম তো পলাতক সে আত্ম গোপন করবেই এবং মালিক থেকে দুরে থাকবেই। তাই তাকে ধরার বিষয়টি অপরিহার্য। সুতরাং এক্ষেত্রে পারিতোষিক আবশ্যক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে পথহারা গোলাম সে তো আত্মগোপন করেনি, বরং সে তার মনিব পর্যন্ত পৌছতে আগ্রহী। তাই তার হেফাজত করা পলাতকের চেয়ে নিম্ন মানের। এজন্য তার ক্ষেত্রে কোন পুরস্কার ধার্য করা হয়নি।

قوله : وَ لَوْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ الخ : আর যদি পলাতক গোলামের মূল্য চল্লিশ দিরহামের কম হয় তবুও চল্লিশ দিরহামই পারিতোষিক সাব্যস্ত হবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতাতম। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে এ ক্ষেত্রে গোলামের মূল্য আবশ্যক হবে তবে তা থেকে এক দিরহাম অবশ্যই কম হবে। তিনি বলেন মূলত পারিতোষিক আবশ্যক হওয়ার কারণ গোলামকে মনিবের নিকট প্রত্যার্পনের বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে মালিকের উপকার হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর দলিল : এ পরিমাণ (তথা চল্লিশ দেরহাম) তা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। সুতরাং তা থেকে হ্রাস করা যাবে না। তাই তো অতিরিক্ত মূল্যের উপর সমঝোতা বৈধ। কেননা, এর অর্থ হল নির্ধারিত পরিমাণ থেকে হ্রাস করা।

قوله : وَ الْمُدَبَّرُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ الخ : আর পলাতক উম্মেওয়ালাদ বা মুদাব্বার সাধারণ গোলামের ন্যায়। তবে শর্ত হল তার প্রত্যার্পণ মনিবের জীবদ্দশায় হতে হবে। কেননা, তার জীবদ্দশায় তার মালিকানা বহাল থাকে এবং তারা গোলাম বাদীর অন্তর্ভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে তাদের প্রত্যার্পণ যদি মনিবের মৃত্যুর পর হয় তাহলে তারা আযাদ হিসাবে ধর্তব্য হবে। তাই প্রত্যর্পণকারী কোন পারিতোষিক পাবে না। আর যদি প্রত্যর্পণকারী মনিবের পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রীর কোন একজন হয় তাহলে পারিতোষিক পাবে না।

قوله : وَ إِنْ أَبَقَ مِنَ الرَّادِّ الخ : আর যদি প্রত্যাবর্তনকারীর নিকট থেকে দ্বিতীয় বার গোলাম পলায়ন করে তাহলে তার উপর কোন ক্ষতি পুরণ আবশ্যক হবে না। তদ্রূপ যদি তার কাছে বিদ্যমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবুও তার উপর কোন ক্ষতি পুরণ আবশ্যক হবে না। কেননা, তা তার কাছে আমানত ছিল।

قوله : وَ يُشْهِدُ أَنَّهُ أَخَذَهُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন ফেরতকারী গোলাম ধরার সময় একথার

উপর সাক্ষ্য রাখবে যে তিনি তাকে তার মালিকের নিকট প্রত্যার্পণের জন্য ধরেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাযি.) এর মতে পলাতককে ধরার এবং তা প্রত্যার্পনের বিষয়ে সাক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যদি সাক্ষ্য রাখে না তবে ফেরত প্রদানের সময় সে পারিতোষিকের হক দার হবে না। কেননা, সে যে সাক্ষ্য পরিহার করল তা দ্বারা বুঝা যায় যে সে তা তার নিজের জন্য ধরেছে যেমন সে মিরাস হিসাবে পেয়েছে কিংবা উপহার হিসাবে পেয়েছে অথবা কারো নিকট থেকে খরিদ করেছে। আর পরে তা তার প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যর্পন করল। সুতরাং এমতা বস্থায় সে পারিতোষিক প্রাপ্ত হবে না। তবে হা যদি সে এমর্মে সাক্ষ্য রাখে যে, সে তাকে তার মালিকের নিকট প্রত্যার্পণ করার জন্য খরিদ করেছে। তাহলে পরিতোষিকের হকদার হবে। আর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সে সেচ্ছাদানাকারী সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَ جُعْلُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ الخ : আর যদি পলাতক গোলাম বন্ধকী মাল হয়। তাহলে বন্ধক গ্রহণকারীর উপর পরিতোষিক আবশ্যক হবে। কেননা, প্রত্যার্পণের মাধ্যমে সে গোলামের অর্থ মূল্য সংরক্ষণ করছে। আর বন্ধক গ্রহণকারীই হচ্ছে ঐ অর্থ মূল্যের বর্তমান হকদার। কেননা, সে তো তার থেকেই তার অর্থ মূল্য উসুল করবে। আর পারিতোষিক সাব্যস্ত হয় অর্থ মূল্য সংরক্ষণ ও তার পুণরুজ্জীবিত করায় বিপরীতে। সুতরাং বন্ধক গ্রহীতার উপরই তা সাব্যস্ত হবে।

قوله : وَ اَمْرُ نَفْقَتِهٖ كَاللُّقْطَةِ الخ : পলাতক গোলাম ধরার পর তার উপর ব্যয় করার হুকুম লুকতার উপর খরচ করায় হুকুমের ন্যায়। তা হল পলাতক দাস বা দাসীকে ধরার পর যদি শাসকের নির্দেশ ছাড়া যে ধরেছে সে তার উপর ব্যয় করে। তবে তা সেচ্ছাদানরূপে গণ্য হবে। আর শাসকের নির্দেশে বা অনুমতিতে যদি ব্যয় করে থাকে তবে তা মনিবের অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তা মনিবের অনুকুলে ঋণ হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

كِتَابُ الْمَفْقُودِ

অধ্যায় : হারানো ব্যক্তি প্রসঙ্গে

وهو غَائِبٌ لم يَدْرِ مَوْضِعَهُ وحياتَه و موتَه فينصبُ القَاضِي من يأْخُذَ حَقَّه وَيَحْفَظُ مَالَهُ ويقومُ عليه وَيُنْفِقُ منهُ على قَرِيبِهِ وِلَادًا وزوجتِهِ ولَا يُفَرِّقُ بينه وبينهَا وَحُكِمَ بِمَوتِهِ بعدَ تِسعِينَ سَنَةً وتعتدُّ امرأتُه وورِثَ منه حِينَئِذٍ لا قَبلَه وَلَا يَرِثُ من أَحَدٍ مَاتَ وَلَو كان مع الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لم يُعْطَ شيئا وَإِنْ انْتَقَصَ حقُّهُ بِهِ يُعْطَى أَقَلَّ مِنَ النَّصِيبَيْنِ وَ يُوقَفُ الْبَاقِى كَالْحَمْلِ -

অনুবাদ : এমন অনুপস্থিত ব্যক্তি যার অবস্থানস্থল, তার জীবিত বা মৃত সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায়নি। কাজী এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তার হকসমূহ উসুল করবে ও তার সম্পদ সংরক্ষণ করবে এবং ব্যবস্থাপনা করবে। সে তা থেকে তার (নিরুদ্দেশ ব্যক্তির) জন্মসূত্রের নিকটাত্মীয় এবং তার স্ত্রীর উপর খরচ করবে। আর বিচারক নিরুদ্দেশ পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করবেন না। আর (নিরুদ্দেশ হওয়া থেকে) নব্বই বৎসর পর তার মৃত্যুর ফায়সালা দিয়ে দেবেন। তার স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে এবং তখন তার মালে উত্তরাধিকারী হবে। তবে এর পূর্বে হবে না। আর যে মারা গেল সে উত্তরাধিকারী হবে না। আর যদি নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সাথে এমন কোন উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকে যে তার দ্বারা বঞ্চিত হয় তাহলে তাকে কোন হিসসাই প্রদান করা হবে না। তবে তার দ্বারা তার হকের পরিমাণ হ্রাস পায় তবে দুই হিসসার অল্প তরটা তাকে প্রদান করা হবে। আর অবশিষ্ট স্থগিত থাকবে গর্ভস্থ সন্তানের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ هُوَ غَائِبٌ لَم يَدْرِ مَوْضَعَهُ الخ مفقود অর্থ হারিয়ে গেছে এমন, হারানো, নিখোঁজ। আর শরীয়াতের পরিভাষায় নিখোঁজ ব্যক্তি বলা হয় এমনভাবে নিরুদ্দেশ হওয়া যে তার অবস্থান হল, তার জীবিত বা মৃত কোন খবরই জানা সম্ভব নয়। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কাজী অন্য এমন কোন বিশ্বস্ত, উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন, যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির প্রাপ্ত উশুল করবে তার সম্পদ সংরক্ষণ করবে এবং তার সম্পদের ব্যবস্থাপনা করবে। কাজী কর্তৃক এরূপ নিযুক্ত করণের মধ্যে উক্ত নিরুদ্দেশ ব্যক্তির কল্যাণ রয়েছে, আর সে তো অক্ষম ব্যক্তির সমপর্যায়ের। ফলে সে পাগল কিংবা নাবালকের সাদৃশ হল তাই কাজী তার মালের সংরক্ষণের জন্য অপর জনকে নিযুক্ত করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, কাজী তো জনগণের কল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

গ্রন্থকারের উক্তি ياخذ حقه প্রাপ্য হক উশুল করবে দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে সে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির শস্য বা অন্যান্য ফসল কব্জা করবে। আর নিযুক্ত ব্যক্তি নিজ পক্ষ থেকে কৃত চুক্তি সম্পর্কে অন্যের উপর দাবী উত্থাপন করতে পারবে। কেননা, এক্ষেত্রে সে তো মূল চুক্তিকারী। কিন্তু নিরুদ্দেশ ব্যক্তির কৃত চুক্তি সম্পর্কে সে দাবী উত্থাপন করতে পারবে না। অনুরূপ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির কোন ভূসম্পত্তি বা অন্য কোন সম্পদ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট

রক্ষিত থাকা অবস্থায় সে (নিযুক্ত ব্যক্তি) এ ব্যাপারে কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করতে পারবে না। কেননা, সে তো মালিক নয় বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত নয়। আর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির এমন সম্পদ যা নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে কাজী তা বিক্রি করে তার অর্থ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিবেন। কেননা, তা মুল সত্তা হিসাবে সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য। সুতরাং তা গুণগতভাবে সংরক্ষণ করা হবে আর এতে মূল মালিকের কল্যাণের ব্যবস্থা করা হবে।

قوله : وَ يُنْفِقُ عَلٰى قَرِيْبِهٖ الخ : আর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার জন্মসূত্রের নিকটাত্মীয়দের এবং তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা হবে। আর এ বিধান তার এমন আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রজোয্য যারা উক্ত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই তার মাল থেকে ভরণ-পোষণ পেয়ে থাকে, যেমন স্ত্রী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদিগণ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েগণ পিতা-মাতা ইত্যাদি। আর যারা তার উপস্থিতিতে কাজীর ফায়সালার ভিত্তিতে তার মাল থেকে ভরণপোষণের হকদার হয় তারা তার নিরুদ্দেশ অবস্থায় ভরণপোষণের হকদার হবে না। যেমন ভাই, বোন, মামা, খালা ইত্যাদি। কেননা, তারা তো কাজীর ফায়সালার ভিত্তিতে তার মাল থেকে ভরণ-পোষণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এখন যেহেতু উক্ত ব্যক্তি নিরুদ্দেশ তাই কাজী তার অনুপস্থিতিতে তার মালে তার বিপক্ষে ফায়সালা প্রদান করতে পারবেন না।

আর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পদ যা থেকে হকদারদের মধ্যে ভরণ-পোষণ দেয়া হবে তা হল যদি তার সম্পদে অন্য-বস্ত্র বিদ্যমান থাকে তাহলে তা প্রদান করা হবে। অন্যথায় দিরহাম দিনার দ্বারা প্রদান করা হবে। কেননা, অন্য বস্ত্র না থাকা অবস্থায় তার মূল্যের ফায়সালা দেয়া হবে। আর মূল্য হচ্ছে দিরহাম দিনার, আর এ বিধান হবে তখন যখন সম্পদ কাজীর নিয়ন্ত্রণে হবে। অথবা কারো নিকট আমানত থাকে বা ঋণ থাকে কিংবা বিবাহ বা বংশসূত্রে কারো কাছে থাকে আর গ্রহিতা তা স্বীকার করে তাহলে তাদের থেকে উশুল করে হকদারের উপর ব্যয় করা হবে। পক্ষান্তরে যদি আমানতদার ঋণদার বা অন্য যাদের কাছে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পদ থাকে সে তা অস্বীকার করে তাহলে খোরপোষের হকদার কেহ বাদীরূপে দাড় হতে পারবে না। আর তাদের অস্বীকার করা তখনই ধর্তব্য হবে যখন কাজীর নিকট তা প্রমাণিত থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি কাজীর নিকট প্রমাণিত থাকে। তাহলে তাদের স্বীকার করা বা অস্বীকার করা কোনটিরই প্রয়োজন নেই। আর যদি আমানত গ্রহণকারী, ঋণ গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যার কাছে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পদ রয়েছে সে কাজীর অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া নিরুদ্দেশ বক্তি থেকে খোরপোষ প্রাপ্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়, তাহলে সে দায়মুক্ত হবে না। কেননা, সে তো হকদারের নিকট কিংবা তার স্থলবর্তী কারোর নিকট তা হস্তান্তর করেনি। পক্ষান্তরে কাজীর আদেশ এর ভিন্ন। কেননা, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্থলবর্তী হলেন কাজী।

قوله : وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَهَا الخ : আর কাজী নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের ফায়সালা দিবেন না। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, চার বৎসর অতিক্রান্ত হলে কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের ফায়সালা প্রদান করবেন। তারপর স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে এবং অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। কেননা, মদীনা থেকে জিনেরা নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত উমর (রাযি.) অনুরূপ ফায়সালা দিয়েছিলেন। তাছাড়া সে অনুপস্থিত থাকার কারণে তার স্ত্রীর হক রোধ করেছে। তাই তা ঈলা ও পুরুষত্বহীন থাকার কারণে তার স্ত্রীর হক রোধ করেছে। তাই তা ঈলা ও পুরুষত্বহীনতার উপর কিয়াস করে সেই সময় সীমার পর বিবাহ-বিচ্ছেদের ফায়সালা দেয়া হবে। সুতরাং ঈলার দিক বিবেচনায় চার মাসের ইদ্দত আর পুরুষত্বহীনতার উপর ভিত্তি করে চায় বৎস পর বিবাহ-বিচ্ছেদের ফায়সালা দেয়া হবে।

আমাদের দলিল : নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী সম্পর্কে নবী করীম (সা.) এর এই বক্তব্য যে তার কাছে প্রমাণ আসা পর্যন্ত সে তার স্ত্রী থাকবে। অনুরূপ হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, সে তার স্ত্রী, তাকে পরীক্ষায় পতিত

করা হয়েছে। সুতরাং মৃত্যু বা তালাকের বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্যধারণ করবে।

তাছাড়া এজন্য যে বিবাহ তো সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট। কিন্তু অনুপস্থিতি তা বিবাহ-বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে না। আর মৃত্যুর বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে বিবাহ বিলুপ্ত হবে না। আর ঈলার উপর কিয়াস করা যাবে না। তা তো জাহিলী যুগে অবিলম্বিত তালাকরূপে গণ্য ছিলো। পরবর্তীতে ইসলামী শরীয়াতে ইহাকে বিলম্বিত তালাকরূপে গণ্য করেছে। আবার পুরুষত্বহীনতার উপর কিয়াস করা যাবে না। কেননা, অনুপস্থিতির পর ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পুরুষত্বহীনতার ক্ষেত্রে এক বৎসর অব্যাহতভাবে চলার পর তা খুব কমই ফিরে আসে।

قوله : وَ حَكَمَ بِمَوْتِهِ بَعْدَ تِسْعِيْنَ سَنَةً الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্ম থেকে নিয়ে নব্বই বৎসর পরে তার মৃত্যুর ব্যাপারে হুকুম প্রদান করা হবে। কানযের আরবী টিকাকার (রহ.) বলেন, ইহা ইমাম আহমদ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অভিমত। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, নব্বই বৎসর ধার্য করা অধিকতর সহজ। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) আলোচ্য মাসআলায় আরো তিনটি মত বর্ণনা করেছেন। তা হল, হাসান বিন যিয়াদ হযরত আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, নিরুদ্দেশ বক্তির জন্ম থেকে নিয়ে একশত বিশ বৎসর পর তার মৃত্যুর ঘোষণা করা হবে। কেননা, বয়সের সীমা তা থেকে খুব কমই অতিক্রম করে। আর জাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার সমবয়সীদের মৃত্যুর সাথে সীমা নির্ধারণ করা হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) এ ব্যাপারে আরো বর্ণনা করেন যে, তবে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারন না করাই হলো অধিকতর কিয়াস সম্মত। সুতরাং কাজী কর্তৃক তার মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হবে তখন তার স্ত্রী ঘোষণার সময় থেকে ওয়াফাতের ইদ্দত পালন করবে। আর সেই সময়ে বিদ্যমান ওয়ারিসদের মধ্যে তার সম্পদ বন্টন করে দেয়া হবে। আর তা এভাবে ধরে নেয়া হবে যে, সে ফায়সালার সময়ই মৃত্যু বরণ করেছে। সুতরাং এ হিসাবে ফায়সালার পূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা উত্তরাধিকারী হবে না। কেননা এই সময় তো তার মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হয়নি। তাই তা এমন হল যে, তার জীবিত থাকা জ্ঞাত রয়েছে।

قوله : وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُوْدِ الخ : আর যদি তার সঙ্গে এমন কোন ওয়ারিছ বিদ্যমান থাকে, যে তার দ্বারা বঞ্চিত হয় তাহলে তাকে কোন হিসসাই প্রদান করা হবে না। আর যদি নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সাথে এমন কোন ওয়ারিস বিদ্যমান থাকে যে তার দ্বারা বঞ্চিত হয় না, তবে তার দ্বারা তার হক্বের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহলে দুই হিসসার অল্পতরটা তাকে প্রদান করা হবে। আর অবশিষ্ট স্থগিত থাকবে। মাসআলাটির বিবরণ এভাবে যে, একজন লোক দুটি কন্যা, একজন নিখোঁজ পুত্র ও একজন পুত্রের পুত্র এবং একজন পুত্রের কন্যা রেখে মারা গেলো এবং তার সম্পদ ওয়ারিছ ভিন্ন অন্য কারো হাতে রয়েছে। আর পুত্র নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে সকল একমত হল। আর মৃত ব্যক্তির কন্যাদ্বয় মিরাসের দাবী করল, তাহলে এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের অর্ধেক তাদের দেয়া হবে। কেননা, এ পরিমাণ পাওয়ার বিষয় তো নিশ্চিত। আর অপর অর্ধেক স্থগিত থাকবে। পক্ষান্তরে পুত্রের সন্তানদের কোন হিসসা প্রদান করা হবে না। কেননা, নিখোঁজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় তো তারা বঞ্চিত হয়। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় তারা মীরাসের হকদার হবে না। আর তা হল গর্ভস্থ সন্তানের সাদৃশ। কেননা, তার অনুকূলে একজন পুত্র সন্তানের হিসসা স্থগিত রাখা হয়। والله اعلم -

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

অধ্যায় : অংশীদারিত্ব প্রসঙ্গে

شَرِكَةُ الْمِلْكِ أَنْ يَمْلِكَ اثْنَانِ عَيْنًا إِرْثًا أَو شِرَاءً وَكُلٌّ أَجْنَبِيٌّ فِي قِسْطِ صَاحِبِهِ وَشَرِكَةُ الْعَقْدِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا شَارَكْتُك فِي كَذَا وَيَقْبَلُ الْآخَرُ وَهِيَ مُفَاوَضَةٌ إِنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً وَكَفَالَةً وَتَسَاوِيَا مَالًا وَتَصَرُّفًا وَدِينًا فَلَا تَصِحُّ بين حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَبَالِغٍ وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وما يَشْتَرِيهِ كُلٌّ يَقَعُ مُشْتَرَكًا إِلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِتِجَارَةٍ أَوْغَصْبٍ أَوْكَفَالَةٍ لَزِمَ الْآخَرَ وَبَطَلَتْ أن وُهِبَ لِأَحَدِهِمَا أو وَرِثَ ما تَصِحُّ فيه الشَّرِكَةُ لَا الْعَرْضُ وَلَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعَنَانٌ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالتِّبْرِ وَالْفُلُوسِ وَلَوْ بَاعَ كُلٌّ عَرْضَهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ وعقد الشَّرِكَةَ صَحَّ -

অনুবাদ : (অংশীদারিত্ব দু' প্রকার, এক) شركة الملك মালিকানার ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব হল দু' ব্যক্তি এক বস্তুর মালিক হবে উত্তরাধিকারী সূত্রে কিংবা খরিদ সূত্রে এবং প্রত্যেকেই তার সাথীর অংশের ব্যাপারে অপরিচিত হিসাবে গণ্য হবে। আর (দ্বিতীয় প্রকার হল) شركة العقد চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। আর তা হল উভয় জনের একজন বলবে আমি এ বিষয়ে তোমাকে অংশীদার করলাম এবং অপরজন তা গ্রহণ করল। আর তা (চার প্রকার। প্রথম প্রকার) مفاوضة 'সম অংশীদারিত্ব' হবে যদি প্রতিনিধিত্বকে, জিম্মাদারিত্বকে, পরস্পর সমান সম্পদে, সম্পদ পরিচালনায় এবং ঋনের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তা (مفاوضة) গোলাম ও স্বাধীন, বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে সহিহ নয়। আর উভয়ের প্রত্যেকে যা কিছু ক্রয় করবে তা অংশিদারী মূলক হবে। পরিবার পরিজনের জন্য ক্রয়কৃত খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া। আর এমন প্রত্যেক ঋণ যা উভয়ের একজনের উপর আবশ্যক হয় ব্যবসার কারণে কিংবা ছিনতাই এর কারণে, অথবা জিম্মাদারীত্বের কারণে তাহলে তা অপর জনের উপরও আবশ্যক হবে। আর مفاوضة বাতিল হয়ে যাবে যদি তাদের দুজনের কোন একজনকে হেবা করা হয়, কিংবা এমন সম্পত্তি লাভ করে যাতে অংশীদারিত্ব সহিহ। তবে দ্রব্য সম্পদ (লাভ করা) দ্বারা বাতিল হবে না। আর شركة مفاوضه এবং شركة عنان দিরহাম দিনার স্বর্ণ রূপার টুকরা বা প্রচলিত মুদ্রা ভিন্ন নয়। আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে নিজের অর্ধেক মাল অপরের অর্ধেক মালের বিনিময়ে বিক্রি করে অতঃপর অংশীদারী চুক্তি সম্পন্ন করে তবে তা সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) كتاب المفقود এরপর كتاب الشركة কে উল্লেখ করার কারণ হল مفقود এর ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তি নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মালে আমানতদার হয়। তেমনি شركة এর ক্ষেত্রে পরস্পর অপর জনের মালে আমানতদার হয়ে থাকেন। তাই এ সম্পর্কের কারণে গ্রন্থকার (রহ.) مفقود এর পরে شركة কে উল্লেখ করেছেন شركة শব্দের অর্থ অংশিদারীত্ব, অংশ গ্রহণ, অংশ। শরীয়াতের পরিভাষায় شركة বলা হয় এমন চুক্তিকে যাতে মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়। সুতরাং شركة শরীয়াতসম্মত। কেননা নবী করীম (সা.) প্রেরীত হওয়ার পর লোকেরা অংশীদারী কাজ কারবার করত। তখন তিনি তাদেরকে এর উপর বহাল রেখেছেন। তাছাড়া নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন :

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীকদ্বয়ের মধ্যে তৃতীয় যতক্ষণ না উভয় থেকে কোন একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে।

قوله : شِرْكَةُ الْمِلْكِ الخ : অংশীদারিত্ব প্রথমত দু' প্রকার : ১। شركة ملك মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। আর তা হল দু'জনের মধ্যে প্রকৃত মালিকানার ক্ষেত্রে সম অংশীদারিত্ব হওয়া। তা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সূত্রে হোক বা খরিদ করা সূত্রে হোক। বা অন্য কোন সূত্রে হোক। যেমন উভয়ের যৌথ আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে হোক বা দু'জনের কারো হস্তক্ষেপ ছাড়া পরস্পরের সম্পদ মিশ্রিত হয়ে গেল যা কোনভাবে পার্থক্য করা যায় না বা পার্থক্য করা কষ্টকর হলে। তখন একজনের অধিকার থাকবে না অপর জনের অনুমতি ছাড়া তার হিসসা ব্যবহার করা আর উভয়ের প্রত্যেক অপরের হিসসা ব্যবহার করা আর উভয়ের প্রত্যেক অপরের হিসসায় অপরিচিতের ন্যায় হবে। সুতরাং এ প্রকারের প্রত্যেক অংশীদার তার অংশ অপর অংশীদারের নিকট বিক্রি করতে পারে, তদ্রূপ অংশীদারের অনুমতি ছাড়া অন্যের নিকটও বিক্রি করতে পারে।

قوله : وَ شِرْكَةُ الْعَقْدِ الخ : আর দ্বিতীয় প্রকার شركة العقد চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। এ প্রকার অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইজাব এবং কবুল প্রয়োজন। আর তা এভাবে যে, একজন বলল আমি এই বিষয়ে তোমাকে অংশিদার করলাম আর অপর জন বলল, আমি তা গ্রহণ করলাম। আর তা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হল যে, কর্ম উকীল বানানোর যোগ্যতা রাখে যাতে উক্ত কর্মের মাধ্যমে অর্জিত বিষয়ে উভয়ের শরীকানাভুক্ত থাকবে। আর এ দ্বিতীয় প্রকার মোট চার প্রকার তন্মধ্য থেকে প্রথমটি হচ্ছে مفاوضة বা সম অংশীদারিত্ব। আর তা হল দুই ব্যক্তি তাদের সম্পদে এবং তা পরিচালনায়। ঋনে প্রতিনিধিত্বে, জিম্মাদারিত্বে সম অংশিদার হয়। কেননা, তা হচ্ছে সর্বপ্রকার ব্যবসায়ে সাধারণ অংশীদারিত্ব। তাতে পরস্পর অংশীদারির বিষয়টি অপরজনের হাতে নিঃশর্তভাবে ন্যস্ত করে। কেননা, শব্দটি ক্ষমতার অর্থ নির্দেশ করে। আর তা এমন সম্পদে হয় যাতে অংশীদারিত্ব শুদ্ধ। আর আমাদের মতে এ সম অংশিদারিত্ব সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে জায়েয। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবী হল তা জায়েয না হওয়া। আর তাই ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মত। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, শিরকাতে মুফাওয়াজা কি জিনিস আমি তা জানি না। সাধারণ কিয়াসের দলিল হল : ইহা জাতিগতভাবে অজ্ঞাত বিষয়ের ওয়াকিল হওয়া বা কাফিল হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ উভয়টি পৃথক পৃথকভাবে করলে ফাসিদ হয়। সূক্ষ্ম কিয়াসের দলিল হল : فَاوَضُوْا فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ - 'তোমরা শিরকাতে মুফাওয়াজা কর, কেননা তা অধিক বরকতপূর্ণ।' তাছাড়া ইসলামের শুরু থেকেই মানুষ বিনা বাধায় এই মুআমালা করে আসছে। আর এভাবেই প্রচলন রয়েছে। তাই আমরা কিয়াস বর্জন করলাম।

قوله : فَلَا تَصِحُّ بَيْنَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ الخ : সুতরাং শিরকাতে মুফাওয়াজা স্বাধীন ও গোলামের মধ্যে আর প্রাপ্ত

বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বৈধ হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে সমতা বিদ্যমান নেই। কেননা, স্বাধীন ও প্রাপ্তবয়স্ক তো চুক্তি সম্পন্ন করার এবং এর দায় গ্রহণ করার অধিকারী। পক্ষান্তরে দাস বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক চুক্তি সম্পাদন করার বা দায় গ্রহণ করার অধিকারী নয়। গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যেও তা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তা জায়েয। কেননা, মুসলমান ও কাফিরের মাঝে তা বৈধ। কেননা, ওয়াকিল ও কাফিল হওয়ার দিক থেকে উভয়ই সমান। আর উভয়ের মধ্যে একজন যে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী তা বিবেচ্য হবে না। আমাদের দলিল হল : মুআমালার ক্ষেত্রে উভয় সমান নয়। কেননা, যিম্মি যদি মূল পুজী দ্বারা মদ বা শুকর খরিদ করে তবে তা তার জন্য জায়েয। পক্ষান্তরে মুসলমানের জন্য ইহা জায়েয নয়।

অনুরূপভাবে দুই দাস বা দুই বালকের মধ্যেও তা জায়েয নয়।

قوله : وَ مَا يَشْتَرِيهِ كُلٌّ الخ : আর উক্ত অংশীদারদ্বয়ের প্রত্যেকে যা কিছু খরিদ করবে তা অংশীদারীমূলক হবে। পরিবার পরিজনের জন্য ক্রয়কৃত খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া। তদ্রূপ তার নিজের ও বস্ত্র ছাড়া। কেননা, তাদের মধ্যকার চুক্তির দাবী হচ্ছে সমতা। তার লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রত্যেকে অপরজনের স্থলবর্তী। কিন্তু যা ব্যতিক্রম করা হল তা ছাড়া। কেননা, সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবিই তাই যে, এগুলোকে শিরকাতুল মুফাওয়াজা থেকে পৃথক করা হবে। কেননা, ধারাবাহিক প্রয়োজন সংঘটিত হওয়া তো জানা বিষয়। আর তা তার শরিকের উপর আরোপ করা এবং তার মাল থেকে খরচ করা সম্ভব নয়। অথচ খরিদ করা ছাড়াও অন্য কোন পন্থা নেই। সুতরাং প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তা নিজ নিজ ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে বিশিষ্ট থাকবে।

قوله : وَ كُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ اَحَدَهُمَا الخ : আর এমন প্রত্যেক ঋণ যা উভয়ের বা উভয়ের একজনের উপর আবশ্যক হয় ব্যবসার কারণে কিংবা ছিনতাই এর কারণে অথবা জিম্মাদারীত্বের কারণে তাহলে তা অপর জনের উপর আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, সে সকল ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সহীহ তার বিনিময়ে যে ঋণ তাদের উভয়ের একজনের উপর আবশ্যক হবে তা অপরজনের উপরও আবশ্যক হবে। আর যেসব বিষয়ে অংশীদারী বৈধ নয়, সেসব বিষয়ে বিনিময়ে যে ঋণ তাদের যে কোন একজনের উপর আবশ্যক হবে তা অপর জনের উপর আবশ্যক হবে না। যেমন কৃত অপরাধের ক্ষতিপুরণ, বিবাহ খোলা, ইচ্ছাকৃত হত্যা দন্ডের কারণে আবশ্যকীয় ঋণ।

আর জিম্মাদারীত্বের কারণে আবশ্যকীয় ঋণের দায় তথা যদি তাদের দুজনের একজন তৃতীয় কারো পক্ষ থেকে ঋণের দায় গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তাও শরীকদ্বয়ের উপর আবশ্যক হবে।

পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে তার উপর তা আবশ্যক হবে না। কেননা, তা হল সেচ্ছা দান। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : তা প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও স্বেচ্ছা দান কিন্তু পরবর্তীতে তা বিনিময় হয়ে যায়। কেননা কফিল যা আদায় করবেন তা অবশ্যই ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে যার পক্ষ থেকে আদায় করা হয়েছে। তবে হা যদি তার অনুমতিতে আদায় করা হয়ে থাকে। সুতরাং তা পরিণতির দিক বিবেচনায় তা শিরকাতুল মুফাওয়াজার অন্তর্ভুক্ত। আর যদি দায় গ্রহণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকে তা হল বিশুদ্ধ মতে তা শরীকদ্বয়ের উপর আবশ্যক হবে না। কেননা, এতে মুফাওয়াজার গুণ বিদ্যমান নেই। অনুরূপভাবে ছিনতাই ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ক্ষতি পুরণের বিষয়টি কাফালাত পর্যায়ভুক্ত হবে।

قوله : وَ تَبْطُلُ اِنْ وَهَبَ الخ : আর যদি উভয়ের যে কোন একজনকে হেবা করা হয় আর সে তা কব্জা করে ফেলে অথবা তাদের এমন কিছু উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হল যাতে অংশিদারিত্ব বৈধ। তাহলে তার শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, যে মাল মূলধন হওয়ার যোগ্য তাতেও সমতা বিনষ্ট হয়েছে। অথচ শিরকাতুল মুফাওয়ায়ার ক্ষেত্রে প্রথমেও স্থায়িত্বে উভয় অবস্থায় তা বিদ্যমান থাকা শর্ত। আর তা এজন্য যে, যে যা প্রাপ্ত হবে যদি তাতে অপরজনের অংশীদারির কারণ বিদ্যমান না থাকে তবে সে তাতে অংশীদার হতে পারবে না। তবে হা তাতে শিরকাতুল আনান হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তা عنان এ রূপান্তরিত করা যাবে। কেননা, عنان

এর ক্ষেত্রে সমতা শর্ত নয়। আর যদি উভয়ের কোন একজন উত্তরাধিকারী সূত্রে কোন দ্রব্য সম্পদ লাভ করে তবে তা তার একক মালিকানায় থাকবে এবং তার শিরকাতুল মুফাওয়াজা বাতিল হবে না। তেমনি যদি ভূ-সম্পদ অর্জন করে তবে তার বিধান ও দ্রব্য সম্পদের ন্যায় হবে।

قوله : وَلَاتَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ الخ : شركة مفاوضة এবং شركة عنان আমাদের মতে দ্রব্যসম্পদে এবং মাপা ও ওজনের বস্তুতে বৈধ নয়, বরং দিরহাম দিনার বা স্বর্ণরৌপ্যের টুকরা কিংবা প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা বৈধ। দ্রব্য সম্পদে বৈধ না হওয়ার কারণ তা দায়হীনতা থেকে মুনাফা ভোগে পর্যবসিত হয়। কেননা উভয় যদি তাদের সম্পদ ভিন্ন পরিমাণে বিক্রি করে তাহলে একজন তার শরীকদারের মালে যে অতিরিক্ত পরিমাণের হক্বদার হবে ঐ সম্পদের মুনাফা যার মালিকানা তার নেই এবং যার দায় সে বহন করেনি। পক্ষান্তরে দিরহাম দিনারের বিষয় ভিন্ন। কেননা, দিরহাম দিনার যেহেতু অনির্ধারিত, তাই সে যা খরিদ করবে তার মূল্য তার জিম্মায় অনির্ধারিতভাবে থেকে যাবে। সুতরাং তা এই মালের মুনাফা হল যার দায় তার উপর এসেছে। তাছাড়া দ্রব্য সম্পদের ক্ষেত্রে কৃত ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে বিক্রয়। পক্ষান্তরে দিরহাম দিনারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রয়। আর উভয়ের একজন এশর্তে নিজের মাল বিক্রয় করা বৈধ নয়, যে অপরজন তার মূল্যে শরীক হবে। তবে উভয়ের একজন এ শর্তে কোন দ্রব্য ক্রয় করা বৈধ যে খরিদ কৃত দ্রব্যটি উভয়ের শরীকানায় থাকবে। আর প্রচলিত মুদ্রা যেহেতু মুদ্রার মতই তাই তা স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাদৃশ হবে। ইহা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে প্রচলিত অন্য ধাতব মুদ্রা দ্বারা অংশীদারী ব্যবসা ও মোদারাবা বৈধ নয়। কেননা, তার মূল্যমান উঠানামা করে বা কখনো তা পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তবে হা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে ধাতব মুদ্রা দ্বারা মুদারাবা বৈধ হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

قوله : وَلَوْ بَاعَ كُلٌّ نِصْفَ عِوَضِهِ الخ : আর যদি উভয়ে তার অর্ধেক মাল অপরের অর্ধেক মালের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং অংশীদারী চুক্তি সম্পন্ন করে তবে তা দ্বারা মালিকানা অংশীদারীত্ব সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, যদি উভয়ের পণ্যের মূল্য সমান হয় পক্ষান্তরে যদি উভয়ের পণ্যের মধ্যে মূল্যের তারতম্য হয় তাহলে কম মূল্য সম্পন্ন মালের মালিক ঐ পরিমাণের বিনিয়ে বিক্রি করবে যা দ্বারা অংশীদারী সিদ্ধ হয়।

وَعَنَانٌ أن تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً فَقَطْ وَتَصِحُّ مع التَّسَاوِي في الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ وَعَكْسِهِ وَبِبَعْضِ الْمَالِ وَبِخِلَافِ الْجِنْسِ وَعَدَمِ الْخَلْطِ وَطُولِبَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ وَرَجَعَ على شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ منه وَتَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ أو أَحَدِهِمَا قبل الشِّرَاءِ وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ فَالْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا وَرَجَعَ على شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَتَفْسُدُ أن شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً من الرِّبْحِ وَلِكُلٍّ من شَرِيكَيِ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ أَنْ يُبْضِعَ وَيَسْتَأْجِرَ وَيُودِعَ وَيُضَارِبَ وَيُوَكِّلَ وَيَدُهُ في الْمَالِ أَمَانَةٌ -

---

অনুবাদ : আর (দ্বিতীয় প্রকার) شركة عنان (নির্ধারত কিছু সম্পদে দু'জনের অংশীদার হওয়া এবং অবশিষ্ট সম্পদের ব্যাপারে পৃথক পৃথক থাকা) তা হল যদি পরস্পর শুধু প্রতিনিধিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা সহীহ উভয়ের সম্পদের পরিমাণে সমান হওয়া মুনাফাতে নয় এবং এর বিপরীতেও সহীহ। আর আংশিক সম্পদে, জাত ভিন্ন সম্পদে, অমিশ্রিত সম্পদে, কিংবা উভয় থেকে শুধু ক্রেতার নিকট মূল্যের তাগাদা হবে এ ভিত্তিতেও তা সহীহ। সে তার শরীক থেকে ঐ জিনিসে তার হিসসা পরিমাণ মূল্য ফেরত চেয়ে নেবে। আর উভয় সম্পদ কিংবা দুজনের একজনের সম্পদ ক্রয়ের পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে অংশীদারীত্ব বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ের একজন তার সম্পদ দ্বারা (কোন কিছু) ক্রয় করে নেয় আর অপরজনের মাল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ক্রয়কৃত জিনিস উভয়ের মাঝে শরীকানা হবে। আর সে উক্ত দ্রব্যের মূল্যের ঐ পরিমাণ অংশ অংশিদারের কাছ থেকে ফেরত নেবে। আর যদি মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিরহাম কোন একজনের অনুকূলে শর্ত করা হয়। তাহলে অংশীদারিত্ব ফাসিদ হয়ে যাবে। আর মুফাওয়াজা এবং আনান চুক্তির শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিংবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা আমানত হিসাবে কিংবা মুদারাবার ভিত্তিতে অথবা (মূলধন ব্যবহার করার জন্য কাউকে সে) ওয়াকিল নিযুক্ত করে মূলধন দিতে পারে। আর তার হাতে মাল আমানতরূপে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ عِنَانٌ إِنْ تَضَمَّنَتْ الخ : আর অংশিদারিত্বের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে : شركة عنان আর তা হচ্ছে নির্ধারিত কিছু সম্পদে দু' জনের অংশীদার হওয়া এবং অবশিষ্ট সম্পদের ব্যাপারে পৃথক পৃথক থাকা। আর তা পরস্পর পরস্পরের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু কফীল বা দায় বহনকারী হিসাবে হবে না। ওয়াকালাতের ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়ার কারণ এজন্য যে, যাতে অংশীদারীত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। আর তা কাফালাতের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ হল عنان শব্দটি অর্থগত দিক থেকেই কাফালাতের অর্থ ধারণ করে না। আর যে কোন কর্মের বিধান শব্দের অর্থগত চাহিদার বিপরীতে সাব্যস্ত হবে না। আর شركة عنان এ উভয়ের সম্পদের পরিমাণে তারতম্য হওয়া বৈধ। অনুরূপভাবে উভয়ের সম্পদের পরিমাণের ক্ষেত্রে সমান হওয়া আর মুনাফার ক্ষেত্রে বেশ কম হওয়াও বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে সম্পদে সমান হওয়া আর মুনাফার ক্ষেত্রে বেশ কম হওয়া তা شركة عنان এর জন্য সহীহ নয়। কেননা, এক্ষেত্রে

তারতম্য এমন সম্পদের মুনাফা গ্রহণকে অনিবার্য করবে। যার দায় সে বহন করেনি। কেননা উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যখন সম্পদ সমান হবে আর মুনাফা তিন ভাগ হবে আর একজন পাবে এক ভাগ আর অন্যজন পাবে দুই ভাগ। তাই যে দুই ভাগ পেল সে তো সম্পদের দায় বহন ছাড়াই অতিরিক্ত মুনাফা ভোগকারী হল। কেননা, দায় তো মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে হয়ে থাকে। তাছাড়া একারণে যে তাদের মতে মূলধনে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে মুনাফার অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত হয়। তাই তো তারা উভয়ের সম্পদে সংমিশ্রণের শর্তারোপ করেন। তাই মুনাফা মূলত মূল সম্পদের সত্তার সাথে বৃদ্ধির সমপর্যায়ের। তাই মুনাফা তার মূলধনের মালিকানার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে।

আমাদের দলীল : নবী করীম (সা.) এর বাণী : اَلرِّبْحُ عَلٰى مَا شَرَطَا وَ الْوَضِيْعَةُ عَلٰى قَدْرِ الْمَالَيْنِ 'মুনাফা সাব্যস্ত হবে উভয়ের নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে আর وضيعه বা লোকসান সাব্যস্ত হবে উভয় মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে।' উক্ত হাদীসে রাসূল (সা.) মূলধনে সমতা হওয়া বা তার বেশকমের তারতম্যের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তাছাড়া একারণে যে সম্পদের বিনিময়ে যেভাবে মুনাফার হক্বদার হওয়া যায় তেমনি শ্রম ও কর্মের বিনিময়েও মুনাফার হক্বদার হওয়া যায়। তাছাড়া কখনো দুজনের একজন দক্ষ পটু পরিপক্ক হয়ে থাকে আর সে অবশ্যই তার শরীকের চেয়ে বেশি দাবী করবে। আর এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং মুনাফার তারতম্যের দিক বিবেচনা করা হবে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ন মুনাফা একজনের জন্য শর্ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এতে চুক্তিটি এক তরফা হয়ে যায় এবং তা شركة ও مضاربه থেকে বাহির হয়ে যায়, তা ঋণের চুক্তিরূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

قوله : وَ بِبَعْضِ الْمَالِ وَ خِلَافِ الخ : আর উক্ত শরীকের প্রত্যেকেই তার সম্পদের এক অংশ ছেড়ে অন্য অংশ দ্বারা এই অংশীদারী চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। কেননা, عنان শব্দটি যেহেতু সমতার দাবী করে না তাই তা সম্পদের সমতা ও শর্ত হবে না। অনুরূপভাবে যদি সম্পদের জাত ভিন্ন হয় যেমন একজনের দীনার আর অপরজনের দিরহাম তাহলে তাতেও عنان বৈধ। পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় সুরতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে তা জায়েয। কেননা, তাদের মতে সম্পদের মাঝে সংমিশ্রণ শর্ত। অথচ দুই ভিন্ন জাতের সম্পদে সংমিশ্রণ সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আমাদের মতে যদি সম্পদ মিশ্রিত না করে তবুও অংশীদারী চুক্তি বৈধ হবে। পক্ষান্তরে এ মাসআলাতে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তা বৈধ নয়। কেননা, মূলধনের অস্তিত্বেই মুনাফা ধার্যকৃত হয়। অর্থাৎ, মুনাফা মূলধনের অনুবর্তী। সুতরাং মূলধনে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হলে পর তাতে মুনাফার অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। তাই মূলধনে অংশীদারিত্ব মিশ্রনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কেননা, অংশীদারিত্বের চুক্তির মূল হল মূলধন। তাই তো চুক্তিকে মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। মোটকথা তাদের মতে মুনাফা হচ্ছে মূলধনের অনুবর্তী। তাই তো তাদের মতে মূলধন এক জিনস বা সমজাতীয় হওয়া শর্ত এবং তা মিশ্রণ হওয়াও শর্ত। আর মূলধনে সমতার ক্ষেত্রে মুনাফাতে তারতম্য বৈধ নয়।

আমাদের দলীল : মুনাফার অংশীদারিত্বের বিষয়টি মূলত চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত তা মূলধনের সাথে নয়। তাই তো মূলধনের অংশিদারীত্ব বলা হয় না বরং চুক্তিকে অংশীদারিত্ব বলা হয়। সুতরাং অংশীদারিত্ব শব্দের মর্ম মুনাফাতেও প্রয়োগ হওয়া অপরিহার্য। তাই মূলধনের সংমিশ্রণ শর্ত হবে না। তাছাড়া দিরহাম দিনার তো অনির্ধারিত। তাই মুনাফা মূলধনের বিনিময়ে অর্জিত হয় না, বরং ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কেননা, সে তো অর্ধেকের মালিক আর বাকি অর্ধেকের সে ওয়াকিল। সুতরাং মিশ্রণ ছাড়া ব্যবহারের মাধ্যমে যখন অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হল তখন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে মূলধনের মিশ্রণ ছাড়াই অংশিদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মূলধনের মিশ্রণ বা সমজাতীয় হওয়া শর্ত হবে না।

قوله : وَطُوْلِبَ الْمُشْتَرِى الخ : অনুরূপভাবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উভয়ের যে কেউ যা কিছু খরিদ করবে মূল্যের ব্যাপারে তার কাছেই তাদাগা করা হবে। অন্য শরীকের নিকট নয়। কেননা, অন্যের উপরও তা আবশ্য

হয়, তা হচ্ছে কাফালাত। অথচ شركت عنان কাফালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং তা শুধু ওয়াকালাত চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যাবতীয় দেনা-পাওনার তাগাদার ক্ষেত্রে ওয়াকিল হল মূল ব্যক্তি।

قوله : وَ رَجَعَ عَلٰى شَرِيْكِهٖ بِحِصَّتِهٖ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অতঃপর সে তার শরীকদারের কাছ থেকে ঐ জিনিসে তার হিস্যা পরিমাণ মূল্য ফেরত চেয়ে নেবে। অর্থাৎ, সে যদি নিজের মাল থেকে মূল্য আদায় করে থাকে। কেননা, সে তো অংশীদারের অংশের পরিমাণে তার পক্ষ থেকে ওয়াকিল। সুতরাং যখন সে তার নিজের মাল থেকে মূল্য পরিশোধ করবে তখন সে তার কাছ থেকে ঐ অংশ ফেরত নেবে। আর যদি অবস্থা এমন যে, বিষয়টির সত্যাসত্য তার বক্তব্য ভিন্ন জানা সম্ভব না হয় তাহলে তাকে প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। কেননা, সে তো অপর জনের দায়িত্বে মালের দায় সাব্যস্ত হওয়ার দাবী করছে। আর যদি সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে অস্বীকার কারীর কথা শপথসহ গ্রহণ করা হবে।

قوله : وَ تَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ الخ : আর উভয়ের সম্পদ বা তাদের একজনের সম্পদ কোন কিছু ক্রয় করার পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অংশীদারিত্ব বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, অংশীদারিত্ব চুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে মাল। সুতরাং চুক্তির ক্ষেত্র বহাল না থাকলে চুক্তি কিভাবে বহাল থাকবে। যেমন বিক্রয়ের ক্ষেত্র। আর উভয় অংশীদারের মাল ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে তো বিষয়টি স্পষ্ট, আর তাদের একজনের মাল ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে একই হুকুম। কেননা, সে তো নিজের মালে অপরজনের শরীকদারীতে কোনভাবে সম্মত হবে না। সুতরাং চুক্তির কোন ফায়দা না থাকার দরুন চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর নষ্ট হওয়া মাল যদি একজনের হয় আর তা তার হাতেই নষ্ট হয় তবে তো তাতে অন্য কেহ দায়ী হবে। অপর জনের হাতেও যদি নষ্ট হয় তবুও সে দায়ী হবে না। কেননা, তাতো তার নিকট আমানত ছিল। কিন্তু যদি মিশ্রণযুক্ত হয়, আর তা একাংশ নষ্ট হয় তাহলে তা উভয়ের অংশ থেকেই গণ্য হবে। আর যদি তাদের একজন তার সম্পদে মাল খরিদ করে ফেলে আর অপরজনের মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে শর্ত অনুযায়ী খরিদকৃত মাল উভয়ের মধ্যে শরীকানা হবে। কেননা, খরিদ করার কারণে অংশীদারিত্ব বিদ্যমান ছিল। কেননা, মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সময় উভয়ের মাঝে শরীক অবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাই তার পর নষ্ট হওয়ার দরুন হুকুম পরিবর্তন হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে উক্ত খরিদকৃত বস্তুতে চুক্তিগত শর্তের সাথে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) এর মতে মালিকানা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে তাদের দুজনের যে কেউ তা বিক্রি করবে তা সহীহ হবে। কেননা, তাতে তো অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তা সম্পন্ন হওয়ার পর মাল নষ্ট হওয়ার কারণে তা ভঙ্গ হবে না। অতঃপর যদি উভয়ের মাল মিলানোর পূর্বে ধ্বংস হয় তবে যার মাল ধ্বংস হয়েছে তার পক্ষ থেকেই এই ক্ষতিটি যাবে। অপর শরীক থেকে ধ্বংস হওয়া মালের অর্ধেক ক্ষতি উশুল করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের মাল মিলানোর পর ধ্বংস হয় তবে উভয়ের পক্ষ থেকে তার ক্ষতি ধর্তব্য হবে। কেননা, এগুলোকে এমনভাবে মিলানো হয়েছে যে তা পার্থক্য করা যায় না।

قوله : وَ تَفْسُدُ اِنْ شَرَطَ لِاَحَدِهِمَا الخ : আর যদি মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিমাণ কোন একজনের অনুকূলে শর্ত করা হয় তাহলে অংশীদারীত্ব বৈধ হবে না। কেননা, তা এমন শর্ত যা অংশীদারিত্ব চুক্তির মূল কর্তন করতে অনিবার্য হতে পারে। আর তা এভাবে যে যা নির্দিষ্ট করা হল মুনাফা তাই হল। সুতরাং এহেন অবস্থায় দ্বিতীয় শরীক মুনাফা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া লাযিম হয়ে পড়ে তাই কারো জন্য মুনাফার কোন অংশ নির্ধারণ করা বৈধ নয়।

قوله : وَ لِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيْكَيِ الْعِنَانِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, عنان শরীকদার কিংবা مفاوضه শরীকদ্বয় প্রত্যেকেই ব্যবসার উদ্দেশ্যে কাউকে মূলধন দিতে পারে। কেননা অংশীদারীত্ব চুক্তিতে এর প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া তার তো পারিশ্রমিক ছাড়া বিনিয়োগ করা তার চেয়ে নিম্ন মানের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই সে

তার অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে তার অধিকার রয়েছে আমানত রাখার। কেননা তারও প্রচলন রয়েছে। অনুরূপ-ভাবে মুদারাবার ভিত্তিতে কাউকে মূলধন প্রদান করতে পারবে। কেননা, ইহা অংশীদারিত্ব থেকে নিম্নস্তরের। সুতরাং অংশীদারির চুক্তি তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। অনুরূপভাবে মূলধন ব্যবহার করার জন্য কাউকে সে ওয়াকিল বা প্রতিনিধি সাব্যস্ত করতে পারবে। কেননা, ব্যবসা বানিজ্যে প্রতিনিধি সাব্যস্ত করা ব্যবসায়েরই অনুসঙ্গ। আর ব্যবসার জন্যই তো অংশীদারী চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আর মাল তার হাতে আমানত হিসাবেই থাকবে। সুতরাং যদি তার কোন বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস না হয়, বরং অন্য কোন কারণে ধ্বংস হয় তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। সুতরাং এটা গচ্ছিত দ্রব্যের মতই হলো।

وَتَقَبُّلٌ إِنْ اشْتَرَكَ خَيَّاطَانِ أَو خَيَّاطٌ وَصَبَّاغٌ على أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا وَكُلُّ ما يَتَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُمَا وَكَسْبُ أَحَدِهِمَا بَيْنَهُمَا وَوُجُوهٌ إِنْ اشْتَرَكَا بِلَا مَالٍ على أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا وَتَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَإِنْ شَرَطَا مُنَاصَفَةَ الْمُشْتَرٰي أَو مُثَالَثَتَهُ فَالرِّبْحُ كَذَٰلِكَ وَبَطَلَ شَرْطُ الْفَضْلِ -

---

অনুবাদ : আর (তৃতীয় প্রকার) شركة التقبل (ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব) হল যদি দুইজন সেলাই কর্মী বা একজন রঞ্জন কর্মী ও একজন সেলাই কর্মী এ শর্তে অংশীদারিত্ব চুক্তি করে যে তারা ফরমায়েশ গ্রহণ করবে এবং অর্জিত উপার্জন দুজনের মাঝে ভাগ হবে। আর প্রত্যেক কর্ম যা তাদের একজন ফরমায়েশ গ্রহণ করবে, তা উভয়ের জন্য আবশ্যক হবে। আর তাদের উভয়ের একজনের উপার্জন দুজনের মাঝে ভাগ হবে। আর (চতুর্থ প্রকার) شركة وجوه (পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারিত্ব) হল যদি মূলধন নেই এমন দু'জন এই শর্তে অংশীদারিত্ব চুক্তি করে যে তারা নিজেদের পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করবে। আর তা প্রতিনিধিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে আর যদি তারা অর্ধাঅর্ধির শর্ত করে থাকে কিংবা তিন ভাগের দুই তৃতীয়াংশ এক শরীকের আর এক তৃতীয়াংশ অপর শরীকের হওয়ার শর্ত করে তাহলে মুনাফা ঐ হিসাবে ভাগ করা হবে। আর অতিরিক্ত মুনাফার শর্ত বাতিল হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

অংশীদারিত্বের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে شركة التقبل 'ফরমায়েশ গ্রহণের অংশীদারিত্ব' বা شركة الصنائع 'পেশাগত অংশীদারিত্ব' আর তা হচ্ছে দুজন সেলাইকর্মী বা একজন সেলাইকর্মী ও একজন রঞ্জনকর্মী এই শর্তে অংশীদারিত্ব চুক্তি করল যে, তারা ফরমায়েশ গ্রহণ করবে এবং উপার্জিত মুনাফা তাদের মাঝে ভাগ হবে। তাহলে এ ধরনের অংশীদারিত্ব চুক্তি জায়েয। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে তা জায়েয হবে না। কেননা, ইহা এমন এক অংশীদারি চুক্তি যাতে অংশীদারির উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। আর অংশীদারির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। আর মুনাফা অর্জনের জন্য শর্ত হল মূলধন বিদ্যমান থাকা। অথচ এখানে মূলধন নেই। আর মুনাফা তো মূলধনের অংশীদারির ভিত্তিতে বন্টিত হয়ে থাকে। সুতরাং মূলধন বিহীন আলোচ্য অংশীদারিত্ব সহীহ হয়নি।

আমাদের দলীল : অংশীদারি চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন। আর তা একে অপরকে ওয়াকিল প্রতিনিধি ধার্য করার মাধ্যমে সম্ভব হয়ে থাকে। কেননা, সে যখন অর্ধেকের ক্ষেত্রে মালিক আর অর্ধেকের ক্ষেত্রে ওয়াকিল হয়, তখন লব্ধ মালের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ধরনের চুক্তি জায়েয হল।

قوله : وَ كُلُّ عَمَلٍ يَتَقَبَّلُ اَحَدُهُمَا الخ : আর প্রত্যেক এমন কর্ম যা তাদের একজন গ্রহণ করবে তা উভয়ের উপর আবশ্যক হবে। আর উভয়ের একজনের উপার্জন তাদের শর্তানুযায়ী উভয়ের মাঝে ভাগ হবে। সুতরাং উভয়ের যে কোন একজনের নিকট কাজের ফরমায়েশ দেয়া যাবে। অনুরূপ উভয়ের প্রত্যেকেই পারিশ্রমিকের তাগাদা দিতে পারবে। সুতরাং পরিশোধকারী যার কাছেই পরিশ্রমিক পরিশোধ করবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এই অংশীদারিত্ব বিষয়টি مفاوضة শ্রেণীর হয়ে থাকে তাহলে উক্ত বিধানের যৌক্তিকতা তো অতি স্পষ্ট। আর যদি তা অন্যান্য ক্ষেত্রে হয় তবে তার বিধান সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে জায়েয হবে। সাধারণ কিয়াস কিন্তু এর ভিন্ন। কেননা, এখানে অংশীদারির চুক্তিটি নিঃশর্তরূপে সংগঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, এতে কাফালাত বা দায়গ্রস্থতার শর্ত করা হয়নি। অথচ কাফালাত হচ্ছে مفاوضة এর অনিবার্য দাবী। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ হল এই পেশাগত অংশীদারির চুক্তি দায়গ্রস্থতাকে অনিবার্য করে। তাই তো তাদের একজন কোন কর্মের দায়গ্রহণ করলে তা অপরের জন্যও দায়যুক্ত হয়। আর যখন অপরের ফরমায়েশ এর দায় তার উপর আরোপিত হয় তাই সে তার পারিশ্রমিকের হকদার হয়। সুতরাং কাজের দায় গ্রহণ এবং বিনিময় আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তা مفاوضه এর স্থলবর্তী হল।

قوله : وَ وُجُوهٌ اِنْ اِشْتَرَكَا الخ : আর অংশীদারিত্বের চতুর্থ প্রকার হল شركة الوجوه পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। আর তা হল মূলধন নেই এমন দুজন এই শর্তে অংশীদারিত্ব করল যে, তারা নিজেদের পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করবে। আর شركة الوجوه ইহা شركة المفاوضة -ও হতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে 'অর্থদ্রব্য' ও 'পণ্যদ্রব্য' উভয়েই কাফালাত ও ওয়াকালাত সাব্যস্ত হওয়া সম্ভবপর। আর যদি চুক্তিকে নিঃশর্ত রাখা হয় তাহলে তা شركة عنان হবে। সুতরাং شركة الوجوه এর শরীকদ্বয় যা কিছু খরিদ করবে সে ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই অপর শরীকের ওয়াকিল হবে। কেননা, ওয়াকিল হওয়া বা অভিভাবক হওয়া ছাড়া অন্যের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা বৈধ হবে না। আর এক্ষেত্রে অভিভাবক না হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট। সুতরাং ওয়াকিল হওয়া নির্ধারিত হয়ে গেল।

قوله : فَاِنْ شَرَطَا مُنَاصَفَةً الخ : আর شركة الوجوه এর সুরতে অর্ধাঅর্ধির শর্ত করে থাকে কিংবা তিন ভাগের দুই তৃতীয়াংশ এক শরীকের এবং এক তৃতীয়াংশ অপর শরীকের হওয়ার শর্ত করে থাকে, তাহলে মুনাফা ও ঐ হিসাবে ভাগ করা হবে। আর প্রত্যেক শরীকের নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত মুনাফার শর্ত বাতিল। এতে সমতা আবশ্যক এজন্য যে, মূলধন কিংবা শ্রম অথবা দায়বহন ব্যতীত মুনাফার অধিকারী হয় না। সুতরাং মূলধন প্রয়োগকারী তার মূলধনের বিপরীতে মুনাফার অধিকারী হবে। আর মুযারিব তার শ্রমের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হবে। আর উস্তাদ কারিগর তার ছাত্র কারিগর দিয়ে কাজ করানোর দায় বহনের জন্য সে মুনাফায় হকদার হয়। তাছাড়া অন্য উপায়ে মুনাফায় হদকার হওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে পরিচয় ভিত্তিক অংশীদারী চুক্তিতে দায় বহনের বিনিময়ে মুনাফার অধিকারী হবে। আর দায় বহন তো ক্রয়কৃত বস্তুতে মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে। তাই মালিকানায় অতিরিক্ত পরিমাণ মুনাফার সে হকদার হবে না। আর এ হিসাবে তা মুদারাবা থেকে ভিন্ন।

فصل

অনুচ্ছেদ

وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةٌ فِي اِحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَاسْتِقَاءٍ وَالْكَسْبُ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ ما لِلْآخَرِ وَالرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِقَدْرِ الْمَالِ وَإِنْ شُرِطَ الْفَضْلُ وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ حُكْمًا ولم يُزَكِّ مَالَ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ وَ أَدَّيَا مَعًا ضَمِنَا وَلَوْ مُتَعَاقِبًا ضَمِنَ الثَّانِي وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ بِشِرَاءِ أَمَةٍ لِيَطَأَ فَفَعَلَ فَهِيَ له بِلَا شَيْءٍ -

অনুবাদ : কাঠ কাটা, শিকার করা ও পানি উঠানোর ক্ষেত্রে শরীকানা চুক্তি বৈধ নয়। বরং উপার্জন কাজকারীর জন্যই হবে এবং তার উপর অপরজনকে اجر مثل। (এর জন্য সাধারণ যে বিনিময় আসে তা) প্রদান করা আবশ্যক। আর অবৈধ চুক্তির মুনাফা মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে বন্টিত হবে। যদি বেশির চুক্তি করে থাকে। আর উভয় শরীকের একজনের মৃত্যু দ্বারা অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদিও তার মৃত্যু হুকুমগত হয়ে থাকে। আর অপরের মালে তার অনুমতি ছাড়া যাকাত আদায় করতে পারবে না। আর যদি প্রত্যেকে (অপরজনকে যাকাত আদায়ের) অনুমতি প্রদান করে। আর উভয়ে এক সাথে আদায় করে তাহলে উভয়ে প্রত্যেকের অপর জনের দায় বহন করবে। আর যদি আগ-পিছ করে আদায় করে তাহলে দ্বিতীয়জন দায় বহন করবে। আর শিরকাতুল মুফাওয়াযা এর শরীকদ্বয়ের একজন অপরজনকে একজন দাসী ক্রয় করে তার সাথে সহবাস করার অনুমতি প্রদান করে। অতঃপর সে (অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি) তা করে তাহলে আর্থিক দায় ছাড়াই দাসী তার হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : وَ لَا تَصِحُّ شَرِكَةٌ فِى اِحْتِطَابٍ الخ : যদি কোন দু ব্যক্তি কাঠ কাটা, শিকার করা, পানি উঠানোর ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তি করে, তবে এ চুক্তি বাতিল হবে। আর প্রত্যেকে যা পৃথক পৃথকভাবে উপার্জন করবে তা তারই হবে। অপরজন এতে শরীক হবে না। কেননা, কাঠ কাটা, শিকার করা বা এ জাতীয় কাজ যা প্রাকৃতিকভাবে বৈধ এমন জিনিস সংগ্রহের ক্ষেত্রে অংশীদারী চুক্তি নেই। কেননা, অংশীদারীর মধ্যে প্রতিনিধিত্বের অর্থ বিদ্যমান। অথচ প্রাকৃতিক বৈধ বস্তু সংগ্রহের ক্ষেত্রে ওয়াকালতী বাতিল। কেননা, তা সংগ্রহের জন্য মুওয়াক্কীলের আদেশ প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। বরং তার আদেশ ছাড়াই ওয়াকিল তা সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং সে মুয়াক্কীলের স্থলবর্তী হল না। তবে হা যদি উভয়ে এক সাথে তা সংগ্রহ করে তাহলে হকদারীর কারণে উভয়ের মাঝে তা সমানভাবে বন্টিত হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে একজন কাজ করে আর অপরজন বসে থাকে তাহলে যে সংগ্রহ করল তার জন্যই সংগৃহীত বস্তু হবে। আর যদি মূল কাজ একজন করে থাকে আর অপর জন তাকে সহযোগিতা

করে থাকে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে সাহায্যকারী প্রচলিত পারিশ্রমিক এর হকদার হবে। আর এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, এ পারিশ্রমিক সংগৃহীত বস্তুর অর্ধেককে অতিক্রম করতে পারবে না।

قوله : وَالرِّبْحُ فِى الشِّرْكَةِ الْفَاسِدَةِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, প্রত্যেক অবৈধ অংশীদারীত্ব চুক্তির মুনাফা তার মূলধনের পরিমাণের ভিত্তিতে বন্টিত হবে। যদি অতিরিক্তের তথা বেশকমের শর্ত করে। কেননা, মুনাফা অংশীদারিত্ব চুক্তির ক্ষেত্রে মূলধনের অনুবর্তী। সুতরাং মূলধনের পরিমানের ভিত্তিতেই মুনাফা বন্টিত হবে। আর অতিরিক্ত পরিমাণের হকদার হয় পৃথকভাবে উল্লেখের দ্বারা। কিন্তু এখানে যেহেতু মূল অংশীদারিত্বই বাতিল তাই যদিও পৃথকভাবে অতিরিক্ত পরিমাণের উল্লেখ করা হয় তবুও তা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। তাই তা মুল ধনের পরিমাণের ভিত্তিতে মুনাফার হকদারিত্ব বাকী থাকবে।

قوله : وَ تَبْطُلُ الشِّرْكَةُ بِمَوْتِ اَحَدِهِمَا الخ : যদি দুই শরীকের একজন মৃত্যু বরণ করে তা প্রকৃতগত হোক বা হুকমীগত হোক। আর তা হল (তথা হুকমী মৃত্যু হল) যদি দারুল হরবে চলে যায় আর শাসক তাকে দারুল হরবের অন্তর্ভুক্তির ফায়সালা দিয়ে দেন তাহলে এ দু' অবস্থার মৃত্যু দ্বারা অংশীদারিত্ব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, অংশীদারিত্বের মধ্যে ওয়াকালত অন্তর্ভুক্ত। অথচ মৃত্যুর কারণে (বা দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে) ওয়াকালত বাতিল হয়ে গেল। এক্ষেত্রে শরীকদ্বয় তার শরীকের মৃত্যুর খবর শুনল কি না তা দেখতে হবে না। কেননা, তা হল বিধানগত অপসারণ। সুতরাং ওয়াকালাত যখন বাতিল হয়ে গেল তখন অংশীদারীত্ব চুক্তি এমনিতেই বাতিল হয়ে যাবে। তবে হা যদি দুই শরীকের একজন তার শরীকানা চুক্তি বাতিল করে দেয় তাহলে অপর শরীক তার অবগতির দিক বিবেচনা করা হবে। কেননা, ইহা হচ্ছে সেচ্ছায় অপসারণ।

قوله : وَ لَمْ يُزَكِّ مَالَ الْأٰخِرَةِ الخ : শরীকদ্বয় একজনের অনুমতি ছাড়া অন্যজন তার যাকাত আদায় করতে পারবে না। কেননা, যাকাত আদায় করা তা ব্যবসায়ীক কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি উভয়েই যাকাত আদায় করার জন্য উভয়কে অনুমতি দিয়ে দেয় আর তারা এক সাথে আদায় করে তাহলে প্রত্যেকেই অপরজনের হিসসার দায় বহন করবে। আর যদি তাদের আদায় করা আগে পরে হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়জন দায় বহনকারী হবে। প্রথম জনের আদায় করা সম্পর্কে অবগত হোক বা না হোক। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে যদি অবগত না হয় তাহলে দায় বহনকারী হবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : সে তো দরিদ্রকে মালিক বানানোর হুকুমে আদিষ্ট। সুতরাং সে তাই করেছে। কিন্তু তা যাকাত হিসাবে হওয়া না হওয়া ইহা তো তার মালিকানায় নয়। বরং তা হচ্ছে মূল মালিকের নিয়তের উপর নির্ভর। সুতরাং তার দায়িত্বে যা ছিল সে তাই করেছে। এজন্য মুআক্কীলের অনুকূলে দায় বহনকারী হবে না। আর বিষয়টি এমন হল যে, অবরুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষ হতে দম দেওয়ার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশকারীর অবরুদ্ধতা বিলুপ্তির পর এবং তার হজ্জ আদায়ের পর (আদিষ্ট ব্যক্তি) প্রাণী জবেহ করে তাহলে তার উপর ক্ষতি পুরণের দায় আরোপ হয় না। আর এক্ষেত্রে বিষয়টি সে অবগত হোক বা না হোক এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : সে তো যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট। অথচ যা সে আদায় করেছে তা তো যাকাত হয়নি। তাই সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী হল। আর এটা এজন্য যে আদেশদাতা তার আদেশের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে অবশ্যই পালনীয় বিধান থেকে দায়মুক্ত করা। কেননা, স্বভাবতই মানুষ একটি ক্ষতি রোধ করার জন্য আরেকটি ক্ষতি মেনে নেয়। আর এখানে তার উদ্দেশ্য সে নিজে আদায় করার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আদিষ্ট ব্যক্তির আদায় এর মধ্যে এ উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং সে তার বহনকারী হবে। সে তা অবগত থাক বা না থাক।

আর অবরুদ্ধতার দম সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে দায়বহণের ব্যাপারে কোন কোন ইমামের নিকট এ সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। কেননা, মূলত অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর তো দম ওয়াজিব নয়। বরং সে তার

অবরুদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা। পক্ষান্তরে যাকাত আদায়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তাতো আদেশের সময়েও ওয়াজিব ছিল। সুতরাং এখানে কর্তব্যদায় রহিত করার বিষয়টি উদ্দেশ্যরূপে বিবেচ্য। তাই অবরুদ্ধতার বিষয়কে এ ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

قوله : وَاِنْ اَذِنَ اَحَدُ الْمُفَاوَضَيْنِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, শিরকাতুল মুফাওয়াযার একজন শরীক অপরজনকে একটি দাসী খরীদ করে তার সাথে সহবাস করার অনুমতি প্রদান করে আর সে তা করে তাহলে আর্থিক দায় ছাড়াই দাসী তার হয়ে যাবে। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতামত। পক্ষান্তরে সাহাবাইন (রহ.) এর মতে অনুমতি দাতা অপরজন থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত নেবে। কেননা, সে একান্তভাবে তার উপর সাব্যস্ত ঋণ শরিকানা মাল থেকে পরিশোধ করেছে। সুতরাং অপর শরীকদার তার কাছ থেকে নিজের হিসসা ফেরত নিবে। যেমন অন্য কোন প্রকার খাদ্য বা বস্ত্র খরিদ করার ক্ষেত্রে। আর তা এ কারণে যে, দাসীর মালিকানা একান্তভাবে ক্রেতার অনুকূলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর মালিকানার বিপরীতে মূল্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর দলিল : উক্ত খরীদকৃত দাসীটি অংশিদারিত্বের দাবী মতে নিশ্চিতরূপেই অংশীদারি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেননা, তারা তো চুক্তির প্রকৃতি পরিবর্তনের অধিকারী নয়। সুতরাং এটা অনুমতি প্রদান না করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেল। আর উক্ত অনুমতিটা নিজ অংশ হেবা করে দেয়াকে অন্তর্ভুক্ত করল। কেননা মালিকানা ছাড়া তো সহবাস করা বৈধ নয়। আর তা বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে না। কেননা, তা অংশীদারীত্বের পরিপন্থী। সুতরাং উক্ত অনুমতিকে হেবার অর্থে গ্রহণ করে তার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করেছি। কিন্তু খাদ্য বা বস্ত্রকে অনিবার্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যতিক্রম গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং তা মূল চুক্তি বলে তা তার মালিকানায় এসে পড়বে। সুতরাং তার সাথে আলোচ্য মাসআলার কিয়াস করা সহীহ হয়নি।

كِتَابُ الْوَقْفِ

অধ্যায় : ওয়াকফ

هُوَ حَبسُ الْعَيْنِ على مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنفَعَةِ وَالْمِلْكُ يَزُولُ بِالْقَضَاءِ لَا إلَى مَالِكٍ وَلَا يَتِمُّ حتى يَقْبِضَ وَيفْرِزَ وَيجْعَلَ آخِرَهُ لِجِهَةٍ لَا تَنقَطِعُ وَصَحَّ وَقْفُ الْعَقَارِ بِبَقَرِهِ وَأَكَّرتِه وَمُشَاعٍ قَضَى بِجَوَازِهِ وَمَنقُولٍ فيه تَعَامُلٌ وَلَا يُملَكُ الْوَقْفُ وَلَا يُقسَمُ وَإِنْ وَقَفَ على أَوْلَادِهِ وَيبدأُ من غَلَّتِهِ بِعِمَارَتِهِ بِلَا شَرْطٍ وَلَو دَارًا فَعِمَارَتُهُ على من له السُّكْنَى وَلَوْ أَبَى أو عَجِزَ عَمَّرَ الْحَاكِمُ بِأُجْرَتِهَا وَيُصْرَفُ نَقْضُهُ إلَى عِمَارَتِهِ إنْ احْتَاجَ وَإِلَّا حَفِظَهُ لِيَحْتَاجَ وَلَا يَقْسِمُهُ بين مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ وَإِنْ جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ أو جَعَلَ الْوِلَايَةَ إلَيْهِ صَحَّ وَينزَعُ لو خَائِنًا كَالْوَصِيِّ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُنزَعَ -

অনুবাদ : ওয়াকফ হল কোন ব্যক্তি কোন জিনিষকে নিজের মালিকানায় রেখে দিয়ে এর উপকারিতা দান করে দেয়া। আর মালিকানা রহিত হয় (শাসকের) বিচারের মাধ্যমে। পুনরায় (পূর্বের) মালিকের দিকে ফিরে যাবে না। আর (মুতাওয়াল্লী কর্তৃক) কজা না করা পর্যন্তও তা পৃথক না করা। এবং তার শেষে চিরস্থায়ী কোন দিক উল্লেখ না করা পর্যন্ত ওয়াকফ পরিপূর্ণ হবে না। আর ভূমি সম্পত্তি হালের বলদ ও ভূমি বাষীদের (যারা তার গোলাম) সহ তার (ওয়াকফ করা বৈধ) ও অবিভক্ত সম্পত্তি যা জায়েয হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। (তা ওয়াকফ করা জায়েয) এবং স্তানান্তর যোগ্য বস্তু যাতে ওয়াকফের প্রচলন রয়েছে তা ওয়াকফ করা বৈধ। আর কাউকে (ওয়াকফের) মালিকানা বানানো যাবে না এবং (তা) বন্টন করা যাবে না। যদিও তার সন্তানাদির অনুকুলে ওয়াকফ করে থাকে। আর তার (ওয়াকফকৃত সম্পত্তির) আয় প্রথমত তার প্রয়োজনীয় উন্নয়নে কোনরূপ শর্ত ছাড়াই ব্যয় করা শুরু করবে। আর যদি তা (ওয়াকফকৃত বস্তু) বাড়ী হয় তবে বসবাস যার হবে উন্নয়ন ব্যয়ও তার উপর বর্তাবে। আর যদি সে প্রদানে অস্বীকার করে কিংবা (দরিদ্রতার দরুন) অক্ষম হয় তাহলে বিচারক (তা ভাড়ায় দিয়ে) তার আয় দিয়ে উন্নয়ন করবে। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে তার ভগ্নাবশেষগুলো তার উন্নয়নে ব্যয় করবেন। নতুবা তা প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষণ করবে। আর তা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির হকদারের মাঝে বন্টন করবেন না। আর ওয়াকফকারীর যদি ওয়াকফের আয় নিজের নামে নির্ধারিত করে কিংবা তার পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখে তাহলে তা সহীহ। আর যদি ওয়াকফকারী খিয়ানতকারী হয় (বিশ্বাস ভঙ্গকারী হয়) তবে তা ওয়াছি এর ন্যায় তার হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হবে যদিও সে না নেয়ার শর্ত করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

قوله : هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ الخ : ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হয় কি না এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য বিদ্যমান। তাহল ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে ওয়াফক কৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হয় না। তবে হা যদি শাসক তার মালিকানা বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়ে দেন, কিংবা সে ওয়াকফ করার সময় বলে যে তা আমার মৃত্যুর সাথে সাথেই এই কাজের জন্য ওয়াকফ করলাম। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার সাথে সাথেই তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পত্তির জন্য মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা পর্যন্ত মালিকানা রহিত হবে না। সাহাবাইন (রহ.) এর দলিল : ওয়াকফ অর্থ বস্তুকে আল্লাহর মালিকানার বিধানের ভিত্তিতে আবদ্ধ করা। তাই তা ওয়াকফকারীর মালিকানা থেকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে চলে যাবে যে তার মুনাফা বান্দার দিকে ফিরে আসবে। তাই তা বাধ্যতামূলক হবে। তাছাড়া হযরত উমর (রাযি.) সম্পর্কীয় হাদীস। তা হল যখন হযরত উমর (রাযি.) তার মালিকানাধীন ছামাগ নামক ভূমি সাদকা করতে চাইলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাকে বললেন :

تَصَدَّقْ بِاَصْلِهَا وَ لَايُبَاعُ وَ لَايُورَثُ وَ لَايُوهَبُ

'মূল ভূমি সাদকা কর যা কখনো বিক্রি করা যাবে না, মীরাছরূপে বন্টন করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না।' তাছাড়া অনেক সময় ওয়াকফকারীর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে তা বাধ্যতামূলক হয়। যেমন, যাতে সার্বক্ষণিক এর ছওয়াব তার দিকে পৌছতে থাকা আর তা সম্ভব একমাত্র তার মালিকানা মুক্ত করে আল্লাহর মালিনাকায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে। আর তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মসজিদ। তবে ইমাম আবু হউসুফ (রহ.) বলেন, ওয়াকফের বক্তব্য উচ্চারণ মাত্র মালিকের মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তা তো মালিকানা রহিতমূলক বক্তব্য, যেমন আজাদ করার বিষয়টি। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, মুতাওয়াল্লির হাতে অর্পণ না করা পর্যন্ত মালিকানা বাতিল হবে না। কেননা, তা হচ্ছে আল্লাহর হক। যা বান্দার হাতে অর্পনের মধ্য দিয়ে ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হয়। তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তো সব কিছুর মালিক। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছুকে উদ্দেশ্যরূপে আল্লাহর মালিকানায় প্রদান কর সাব্যস্ত হতে পরে না। তবে অন্যকে মালিক বানানোর অনুবর্তীরূপে সাব্যস্ত হতে পারে। তখন আল্লাহকে মালিক বানানো হবে। আর তা যাকাত ও অন্যান্য সাদাকাত এর সাদৃশ্য হল। ইমাম আবু হানিফা এর দলিল : তিনি বলেন, শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফ অর্থ কোন বস্তুকে মালিকের মালিকানায় আবদ্ধ করে দেয়া। আর তার মুনাফা সাদকা করে দেয়া। তাছাড়া নবী করীম (সা.) এর হাদীস : لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফারায়েয থেকে কোন মাল আবদ্ধ রাখার অবকাশ নেই।' আর হযরত শোরায়হ (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা.) (ওয়াকফের মাধ্যমে) আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রির বৈধতা নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া এ কারণে যে এতে তো বান্দার হক এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, সে চাষাবাদ, বসবাস ও অন্যান্য উপায়ে তার থেকে ফায়দা গ্রহণ করার বৈধতা রয়েছে। অনুরূপভাবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় যথার্থ স্থানে ব্যয় করার বিষয়টিও তার কতৃত্বাধীন থাকে। তবে ওয়াকফকারী ওয়াকফের সম্পত্তির আয় সর্বদা ছদকার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যদি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় তবে তো অর্জিত মুনাফার ছওয়াব তার অনুকুলে হওয়া সম্ভব নয়। আর মসজিদের বিষয় ব্যতিক্রম। কেননা, মসজিদ থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। কেননা, তা তো একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্মান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সদকা অনুরূপ নয়। কেননা, তা থেকে বান্দার উপকার অর্জন করা বৈধ। তাই তা তার নিযুক্ত কোন বিচারক ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হওয়ার ফায়সালা প্রদান করে থাকেন, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। অনুরূপ সে যদি তার নিজের মৃত্যুর সাথে ওয়াকফকে সম্পৃক্ত করে। আর এ ক্ষেত্রে শাসকের ফায়সালা এজন্য যে তাতে ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত প্রদান। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত রাখার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত এই যে, তাতে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হবে না। তবে তা হল চিরস্থায়ীভাবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মুনাফা সাদকা করে দেয়া। সুতরাং

তা স্থায়ীভাবে কোন কিছুর মুনাফা সম্পর্কে ওয়াছিয়াতের সমতুল্য হল। তাই তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

قوله : وَ يُجْعَلُ اٰخِرَهُ بِجِهَةٍ الخ : ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে যদি তার শেষে চিরস্থায়ী কোন দিক উল্লেখ না করে তাহলে ওয়াকফ পূর্ণতা লাভ করবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে অস্থায়ী কোন খাত উল্লেখ করলেও ওয়াকফ জায়েয হয়ে যাবে। অতঃপর উক্ত খাত বন্ধ হয়ে গেলে তা গরীব-মিসকিনদের জন্য হয়ে যাবে। যদিও ওয়াকফ করার সময় তাদের নাম উল্লেখ করা না হয়। তিনি দলিল দেন যে, মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লহর নৈকট্য অর্জন করা। আর তা তো এখানে বিদ্যমান। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা কখনো অস্থায়ী খাতে ওয়াকফ করার মাধ্যমে হয় আর কখনো স্থায়ী খাতে ওয়াকফ করার মাধ্যমে হয়। সুতরাং ওয়াকফের স্থায়ী সুরতই বৈধ হবে। তরফাইন (রহ.) এর দলিল : ওয়াকফের ফলাফল হলো নতুন কোন মালিকানার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মালিকানা বিলুপ্ত হওয়া। সুতরাং তা চিরস্থায়ী হয়। যেমন দাস মুক্তির বিষয়টিতে চিরস্থায়ী মালিকানা বিলুপ্ত হয়। সুতরাং উল্লেখকৃত খাতটি যদি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তাহলে সেখানে ওয়াকফের দাবী পূর্ণ হয় না। তাই যেভাবে সাময়িক বিক্রি বাতিল তেমনি সাময়িক ওয়াকফও বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। আর কেহ কেহ বলেন, চিরস্থায়ী খাতে ওয়াকফ করা সর্বসম্মত শর্ত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে ওয়াকফের সময় চিরস্থায়ী শব্দটি উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেননা ওয়াফক ও সাদকা তা চিরস্থায়ীই হয়ে থাকে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে চিরস্থায়ীত্বের দিক উল্লেখ করা শর্ত। কেননা, ওয়াক্‌ফ হচ্ছে মুনাফা সদকা করা আর তা তো সাময়িক হতে পাবে আবার চিরস্থায়ী হতে পারে। তাই শর্তহীন ওয়াকফে স্থায়ীত্বের দিকে ধাবিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য স্থায়িত্বের বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ অপরিহার্য।

قوله : وَ صَحَّ وَقْفُ الْعِقَارِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ভূ-সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ। কেননা, সাহাবায়ে কেরামগণ ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। আর স্থানান্তরযোগ্য ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াফক করা জায়েয নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, যদি ভূমি তার হালের বলদ এবং ভূমি চাষী যারা ওয়াকফকারীর গোলাম তাদেরসহ ওয়াকফ করা বৈধ। চাষাবাদের অন্যান্য উপকরণ সম্পর্কে তেমনি মন্তব্য হবে। কেননা, ভূমি থেকে অর্জিত মুনাফাই হচ্ছে ভূমির উদ্দেশ্য। সুতরাং ভূমি থেকে মুনাফা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হল চাষ করা। সুতরাং ভূমিতে চাষ করতে যা প্রয়োজন হয় সবই ভূমির অনুবর্তী হয়ে তাতেও ওয়াকফ সহীহ।

قوله : وَ مُشَاعٍ قَضٰى بِجَوَازِهٖ الخ : ইজমালি সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ। যদি তা বন্টনযোগ্য হয়ে থাকে, ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতামত। কেননা বন্টন হচ্ছে দখল বুঝে নেয়ার পূর্ণাঙ্গ পর্যায়। আর তার মতে দখল শর্ত নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে তাতে ওয়াকফ কার্যকর নয়। কেননা, মুতাওয়াল্লিরা বা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি ওয়াকফ কৃত ভূমির মূল দখল বুঝে নেয়া শর্ত। সুতরাং যা দ্বারা দখল পূর্ণাঙ্গ হয় তথা বন্টন তা শর্ত হবে। আর যদি ইজমালী সম্পত্তি বন্টনযোগ্য না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে ইজমালী অবস্থায়ই তাতে ওয়াকফ বৈধ হবে। কেননা, তিনি হেবা ও সাদাকার সাথে কিয়াস করেছেন। কিন্তু মসজিদ ও কবরস্থানের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে বন্টন যোগ্যতা না থাকা অবস্থায় তাতে ওয়াকফ বৈধ নয়। কেননা, শরীকানায় বিদ্যমান থাকা তা একান্ত আল্লাহর জন্য হওয়াকে বাধা প্রদান করে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে পালাক্রম প্রয়োগ করা তা অত্যন্ত ঘৃণ্য। কেননা, এক বৎসর কবরস্থান বা মসজিদ থাকবে আর এক বৎসর ফসলী জমি বা ঘোড়ার আস্তাবল থাকবে তা তো মোটেও গ্রহণীয় নয়। আর এ দুটি ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে ওয়াকফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেটাকে কাজে লাগানো এবং উৎপাদন বন্টন করা সম্ভব। আর যদি সবটুকু ওয়াকফ করার পর তার একাংশের কোন হকদার প্রমাণিত হয়। তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে অবশিষ্টাংশের ওয়াকফও বাতিল হবে যাবে।

قوله : وَ مَنْقُوْلٍ فِيْهِ تَعَامُلٌ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে সকল স্থানান্তর যোগ্য বস্তু ওয়াকফ করার প্রচলন রয়েছে, সেগুলো ওয়াকফ করা জায়েজ হবে। যেমন বালতি, জানাযার খাটিয়া, কুড়াল, ডেগ-ডেগচি, কুরআন শরীফ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে তা ওয়াকফ করা জায়েয নয়।

কেননা, কিয়াস বর্জন করা হয় শরীয়াতের প্রত্যক্ষ কোন দলিলের ভিত্তিতে। আর নস শুধু অস্ত্র ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে এসেছে। যেমন হুজুর (সা.) ইরশাদ করেন :

وَ اَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ حَبَسَ اَدْرُعًا وَ اَفْرَاسًا لَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ طَلْحَةُ حَبَسَ دِرْعَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

'আর খালেদ তো তার কিছু বর্ম ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ (ওয়াকফ) করেছেন। আর তালহা তার বর্মসমূহ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেছেন।' সুতরাং মাশহুর হাদীসের ভিত্তিতে কিয়াস শুধু অস্ত্র ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে বর্জিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, লোক প্রচলনের কারণে কিয়াস পরিত্যাগ করা যায়। আর উপরোক্ত বস্তুসমূহ ওয়াকফ করার প্রচলন রয়েছে। তবে হ্যা যেগুলোতে লোক প্রচলন নেই সেগুলো ওয়াকফ করা আমাদের মতেও জায়েয নেই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে সকল বস্তুর মূল সত্য বিদ্যমান রেখে উপকার লাভ করা যায় এবং তা বিক্রয় করাও যায় তবে সে গুলোতে ওয়াকফ করাও বৈধ। কেননা, উপকার যোগ্যতার দিক থেকে এগুলো অস্ত্র-অশ্ব এর ন্যায়। প্রচলন থাক বা না থাক। এ ব্যাপারে আমাদের দলিল এই যে, এগুলো ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীত্বের দিক নেই। অথচ আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে তা শর্ত।

قوله : وَلَا يُمَلَّكُ وَ لَا يُقْسَمُ الخ : আর ওয়াকফকৃত বস্তু কারো মালিকানা প্রদান করা যাবে না। তেমনি তা বন্টন করাও জায়েয নেই। এমনকি যদি কোন ব্যক্তি তার সন্তানাদির মাঝে কোন ভূমি বা বস্তু ওয়াকফ করে থাকে তবুও তা তাদের মাঝে বন্টন করা যাবে না। বরং তারা তা অবশিষ্ট অবস্থায় তা থেকে উপকৃত হবে। আর ইমাম আবু ইসুফ (রহ.) এর মতে ওয়াকফকৃত ভূমি যদি ইজমালি হয়ে তাকে আর শরীকদার তা বন্টনের দাবী করে তবে তা বন্টন বৈধ। এক্ষেত্রে বন্টন বৈধ হওয়ার দলিল হল : এক্ষেত্রে বন্টন করা এর অর্থ হচ্ছে পৃথকীকরণ ও আলাদাকরণ, ওয়াকফের ক্ষেত্রে ওয়াকফের মূল স্বার্থ রক্ষার্থে পৃথকীকরণের দিকটাকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং তা মূলত বিক্রি বা অন্যকে মালিক বানানো নয়। আর যদি উক্ত ওয়াকফকারী ইজমালি সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ ওয়াকফ করে থাকে তাহলে সে নিজেই তার শরীকদারের সাথে বন্টন করবে। কেননা তা ওয়াকফকারী বা তার মৃত্যুর পর ওয়াছির হাতে অর্পিত। আর যদি কেহ নিজের একক মালিকানাধীন ভূমিসম্পত্তির এক অংশ ওয়াকফ করে থাকে তাহলে বিচারক তা বন্টন করে দিবেন। অথবা সে তার অবশিষ্টাংশ অন্য কারো নিকট বিক্রি করবে অতঃপর ক্রেতা তা বন্টন করে নেবে। অতঃপর ক্রেতার নিকট থেকে ওয়াকফকারী পুনরায় তা ক্রয় করে নেবে। কেননা, এক ব্যক্তি দাবীকারী এবং বন্টনকারী হতে পারে না।

قوله : وَ يُبْدَأُ مِنْ غُلَّتِهِ الخ : আর ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় প্রাথমিকবাবে ব্যয় করা হবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির প্রয়োজনীয় উন্নয়নে। ওয়াকফকারী এর শর্ত করুক বা না করুক। কেননা, ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থায়ীভাবে ওয়াকফের সম্পত্তি থেকে উৎপাদিত আয় ব্যয় করা। সুতরাং যদি উক্ত সম্পত্তিতে উন্নয়নমূলক কাজ করা না হয় তাহলে তাতো স্থায়ী হবে না। তাই স্থায়ীত্বের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন করা হবে। তাছাড়া এজন্য যে দায় বহনের বিনিময়েই ফল ভোগের অধিকারী হয়। সুতরাং তা ঐ গোলামের ভরণপোষণের ন্যায় যার খেদমত গ্রহণকারীর উপরই তার ভরণ-পোষণের দায় আরোপ হবে। আর যদি দারিদ্রের অনুকুলে অসিয়াত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ওয়াকফ থেকে অর্জিত মালই হল তাদের সহজলভ্য মাল। সুতরাং তা থেকেই উন্নয়ন ব্যয় সাব্যস্ত হবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন লোকের নামে ওয়াকফ করা হয়। কিন্তু ওয়াকফের ফলাফল গরীব মিসকীনদের জন্য হয়। তাহলে উন্নয়ন ব্যয় ঐ লোকটি জীবদ্দশায় তার সম্পত্তিতে সাব্যস্ত হবে। তার যে কোন সম্পত্তি থেকে তা আদায় করা হবে। অবশ্য তার প্রতিকুলে ঐ পরিমাণ ব্যয় সাব্যস্ত হবে যা দ্বারা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফকালীন অবস্থার উপর থাকতে পারে।

আর যদি কেহ তার বাড়ি নিজ সন্তানদের মাঝে ওয়াকফ করে তাহলে বসবাস যার হতে উন্নয়ন ব্যয় তার উপর বর্তাবে। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দায় বহনের বিনিময়ে ফল ভোগের অধিকারী হয়।

قوله : وَ لَوْ اَبٰى اَوْ عَجِزَ الخ : আর যার নামে ওয়াকফ করা হয়েছে সে যদি প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যয় বহন

করতে অস্বীকার করে কিংবা সে যদি অক্ষম হয়। তাহলে কাজী তা ভাড়ায় খাটাবেন এবং এ থেকে অর্জিত আয় দ্বারা তা উন্নয়ন করবেন। অতঃপর যার বসবাসের অধিকার তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন। কেননা, এতে ওয়াকফকারীর হক এবং বসবাস কারীর হক রয়েছে। সুতরাং আলোচ্য পদ্ধতির মাধ্যমে উভয়ের হকের দিকের বিবেচনা করা হয়। কেননা, যদি তাতে উন্নয়ন করা হয় না। তাহলে তা বসবাস উপযোগীই থাকবে না।

قوله : وَ يُصْرَفُ نَقْضُهُ الخ : আর যদি ওয়াকফকৃত ভবন ধ্বংস হয় বা তা পুনঃনির্মানের প্রয়োজনে তা ধ্বংস করা হয় তাহলে ভগ্নাবশেষগুলো ওয়াকফকৃত সম্পত্তি উন্নয়নের কাজে ব্যয় করবেন। যদি প্রয়োজন হয়। আর যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে তা সংরক্ষণ করবেন। তবে তা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির হকদারের কাছে বন্টন করা জায়েয হবে না। কেননা, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি যেন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে এবং ওয়াকফকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সে জন্য উন্নয়ন ও সংস্কার অপরিহার্য। সুতরাং যদি তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রয়োজন হয় তাহলে তা কাজে লাগানো হবে। আর যদি তাৎক্ষণিক কাজে লাগে না, তাহলে তা আগামি প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হবে। আর যদি তা সংরক্ষণ করা কষ্টকর হয় তাহলে তা বিক্রি করে সংরক্ষণ করা হবে। আর তা হবে মূলকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তীকে ব্যবহার করা আর তা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির হকদারের মাঝে বন্টন করা যাবে না। এজন্য যে তারা মূল সত্ত্বার হকদার নয়, বরং তার মুনাফার মধ্যে শুধু তাদের হক রয়েছে। কেননা, সত্ত্বা হচ্ছে আল্লাহর হক। সুতরাং যা তাদের হকের অন্তর্ভুক্ত তা তাদের মধ্যে বন্টিত হবে অন্য কিছু নয়।

قوله : وَ اِنْ جَعَلَ الْوَقْفَ الخ : ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফের আয় নিজের নামে নির্ধারিত করে অথবা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির পরিচালনা নিজের কর্তৃত্বে নিজ হাতে রখে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে তা জায়েয। কেননা, নবী করীম (সা.) সাদাকা থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন। আর সাদাকা অর্থ এখানে ওয়াকফকৃত সাদাকা। অথচ নিজের জন্য শর্তারোপ ছাড়া তা থেকে আহার করা হালাল নয়। তাই উক্ত হাদীস এ রকম শর্তারো করাকে বৈধতা প্রমাণ করে। তাছাড়া এজন্য ওয়াকফ হল নিজের মালিকানা রহিত করে ছাওয়াবের আশায় আল্লাহর নামে সাব্যস্ত করা। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সুতরাং যখন অংশ বিশেষ বা সম্পূর্ণ নিজের জন্য বরাদ্দের শর্তারোপ করে তখন যা আল্লাহর মালিকানায় হয়ে গেছে তা নিজের মালিকানায় আনয়ন করা হবে। তা নিজস্ব মালিকানার বস্তু নিজের মালিকানায় আনয়ন করা নয়। আর তার তো বৈধতা রয়েছে। যেমন কেহ সরাইখানা, হাম্মামখানা, পানির উৎস বা কবরস্থান তৈরী করে ওয়াকফ করে দিল এ শর্তে যে সে উক্ত সরাইখানায় থাকবে, উক্ত পানির উৎস থেকে পান করবে বা উক্ত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে, তবে তা সহীহ। তা ছাড়া তার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ছওয়াব লাভ করা। আর নিজের জন্য ব্যয় করার মধ্যেও ছওয়াব রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন : نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى نَفْسِهٖ صَدَقَةٌ মানুষের নিজেদের জন্য খরচ করাটাও সদকা। অনুরূপভাবে যদি সে তা পরিচালনা কর্তৃত্ব নিজ হাতেও রাখার শর্ত করে তবে তা জায়েয হওয়ার কারণ হচ্ছে ওয়াফক বৈধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পন করা। সুতরাং নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক তারই পক্ষ হতে তারই আরোপিত শর্তের কারণে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তা তো অসম্ভব যে অন্য লোক তার পক্ষ হতে কর্তৃত্ব লাভ করবে। অথচ তার নিজের জন্য কর্তৃত্ব লাভ হবে না। তা ছাড়া উক্ত ওয়াকফকৃত সম্পত্তির সেই হচ্ছে অত্যন্ত নিকটতম ব্যক্তি। সুতরাং এর পরিচালনা কতৃত্বের ব্যাপারে সেই হচ্ছে অধিকতর হকদার। যেমন কেহ যদি মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে উক্ত মসজিদে মুআজ্জিন নিযুক্ত করণ বা তা সংস্কার করণে সেই হবে অধিক হকদার। তবে তা যদি এমন হয় যে সে নিজের হাতে ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনায় শর্ত করল অথচ সে এ ব্যাপারে খিয়ানতকারী। তাহলে কাযীয় অধিকার রয়েছে তিনি গরীব মিসকিনদের কল্যাণের লক্ষ্যে তা তার হাত থেকে নিয়ে নিবেন। যেমন তার অধিকার রয়েছে অপ্রাপ্ত সন্তানের স্বার্থ রক্ষার্থে ওয়াছীকে সম্পত্তির পরিচালনা থেকে বের করে দেয়া। অনুরূপ যদি সে তাও শর্ত করে যে কোন শাসকের জন্য এ অধিকার নাই যে সে তা তার কর্তৃত্ব থেকে বের করে অন্য কাউকে উক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে। তাহলেও খিয়ানতের আশংকার সময় তার এ শর্ত বাতিল হিসাবে গণ্য করা হবে। কেননা, তা শরীয়াত বিরোধী শর্ত।

অনুচ্ছেদ : فصل

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لم يَزُلْ مِلْكُهُ عنه حتى يُفرِزَهُ عن مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فيه وإذا صلى فيه وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أو فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أو اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فِيهِ لَهُ بيعه وَيُورَثُ عنه وَمَنْ بَنَى سِقَايَةً أو خَانًا أو رِبَاطًا أو مَقْبَرَةً لم يَزُلْ مِلْكُهُ عنه حتى يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ وَإِنْ جُعِلَ شَيْءٌ من الطَّرِيقِ مَسْجِدًا صَحَّ كَعَكْسِهِ -

অনুবাদ : যে কেউ মসজিদ নির্মাণ করল তাহলে তার থেকে মালিকানা রহিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা যথাযথভাবে তার মালিকানা থেকে পৃথক না করবে এবং লোকদের সেখানে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান না করবে। সুতরাং যখন (তার অনুমতিক্রমে) সেখানে একজন ব্যক্তি নামাজ আদায় করে ফেলবে তখন তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে। আর কেহ যদি এমন মসজিদ তৈরী করে যার নীচে (ভূগর্ভস্থ) কক্ষ রয়েছে। কিংবা যার উপরে (বিভিন্ন তালা) কক্ষ রয়েছে। আর মসজিদের দরজা রাস্তার দিকে খুলে দেয় অতঃপর সেটাকে সে (তার নিজ মালিকানা থেকে) পৃথক করে দেয়। অথবা যদি সে তার বাড়ীর মধ্যখানে মসজিদ তৈরী করে এবং মানুষকে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয় তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তা তার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারভুক্ত হবে। আর যে কেউ (নিজ ভূমিতে মুসলমানদের জন্য) পানকেন্দ্র (মুসাফিরদের জন্য) সরাইখানা, অশ্বশালা কিংবা কবরস্থান স্থাপন করে তাহলে শাসকের ফায়সালা করা পর্যন্ত তা থেকে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না, যদি রাস্তায় কিছু অংশকে (প্রয়োজনের ভিত্তিতে) মসজিদ (এর অন্তর্ভুক্ত) করা হয় তবে তা সহীহ। যেমন এর বিপরীতে সহীহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : قوله : وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا الخ : যখন কেহ তার মালিকানাধীন ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করে তবে তার মালিকানা ভুক্তই থাকবে। অতঃপর যখন সে তা যথাযথভাবে তার মালিকানা থেকে পৃথক করবে এবং লোকদেরকে তাতে নামাজ আদায়ের অনুমতি দিয়ে দিবে। এবং তার উক্ত অনুমতিক্রমে তাতে একজন ব্যক্তি নামাজ আদায় করে ফেলবে। তখন তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট হল : (১) পৃথকীকরণ অপরিহার্য। আর তা এজন্য যে, পৃথকীকরণ ছাড়া তা খালেস আল্লাহর জন্য হতে পারে না। (২) তাতে নামাজ আদায় করা। আর তা এজন্য যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে ওয়াকফ স্বীকৃত হওয়ার জন্য অর্পণ অপরিহার্য। আর প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর অর্পণ বিবেচ্য। সুতরাং মসজিদের ক্ষেত্রে এর অর্পণ হচ্ছে তাতে নামায আদায় করা। তাছাড়া একারণে যে, যেহেতু মসজিদের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে কব্জা করা সম্ভব নয়, সুতরাং উদ্দেশ্যকে কব্জার স্থলবর্তী করা হবে।

قوله : وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا الخ : আর যে ব্যক্তি এমন মসজিদ তৈরী করে যার নীচে তথা ভূগর্ভস্থ কক্ষ রয়েছে কিংবা যার উপরে তালা তালা সিস্টেম কক্ষ রয়েছে। আর মসজিদের দরজা বা প্রবেশপথ সাধারণ রাস্তার দিকে খুলে দেয় এবং তা তার মালিকানা থেকে পৃথক করে দেয়। তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তা তার ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী সম্পত্তিরূপে প্রাপ্ত হবে। কেননা, তা এক মাত্র আল্লাহর জন্য হয়নি। কারণ, তাতে বান্দার হক মিশ্রিত রয়েছে। তবে যদি ভূগর্ভস্থ কক্ষটি মসজিদের প্রয়োজনে হয়ে থাকে তবে তা সাধারণ মসজিদের ন্যায় তার ওয়াকফও বিশুদ্ধ হবে। যেমন বায়তুল মুকাদ্দাসের ভূগর্ভস্থ কক্ষ। আর হযরত হাসান বিন যিয়াদ হযরত আবু হানিফা (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি নীচে মসজিদ হয় আর উপরে বসবাস বা

মানুষের অন্য কোন প্রয়োজনের কক্ষ হয় তাহলে তা মসজিদরূপে গণ্য হবে। কারণ, মসজিদ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। আর তা নীচের থেকেই সাব্যস্ত হয়। উপরের থেকে নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর ঘর। যার সম্মান মর্যাদা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যকীয়। সুতরাং তা উপর থেকেই গণ্য করা হবে। কেননা, যদি উপরে ভাড়ার ঘর বা বসবাসের ঘর হয় তবে তাতে তা'জীম রক্ষা করা হবে না। উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যখন রায় নামক স্থানে প্রবেশ করলেন তখন আমাদের কথিত 'প্রয়োজন' এর প্রেক্ষিতে উক্ত সব কটি সুরতকেই বৈধ বলেছেন। আলোচ্য মাসআলার ন্যায় হুকুম হবে যদি কেহ তার বাড়ীর মধ্যখানে মসজিদ নির্মাণ করে এবং মানুষকে তাতে নামাজ পড়ার অনুমতি প্রদান করে। তাহলে তাও খালিস আল্লাহর জন্য হবে না। এজন্য সে তা বিক্রি করতে পারবে এবং তার মৃত্যুর পর তাতে উত্তরাধিকারী জারী হবে। কেননা, মসজিদ এমন স্থানে হওয়া চাই যেখানে কারো বাধা দানের অধিকার থাকবে না। অথচ যদি মসজিদের চতুর্দিকে তার মালিকানাভুক্ত জমি বিদ্যমান থাকে তবে তো তার বাধা দানের অধিকার থেকে গেল। সুতরাং তা মসজিদ হল না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাকেও মসজিদ গণ্য করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা, যখন সে মসজিদ নির্মানে রাজী হল তখন আবশ্যকীয়ভাবে তার রাস্তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, রাস্তা ছাড়া তো মসজিদ হতে পারে না। সুতরাং তা মসজিদের প্রাপ্য হক হল। যেমন বাড়ী ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে রাস্তার উল্লেখ না করলেও রাস্তা তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

قوله : وَ مَنْ بَنٰى سِقَايَةً اَو خَانًا الخ : যদি কেহ মুসলমানদের জন্য পানকেন্দ্র স্থাপন করে কিংবা মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা বা অশ্বশালা তৈরী করে কিংবা কবরস্থান তৈরী করে তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে শাসকের আদেশের পূর্বে তার মালিকানা তার থেকে বিলুপ্ত হবে না। কেননা, তা বান্দার হক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তার কারণ হচ্ছে উক্ত ব্যক্তি তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ সরাইখানায় সে নিজে অবস্থান করার, পানকেন্দ্র থেকে পান করার, কিংবা কবরস্থানে তাকে সমাহিত করার অধিকার তারও আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে শাসকের বিচারের মাধ্যমে কিংবা তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু মসজিদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা থেকে সে নিজে উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই। সুতরাং তা মসজিদ হতে তথা একান্ত আল্লাহর জন্য হতে বিচারকের বিচারের প্রয়োজনীয়তা নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর মতে এসব ক্ষেত্রে ওয়াকফকারীর তা ওয়াকফ করার বক্তব্য উচ্চারণের সাথে সাথেই মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, তার মতে তা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যাস্ত করা মালিকানা দূর হওয়ার জন্য শর্ত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে মানুষ যখন পানকেন্দ্র থেকে পান করবে, সরাইখানায় অবস্থান গ্রহণ করবে এবং কবরস্থানে কাউকে দাফন করা হবে সাথে সাথেই তার মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। কেননা, তার মতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি অর্পণ করা শর্ত। সুতরাং প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর অর্পণ হলো শর্ত। সুতরাং উক্ত বস্তু সমূহে যদি বর্ণিত সুরত পাওয়া যায় তবে তা অর্পণ প্রাপ্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে ওয়াকফকারীর মালিকানা রহিত হয়ে যাবে। আর ওয়াকফকৃত কুয়া বা হাউজ সম্পর্কেও একই হুকুম। আর যদি তা তত্ত্বাবধায়কের হাতে অর্পণ করে দেয় তাহলে এ সকল সূরতে অর্পণ শুদ্ধ হবে।

قوله : وَ اِنْ جَعَلَ شَيْءٌ مِّنَ الطَّرِيْقِ الخ : যদি মসজিদ প্রশস্ত করার প্রয়োজন হয় আর সে অনুযায়ী রাস্তার কিছু অংশ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয় কিংবা আশপাশের অন্য কারো কিছু ভূমি খরিদ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয় তবে তা জায়েয। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) মসজিদে হারামের প্রশস্ততা এমনিভাবেই করেছেন। অনুরূপভাবে যদি মসজিদের কিছু অংশ প্রয়োজনের তাগিদে রাস্তার অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তবে তাও জায়েয আছে।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله و اصحابه اجمعين -